মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি

[৭৫০-১২৫৮]

মুসা আনসারী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

ভাদ্র ১৩৭৭ / সেপ্টেম্বর ১৯৭০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
প্রকাশ মুদ্রায়ণ
১১০/২ পূর্ব তেজতুরি বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

উৎসর্গ

বিশ্বমানব সভ্যতার প্রগতির স্বার্থে বস্তুনিষ্ঠ
ইতিহাস গবেষণা, রচনা ও চর্চায় নিবেদিত
সকল সংস্কৃতসেবীদের উদ্দেশে

প্রস্তাবনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনের গোধূলিলগ্নে উপলব্ধি করি যে, ইসলামের ইতিহাসের মূল পত্রের উপর, যত সামান্যই হোক, কিছু আলোচনা করা উচিত। আমাদের দেশে ইসলামের ইতিহাসের যথারীতি চর্চা ও পুনর্গঠনে পাশ্চাত্য আরব বিশেষজ্ঞ যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন তা বিস্ময়কর। স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায়, কারণে-অকারণে উক্ত পুনর্গঠন কর্মকাণ্ডে অনেক ভুলত্রুটি, এমন কি বেশ বিভ্রান্তি যে ছিল না, তাও নয়, তথাপিও তাদের গবেষণার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের ঐ বিশেষজ্ঞদের অনেকেই ছিলেন সেকালের প্রগতিবাদী এবং গীবনীয় ইতিহাসতত্ত্বে বৃত্তাবদ্ধ। তাঁরা তাদের সময়ের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে মনে হচ্ছে দিন বদলে গেছে; নতুন নতুন জীবন জিজ্ঞাসার মুখোমুখী আজকের মানব সমাজ। অতীতের ইতিহাসতত্ত্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আজকের অগ্রগামী চিন্তার আলোকে মানব সমাজ বুঝতে চায় তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য। নইলে তার ইতিহাস হারাবে তার প্রাণশক্তি।

ইতিহাস পাঠের আধুনিকায়ন খুবই দুরূহ কাজ। আপনার দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও এ কাজের সূত্রপাত করা হল। অনুজরা একে বিকশিত করে সামনে এগিয়ে যাবে; আমরা হব যাদুঘরের বস্তু।

আলোচ্য গ্রন্থে আব্বাসী বিপ্লব (৭৫০) হতে বাগদাদ পতন (১২৫৮) পর্যন্ত সময়কালটি নির্বাচন করা হয়েছে। এ সময়কালে আরব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ এবং তাৎপর্যপূর্ণ পতন সংঘটিত হয়। প্রাচ্য ইতিহাসমোদীদের নিকট এ সময়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি পৌছে দেয়ার প্রয়োজন আছে বৈকি! প্রাচীন বিশেষজ্ঞরা আল মামুন উত্তরকালের ইতিহাসের চমকের সন্ধান পান নি, তাই মামুন পরবর্তীকালের ইতিহাস উপেক্ষিত; অথচ এর পুনর্গঠন করতে পারলে এটা হবে প্রাণবন্ত। হিট্টিসহ প্রায় সকল ঐতিহাসিক এ সময়ের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন: কিন্তু এর অবক্ষয় ও পতনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। এক সময় এম. এন. রায়ের বই বাংলার তরুণ-মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইতিহাস চেতনা সৃষ্টি না করে তার মধ্যে ঔদ্ধত্য গর্ব ও সংস্কার বৃদ্ধি করে। গবেষক এম. এ. শাবান একজন ব্যতিক্রমধর্মী ঐতিহাসিক।

মূল বক্তব্য উত্থাপনের পূর্বে দু' একটি বাড়তি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। ক. এ পুস্তকে বহুল ব্যবহৃত 'আব্বাসীয়, ফাতেমীয়' ইত্যাদি ধরনের কষ্টকর বিশেষণ

পদের পরিবর্তে আব্বাসী, ফাতেমী, হাশেমী ধরনের শ্রুতিমধুর বিশেষণ পদ গ্রহণ করা হয়েছে। ইংরেজি অনুকরণে বাংলায় এরূপ বিশেষণ পদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাবারীর ইংরেজি অনুবাদক দেখিয়েছেন যে, নির্বিচারে গ্রিক অনুকরণের ফলে ইংরেজিতে ঐ ভ্রান্তির সংক্রমণ হয়। খ. মানব সভ্যতার বিকাশের স্বার্থে তার অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন হতে হয়; কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা সুবিস্তৃত এবং প্রতিদিন তা বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান জ্ঞান সঞ্চয়ের একমাত্র পথ বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করা; এতে সময়ের সাশ্রয় হয়; ইতিহাস চেতনা গভীবতা পায়। ইতিবৃত্তমূলক বর্ণনাধর্মী ইতিহাসে চেতনা গভীরতা পায় না। তাই ইতিবৃত্তমূলক বর্ণনাধর্মী ইতিহাস রচনার কাল সমাপ্তির পথে। আমাদের দেশে ঐ পদ্ধতি অবলম্বনেব বাস্তব অবস্থা তৈরি না হওয়ায় এ পুস্তকে সনাতন পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় নি; তবে এতে আধুনিক ঐতিহাসিক ধ্যান-ধারণা, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং আধুনিক গবেষণার ফলাফল যথাসম্ভব সংযোজিত হল। ঘটনা পরিবেশনে তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উপেক্ষিত হয় নি।

এ পুস্তকের ঘটনা প্রবাহের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিসমূহের গতি-প্রকৃতি উদ্ঘাটনের এক সচেতন প্রয়াস আছে। আব্বাসী বিপ্লব সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, এটা কেবল পারিবারিক বিপ্লব ছিল না। কেননা এ বিপ্লবের সাফল্যে একটি সামাজিক শ্রেণীর পতন এবং অন্য একটি সামাজিক শক্তির উদ্বোধন সূচিত হয়। উমাইয়া বংশের সামাজিক ভিত্তিমূল ছিল সিরিয়ার দাস মালিক শ্রেণী আর তাদের বিরোধী শক্তির উৎস ছিল ইরাক-ইরানের সামন্ত সামাজিক শক্তি। বিপ্লবে সিরিয়ার দাস মালিক সমাজের পতন হয়। সেই সাথে আরব রাষ্ট্রের পুরনো বিরোধের অবসান হয়। নতুন এক সামাজিক দ্বন্দ্বের বিকাশ হয়।

বিপ্লবোত্তর উদীয়মান সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রথম প্রতিফলন ঘটে বারমেকি অভিজাত পরিবারের পতনের মধ্যে। বাগদাদে ফজল বিন রাব্বীর নেতৃত্বে বারমেকি-বিরোধী একটি সামাজিক শক্তির উত্থান হয়। আবনা অভিজাত নেতা আলী বিন ইসা বিন মাহান বারমেকিদের পূর্বাঞ্চলীয় নীতির কড়া সমালোচনা করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে খলিফা হারুন বারমেকিদের পতন ঘটান। এ ঘটনা হতে অনুমান করা যাচ্ছিল যে, বাগদাদে ঐ নয়া শক্তির উত্থানে রাজনীতি এক নয়া মোড় নিচ্ছে। বস্তুত তাদের নয়া রাজনীতির প্রকাশ ঘটে আমীন-মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধে। অচিরেই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যকার গৃহযুদ্ধটি সাম্রাজ্যের দুটি প্রবল জাতিসত্তার মধ্যকার দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। ঘটনা প্রবাহ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রেণীর বিকাশক্রম, শাসক শ্রেণীর মধ্যকার বিরোধ (Social dynamism) এবং ইতিহাসের চালিকা শক্তি (Motive force) কিরূপে আব্বাসী ইতিহাসে গতি সঞ্চার করে–তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

[নয়]

এ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়টি একটু ভিন্ন স্বাদের; এবং এটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুটি সাধারণ ইতিহাস সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত, সে কারণে এ সময়ের ঘটনাপুঞ্জ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, অথচ এ সময়টি (৮৪৭-৯৪৬) আব্বাসী খেলাফতের দীর্ঘায়িত ক্রান্তিকাল; আরব নেতৃত্ব হতে অনারব নেতৃত্বে উত্তরণ এবং খেলাফত হতে সালতানাতের বিকাশ সাধনের পটভূমি রচিত হয় এই সময়। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার চিত্তাকর্ষক বিষয়টি এতে বিধৃত হয়েছে। এই উপেক্ষিত অধ্যায়ের উপর অনেকখানি আলোকপাত করেছেন এম. এ. শাবান। অধ্যায়টি মোটামুটি তার অনুসরণে রচিত।

সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থে মোতাওয়াক্কিলকে আব্বাসী খেলাফতের অবক্ষয়ের যাত্রা বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; বক্তব্যটি সম্ভবত আংশিক সত্য; কিন্তু কি হিসেবে? তাঁর রাজত্বকালে তার সাম্রাজ্যের কোনো বিস্তৃতি ঘটে নি সত্য; কিন্তু তিনি আমরণ তাঁর উত্তরাধিকারের সফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর খাজাঞ্চিখানাও ছিল পরিপূর্ণ।

আমলা-সামরিক নেতা কর্তৃক মোতাওয়াক্কিলকে খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল আব্বাসী ইতিহাসের প্রথম ঘটনা। তাঁর নিজস্ব রাজনীতি সফল করার জন্য তিনি অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নতুন সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে এক বিপজ্জনক পদক্ষেপ নেন; সমরনেতাদেরকে ভূমি মঞ্জুরী (Land Grant) দান করেন।

ইকতা বা ভূমি মঞ্জুরী কোনো অভিনব ব্যাপার ছিল না, তবে তা দেয়া হত রাজপরিবার সদস্য ও উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তাদেরকে। এতদিন ঐ সামন্তরাই ছিল শাসক শ্রেণীর নেতা; নতুন ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে সমরনেতারা ও শাসক শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রবেশাধিকার অর্জন করে। সামাররা সামরিক নেতারা তাঁকে হত্যা করে আব্বাসী ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই হত্যাকাণ্ড হতে আব্বাসী খলিফাদের রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের অবসান প্রত্যাসন্ন হয়ে পড়ে। এই হত্যাকাণ্ডের পরপরই খেলাফতের প্রথম রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

বস্তুত মোতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর পর হতে বুওয়াইহী কর্তৃক বাগদাদ দখল পর্যন্ত (৮৬২-৯৪৬) এই দীর্ঘ সময়কালটি ছিল আব্বাসী খেলাফতের রাজনৈতিক সংকটকাল।

প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক সংকটের প্রকাশ ঘটে বাগদাদ-সামাররা দ্বন্দ্বের মধ্যে। রাজধানী সামাররায় সামাররা বাহিনী ও শাকেরিয়া বাহিনীদ্বয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রথম সংকটের সূচনা হয়। সামাররার রাজনৈতিক ডামাডোলে বুগা ও ওয়াসিফ সামাররা বাহিনীর সমর্থন হারালে শাকেরিয়া বাহিনী তাদেরকে সমর্থন দেয়। সামাররা বাহিনীকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হলে নেতাদ্বয় খলিফা মস্তাইনকে সঙ্গে নিয়ে বাগদাদে গমন করেন। এভাবে বাহিনীদ্বয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব অচিরে বাগদাদ-সামাররা দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে।

[দশ]

মতাজ সামরিক প্রশাসনিক ইকতা নীতির ঘোর বিরোধিতা করেন এবং সামরিক বিভাগ হতে রাজস্ব বিভাগের স্বতন্ত্রতার নীতিতে অটল ছিলেন; অথচ সেনাবাহিনী রাজস্ব বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই জটিল প্রশ্নে বেসামরিক আমলারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

মুন্তাসির হতে মোহতাদীর রাজত্বকাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একক রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র অচল হয়ে গেছে; অথচ বেসামরিক আমলা অথবা সামরিক বাহিনী কোনো পক্ষরই এককভাবে আপন আপন স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার অবস্থা ছিল না। সে সময় কোনো চরমপন্থা কার্যকর নয় ভেবে সামাররায় মধ্যপন্থীদের বিকাশ হয়। তৎকালীন বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসনের জন্য তারা একটি সম্মিলিত আপোষ ফর্মুলা রচনা করে খলিফা মোহতাদীর নিকট পেশ করে। মোহতাদী তাদের শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। মোতাওয়াক্কিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুতামিদকে খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর ফলে মোতামিদ এবং তদোত্তরকালে বেশ কয়েক বছরের জন্য বাগদাদে এক অভিনব রাজনীতির বিকাশ হয়। উক্ত আপোসনামায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল। খলিফা তাঁর এক ভ্রাতাকে প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করবেন। মোতামিদ আবু আহমদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। খলিফার নিকট হতে সর্বোচ্চ সামরিক দায়িত্ব প্রত্যাহার করার অর্থ হল রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের অবসানের সূচনা। আবু আহমদকে মোয়াফফাক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে বাগদাদ নগরে পরস্পর স্বার্থবিরোধী দুটি সামাজিক শক্তি স্ব-স্ব স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়। উক্ত সামাজিক শক্তির একটির নেতৃত্ব দেয় জাররাহ পরিবার। অপরটির নেতৃত্ব দেয় ফুরাত পরিবার। জাররাহ পার্টি ভূমির উপর কর আরোপ এবং বাণিজ্যে কর রেয়াতের প্রবক্তা ছিল; কেন্দ্রের স্বার্থে আঞ্চলিক স্বার্থ বলিদান দিতে তাদের কুণ্ঠা ছিল না; তারা আঞ্চলিক সরকারের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণেরও প্রবক্তা, তাই তারা সামরিক প্রশাসনিক ইকতা ব্যবস্থার সমর্থক। বস্তুত জাররাহ পার্টি ছিল দেশের নির্ভেজাল সামন্ত শক্তির প্রতিনিধি। ফুরাত দল সামরিক প্রশাসনিক ইকতার ঘোর বিরোধী ছিল; তারা সামরিক বাহিনীকে রাজস্ব বিভাগ হতে স্বতন্ত্র রাখার পক্ষপাতি, তবে সেনাবাহিনীর নিয়মিত এবং উপর্যুক্ত বৃত্তি প্রদানে আগ্রহী; তারা আঞ্চলিক স্বার্থের সাথে কেন্দ্রীয় স্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে চাইত। বস্তুত ফুরাত দল ছিল সামন্ততন্ত্রী-বণিক শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধি। তৎকালীন বাস্তবতায় জাররাহ দল ছিল রক্ষণশীল; ফুরাত দল ছিল উদারপন্থী প্রগতিবাদী। তাদের এরূপ মতাদর্শভিত্তিক দলীয় রাজনীতির বিকাশ ছিল মধ্যযুগের প্রথমার্ধে এক বিরল ঘটনা। দুর্ভাগ্যবশত এরূপ দলীয় রাজনীতির অধিকতর বিকাশ সম্ভব হয় নি। তবুও তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করে।

[এগার]

জীবিত থাকা পর্যন্ত মোয়াফফাক উভয় দলের যুগ্ম সরকার পরিচালনায় সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি একটি সমন্বিত সেনাবাহিনী গঠন করেন ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে একের পর এক সমস্যার সমাধান করেন। বস্তুত মোয়াফফাক ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম প্রতিভাবান সৎ রাজনীতিবিদ। অথচ ইতিহাস গ্রন্থে তার কোনো পরিচয় নেই বললে চলে।

মোক্তাদিরের খেলাফতে সমাসীন হওয়ার সময় হতে বুওয়াইহীরা ৯৪৬ সালে বাগদাদ খলিফার সময় পর্যন্ত ছিল আব্বাসী খেলাফতের চরম সংকটকাল। মুক্তাদিরের সময় ৪ জন সমরনেতার উত্থান হয়, এবং বেসামরিক আমলাদের তুলনায় সমর নেতারা অনেক প্রভাবশালী হলেও রাষ্ট্রীয় চরিত্রের প্রধান দিক ছিল সামরিক নাগরিক আমলাতান্ত্রিক মিশ্র স্বৈরতন্ত্র।

মুক্তাদিরের ২৫ বছরের রাজত্বকালে ১৫ জন মন্ত্রীর উত্থান-পতন ঘটে; ৫ বার বল প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল বা ক্যু সংঘটিত হয়। এরূপ সংকটকালে সামরিক ব্যক্তিত্ব বাগদাদের রাজনীতিতে নিয়ামক শক্তি বলে বিবেচ্য হয়, তথাপি বেসামরিক আমলাদের উৎখাত করা সম্ভব হয় নি। ঐ দীর্ঘ ২৫ বছরের আব্বাসী রাজনৈতিক আবর্তের কালকে জাররাহ ও ফুরাত পরিবারের মতাদর্শগত কার্যক্রম দ্বারা বিশ্লেষণ করা চলে।

আব্বাসী খেলাফতের এরূপ রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত জানজ বিদ্রোহ, সাফফারী আন্দোলন এবং কারামিতা বিদ্রোহের নতুন বিশ্লেষণ যথাস্থানে সংযোজিত হয়েছে; বাগদাদের রাজনীতিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস আছে।

এই অধ্যায়ে খলিফার রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র কিরূপে সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক মিশ্র স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়, পুনশ্চ ঐ মিশ্র স্বৈরতন্ত্র কিরূপে নির্ভেজাল সামরিক স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়—তার একটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সুসংহত ইতিহাস বিধৃত হল।

মধ্যযুগে যে কোনো রাজ্য বা সাম্রাজ্যের বড় সমস্যা ছিল রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা। যে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র যে কোনো সময় খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। কখনো বল প্রয়োগ করে ধ্বংস করা হত, অথবা রাজ্যের দুর্বল গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। বস্তুত রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও বিচ্ছিন্নতা যেন দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়।

আব্বাসী আমলে ঐ একই ঘটনা ঘটে। আব্বাসী সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে মরোক্কোতে ইদ্রিসী বংশ (৭৮৮-৯০৪), ইখশিদ বংশ (৯৩৫-৯৬৯), ফাতেমী বংশ (৯৬৯-১১৬০), সিরিয়ায় হামদানী বংশ (৯৬৯-১০০৩); প্রাচ্য অঞ্চলে তাহেরি বংশ

(৮২০-৮৭৪) সাফফারী বংশ (৮৬৭-৯০৮) এবং সামানী বংশ (৮৭৪-৯৯৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ সব বংশের মধ্যে ইদ্রিসী, রুস্তামী এবং ফাতেমী বংশ আব্বাসীদের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক না রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আব্বাসী বিপ্লবের সাথে সাথে স্পেনে উমাইয়া বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভা নগরী দ্বিতীয় আরব সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হয়। ফাতেমীরা কায়রোতে প্রতিষ্ঠা করে তৃতীয় আরব সংস্কৃতি কেন্দ্র। এভাবে এককেন্দ্রিকতার স্থানে ইসলামি উম্মার বহুকেন্দ্রিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। আরো লক্ষ্য করার বিষয়–উমাইয়া, ইদ্রিসী-রুস্তামী এবং ফাতেমীরা ছিল আরব। এ শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা চলে না। ঐগুলো ব্যতীত অন্য বংশগুলো ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। তারা আব্বাসী বিপ্লবের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দেয়। আব্বাসী সরকারের সাথে সহযোগিতার পথ ধরে তারা তাদের আত্ম পরিচিতি অর্জন করে। তারা তাদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের এক পর্যায়ে স্থানীয় স্বার্থ সচেতন হয়। এ সব বংশের প্রতিষ্ঠাতারা কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আপন আপন কর্মস্থলে বা প্রদেশের স্বাধীকার বা স্বাধীনতা অর্জন করে। কেন্দ্রের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের।

হিট্টির মডেল অনুসরণ করে আমাদের দেশে ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত বংশগুলো 'খুদেবংশ' (Sundry dynasty) শীর্ষক একটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয় এবং তা স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। তাদের সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অবশ্যই কাম্য, তবে তা হওয়া উচিত আব্বাসী খেলাফতের কাঠামোর মধ্যে। এ পুস্তকে তাদের সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য কোনো স্বতন্ত্র অধ্যায় করা হয় নি।

হিট্টি বুওয়াইহী বংশকে তথাকথিত খুদেবংশ পর্যায়ভুক্ত করলেন কেন, তা বোধগম্য নয়। আব্বাসী সাম্রাজ্যের উল্লিখিত বিচ্ছিন্নতাবাদী বংশ বা শক্তিসমূহ হতে বুওয়াইহীদের ছিল মৌলিক পার্থক্য। বুওয়াইহীদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বলা চলে না। তারা ছিল বিজয়ী জাতিসত্তা (conquering race)। তারা ইসলামের ইতিহাসে এক নবতর ধারার দিক নির্দেশনা দেয়। আব্বাসী সাম্রাজ্যের ক্ষুদে জাতিসত্তাসমূহের বিকাশের ধারাকে বেগবান করে। প্রথমত তারা আরব জাতির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নি সত্য; কিন্তু তাদের আর্থ-সামাজিক সংগঠনে আরব নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ছুড়ে ফেলে অনারব নেতৃত্বের পথ প্রশস্ত করে। দ্বিতীয়ত আরব খেলাফতের পরিবর্তে প্রাচ্য জাহানদারী বা সালতানাতের ধারার প্রবর্তন করে। মধ্যযুগ বা সামন্তবাদের শেষার্ধে উক্ত ধারণাটি মহীরূহে পরিণত হয়; ধারণাটি বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। সেলজুকরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং সেলজুকী মন্ত্রী নিজামুলমুলক তুসী জাহানদারী বা সালতানাত আদর্শের সমর্থনে তার রাষ্ট্র দর্শন নির্মাণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আব্বাসী রাষ্ট্র যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হয় ঠিক তেমনি বুওয়াইহী অথবা সেলজুকীও বিচ্ছিন্নতাবাদে আক্রান্ত হয়। কেন এরূপ ঘটে? এর কি কোনো সামাজিক ব্যাখ্যা নেই? এত রদবদলের পরও তৎকালীন রাষ্ট্র সমাজে কোনো মৌলিক রূপন্তর ঘটে নি কেন? এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হল।

পুস্তকের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় দুটিতে আলোচ্য সময়কালের ইসলামি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পুস্তকের সিংহভাগে প্রধানত আরব তথা প্রাচ্য মুসলিম শাসকবর্গের রাজনৈতিক জীবন সাধনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার স্বরূপ সন্ধানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেও তার সমগ্র মানস পরিমণ্ডল উপেক্ষিত হয় নি।

যাহোক উক্ত অধ্যায়দ্বয়ে তার সাংস্কৃতিক জীবন সাধনার বিশেষ বিশেষ দিকের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানুষ তার জীবন সাধনার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করে তাই তার কৃতি বা সংস্কৃতি। পুনশ্চ তার সুসংহত সংস্কৃতি তার জীবনের বাস্তবতার রূপান্তর ঘটায়। তার উন্নত জীবন সাধনা উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এবং উন্নত সংস্কৃতি তার জীবনকে আরো উন্নত করে। এভাবে মানব সভ্যতা হয় এক বিকাশমান প্রক্রিয়া। এ কারণে তার রাষ্ট্রীয় সাধনা, তার সমাজ জীবন তার সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত সমাজ জীবন গড়ে ওঠে তার জীবিকা উৎপাদনের কর্মকাণ্ড হতে; সে তার সঙ্ঘ শক্তি দিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এ সংগ্রামে যতটুকু সে সাফল্য অর্জন করে ততটুকু গড়ে ওঠে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি দু প্রকারের : ক. বৈষয়িক, খ. মানসিক। তার বৈষয়িক কৃতিকর্মে লুকিয়ে থাকে তার মানসিক বা আধ্যাত্মিক উপাদান; তার মানসিক ক্রিয়াকর্ম যখন স্বতন্ত্ররূপ পায়-তার মধ্যে তার বৈষয়িক জীবনের চিত্রই ফুটে ওঠে। বস্তুত মানব জীবন ও তার সংস্কৃতির এ দ্বান্দিক রূপটি অনুধাবন করতে পারলে মানব জীবন ও মানব সভ্যতার ইতিহাসের বাস্তব উপলব্ধি হয় সহজসাধ্য।

আব্বাসী শাসন আমলকে রাজনৈতিকভাবে দুভাগে ভাগ করা হয় : ক. সুবর্ণ যুগ, খ. অবক্ষয়ী যুগ। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচনায় দেখা যায় যে, সুবর্ণ যুগের সংস্কৃতিতে যে উচুমান অর্জিত হয়েছিল অবক্ষয়ী যুগে সে মান হয়ে ওঠে অকল্পনীয়। সুবর্ণ যুগের মূলে ছিল তৎকালীন বাস্তব জীবনের ব্যাপ্তি। বাগদাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিশ্ব বাণিজ্য। সেই সাথে সমগ্র সমাজ জীবন হয় কর্ম মুখর, তার চিন্তা চেতনায় আসে মৌলিকত্ব ও গতিশীলতা। দশম শতাব্দীর শেষার্ধ হতে প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বের উত্তর ও দক্ষিণ বাণিজ্য পথের পতন হওয়ায় এতদাঞ্চলের জীবনের বাস্তবতা সঙ্কুচিত হয়; সেই সাথে তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গতি হারায়, ক্রমাগত পশ্চাদপদ চিন্তন ও কুসংস্কার তাদের গ্রাস করে বসে। এ পতন একাদশ শতক হতে শুরু হয় এবং এ পশ্চাদমুখী অবস্থা প্রাক আধুনিককাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বিদ্যমান থাকে।

পুস্তকখানি দিনের আলো দেখল। এ মুহূর্তে সর্বজনশ্রদ্ধেয় মরহুম প্রফেসর মোমতাজুর রহমান তরফদারের কথা বারবার মনে হচ্ছে। এ পুস্তক রচনার মূল পরিকল্পনার কথা শুনে খুব খুশি হয়ে তিনি এর ভূমিকা লিখতে চেয়েছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য তিনি এখন প্রয়াত।

পুস্তকখানি যথাসময় প্রকাশ করার জন্য বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালনক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং পরিচালক জনাব গোলাম মঈনউদ্দিনকে জানাই বিশেষ ধন্যবাদ। এর প্রকাশনার সাথে যুক্ত বাংলা একাডেমীর অন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

পুস্তক রচনার সময় অসুস্থ সহধর্মিনীর সহযোগিতা আমাকে উৎসাহিত করে। পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় স্নেহাস্পদ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান (ঢা: বি:), অধ্যাপক ফকির ফারুক (গভ: কলেজ) এবং অধ্যাপিকা আরজুমান্দ আলো আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে। মোবারকবাদ জানিয়ে তাদেরকে খাটো করতে চাই নি।

নানা কারণে পুস্তকখানিতে বেশ কিছু ভুলক্রটি রয়ে গেল। আরবি নাম-ধাম বাংলা ভাষায় রূপান্তরের এখনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলে কিছু স্বাধীনতা নিয়েছি, তবুও অসতর্কতার জন্য সর্বত্র একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে ওঠে নি। আরবি ও ইংরেজি গ্রন্থ ব্যবহার করায় বাংলা শব্দচয়ন এমন কি বাক্য গঠনেও ক্রটি থাকতে পারে। অল্প সময়ে পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় বানান ভুলসহ অন্য কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে পারে।

পুস্তকের বাহ্যিক ক্রটি বিচ্যুতির দায়দায়িত্ব আমার নিজের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার মতামত খুব স্বচ্ছ হয়েছে বলে মনে হয় নি। এ সব ক্রটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সহৃদয় পাঠক পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে খুশি হব। বইখানি যদি উৎসুক পাঠকের কোনো কাজে লাগে তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

ভবিষ্যতে পুস্তকখানির মান উন্নয়নে বোদ্ধা পাঠকমণ্ডলীর সুচিন্তিত মতামত সানন্দে বিবেচ্য হবে। তাই শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গের নিকট হতে মূল্যবান পরামর্শ পাওয়ার আশায় প্রতীক্ষায় রইলাম।

মুসা আনসারী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-আব্বাসী যুগে আরব সভ্যতার বিকাশধারা

১.১ প্রাক-কথন

প্রাক-ধনবাদী যুগে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে দুটি বড় ঘটনা ঘটে। তার একটি খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীব শেষপ্রান্তে (৪৭৫ খ্রি.) পশ্চিম রোমীয় সাম্রাজ্যের পতন। আর এটি কোনো সাধারণ পতন ছিল না; এতে ছিল দাসশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ব্যবস্থা ভিত্তিক প্রাচীন সভ্যতার পরিসমাপ্তি।[১] এর ধ্বংসস্তূপে প্রাণোচ্ছল উদীয়মান জর্মন জাতিসমূহের সৃজনশীল প্রতিভায় গ্রামভিত্তিক নয়া আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ভূমি ভিত্তিক এই নয়া ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তি হিসাবে (প্রথম স্তরে) ভূমিদাসের ও শেষপ্রান্তে স্বাধীন কৃষকের ভূমিকাই ছিল প্রধান।[২] ইউরোপের ইতিহাসে সভ্যতার এই সময়টি সাধারণত মধ্যযুগ বলে অভিহিত করা হয়। ইউরোপের মধ্যযুগ মূলত সামন্তবাদেব নামান্তর। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় সামন্তযুগের পতন হলেও বলা চলে এর বিলুপ্তির সূচনা হয় ইংল্যান্ডে কৃষি ও শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবেব সাথে।[৩] ইউরোপীয় সামন্তকালকে মোটামুটিভাবে দু ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথমার্ধ বা চিরায়ত সামন্তযুগ এবং তা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রীয় জীবনে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল—বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ছিল প্রকট; নাগরিক জীবন ছিল নগণ্য, গ্রাম জীবন ছিল প্রবল। এ সময় ইউরোপীয় সমাজদেহে পরিমাণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। আর এ পরিবর্তন ছিল মূলত সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার স্বাধীন, পূর্ণ ও অব্যাহত বিকাশধারার প্রতিফলন। সামন্ত শোষণ পর্যায়ক্রমে শ্রম-খাজনা, দ্রব্য-খাজনা ও মুদ্রা-খাজনায় রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যেই তাব বিকাশধারা অভিব্যক্ত হয়।[৪] মুখ্যত এই অবকাঠামোর পরিবর্তনে উপরিকাঠামোতে রূপান্তর ঘটে।[৫] প্রথমার্ধের রূপান্তর প্রক্রিয়াটি লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হতে সামন্তবাদের মধ্যকার বিরোধী শক্তি (বণিকশ্রেণী) প্রবল হতে থাকায় উক্ত পরিবর্তনের গতিবেগ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে এবং অসংখ্য ঘটনায় তা প্রতিফলিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে—ইউরোপীয় বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানে নিখিল ইউরোপীয় সামন্তবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদে শৈথিল্য, ইতালিতে কয়েকটি স্বাধীন নগরের উৎপত্তি ও বণিক শ্রেণীর উন্মেষ, সেই সাথে রেনেসাঁস ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপীয় মানস পরিমণ্ডলে মনোবিপ্লব ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ; ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদনের গতি সঞ্চারণ; বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে বাণিজ্যতন্ত্রের সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটে। কৃষি বিদ্রোহ, বাণিজ্যিক বিপ্লবের সাথে আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি ও দর্শনের অভূতপূর্ব বিকাশে সামন্ততন্ত্রে পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে

ওঠে। বৈষয়িক উন্নতির সাথে মানসিক উন্নতি; আবার অধিকতর মানসিক উন্নতিতে বৈষয়িক, রাজনৈতিক উন্নতির গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে থাকায় সামন্তবাদের শেষার্ধে পরিবর্তনের দিকটি প্রাধান্য পায়। ফলে ইউরোপীয় সমাজে বিশেষ করে, ইংল্যান্ডে বাণিজ্যতন্ত্র নিয়ামক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং তা পুঁজিতন্ত্রের জন্ম দেয়—ফলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন সময় ইউরোপ হতে সামন্তবাদের চির পতন ঘটে।

মধ্যযুগের দ্বিতীয় বড় ঘটনা হল এশীয় সমাজে সপ্তম শতাব্দীতে আরবের মরুসন্তানরা একটি নয়া আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ভিত্তিতে সেদিনের সম্ভাব্য উঁচুমানের সভ্য সমাজ গঠন করে; অথচ ইউরোপে মধ্যযুগের প্রথমার্ধে এর সমকক্ষ সমাজ ছিল অকল্পনীয় এবং অচিরে তিনটি মহাদেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষ্য করার বিষয় মুসলিম বিশ্বের উত্থান ও বিকাশকাল দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। একাদশ শতক হতে ইসলামি বিশ্বে দ্রুত অবক্ষয় দেখা দেয়; তার স্বর্ণযুগকে ধরে রাখা যায় নি। একথাও সত্য যে, বিশ্ব সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার অবদান অবিস্মরণীয়। একাদশ শতক হতে পশ্চিম ইউরোপে নয়া রূপান্তর শুরু হয়। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইসলামি স্বর্ণযুগের সংগৃহীত ও বিকশিত বিশ্ব জ্ঞান ভাণ্ডার ইউরোপীয় মানস পরিমণ্ডলকে আলোকিত ও বিকশিত করে। লক্ষণীয় হয়ে উঠে ইসলামি বিশ্বের অবক্ষয়; প্রকট হতে থাকে তার পশ্চাদপদতা, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হতে তারা ইউরোপীয় আক্রমণের শিকারে পরিণত হয় এবং মুসলিম বিশ্বে ইউরোপীয় প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেন এমন হল?

দুই ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দুটি সভ্যতা পাশাপাশি সূচিত ও বিকশিত হয়। ইউরেপীয় সামন্ত যুগের সূচনা হয় গ্রিসিয়-রোমীয় পরিণত দাসত্য যুগের ধ্বংসস্তূপের উপর; কিন্তু ইসলামি বিশ্বের জন্ম যাযাবরী জীবনের অবক্ষয় ও দাসতা অর্থনীতির উদ্ভবের মধ্য দিয়ে এবং এর স্বাভাবিক অবক্ষয়ের পূর্বেই সামন্তবাদের বিকাশ ঘটতে থাকায় ইসলামি বিশ্বের সামন্তবাদ এক নবরূপ পরিগ্রহ করে। তাই উভয়ের বিকাশ ছিল ভিন্ন ধর্মী; ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উভয় ক্ষেত্রে শোষণের মূল ভিত্তি ও প্রকৃতি অনেকাংশে অভিন্ন হলেও শেষার্ধে ইউরোপের শোষণের রূপ বদলে যায় এবং সমাজে নয়া চালিকা শক্তির বিকাশ ঘটে। বক্ষ্যমান আলোচনায় বিশ্ব মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সামাজিক চালিকা শক্তিসমূহের অনুসন্ধান ও তাদের গতি প্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটন, সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তির আন্তঃসম্পর্ক এবং বহিঃকারণসমূহ কিভাবে এর বিকাশধারাকে প্রভাবিত করেছে তার উপলব্ধির প্রচেষ্টা চালান হবে।

১.২ ইসলাম পূর্বযুগে ইসলামের লীলাভূমি হেজাজ

ঐতিহাসিক বিচারে, আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে পশ্চাদপদ জনপদ হেজাজ প্রদেশের মক্কা-মদিনায় ইসলামি বিপ্লব সূচিত হয়। আধুনিক বুর্জোয়া ঐতিহাসিকগণ

গতানুগতিকভাবে একে প্রধানত আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় বিপ্লব বলেই চিহ্নিত করেন। এরূপ একটি সর্বাত্মক বিপ্লব আকস্মিকভাবে ঘটতে পারে না এবং এর আর্থ-সামাজিক দিকটা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না বলে তাঁরা ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে মক্কা তথা হেজাজ-আরবের আর্থ-সামাজিক পটভূমি বর্ণনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এরূপ বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভবে প্রাচীন আরব সভ্যতার অবদান এবং বহিঃশক্তিসমূহের প্রভাব নির্ণয়ের প্রয়াস চালান হয়। এরূপ বহিঃশক্তিসমূহের প্রভাবের একটি চমৎকার সারসংকলন করেছেন হিট্টি। কিন্তু হেজাজের এরূপ রূপান্তরে এসব শক্তিসমূহের নির্ধারণী প্রভাব সম্পর্কে তিনি দ্বিধাচিত্ত।[৬] এ বিপ্লব হেজাজের আর্থ-সামাজিক বিকাশধারার ফলশ্রুতি—এমন মতামত তিনি কোথাও ব্যক্ত করেন নি। ওয়াট সাহেব এ বিপ্লবের একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মন্তব্য করেন যে, কোরআন অবতীর্ণ হয় মরুভূমির আবহাওয়ায় নয় বরং উচ্চতর অর্থনৈতিক পরিবেশে। মক্কায় বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশে গোত্রীয় সংহতির মূল রক্ত সম্পর্ক শিথিল হওয়ায় নতুন ও বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ সংগঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৭] তৎকালীন উৎপাদন প্রণালীর মানদণ্ডে অতীত সমাজের বিচার না করে তিনি আধুনিক অর্থনৈতিক প্রত্যয়সমূহ যান্ত্রিকভাবে তার উপর আরোপ করেছেন মাত্র।

ইসলামের চিরায়ত সাহিত্যে আরবের প্রাক-ইসলামি যুগ 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বলে অভিহিত। হিট্টি সীমিত অর্থে তা গ্রহণ করেছেন। প্রাক-ইসলামি হেজাজের বাস্তব অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করলে সম্ভবত এঙ্গেলসের মতামতই সমধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর মতে, জাহেলিয়া ছিল 'প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে' হেজাজী সমাজ বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়; ঐতিহাসিক যুগে উত্তরণের পূর্ব মুহূর্ত, যুগসন্ধিক্ষণ।[৮] এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাক-ইসলামি সাহিত্য বিবেচ্য; 'আইয়ামুল আরব' কেবল নিরর্থক রক্তপাতের ইতিহাস, এর পশ্চাতে কি আন্তঃসামাজিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল না?

ইসলামের অভ্যুদয় প্রাক্কলে হেজাজ প্রদেশে যুগপৎ বেদুইন সমাজ, আধা-বেদুইন, আধা-গ্রাম সমাজ, গ্রাম্য সমাজ ও শহুরে সমাজ বিদ্যামান ছিল। হেজাজের এরূপ বাস্তব অবস্থা তার সামাজিক বিকাশে বিশেষ ধারার ইঙ্গিত বহন করে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আজকের শহুরে ছিল গতকালের বেদুইন। বেদুইন জীবন যাত্রায় পরিবর্তন মন্থর হলেও তা অনড় নয়-এ সত্য আজ সর্বজন স্বীকৃত।[৯] বেদুইনদেরকে জিপসী ভাবাও ঠিক নয়; যাযাবরীও এক রকম জীবন পদ্ধতি।[১০] তাদের সামাজিক ও মানসিক গঠন মূলত তাদের উৎপাদন পদ্ধতিজাত; আধুনিক ঐতিহাসিক তা অস্বীকার করতে পারছেন না।[১১] তাদের উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশশীল বলেই উল্লিখিত বিভিন্ন সমাজ বিকশিত হয়েছিল।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হেজাজে প্রাথমিক প্রধান সামাজিক শ্রম বিভাজন সংগঠিত হয় বলে জানা যায়; তাই পশু পালন হতে কৃষি বিচ্ছিন্ন হয়। বেদুইনদের

অগ্রগামী অংশ বিভিন্ন মরুদ্যানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করে। জাহেলিয়া যুগে ষষ্ঠ শতাব্দীতে সামাজিক শ্রম বিভাগের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়; কৃষি হতে হস্ত শিল্প পৃথক হয়; এ সময় মদিনার পশ্চিমে সুলাইন গোত্রের আবাস ভূমিতে লৌহ আকর আবিষ্কৃত হয় এবং লৌহ শিল্প গড়ে উঠে।[১২] লৌহ শিল্প বিকাশে কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নতি হয়; কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা এবং উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির উন্নতি হয়। উৎপাদন শক্তির অধিকতর বিকাশে পণ্য উৎপাদিত হয় এবং অস্থাবর সম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বেদুইন ও গ্রাম্য সমাজের মধ্যে এমন কি আন্তঃগোত্রীয় পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। বিভিন্ন 'হিমায়' হাট বাজার বসতে থাকে।[১৩] কেবল হেজাজের এরূপ সমাজ বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে মক্কায় শহুরে সমাজ বিকাশের ধারা অনুধাবন করা সম্ভব। মক্কার ভূপ্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের; পশু পালন অথবা কৃষির জন্য ছিল একেবারে অনুপযুক্ত, তবে এর ভৌগোলিক অবস্থাটি ছিল খুবই সুবিধাজনক। ইয়ামেনী সুগন্ধি পণ্যের ইয়ামেন-সিরিয়া বাণিজ্য তথা প্রাচ্য-প্রতিচ্য আন্তর্জাতিক কাফেলা বাণিজ্য সড়কে অবস্থিত ছিল মক্কা। তাই মক্কা হেজাজের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক, মক্কায় ছিল জমজম কূপ; কাবা গৃহ হেজাজীদের প্রধান তীর্থ ক্ষেত্র। মক্কায় বসবাসকারীদের জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল ব্যবসা। হেজাজবাসী মক্কাকে শান্তির নগর হিসাবে গ্রহণ করে বছরে অন্তত চার মাস সর্ব প্রকার হানাহানি নিষিদ্ধ থাকায় নিরাপদে ব্যবসা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড পরিচালনা করা যেত। তাবারীর একটি উক্তিতে মক্কায় বাণিজ্যের ব্যাপকতা অনুমান করা যায়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে ২৫০০ উটের কাফেলা বাণিজ্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।[১৪] বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার কোরাইশরা সিরিয়া অভিমুখে এক হাজার উটের বাণিজ্য কাফেলা প্রেরণ করে। উল্লেখ্য যে, প্রাক ইসলামি যুগে মক্কার নিজস্ব কোনো মুদ্রা ছিল না এবং তখনো এখানে মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কথা নয়; কেননা তখনো হেজাজে বা মক্কায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি। যা হোক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে মক্কার এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হেজাজী গ্রাম সমাজ ও বেদুইন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং উৎপাদন শক্তি বিকশিত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রম বিভাগ, পণ্য উৎপাদন এবং অস্থাবর সম্পত্তির উপর ব্যক্তিমালিকানা উদ্ভবে সম্পদ বন্টনে বৈষম্য দেখা দেয়। আদিম গোত্রীয় সমাজ-সম্পর্কে অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে; তাই আদিম সাম্যবাদের স্থানে এক নতুন শ্রেণীবিন্যাস প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়। বিভিন্ন পরিবারের গোত্রপতিরা ধীরে ধীরে গোত্রীয় অভিজাত শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়।[১৫] সম্পদ বন্টনে বৈষম্য দেখা দিলে প্রতিটি সমাজে সম্পদহীন শ্রেণীর জন্ম হয়; এদেরকে বলা হয় সালুক। এই সম্পদহীন বাহিনীর সদস্যরা লুটতরাজ-রাহাজানীতে ছিল সিদ্ধহস্ত। অভিজাতদের চোখে এরা ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। গোত্র-বিরোধী

কার্যকলাপের জন্য যাদেরকে সমাজচ্যুত করা হত এবং তাদেরকে বলা হত ত্বারিদ। কবি সানফারা এদের জীবনধারা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৬] উক্ত সালুক বা ত্বারিদ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা হয় নি, তবুও এদের মধ্যে ওয়াট সাহেব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন।[১৭] অথচ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ মূলত আধুনিক পুঁজিবাদীযুগের মনোভঙ্গি; এরূপ মনোভঙ্গি গোত্রীয় সমাজে কিরূপে উদ্ভব হবে? উক্ত সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে সোভিয়েত সমাজতাত্ত্বিক Beleyaev-এর বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। তিনি মনে করেন, উক্ত সমাজ প্রথমে বিকশিত হয় বেদুইন ও গ্রাম সমাজ হতে, পরে তাদের অনেকে কাজের সন্ধানে মক্কায় এসে বসবাস করতে থাকে। বস্তুত, হেজাজী কৌম সমাজের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কে দ্রুত অবক্ষয়ের ফলে উক্ত সম্পদহীন গোত্রহীন সমাজের জন্ম হয়। তারা অচেতনভাবেই সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।[১৮] এরূপ বিদ্রোহের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বা ব্যক্তিত্ববোধের কোনো সন্ধান মেলে না, বরং তখনো সমাজ ছিল নিয়ামক শক্তি।

বৈষম্যমূলক সম্পদ বণ্টনের ফলে কেবল যে-সালুক ও ত্বারিদ সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তাই নয়, গোত্রীয় অভিজাত পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের জন্য প্রয়োজন হয় দাস শ্রমের। অনেকের ধারণা, প্রাচ্য দেশে দাস কেবল গৃহস্থালির কাজেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে আরব গোত্রীয় অভিজাতরা পশুপালন, জলসেচ ইত্যাদি কঠিন কাজ সম্পাদনে দাসশ্রম নিয়োগ করত।[১৯] দাস সাধারণত আরবদের মধ্য হতে সংগ্রহ করা কখনো উৎসাহিত হয় নি; বরং নিগ্রোদাস সংগ্রহ করা হত। এদের সম্বন্ধে আনতারার কাব্যে চমৎকার বর্ণনা আছে।[২০]

হেজাজের সংঘাতময় মরুজীবনে জনবল সৃষ্টির তাগিদ প্রতিটি গোত্র অনুভব করত। তাই যে কোনো গোত্রে যে কোনো ব্যক্তির আশ্রয় প্রার্থনা সাদরে গৃহীত হত; কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত দাস প্রভুর আশ্রয়ে গোত্রের অন্যতম সদস্য হিসাবে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারত; এদেরকে বলা হত দাখিল বা মাওলা। কোনো দুর্বল গোত্রের কেউ অন্য শক্তিশালী গোত্রের কারো সাথে মিতালী পাতানোর ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে উখুওয়াৎ বা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হত। আরবের কৃষি সমাজের জন্য এরূপ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বড় প্রয়োজন ছিল। অনাবৃষ্টি বা আকালের সময় অভাবগ্রস্ত গোত্রে আক্রমণ ও লুটতরাজ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কৃষি গোত্রীয় সমাজ পার্শ্ববর্তী কোনো শক্তিশালী গোত্রকে তাদের ফসলের একটি অংশ প্রদানের বিনিময়ে এরূপ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করত।[২১] কোনো কোনো সোভিয়েত পণ্ডিত এরূপ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সামন্ত সম্পর্কের নমুনার সন্ধান পেয়েছেন।[২২] নিঃসন্দেহে গোত্রের তথা গোত্রীয় অভিজাতদের প্রভাববলয় সম্প্রসারিত করার জন্য এরূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কৃষকদের দেয় রাজস্ব অথবা কর পর্যায়ভুক্ত নয়। এতে প্রভুত্ব-অধীনতার কিছু লক্ষণ থাকলেও এটাকে চিরায়ত সামন্ত সম্পর্ক বলে চিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত বলে

মনে হয় না। গোত্রের মর্যাদা আর গোত্রীয় অভিজাতদের মর্যাদা যদিও একাকার করে দেখা হত, তবুও গোত্রপতির ক্ষমতা, মর্যাদা কেবল প্রথার উপর নির্ভরশীল ছিল না, বরং তা ছিল আর্থিক সঙ্গতির উপর। যার যত উট, দাস, মাওলা হালিফ বেশি সে তত মর্যাদাবান গোত্রীয় অভিজাত।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হেজাজের বেদুইন সমাজের আর্থ-সামাজিক বিকাশ মক্কা শহরের পত্তনের প্রধান কারণ, আবার মক্কার শহরে সমাজের বিকাশও হেজাজের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিকাশকে প্রভাবিত করে। কখন হতে মক্কায় জনবসতি শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা শক্ত, তবে একথা সত্য যে, মক্কাবাসীরা প্রথম হতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। প্রথমত, ক্ষুদে ব্যবসা, আড়তদারী, বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের *দালালি তথা সেবামূলক ব্যবসা দিয়ে তাদের নাগরিক জীবন শুরু হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর* শেষার্ধ হতে তারা আন্তর্জাতিক কাফেলা ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করতে থাকে। শুধু তাই নয়, ইয়ামেনী ব্যবসায়ও তারা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।[২৩] তাদের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য বিনষ্ট করার জন্য ইয়ামেনের আবেসিনীয় শাসক আবরাহা মক্কার উপর ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করে। তদুপরি তৎকালীন বৃহৎ শক্তি বাইজান্টাইন ও পারস্যের মধ্যকার দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে তাদের অস্তিত্বের জন্য।[২৪]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কাবাসীদের জীবিকা অর্জনের প্রধান পথই ছিল ব্যবসায় এবং মক্কায় নানা ধরনের ব্যবসায়েরও সুযোগ ছিল। প্রচুর অর্থাভাবে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না, তাই বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীদের জন্য অর্থলগ্নীর ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়, এবং সুদী মহাজনী ব্যবসা দ্রুত জমে ওঠে। সুদী মহাজনী জাল সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তায়েফের বনু সাকিফও এই সুদী কারবারের সাথে জড়িত হয়। মক্কার সাথে তায়েফের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সম্পর্কের জন্য মক্কা তায়েফকে মক্কাতায়েন বলা হত। মক্কার ধনিক শ্রেণীর অনেকের গ্রীষ্মবাস ছিল তায়েফে। সেখানে অনেকের ভূ-সম্পত্তি ও চারণ ভূমি ছিল। এসব সম্পত্তি ও চারণ ভূমিতে অজস্র দাস নিয়োগ করা হয়।[২৫] এ কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, মক্কায় সুদী কারবারের অবক্ষয়ী দিকটা অচিরেই প্রকটভাবে দেখা দেয় এবং মক্কা সমাজে বিভেদ সৃষ্টির একটি বড় কারণ হয়ে ওঠে।

মক্কাতে কেবল কোরেশ গোত্রই বসবাস করত না, তাদের অজস্র মিত্র গোত্রও বসবাস করত। মক্কার শহরতলীতে বসবাস করত বেদুইন ও গ্রাম সমাজ হতে আগত সালুক ও তারিদ শ্রেণীর লোকেরা। মক্কার কাফেলা ব্যবসায়ের জন্য পথ প্রদর্শক, উট চালক, পণ্য সামগ্রী উঠানো ও খালাস করা ইত্যাদি সেবামূলক কাজের জন্য উক্ত শ্রেণীর লোকদেরকে নিয়োগ করা হত।

হেজাজের বিভিন্ন গোত্রের নিয়মানুসারে মক্কার কোরাইশ গোত্রও সংগঠিত ছিল। কোরেশ গোত্রের ধনী ব্যবসায়ী-সুদখোর-দাসমালিকরাই ছিল অভিজাত এবং তারা

নিজদেরকে ভাবত মালা, তারা দারুন্নোদওয়ায় বসে মক্কা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। উক্ত পরামর্শ সভায় নাগরিক জীবনের বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন কউম (বনু) কে (ব্যক্তি বিশেষকে নয়) দায়িত্ব অর্পণ করা হত।[২৬] কোরেশ গোত্রের দশটি কউমের মধ্যে বনু উমাইয়া প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। তাদের মধ্য হতে কাফেলা নেতা নির্বাচিত হত। বস্তুত কোরেশ গোত্রের প্রধান পরিবারগুলো মক্কা সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়।

উপরের আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট যে, মক্কা সমাজে উচ্চ অভিজাত, মাঝারি ধনী, সাধারণ ব্যবসায়ী, দাস, সম্পদহীন সর্বহারা ইত্যাদি সমাজের অস্তিত্বের ফলে মক্কা নগরে একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজ কাঠামো সৃষ্টি হয়। আরো লক্ষণীয়, এই শ্রেণী বিভক্তি ছিল আনুভৌমিক। এতে নানা সমস্যা দেখা দেয়। উৎপাদন শক্তির বিকাশের ফলে *সাধারণভাবে সমগ্র হেজাজে এবং বিশেষভাবে মক্কায় গোত্রীয় জীবন ব্যবস্থা প্রতিদিন* অকেজো হতে থাকে এবং তদস্থলে ব্যাপক 'জাতীয়' ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার উপাদন সৃষ্টি হয় (একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এরূপ 'জাতীয় ভিত্তি' অবশ্যই আধুনিক রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের সমার্থক নয়, তবে এতে ভাষা, ভূগোল ও সংস্কৃতি ভিত্তিক বৃহত্তর আন্তঃগোত্রীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা লক্ষণীয়)। স্বাভাবিকভাবে এরূপ উদীয়মান রাষ্ট্র শাসিত হবে অভিজাত শ্রেণী দ্বারা। বাইজানটাইন সম্রাটের সাহায্যে উসমান বিন হুরাইরিস রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে বটে কিন্তু তা ব্যাপক জনতার সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। মক্কা তথা সমগ্র হেজাজী সমাজের অবকাঠামোর এরূপ বিকাশের ফলে যেমন একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের সামাজিক তাগিদ দেখা দেয় তেমনি তার উপরিকাঠামোর বিভিন্ন দিকে রূপান্তরের প্রয়োজন হয়। জাহেলিয়া যুগের পুরনো নৈতিক দর্শন অচল হয়ে পড়ে।[২৭] হেজাজের বৌদ্ধিক পরিবেশ পরিবর্তিত হওয়ায় তার পুরনো ধর্মবিশ্বাসও নড়বড়ে হয়ে আসছিল।[২৮] এরূপ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে আরব সমাজের চিরাচরিত গোত্রীয় বন্ধন, পুরনো প্রথা ও বিধান দ্রুত শিথিল হয়ে পড়ে–ফলে গোত্রে-গোত্রে, প্রতি গোত্রের অভ্যন্তরে, নাগরিক-যাযাবরদের মধ্যে নয়া দ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটে।[২৯] আরব সমাজের, অভ্যন্তরে এরূপ বিকাশ এবং তৎকালীন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে সমগ্র আরব জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নে জাতীয় সংহতি এবং আন্তঃগোত্রীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্টভাবে হলেও সর্বস্তরে অনুভূত হয়।[৩০]

১.৩ ইসলামি বিপ্লব : ইসলামি উম্মা ও রাষ্ট্রের উত্থান : এর রাষ্ট্রীয় চরিত্র বিশ্লেষণ

এরূপ অবস্থায় নবী মোহাম্মদের শিক্ষা ক্ষুদ্র গোত্রীয় বন্ধনের পরিবর্তে জাতীয় ঐক্যের আদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে। অনেক দিক থেকে অনুকূল পরিবেশ

এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নবী মোহাম্মদ মক্কা সমাজে রূপান্তর ঘটাতে পারেন নি, এবং এক পর্যায়ে তাঁকে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হয়। তবুও একথা সত্য যে, তিনি মক্কা সমাজে চিড় ধরাতে সমর্থ হন। বেশ কিছুসংখ্যক তরুণ গোত্রীয় শৃঙ্খল ছিন্ন করে তাঁর মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ওয়াট সাহেব নবদীক্ষিতদের উপর জরিপ চালিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রথমত, মক্কার অত্যন্ত প্রভাবশালী গোত্রের অল্পসংখ্যক আশাপ্রদ তরুণ তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এঁদের প্রতিনিধি ছিলেন খালেদ বিন সাইদ; দ্বিতীয়ত, উক্ত প্রভাবশালী গোত্রের দুর্বল পরিবারের তরুণরাই নতুন মতাদর্শের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে, দু-একজন তুলনামূলক বয়স্ক হলেও, কেউ ৩৫ বছরের ঊর্ধ্বে ছিলেন না; তৃতীয়ত, খাব্বারের মত গোত্র বহির্ভূত খুবই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করে; তাইমের মত দুর্বল বংশের আবু বকর ও তাদের একজন দাস ব্যতীত কেউই ইসলাম গ্রহণ করেন নি। ওয়াট সাহেব তাঁর পরিসংখ্যান হতে একটি সিদ্ধান্ত টেনেছেন : ইসলাম ছিল যুব শক্তির আন্দোলন, এবং এটি কোনোক্রমেই 'সর্বহারাদের' আন্দোলন ছিল না। মক্কা সমাজ কাঠামোর নিম্নপর্যায়ের মুক্ত গোত্রের জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নবী সমর্থ হন নি।[৩১] মক্কায় তাঁর ব্যর্থতার জন্য বুর্জোয়া পণ্ডিতগণ সাধারণত কোরাইশদের দৃঢ় বিরোধিতাই প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেন। কোরাইশদের দৃঢ় বিরোধিতা বেশ কিছুদিন কার্যকর হল কেন তার ব্যাখ্যা তারা দেন নি। তাই আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন মক্কায় নবীর ব্যর্থতার প্রধান কারণ সম্ভবত সামাজিক। মক্কা নগরের কোরেশ বংশের মধ্যে শ্রেণী বিভক্তি খুবই তীব্র হয়ে ওঠে; সাধারণ মুক্ত নাগরিকরা অত্যাচারী নেতৃত্বের অবসান কামনা করত; দরিদ্র মুক্ত ব্যক্তিরা অবক্ষয়ী সুদী মহাজনী কারবারজনিত দাসত্বের জাল হতে নিষ্কৃতি চাইত; দাসেরা স্বাভাবিকভাবে মুক্তি কামনা করত। এই সব মুক্তিকামী জনতার নিকট তার প্রথম দিকের আদর্শগত প্রচারণার আবেদন ছিল খুবই অল্প। তাঁর আহ্বানে এদের মুক্তির কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না, বরং তাঁর বক্তব্যে পরলোকে তৌহিদে বিশ্বাসীদের চিরমুক্তির নিশ্চয়তা ছিল। আর অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত ছিল কঠোর শাস্তি। ইহলোকে মুক্তির কোনো আশ্বাস ছিল না। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তৎকালীন ঋণ জালে আবদ্ধ মুক্ত মানুষের পক্ষে কথা বলেন, সুদি কারবারের নিন্দা করেন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণারও নিন্দা করেন। মুষ্টিমেয় ধনী সুদখোর, দাস মালিক, ব্যবসায়ী দ্বারা শোষিত ও প্রতারিত সাধারণ ব্যবসায়ীরা তাঁর আহ্বানের সামাজিক লক্ষ্য অনুধাবন করলেও এতে তাদের প্রকৃত সমাধান খুঁজে না পাওয়ায় বিপুলভাবে সাড়া দেয় নি। তাত্ত্বিকভাবে গোত্রীয় সমাজ বন্ধনে শিথিলতা দেখা দিলেও তখন পর্যন্ত বাস্তবে তা শক্ত থাকায় কেবল মুষ্টিমেয় দৃঢ় চিত্ত, সাহসী ও প্রতিশ্রুতিবান তরুণরা তাঁর মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

হিজরতের পর মদিনায় তাঁর রণনীতি ও রণকৌশল বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়।[৩২] সুপরিকল্পিতভাবে মদিনার গোত্রীয় সম্পর্কের উর্ধ্বে ব্যাপক ভিত্তিতে আনসার-মোহাজের সমন্বয়ে একটি উম্মা গঠনে তিনি তৎপর হন। এই উম্মাই ছিল মূলত আরব জাতীয় রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। মদিনায় তাঁর কার্যক্রম ছিল বিকাশমান আরব সমাজের বাস্তব রূপায়ণের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, গোত্রবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। হিজরতের প্রথম হতে তিনি উম্মার আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেন; মদিনার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, মোহাজেরদের পুনর্বাসন, মদিনায় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ে উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটান ইত্যাদি বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেন। নয়া উম্মা গঠনের বাস্তব পদক্ষেপের সাথে সাথে সম্পত্তি বিষয়ক নানাবিধ আইন, অস্থাবর সম্পত্তি ব্যক্তি-মালিকানা সংরক্ষণ, সম্পত্তি বন্টন ব্যবস্থা,উত্তরাধিকার আইন ও সামাজিক-পারিবারিক বিধি গৃহীত হয়। তাঁর প্রবর্তিত সম্পত্তি সম্পর্কের ধারণা আধুনিক পুঁজিবাদী সম্পর্কের মত হবে না তা বলাই বাহুল্য। তুলনামূলভাবে নারীদের যথেষ্ট মর্যাদা ও অধিকার দিয়েও মূলত পুরুষ প্রধান সমাজ গঠন, দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেও দাস প্রথা লালন, অনাথ, দুস্থ ও পথিকদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সংস্কারমূলক বাস্তব পদক্ষেপের ফলে উম্মার দ্রুত বিকাশ ঘটে। পরিকল্পিতভাবেই রাষ্ট্রীয় যন্ত্র সম্প্রসারিত হয়।[৩৩] বদর যুদ্ধ হতে সেনাবাহিনী গঠন, রণনীতি-রণকৌশলে যুদ্ধ ও শান্তি নীতি বিকশিত হয়। উম্মার অধিকতর সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য উম্মা-বিরোধী কার্য-কলাপের অভিযোগ মদিনা হতে ইহুদি সম্প্রদায়ের বনু কায়নোকা, বনু নাজির ও বনু কুরাইজাকে পর্যায়ক্রমে নির্মূল করা হয়। উদীয়মান উম্মার সার্বিক উন্নয়নের পক্ষে এ ব্যবস্থা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উম্মা গঠন প্রক্রিয়ায় মাটির সাথে মক্কার ব্যবসাজীবীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে; কৃষি উৎপাদনে দাসশ্রম নিয়োগ করা হয়। খয়বর যুদ্ধে আর একটি ভূমি বন্দোবস্ত নীতি গৃহীত হয়। আত্মসমর্পণকারী ইহুদিদেরকে ভূমি রাজস্বের বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করা হয়। সম্ভবত এই সর্ব প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সামন্ত শোষণ নীতি প্রবর্তিত হয়। দীর্ঘদিন সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে নব্য আরব রাষ্ট্র বাস্তব রূপলাভ করে। এঙ্গেলসের মতে এটাই হেজাজী আরবে গোত্রীয় ও পারিবারিক সম্পর্কের উর্ধ্বে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা। ক্ষয়িষ্ণু আদিম কৌম-সমাজের ধ্বংসস্তূপে উক্ত নয়া রাষ্ট্র গঠনে নবী মোহাম্মদের নেতৃত্বে কোরাইশ গোত্রের মধ্যশ্রেণী প্রধান ভূমিকা পালন করে, তাই কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রে কোরাইশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে।[৩৪] নবগঠিত রাষ্ট্রে গোত্রবাদ অবদমিত হয়; কিন্তু নির্মূলিত হয় নি। শহুরে সমাজের দ্রুত বিকাশ ঘটে; কিন্তু বেদুইন সমাজও বিদ্যমান থাকে। যুগপথ দাসশ্রম শোষণের পাশে সামন্ত শোষণও প্রবর্তিত হয়।

নয়া আরব রাজ্যের রাষ্ট্রীয় চরিত্র বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকগণ মতৈক্যে উপনীত হতে পারেন নি। জর্মন আরব তত্ত্ববিদ হুবার্ট গ্রিমের (১৮৬৪-১৯৪২) মতে এটা ছিল

সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্র। তাঁর এ মতবাদ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক পুঁজিতন্ত্র বিকশিত হওয়ার পূর্বে সমাজতন্ত্র কেবল অনৈতিহাসিক নয়, অকল্পনীয়ও বটে। তদুপরি ওয়াটের মতে এটি কোনোক্রমে সর্বহারাদের আন্দোলন ছিল না। মন্টোগোমারী ওয়াট মনে করেন, এটি ছিল পুঁজিবাদী পরিবেশে (পুঁজিবাদী পরিবেশ শব্দটি অবশ্যই আধুনিক অর্থে ব্যবহার করা চলে না।) একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। সুদূর অতীতে প্রায় সব সমাজ সংস্কারক অবশ্যই ধর্মীয় ভাষায় কথা বলতেন। আর এরূপ ধর্মীয় ভাষা সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার বাহন মাত্র। এম. এ. রেজনারের বাণিজ্যতান্ত্রিক পুঁজিবাদী তত্ত্বটিও অনেকে গ্রহণ করতে পারেন নি। বরং ইসলামে প্রভাবশালী কোরেশদের বাণিজ্যতন্ত্রের বিরোধিতা প্রবল ছিল। অনেকে মনে করেন, এ রাষ্ট্রটি মূলত বেদুইন ভাবাদর্শ ও স্বার্থ রক্ষাকারী। অনেকে রাষ্ট্রের উত্থানে কৃষির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে গোত্রবাদ হতে সরাসরি সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সোভিয়েত সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক বেলিয়েভ মনে করেন, হেজাজের কৌম সমাজের পতনে প্রধানত দাস-শ্রম শোষণ নির্ভর রাষ্ট্র বিকশিত হয়। যা হোক, এই নব রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণে এর উত্থানের আর্থ-সামাজিক পটভূমি সর্বদাই স্মরণীয়। নিসন্দেহে-এর রাষ্ট্রীয় আদর্শ ইসলামে তৎকালীন উদীয়মান শ্রেণীগুলোর স্বার্থের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় এবং এতে শ্রেণী সমন্বয়ের মতাদর্শ প্রাধান্য পেলে তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

নবগঠিত রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক বিনির্মাণ প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বেই (৬৩২ খ্রি.) মহানবী পরলোক গমন করেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পরপরই কেন্দ্রীভূত আন্তঃগোত্রীয় রাষ্ট্রীয় জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে গোত্রবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৩৫] অচিরেই তা প্রতিহতও করা হয়। একত্রিভূত আরব শক্তির উত্তাল তরঙ্গ পার্শ্ববর্তী পারস্য ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের উপর আছড়ে পড়ে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে।

১.৪ নয়া আরব সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ

নববিজিত রাজ্যসমূহে নয়া শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রকৃত অর্থই হল ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব প্রশাসন। বিজিত অঞ্চলে প্রচলিত উন্নতর আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক এবং ভূমি মালিকানার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আরবদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। মরু পরিবেশে আদিম কৌম সমাজ হতে সবেমাত্র সভ্য জীবনের জয়যাত্রা শুরু হওয়ায় তারা মধ্যযুগে উৎপাদনের উপায় হিসাবে ভূমি বা কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধলব্ধ ধনৈশ্বর্য ও দাস পেয়ে দিশাহারা হয়ে যায়। যাহোক, নববিজিত দেশের সম্ভাব্য ভূমিনীতির প্রশ্নে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দেয়।[৩৬] যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানায় বিজিত ভূমি বন্টন করা হলে ভাবী মুসলিম বংশধরদের কি হবে—এরূপ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রথম উমরের সমন্বয়বাদী নীতি গৃহীত হয়। প্রথমত, বল প্রয়োগে বিজিত অঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। অর্থাৎ

বিজিত দেশের সমাজসমূহের উঁচু পর্যায়ের পুরনো সামন্ত শক্তিগুলোকে হটিয়ে দেয়া হয়; নিম্ন পর্যায়ে গ্রাম্য সমাজে গোত্রীয় বা পারিবারিক যৌথ সম্পত্তি সম্পর্ক ধারণার উচ্ছেদের কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তথাকথিত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি সমর নেতাদের মধ্যে ইকতা হিসাবে বন্টন করা হয় এবং এই ইকতা পরবর্তীকালে উসমানী তিমার ও মোগলদের জায়গীরের আদি মডেল। দ্বিতীয়ত, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আত্মসমর্পণকারী গ্রাম্য দেহকান-খুদে সামন্ত, যাজক এবং শহরবাসীদের সম্পত্তি মালিকানা সরকারের নির্ধারিত রাজস্ব নীতির শর্তানুসারের স্থিতাবস্থা রক্ষানীতি গৃহীত হয়। ফলে স্থানীয়দের অধিকার ও দায়িত্ব পূর্ববত বহাল থাকে। হজরত উমর আরববাসীদের আরবের বাইরে ভূসম্পত্তি অর্জনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন সামরিক ও রাজনৈতিক সব দায়িত্ব চাপান হয় আরবদের উপর। এজন্য বায়তুল মাল হতে প্রত্যেক আরব নরনারীকে বৃত্তিদানের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিজিত জনতার মাঝেও আরবদের অবিমিশ্র রক্ত ধারা সংরক্ষণের জন্য তাদের গোত্রীয় সংগঠন সযত্নে রক্ষা করা হয় এবং আরব সেনাবাহিনী সদস্যদেরকে সপরিবারে বিজিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিবিরে পুনর্বাসনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বলপ্রয়োগে দখলকৃত পুরাতন শহরে পরিত্যক্ত গৃহগুলিতেও বিশিষ্ট আরব পরিবারে পুনর্বাসন দেয়া হয়। এভাবে পুরনো শহরের সাথে বসরা, কুফা, ফুসতাত বা কায়রোয়ান ইত্যাদি আরব সেনাবসতি হতে বড় বড় শহরের উৎপত্তি হয়। প্রাচীর ঘেরা এ সব আরব সেনা শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য এসে জমায়েত হতে থাকে। খুদে দোকানি, হস্ত শিল্প, মুদ্রা ব্যবসায়ী, মহাজন, দালাল ছাড়াও চিকিৎসক, গণৎকারের মত শিক্ষিত পেশাদার সমাজ নিয়ে শহরতলী গড়ে ওঠে। আরব ভূখণ্ডের বাইরে এভাবে এ সব আরব পরিবার সামাজিক উৎপাদন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তদুপরি স্থানীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব স্থানীয়দের উপর চাপিয়ে দেয়ার ফলে তারা সাধারণ জনতা হতে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দারা শহর ও গ্রামের হিতাহিত, রাস্তাঘাটের তদারক, পানীয় জলের সরবরাহ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করে। প্রসঙ্গত, আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। আরব সেনা বাহিনীতে অনারব মুসলিমরা সমাদৃত ছিল না অথচ প্রথম শতাব্দী ধরে সিরিয়া ইরাকে বসবাসকারী আরব খ্রিষ্টানদের সামরিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল প্রচণ্ড। অনারবদের ধর্মান্তরণ উৎসাহিত করা হত না।[৩৭] *অধিকতর সভ্যজগতে আরব বিজয় ও তাদের শাসন আরব জাতির* **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে যেমন ত্বরান্বিত করে তেমনি তা জটিলও করে তোলে। আরব সমাজের অভিজাতরা সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় তারাই রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার সিংহ ভাগ ভোগ করে; আর সাধারণ আরবরা দুঃখ কষ্টের বোঝা বহন করে। দাস প্রথা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজিত দেশে শোষণ ও দাস শ্রম আরব গোত্রীয় আভিজাত্যের বৈষয়িক ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।**

১.৫ নয়া সামাজিক শক্তির বিকাশ এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

উমরের খিলাফত সমাপ্তির পূর্ব হতেই দ্রুতগতিতে শহুরে সমাজের বিকাশ হতে থাকে এবং বিভিন্ন শহরে বেশ কিছুসংখ্যক ধনী ব্যক্তি তথা পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। নব্য ধনী ব্যক্তিদের অনেকেই যেমন উসমান, তালহা, জুবাইর, আবদুর রহমান ছিলেন নবী মোহাম্মদের বিখ্যাত ধনকুবের সাহাবী।[৩৮] নব গঠিত মুসলিম উম্মার মধ্যে প্রচণ্ড ধনবৈষম্য এবং নাগরিক জীবনের সাথে বেদুইন জীবনের পার্থক্য এতই তীব্রভাবে দেখা দেয় যে, আবুজর গেফারী প্রথমে সিরিয়ায় অত্যন্ত চড়া সুরে সমাজ বিকাশের নয়া প্রক্রিয়ার প্রতিবাদ করেন; এ কারণে তাঁকে রাজধানী মদিনায় বসবাস করার নির্দেশ দেয়া হয়। মদিনার অবস্থা দেখে তিনি অধীর হয়ে পড়েন। এখানেও তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হলে তাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়। আজকাল অনেকে তাঁকে সাম্যবাদী বলে আখ্যায়িত করতে চান। নিঃসন্দেহে তিনি আদিম গোত্রীয় সাম্যবাদের প্রবক্তা ছিলেন। সামাজিক প্রগতি বা সামাজিক পরিবর্তনে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। ইতিহাসের অগ্রগতিকে বিভ্রান্ত করা যেতে পারে অথবা সঠিক খাতে প্রবাহিত করা যেতে পারে, তাকে রুদ্ধ করা অথবা পশ্চাতে ঠেলে দেয়া যায় না বলে তাঁর রক্ষণশীল কণ্ঠস্বর সেদিন কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

খিলাফতের প্রথম যুগে কেবল ধনী-দরিদ্র অথবা বেদুইন নাগরিক জীবনের মধ্যকার বিরোধই বিকশিত হয়েছিল তাই নয়, এ সময় হতে আন্তঃগোত্রীয় বিরোধ নবরূপে পুনরায় অঙ্কুরিত হতে থাকে। কোরাইশ গোত্রের উমাইয়া বংশ পুনরায় সমগ্র আরব সমাজ তথা মুসলিম বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। উমাইয়া পরিবার প্রথমে মহানবীর ঘোরতম বিরোধিতা করলেও মক্কা বিজয় প্রাক্কালে অনেক সুবিধাজনক শর্তে মুসলিম উম্মায় যোগদান করে এবং উমরের খিলাফতের সময় তারা সিরিয়ায় তাদের প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। উসমানের খিলাফতকালে তাদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন সম্পূর্ণ হয়। ফলে এই দাস মালিক, সম্পদশালী এবং নাগরিক জীবনের প্রতিনিধি উমাইয়া বংশের বিরোধিতা হতে আন্তঃগোত্রীয় বিরোধের জন্ম হয়। উক্ত ত্রিবিধ সামাজিক বিরোধের প্রকাশ ঘটে উসমান হত্যা, উষ্ট্রযুদ্ধ এবং আলী-মোয়াবিয়ার মধ্যকার সংঘর্ষের মধ্যে। বলা হয়, আলী-মোয়াবিয়ার বিরোধের মধ্য হতে উগ্রপন্থী, নৈরাজ্যবাদী, অবিরাম সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী খারেজিদের উদ্ভব হয়। তৎকালীন বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আরব সমাজের ক্রমবর্ধমান বিরোধের মধ্যে উক্ত সম্প্রদায়ের উত্থানের কারণ নিহিত ছিল। মহানবীর প্রথম আরবী সাহাবা আবু বকর, উমর পুরানো গোত্রীয় গণতান্ত্রিক নীতি অনুশীলন করেন বটে; কিন্তু দ্রুত বিকাশমান সমাজের বাস্তব অবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। উসমানের পর আরব অভিজাত শ্রেণীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়। নবীর প্রভাবশালী সাহাবাগণ, যাদের অনেকেই প্রচুর সম্পদের মালিক, সবাই উক্ত অভিজাতদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত

করেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে আরব জনতার বুকে যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয় তারই সশস্ত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে খারেজি আন্দোলনে। তারা উম্মার সার্বভৌমত্বের কথা ঘোষণা করে; জনস্বার্থের প্রতি অবহেলা করলে নির্বাচিত খলিফার অপসারণের অধিকার উম্মার আছে বলে তারা মনে করত; খিলাফতের উপর কোরাইশদের একচেটিয়া অধিকারের প্রতিবাদ করে।[৩৯] তাদের রণনীতি ও রণকৌশল যতই দুর্বোধ্য হোক, তাদের মুক্তির বাণী যতই কল্পনা বিলাসী হোক-তাদের আদর্শপ্রীতি ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহ্য পরবর্তীকালের দাস বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জাতিসত্তার মুক্তির সংগ্রামে যে প্রেরণা জুগিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। তাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে, ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবর্জিত বিপ্লবী তত্ত্ব অনুশীলনে সঠিক কৌশল ও সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যায় না।

যাহোক, নবগঠিত আরব সাম্রাজ্যের নেতৃত্বের প্রশ্নে আরব অভিজাত শ্রেণীর বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের একটি ছিল বনু হাশিম, আর একটি ছিল বনু উমাইয়া। কোরেশ গোত্রের পারিবারিক দ্বন্দ্বে সমগ্র আরব তথা মুসলিম উম্মা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মোয়াবিয়ার নেতৃত্বে বনু উমাইয়া ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়েলহাউজেন উমাইয়া রাজত্বকালকে (৬৬০-৭৫০) মুসলিম বিশ্বে আরব প্রাধান্য যুগ বলে অভিহিত করেন।[৪০] বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ বক্তব্যের বিরোধিতার কোনো কারণ থাকে না; কিন্তু উমাইয়া শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে তৎকালীন আরব সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটি উমাইয়া যুগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটান সম্ভব হয় নি; বরং বিজিত দেশে বিদ্যমান সামন্ত ব্যবস্থার প্রভাবে খোদ দাস-মালিক আরব গোত্রীয় অভিজাতদের মধ্যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া জোরদার হয় এবং তারাও সামন্ত শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। মুসলিম বিশ্বের বহুজাতিক সমাজের ইতিহাসে উমাইয়া আমলটি তাই মূলত উৎক্রান্তিকাল।

১.৬ উমাইয়া রাষ্ট্রীয় চরিত্র ঃ নতুন দ্বন্দ্বে উমাইয়াদের পতন

উদীয়মান আরব অভিজাতদের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মোয়াবিয়ার সাফল্যের কারণ হল-তিনি উমরের সময় হতে সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর ক্ষমতার বৈষয়িক ও সামরিক ভিত্তি রচনা করতে সমর্থ হন। মোয়াবিয়া, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এবং তাঁর অধীন সমর নেতারা উমরের বিধান লঙ্ঘন না করেও অসংখ্য অনাবাদি জমির মালিক হতে পেরেছিলেন। এরূপ প্রাপ্ত অনাবাদি অথচ উর্বর ভূমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে ফসল ফলানোর কাজে অসংখ্য দাস-শ্রম নিয়োগ করায় এ অঞ্চল দ্রুত সুজলা, সুফলা শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠে।

মোয়াবিয়ার সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে আরব সিরিয় গোত্র কলবী বা ইয়ামানিদের পূর্ণ সশস্ত্র সমর্থনে। যদিও মোয়াবিয়া মুদারীয় গোত্রভুক্ত ছিলেন তথাপি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে ইয়ামানি গোত্রের সাথে তিনি নানাভাবে সুসম্পর্ক এমন কি বৈবাহিক সূত্র স্থাপন করেন। ইয়ামানিরা সামাজিকভাবে অগ্রগামী হওয়ায় নাগরিক জীবনের প্রতিনিধি উমাইয়াদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন সহজ হয়। উমাইয়ারা প্রজাদের সামাজিক উৎপাদনে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করে নি; অচল হয়ে পড়া সেচ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করে; মেহনতি মানুষের উপর স্থানীয় প্রভাবশালী শ্রেণীর শোষণ অধিকার নিশ্চিত রাখা হয়, যাজকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী খ্রিষ্টানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। হস্তশিল্পের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি যত্ন নেয়ায় স্থানীয় কারিগর শ্রেণীর যথেষ্ট উন্নতি হয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব হয় তাদের পণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার। বস্তুত, সবদিক দিয়ে সিরিয়া উমাইয়াদের শক্তি কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৪১] মোয়াবিয়ার ক্ষমতার প্রধান শ্রেণীভিত্তি ছিল দাস-মালিক এবং তাদের সহযোগী যাজক, মহাজন ও কারিগর শ্রেণী।

উমাইয়াদের জন্য সিরিয়ায় যে সুযোগ ছিল হেজাজ বা ইরাকে তা ছিল না। হেজাজ এবং ইরাকে আরব বেদুইন সমাজের প্রভাব ছিল সুদৃঢ়। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলদ্বয়ে আরব সমাজের ধনী দাস-মালিকরা যথেষ্ট পরিমাণে অনাবাদি জমি সংগ্রহ করতে পারে নি। উমাইয়া বিরোধী শিবিরের শক্তিকেন্দ্র হওয়ায় এ সব অঞ্চল উমাইয়াদের পুনঃবিজয় করতে হয়। তুলনামূলকভাবে এসব অঞ্চলে সিরিয়ার মত দাস-শ্রম নিয়োগের সুযোগ ছিল না, বরং এখানে ব্যাপকভাবে কৃষিতে সামন্ত শোষণ প্রাধান্য পায়। সোয়াদ ও সমগ্র পারস্য সমাজে দেহকানরাই (জোদ্দার) ছিল প্রায় সমাজের শক্ত ভিত। 'কৌম সম্পত্তি সম্পর্ক বা 'পিতৃতান্ত্রিক সম্পত্তি সম্পর্ক' (যা মূলত সামন্ত সম্পর্কের আদিরূপ) ছিল ব্যাপক ও প্রধান। তাই এসব অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত সামরিক স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তিত হয়। আব্দুল মালিক এবং ওয়ালিদ বিভিন্ন সংস্কার সাধন করে এতদঅঞ্চলে জনতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়াস চালান বটে; কিন্তু সিরিয়ার মত এখানে তাদের ক্ষমতার মূল শ্রেণীভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারে নি।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, বেদুইন সামাজিক পটভূমিতে খারেজি বিদ্রোহ গড়ে ওঠে এবং কোরাইশদের পারিবারিক নেতৃত্বের প্রশ্নে শিয়া বিদ্রোহ জন্মলাভ করে। এ দুটি বিরোধ ব্যতীত উমাইয়া বংশ আরো একটি মারাত্মক বিরোধের মুখোমুখী হয়, তা হল মাওয়ালী বিদ্রোহ। অনারব নব মুসলিমদেরকে মাওয়ালী বলা হত। বিভিন্ন কারণে মুসলিম বিশ্বে তারা ছিল একটি সামাজিক শ্রেণী। ইরাকের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ভাষা ও জাতিসত্তার বিচারে তারা ছিল পারসী। উদীয়মান শহরগুলোর নাগরিকদের জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ছিল তারা। মূলত

মাওয়ালীরা ছিল ইরানি সংস্কৃতির উত্তরাধীকারী, ফলে আরবদের তুলনায় অধিকতর সংস্কৃতিবান। যোগ্যতাবলেই তারা বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োজিত হয়। এতদসত্ত্বেও তারা মর্যাদার মাপকাঠিতে আরবদের ধারের কাছে ছিল না। অনেকে মনে করেন, এর পশ্চাতে আরবদের জাত্যাভিমানই প্রধান কারণ। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আরবদের গোত্রীয় সংগঠনের অবশিষ্টাংশের ফলশ্রুতি। আর গোত্রীয় ব্যবস্থায় অনারব কখনই আরব গোত্রের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করতে পারত না। তদুপরি বিজিত অঞ্চলে উমরের নিষেধাজ্ঞা আরব-আজম-আন্ত-বিবাহ ও আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেবল আত্মমর্যাদার প্রশ্নে নয়, অর্থনৈতিক ব্যাপারেও দেখা যায় উমরের 'বৃত্তি তালিকায়' তারা ছিল সর্বনিম্নে। উসমানের সময় ভূমি ক্ষুধার্ত আরব অভিজাতরা ইরাককে কোরাইশ বাগিচায় পরিণত করার প্রচেষ্টার ফলে মাওয়ালীদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। তাদের প্রতি মোয়াবিয়া ও জায়েদ-বিন-আবিহির নমনীয় নীতি পরিত্যাগ করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। আত্মরক্ষার্থে তারা শিয়াদের সমর্থন দিতে থাকে। মাওয়ালীদের মধ্যে শুযুবিয়া আন্দোলন গড়ে ওঠে। বস্তুত, ইরাক ও পারস্যে মাওয়ালীদের উমাইয়া-বিরোধী ভূমিকা উমাইয়া তথা আরব প্রাধান্যের পতনের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় উমর এরূপ সামাজিক বিরোধ নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাওয়ালীদের সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ কারণেই বিজিত শত্রু সম্পত্তি ও আত্মসমর্পণকারীর সম্পত্তির মধ্যকার পার্থক্য দূরীভূত করা হয়।[৪২] এই ঘটনার পর হতে লেভির মতে কৃষি ভূমি ও চারণ ভূমির উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় একটি নির্ধারিত আইনে পরিণত হয়।[৪৩] অন্তিম বিশ্লেষণে উমরের বিধানে আরব বেদুইনের গোষ্ঠীগত সম্পত্তি ধারণাই বেশি প্রতিফলিত হয়; এতে ইসলামি বিশ্বে পুরনো সামাজিক দ্বন্দ্বের নিরসন না হয়ে তা দীর্ঘায়িত হয়; এবং সম্ভবত উৎপাদন শক্তির ব্যাপক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কৃষি ও চারণ ভূমির উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রীয় সাধারণ বিধান হলেও এ নিয়ম কঠোরভাবে কখনো পালিত হতে দেখা যায় না; কারণ এরূপ বিধান প্রয়োগকারী কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাই গড়ে ওঠে নি। এ সম্পর্কে আরো স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রাক-ইসলাম যুগে শহরে বা শহরতলীতে বাস্তুভিটা, বাগ-বাগিচার উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামের প্রথম দিকেও এ নিয়ম অব্যাহত ছিল। কোরাইশরা নিয়মটি অধিকতর বিকশিত করতে চেয়েছিল। অসংখ্য আরব ইকতাদার পরিবার শহরতলীর অনেক ইকতা সম্পত্তির উপর আধা ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃত সার্বজনীন ব্যক্তি-মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। কৃষক পরিবার বা গোত্র কেবল ব্যবহার করার

মালিকানা পায়। এটাই মূলত সম্পত্তির উপর সামন্ত মালিকানার একটি বিশিষ্ট রূপ। সম্ভবত এ সবই মুসলিম বিশ্বে ভূসম্পত্তিতে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাব বিরুদ্ধে ইকতাদাব, তিমারদার বা জায়গীরদারদের পুনঃপুনঃ বিদ্রোহের বড় কারণ। বস্তুত, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইসলামেব ভূসম্পত্তি বিষয়ক বিধি-বিধান ছিল খুবই অস্পষ্ট; তত্ত্ব ও অনুশীলনে ছিল প্রচণ্ড পার্থক্য।[৪৪] ভূসম্পত্তি বিষয়ক ইসলামি বিধানের এরূপ অনিশ্চিয়তার দরুন ইকতাদারগণ কখনো গ্রামাঞ্চলে কৃষির উপর তদাবকি করে নি।

এসব কারণে বিশাল মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য অর্থে ভূস্বামী–প্রজা–এরূপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। ইউরোপীয় অর্থে ভূস্বামী-কৃষক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও ইসলামি বিশ্বে শহুরে ইকতাদার, মূলতাজিম বা ইজারাদারদের জন্য গ্রাম্য উদ্বৃত্ত আত্মসাতের পথ সুপ্রশস্ত ছিল; অথচ উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো দায়িত্ব তারা গ্রহণ করত না! এতদঅঞ্চলে প্রাচীনকালের সেচ ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টায় বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয় নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত ছিল। সিস্তানে প্রাপ্ত বায়ু চালিত সেচ যন্ত্রেব ব্যবহার কখনো মুসলিম বিশ্বে জনপ্রিয় করে তোলা হয় নি। ইউরোপীয় সামন্তরা মুসলিম বিশ্ব হতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সামন্ত ব্যবস্থাটাই দীর্ঘায়িত করে। যাহোক. মুসলিম বিশ্বে কৃষি এবং কায়িক শ্রমের প্রতি শোষক শ্রেণীর মধ্যে অনেকখানি উপেক্ষার ভাব থাকায় কৃষি উৎপাদনে স্থবিরতা লক্ষণীয় হয়। এমন কি মাঝে মাঝে সুজলা সুফলা গ্রামের বাসিন্দারা বেদুইনে রূপান্তরিত হওয়া এবং গ্রাম উজাড় হওয়ার অসংখ্য ঘটনার কথা জানা যায়। অথচ মজার ব্যাপার, ইসলামি বিশ্বের শহরে ও শহরতলীতে বাগিচা ও উদ্যান রচনার এবং উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চায় ইকতাদারদের ভূমিকা ছিল প্রচণ্ড। এ সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন আছে।

ইসলামের ইতিহাসে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসী বিপ্লবকে কেবল পারিবারিক বিপ্লব বলে চিহ্নিত করলে সম্ভবত তার সঠিক মূল্যায়ন হয় না। অনেকে মনে করেন, উমাইয়া পতনে মুসলিম বিশ্ব হতে আরব প্রাধান্যের পরিসমাপ্তি ঘটে; কথাটি অবশ্যই আংশিক সত্য; পূর্ণ সত্য নয়। উক্ত উত্থান ও পতনের পশ্চাতে যে সামাজিক বাস্তবতা ছিল ঐতিহাসিক বিচারে তা উপেক্ষিত, অথচ এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, উমাইয়া বংশের পতনে আরব সমাজে দাসমালিক শ্রেণীর পতন এবং পুরনো (উমাইয়াদের পিতৃতান্ত্রিক) শাসন পদ্ধতি উৎখাত সম্পন্ন হয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সামন্ত প্রভাবিত শাসন ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়াদের পতনের সাথে দামাসকাস্ তথা সিরিয়ার প্রাধান্য শেষ হয়; ইরাক-ইরানে দেহকান ও সামন্তদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আব্বাসী বিপ্লব পারিবারিক নয় বরং একটি সামাজিক বিপ্লব ছিল। এর ফলে পুরনো আরব-আজম, দাসমালিক দেহকান বিরোধের অবসান হয় এবং নতুন শ্রেণী-বিরোধের সূচনা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্বাসী বিপ্লব ঃ আব্বাসী বংশের উত্থান

২.১ আব্বাসী বংশ পরিচয়

উমাইয়া বংশের ধ্বংসস্তূপে আব্বাসী বংশ প্রতিষ্ঠা আরব জাতি তথা মধ্যযুগে ইসলামের ইতিহাসে এক নবতর গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে। এই বংশের ৩৭ জন খলিফা দীর্ঘ ৫০৮ বছর (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) ধরে খেলাফতের আসন করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যযুগে মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখে অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেন; আবার অনেকে সিংহাসন(?)[১] অলঙ্কৃত করে মূলত শক্তিশালী সামাজিক শক্তির ক্রিড়নকের ভূমিকা পালন করেন। অনেকেই খেলাফতের রাজনৈতিক ক্ষমতা নয়, কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ভোগ করেন। আস্ সাফফাহ্ হতে মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত (৭৫০-৮৪৭ খ্রি.) দশ জন খলিফার প্রায় একশ বছরের শাসনকালকে হিট্টি যথার্থই আব্বাসী বংশের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেন। এ বংশের উত্থান ও বিকাশ যেমন বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ, তার অবক্ষয় প্রক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি এর পতন হৃদয়স্পর্শী মর্মন্তুদ কাহিনী মনে হলেও তা ঐতিহাসিক সত্য, এবং তা ইতিহাসের নিয়মেই সংঘটিত হয়।

বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ এর চাচা আল আব্বাসের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ আবুল আব্বাস যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামের ইতিহাসে তাই আব্বাসী খিলাফত নামে সমধিক পরিচিত। আরবের কোরেশ বংশের এই পরিবারের সাথে মহানবীর সম্পর্ক তালিকা হতে স্পষ্ট হবে।
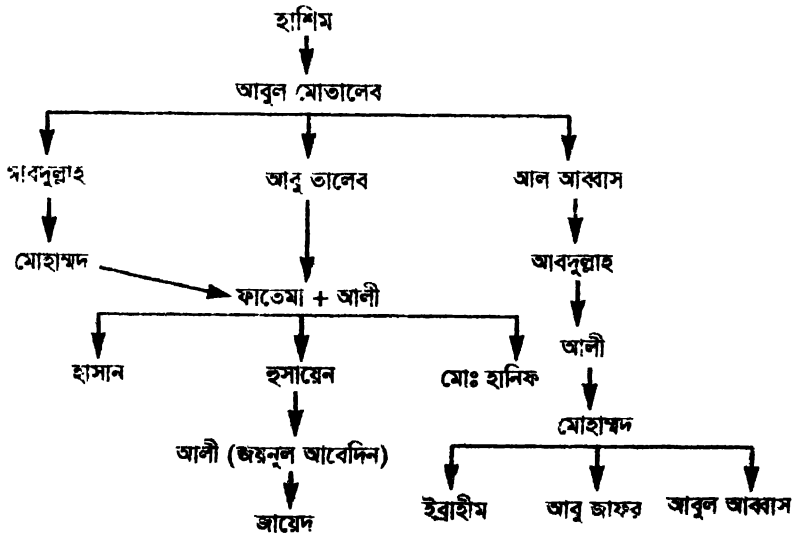
২.২ বিপ্লবের ঐতিহাসিক পটভূমি

এই বংশটি রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। এ বিপ্লব সংঘটিত হয় আরব নেতৃত্বে; এর তাত্ত্বিক কাঠামো, রণনীতি ও রণকৌশল গঠিত হয় আরব দ্বারা; এ বিপ্লবের নাম ভূমিকা গ্রহণকারী খোরাসানী বাহিনীর নেতৃত্বের ও সিংহভাগ ছিল আরব। তৎকালীন আরব সাম্রাজ্যের খোরাসান প্রদেশ হতে বাস্তব বিপ্লবের সূচনা হলেও মূল খোরাসানীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। বস্তুত দীর্ঘদিনের গোপন হাশেমী আন্দোলনের ফলশ্রুতি এই রাষ্ট্র বিপ্লব। হাশেমী আন্দোলনের মতাদর্শগত ভিত্তি, এর তাৎপর্য, সফলতা ও ব্যর্থতা অনুধাবন করার জন্য ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।

মহানবী ধরাধাম ত্যাগ করেন; কিন্তু রেখে যান একীভূত আরব জাতি ও একটি আরব রাষ্ট্র। তাঁর অবর্তমানে উদীয়মান জাতি ও রাষ্ট্রের কে কর্ণধার হবেন সে সম্পর্কে তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব অথবা স্পষ্ট নীতিমালা রেখে যান নি। তাই মহানবীর মহাপ্রয়াণে মদিনায় তার সাথীরা (সাহাবা) স্বাভাবিকভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত ওমর উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহর্ণ করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে নয়া আরব সমাজের জ্যেষ্ঠ, প্রবীণ এবং মহানবীর নিকটতম ব্যক্তি হযরত আবু বকর জাতির সংকটকালে রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আপনাকে রসুলের খলিফা (খলিফাতু রাসুলিল্লাহ) বলে ঘোষণা করেন। সমগ্র সমাজ তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করে। ছয়মাস পর হযরত ফাতেমা ইন্তেকাল করলে হযরত আলীও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। খেলাফত পদ গ্রহণ করার পর পরই হযরত আবু বকর হয়ে উঠেন সমগ্র জাতির ঐক্যসূত্র, কণ্ঠস্বর এবং প্রগতির দিশারি। তিনি দেশকে আচমকা বিপদের হাত হতে উদ্ধার করেন তাই নয়, বরং সমগ্র জাতিকে গৌরবময় দিগ্বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বের সাফল্য দেখে সমগ্র জাতি নেতা নির্বাচনের ঐ নীতি চালু রাখে। তিনি মহানবীর খলিফা বলে মহানবীর সকল ক্ষমতার অধিকারী হন নি।[২]

নানাজনে খলিফা শব্দটির নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন; তবে এ প্রসঙ্গে আধুনিক লেখক ডব্লিউ. এম. ওয়াট তার Islamic Political Thought গ্রন্থে বলেন যে, খলিফা শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী (Successor) Successor is one who takes the Place of another after him in some matter.[৩] তাঁর ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য। তৎকালীন মদিনাবাসীদের এই নয়া পদের কর্তৃত্বের ব্যাপকতা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে করার কোনো কারণ নেই, তাদের ঐতিহ্য অনুসারে নেতা হলেন সমানে সমান Equal among the equals অধ্যাপক শাবান এই সূত্র ধরে বলেন: This Vagueness would assume minimum authority, While at the same time leaving the door open for any possible development.[৪]

মহানবীর উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত আবু বকর আপনার উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত ওমরকে মনোনিত করেন। এ মনোয়নের প্রতি সমগ্র জাতি স্বাগত জানায়। হযরত ওমর আমিরুল মোমেনিন উপাধি গ্রহণ করেন। সাধারণত এর অনুবাদ করা হয় Commander of believers বিশ্বাসীদের অধ্যক্ষ। অধ্যাপক শাবানের মতে এ অনুবাদ ভ্রান্ত, আরব ঐতিহ্য বহির্ভূতও বটে, তাই ওমর আপনাকে তা মনে করতেন না। শাবান আরো বলেন যে, ঐ শব্দের একাধিক অর্থ থাকলেও উপদেষ্টা (advisor বা Counsellor) হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বা বাস্তবসম্মত। আরব ঐতিহ্যে গোত্র প্রধানের নির্দেশ দানের কোনো ক্ষমতা ছিল না। হযরত ওমর স্বয়ং এ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।[৫]

ইসলামের সর্বত্র বিজয় অভিযানের ফলে অভাবনীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা মাথা চাড়া দিতে থাকে। হযরত ওমর উদীয়মান সমস্যার গতি প্রকৃতি অনেকখানি উপলব্ধি করেন; কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এর কোনো সমাধান সহজলভ্য ছিল না। বিজিত অঞ্চলে প্রশাসন পরিচালনার জন্য গড়ে ওঠে আরব উপনিবেশ এবং প্রদেশগুলো হয়ে ওঠে বিজেতাদের দ্বারা শাসিত। আরবরা ছুটে যায় ঐ সব অঞ্চলে নবগঠিত দুর্গ শহরে। তাদের সাথে নিয়ে যায় তাদের গোত্র 'চেতনা'। ইসলামের একত্ববাদের ভিত্তিতে নয়া বৃহত্তর আরব সমাজ গঠিত হয় এবং তাদের প্রাচীন গোত্রবাদ অবদমিত হয় বটে' কিন্তু এত স্বল্প সময়ের মধ্যে আরব জনজীবন হতে তা নির্মূলিত হয় নি। সচেতন ওমর এ কারণে আরব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই চিন্তিত ছিলেন।[৬] তার আশপাশে অসংখ্য গণ্যমান্য প্রভাবশালী সাহাবা জীবিত ছিলেন এবং ইচ্ছা করলে তিনি কাউকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে পারতেন এবং সম্ভবত তাতে কেউ আপত্তি উঠাতেন না; তথাপিও ঐ জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবী নিয়ে তিনি একটি নির্বাচনী কলেজ গঠন করেন। উক্ত কমিটি সদস্যদের কাউকে সরাসরি আমিরুল মোমেনিন পদে নিয়োগ না করে বরং নিরাজমান সম্ভাব্য সমস্যাগুলো পর্যালোচনা এবং সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত কর্মসূচি বিবেচনা করে স্থির ও দৃঢ় চিত্ত প্রবীণ সাহাবা উসমান এবং বীর শ্রেষ্ঠ ও ধীমান আলীকে উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত ভাবলে তাঁদের কোনো একজনকে উক্ত পদে সমাসীন হতে অনুরোধ জানানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় উক্ত কমিটির উপর।

সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হযরত আলী অস্বীকৃতি জানালে উসমান তাঁর পূর্বসূরি শেখদ্বয় (শায়খায়েন) আবু বকর ও ওমরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে রাজি হয়ে খেলাফত পদ গ্রহণ করেন।[৭]

বিজিত অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান আরব অভিবাসীদের আগমনের ফলে সামাজিক সমস্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, কুফা হয়ে ওঠে একটি নবগঠিত সমস্যার শহর। বিজিত অঞ্চলে বিভিন্ন দুর্গ শহরে আরব অভিবাসীদের মধ্যে যারা বিজয় কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের বলা হয় আশরাফ এবং তাদের মাথাপিছু তিন হাজার

দিরহাম বৃত্তি দেয়া হয়; অথচ নবাগতরা পেতেন মাত্র তিনশ দিরহাম। দ্রুত বিকাশমান আরব সমাজের কোরাইশ গোত্রের হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সাথে নতুন নাগরিক বেদুইন, আনসার-মোহাজেরদের মধ্যে ধন বৈষম্যমূলক দ্বন্দ্বের নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে বড় ধরনের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে।[৮] উসমান অনুধাবন করেন যে, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছেন না। সীমিত ক্ষমতা দিয়ে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবেন না বলে প্রথমত তিনি নতুন উদ্যোগে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন; দ্বিতীয়ত, প্রশাসনের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য তার অনুগত বিশ্বস্ত লোক উচ্চপদে নিয়োগ করেন। বস্তুত এটা তার ক্ষমতা বৃদ্ধিরই প্রয়াস মাত্র। তাঁর অনেক পদক্ষেপেরই অপব্যাখ্যা করা হয়, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়; এবং এভাবেই উমাইয়া-হাশেমী দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে। অবেশেষে তিনি নিহত হন। এটাই ছিল উদীয়মান আরব সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। নিঃসন্দেহে ঘটনাটি ছিল আরব জাতির জন্য অশনিসংকেত। তাবারী বলেন: মদিনাবাসী এতই মর্মাহত হন যে, পাঁচ দিন চলে যায় কাউকে নয়া নেতৃত্ব গ্রহণে রাজি করান যায় নি। হযরত আলীকে অবশেষে এরূপ অশুভলগ্নেই গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়। মক্কার প্রভাবশালী কোরাইশদের বড় অংশ কখনো আলীর উপর আস্তা স্থাপন করে নি, কেননা তাদের ধারণা ছিল আলী তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবেন না। তালহা, জুবায়ের ও আয়শার মত ব্যক্তিত্ব তাঁর বিরোধিতা করেন।[৯]

প্রথম গৃহযুদ্ধের সময় মদিনার আনসারগণ আলীর প্রতি আস্থা স্থাপন করেন। তাদের ধারণা ছিল যে, আলী তাদের পূর্বের মর্যাদায় সমাসীন করবেন। কুফাব সকল আরব আশরাফ এবং নবাগতরা আলীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন—ভীত সন্ত্রস্ত আশরাফরা তাদের কায়েমি স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং নবাগতরা ন্যায় বিচার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। নবাগতদের বিশ্বাস ছিল আলীর মত প্রজ্ঞাসম্পন্ন নীতিবাদী জ্ঞানী ব্যক্তিই 'ফাই' এবং 'গণিমত' সম্পর্কে কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার উপযুক্ত ও সক্ষম ব্যক্তি। অচিরেই হযরত আলীর বুঝতে বাকি রইল না যে, তাঁর অনুসারীদের মধ্যকার পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সমন্বয় ঘটান সম্ভব নয়।[১০] তিনিও অবশেষে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। পূর্বের আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট যে প্রথম চার জন খলিফা যারা প্রায় ৩০ বছর নয়া আরব রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাদের তিনজনই আততায়ীর হস্তে নিহত হন। এটা অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও বাস্তব সত্য এবং এসব ঘটনার অবশ্যই সামাজিক প্রেক্ষিত বিদ্যামন ছিল—যা অনুধাবন না করলে উদীয়মান আরব সমাজের বিকাশ ধারা ও বিভিন্ন সামাজিক শক্তির পরিচয় অজানা থাকার কথা।

আলী নিহত হলে সমর্থকের অভাবে আলী পুত্র হাসান খেলাফতের পথ হতে সরে দাঁড়ালে সিরিয়ার দক্ষ প্রশাসক উমাইয়া বংশের উজ্জ্বল তারকা মোয়াবিয়াকে আমিরুল মোমেনিন পদে সমাসীন করা হয়। তিনি ধর্মীয় ক্ষমতার দাবি করেন নি।[১১] আবু বকর

ও ওমরের মতই সীমিত রাষ্ট্রীয় ক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি কোরেশ নেতা হলেও ধনকুবের তালহা ও জুবায়েরের মত কেবল মক্কার স্বার্থে আপনাকে সম্পৃক্ত করেন নি; সিরিয়ার সামরিক বাহিনী তাঁর ক্ষমতার উৎস হলেও সেনাবাহিনীকে সর্বদা পর্দার অন্তরালে রাখতেন। আরব ঐতিহ্য অনুসারে তিনি গোত্রপতিদের ক্ষমতার অংশীদার করেন। তিনি আপনাকে আর দশজনের মধ্যে একজন হিসেবে ভাবতেন। (equal among the equals) তিনি আপোষ নীতির অনুসরণে আরব সমাজে সাময়িক শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।[১২] তার শেষ কাজ ছিল তদপুত্র ইয়াজিদের উত্তরাধিকার মনোনয়ন। তিনি খেলাফতকে মুলকিয়াত বা রাজতন্ত্রে রূপান্তর করেন বলে অনেকে সমালোচনা করেন। অবশ্য কায়তানী মনে করেন এটাই তৎকালীন উদীয়মান আরব সমাজের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগামী পদক্ষেপ। এত সমালোচনা সত্ত্বেও মধ্যযুগের মুসলিম সম্প্রদায় রাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন দেয় এবং অনুশীলন করে।[১৩] খোলাফায়ে রাশেদীন যুগে প্রচলিত গোত্রীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত থাকায় মুলকিয়াত বা রাজতন্ত্রের ধারণা কেউ লালন করে নি। যাহোক এভাবেই উমাইয়া বংশ তথা আরব সমাজ তথা ইসলামি উম্মার মধ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.৩ শিয়া সম্প্রদায় ও খারেজীদের উদ্ভব

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলীর সময় দুর্ভাগ্যবশত প্রথম গৃহ-যুদ্ধ সংগঠিত হয় যার প্রকাশ ঘটে উস্ট্র বা সিফ্ফিনের ঘটনার মধ্যে দিয়ে। হযরত আলী এবং তাঁর পরিবারের প্রতি দৃঢ় সমর্থকরা পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে শিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। নানা দল উপদলে বিভক্ত হলেও সম্প্রদায়টির মূল আদর্শ ছিল এক। তাদের সকল ফেরকাই মনে করত ইসলামি উম্মার সার্বিক সুখ, শান্তি, প্রগতি এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আলী এবং তাঁর বংশধর হবেন উম্মার ইমাম ও আমিরুল মোমেনিন। হযরত আলী ছিলেন 'বাবুল ইলম' সর্বজ্ঞানের সিঁড়ি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরাই তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ও উত্তরাধিকারী। এরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উত্তরাধিকারী ইমামরাই খলিফা বা রাজনৈতিক বা ইহলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন। উম্মার ইমাম আমেরুল মোমেনিন দেশ, সমাজ ও জাতির একমাত্র মুখপাত্র।

প্রথম পর্যায়ে শিয়া ব্যতীত আলীকে আরো অনেকে সমর্থন দিলেও সিফ্ফিন যুদ্ধের পর তারা আলীর প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। তারা ইসলামের ইতিহাসে খারেজী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এঁরা ইমাম বা আমেরুল মোমেনিন কাউকে কোনো ক্ষমতার অধিকারী বলে ভাবতেন না। তারা আল্লার অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। তারাই কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যাতা বলে দাবি করতেন। অন্যকারও ব্যাখ্যা তারা গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। এদেরকে মূলত বেদুইন মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী চরমপন্থী গণতন্ত্রী বললে অত্যুক্তি হয় না।

মোয়াবিয়ার জীবদ্দশায় তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ধৈর্যশীল আপোষমূলক নীতি কার্যকর ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তাঁর নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম হন নি। আব্দুল মালিক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটান এবং ইসলামি উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ রাখেন। মূলত তিনিই উমাইয়া স্বৈরশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। নিঃসন্দেহে বিশ্ব বিজয়ের ইতিহাসে উমাইয়াদের অবস্থান ছিল অনন্য। উমাইয়াদের খেলাফত যুগে আরব জাতির প্রভুত্ব এশিয়া আফ্রিকার সীমা অতিক্রম করে ইউরোপেও সম্প্রসারিত হয়। ওয়েল হাউজেনের মতে, উমাইয়াদের পতনের সাথে আরব প্রভুত্বের অবসান ঘটে। উমাইয়াদের অনেক সাফল্য থাকলেও উম্মার সামাজিক সমস্যার সমাধানে তারা ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, বরং তা প্রতিদিন তীব্র হতে তীব্রতর হয়। এই সামাজিক সমস্যার ফলেই শিয়াও খারেজী বিদ্রোহ পূর্বাঞ্চলে লেগেই থাকে। প্রায়শ বিভিন্ন শহরে শান্তি বিঘ্নিত হয়। উমাইয়াবিরোধী শক্তি এ বাস্তব অবস্থার সদ্ব্যবহার করে।

প্রথম ইয়াজিদের সময় কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা হতে শিয়া আন্দোলনের নব পর্যায়ের সূচনা হয়। ঐ ঘটনার পর আলী বংশের আরো কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি আহলে বায়েতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রাণ বিসর্জন দেন। আহলে বায়েতের নামে অসংখ্যবার সশস্ত্র শিয়া বিদ্রোহ হয়। তারা সকল অত্যাচার উপেক্ষা করে অবিরত উমাইয়াবিরোধী প্রচার অভিযান চালিয়ে যায়। এসব ঘটনার সদ্ব্যবহারে ইসলামি উম্মার মধ্যে সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আহলে বায়েতের ইমাম আদর্শ ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আহলে বায়েতের প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতি বৃদ্ধির সাথে তাদের নিজেদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রহ হয়। আহলে বায়েতের ধারণাটি মূলত আরব ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কারবালার ঘটনার পর শিয়া আন্দোলনের বড় ঘটনা ছিল কুফায় মুখতারের বিদ্রোহ। কুফার শিয়া সম্প্রদায়ের যারা কারবালার ঘটনার সময় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি—সেই অনুশোচনাকারীরা মুখতারকে সমর্থন দেয়। কিন্তু উমাইয়াবিরোধী কুফার কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধি আশরাফরা জুবায়েরকে সমর্থন দেয়ায় মুখতারের বিদ্রোহ সহজে অবদমিত হয়। তবু মুখতারের বিদ্রোহ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সর্ব প্রথম প্রকাশ্যে মুহাম্মদ বিন-আলী হানাফিয়াকে ইমাম এবং উম্মার প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা মাহদী বলে প্রচার করেন। মুখতারের পরও কুফাবাসীরা সর্বদা উমাইয়াবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে।[১৪] তারা ইবনুল আস এবং ইয়াজিদ বিন মুহাল্লিরের প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। মোহাম্মদ আল বাকের ও কুফায় ৭২০ সালে বিদ্রোহ করলে পরাজিত ও নিহত হন। ইয়াজিদ বিন মুহাল্লেরের ৭২০ সালের বিদ্রোহ দমন করার পর ইরাকে সিরীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে তাদের পক্ষে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা অসম্ভব হলে তারা গোপন সংগঠন পদ্ধতি অবলম্বন করে। উমাইয়াদের শেষের

দিকে উমাইয়াবিরোধী তিনটি গোপন আন্দোলনের নেতা ধৃত ও নিহত হন: প্রথমত বায়ান বিন সামানকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। তিনি প্রথমে আবু হাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আলীহানাফিয়ার পক্ষে প্রচারাভিযান চালান; পরে তিনি মুহাম্মদ আল বাকেরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন মুগিস বিন সাইদ। তাকেও হত্যা করা হয়। তিনি প্রথমে মুহাম্মদ আল বাকেরের সমর্থক ছিলেন, পরে তিনি পুণ্যাত্মা মুহম্মদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন আবু মনসুর, তাকে ৭৪২ সালে হত্যা করা হয়। তিনি মুহাম্মদ আল বাকেরের অনুগামী ছিলেন। ওয়াট মনে করেন আবু মনসুরের অনুসারীরা সন্ত্রাসে বিশ্বাসী ছিলেন।[১৫]

উমাইয়া শাসনের প্রথমাংশে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য বিদ্রোহ যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি শেষার্ধে তাদের গোপন তৎপরতাও সফল হয় নি। এরূপ পরিস্থিতিতে ৭৪৪ সালে আহলে বায়েতের সদস্য আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া কুফায় বিদ্রোহ করলে তাকে কুফা হতে বহিষ্কার করা হয়। তিনি আপনাকে পশ্চিম ইরানে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুনশ্চ তিনি এখানেও উমাইয়া বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে খোরাসানে পলায়ন করে ও প্রাণ রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি ব্যর্থ হলেও উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনের এক নয়া দিকনির্দেশনা দান করেন। শক্তিশালী উমাইয়াদের মূল উৎপাটন করতে হলে একটি ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন। এ কাজে তিনি হাত দেন। তাই তার সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন উমাইয়া বংশীয় হিশাম পুত্র সুলাইমান। সিরীয় সেনাপতি মনসুর আল জমহুর আল কালবী, খারেজী নেতা শায়বান, তার সাথে আব্বাস বংশীয় আবু জাফর। এভাবে তিনি সিরীয় সামরিক শক্তিতে বলীয়ান, কিন্তু গণবিচ্ছিন্ন উমাইয়া বংশের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের একটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের আদর্শ স্থাপন করেন।[১৬] তাই তাঁর রণকৌশল ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত; তবে তাঁর রণকৌশল প্রয়োগে ছিল ভ্রান্তি। ওয়াসিতে অবস্থিত সিরীয় সামরিক বাহিনীর হাতের নাগালে কুফা অথবা ফারেসে বিদ্রোহ করা ছিল মারাত্মক ভুল। কেবল দুর্বল স্থানে প্রথম আঘাত হানতে হয়। পরবর্তীকালে আব্বাসী বিপ্লবে উক্ত রণকৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়।[১৭]

২.৪ বিপ্লবের সামাজিক পেক্ষাপট

আব্বাসী বিপ্লবের সাফল্যের প্রধান কারণ খোরাসানে এর সফলতা। খোরাসান কি বিপ্লবের জন্য উর্বর ভূমি ছিল সে সম্পর্কে তার বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা করার প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে সাসানীদের কেন্দ্রীয় সরকারের পতনের পর আরবদের জন্য খোরাসান বিজয় সহজসাধ্য হয়; মার্ভে তারা সহজে প্রবেশ করে। এখানকার স্থানীয় শাসকরা বিজয়ীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুসারে আরবরা বার্ষিক কর পেলে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না বলে স্থির হয়। কাজেই স্থানীয় অভিজাত শাসক শ্রেণী দেহকানরা সকল সুযোগ ভোগ করে। ফলে বিজয়ী আরব ও দেহকানদের মধ্যে একটি শ্রেণীগত মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

খোরাসানে আরববা অভিবাসন গ্রহণ করে নি এবং তারা কিছুদিন ধরে বিজয় অভিযান হতে বিরত থাকতে চায়। তারা বার্ষিক অভিযানের জন্য মাত্র চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী রাখে। চুক্তি অনুসারের মার্ভের অধিবাসীরা শহরতলীতে সেনাবাহিনীর গৃহায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।[১৮]

৬৫২-৫৩ সালে আরবরা সাসানী সাম্রাজ্য বিজয় সম্পূর্ণ করে হপ্তালী (তুখারিস্থান) অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে, তবে প্রথম গৃহযুদ্ধের সময় এতদঅঞ্চলে তাদের অগ্রাভিযান স্তব্ধ হলেও মার্ভস্ত বাহিনী এ অঞ্চলের কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করে।

বসরায় আরব অভিবাসীদের চাপ হ্রাস করার জন্য ৬৬৭ সালে পুনবায় খোবাসানে বিজয় অভিযান প্রেরণ কবা হয়। পরবর্তী চার বছরে তুখারিস্তানে তাদের প্রচুর অগ্রগতি হয়। তবুও ঐ পূর্বাঞ্চলে আরব অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা হয নি। ৬৭১ সালে জায়েদ বিন সুফিয়ান বসরা ও কুফা হতে প্রায় ৫০ হাজার আরব পবিবারকে মার্ভের চতুর্পাশ্বে পুনর্বাসিত করেন। এ ব্যবস্থার গুরুত্ব ছিল প্রচণ্ড। এ অঞ্চলে কোনো দুর্গ নগর প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। দিউয়ানে তাদের নাম নিবন্ধীকৃত বলে তারা সবকালি ভাতা পেত। এবং যুদ্ধরত থাকত। তারা সোগদানিয়া জয় করে। দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের সময় হতে ৬৮৪-৯৬ সাল পর্যন্ত তাদের অগ্রাভিযান বন্ধ থাকে; কিন্তু আবব সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের বিরোধের প্রভাব এতদঞ্চলে অবস্থানরত আরবদেব উপরে পড়ে। কেউ আব্দুল মালিকের কেউ আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের পক্ষ অবলম্বন করে। আরব সামাজ্যের এই অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার যুগে মার্ভে সামাজিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়া দৃঢ় হতে থাকে। খোরাসানে বসবাসকারী অনেক আবব যুদ্ধে যোগদান না করে বরং কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। দ্রুত মার্ভ হয়ে উঠে বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। স্থানীয় বণিকরাও ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে। গ্রামে বসবাসকারী আরবরা জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ শুরু করে; কৃষিকর্মে জড়িত হয়ে তারা বস্তুত দেহকানদের প্রজায় পরিণত হয়। এভাবে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে লেনদেন ও ভাববিনিময়ের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হতে থাকে। আব্দুল মালিক সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলে খোরাসানে ঐ প্রক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়।

৭০৪ সালে মাওয়ালীদের দিউয়ানে নিবন্ধীকৃত করা হয়; তাদেরকে বৃত্তি প্রদান ও যুদ্ধে যোগদানে উৎসাহিত করা হয়। এসব ব্যবস্থায় স্থানীয়দের মধ্যে সামাজিক আত্তীকরণ জোরদার হওয়ার কথা, কিন্তু হাজ্জাজের অনুসৃত নীতিতে ফল উল্টো হয়। কুতাইবার দশ বছরের শাসনামলে (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) মাত্র সাত হাজার নয়া মুসলিমকে দিওয়ানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি খোরাসানী বাহিনীকে সুসংহত করেন। তিনি বসরা মডেলে আরবদের গোত্রীয় লাইনে পাঁচটি বাহিনী এবং মাওয়ালীদের একটি বাহিনী গঠন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আরব মাওয়ালী বাহিনীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের সর্বদা যুদ্ধে নিয়োজিত রেখে আত্তীকরণ প্রক্রিয়া স্তব্ধ করা। কুতাইবা

যেভাবে বিজযাভিযানেব আযোজন কবেন তাতে তাব প্রয়োজন হয অসংখ্য সৈন্যের-এজন্য অনাবব অমুসলিম প্রজাদেব সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত কবা হয়। যেহেতু তাবা দিউযানে অন্তর্ভুক্ত নয সে জন্য সাবা বছব তাদেবকে ভাতা দিতে হত না। তাদেবকে সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত কবতে হলে দেহকানদেব সহযোগিতাব প্রযোজন ছিল। দেহকানবা ছিল সুবিধাভোগী স্থানীয অভিজাত ও সমাজ কাঠামোতে রূপান্তব হলে তা হত তাদেব জন্য মাবাত্মক। কতিপয মাওযালী তাদেব স্বার্থেব পবিপন্থী হতে পাবে নি বলে তাবা এতটুকু উৎসাহিত কবত। আরববা যদি স্থানীযদেব সাথে সম্পৃক্ত হযে যায তাহলে সমাজ কাঠামো অক্ষত বাখা দুরূহ ব্যাপাব। কেননা এরূপ আববদেবকে স্থানীয সমাজ কাঠামো হতে দূবে সবিযে বাখা হত অসম্ভব ব্যাপাব। এব ফলে দেহকানদেব কর্তৃত্ব ধ্বংস হতে পাবত। এ কাবণে তাবা কুতাইবার নীতি সমর্থন কবে, কিন্তু কৃষকদেব জন্য তা ছিল ক্ষতিকব – স্বেচ্ছায যুদ্ধে যোগদান তাদেব জন্য লাভজনক ছিল না, ববং তাবা বছবেব মূল্যবান সময যুদ্ধে বত থাকলে গ্রাম্য অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে, দ্রব্যমূল উর্ধ্বগতি হয। এজন্য অনেক আবব, মাওযালী ও ইবানী বিদ্রোহ কবে এবং তাকে নিহত কবে। এ ঘটনায দেহকানবা ভীত হয। আববেব নিকট আত্তীকবণ প্রশ্নটি বড হযে দেখা দেয। প্রশ্নটি অনেকেব সামনে স্পষ্ট হয, ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আত্তীকবণ প্রক্রিযা বেশ গতিবেগ পায।[১৯] দ্বিতীয ওমব ৭১৭ সালে ক্ষমতায সমাসীন হযেই আবব সাম্রাজ্যেব জন্য খোবাসানে যে একটি আদর্শ অবস্থা বিদ্যমান তা অনুধাবন কবতে পাবেন। বস্তুত মার্ভ ও তাব চাবপাশে অর্ধশতাব্দী ধবে আবব ইবানীবা পাশাপাশি বসবাস কবায তারা পবস্পবেব প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতাব প্রযোজন প্রচণ্ডভাবে অনুধাবন কবতে পাবেন। দ্বিতীয ওমব এ বাস্তব অবস্থা গ্রহণ কবেন এবং কযেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ কবেন। ওমবেব শান্তিবাদী নীতি বণিক সমাজকে আন্দোলিত করে। বৃহত্তব স্বার্থের জন্য আববদেব অনেকে সামাজিক সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিযাকে স্বাগত জানান। কিন্তু কাযেমি স্বার্থবাদী আববরা তাতে বাধা দেয—ফলে আববদেব মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হযে উঠে। মার্ভের আববদেব মধ্যে এরূপ সামাজিক বাস্তবতায আব্বাসী বিপ্লবী আন্দোলনেব লক্ষণ দেখা দেয।[১৯]

২.৫ আব্বাসী বিপ্লবের সূচনাকাল

আরব সাম্রাজ্যের উল্লেখিত ঐতিহাসিক, সামাজিক ও আদর্শগত পটভূমিতে আব্বাসী আন্দোলনেব সূচনা, বিকাশ, রণনীতি ও রণকৌশল বিবেচ্য। আব্বাসী আন্দোলন বিকশিত হয কুফায় হাশেমী আন্দোলন হতে। শিয়া সম্প্রদায়ের একটি উপদল কুফায় ৭০০–৭১৬ খ্রি. সময কালে হাশেমী আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনটি গড়ে উঠে আবু হাশেম বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী হানাফিয়ার নামে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত

হয়েছে মোখতার সর্বপ্রথম আবু হাশেমকে ইমাম এবং মেহেদী বলে প্রচার করেন। তাঁর সম্পর্কে আমাদের কাছে তথ্য খুবই অপ্রতুল। তবে লক্ষণীয় এই যে, হাশেমী উপদলটি সর্বদা আবু হাশেমের নামে প্রচারণা চালায়; অথচ অন্যান্য শিয়া উপদলগুলো অনেক সময় তাদের ঘোষিত ইমামের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। এই উপদলটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে সক্ষম হয়। আবু হাশেম কখনো কুফায় বসবাস করেছেন বলে জানা যায় না। বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় যে, ৭১৬ সালে তিনি একবার সিরিয়া গমন করেন এবং স্বদেশ ভূমি হেযাযে গমন পথে প্যালেস্টাইনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের গৃহে ইন্তেকাল করেন। বলা হয়, মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে আবু হাশেম তার মেজবান পুত্র মুহাম্মদ বিন আলীকে তাঁর উত্তরাধিকার অর্পণ করেন।[২১] ঘটনাটি সত্য হোক, বা না হোক, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মুহাম্মদ বিন আলী নিজেকে আবু হাশেমের উত্তরাধিকারী বলে প্রচার করেন এবং কুফায় গোপন সংগঠনটি পরিচালনা করেন। আবু হাশেমের অনুসারীগণও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[২২] মহানবীর চাচা আব্বাস ইসলামি বিপ্লবে বড় অবদান রাখেন নি সত্য, তবে তাঁর বংশে বহুখ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ছিলেন ধর্মভীরু পণ্ডিত এবং হাদিস বিশারদ। এই বংশের সদস্যরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, তবে আলী-ফাতেমার বংশধরদের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল। উমাইয়ারা তাদের কখনো সুনজরে দেখেন নি। দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের পর আলী ইবনে আব্দুল্লাহ জনজীবন হতে দূরে অবস্থান করে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার জন্য প্যালেস্টাইনের এক নিভৃত পল্লি হুমাইমায় বসবাস শুরু করেন। তিনি সম্ভবত আদৌ উচ্চাভিলাষী ছিলেন না। তদপুত্র মুহাম্মদ তাঁর পিতার বর্তমানেই হাশেমের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন।[২৩]

মুহাম্মদ ছিলেন দক্ষ সংগঠক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। এরূপ একটি অজ্ঞাত নিস্তরঙ্গ অথচ বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র ও মক্কার তীর্থ যাত্রীদের যাত্রা পথে অবস্থিত বিধায় বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ছিল উপযুক্ত স্থান। মুহাম্মদ বিন আলীই মূলত হাশেমী উপদলকে আব্বাসী দলে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কুফা শহরে তাঁর দলীয় সদস্য ত্রিশের উর্ধ্বে ছিল না। এই সদস্যদের অনেকে হেজাজ, সিরিয়া ও খোরাসানে ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিলেন বলেই তারা সর্বদা তাদের পরিচয় গোপন রাখতে সক্ষম হন। এই নিভৃত গ্রামে অবস্থান করেও আরব সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের বাস্তব অবস্থা ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি তাঁর ব্যবসায়ী দূতদের কাছ থেকে খোরাসানের অবস্থা জেনে সেখানে তাঁর প্রচার জালবিস্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কুফার কয়েকজন প্রচারক (দায়ী) কে খোরাসান প্রদেশের রাজধানী মার্ভে প্রেরণ করেন।[২৪] তাদেরকে সন্তর্পণে গভীর প্রচার অভিযান চালাতে নির্দেশ দান করেন। ৭৩৬ সালে প্রচারকদের কেউ কেউ গ্রেফতার

হয়ে নিহত হলেও খোরাসানের নেতৃত্ব কখনো দুর্বল হয় নি। অথবা তাদের গোপনীয়তা নষ্ট হয় নি; তবে খোরাসানে প্রচার অভিযান প্রবল করার জন্য বুকাইর বিন মাহানকে প্রেরণ করা হয় এবং তাকে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১২ জন নকীব (উচ্চ পর্যায়ে দায়ী) নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ১৯ সদস্যদের প্রায় সবাই ছিলেন আরব অভিবাসী। অবশ্য দু একজন মাওয়ালীও ছিলেন। নয়া সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয় সুলাইমান বিন কাসির আল খুজাইরকে। একই সাথে ৫৮ জন দায়ী ও মিশনারী মনোনীত করা হয়। এর মধ্য হতে ৪০ জনকে মার্ভ শহরে, ১৮ জনকে মার্ভের শহরতলীতে গোপন তৎপরতা পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়। এরা ছিলেন প্রায় সবাই আরব অভিবাসী সন্তান।[২৬] এদের নিকটও তাদের ইমামের নামটি পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। কুফার মাধ্যমে হুমাইমার ইমামের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। হজের সময় মক্কায় ইমামের হাতে চাঁদা দেয়ার সময় কেউ কেউ সাক্ষাতের সুযোগ পেতেন। ৭৪৩ সাল পর্যন্ত বুকাইর মার্ভের সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন। ঐ বছর তিনি ইমাম মুহাম্মদের ইন্তেকালের এবং ইব্রাহিমের ইমামের মনোনীত হওয়ার সংবাদ নিয়ে মার্ভে আগমন করেন।

ইব্রাহিমের নেতৃত্বে সমাসীন হওয়ার সময়টি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ বছর উমাইয়া খলিফা হাশিম মৃত্যুবরণ করেন এবং সেই সাথে উমাইয়াদের পতন কালের সূচনা হয়। উমাইয়াদের অবনতিশীল অবস্থার সদ্ব্যবহার করার জন্য মার্ভের সংগঠন অধীর হয়ে পড়লে কুফা নেতৃত্ব তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে নির্দেশ দান করে। কুফা সংগঠনের নেতা আবু সালাম খাল্লাল ৭৪৪ সালে মার্ভে এসে অবস্থাটি নিয়ন্ত্রণে আনেন। খাল্লালের সাথে এক তরুণ নেতা আবু মুসলিম মার্ভে আগমন করেন। ৪ মাস পর সুলাইমান বিন কাসিরকে সংগঠনের দায়িত্ব দিয়ে তিনি কুফা নগরে প্রত্যাবর্তন করেন। তৃতীয় ইয়াজিদ বা দ্বিতীয় মারওয়ানের খেলাফতের সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে এবং সর্বত্র ঘটনা প্রবাহ এমন দ্রুত গতিতে চলে যে আব্বাসী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবিলম্বে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডয়নের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। ইমামের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে খোরাসান হতে আব্বাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে ৭৪৬ সালে আবু মুসলিম আব্দুর রহমান বিন মুসলিম মার্ভে আগমন করেন। সুলাইমান বিন কাসিরকে মার্ভের নেতৃত্ব হতে অপসারণের প্রস্তাবের প্রতি জনসমর্থন থাকলেও সুলাইমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে স্বপদে বহাল রেখে ও বিপ্লব এগিয়ে নেয়ার কাজে আবু মুসলিম আত্মনিয়োগ করেন।

বিপ্লবের সাফল্যের জন্য স্থান-কাল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবী ঝাণ্ডা উড্ডয়নের পূর্বে এমন প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হয়, যেন বিভিন্ন দিক হতে বাস্তব অবস্থার সকল সুযোগ গ্রহণ করা যায়। কেবল মার্ভে নয় সাম্রাজ্যের সর্বত্র আবু মুসলিম এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিপ্লবের জন্য যথাসম্ভব মানসিক

প্রস্তুতিও নেয়া হয়, প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের নানা লক্ষণের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী ও কেরামতির কথা ছড়ান হয় যা আসন্ন বিপ্লবের ইঙ্গিত বহন করে। আকর্ষণীয় শ্লোগানে সর্বত্র মুখরিত হয়। পূর্বে কাল পতাকা উত্তোলিত হলেও আসন্ন বিপ্লবের কাল পতাকা হবে তাৎপর্যপূর্ণ-উমাইয়াদের পতনের প্রতীক।[২৭] শিয়াদের আহলে বায়েতের ইমামতের অধিকার এবং তাদের অসংখ্য সদস্যাদের হত্যাকাণ্ডের কথা ফলাও করে অবিরাম প্রচারের ফলে মুসলিম গণমনে আহলে বায়েতের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি জাগ্রত হয়। উমাইয়াদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ তীব্রতর হয় এবং একই সাথে আহলে বায়েতের ইমামত এবং তাদের নিজেদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একীভূত হয়ে যায়।

মার্ভে অনেক যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও আবু মুসলিম খোরাসানীকে প্রেরণ করা হল কেন? আবু মুসলিমের পরিচয় কি? আমির আলীর ধারণা তিনি আরব বংশদ্ভূত ইস্ফাহানী। তাছাড়া তাঁর সম্পর্কে নানা কাহিনীও প্রচলিত আছে। আধুনিক গবেষক শাবান বলেন যে, তিনি পূর্বে কখনই খোরাসনে বসবাস করেন নি। তিনি নিজেকে আবু মুসলিম আব্দুর রহমান বিন মুসলিম নামে সবার নিকট পরিচিত করেন। এটা তার নাম নয় বরং ছদ্মনাম। যে কোনো গোপন সংগঠনে মূল নাম গোপন রাখাই নিয়ম এবং যে ছদ্মনাম গ্রহণ করা হয় তা খুবই অর্থবহ হওয়া উচিত। তিনি দক্ষ প্রজ্ঞাবান সংগঠক বলেই তাঁকে মার্ভে বিপ্লব সফল করার গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়। কেন্দ্র হতে দূরে এবং এখানকার সামাজিক অবস্থা ছিল তত্ত্বগতভাবে অনুকূলে, কেবল প্রয়োজন ছিল সঠিক কৌশলের সঠিক প্রয়োগ। সমগ্র উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন নির্ভর করছিল পূর্বাঞ্চলের সফল বিপ্লবের উপর। যা হোক শাবান বলেন তাঁর ছদ্মনামের অর্থ হল দয়াময়ের বান্দা. মুসলিম পুত্র এবং মুসলিম পিতা। অর্থাৎ তিনি যে বিপ্লবের ডাক দিচ্ছেন এবং যার পরিণতিতে ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা হবে সেখানে আরব-আজমের অথবা গোত্রীয় বিভেদ থাকবে না, সবাই সমান অধিকার সম্পন্ন মুসলিম উম্মার সদস্য। তিনি তাঁর ছদ্মনামের সাথে কোনো গোত্র বা পরিবারের সম্পর্কের কথা না বলে নিজেকে সমগ্র খোরাসানের হয়ে কথা বলবেন বলেই নিজেকে খোরাসানী হিসাবেও প্রচার করেন। অথচ তিনি আদৌ খোরাসানের বাসিন্দা ছিল না। He was a living proof that in new society every member would be regarded only as a Muslim regardless of racial origin or tribal Conection. তিনি সার্বজনীন মুক্তির প্রতীক।[২১]

৭৪৭ সালে আবু মুসলিম অবশেষে সব জল্পনাকল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বিপ্লবের প্রতীক কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন করলে পুরনো আরব অভিবাসীদের মধ্য হতে ২২০০ ব্যক্তি উক্ত পতাকা তলে সমবেত হয়। এক মাসের মধ্যে বিপ্লবী বাহিনীতে সাত হাজার ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করলে নয়া দিউয়ানে তাদের নামধাম নিবন্ধীকৃত করা হয়। দ্রুত তাঁর বিপ্লবী খোরাসানী বাহিনী গঠিত হয়।[২১]

বিপ্লবের ঘোষণার সময়টি ছিল খুবই উপযোগী। এ সময় খোরাসানে সেনা-বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ে সব পক্ষই প্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে। ৭৪৫ সালে দ্বিতীয় মারওয়ান নসর বিন সাইয়্যারকে খোরাসানের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করার সময় জুদাই বিন আলী কিরমানীর নেতৃত্বে ইয়ামানীরা বিদ্রোহ করে। অবশ্য ঐ বিদ্রোহ অবদমিত করা হয়। নসর তাঁর সমর্থকদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন জেলায় উপ-শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এতে তার কেন্দ্রীয় সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় নির্বাসিত মুজারী নেতা হারিস বিন মুজাইরকে মার্ভে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান করা হয়। কিন্তু অচিরেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে এবং ইয়ামানীরা হারিসকে শক্তি যোগায়। হারিস নিহত হলেও মুজারী-ইয়ামানী দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। বিপ্লব উদ্বোধনের পূর্বেই আরব অভিবাসীরা ইয়ামেনীদের সাথে যোগদান করেন। আবু মুসলিমের বিপ্লবী বাহিনী ঐ গৃহযুদ্ধকে তাদের বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করে। তারা ইয়ামানীদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে খোরাসানী রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। পলাতক নসর বিন সাইয়্যার নিশাপুর হতে মার্ভের বিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছিলেন। মার্ভে তার সহযোগী দেহকানরা বোখারায় পালিয়ে যায়।[২২]

গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী আবু মুসলিম মার্ভে প্রবশে করেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ইমাম আর রিজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার আহ্বান জানান। ইযামানীরা ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করলেও বিপ্লবী বাহিনীর মিত্রতা রক্ষা করতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে বিপ্লবী বাহিনী খোরাসানের অবশিষ্টাংশ দখল করে নেয়। কাহতাবা বিন শাবীরের নেতৃত্বে খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনী পশ্চিমাঞ্চলের বিপ্লবী অভিযান প্রেবণ করে। দু বছরের মধ্যে তারা ৭৫০ সালে বিজয়ীবেশে কুফা নগরে প্রবেশ করে আবু মুসলিম কুফাসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইয়ামানী নেতাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। এ সময় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলেব ঘটনা প্রবাহের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক কমিসার আবু জাহাম বিন আতিয়ারের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

বিপ্লবী খোরাসানী বাহিনী কুফায় প্রবেশ করলে আবু সালমা তাদেরকে স্বাগত জানান এবং তিনি উজির আল মুহাম্মদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন অর্থাৎ তিনি বেসামরিক প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব পালনের অধিকার লাভ করেন । তবে তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। এ সময় কোনো ইমামের উল্লেখ করা হয় নি। বস্তুত তিনি বিপ্লবী সামরিক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। বিপ্লবী বাহিনীর উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা নয়; এবং আবু মুসলিমের পক্ষে আবু জাহাম বিপ্লবী বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। অবশ্য এ সময় সামরিক ও বেসামরিক উভয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল। এ সময় আবু সালমার জন্য সমস্যা ছিল সর্বসম্মতিক্রমে কাউকে আমিরুল মোমেনিন পদে মনোনীত করা। ইতিপূর্বে

হাশেমী আন্দোলনের নেতা ইব্রাহিম উমাইয়া সরকারের রোষানলে পতিত হয়ে নিহত হন। আব্বাসী পরিবারের সকল সদস্য হুমাইমা হতে পালিয়ে কুফায় আগমন করেন। উক্ত কাফেলায় ইব্রাহিম কর্তৃক হাশেমী আন্দোলনের নেতৃপদে মনোনীত আবুল আব্বাসও ছিলেন। আবু সালমা তাদেরকে আত্মগোপনে থাকার নির্দেশ দেন। অথচ তাদেরকে প্রয়োজনীয় খরচ বহন করেন নি এবং দুঃসংবাদটি আবু জাহামকে পৌঁছে দেয়ারও প্রয়োজনবোধ করেন নি। আবু সালমার আচরণে মনে হয় আমিরুল মোমেনিন প্রশ্নে আবু সালমা এবং বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। আর রিজা শব্দ দ্বারা আবু সালমা বুঝে ছিলেন বিষয়টি উন্মুক্ত। সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম নির্বাচিত হবে। খোরাসানীরা মনে করতেন বিষয়টি এত উন্মুক্ত নয় বরং তা অনেকখানি পূর্ব-নির্ধারিত। হাশেমী আন্দোলনের নেতাই হবেন আমিরুল মোমেনিন।

আবু সালমার অজানা ছিল না যে, সকল শাখার শিয়ারা ইমাম আমিরুল মোমেনিন মতবাদে বিশ্বাসী। খোরাসানীদের মতাদর্শগত অবস্থান সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। কিরূপে সর্বসম্মতিক্রমে সমস্যার সমাধান করা যায় সেটাই ছিল তাঁর মূল সমস্যা। প্রথমে তিনি মহানবীর সরাসরি পরিবারভুক্ত জাফর সাদেক, আব্দুল্লাহ বিন হাসান এবং ওমর বিন হাসানের সাথে যোগাযোগ করেন এবং কতগুলো শর্তসাপেক্ষে ইমাম আমিরুল মোমেনিন পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। তাঁরা কেউ বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এভাবে পুরা দু মাসের মত সময় চলে যাচ্ছে দেখে খোরাসানী বাহিনী বিষয়টি তাদের হাতে তুলে নেয়; তাদের নিজস্ব শর্তে তাদের পছন্দের কথা প্রকাশ করে। যেহেতু আবু হাজাম আবু মুসলিমের প্রতিনিধি ছিলেন তাই তৎকালীন বাস্তবতাকে মেনে না নিয়ে আবু সালমার কোনো উপায় ছিল না।

আবুল আব্বাস খোরাসানী শর্তে আমিরুল মোমেনিন পদে মনোনীত হন; আবু সালমা উজির পদে বহাল থাকেন।[৩৩] এ ব্যবস্থায় আবুল আব্বাসের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। তিনি ইমাম উপাধি গ্রহণ করেন নি অর্থাৎ তাঁর কোনো ধর্মীয় ক্ষমতার দাবি ছিল না। খোরাসানী বিপ্লবীরা উজির পদ বহাল রাখতে আগ্রহী ছিল। তাদের মতে উজিরই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের মালিক, আমিরুল মোমেনিনের সীমিত ধর্মীয় ক্ষমতা থাকবে তাঁর কোনো ইহলৌকিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকবে না। খোরাসানীরা সম্ভবত সাধারণ মুসলিমদের সমর্থন পাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৩৪] শিয়া মতবাদ পরিত্যাগ করলেও তারা খলিফাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এ জন্য দিতে চায় না–তা হলে উমাইয়া খলিফাদের সাথে আব্বাসী খলিফাদের কোনো পার্থক্য থাকে না।

২.৬ আব্বাসী বিপ্লবের তত্ত্ব ও অনুশীলন

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট যে, আব্বাসী পরিবারের নেতৃত্ব হাশেমী আন্দোলন আব্বাসী বিপ্লবের পরিণত হয়; উমাইয়া বংশের ধ্বংসস্তূপে আব্বাসী বংশ প্রতিষ্ঠিত

হয়। আব্বাসী বিপ্লবী খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনী ও তাদের মহান নেতা আবু মুসলিম নিয়ামক ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আবু মুসলিম অপসারিত হন; খোরাসানী বাহিনীও দৃশ্যপট হতে বিদায় নেয়। তা হলে আব্বাসী বিপ্লব কি নিছক একটি পারিবারিক বিপ্লব? (Dynastic Revolution?) খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনী প্রথম দিকে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে পরিবারে জীবিত আবু জাফরকে উপেক্ষা করে আবুল আব্বাসকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করে, আবু সালমা থাকেন উজির পদে। অনেকে মনে করেন যে, আবু জাফরের মাতা ছিলেন বারবারী দাসী এবং আবুল আব্বাসের মাতা ছিলেন আরব মহিলা। এ কারণেই খোরাসানী বাহিনী আবু জাফরকে উপেক্ষা করে। আধুনিক গবেষক শাবান বলেন আরব আজম বা গোত্রীয় চেতনাবিরোধী খোরাসানী বাহিনীর পদক্ষেপেব এরূপ মূল্যায়ন অযৌক্তিক।[৩৫] বিপ্লবী বাহিনীর সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আবু সালমা যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। সুযোগ বুঝে তাকে এবং খোবাসানী বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়। আব্বাসীরা শিয়াদের ইমাম ও আমিরুল মোমেনিনের মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে এবং যথা সময়ে আমিরুল মোমেনিনের সীমিত ক্ষমতা তত্ত্ব ছুড়ে ফেলে দেয়। উজির প্রতিষ্ঠানটিও বিকশিত হতে দেন নি। বিপ্লবের এসব ব্যর্থতার জন্য খোরাসানী নেতৃত্ব অনেকাংশে দায়ী। শাবান এ ব্যর্থতার কোনো সামাজিক ব্যাখ্যা দেন নি। যাহোক বিপ্লবের রাজনৈতিক আদর্শ পরাভূত হলেও শাবানেব মতে তাঁর সাংস্কৃতিক নীতি আব্বাসীরা কখনই পরিত্যাগ করে নি। বরং তারা বিজয়ী ও বিজেতাদের আরব আজমের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়া (Process of assimilation) সযত্নে লালন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।[৪০] এ কারণেই বহু অযোগ্য দুর্বল ব্যক্তি খেলাফতে সমাসীন হলেও দীর্ঘ দিন বংশটি ঠিকে থাকে। বস্তুত আব্বাসী বিপ্লবকে পরিবারিক বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করলে এর যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। উমাইয়াদের পতনের সাথে আরব প্রাধান্যের পরিসমাপ্তি হয় বলে ওয়েল হাউজেন যে মন্তব্য করেন—তা আংশিক সত্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়। আব্বাসী বিপ্লব হতে একক আরব প্রধান্য খর্বিত হলেও তা আরো অনেক দিন টিকে ছিল।

উমাইয়াদের পতন আর আব্বাসীয়দের উত্থানে যে সামাজিক শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল ছিল-তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন না করে শাবান এবং তাদের ভাবাদর্শের (Socio Cultural assimilation) উপর চমৎকার আলোকপাত করেছেন। অবশ্য ওয়েলহাউজেন এ দিকটি তীব্রভাবে অনুধাবন করেন নি। উমাইয়া যুগে আরব সাম্রাজ্যে দুটি বিরোধী সামাজিক ধারা গড়ে ওঠে। মোয়াবিয়ার দীর্ঘ শাসনামলে সিরিয়ায় আরব দাস মালিক শ্রেণীর প্রভাবে এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে এবং দামাসকাস বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইরাক-ইরানে আরব দাস মালিক শ্রেণী কখনো প্রভাবশালী হতে পারে নি বরং এখানে বিভিন্ন চুক্তি অনুসারে পুরনো অভিজাত

সামন্তশ্রেণী দেহকানদের অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। তাই আরব সাম্রাজ্যের দু অঞ্চলে এরূপ দু সামাজিক শক্তির মধ্যে ছিল দ্বন্দ্ব। সিরীয় প্রাধান্য এখানে কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত হয় নি। ভূমি ক্ষুধার্ত আরব অভিবাসী এবং সেই সাথে মাওয়ালীরা এ বাস্তব অবস্থার সুযোগ গ্রহণে সদা প্রস্তুত ছিল; তারা চাইত এতদঞ্চলকে বৃহত্তর আরব সমাজে সম্পৃক্ত করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে। আবদুল মালেক ও হাজ্জাজের প্রচেষ্টার ফল হয় উল্টো। পূর্বাঞ্চলে আরব শাসক শ্রেণীর মধ্যে তীব্র বিরোধ বাধে। উমাইয়া বিরোধী সকল সামাজিক শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে আব্বাসী বিপ্লবে অংশ নেয়। এ বিপ্লব সাফল্যের দ্বারদেশে পৌঁছানোর সময় দেহকানরা বিপ্লবকে সমর্থন দেয় এবং তারাও আরব সামাজিক সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে পূর্বাঞ্চলে তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখে। তাই উমাইয়াদের পতনের অর্থ ছিল আরব দাস মালিক ও সিরিয়ার পতন; এবং পুরনো (উমাইয়াদের পিতৃতান্ত্রিক) শাসন পদ্ধতি উৎখাত সাধন; ইরাক-ইরানে দেহকান ও সামন্ত শ্রেণীর উত্থান।[৪১] এই নয়া সামাজিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ে খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। এই সাথে আরব সাম্রাজ্যে পুরনো সামাজিক দ্বন্দ্বের অবসান হয়; তবে নতুন ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়; গড়ে ওঠে নয়া সংস্কৃতিক ও নয়া রাজনীতি এবং নতুন সমস্যা। আব্বাসী যুগ হয়ে ওঠে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

তথ্যপুঞ্জি

১. সিংহাসন শব্দটি অভ্যাসগতভাবে ব্যবহৃত হয়। বুওয়াইহী শক্তি কর্তৃক বাগদাদ দখল হওয়ার পর আব্বাসী খলিফাগণ সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হয়; তবে তাদেরকে সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সুন্নি মুসলিমদের ধর্মীয় ইমাম। সেই অর্থে আমিরুল মোমেনিন। বুইওয়াইহী হলেন ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রধান বা সুলতান বা জাহানদার বা (Secular head) বুওয়াইহীদের বাগদাদ হতে বিতাড়িত করলেও সুন্নি ইসলামের পতাকাবাহী সেলজুকদের সময়ও আব্বাসী খলিফাদের শাসনতান্ত্রিক অবস্থাব কোনো উন্নতি হয় নি বরং নিজামুলমুলকাতুসী বুওয়াইহী সালতানাত আদর্শের প্রতি জোরাল তাত্ত্বিক সমর্থন দেন তার সিয়াসতনামা গ্রন্থে। সালতানাত-জাহানদারী মূলত ইরানী ধারণা (Concept) ইসলামে সম্পৃক্ত করা হয়।

২. খোরাসানে বসবাসকারী আরবরা খোরাসানী জনতার স্বেচ্ছায় সমর্থন অর্জন করেন এবং খোরাসানী বাহিনীর জোয়ানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল খোরাসানী নেতৃত্বে নয়। দেখুন Wellhausen. The Arab kingdon and its fall

৩. W. M. Wall. Islamic Political Thought (Edinbourgh 1965). p. 52

৭. Shaban, op cit p 141
৮. Ibid p 141-2
৯. Ibid p 142
১০. Ibid p p 142-43
১১ Ibid p 144
১২. P K Hitti, op cit p p 197-78
১৩ Ibid p 174
১৪. Shaban, op cit p 146
১৫. Ibid p p 147-48
১৬ Ibid p 148-49
১৭. Ibid p p 150-51
১৮. Ibid p 151
১৯. Ibid p 152
২০. bid p 15-3
২১. Ibid p p 154,55
২২. Ibid p 159

তৃতীয় অধ্যায়

আব্বাসী বংশের প্রতিষ্ঠা

৩.১ আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ্ আস-সাফফাহ্ (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)

ইতোপূর্বে মন্তব্য করা হয়েছে যে, আব্বাসী খিলাফত সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবটি আরম্ভ হয় খোরাসানে; সমাপ্তি ঘটে জাব যুদ্ধে উমাইয়া বংশের পতনে। আব্বাসী বিপ্লবেব অধিনায়ক আবু মুসলিম আব্দুর রহমান বিন মুসলিম-এর নেতৃত্বে সমগ্র খোরাসান প্রদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনীর পদানত হলে তিনি তার সেনাপতি কাহতাবা বিন শাবিবকে পশ্চিমাঞ্চল বিজয় অভিযানে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন খালেদ বিন ববমক।[১] খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনী রায়নগরে প্রবেশ করে শান্তি স্থাপন করে। এখান হতে কাহতাবা পুত্র হাসান এবং আবু আয়ুনকে পারস্যের বিখ্যাত নগরী নিহাওয়ান্দ অবরোধ করতে প্রেরণ করা হয়। এই নগরের পতন রোধ করতে উমাইয়া সরকার আব্দুল্লাবিন মরওয়ান এবং ইয়াজিদের নেতৃত্বে দুটি বাহিনী প্রেরণ করে বটে; কিন্তু তাদের পৌছানোব পূর্বেই নিহাওয়ান্দের পতন ঘটে।[২] আব্বাসী বিপ্লবের পতাকা নিহাওয়ান্দের আকাশে পতপত করে উড়তে থাকে। উমাইয়া বাহিনীদ্বয়ের অগ্রগতি রোধ করতে আবু আয়ুনকে আব্দুল্লার বিরুদ্ধে এবং স্বয়ং কাহতাবা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা কবেন। কারবালা প্রান্তরে কাহতাবা ইয়াজিদের মুখোমুখী হয়ে উমাইয়া বাহিনীকে পবাজয় বরণ করতে বাধ্য করেন, তবে তিনি নদীতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারান।[৩] কাহতাবা পুত্র হাসান পলায়মান ইয়াজিদের পশ্চাদ্ধাবন করলে ইয়াজিদ ওয়াসিতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন; হাসান সচ্ছন্দ কুফা নগরে প্রবেশ করেন। কুফা উমাইয়া শাসনমুক্ত হয়।

এসব বিপর্যয়ের সংবাদে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে হাশেমী আন্দোলনের মূল নায়ক ইমাম ইব্রাহিমকে গ্রেফতার করে হাররান বন্দি শিবিরে নিক্ষেপ করেন। পরে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর ইমাম ইব্রাহিমের পরিবারের সদস্যারা মুক্ত অঞ্চল কুফায় গমন করে।[৪] কিন্তু আবু সালমার নির্দেশে তাঁরা আত্মগোপন করেন। ফাতেমীদের প্রতিনিধি আবু সালমা উজির আল মোহাম্মদ হিসেবে কুফায় অবস্থান করছিলেন। বিপ্লবী কাহিনী কুফায় প্রবেশ করলে পদাধিকারবলে কুফায় সাময়িক সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিরাজমান বিশৃংখল পরিস্থিতিতে আহলে বায়েতের মধ্য হতে সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম আমিরুল মোমেনিন পদে অধিষ্ঠিত করানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে কালক্ষেপণ করতে থাকেন; অথচ শক্তি শূন্য অবস্থা বেশি দিন চলতে দিতে পারে না। এরূপ সংকটকালে আবু সালমার সিদ্ধান্তহীনতা ছিল তাঁর একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি। তখনো কেন্দ্রীয় উমাইয়া সরকারের

পতন ঘটে নি। এরূপ পরিস্থিতিতে বিপ্লবী বাহিনীর চাপের মুখে আবু সালমা এবং হাসান কাহতাবার যুগ্ম ইশতিহাবে কুফার জনতাকে কুফাব কেন্দ্রীয় মসজিদে সমবেত হযে একজন ইমাম/আমিরুল মোমেনিন নির্বাচন করার আবেদন কবা হয়।[৫] ঐদিন কুফা এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ধাবণ করে। শহবেব চতুর্দিক হতে কালো পোশাক পরিহিত অসংখ্য জনতা মসজিদে সমবেত হন। ইতিমধ্যে সম্ভবত আবুল আব্বাস বিপ্লবী বাহিনীব শর্ত গ্রহণ কবেন। নামাজ পবিচালনা কবার পব আবু সালমা স্বয়ং খলিফা পদেব জন্য আবুল আব্বাসেব নাম প্রস্তাব করেন। সমবেত জনতা সমস্বরে আল্লাহু আকবব ধ্বনি দ্বাবা ঐ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন দেয়।[৬] সৈয়দ আমীর আলী আবু সালেমার ঐ আচবণেব সমালোচনা কবেন। সম্ভবত কুফাব সামগ্রিক পবিস্থিতি তিনি বিবেচনায় আনেন নি। বস্তুত দ্রুত পবিবর্তিত অবস্থায আবু সালমাব জন্য অন্য কোনো পথ উন্মুক্ত ছিল না। যাহোক কুফাব জনতাব এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের প্রেক্ষিতে আবুল আব্বাসকে তাঁব গোপন আস্তানা হতে মসজিদে আনয়ন কবা হয। সকলেই তার প্রতি আগ্রহে আনুগত্য প্রকাশ কবে। ঘটনাটি ঘটে ৭৪৯ সালেব ২৫ নভেম্বর। এভাবে আবুল আব্বাস বিখ্যাত আব্বাসী বংশের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ইমাম উপাধি গ্রহণ কবেন নি, তিনি কেবল আমিরুল মোমেনিন পদে অভিষিক্ত হন।[৭]

উমাইযাদেব বিয়োগান্ত নাটকেব শেষ মুহূর্ত সমাগত। একদিকে দক্ষিণে হাসান সগৌববে কুফা নগবে প্রবেশ কবেন; তাঁব সহযোগী আবু আয়ুন উত্তর দিকে বিজয় অভিযান পবিচালনা কবেন। ছোট জাব নদীর পূর্ব তীরে শাহরজুর নামক স্থানে আবু আয়ুন মাবাওযান পুত্রকে আক্রমণ করেন। মারওয়ানপুত্র পরাজিত ও নিহত হন। বণক্ষেত্রে চলে হত্যাযজ্ঞ। এটা ছিল মাবওয়ানের জন্য অসহনীয ঘটনা। মারওয়ান নতুন সংকল্প নিয়ে ১২০০০০ সৈন্য সমাবেশ করেন জাব নদীব পশ্চিম প্রান্তরে। তিনি মোকাবিলা করবেন পুত্র হন্তা আবু আয়ুনের। আবুল আব্বাস দ্রুত আবু আয়ুনকে সাহায্য করার জন্য তাব পিতৃব্য আব্দুল্লাহ বিন আলীকে এক সুসজ্জিত বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে উত্তরে জাবের দিকে প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন আলী আবু আয়ুনকে সহকারী হিসেবে বহাল রেখে সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জাবের পূর্বতীরে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই স্মরণীয় যুদ্ধে উমাইয়াদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় মারওয়ান তাঁর শেষ শৌর্যবীর্য প্রদর্শন কবেও পরাজয় এড়াতে পারেন নি।[৮] এ ঘটনা ঘটে ৭৫০ সালের ২৫ জানুয়াবি। ইতোমধ্যে আবুল আব্বাস সানন্দে আস সাফ্ফাহ বা বক্তপাতকারী উপাধি গ্রহণ করে বিজয়ী বাহিনীর মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত কবেন। মারওয়ান প্রাণ বাঁচানোর জন্য নগর হতে নগরান্তরে ছুটতে থাকেন। কোথাও তাঁর জন্য নিরাপদ আশ্রয় মেলে নি। আমীর আলীর ভাষায় আবুল আব্বাসের নির্দেশে আব্দুল্লাহ বিন আলী শিকারী কুকুরের মত শত্রুর পিছু ধাওয়া করে অবশেষে মিশরের ফুসতাতে মারওয়ানকে গ্রেফতার করে সেখানে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। পরবর্তী মার্চ

মাসে দামাসকাসের পতন হলে স্পেন ব্যতীত সমগ্র আরব সাম্রাজ্য আব্বাসীদের পদানত হয়। মহা বিজয়ের পর উমাইয়া বংশের জীবিতদের উপর চলে নৃশংসতার তাণ্ডবলীলা। প্রয়াতদের অস্থিগুলিও রেহাই পেল না; করব থেকে উঠিয়ে সেগুলো ভস্মিভূত করা হয় বলে ইবনে খালিকান একজন প্রত্যক্ষদর্শীর উদ্ধৃতির উল্লেখ করেন। অবশ্য আমীর আলীর মতে তৎকালীন যুগধর্মের মাপকাঠিতে আবুল আব্বাসের ঐ নৃশংসতা সীমাহীন ছিল না।[৯]

পতিত বংশের প্রতি আব্বাসীদের এরূপ নিষ্ঠুর আচরণে উমাইয়া বংশের অনুগামীরা দামাসকাস, হিমস, কিন্নাসিরিন, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহ করে, কিন্তু সহজে তা দমন করা হয়। ইরাকে মারওয়ানের রাজ প্রতিনিধি ইয়াজ বিন নুবাইর ওয়াসিতে ক্ষমতাসীন ছিলেন। আব্বাসী বাহিনী উক্ত নগর কঠোরভাবে অবরুদ্ধ করে তাঁকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। তাকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করা হয়।[১০]

এ অবস্থার মধ্যে আবুল আব্বাস একটি প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণে মনোযোগ দেন। আমীর আলী বলেন, আবুল আব্বাস বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব যতদূর সম্ভব তাঁর আত্মীয়দের উপর ন্যস্ত করেন। আবু জাফরকে মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজানে, তাঁর পিতৃব্য দাউদ বিন আলীকে হেজাজ, ইয়েমেনে, আব্দুল্লাহ বিন আলীকে সিরিয়ায়, সুলাইমান বিন আলীকে বসরায়, খোরাসানে আবু মুসলিমকে, আবু আয়ুনকে মিশরের শাসনকর্তা নিযোগ করেন।[১১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আবুল আব্বাস খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনীর ইচ্ছানুসারে সীমিত ক্ষমতা নিয়েই আমিরুল মোমেনিন নির্বাচিত হন; ইমাম পদের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি বেসামরিক সমর্থনও ছিল। স্বাভাবিকভাবে আবু সালমা উজির পদে বহাল থাকায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারের সব ক্ষমতা তাঁর হাতেই ছিল—খলিফার হাতে নয়। যাহোক, অল্প সময়ের জন্য হলেও উজির বিপ্লবী বাহিনী ও খলিফার মধ্যে বেশ সমঝোতা ছিল। সাধারণ শত্রু উমাইয়া বংশ ধ্বংস হলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।[১২]

খোরাসানী বিপ্লবী কাহিনীর প্রাথমিক ধারণা হয়েছিল যে, নয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে উজির পদটি হবে ভিত্তিপ্রস্তর। ঐ সময় এর প্রয়োগ পদ্ধতি ও কার্যক্রম তাদের জানা ছিল না। সে কারণে তৎকালীন বাস্তবতায় ব্যবস্থাটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। আবু সালমা তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; কিন্তু সে সময় সকল ক্ষমতার উৎস ছিল খোরাসানী বাহিনী। তারা তাদের ক্ষমতা উজিরের হাতে হস্তান্তর করতে রাজি ছিল না। কাজেই তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা ছিল অসম্ভব।

বস্তুত বিপ্লবী বাহিনী অথবা খলিফা কোনো পক্ষই উজিরের এরূপ অবস্থান পছন্দ করছিল না। তদুপরি আবু সালমার আচরণ এবং যথা সময়ে সিদ্ধান্ত গহণে ব্যর্থতা তাঁর অবস্থানকে অসহনীয় করে তোলে। এই সুযোগে খলিফা আবুল আব্বাস আবু

মুসলিমের অনুমতিক্রমে উজিরের পদ হতে আবু সালমাকে অব্যাহতি দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। আবু মুসলিম কেবল খলিফাকে সমর্থনই করেন নি বরং তিনি স্বয়ং আবু সালমাকে হত্যার সকল ব্যবস্থা করেন।[১৩]

আবু সালমার অপসারণের পর উজিরের পদ গ্রহণ না করেও আবু মুসলিমের রাজনৈতিক কমিশনার আবু জাহাম উজিরের দায়িত্ব পালন করেন। তবে দ্রুত বাস্তব অবস্থায় পরিবর্তন দেখা দেয় এবং অচিরেই খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনী ও আব্বাসী বংশের মধ্যকার যুক্তফ্রন্টে ফাটল ধরতে শুরু করে। আবুল আব্বাস কুফা নগরে অবস্থান করা কোনোক্রমে নিরপাদ নয় মনে করে আনবারে হাশেমীয়া প্রাসাদে অবস্থান করেন।[১৪] খোরাসানী বাহিনীর অনেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে আবুল আব্বাস সন্তুষ্টচিত্তে তাদেরকে পূর্বাঞ্চলে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান করেন। একই সময় মারওয়ানী সেনাবাহিনীর যারা নয়া সরকারের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আব্বাসী সেনাবাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক আবুল আব্বাস রাজপরিবারের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে তাদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাঁর এ দুটি পদক্ষেপে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়। এসব পদক্ষেপ যদি পূর্বপরিকল্পিত নাও হয় তবুও এগুলো ছিল দূরদর্শী ও তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

আব্বাসী বংশের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আসসাফ্ফাহ মাত্র চার বছর রাজত্ব করে ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন হীরার অনতিদূরে আনবারে হাশেমিয়া প্রসাদে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে রেখে যান পুত্র মুহম্মদ ও কন্যা রাইতাকে। রাইতা পরবর্তীকালে তাঁর চাচাত ভাই মুহম্মদ আল মাহদীকে বিয়ে করেন। মৃত্যুর পূর্বাহ্নে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু জাফরকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আসসাফ্ফাহর জীবদ্দশায় এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় এবং তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা তাঁর উত্তরাধিকারী আবুল জাফরকে আব্বাসী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়।

৩.২ আব্বাসী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর আব্দুল্লাহ আল মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)

আবুল আব্বাস আস্‌সাফ্ফাহর মৃত্যুকালে তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবু জাফর হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে মক্কায় ছিলেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন আবু মুসলিম। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভ্রাতুষ্পুত্র ইসা তাঁর খিলাফতের ঘোষণাদান করেন। খোরাসানী বাহিনীসহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন; পরিবারের একমাত্র সদস্য জাব বিজয়ী বীর আব্বাসী বাহিনীর সংগঠক অধিনায়ক এবং সিরিয়ার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন আলী তাঁর এ মনোনয়ন স্বীকার করেন নি। আবু জাফর দ্রুত আনবার এর হাশেমিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, আব্বাসী বিপ্লবের সাফল্যের মুহূর্তে আবু জাফর ছিলেন আব্বাসী পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য এবং সিরিয়া-ইরাক ও হেজাজে হাশেমী আন্দোলনের সক্রিয় নেতা; তবুও খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনী তাঁকে উপেক্ষা করে আবুল আব্বাসকে আমিরুল মোমেনিন পদে অধিষ্ঠিত করে। আবু জাফর সানন্দে তা মেনে নেন। তাদের এই উপেক্ষা সম্ভবত তাঁর জন্য মঙ্গলজনক হয়। আবুল আব্বাসের জীবদ্দশায় বাস্তব অবস্থায় যে রূপান্তরের লক্ষণ দেখা দেয় আবু জাফরের মানস চোখে তা ছিল স্পষ্ট। তার দীর্ঘ দিনের শাসনকালে তিনি কিছু নীতি গ্রহণ করেন; প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে উক্ত রূপান্তর প্রক্রিয়ার একটি পরিণতি দান করেন। আপন বংশকে শক্ত ভিতের উপর এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, অভ্যন্তরীণ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও পাঁচশ বছর ধরে তা টিকে থাকে এবং বিশ্বসভ্যতায় একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

আব্বাসী বংশের সুদৃঢ়করণে নেতিবাচক পদক্ষেপ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু জাফরের পিতৃব্য আব্দুল্লাহ বিন আলী তাঁর উত্তরাধিকার মেনে নেন নি। আবুল আব্বাসের মৃত্যুর প্রাক্কালে আরব সাম্রাজ্য সীমান্তে বাইজানটাইন শক্তির দুরাকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন আলী যুদ্ধাভিযানে গমন করছিলেন; আবু জাফরের খিলাফত লাভের সংবাদ পেয়ে সীমান্তের দিকে আর অগ্রসব না হয়ে রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে থাকেন এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। আব্বাসী বংশের জন্য এটা ছিল বড় সংকটকাল।[১৫]

আবুল আব্বাস তাঁর তথাকথিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আবু জাফরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় আব্দুল্লাহ বিন আলী বিদ্রোহ করেন—এরূপ কাহিনী আধুনিক গবেষকরা গ্রহণ করতে পারছেন না। তারা আরো মনে করেন আব্দুল্লাহ বিন আলীর কেবল ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য হতে এ বিদ্রোহ জন্ম নিয়েছিল বললে সম্ভবত ঐ সময়ের বাস্তব অবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। তাঁর অসংখ্য অনুগামী কেন আবু জাফরের উত্তরাধিকারের বিরোধিতা করবে? তাঁর অনুগত সেনাবাহিনী ছিল বিজিত বিজেতার সমন্বিত এক মডেল বাহিনী। এই বাহিনী আব্বাসীদের পক্ষে তাদের পূর্বের সহকর্মীদের বিরুদ্ধেও লড়েছিল। তাদের এ বিদ্রোহ আব্বাসী বংশের বিরুদ্ধে অকল্পনীয়; তবে ব্যক্তি আবু জাফরের বিরুদ্ধে অবশ্যই সম্ভব। আবু জাফরের রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ কারো অজানা ছিল না এবং তা ছিল তাদের সাধারণ স্বার্থবিরোধী। পরিবর্তিত অবস্থায় আরব সাম্রাজ্যের নয়া কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেনাবাহিনী পুনর্গঠন সম্পর্কে আবু জাফরের মতামত ছিল সুস্পষ্ট। তিনি ছিলেন শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত সরকারের দৃঢ় সমর্থক; প্রদেশসমূহ থাকবে কেন্দ্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এরূপ সরকারের শক্তির উৎস হবে একটি মডেল সেনাবাহিনী। সিরিয়া জাজিরা হতে সৈন্য সংগ্রহে তাঁর আপত্তির কোনো কারণ ছিল না; তবে তাদের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকুক তাও তাঁর কাম্য ছিল না।

তাদের এরূপ আব্দার সহ্য করলে কালক্রমে বিচ্ছিন্নতাবাদ উৎসাহিত হতে পারে এবং মারওয়ানী শক্তির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এতে আব্বাসী বিপ্লবের ভাবাদর্শ বিনষ্ট হবে। জাফরের এরূপ চিন্তার সাথে আব্দুল্লাহ ও তাঁর সেনানেতারা ঐকমত্য পোষণ করতেন না। সিরিয়ার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ সিরিয়ার স্বার্থের প্রতি সজাগ ছিলেন; তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্বশাসনে অভ্যস্ত সিরীয়রা আবু জাফরের কেন্দ্রীভূত শাসন পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে আব্বাসী বংশের ধ্বংস ডেকে আনবে। বস্তুত আব্দুল্লাহ আব্বাসী বংশের স্বার্থের সাথে তাঁর নিজের ও সেনাবাহিনীর স্বার্থ একাকার করে দেখেন; ফলে তিনি এ বিদ্রোহ করেন বলে আধুনিক গবেষক শাবান মনে করেন। আব্দুল্লাহ ছিলেন সিরিয়া-ইরাক তথা আরবদের একক প্রাধান্যের স্বপক্ষে; আবু জাফর ছিলেন আরব-আজমের সমন্বয়ের স্বপক্ষে–উভয় জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের স্বপক্ষে।[১৬]

আবু মুসলিম দ্রুততার সাথে ঐ বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। আব্দুল্লাহ বাহিনীর খোরাসানী সদস্যরা আবু মুসলিমের পক্ষে যোগদান করেন। এমন কি অল্প সংখ্যক সিরীয় স্বপক্ষ ত্যাগ করে। উভয় পক্ষ নিসিবিন রণক্ষেত্রে মুখোমুখী হলে বিদ্রোহটি সহজে অবদমিত হয়। আব্দুল্লাহ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন কবে বসরার শাসনকর্তার ভ্রাতা সুলায়মানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহী নেতাকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে সুলায়মান পদচ্যুত হন; আব্দুল্লাহকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়- অবশেষে গৃহচাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১৭] এই বিজয়ের ফলে আবু জাফরের অবস্থান বেশ একটু দৃঢ় হয়। এভাবে আব্বাসী বংশের দৃঢ়িকরণের প্রথম পদক্ষেপ সফল হয়।

এর পর আবু মুসলিমের পালা। আবু মুসলিম যখন নিসিবিনে আব্দুল্লাহর সাথে যুদ্ধরত—রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত মালে গণিমাহ সম্পর্কে আবু মুসলিম কি করেন—কেবল তাই লক্ষ্য করার জন্য আবু জাফর তাঁর এক প্রতিনিধিকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। নিছক তুচ্ছ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করে আবু জাফর আবু মুসলিমের পশ্চাতে এক গুপ্তচর নিয়োগ করবেন তা বোধগম্য নয় বলেই আবু মুসলিম খলিফার আচরণের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আবু জাফর খলিফার সীমিত ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন না। বস্তুত আবু মুসলিমের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এ ঘটনায় প্রতিফলিত হয়। আবু মুসলিম বিষয়টি অনুধাবন করেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন না করে বরং তিনি ও তাঁর শক্তিকেন্দ্র খোরাসানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক দাবা খেলার চালে যে ভুল হয়েছে, আবু জাফর তা দ্রুত শুধরে নিয়ে যে কোনো মূল্যে বিজয় অর্জন করতে তিনি ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে আবু মুসলিমকে রাজধানীতে নিয়ে এসে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়।[১৮] মজার ব্যাপার খোরাসানী বাহিনীর মধ্যে এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি। এটা ছিল তাঁর বড় বিজয়; তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনার পর তিনি হলেন আল মনসুর

(আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী)। আব্দুল্লাহ বিন আলীর পতনে তাঁর সামরিক তত্ত্ব জয়যুক্ত হয়; আবু মুসলিমের পতনে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে আর কোনো বাঁধা অবশিষ্ট রইল না। তাঁর আল মনসুর উপাধি কোনো গর্বিত উচ্চারণ বা ফাঁকা আওয়াজ ছিল না বরং তাৎপর্যপূর্ণ।[১৯]

নিজস্ব পদ্ধতিতে আব্বাসী বংশ প্রতিষ্ঠার পথে বড় দুটি বাঁধা অপসারিত হয়–আর একটি সম্ভাব্য বাঁধা ছিল ফাতেমীবংশ। আব্বাসী বংশের নেতৃত্বে উমাইয়া বিরোধী হাশেমী আন্দোলন গড়ে ওঠে। শিয়া সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় আন্দোলনটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর প্রচারণার মধ্যে আহলে বায়েতের মধ্য হতে ইমাম/আমিরুল-মোমেনিন হওয়ার সম্ভাব্যতার উপর বিশেষ জোর দেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত আব্বাসী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে আব্বাসীরা আলী বংশের বিদ্রোহের আতঙ্ক হতে মুক্ত ছিল না। বিভিন্ন সময় আলী বংশের গতিবিধির উপর নজরদারি করা হয়। শিয়া ইমাম মোহাম্মদ আন্নাফসুজ জাকিয়া তাঁর ভ্রাতা ইব্রাহিমকে আইওয়াজ ও বসরায় বিদ্রোহ করতে প্রেরণ করেন; অন্য দিকে তিনি স্বয়ং মদিনায় অভ্যুত্থান ঘটান। দুস্থান হতে একযোগে মনসুরের পদচ্যুতির ঘোষণা দানের সিদ্ধান্ত ছিল; কিন্তু ইব্রাহিমের প্রস্তুতির পূর্বেই ভাবাবেগ তাড়িত নাফসুজ্জাকিয়া ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মদিনায় মনসুরের সহকারী ধৃত ও বন্দি হন। কয়েক দিনের মধ্যে হেজাজ ও ইয়েমেনবাসী ইমাম হিসেবে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বলে সৈয়দ আমীর আলী মন্তব্য করেন।[২০] এই বিদ্রোহ দমন করতে ইসাকে প্রেরণ করা হলে ভীত সমর্থকরা নাফসুজ্জাকিয়াকে ত্যাগ করে। তিনি মাত্র তিনশ সমর্থক নিয়ে আব্বাসী বাহিনীর মোকাবিলা করে নিহত হন। মদিনার শিয়া বিদ্রোহের অবসান হয়। ইব্রাহিমের বিদ্রোহ ছিল সংগঠিত। তবুও আব্বাসী আক্রমণে টিকে থাকতে পারে নি; ইব্রাহিম যুদ্ধে নিহত হন। একে একে আব্বাসী বংশের বিপজ্জনক সকল শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়।[২১]

আব্বাসী বংশের স্বকীয় অস্তিত্বের জন্য এসব ছিল গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু নেতিবাচক পদক্ষেপ। আর মনসুর স্বীয় বংশের স্থায়িত্বের জন্য কতগুলো ইতিবাচক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত ইসার পরিবর্তে তিনি আপন পুত্র মোহাম্মদকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তাঁর উপাধি দেয়া হয় 'আল মাহদী'। তাঁর আপন উপাধির মত এটিও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। আলাভী বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হলেও সর্বত্র তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল দরদি সমর্থকের অভাব ছিল না। এদেরকে সামরিক উপায়ে দমন করা সম্ভব নয়। তবে ভাবাদর্শগতভাবে নিরস্ত্র করা সম্ভব এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক। খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনীর চাপে আব্বাসীরা ইমাম উপাধি গ্রহণ করে নি। এতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত ছিল না। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মাহদী বা ত্রাণকর্তা রূপে যুবরাজের যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় তার আবেদন সাধারণ সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদের মধ্যে ছিল প্রবল।

মুখতারের বিদ্রোহের পর হতে প্রায় একশ বছর ধরে মাহদী ভাবাদর্শ জনসাধারণের মধ্যে চালু ছিল। তিনি এর সদ্ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করেন।[২২] প্রথম দিকে অনেক খোরাসানী এমন কি আব্বাসী বংশের বিশিষ্ট সদস্য ইসা বিন মুসা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির ব্যবহারের বিরোধিতা করেন। দীর্ঘ দিন প্রচারণার পরে লোক সমাজে ধর্মীয় আবেদন গৃহীত হয় এবং আব্বাসী বংশের এটি একটি গৃহীত নীতিতে পরিণত হয়। এ কারণে খলিফাদের ব্যক্তি জীবনে অধার্মিকতার অভিযোগ ছিল বিরল। বিনা বাঁধায় মাহদীর খলিফা পদে সমাসীন হওয়া তাঁর দূরদর্শী নীতির ফল। পরবর্তী প্রায় পঁয়ত্রিশ জন খলিফা তাঁবই প্রত্যক্ষ বংশধর। তিনি যে উত্তরাধিকার নীতির প্রবর্তন করেন তা তাঁব বংশেব গৃহীত নিয়মে পবিণত হয়।[২৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিয়া ও খারেজী উগ্রপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় উমাইয়া যুগে। মুবজিযাদেব অবস্থান তাদের বিপরীতে হলেও উমাইয়াদেবকে কখনই ধর্মীয় আবেদন কাজে লাগাতে দেখা যায যায়। এ কাজটির পথপ্রদর্শন করেন আল মনসুর। সময়ের অগ্রগতির সাথে মুসলিম উম্মাব কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে এবং উগ্রপন্থীরা কোরআন-হাদিসের নামে নানা মতামত ছড়াতে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রিয় একটি মধ্যপন্থী সমাজ গড়ে ওঠে; তাদেব মধ্যে অনেকে সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং খাঁটি হাসিদ ও সুন্নাহ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। মনসুরের সময় মদিনাব মালিক ইবনে আনাস ছিলেন এমন একজন নীরব বুদ্ধিজীবী কর্মী। তিনি তাঁর বিখ্যাত মুয়াত্তা রচনা করেন। ক্রমবর্ধমান মুসলিম সম্প্রদায় নানা বৈষয়িক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় সুন্নাহব উপর নির্ভর করে ইজমা, কিয়াস, ইসতেহসান প্রয়োগ করে তাদের প্রয়োজন মিটাতে এগিয়ে আসেন আবু হানিফা। এভাবে হাদিস ফিকাহ্ শাস্ত্র চর্চার সূচনা হয়। এদের সবাই ছিলেন মধ্যপন্থী, তবে এদের একাংশ বক্ষণশীল এবং অপর অংশ উদারতাবাদী; অথচ মৌলনীতিতে ছিলেন সকলেই এক সুন্নাহর অনুসারী। মনসুর ধর্মীয় কর্তৃত্ব দাবি না করে বরং ধর্মবেত্তা ও শাস্ত্রজ্ঞদের কর্তৃত্ব মেনে নেন। তাঁরা রাজদরবারে যথেষ্ট সমাদৃত হতেন, তবে খলিফা ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; শুক্রবারে তিনি বিশেষ পোশাক পরিধান করতেন। তিনি উগ্রপন্থী শিয়া ও খারেজীদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত গঠনে উৎসাহ যোগান। মনসুরের পরবর্তীকালে আহলুস সুন্নাহ আরো সংগঠিত হয়। বস্তুত এদের মুখপাত্র বুদ্ধিজীবীরাই আব্বাসীদের একটি সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত হন। তাদের একাংশ সর্বদা খলিফাদের স্বপক্ষে প্রচারণা চালাতেন। তাই তাঁর উদার ধর্মীয় নীতি আব্বাসী বংশের দীর্ঘ স্থায়ীত্বের একটি বড় কারণও বটে।

আব্বাসী বংশের স্থায়ীত্বের জন্য তিনি আরো কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তার একটি হল রাজধানী স্থাপন। মক্কা, মদিনা, দামাস্কাস, কুফা, বসরা অথবা আনবার কোনোটাই তাঁর কাঙ্ক্ষিত রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয় নি। সবদিক বিবেচনা করে একদা পারস্যের সাসানী বংশের গ্রীষ্ম-

অবকাশ কেন্দ্রে টেসিফ্যান বা মাদায়েনের নিকটবর্তী বাগদাদ নামক স্থানটি সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় উপযুক্ত স্থান বলে তাঁর নিকট বিবেচিত হয়। আরব্য রজনীর রূপকথায় যে রূপনগর মোহিনীরূপে ফুটে উঠেছে তাতে মূলত তাঁর রচিত বাগদাদ নগরীর বাস্তব অবস্থাই প্রতিফলিত হয়েছে। নগরীটি কেবল মনোরম পরিবেশেই স্থাপিত হয় তাই নয়; এর কৌশলগত অবস্থান লক্ষণীয়। এর ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য তৎকালীন সভ্যজগতের বিভিন্ন নগর বন্দরের সাথে নৌযোগাযোগ স্থাপন হয় সহজসাধ্য। সে কারণে নগরটি দ্রুত শ্রেষ্ঠ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। মনসুর নিজেই বলেন ঃ Besides, here is the Tigris to put us in touch with lands as for as China and bring us all that the seas yield as well as the food products of Mesopotamia, Armenia and their environ than there is Euphratis to carry for us all that Syria, Raqqa and adjacent lands home to offer.

তাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে রাজকীয় জ্যোতিষীর নির্ধারিত সময়ে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সিরিয়া মৌসুল, কুফা, ওয়াসিতসহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আহুত হাজার হাজার স্থপতি, কারিগর, মিস্ত্রী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে নগরীটি মাত্র ৪ বছরে ৪৮৮৩০০ দিরহাম ব্যয়ে এ সুষমামণ্ডিত নগরী নির্মিত হয়। নগরীটি বৃত্তাকার বলে একে মুদাওয়ারা বলা হয়। নগরীর অভ্যন্তরে দুটি গোলাকার বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। নগরের চতুর্দিকে খাল দ্বারা বেষ্টিত করা হয়; বসরা, কুফা, খোরাসান ও দামেস্ক নামে চারটি বক্রাকার এলাকার প্রবেশদ্বার স্থাপন করা হয়। বহিঃপ্রাচীর এবং মধ্যবর্তী প্রাচীরের অন্তবর্তী স্থানে খোরাসানী বাহিনীর বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ প্রাচীর এবং মধ্যবর্তী প্রাচীরের অন্তবর্তী স্থানে সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থান ও বাজার ছিল। বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে নীল গম্বুজবিশিষ্ট মনোরম রাজপ্রাসাদ (কুব্বাতুল খাজরা) এবং সেই সাথে প্রাচীন মসজিদ ও সচিবালয় এখানেই গঠিত হয়। নগরের অভ্যন্তরে প্রচুর বাগ-বাগিচা ছিল। নগর প্রাচীরের বাইরে বাজার ছিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। মৃত্যুর পূর্বে মনসুর বহিঃপ্রাচীরের বাইরে তাইগ্রীসের তীরে কাসরে খুলদ নামক আর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন; যুবরাজ আল মাহদীর জন্য আর একটু উত্তরে রুসাফা নামক অন্য একটি প্রসাদ নির্মাণ করেন। নগরটি নির্মিত হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়; মধ্যযুগে তার তুলনা বিরল।[২৪]

শাসননীতি ও শাসন পদ্ধতি

মনসুর তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধীদের কাউকে ক্ষমা করেন নি, তা অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট হয়। এর মধ্যে তাঁর নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটলে ও এর মধ্যে মূলত

তাঁর শাসননীতি ও শাসন পদ্ধতিরই প্রকাশ ঘটে। তাঁর শাসননীতি ও পদ্ধতি যথাযথ প্রয়োগের জন্য তিনি বাগদাদ নগরী স্থাপন করেন। তিনি তাঁর কেন্দ্রীয় কার্যালয় হতে এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সমগ্র শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন স্বয়ং খলিফা মনসুর। বিপ্লবের সাথে জড়িত থাকায় তিনি খলিফা পদের সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। খলিফা পদ লাভ করার পর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। বস্তুত উমাইয়া স্বৈরতন্ত্র হতে আব্বাসী স্বৈরতন্ত্রে কোনো পার্থক্য ছিল না।[২৫] তার হাতের কাছে সকল প্রশাসনিক প্রধানদের দফতর ছিল; তাঁরা সকলেই তাঁর নিকট দায়ী ছিলেন। ঐ সকল দফতর প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করত। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঘটনাবলী সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হওয়ার জন্য, অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা সঠিকভাবে আচরণ করছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র এজেন্ট নিয়োগ করেন। তারা প্রতিদিন তাঁকে সরাসরি দৈনন্দিন তথ্যাদি সরবরাহ করতেন। প্রতিদিন কোথায় কোন জিনিসের কি মূল্যে বেচাকেনা হচ্ছে সে তথ্যও তারা সরবরাহ করতেন। এইসব রাজপ্রতিনিধিকে বলা হত সাহেবে বারিদ, চলতি ভাষায় *পোস্টম্যান। এই পদের গুরুত্ব এবং পদাধিকারীর সাথে খলিফার সম্পর্কের দ্যোতক* হিসেবে তাদের উপাধি ছিল মাওলায় আমিরুল মোমেনিন। মাওলা শব্দটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখানে একান্ত বিশ্বস্ত এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা ছিল সবচেয়ে উঁচু পদ। ইবনে খলদুন এই বিশেষ অর্থের প্রতি আলোকপাত করে বলেন: *Choosing another person one self for a special affairs which this person is* requered to accomplish in a sufficient manner.[২৬] মনসুর তাঁর প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অন্তত ৫০ ব্যক্তিকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। এদের মধ্যে ১৭ জন ছিলেন সাহেবে বারিদ। এরা ছিলেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। এদের কেউ ছিলেন আরব, আবার কেউ অনারব। অনারবদের অনেকের নাম উচ্চারণ করা কঠিন বলে তারা স্বেচ্ছায় আরব নাম গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অনেক পরিবার ছিল যারা বংশানুক্রমে বিভিন্ন আব্বাসী খলিফার অধীনে ঐ পদে বহু বছর ধরে ছিল। বারমেকিরা ছিল এরূপ একটি পরিবার।

মনসুরের গোয়েন্দা বিভাগ ছিল খুবই সক্রিয়, তাঁর গুপ্তচরদেরকে বলা হত খলিফার হাতের আয়না, যা দিয়ে তিনি শত্রু-মিত্র দেখতে পেতেন। কোনো বরখাস্তকৃত শাসক তার জমাকৃত ধনদৌলত নিয়ে পলায়ন করতে পারত না। তাঁর হিসাব বিভাগও ছিল খুবই সক্রিয়।[২৭]

আব্বাসী বিপ্লব সফল হওয়ার সময় উজারত পদটি সহ্য করা হলেও আবু সালমার অপসারণের পর মনসুর ঐ পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান নি। তবে তিনি একটি কাতেবের পদ সৃষ্টি করেন। কাতেব ছিলেন প্রশাসনিক সহযোগী; তার কোনো নির্বাহী

ক্ষমতা ছিল না। ইরাকি সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট না থাকায় দ্বিতীয় কাতিব আবু আইয়ুব আল মুরীইয়ানীকে নিয়োগ করেন, কিন্তু মুরীইয়ানীর মৃত্যুর পর তার পদে আর কাউকে মনসুর নিয়োগ করেন নি। প্রাদেশিক শাসনের উপর কেন্দ্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তিনি প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র সাম্রাজ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারের প্রধান লক্ষ্য।[২৮]

আরব সাম্রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়ীকরণ নীতি

উমাইয়ারা যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে আব্বাসীরা তাদেরকে উৎখাত করে সেই সাম্রাজ্যের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মাত্র। স্মরণ করা যেতে পারে আব্বসীরা কখনো স্পেনকে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে পারে নি এবং উমাইয়া বংশ পুনরায় স্পেনে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনসুর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণনীতি পরিত্যাগ করেন এবং মূল সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়ীকরণ নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার উত্তরাধিকারীরা তাঁর এই নীতি অনুসরণ করেন। এ কারণে তারা সর্বদা আগ্রাসন নীতির পরিবর্তে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। মিশর সহজে আব্বাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেননা মিশরে বসবাসকারী আরবরা আব্বাসীদের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়; কিন্তু আবো পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকায় বিশৃংখলা বিরাজ করে সেখানে পুনঃপুনঃ বারবারীদের বিদ্রোহ তদুপরি আরবদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ইফ্রিকিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ছিল বড় বাঁধা। বারবারীদের অবিরত বিদ্রোহ এবং বাইজানটাইনদের আক্রমণের আশঙ্কা মিশরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, এ জন্য উত্তর আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলের উপর আব্বাসী নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ কারণে ঐ অঞ্চলে খোরাসানী বাহিনীর একাংশ প্রথমে সাময়িকভাবে পরে স্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খোরাসানী বাহিনী দশ বছর ধরে কয়েকবার অভিযান চালিয়ে কায়রোয়ান পর্যন্ত আব্বাসী শাসন সুদৃঢ় করে।[২৯]

আব্দুল্লাহ বিন আলীর বিদ্রোহ বাইজানটাইনদেরকে আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পুনরায় আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে। ৭৫৫ সালে তারা মালাতিয়ার শক্ত ঘাঁটি দখল করে এবং সকল আরব দুর্গ গুড়িয়ে দেয়। ঐ অঞ্চলের স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য খোরাসানী বাহিনী প্রেরণ করা হয়, তবে তাদেরকে উক্ত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে রাখা হয় নি; বরং সিরিয়া ও জাজিরা হতে সৈন্য সংগ্রহ করে বাইজানটাইন সীমান্তে ককেসাস অঞ্চলে স্থায়ীভাবে উপনিবেশ গঠন করা হয়। তাদের প্রতিমাসে ৮০ দিরহাম করে সামরিক বৃত্তি বরাদ্দ করা ব্যতীত জায়গীর দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৩০]

আবু মুসলিম খোরাসানীর অপসারণের পর খোরাসান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং আব্বাসী কর্তৃত্ব বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ বিশাল অঞ্চলের শাসনের জন্য আবু মুসলিমের শূন্যস্থান পূরণ করার মত যোগ্য ব্যক্তি ছিল

দুর্লভ। তদুপরি আবু মুসলিমের পর যাদেরকে শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয় তাবা কেবল কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে শাসন করতে থাকায় স্থানীয় অধিবাসীদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয, ফলে খোরাসানী বাহিনীতেও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম শাসনকর্তা নিহত হন। দ্বিতীয় শাসনকর্তা ছিলেন একজন বিপ্লবী সন্তান এবং মনসুরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, তবুও তিনি কেন্দ্রের অন্ধ অনুকরণ পছন্দ না করে বরং বিদ্রোহ করেন। একই সময় পশ্চিম খোরাসানে নিশাপুর ও বাযের মধ্যবর্তী এলাকায় জনৈক সানবাদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ হয়। ঘটনাটি ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ। এতে পশ্চিম ও খোবাসানেব সাথে সংযোগকারী উত্তরেব বাণিজ্য পথ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয, তাছাড়াও বিদ্রোহের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। ক্যাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণে পাহাড়ি অঞ্চল ছিল স্বশাসিত; তারা আববদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করে আসছিল। উল্লিখিত সানবাদ বিদ্রোহ দমনের জন্য মনসুর ফারেস হতে আরব ও অনারব নিয়ে এক নতুন সেনাবাহিনী গঠন করে। এই বাহিনী কেন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট ছিল না বলে মনসুর উপদ্রুত অঞ্চলে খোবাসানী বাহিনী নিয়োগ করেন। সানবাদ বিদ্রোহ সহজে অবদমিত হয়। সানবাদ তুখারিস্তানে পলায়ন করার পর আর কোনো দিন বিদ্রোহ করে নি। তাবারিস্তানের স্বগোত্রীয় দায়লামীরাও প্রায় একই সাথে বিদ্রোহ করে বলে খোরাসানের পথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তবে এ বিদ্রোহও সহজে দমন করা হয়। এ সময় খোবাসানী বাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য না থাকায় মনসুর সিরিয়া ও ইরাক হতে সৈন্য সংগ্রহের প্রতি মনোযোগ দেন এবং যুবরাজেব নেতৃত্বে রায় নগরে বড় ধরনের দুর্গ নির্মাণ করা হয় এবং গোটা অঞ্চলেব নিবাপত্তা বিধান কর াহয়।[৩১]

বাইজানটাইনে আরবদের বিপদ দেখে খাজাররা ককেসাসের দিকে অগ্রসর হয় এবং তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করায হঠাৎ ভূমধ্যসাগর হতে ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত সমগ্র উত্তব সীমান্ত বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়। মনসুর এই উপদ্রুত অঞ্চলে দ্রুত সৈন্য সমাবেশ কবেন। তিনি এবার সেনাবাহিনী গঠন করার জন্য খোরাসান অথবা ফারেসের দিকে না তাকিয়ে বরং সিরিয়া-ইরাক, জাজিরা হতে সৈন্য সংগ্রহ করেন; বসরা ও কুফা হতেও সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবশেষে সমগ্র উত্তর সীমান্তে স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। ককেসাস অঞ্চলে নতুন নতুন দুর্গ নির্মাণ করা হয়; সৈনিকদের নিয়মিত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যুবরাজ মাহদীকে নয়া সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়।[৩২]

অন্যত্র উল্লেখিত হযেছে যে, আব্বাসী বিপ্লবের সময় হিরাতের হেপ্তালী, পুশাঙ ও বাদগী জনতা নীজাকের নেতৃত্বে আবু মুসলিমের সাথে যোগদান করে। আবু মুসলিমের অপসারণের পব তারা অস্বস্তিবোধ করে। তারা ভাবতে থাকে যে তাদেব স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; তাই তারা উস্তাদসীসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। তাদের ভ্রাতৃপ্রতীম সীসন্তানীরাও ঐ বিদ্রোহে যোগদান করে। খোরাসানের শাসনকর্তা দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ায় এ বিদ্রোহ স্তব্ধ হয়। বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর হেপ্তালীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[৩৩]

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতে এটা স্পষ্ট হয় যে, আল মনসুর আব্বাসী উত্তরাধিকারের প্রায় সবটাই পুনঃদখল করে আরব সাম্রাজ্য বাস্তবে পুনর্গঠিত করেন। এই পুনর্গঠিত আরব সাম্রাজ্যের শক্ত ভিত্তির উপর আব্বাসী শাসন দৃঢ়িকরণের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরই অনুসৃত বা গৃহীত নীতিসমূহ তাঁর উত্তরাধিকারীরা কখনো হুবহু নকল করেন; কখনো ভ্রান্তভাবে তা প্রয়োগ করেন; কখনো অন্ধ অনুসরণও করেন। কিন্তু সৃজনশীলভাবে তারা অনুসরণ করতে পারেন নি। এ কারণে আবু জাফর আব্দুল্লাহ আল মনসুরকে আব্বাসী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার আসন প্রদান না করে উপায় আছে কি?

নয়া রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের প্রবর্তন

মনসুরের শাসনকালের শেষের কয়েক বছর ছিল শান্তিপূর্ণ। এরূপ শান্ত পরিবেশে আব্বাসী শাসন ব্যবস্থায় নতুন কোনো উপাদান সংযোজিত হয় নি। এ কারণে মনে হয় আল মনসুর প্রথম দিকে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত প্রশাসনিক কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধনের কোনো প্রয়োজনবোধ করেন নি। আধুনিক গবেষক এম. এ. শাবান মনে করেন তাঁর প্রবর্তিত শাসন নীতি ও শাসন ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে মনে হয় তিনি উমাইয়া স্বৈরতন্ত্রের অনুসরণ করেন মাত্র। আব্বাসী বংশের স্থিতিশীলতা, আরব সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষাই তাঁর একান্ত কাম্য ও লক্ষ্যবস্তু ছিল। তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সামাজিক সমস্যার কথা আদৌ ভাবেন নি। অথচ আব্বাসী বিপ্লবের ফলে আব্বাসী সাম্রাজ্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় প্রশাসনিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন সাধনের দরকার ছিল–তা করার জন্য তিনি বড় ধরনের সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন নি। মূলত তিনি ছিলেন রক্ষণশীল দক্ষ শাসক। শাবানের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

In short, he was not a ruler who was profoundly concemed with reform and he does not seem to have realized that his empire was going through a period of fundamental Change. As a leader of supposedly revolutionary regime he introduced very little change and indeed was besically a conservative ruler.[৩৪]

উমাইয়া বংশের শাসনামলে আরব সাম্রাজ্যের কর ব্যবস্থা জটিল আকার ধারণ করে। তারা এই সমস্যার সমাধান করতে পারলে আব্বাসী বিপ্লব হত কিনা তা বলা শক্ত। নসর বিন সাইয়ার যদি কয়েক বছর আগে তার সমাধান প্রয়োগ করতে পারতেন তাহলে হয়তো ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হত। যাহোক মনসুর পূর্বের কৃষি অর্থনীতি নির্ভর কর ব্যবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। পুনশ্চ এ ব্যবস্থাটি সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক রকম ছিল না; নীতিগতভাবে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যারা আবাদি জমি

ভোগের অধিকারী তাদেরকে ভূমি রাজস্ব দেয়ার কথা; কিন্তু এ ব্যবস্থা এক এক প্রদেশে এক এক রকম এবং এতে প্রচুর অসঙ্গতি বিদ্যমান ছিল। আল মনসুর এসব অসঙ্গতি দূর না করে বরং সচেতনভাবে অপরিবর্তিত রাখেন। শহুরে সমাজের কর সমস্যা ছিল প্রকট। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বণিক সমাজে অমুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং তাদেরকে জিজিয়া কর দিতে হত। আরব সাম্রাজ্যে দ্রুত নগরায়ন এবং সেই সাথে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক নগর ও গঞ্জ করহীন অঞ্চলে পরিণত হয়। নয়া মুসলিমদের উপর কোনো কর আরোপ করা হয় নি অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা করমুক্ত সমাজে পরিণত হয়। করমুক্ত হওয়ার সুযোগে বস্ত্রশিল্প বিস্ময়করভাবে বিকশিত হয়। ব্যবসার জন্য যাদের দোকান ঘরের প্রয়োজন ছিল তারাই কেবল শুল্ক দিত। উমাইয়াদের অনুকরণে মনসুর বাগদাদ নগরে অনেক দোকান-ঘর নির্মাণ করেন। দোকানদারদের নিকট হতে কর (গাল্লা) আদায় করা হয়। যারা সরকারি জমিতে দোকান-ঘর নির্মাণ করে ব্যবসা করত তাদের নিকট হতে অল্প পরিমাণে কর আদায় করা হত। পদক্ষেপটি সঠিক হলেও এটা যথেষ্ট ছিল না। কর ফাঁকি দেয়ার অসংখ্য কানাগলি ছিল; মনসুর সেগুলো একেবারে উপেক্ষা করেন। অল্প সংখ্যক ব্যবসায়ী যাদের হাত দিয়ে বিপুল পরিমাণে পণ্য আমদানি-রপ্তানি হত তাদের উপর কর আরোপ করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ইসলামের নিয়ম অনুসারে ধনী মুসলিমদের শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দেয়ার কথা; কিন্তু খলিফা হযরত উসমানের সময় হতে সরকারি কর হিসেবে বিবেচ্য হত না। এর অর্থ হল ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা করের বোঝা বহন করত এবং ধনীরা হয়ে পড়ে করমুক্ত। এতে কেবল সমাজে ধন বৈষম্যই বৃদ্ধি পায় নি বরং সামাজিক অস্থিরতাও বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত সবাইকে বসরা বন্দরে তাদের পণ্য জাহাজ ভেড়ার সময় ২.৫০%, ৫%, ১০% শুল্ক দিতে হত। অনেকে কর রেয়াত পেত; অসংখ্য ব্যবসায়ী শুল্ক ফাঁকি দিতে পারত। মনসুর সম্ভবত কর নিয়ন্ত্রণের জন্য বসরা বন্দর এলাকায় প্রাচীর নির্মাণ করেন, তার খরচ অবশ্য বসরার বাসিন্দাদের বহন করতে হয়।[৩৫]

উমাইয়ারা তাদের নিজেদের জন্য অনেক আবাদি জমি অধিগ্রহণ করে। মনসুর এসব অধিগৃহীত জমি বাজেয়াপ্ত করেন এবং বাজেয়াপ্তকৃত আবাদি জমিগুলি তাঁর বংশের নর-নারী নির্বিশেষে সকল সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাদের প্রতি ছিলেন উদার ও নমনীয়; কিন্তু সে তুলনায় সরকারি কর্মচারীদের প্রতি ছিলেন কঠোর। তাদের সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৩০০ দিরহাম। এজন্য তাদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবণতা ছিল ব্যাপক।

উমাইয়া যুগে যে মুদ্রা মুদ্রিত হত তা মূল্যবান ধাতু হতে ৫%-১০% কম কিন্তু মনসুর তার সমস্যা মেটাতে ১৫% হ্রাস করেন। মুদ্রার এত অবমূল্যায়নের ফলে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা দেখা দেয় নি কারণ তিনি এ কাজটি করেন ধীরে ধীরে। তাঁর মৃত্যুকালে খাজাঞ্চিখানার রিজার্ভ ছিল প্রচুর পরিমাণে।[৩৬]

আব্বাসী বিপ্লবের ধ্বংসকারী এবং প্রতিষ্ঠাতা

মনসুর আব্বাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিত্যাগ করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আব্বাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছিল খলিফার ক্ষমতা সীমিত রাখা এবং নয়া পরিস্থিতিতে উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ওজারত বা পরামর্শ সভার প্রবর্তন করা। খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনী নিজেদেরকে বেসামরিক উজিরের অধীন করতে ইচ্ছুক না হওয়ায় প্রথম উজির আবু সালমা নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর নিহত হওয়ার পরই প্রকৃত উজারাত প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃত অর্থে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মনসুর সুকৌশলে আবু মুসলিমকে নিহত করে খেলাফতকে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত করেন। তাঁর এ কাজে বাঁধা দেয়ার মত তখন কোনো সামাজিক শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। এ কারণে মনসুরকে আব্বাসী বিপ্লবকে ধ্বংসকারী বললে অত্যুক্তি হয় না। এটা চিত্রের একটি দিক। আর একটি দিকও লক্ষ্য করা যায়। আব্বাসী বিপ্লব আরব সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও আরব আজম এর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়া আদৌ বাধাগ্রস্ত করেন নি বরং উৎসাহিত করেন। বস্তুত উক্ত প্রক্রিয়াটি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কালভেদে তার নিজস্ব গতিতে চলতে থাকে। খোরাসানে এর গতি ছিল তীব্র তা কখনো থমকে দাঁড়ায় নি। এখানে তৃণমূল পর্যায়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিস্তৃত হয়। এখানে ও পার্শ্ববর্তী সমগ্র মধ্য এশিয়া অঞ্চলে আত্তীকরণের অর্থ দাঁড়ায় স্থানীয় জনতা পৈতৃক ধর্মের পরিবর্তে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম গ্রহণ। তারা ধর্মান্তরিত হলেও তাদের মৌল সংস্কৃতি ত্যাগ না করে নয়া সংস্কৃতির উদ্বোধন করে। মিশরের অবস্থা ছিল ভিন্ন। এখানে আরব ও কপটরা স্ব স্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। দু'চারটি কপট পরিবার ধর্মান্তর গ্রহণ করে। যা হোক, সম্প্রদায়দ্বয় যুগ যুগ ধরে সামাজিকভাবে পাশাপাশি বসবাস করে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে; সহ অবস্থানের উপযোগী সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমঝোতা গড়ে ওঠে। ক্রমবর্ধমান বাগদাদ নগর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সহঅবস্থান ধর্মী মেট্রোপলিটনে পরিণত হয়। এখানে আরব আজম, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়, তাই নয়, বাগদাদের অনেক আরব আজম অমুসলিমের শিক্ষা সংস্কৃতির অসংখ্য উপাদান গ্রহণে আগ্রহী হয়ে পড়েন।[৩৭]

তাবারীর অনুসরণে পি. কে. হিট্টি আব্বাসী সরকারকে দৌলা বা নয়া যুগ বলে অভিহিত করেন। বস্তুত আব্বাসী খেলাফত অবশ্যই উমাইয়া যুগ হতে এক নয়া যুগের সূচনা করে; আরব-আজম মিলে মধ্যযুগে বৃহত্তর সমাজ গঠনের যাত্রা বিন্দু স্থাপন করে। আল মনসুর শুধু আব্বাসী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না; ঐ নয়া যুগের প্রথম রূপকারও বটে। মধ্য যুগে এটা ছিল এক বিস্ময়।

বিশ্ব সভ্যতায় তাঁর অবদান

মধ্য যুগে আব্বাসী বংশ বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কবে বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকাব কবে আছে। আব্বাসীদেব মাহাত্ম তাদেব দিগ্বিজযে নয কেননা মনসুব বাজ্যেব সম্প্রসাবণ বা বিশ্ববিজযেব নীতি পবিত্যাগ কবেন তাঁব সকল উত্তবসূবি ওব এ নীতি অনুসবণ কবেন। মনসুবেব স্বপ্নপুবী বাগদাদ নগবী কি কেবল তাব ধন ঐশ্বযেব জন্য অক্ষয খ্যাতি অর্জন কবে? হিট্টিব ভাষায It was then that Bagdad became a city with no peer throught the whole world মনসুব চেযেছিলেন নগবটি বিশ্ব সভ্যতাব যাদুঘবে পবিণত হোক। ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন সভ্যতা সযত্নে লালন কবে উত্তবসূবিদেব নিকট তা হস্তান্তবকবণেব কাজটিই ছিল তাঁব ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং এব মধ্যেই তাব মাহাত্ম নিহিত। এ কাজেব সূচনা কবেন আল মনসুব। মধ্যযুগে মনসুবেব মত ব্যক্তিত্ব ব্যতীত এমন কর্মে কেউ অগ্রসব হতে পাবতেন না। তিনি ছিলেন একজন গুণগ্রাহী উদাবচিত্ত ব্যক্তিত্ব। তিনি চেযেছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন সাহিত্যেব মুক্ত চচা হোক বাগদাদে। তাঁব সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতায গ্রীক পাহলবী, সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ কবে আববি ভাষায অনুবাদেব শুভ পদক্ষেপ গ্রহণ কবা হয। ত কালীন ভাবতীয জ্যোতির্বিদ্যাব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল ফাজাবী আববিতে অনুবাদ কবেন। ইবনুল মুকাফফা কালীলা ওযা দীমনাব আববি অনুবাদক। The earliest literary work in Arabic that has came down to us is Kalila wa Dimnat মনসুব একবাব অসুস্থ হযে পডলে অনেক ডাক্তাব তাঁকে সুস্থ কবতে ব্যর্থ হলে তিনি জুনদেশাহপুব হাসপাতালেব অধ্যক্ষ নেসতুবি খ্রিষ্টান ডাক্তাব জুর্জিস বিন বখতিযেশুকে বাজদববাবে আমন্ত্রণ জানান। তাঁব চিকিৎসায মনসুব আবোগ্য লাভ কবলে তাকে শাহী কবিবাজেব মর্যাদা দান কবা হয।[৩৮] সেই সময হতে বাগদাদে চিকিৎসা শাস্ত্রেব চর্চাব এক নযা দিগন্ত উন্মুক্ত হয। গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র আবব সাম্রাজ্যে জনপ্রিয হয। আবব সাম্রাজ্যে কেন – সমগ্র মুসলিম সম্প্রদাযেব মধ্যে এইটাই ইউনানী বা হেকেমি চিকিৎসা পদ্ধতি বলে সমধিক পবিচিতি লাভ কবেছে। এভাবে মনসুব আব্বাসীদেব মননশীল গৌববেব ইতিহাসেব প্রথম অধ্যায বচনা কবেন। বিশ্বসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেব প্রতি মনসুবেব সক্রিয শ্রদ্ধা প্রদর্শনেব মধ্যে আব্বাসী বিপ্লবেব অন্যতম দিক বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক আত্তীকবণ নীতিই প্রতিফলিত হয। মনসুব আব্বাসী বিপ্লবেব ধ্বংসকাবী যেমন সত্য, তাব চেযে আবো সত্য তিনিই আব্বাসী বিপবেব প্রতিষ্ঠাতা-রূপকাব।

৩.৩ মোহাম্মদ আল মাহদী (সুপথে চালিত) : মনসুবনীতির অগ্রগতি

আল মনসুব প্রযাত হলে মোহাম্মদ আল মাহদী নির্বিঘ্নে পিতাব স্থলাভিষিক্ত হন। মাযেব দিক থেকে তিনি প্রাচীন হিমাবিয বাজবংশোদ্ভূত ছিলেন।[৩৯] সাধাবণ ইতিহাস সাহিত্যে

মাহদীর রাজত্বকালের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যায় না। অথচ তাঁর রাজত্বকালের ঘটনা প্রবাহ পরবর্তীকালের ইতিহাসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। নীতি ও আর্দশের ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর পিতা হতে ভিন্নরূপে চিহ্নিত করা হয়; এবং তার সমর্থনে কতগুলো ঘটনা পরিবেশন করা হয়।[৪০] অথচ ঐ সব ঘটনার প্রেক্ষিত উপেক্ষিত। বাস্তবে তিনি মনসুরের নীতিরই অনুসরণ করেন—তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁর নীতির প্রয়োগ কৌশল ছিল ভিন্নধর্মী।

মনসুরের খেলাফতের শেষ কয়েক বছর ধরে সাম্রাজ্যের সর্বত্র-ই শান্তি বিরাজমান ছিল। আব্বাসী বংশের প্রতি জনতার সমর্থন ছিল। মনসুরের কঠোর শাসন ব্যবস্থা তাই হয়ে পড়ে নিষ্প্রয়োজন। পুত্রকে মাহদী হিসেবে মনসুর যে ভাবমূর্তি লোকসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন সিংহাসনে উপবেশন করেই তিনি সকলের মনোরঞ্জনের প্রয়াস চালান। সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ আদালত 'মাজালেম' গঠন করেন এবং তিনি স্বয়ং এ মাজালেমে বসে বিভিন্ন রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শ্রবণ করতেন। পিতা মনসুর যাদেরকে বন্দি-শিবিরে নিক্ষেপ করেন, তাদের বিষয়ে তিনি পুনর্বিবেচনা করেন; যাদের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর অভিযোগ ছিল না তাদেরকে তিনি মুক্তিদান করেন। তহবিল তসরুফের অভিযোগে পদচ্যুত সরকারি কর্মচারীদের বায়তুল মালুল মাজালেমে আটককৃত টাকা পয়সা ফেরত দেয়া হয়। তাঁর পিতামহ মহম্মদের প্রতি প্রয়াত যোদ্ধা মাসলামার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে মাহদী মাসলামার বংশধরকে মূল্যবান জায়গীরসহ ২০,০০০ দীনার বখশিশ প্রদান করেন। উমাইয়া বংশীয় দ্বিতীয় মারওয়ানের জনৈক পুত্র বিদ্রোহ করার চেষ্টা করলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় বটে, তবে অচিরে মোটা অংকের বৃত্তিসহ তাকে মুক্তি দেয়া হয়। মারওয়ানের বিধবা পত্নীর স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের জন্য রাজপ্রাসাদে একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়। রাজপরিবারের সবাই তাঁর প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করতেন।[৪১]

মাহদী হিসেবে শিয়া অনুগামী মানুষের সশ্রদ্ধ আনুগত্য লাভের জন্য তিনি আলী বংশীয় ইব্রাহিম পুত্র হাসানকে মুক্তিদান করেন। মার্ভের অধিবাসী শিয়া সমর্থক ইয়াকুব ছিলেন আবু মুসলিমের গুপ্তচর অথচ 'পবিত্র আত্মা' মহম্মদের বিদ্রোহের সাথে জড়িত থাকায় তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। মধ্যপন্থী শিয়াদের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁকে মুক্তি দান করে রাজনৈতিক কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়। তাঁর পছন্দসই ব্যক্তিদেরকে তার অধীনস্থ পদে নিয়োগ দান করার অধিকারও তাকে প্রদান করা হয়। তাঁকে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার অনুমতিও প্রদান করা হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে মাহদী ইয়াকুবকে পদচ্যুত করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[৪২] তিনি সর্বত্র উদারতা ও বদান্যতার খ্যাতি অর্জন করেন। হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায় তিন কোটি দিরহাম এবং মক্কায় দেড় লাখ পোশাক পরিচ্ছদ বিতরণ করেন। মদিনায় নবীজীর মসজিদের শোভাবর্ধনের জন্য তা

পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন। পবিত্র নগরীদ্বয়ে তীর্থযাত্রীদের স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য রাস্তাঘাট ও সরাইখানা নির্মাণের আদেশ দেন।[৪৩]

আল-মনসুর সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়কে সংগঠিত করতে উৎসাহ দেন এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মাহদী পিতার ধর্মীয় নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন। এ সময় ব্যবহারিক শাস্ত্রের প্রভূত বিকাশ ঘটে। সেই সাথে বিভিন্ন মজহাব বা আইন পদ্ধতি গড়ে উঠলেও মৌলিক ধর্মীয় মতাদর্শে তাদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল। মাহদী তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে উৎসাহিত করেন, তাই নয়, তাকে আরো বিকশিত করেন।

এ সময় খোরাসানে হাশিম বিন হাকিম নামক এক ব্যক্তি অবতরবাদের প্রচার করেন। তিনি সর্বদা মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত রাখতেন বলে তাকে মুকান্না বলা হত। তাঁর শিষ্যদের মতে, তাঁর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখার জন্য তা সর্বদা আবৃত রাখতেন। শত্রুপক্ষের মতে, তার কদাকার কুৎসিত মুখমণ্ডল আড়াল রাখার জন্য মুখোশ পরিধান করতেন। তাঁর অনুগামীরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করত বলে তাদেরকে মুবাইজ বলা হত। খোরাসানের অসংখ্য নরনারী তাঁর মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৪৪]

একই সময় ক্যাসপিয়ান সাগরের পূর্বদিকে জুরজানে আর একটি ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করে। তারা সাধারণত জিনদিক বলে পরিচিত। শব্দটির মূল উৎস কি অথবা এর সুনির্দিষ্ট অর্থই বা কি সে বিষয়ে গবেষকরা নিশ্চিত নন। শাবানের মন্তব্যটি তাই গুরুত্বপূর্ণ। Neither the origin of the term not its derivation can be determined, but this very vaguenes and absence of any common cause among the people who were persecuted lead us to believe that it was a nomenclature intended to cover all those who disagread with Mahdis religious policy.[৪৫] তাদের মতাদর্শ তাদের নিজস্ব সূত্র হতে জানার কোনো উপায় নেই। তাদের বিরোধীপক্ষের একতরফা তাও এলোমেলো বর্ণনা পাওয়া যায়। লিউইস বা হিট্টির মতে ইরানি 'মাজদী' নৈরাজ্যবাদ, ম্যানির সাম্যবাদ ও ইরানি ইসলামের সংমিশ্রিত রূপটাই তথাকথিত জিনদিকবাদ। আমীর আলীর বক্তব্য প্রায় একই প্রকার।[৪৬] এই মতাদর্শ ইরান-ইরাকের ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তাতে সন্দেহ নেই। মাহদীর সময় কেন এ মতাদর্শ দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করে? আমীর আলী এর কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। তবে তিনি বলেন তাদের মতাদর্শে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়, শাসন কর্তৃত্ব দুর্বল করে মানব রিপুকে অবাধ স্বাধীনতা দান করে। আব্বাসী বিপ্লবে আরব-আজম এর মধ্যে আত্তীকরণের আদর্শ ও সাধারণ মানুষের মুক্তির স্বপ্ন সফল না হওয়ার প্রতিক্রিয়াতে এসব আকর্ষণীয় মতাদর্শ প্রসার লাভ করে। বস্তুত প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয় বলে মাহদী এসব মতবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপর কঠোর দমননীতি চালান। তবে

তাঁর এরূপ ব্যবস্থায় আহলুস সুন্নাহ সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মাহদী যে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন আব্বাসী খলিফাগণ এরূপ ধর্মীয় নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন।[৪৭]

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। আব্বাসী সরকারের কর্মচারী ইবনে মুকাফ্ফা আরব সাম্রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন, এতে আরব সাম্রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তা প্রসূত সমাধানের কিছু দিকনির্দেশনাও ছিল। প্রতিবেদনটি তিনি মনসুরের নিকট উত্থাপন করেন। আত্মপ্রত্যয়ী মনসুর প্রতিবেদনটি পাঠ করেছিলেন বলে মনে হয় না তবে মাহদী অবশ্যই তা অধ্যয়ন করেন এবং তার প্রয়োজনীয় অংশ বাস্তবে প্রয়োগ করেন। তিনি পিতার মত স্বেচ্ছাচারী শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায় বিশ্বাস করতেন। প্রাদেশিক সরকারের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সরকারের প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করেন; তদুপরি একজন প্রধান মহা-হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করেন। প্রধান মহা হিসাব পরীক্ষক সরাসরি মাহদীর নিকট দায়ী ছিল। বিভিন্ন হিসাব পরীক্ষকদের মাধ্যমে তিনি দেশে আয়-ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রধান প্রশাসনিক সহকারী ছিলেন একজন উজির বা কাতিব। ঐ সময় শব্দদ্বয় সমার্থবোধক হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার ফলে কোনো শাসনকর্তা বা প্রভাবশালী কর্মচারীর পক্ষে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে তা আত্মসাৎ করার সুযোগ ছিল না।[৪৮] উক্ত প্রতিবেদনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা ছিল। ইবনে মুকাফফা মনে করতেন যে সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপ যুদ্ধবিগ্রহের দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। তাদেরকে বে-সামরিক বিশেষ করে কর নির্ধারণ ও কর আদায় করার কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা উচতি নয়। মনসুরের সময় একই ব্যক্তি সেনাপ্রধান এবং প্রধান কর সংগ্রাহকও ছিলেন। মাহদী এরূপ ব্যবস্থা পরিহার করেন। দুর্ভাগ্যবশত তার উত্তরসূরিরা মাহদীর ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। মাহদী ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি পুলিশ বিভাগ গঠন করেন বেসামরিক সূত্র হতে। তিনি মদিনা হতে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে পুলিশ ও তাঁর দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এ ব্যবস্থাটি চালু রাখতে পারলে পরবর্তীকালের অনেক সংকট এড়ানো আব্বাসী বংশের পক্ষে সম্ভব হত।[৪৯]

আরব সাম্রাজ্যের কর ব্যবস্থায় যে অসঙ্গতি বিদ্যমান ছিল, ইবনে মুকাফ্ফা তাঁর প্রতিবেদনে, তার প্রতি খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রতিবেদনে কর কাঠামোর অসঙ্গতি দূরীভূত করতে এবং মুদ্রাস্ফীতিরোধ করার উপায় অবলম্বনের কথা বলা হয়। মাহদী কর কাঠামোর অসঙ্গতি দূর করার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি, অথবা সেনা বৃত্তির কোনো নয়া বিন্যাস সাধনও করেন নি।

মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রচুর রাজস্ব ঘাটতি হয়—তা তিনি উপলব্ধি করেন। প্রথম আরব বিজয়কালে গৃহীত রাজস্ব কাঠামো বিদ্যমান ছিল; বিজিত দেশে আরবদের

অধিকৃত জমির উপর এক দশমাংশ হারে কর দিতে হত। মুদ্রাস্ফীতির ফলে উক্ত ব্যবস্থায় অবশ্য খাজাঞ্চিখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি; কিন্তু সমস্যা হয় যে জমি অমুসলিমদের হাতে ছিল। মাহদীর যুগে সোয়াদে অনেক কৃষক পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, অথচ তারা পূর্বের মতই কর দিত। এটা ছিল নির্দিষ্ট হারে ফসলে অথবা মুদ্রায় স্থানীয় উৎপন্নের ভিত্তিতে। নগদে নির্দিষ্ট হারে মুদ্রায় প্রদত্ত রাজস্ব পরিবর্তিত অবস্থায় একেবারে নগণ্য হয়ে পড়ে। এ কারণে সোয়াদে মাহদী মুকাসামা বা অংশীদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। The tax was assessed an actual produce and the imposed rates varied from half to one-third according to the method and expense involved in irrigation. বিজিত দেশের উৎপন্ন নানা ফলমুলের উপরও তিনি কর আরোপ করেন। ফলে খাজাঞ্চিখানা বেশ লাভবান হয়। আরব দেশের উৎপন্ন ফসল গম, বার্লি, খেজুর ও আঙ্গুরের উপর কর আরোপ করা হয়। আরবের বাইরে সিরিয়ায় অলিভ ছিল মূল্যবান ফল। আব্দুল মালিকের পূর্বে তার উপর কোনো কর আরোপ করা হয় নি। সোয়াদে নানা ধরনের ফলমুল উৎপন্ন হলেও অনেক দিন ধরে সেগুলি ছিল করমুক্ত। এর সংশোধন করা হয় কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে মাহদী ফারেসে অনেক কর রহিত করেন এবং সোয়াদে কৃষি সামগ্রীর মোকাসামা প্রথার প্রবর্তন করেন। অবশ্য উৎপাদন খরচ বাদে সরকারি শেয়ার নির্ধারণ করা হয়।[৫০]

মিশরে মুদ্রায় খাজনা দেয়ার রেওয়াজ ছিল। মাহদী মিশরবাসীকে দ্বিগুণ হারে খাজনা দেয়ার নির্দেশ দান করেন। এতে তাঁর যুগের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ অনুমান করা যায়। শহরে আমদানিকৃত গবাদিপশুর উপর কর আরোপ করা হয়।[৫১] এ ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলে ভূমি রাজস্বে পরিবর্তনের কথা জানা যায় না। আরব বিজয়ীদের সাথে বিজিত দেশের বশ্যতাচুক্তির শর্তানুসারের তারা কর প্রদান করত। এরূপ ক্ষেত্রে রাজস্ব ব্যাপারে কোনো সংস্কার সাধনের প্রশ্ন উঠত না। মনসুরের মত মাহদী বাগদাদের দোকানের উপর কর আরোপ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কর আদায়ের উপরই গুরুত্ব দেন। রাজস্ব কাঠামো থাকে অপরিবর্তিত। বাগদাদে কোনো নতুন দোকানের উপর তিনি নতুন কর আরোপ করেন মাত্র। রাজস্ব ব্যাপারে মাহদী তার পিতার মতই রক্ষণশীল ছিলেন। মুকাফফার প্রতিবেদনে সেনাবাহিনীকে সর্বদা যুদ্ধাবস্থার মধ্যে রাখার প্রস্তাব ছিল। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে থাকায় মাহদীর জন্য বাইজানটাইন সীমান্তে তার সৈন্য সমাবেশের সুযোগ আসে। ৭৭৮ সালে বাইজানটাইন সীমান্তে গ্রীষ্মকালীন আগ্রাসী অভিযান পরিচালনার কারণে উক্ত সীমান্ত অঞ্চল বেশ গরম হয়ে ওঠে এবং উভয়পক্ষের মধ্যে বৃহদায়তনের যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুত্র মুসাকে রাজ প্রতিনিধি হিসেবে বাগদাদে রেখে স্বয়ং মাহদী খোরাসানী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং বাইজানটাইন অভিমুখে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। রাক্কায় তিনি প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। তাবারির মতে এখান হতে ঈসা বিন মুসা, আব্দুল মালিক বিন সালেহ, হাসান বিন কাহতাবা প্রমুখ সেনাপতিবৃন্দসহ হারুন আর

রশীদের নেতৃত্বে অগ্রগামী বাহিনী বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করা হয়। সালামিয়াসহ বিভিন্ন স্থান আরবদের দখলে আসে। এ অভিযান সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। সীমান্তে শান্তি রক্ষা ও যুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব হারুন আর রশিদের উপর অর্পণ করে মাহদী বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের আরমেনিয়া-আজারবাইজানসহ প্রদেশসমূহের শাসন কর্তৃত্বও হারুনের উপর ন্যস্ত করা হয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ঐ গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে সাফল্যের সাথে যুদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালনার জন্য পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশসমূহের রাজস্ব ব্যয়ের অধিকারও হারুন আর রশিদকে দেয়া হয়। ৭৮১ সালে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ছাড়াও হারুন ৯৭৯৩ জনের এক বিপুল বাহিনী নিয়ে কনস্টান্টিনোপলের বিপরীত দিকে বসফোরাস উপকূলে উপনীত হন। বাইজানটাইনের রাণী আইরিন বারবার পরাজয় স্বীকার করে শান্তি ভিক্ষা করেন। আরবরাও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তিন বছরের জন্য একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বছরে দুবার ৭০ হাজার দীনার কর প্রদানে বাইজানটাইন রাজি হয়। তদুপরি বিজয়ী বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের জন্য পথপ্রদর্শক সরবরাহ করে এবং রসদপত্র সংগ্রহের জন্য সীমান্ত এলাকায় বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই চুক্তি প্রসঙ্গে শাবানের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেন : Indeed this was one of the most peculiar features of Byzantine-Muslim wars in Abbasid times; both armies in thier advance into each other's territories actually bought their Provisions from the enemy. One can only conclude that booty was not primary object in these wars, or that because of the strong holds on both sides of the frontiers, acquiring booty was so difficult that it was only attented in exceptional circumstances.[৫২] পূর্বাঞ্চলে বোখারা কিশ নগরে সোগদীয়রা এবং পুশাঙ গুজগানে হপ্তালী সামন্ত রাজারা ছোট ছোট বিদ্রোহের সূত্রপাত করলে কেন্দ্রের সামান্য সাহায্য নিয়েই সেগুলো অবদমিত করা হয়। এরপর মাহদী ক্যাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী অঞ্চলের প্রতি নজর দেন। ৭৮৩ সালে রাক্কা যুদ্ধ শিবিরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর একটি অংশ হাদীর নেতৃত্বে ক্যাস্পিয়ান অঞ্চলের দিকে প্রেরণ করা হয়। এ অভিযানটি সফল হয়। তাবারিস্তানের শাসক আনুগত্য স্বীকার করেন। রাক্কায় প্রত্যাবর্তনের সময় হাদী তাঁর পিতার মৃত্যুর সংবাদ পান।

উল্লিখিত যুদ্ধাভিযানসমূহের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, মনসুরের সময় সিরিয়া, ইরাক, জজিরা হতে যে সেনা গঠিত হয় তাদের একটি অংশ বাগদাদ হতে রাক্কায় প্রেরণ করা হয়; অপর অংশটি বাইজানটাইন সীমান্তে সেনা নিবাসে (সাগুরে) প্রেরণ করা হয়। ঐ দূরবর্তী অঞ্চলে সেনাদেরকে যাওয়ার জন্য প্রথম দিকে সামরিক বৃত্তি ছাড়াও জায়গীর দেয়া হত। এ সময় অনেকে জায়গীর সাপেক্ষে ঐ অঞ্চলে অভিবাসনের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করে। অবশ্য মনসুরের সময় বসরার আজদ, তাই, হামাদান গোত্রের লোকেরা উক্ত অঞ্চলে

অভিবাসনে আগ্রহ দেখায়। এই অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত আরব অভিবাসনের ফলে বাবেকের নেতৃত্বে স্থানীয়রা বিদ্রোহ করে। দ্বিতীয়ত কয়েক বছরের মধ্যেই আরো পশ্চিমে আরব-বাইজানটাইন সীমান্তে নতুন সেনানিবাস গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তৃতীয়ত দক্ষিণাঞ্চলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মাহদীর পিতৃব্য পুত্র বসরার শাসনকর্তাকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অতিরিক্ত শাসনভাব প্রদান করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারত মহাসাগর দিয়ে প্রবাহিত বাণিজ্যের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করা। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপসাগরীয় পশ্চিম তীরের আরব বেদুইনরা বণিক কাফেলার উপর লুটতরাজ চালায়। এ ঘটনা এ অঞ্চলে নানাবিধ সমস্যার জন্ম দেয়।

মৃত্যুকালে মাহদীর বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। তিনি দশ বছর সুনামের সাথে রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকাল ছিল ঘটনাবহুল এবং তার শাসননীতি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। মাহদীর উপর রাজমহিষী খায়জুরানের প্রভাব ছিল অত্যধিক। তার অনুরোধে সাফ্ফার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসার উত্তবাধিকারের দাবি প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করে খায়জুরানের গর্ভজাত দু-পুত্র মুসা ও হারুনের উত্তরাধিকার ঘোষণা করা হয়।

৩.৪ মুসা আল হাদী (প্রথ-প্রদর্শক) : ৭৮৫–৮৬

পিতার মৃত্যুকালে মুসা জুরজানে ছিলেন। মুসা বাগদাদের খোরাসানী বাহিনীর আদৌ প্রিয়পাত্র ছিলেন না, বরং তাঁর মনে হয়েছিল যে তারা তাঁর উত্তরাধিকারে আপত্তি করতে পারে। হারুন দ্রুততার সাথে পিতার অনুজ্ঞা অনুসারে মুসাকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন এবং স্বয়ং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং বাগদাদ বাহিনীকে দুবছরের সেনাবৃত্তি মঞ্জুর করে মুসার প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করেন। এভাবে পুনরায় আব্বাসী বংশের উত্তরাধিকার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসা আল হাদী হলেন প্রথম খলিফা যিনি খলিফার ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদ সরকারি তহবিল হতে পৃথকীকরণ নীতির প্রবর্তন করেন। তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎস ছিল উমাইয়াদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ এবং বিভিন্ন মুসতাগিল্লা হতে প্রাপ্ত কর। এ সময় মুস্তাগিল্লার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাগদাদ নগরের দোকানসমূহ, বিভিন্ন বাসভবন, সরকারি গোসলখানা, শস্যমাড়াই মিল-কারখানা।

তার অল্পকাল স্থায়ী রাজত্বকালে দুটি ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রথমত মদিনায় আলাভীদের বিদ্রোহটি সহজে দমন করা হয়। তবে নফসুজজাকিয়ার জনৈক ভ্রাতা ইদ্রিস উত্তর আফ্রিকার মৌরিতানিয়ায় পলায়ন করে এবং তার পুত্র ইদ্রিসী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে মাগরীব আল আকসা আব্বাসী সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল আরমেনিয়ায় বিদ্রোহ। এটা ছিল একটি ভয়াবহ ঘটনা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরমেনিয়া ও আজারবাইজানে মাহদীর সময় আরবদের

অভিবাসন প্রক্রিয়া খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাইজানটাইন সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত সেনানিবাসে (সাগুর) অভূতপূর্ব হারে আরবদের পুনর্বাসন স্থানীয় লোকেরা ভাল নজরে দেখে নি বলে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহে ঘৃতাহুতি দেয় এই অঞ্চলে পুরনো বসতি স্থাপনকারী আরবরা। এসব গোলযোগের ফলে খাজাররা পুনরায় মাথা চাড়া দেয়। বিশৃঙ্খল অবস্থা চলতে থাকায় নয়া আরব অভিবাসীদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিয়ে অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হয়।

মুসা আল হাদী প্রায় দু'বছর রাজত্ব করেন– তিনি তাঁর পিতার রাজত্বকালে বর্ধিত অংশ বলেই ধরা হয়। তদীয় ভ্রাতা হারুনুর রশীদ ইতোপূর্বেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছিলেন।

তথ্যপুঞ্জি

১. সৈয়দ আমীর আলী,
২. ঐ পৃ. ১৭২
৩. ঐ পৃ. ১৭২-৭৩
৪. ঐ পৃ. ১৭৩
৫. ঐ পৃ. ১৭৪
৬. ঐ পৃ. ১৭৫
৭. M.A. Shaban, Islamic History of (Cambidge.
৮. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত ১৭৬-৭৭
৯. ঐ পৃ. ১৭৮-৭৯
১০. ঐ পৃ. ২০৪-৫
১১. ঐ পৃ. ২০৫
১২. Shaban op at p. 2
১৩. Ibid. p. 203
১৪. Ibid. p. 3
১৫. Ibid. p. 6
১৬. Ibid. p.p. 6-7
১৭. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৮,৯
১৮. Shaban op cit p.p. 7, 8
১৯. Ibid. p. 8
২০. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২১৪-১৭
২১. Shaban op cit. P.14, 15
২২. Ibid . P. 8
২৩. Hitti op at p.p. 244-9, Shaban. P. 8
২৪. Ibid. p.p. 292-93
২৫. Shaban op cit. p. 9

২৬. Ibid. p. 9-10
২৭. Ibid. p. 10-11
২৮. Ibid. p 11
২৯. Ibid p. 12
৩০. Ibid . p. 12-13
৩১. Ibid. p. 13-14
৩২. Ibid. p. 15
৩৩. Ibid. p. 15. 16
৩৪. Ibid. p. 16
৩৫. Ibid. p 16 17
৩৬. Ibid . p 18
৩৭. Ibid. p. 19
৩৮. Hitti op cit. p p. - 308-9
৩৯. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৪
৪০. ঐ পৃ. ২২৪
৪১. Shaban. op cit. P. 21
৪২. Ibid. p. 21
৪৩. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৫
৪৪. ঐ পৃ. ২২৬
৪৫. Shaban op cit. p. 22
৪৬. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৬-২৭
৪৭. Shaban op cit. p. 22
৪৮. Ibid. cit. p. 22
৪৯. Ibid. p p. 22-23
৫০. Ibid. p.p. 23-24
৫১. Ibid. P. 24
৫২. Ibid. p. 25

চতুর্থ অধ্যায়

খলিফা হারুনুর রশীদ (৭৮৬—৮০৯ খ্রি.)

৪.১ ভূমিকার বদলে

মাহদীর অনুজ্ঞা অনুসারে ভ্রাতা আল-হাদীর মৃত্যুর পর হারুন খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। তার উপাধি ছিল আর রশীদ বা ন্যায়পরায়ণ। নিঃসন্দেহে তৎকালীন সভ্য বিশ্বের তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিখ্যাত অগ্রগামী সংস্কৃতিবান নৃপতি। আরব্য-রজনীর প্রভাবে তাকে কেন্দ্র করে যে চটকদার রোমাঞ্চকর কল্প-কাহিনী গড়ে উঠেছে তা ভেদ করে তাঁর রাজত্বকালের ঘটনা প্রবাহের সঠিক চিত্র অঙ্কন আধুনিক ঐতিহাসিকের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য। শাবানের মতে, অনেকে এ কাজে অগ্রসর হয়েও তাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন নি।[১] অথচ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের আলোকে তাঁর শাসনকালের চিত্র না আঁকতে পারলে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক বিকাশধারা অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব। সন্দেহাতীতভাবে তার সম্পর্কে যে কথাটি বলা যায়, তা হল তিনি তার পিতা ও পিতামহের রাষ্ট্রীয় নীতিমালাই অনুসরণ করেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর নীতিমালার বিকাশ ঘটান। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি প্রগতিশীল হলেও আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিতা ও পিতামহের মতই রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতার, বদান্যতা, প্রজারঞ্জন ইত্যাদি অসংখ্য সাধুবাদে যেসব ঐতিহাসিক তাঁকে ভূষিত করেন, তাঁরাই পুনরায় বারমেকি বংশের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরতায় হতবাক হয়ে যান। তারা ঐ ঘটনার কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যাখ্যা নিতে ব্যর্থ হন। তার মৃত্যুর পর পরই আমিন-মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ কি আকস্মিক ব্যাপার ছিল? এটা কি কেবল দু-ভ্রাতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব, না তার পশ্চাতে একাধিক পরস্পরবিরোধী সামাজিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল? হারুনের গৃহীত নীতি-ই বা কতটুকু দায়ী ছিল? এসব প্রশ্ন উঠতে পারে।

তিনি তার পিতার মত স্বদিচ্ছা নিয়েই সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলাবী ও অন্যান্যদের প্রতি তিনি শুভেচ্ছা ও সমঝোতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। পূর্বসূরিদের মত তিনিও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ক্ষমতায় আরোহণ করার পর পরই তিনি হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা-মদিনা ভ্রমণ করেন এবং প্রজাবর্গের মধ্যে প্রচুর উপঢৌকন বিতরণ করেন।[২] ভ্রাতা আল হাদী কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত ইয়াহইয়া-বিন-খালেদ বারমেকিকে মুক্তিদান করেন এবং সরকারি উচ্চপদে নিয়োগ করেন। বারমক পুত্রগণ কেবল রাজদরবারে যথাযোগ্য সমাদৃত হন নি বরং সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের অবিস্মরণীয় অবদান রাখার পথও সুগম হয়। রাজমাতা খায়জুরানের প্রতি ভ্রাতা হাদীর বৈরী ব্যবহার পরিত্যাগ করে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেন।

পবিত্র কাবাগৃহ হতে প্রত্যাবর্তন করেই হারুন-আর-রশীদ সাম্রাজ্যের বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। মাহদীর সময় আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে যে অভ্যন্তরীণ সমস্যার উদ্ভব হয়, হারুন সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ঐ অঞ্চলের বিশৃঙ্খল অবস্থা শুক্রপক্ষকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করতে উৎসাহিত করে। হারুনের সিংহাসন আরোহণকালে মাহদী কর্তৃক সম্পাদিত আরব-বাইজানটাইন শান্তি প্রতিষ্ঠার মেয়াদও শেষ হয়ে আসে। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি বিরুদ্ধ পক্ষ শত্রুতা করার পায়তারা করে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এরূপ সম্ভাব্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য হারুনের পক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণ করাই ছিল স্বাভাবিক। পিতার জীবদ্দশায় তিনিই বাইজানটাইন সমস্যার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সম্ভাব্য পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিনি আপনাকে প্রস্তুত করেন। আব্বাসী বংশের পরম সুহৃদ ইয়াইয়া বিন খালেদ বরমককে উজির পদে নিয়োগ করে দেশ শাসনের পুরোপুরি দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেন।[৩]

৪.২ তাঁর প্রাথমিক সমস্যাবলী

সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থে বাইজানটাইনের সাথে হারুনের সম্পর্কের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে লেখা হয়, অথচ তার মূল সমস্যাটি হয় উপেক্ষিত। এ সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে কয়েকটি অভ্যন্তীণ ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে। বিষয়গুলি (ক) খারেজী বিদ্রোহ ও মসুল প্রাচীর ধ্বংস; (খ) আলাবীদের প্রতি তার আচরণ; (গ) আফ্রিকার সমস্যা।

ন্যায়পরায়ণ হারুনের রাজত্বের প্রথম দিকে খারেজী সম্প্রদায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রভাব বলয়ে যথারীতি বিদ্রোহ করে। প্রতিটি বিদ্রোহ অতি সহজে অবদমিত হয়। খারেজী নেতা ওয়ালিদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহটি দমন করতে সরকারি বাহিনীর বেশ বেগ পেতে হয়। ওয়ালিদ একই সাথে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে এক ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেন। অবশেষে রাজকীয় বাহিনীর হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ইবনুল খাল্লিকানের বর্ণনা অনুসারে ওয়ালিদের পর লায়লা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে চমক লাগিয়ে দেন।[৪] অবশ্য মধ্যযুগে ইসলামি উম্মায় এরূপ নারী নেতৃত্ব কোনো বিরল ঘটনা নয়। হযরত আয়শা ও হযরত আলীর বিরুদ্ধে উষ্ট্রযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাতে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি। যা হোক ভ্রাতার মৃত্যু লায়লাকে শক্তি যোগায়। বারবার তিনি রাজকীয় বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। অবশেষে রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতি এবং লায়লার আত্মীয় ইয়াজিদ-বিন-মাজাইদ তাকে পরাজিত করেন এবং তাকে অস্ত্র ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে প্রবৃত্ত করেন। লায়লা কেবল শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন নি-তিনি তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুতে অভিভূত হয়ে শোকগাথা রচনা করেন, এবং পরে কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি

অর্জন করেন। সৈয়দ আমীর আলী তাঁকে আব্বাসী যুগে আরব্য জোয়ান-অব-আর্ক বলে অভিহিত করে এক নতুন চমক দিয়েছেন।[৫]

মৌসুল নগরে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করা হয় এবং মসুল প্রাকাররাজি ধ্বংস করা হয়। দামাস্কাসে মুদার ও হিমারের মধ্যকার কলহও কঠোর হাতে দমন করা হয়।[৬]

সৈয়দ আমীর আলী শিয়া ইমাম মুসা আল কাজিমের কথা গুরুত্বের সাথে বলতে গিয়ে ন্যায়পরায়ণ হারুনের চরিত্রের সন্দিগ্ধচিত্ততার চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সন্দিগ্ধচিত্ততা মূলত স্বৈরাচারের মূল প্রবণতা; ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে তা বিবেচ্য হওয়াই সঠিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে হারুন আলাবীদের প্রতি তার শুভেচ্ছার কথা ঘোষণা করেন; কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা খুবই কঠিন। শিয়া সম্প্রদায় প্রায়শ বিদ্রোহ করে। বস্তুত আব্বাসী বংশ ন্যায়সঙ্গত কারণে শিয়া বিদ্রোহ সম্পর্কে সর্বদাই আতঙ্কিত থাকত। হারুনের সময় ইয়াহইয়া আলাবী দায়লাম অঞ্চলে বিদ্রোহ করেন। নিঃসন্দেহ শিয়া ইমাম মুসা আল কাজিম মদিনায় সম্মানিত পণ্ডিত ও সাধুব্যক্তি ছিলেন। একজন স্বৈরাচারী কখনো কোনো ব্যক্তির জনপ্রিয়তা পছন্দ করতে পারেন না। হারুন মুসা-আল-কাজিমকে হেজাজ হতে বাগদাদে আনেন এবং তাঁকে কারাগার অধ্যক্ষ সিন্দী ইবনে মাহিকের ভগ্নীর জিম্মায় দেন। ইমাম উক্ত মহিলার সশ্রদ্ধ সেবা-যত্নে থাকলেও তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ৭৯৯ সালে ঐ মহিলার গৃহে মৃত্যুবরণ করেন।[৭]

উমাইয়া শাসিত স্পেনে কখনো আব্বাসী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মৌরিতানিয়া আব্বাসী সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং ইদ্রিসী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইফ্রিকিয়াও বহুদিন অশান্ত থাকে; হারুন সেখানে শান্তি স্থাপনের জন্য বিখ্যাত সেনাপতি হারসামাকে প্রেরণ করেন। তিনি প্রায় তিন বছর ধরে ইফ্রিকিয়ায় শান্তি রক্ষা করেন বটে: কিন্তু সেখান হতে কোনো রাজস্ব সরকারি খাজাঞ্চিখানায় জমা হওয়া তো দূরের কথা বরং মিশর হতে বছরে একলাখ দিনার প্রেরণ করা হতো। এমতাবস্থায় দক্ষিণ আলজেরিয়ার শাসনকর্তা ইব্রাহিম বিন আগলাব হারুনের নিকট প্রস্তাব পাঠান যে, যদি তাকে বংশানুক্রমিক শাসনভার অর্পণ করা হয় তাহলে তিনি ইফ্রিকিয়ায় কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাই করবেন না, উপরন্তু বার্ষিক ৪০ হাজার দিনার রাজস্ব বাগদাদে পাঠাবেন। হারুন এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আগলাবী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে আফ্রিকার আরো একটি অঞ্চল কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজ্যের কেন্দ্রীভবন এবং বিচ্ছিন্নতার দ্বন্দ্বে কখনো কেন্দ্রীভবনের কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদের জয় হয়।

৪.৩ তাঁর বাইজানটাইন নীতি

ঐতিহাসিকগণ বাইজানটাইন শক্তির সাথে হারুনের যুদ্ধাভিযানকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্মকাণ্ড বলে চিহ্নিত করেন। একথা অনস্বীকার্য যে, হারুন ছিলেন বড় মাপের সমর

কুশলী এবং বাইজানটাইন শক্তির সাথে তার যুদ্ধের মধ্যে তা প্রমাণিত হয়। পিতা মাহদী তাব যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর সময় বাইজানটাইন অভিযানে হারুনকে সেনাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন। তিনি সেখানে বড় রকমের সাফল্য অর্জন করলে শক্রপক্ষ শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। হারুনুর রশীদ ক্ষমতায় আরোহণ করেন বাইজানটাইন সমস্যা নিয়ে। তাই তার ক্ষমতারোহণের প্রথম হতে তিনি ঐ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্বয়ং বাইজানটাইন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা ইয়াহইয়া বার্মেকির হস্তে অর্পণ করেন। তার প্রধান কার্যালয় তিনি বাগদাদ হতে রাক্কায় স্থানান্তরিত করেন, কেননা এতে সীমান্তের উপর সর্তক দৃষ্টি রাখা সম্ভব ছিল। বস্তুত তাব অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতি অনেকাংশে নির্ধারিত হয় তার বাইজানটাইন নীতি দ্বারা। তার রাজত্বকালে প্রথম চার বছর অর্থাৎ ৭৮৬ হতে ৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি তার সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রাখার জন্য আপনাকে কেবল প্রতিবক্ষামূলক অবস্থানে রাখেন। এই সময়ে ঐ অঞ্চলে নযা সামরিক সংগঠনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁব পিতার সময় বাইজানটাইন সীমান্ত জুড়ে সেনা উপনিবেশ (বা সাগুর) প্রতিষ্ঠিত করে যে শক্তিশালী প্রতিবক্ষা ব্যূহ বচনা করা হয়েছিল সামরিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে এ সময় তা অনেকখানি অকেজো হয়ে পড়ে। এই সামরিক উপনিবেশগুলো সামরিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে। আববি সৈনিকরা শক্রর সাথে যুদ্ধ বা সীমান্ত রক্ষার চাইতে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পুনর্বাসনে উৎসাহী হয়। সীমান্ত অঞ্চলটি মূলত উভয় দেশের পণ্য বিনিময়ের জন্য বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। বস্তুত অঞ্চলটি করমুক্ত এলাকায় পরিণত হয। শক্রপক্ষকে সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশে বাধা না দিয়ে বরং তাদের গমনাগমনে উৎসাহিত করা হয়। এ অঞ্চলে সামরিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করার জন্য আববদেরকে জমি দেয়ায় ধীরে ধীরে অঞ্চলটি করমুক্ত হয়ে যায়। তারা তাদের অবসর সময় ফসল ফলনোর প্রতি মনোনিবেশ করে এবং তাদের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত ফসল জমা হয়; যার জন্য তাদের দরকার ছিল বাজারের; বাইজানটাইন-ই ছিল এরূপ প্রয়োজনীয় বাজার। উভয় দেশের সীমান্তে পণ্য লেনদেনের ফলে আরব সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ কারণেই হারুন উত্তর সীমান্তের ঐ সকল প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তুরাস পর্বতমালার দক্ষিণ ঢালে তারসুস আলেপ্পোর মাঝে নতুন প্রতিরক্ষা লাইন গঠন করেন। এই নতুন সামরিক ঘাঁটিকে সাগুর না বলে বলা হয় আওয়াসিম। These were a Chain of defensive position established along with this line the main base at the town of Manbiz in Charge of which he appointed Abdul Malik bin-Salih.[৮]

তারসুস দুর্গ নবায়ন করা হয় এবং বদলি ভিত্তিতে তিন হাজার খোরাসানী সৈন্য সমাবেশ করা হয়। পরিত্যক্ত ম্যাসিসা ও এন্টিওক দুর্গ হতে দু'হাজার সৈন্য এখানে

নিয়ে আসা হয়। তাদের অতিরিক্ত দশ দিনার বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়; গৃহায়নের জন্য জমি প্রদান করা হয়; কিন্তু তাদেরকে ফসলি জমি দেয়া হয় নি। কেননা তারসুস ছিল শত্রুর তোপের মুখে। এ অবস্থা অন্যান্য নয়া সেনা উপনিবেশে করা যায় নি। প্রতিকূল অবস্থা দেখে অনেকে স্বেচ্ছায় সাগুর ত্যাগ করে আওয়াসীমে চলে আসে। যারা সাগুরে থেকে যায় তাদেরকে কর দিতে হয়। এ অবস্থায় অনেকে অসন্তুষ্টই হয়। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে নতুন করে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

তারসুসের নতুন আওয়াসিমে ৭৯০ সালে আব্দুল মালিক বিন সালেহ্ সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সামরিক ঘাঁটি মাব্বিজ হতে প্রতিবছর প্রথাগত গ্রীষ্ম অভিযানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সাগুরের বাণিজ্য বা কার্যকলাপে আওয়াসিমে পুনরাবৃত্তি হয় তবে এর উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ ছিল।

৭৯১ সালে বাইজানটাইন সম্রাজ্ঞী স্বয়ং তার স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করলে তার সমুচিত জত্তয়াব দেন হারুন। এ পর্যায়ে সাইপ্রাস ক্রীট দ্বীপ পুনরাধিকার করা হয়। সমূহ্ বিপদে আতঙ্কিত হয়ে আইরিন (৭৯৭–৮০) পুনরায় কর প্রদানের শর্তে আর একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। রাণী আইরিনকে পদচ্যুত করে ৮০২ সালে নাইসিফোরাস বাইজানটাইন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং উক্ত চুক্তি উপেক্ষা করে ৮০৩ সালে হারুনকে এক অপমানজনক পত্র লেখেন। সৈয়দ আমীর আলীর মতে পত্রের ভাষা ছিল নিম্নরূপ: রোমক সম্রাট নাইসিফোরাসের নিকট হতে আরবদের রাষ্ট্রপ্রধান হারুনের নিকট। "সত্যিই আমার পূর্ববর্তী সম্রাজ্ঞী তোমাকে দাবার কিশতির আসনে বসিয়েছেন আর নিজেকে স্থাপন করেছেন বোড়ের আসনে এবং তার বিস্তর ঐশ্বর্য তোমার কাছে পাঠিয়েছে, আর তা ঘটেছে তার রমণীসুলভ দুর্বলতা আর নির্বুদ্ধিতার জন্য। এক্ষণে তুমি পত্রপাঠমাত্র তার নিকট হতে গৃহীত সমুদয় সম্পদ প্রত্যাবর্তন কর, অন্যথায় তরবারি-ই তোমার ও আমার মধ্যে সীমাংসা করবে।

হারুন-আর-রশীদ তৎক্ষণাৎ উক্ত চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লেখেন: আমীরুল মোমেনিন হারুনের নিকট হতে রোমক কুকুর নাইসফোরাসের নিকট যথার্থই আমি তোমার চিঠি পড়েছি; জবাবটা চোখেই দেখবে, কানে শুনবে না। সদা প্রস্তুত হারুন তৎক্ষণাৎ সসৈন্য যাত্রা করেন এবং বাইজানটাইনের শক্ত ঘাঁটি হিরাক্লিয়াসে পৌঁছে যান। এখানে উভয় পক্ষ মুখোমুখী হলে নাইসিফোরাস শোচনীয় পরাজয় বরণ করে শান্তি প্রার্থনা করেন এবং বর্ধিত কর নিয়মিতভাবে প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। বিজয়ী খলিফা রাক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। শান্তিচুক্তির কালি শুষ্ক হওয়ার পূর্বেই নাইসিফোরাস চুক্তির ধারা ভঙ্গ করেন। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে তুরাস পর্বতের তুষারপুঞ্জ অতিক্রম করে হারুন অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুতগতিতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এবারও শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ করে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেন। সম্রাট পুনরায় শান্তি প্রার্থনা করেন। হারুন পুনরায় আর একটি সম্মানজনক চুক্তি সম্পাদন করেন। পুনশ্চ বাইজানটাইন শান্তিচুক্তি

করলে পুনরায় আর একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। হারুন শত্রুর অপরাধ মার্জনা করেন। খলিফা যখন তারাবিস্থান ও দাইলামে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ঠিক ঐ সময় পুনরায় নাইসিফোরাস অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন। এবার হারুন রোমকদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। একশ পয়ত্রিশ হাজার বেতনভুক্ত সৈনিক ছাড়াও অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী এই যুদ্ধে যোগদান করেন। খলিফার বাহিনী উত্তরে বিথিনিয়া পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া মাইনর এবং পশ্চিমে মেসিয়া ও কারিয়া পর্যন্ত দখল করে নেয়। মাকাল্লিয়া, থিবাসা, মালিকোপিয়া, আইভারো পলিস, নাইসিয়া এবং হিরাক্লিয়াস আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৯]

উপরের বর্ণনা হতে এটা স্পষ্ট যে, বাইজানটাইন সরকার বারবার চুক্তি ভঙ্গ করে, খলিফা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শুত্রুপক্ষ শান্তি ভিক্ষা করলে হারুন সর্বদাই ক্ষমা করেন বলে আমীর আলী হারুনের এরূপ আচরণকে অদূরদর্শী বলে মনে করেন এবং বলেন যে, হারুন কনস্টান্টিনোপল দখল করলে শান্তি ও সভ্যতার পক্ষে অশেষ মঙ্গল হত। বাইজানটাইন শক্তির বিরুদ্ধে হারুনের অসংখ্যবার যুদ্ধাভিযান এবং প্রতিবারেই এত গৌরবময় বিজয়ের পরও তিনি কেন কনস্টান্টিনোপল দখল করেন নি, এরূপ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এ কারণেই আধুনিক গবেষকগণ হারুনের বাইজানটাইন নীতি সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তাহলে কি তার রণনীতি ও রণকৌশল তার নিকট অস্পষ্ট ছিল? সম্ভবত কোনো পক্ষেরই রণনীতি বা রণকৌশল সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা ছিল না বরং উভয় পক্ষই স্ব স্ব বাস্তব অবস্থা সর্ম্পকে সচেতন ছিলেন। হারুনের নিজস্ব সাম্রাজ্য ছিল অশান্ত, অস্থিতিশীল। তার পক্ষে সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করা ছিল বিলাসিতামাত্র। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের নানা সমস্যা ছিল। নবম শতাব্দীতে ইউরোপে চলছিল ধর্মীয় ও নয়া রাজনৈতিক আন্দোলন। জর্মন জাতিসত্তাসমূহ ইউরোপের নয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং হোলী রোমান সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নে বিভোর। বিকাশমান আদর্শগত সংগ্রামে ফ্রাংক ও বাইজানটাইন পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। বস্তুত এসব বিষয় বিবেচনা করলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে তাদের মধ্যকার যুদ্ধের চরিত্র ছিল সীমান্ত দ্বন্দ্বমাত্র; কোনোক্রমেই আগ্রাসী বা সাম্প্রসারণবাদী যুদ্ধ নয়। হারুন সাগুরের পুনর্গঠনের অনুমতি দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাইজানটাইনের বিরুদ্ধে কেবল তিনি সামরিক অভিযান-ই চালান নি বরং সেই সাথে কূটনৈতিক অভিযানও চালান। জাব যুদ্ধের পর উমাইয়ারা স্পেনে তাদের বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এবং স্পেনকে তারা একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী বিশ্বসংস্কৃতি কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে। স্পেনীয় উমাইয়াদের সাথে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় শক্তির ছিল প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। ফ্রাঙ্কীয় শক্তির সাথে বাইজানটাইন শক্তির মধ্যেও ছিল বিরোধ। হারুন ইউরোপের এই বাস্তব অবস্থার সদ্ব্যবহার করেন।

তিনি ফ্রাঙ্কীয় সম্রাট বিখ্যাত শার্লিম্যানের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন।[১০] শত্রুপক্ষ উমাইয়া ও বাইজানটাইনের বিরুদ্ধে তার এই মৈত্রী সম্পর্ক কাজে লাগানোর ইচ্ছা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শার্লিম্যানেরও একই প্রকার স্বার্থ চেতনা ছিল।

শার্লিম্যান যদি হারুনকে বাইজানটাইনের বিরোধিতায় উৎসাহিত করে থাকেন- সেটাই স্বাভাবিক; বাইজানটাইন তাই বারবার প্রতিটি সুযোগে সীমান্ত অঞ্চল অশান্ত রাখতে তৎপর ছিল। এ কারণে অনেকে মনে করেন, এটা ছিল কেবল সীমান্ত বিরোধ; কেউই সম্ভবত বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পরস্পরের সামাজ্য দখলের কথা চিন্তাও করত না এবং এরূপ কল্পনাও সম্ভবত কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহলে কি হারুন বাইজানটাইন ভূত দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন? শার্লিম্যান ও হারুন তাদের পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উভয় দেশের মধ্যে দূত বিনিময় এবং উপঢৌকন আদান-প্রদানের অনেক খবর পাওয়া যায়। হারুন শার্লিম্যানকে জমকালো পোশাক, সুগন্ধি দ্রব্য প্রেরণ করেন, এবং এই মৈত্রী দূতাবলী ৭৯৭-৮০৬ খ্রি. পর্যন্ত চলে।

আধুনিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, তার জীবনের কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালিত হয় প্রধানত বাইজাইনটাইন প্রশ্নকেন্দ্রিক; এবং সমগ্র জীবনের মূল্যবান সময়গুলো কাটে সমর ক্ষেত্রে।

জন সেবায় হারুন

বাইজানটাইন সীমান্ত সমস্যা ব্যতীত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান দমনেই তাঁর জীবন কেটে যায়। তার জীবন শুরু হয় যুদ্ধ দিয়ে আবার জীবন অবসানও হয় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। জীবনের শেষ প্রান্তে খোরাসানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৮০৮ সালে সসৈন্য রাক্কা ত্যাগ করে তুস নগরের নিকট সানবাদে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দেখা যায় তার সময় কখনো শিয়া বিদ্রোহ, কখনো খারেজি বিদ্রোহ, কখনো খাজার বিদ্রোহ ছাড়াও তোখারিস্তান তাবারিস্থান অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র গোলযোগ লেগে থাকত। এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও তিনি অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। বিদ্যালয়, মসজিদ, রাস্তা, হাসপাতাল, সরাইখানা, সেতু নির্মাণ ইত্যাকার কাজ, মক্কা-মদীনায় তার বদান্যতার কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। আর রাজমহিষী জোবাইদাও অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। একবার হজে গিয়ে সেখানে পানির কষ্ট দূরীভূত করার জন্য একটি খাল খনন করার ব্যবস্থা নেন যা নাহারে জোবাইদা নামে খ্যাত।

এতদ্‌সত্ত্বেও শান্তি সুদৃঢ় হয় নি। তাঁর সাম্রাজ্যে শান্তি সুদৃঢ় হয় নি কেন? সম্ভবত তার একমাত্র জওয়াব তিনি ছিলেন সামরিক প্রতিভা, প্রশাসনিক প্রতিভা ছিলেন না। পরিবর্তিত অবস্থার কথা না ভেবে সনাতনী পদ্ধতিতে তাঁর স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে চেষ্টা করেন সামরিক শক্তি দিয়ে। এ কাজ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যে আর্থ-সামাজিক নৈরাজ্য ও অশান্তি-ই বৃদ্ধি পায়। তার সমাধানের বীজ নিহিত ছিল প্রশাসনিক ও কর কাঠামোর আমূল সংস্কারের মধ্যে—সেদিকে তিনি পা মাড়ান নি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি নির্ভর করেছিলেন বার্মেকীদের উপর। তারা রাজপরিবারকে আন্তরিকতার সাথে সেবা করে; কিন্তু জনতার নয়। তাদের পক্ষে আর্থ-সামাজিক সংস্কারের কাজ ছিল অসম্ভব। হারুনের জীবনে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।

৪.৪ তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

ন্যায়পরায়ণ হারুন রাজমহিষী জুবাইদার প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেন নি। খলিফা তাঁর এবং তাঁর ভ্রাতা ইসা বিন ফাজরের অনুরোধে মাত্র পাঁচ বছর বয়স্ক পুত্র মোহাম্মদকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তার এ কাজ আদৌ যুক্তিসঙ্গত হয় নি বরং তা শোধরানোর জন্য সাত বছর পর ৭৯৮ সালে তার যোগ্যপুত্র আব্দুল্লাহ্‌কে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। তবে এ সময় একটি শর্ত আরোপ করা হয়। আমিনের মৃত্যুর পরই তিনি খিলাফতে সমাসীন হবেন। আব্দুল্লাহ্‌কে আল-মামুন (বিশ্বাসী) উপাধি দান করা হয়। পরবর্তীকালে স্বীয়পুত্র কাশিমকে আল-মুতাসিম উপাধি দিয়ে মামুনের উত্তরাধিকার দেয়া হয়। খলিফা হারুন কেবল তাঁদের মনোনয়ন দিয়ে ক্ষান্ত হন নি তিনি তার জীবদ্দশায় প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যকে তিনভাগে ভাগ করে পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার আমিনের উপর, পূর্বাঞ্চলের শাসনভার মামুনের এবং মেসোপটেমিয়া ও সীমান্ত অঞ্চলগুলি কাশেমের উপর অর্পণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মামুনের প্রতি পিতার বিশ্বাস থাকায় প্রয়োজনবোধে কাশেমকে তার উত্তরাধিকার হতে অপসারণ করার অধিকারও মামুনকে দেয়া হয়। মামুনের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় জাফর-বিন-ইয়াহিয়ার উপর। এই ব্যবস্থায় হারুন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি; বরং অস্বস্তিবোধ করছিলেন বলে ৮০২ সালে আমিন ও মামুনকে নিয়ে হজব্রত পালন উপলক্ষে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। তাঁর মনোনয়ন ব্যবস্থা মেনে চলার অঙ্গীকার সম্বলিত দু'ভাইয়ের সম্পাদিত দুটি দলিল কাবাগৃহে গচ্ছিত রাখা হয়।[১১] এ সব সতর্কতা সত্ত্বেও তার মৃত্যুর পর পরই তার এই ব্যবস্থাপনা আরব সাম্রাজ্যকে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে ঠেলে দেয়। এ ঘটনার মধ্যে আর যাই হোক তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে না।

৪.৫ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে হারুন

এ সময় ইসলামি উম্মার কলেবর অনেক বৃদ্ধি পায়। আব্বাসী বিপ্লবের ফলে নানা ভাষাভাষী ও নানা জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম সম্প্রসারিত হওয়ায় নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং এ সমস্যা মৌলিকভাবে প্রাথমিক যুগের সমস্যা হতে ভিন্নরূপ ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং উমাইয়া যুগের আর্থ-সামাজিক মূল সমস্যা হতে সৃষ্টি হয় শিয়া, খারেজী, কাদবী, জাবারী, মোরজীয়া নামক মতবাদ। এদের প্রথোমক্ত তিনটি দল ছিল উগ্রপন্থী এবং পরবর্তী দুটি রক্ষণশীল। এসব দল এককভাবে কখনই সমগ্র উম্মার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। আব্বাসী বিপ্লব সফল হওয়ায় সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হয় এবং ইসলামি উম্মার কলেবর বৃদ্ধিতে তার ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, নৈতিক ইত্যাকার নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। নয়া সমস্যা সমাধানে এক ঝাঁক বুদ্ধিজীবী আত্মনিয়োগ করেন। তারা

কোরআন-সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, উপমা, সাদৃশ্য অনুমান, অবরোহ-আরোহ এক কথায় ইজতিহাদ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান দেন। সমস্যা সমাধানের এরূপ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে গড়ে উঠে বিভিন্ন মাযহাব বা আইন পদ্ধতি। ছোট ছোট ব্যাপারে এদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও মৌলগত ও আদর্শগত ব্যাপারে এদের মধ্যে ছিল ঐকমত্য। এবং এরাই উম্মার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এদেরকে বলা হয় আহুলুস সুন্নাহ। মনসুর এদের শিয়া ও খারেজীদের বিপরীতে সংগঠিত হতে উৎসাহিত করেন। হারুনের আমলে মদিনায় মালেক ইবনে আনাস মালেকী মাযহাব এবং আব্বাসীদের প্রথম যুগের প্রধান কাজী আবু ইউসুফ হানাফী মাযহাবের বাস্তব রূপদান করেন। হারুন এদেরকে পৃষ্টপোষকতা দেন।[১২] আহলুস সুন্নাহর সংগঠক বুদ্ধিজীবীরাই ছিল হারুনের একটি বড় সামাজিক শক্তি। আমীর আলীর মতে, প্রথমদিকে ঐ বৃদ্ধিজীবী সামাজিক শ্রেণী উম্মার উন্নতি ও প্রগতির জন্য সহায়ক শক্তি ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্বল খলিফাদের আমলে এই শ্রেণী ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ করে উম্মার মধ্যে স্থবিরতা আনে। এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জোরদার হয়। সম্ভবত আমীর আলী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে উল্টোভাবে দেখেছেন। কারণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সৃজনশীল মননশীলতার মূল উৎস এবং সৃজনশীল মননশীলতা বাস্তব অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে পারে। আর্থ-সামাজিক স্থবিরতা জন্ম দেয় মানসিক বন্ধ্যাত্ব, যা হতে গড়ে উঠে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তি। নিঃসন্দেহে হারুনের সময় ইসলামি উম্মার প্রগতির যুগ। এই যুগে ধর্মীয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা সাহিত্যের প্রভৃত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত বিশ্ব সভ্যতায় আব্বাসীদের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে তার সূচনা করেন মনসুর। অধিকতর বিকশিত করেন হারুন এবং পূর্ণতা দান করেন মামুন। মধ্যযুগে প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হতে বসেছিল। আব্বাসী যুগের সূচনায় আল মনসুর তার সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হারুন তাকে আরো বিকশিত করেন। হারুনের যুগে কেবল ধর্মবেত্তা বা আইন বিশেষজ্ঞরাই তাঁর দরবার উজ্জ্বল করেন, তাই নয়, তার দরবারে সমবেত হন সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বৈয়াকরণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, জ্যোতিষী এমন কি ভাড়, চাটুকার ও হাস্যরসিক ব্যক্তিরাও। বিভিন্ন দেশ হতে সংগৃহীত মূল্যবান পুস্তকের আরবিতে অনুবাদ করার কার্যক্রম চালু করা হয়। আল-ফজল-বিন নওবখত জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেকগুলো পুস্তকের অনুবাদ করেন। হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ-আল-মাতা ইউক্লিডের *এলিমেন্ট*, *টলেমীর আল-মাজেস্ট্রা* অনুবাদ করেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণ আসমাই শফিই, আব্দুল্লাহ-বিন-ইদ্রিস, যুগশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ইব্রাহিম মৌসুলী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসাবিদ বখতিশু পুত্র জিব্রাইল তার দরবারের উজ্জ্বল তারকা ছিলেন। হারুন স্বয়ং তার প্রেমিকা হেলেনা সম্পর্কে দু'চারটি কাব্যকলি রচনা করে কবি খ্যাতি অর্জন করেন। কবি আবু নওয়াস এবং আবুল আতাহিয়াকে তিনি পৃষ্টপোষকতা দান

করেন। মুসলিম ওয়ালিদ স্তুতিবাদ লেখার জন্য পুরস্কৃত হন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সমমর্যাদা ও সম্মান দান করে তিনিই প্রথম সঙ্গীতকলাকে এক অভিজাত পেশায় উন্নীত করেন।[১৩] বস্তুত মধ্যযুগে তাঁর দরবার ছিল আড়ম্বরপূর্ণ-সেখানে জ্ঞানী গুণীরা সমাদৃত হয়ে এক নয়া সংস্কৃতি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। দোষগুণে মিশ্রিত হারুন ছিলেন একজন মহান সংস্কৃতিবান আলোকিত স্বৈরাচারী নৃপতি। যুগের মাপকাঠিতে তাঁকে মূল্যায়ন করাই হবে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস।

৪.৬ বারমেকী বংশের উত্থান

ন্যায়পরায়ণ হারুনের রাজত্বকালে বারমেকী বংশের পতন একটি বড় ঘটনা। এ বংশের পতনের বিশ্লেষণ ব্যতীত হারুন যুগের ইতিহাস কেবল অপূর্ণই থাকে না, এ যুগের বাস্তব অবস্থাটি অজ্ঞাত থেকে যায়। সৈয়দ আমীর আলীসহ সকল ঐতিহাসিকই মনে করেন যে, ঐ বিখ্যাত বংশটি সতের বছর ধরে আরব সাম্রাজ্য পরিচালনায় হারুনকে কেবল অবিচল নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সাথে সেবা দেয় অথচ তাঁরই হাতে তাদের পতন হয়। এ ঘটনা তাঁর রাজত্বকালের উজ্জ্বলতাই ম্লান করে নি বরং মনস্তাপ ও অকৃতজ্ঞতাজনিত বিবেকানুভূতি তার ভবিষ্যত জীবনকেও তমসাচ্ছন্ন করে থাকবে।[১৪] পুনশ্চ তাদের পতনে অনেকেই হতবাক হয়েছেন; তাঁর উদারতার সাথে তাঁর এরূপ নিষ্ঠুরতার সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তারা হারুনের রাজত্বকালের ঘটনা প্রবাহকে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে চান নি। ইবনুল ফকিহ ও তাবারীর অনুসরণে হিট্টি মনে করেন যে, উমাইয়া যুগে কুতাইবা বিন মুসলিম মধ্য এশিয়ার বলখ দখলের সময় খালেদ তার মাতাসহ যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন। খালেদের পিতা ছিলেন বলখের বৌদ্ধমঠের একজন পুরোহিত বা বরমক।[১৫] আব্বাসী বংশের প্রারম্ভে খালেদ প্রতিষ্ঠিত বংশটি তাই বারমেকী বংশ নামে পরিচিতি লাভ করে। বৌদ্ধ ও পারস্য ঐতিহ্যের ধারক-বাহক এই শিক্ষিত পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে উমাইয়া যুগে অন্যতম বিখ্যাত 'মাওলা' পরিবারে পরিণত হয়। এই পরিবারটি খোরাসানে আব্বাসী আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করে। আবু মুসলিম খোরাসান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আব্বাসী বিপ্লব দৃঢ় করে পশ্চিমাঞ্চলে আব্বাসী বিপ্লব সফল করার জন্য সেনাপতি কাহতাবার সাথে খালেদ বিন বারমাককে পশ্চিম অভিযানে প্রেরণ করেন।[১৬] খালেদ খলিফা আস-সাফ্ফা রাজপরিবারের সাথে দ্রুত এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন যে, সাফ্ফা তনয়া খালেদের স্ত্রীর আদর যত্নে লালিত হয়। পরবর্তীকালে বিখ্যাত হারুন-আর-রশীদ শিশু অবস্থায় খালেদ পুত্র ইয়াহিয়ার স্ত্রীর স্তন্য পান করতেন। আস-সাফ্ফা খালেদকে রাজস্ব বিভাগের প্রধান পদে নিয়োগ করেন। মনসুর তাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন।[১৭] এবং বাগদাদ নির্মাণকার্যের তদারকির দায়িত্ব দেন। এ সময় তিনি মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। এক ভয়াবহ শিয়া বিদ্রোহ দমনে

সফল হওয়ায় আল-মনসুর তাঁকে ৭৬৫ সালে তাবারিস্থানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বৃদ্ধ বয়সে মাহদীকে বাইজানটাইন দুর্গ দখলে তিনি অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মনসুরের রাজত্বকালে তিনি সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আল মনসুর খালেদপুত্র ইয়াহহিয়াকে আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আল-মাহদী তার দায়িত্ববোধ ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে ইয়াহহিয়াকে হারুনের শিক্ষকপদে নিয়োগ করেন। হারুন তাকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন।[১৮] আল মাহদীর মৃত্যুর পর আল-হাদী সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে হারুনের উত্তরাধিকার মনোনয়ন বাতিল করে স্বীয়পুত্র জাফরকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চাইলে রাজমাতা খায়জুরানের সাথে ইয়াহহিয়ার ঘোরতর মতবিরোধ হওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন।[১৯] হারুন খেলাফতে সমাসীন হয়ে ইয়াহহিয়াকে মুক্তি দেন এবং সাম্রাজ্যের যাবতীয় সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেন। খায়জুরানের মৃত্যুর পর হারুন তার নিকট হতে রাজকীয় সীলমোহর ফিরিয়ে নেন। তিনি ও তার চার পুত্র ফজল, জাফর, মুসা ও মোহাম্মদ ৭৮৬-৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসী সাম্রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২০] ইয়াহহিয়ার জ্যৈষ্ঠপুত্র ফজল ছিলেন হারুনের বাল্য সাথী; ফজল প্রথমে খোরাসানে এবং পরে ৭৯১ সালে মিশরের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। রমজান মাসে মসজিদে বাতি জ্বালানোর রীতি প্রথমে তিনিই প্রবর্তন করেন।[২১] জাফরও হারুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও নিত্য সহচর ছিলেন। তার উপর মামুনের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি সিরিয়াসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। মুসা ও মোহাম্মদ সরকারি উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। বস্তুত বার্মেকী বংশ প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে আব্বাসী বংশের শাসন পরিচালনায় কেবল দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেন, তাই নয়, বরং তারা আব্বাসীদের যুগে যে নয়া সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তার উপর তাদের নেতৃত্বের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়।

পূর্ব বাগদাদে তাইগ্রিস নদীর তীরে তারা তাদের নির্মিত প্রাসাদের জাঁকজমকপূর্ণ স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন করতেন। জাফর নির্মিত জাফরী ভবন ছিল অনিন্দসুন্দর এবং স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। তার চতুষ্পার্শ্বে জাফরী মডেলে গড়ে ওঠা বসতি এলাকা তৎকালীন অভিজাত এলাকায় পরিণত হয়। মামুন ভবনটি দখল করে দারুল খেলাফতে রূপান্তর করেন।[২২] জাফরী ভবনের পশ্চাতে ছিল বিশাল উদ্যান। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী বারমেকীরা উদার হস্তে স্তুতিকার, শিল্পী, সাহিত্যিক জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে বিতরণ করতেন। তাদের বদান্যতা প্রবাদে পরিণত হয়। তাদের উদ্যোগে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুল, মসজিদ, রাস্তাঘাট, খাল ইত্যাদি অসংখ্য জনহিতকর কার্য সম্পাদিত হয়। জাফর তার বাগ্মিতা ও সাহিত্যকর্মের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তার সৌজন্যে আহলুল কলম বা সাহিত্যসেবী সমাজ গড়ে ওঠে। তিনি নতুন ফ্যাশনের প্রবর্তন করেন। বেশভূষা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ অনুষ্ঠানে নিত্যনতুন প্রথার প্রচলন করেন।[২৩]

৪.৭ বার্মেকি বংশের পতন ঃ এর সামাজিক পশ্চাদভূমি

এহেন জ্ঞানী গুণী ফজলকে ৮০৩ সালে নিহত করা হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৩৭ বছর। তার দ্বিখণ্ডিত মুণ্ডু বাগদাদ সেতুর দুপাশে প্রদর্শনের জন্য রেখে দেয়া হয়। বৃদ্ধ পিতা ইয়াহহিয়া ও তিনপুত্র ফজল, মুসা ও মোহাম্মদকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইয়াহহিয়া ও ফজল কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাদের ৩০,৬,৭৬০০০ দীনার নগদ মুদ্রা, সকল স্থাবর সম্পত্তি-আবাদি জমি, অট্টালিকা, অলংকার মূল্যবান আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এভাবে ঐ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পরিবারের পতন ঘটে।[২৪] এই পরিবারের এরূপ পতনের কারণ কি? অনেকে অনেক কথাই বলেন। হারুনের ভগ্নি আব্বাসার সাথে অবৈধ সম্পর্কের জন্য জাফরকে নির্মমভাবে হত্যা করার কাহিনী ইবনে খলদুন উপহাস করেছেন অলীক কল্পনা বলে।[২৫] তার ধারণা বার্মেকীদের রাজস্ব ব্যবস্থার উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল বিধায় হারুনকেও তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য তাদের নিকট হাত পাততে হতো, হারুনের নিকট এরূপ অবস্থান ছিল অসহনীয়-তাই তাদের পতন ঘটানো হয়। ইবনে খলদুন কথিত হারুনের এরূপ ন্যাক্কারজনক অবস্থান আদৌ ঐতিহাসিক সত্য নয়। অবশ্যই বারমেকী পরিবার সম্পদশালী ছিল; তারা রাজকোষকেও সম্পদে পূর্ণ করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, হারুন এবং গোটা রাজপরিবারকে সম্পদশালী করে। এটাই আধুনিক গবেষকেরা প্রমাণ করেছেন। নিঃসন্দেহে পরিবারটি খুবই জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু হারুন ছিলেন আরব্য রজনীর কিংবদন্তী পুরুষ। তবে কেন তিনি তাঁর অধীনস্ত পরিবারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের পতন ঘটাবেন? অবশ্য তাদের অনেক শত্রু থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থে ঐ শত্রুতার আর্থ-সামাজিক কারণ একেবারে উপেক্ষিত। এ পরিবারের শত্রুরা ন্যায়পরায়ণ হারুন দ্বারা তাদের পতন ঘটায় সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়; কিন্তু সেই বাস্তবতাটি কি? যে কারণে বার্মেকী শত্রুপক্ষ হারুনকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল, ঐ বাস্তব অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ তাই একান্ত প্রয়োজন। তৎকালীন ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বাইজানটাইন সমস্যা হারুনের জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। ঐ সমস্যার প্রতি আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব বারমেকী পরিবারের উপর চাপিয়ে দেন। স্বাভাবিকভাবে এই পরিবারকে সাম্রাজ্যের রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই মূল দায়িত্ব পালনে তারা সফল না ব্যর্থ ? এতে ব্যর্থতা থাকলে তাদের শত্রুপক্ষ অবশ্যই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। বস্তুত এরূপ ঘটনাই ঘটেছিল। মূল দায়িত্ব পালনে তাদের মূল্যায়ন করতে শাবান যে মন্তব্যটি করেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ॥ the success of their financial policy is to be measusrd by the wealth of the

centril treasury, then it was a huge success, but if it measured by its results and effect on peoples of the empire then it was a dismal failure ।[২৬] বারমক পরিবারটি মূলত আল-মনসুরের মতই রক্ষণশীল ছিল, কখনই সংস্কারকের ভূমিকা পালন করে নি। তারা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে রাজস্ব কাঠামোতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে নি। অথচ আধুনিক গবেষণায় এটাই ছিল আব্বাসী সাম্রাজ্যের মূল সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হয় নি বলে আরব-সাম্রাজ্যের ইতিহাস মূলত বিচ্ছিন্নতাবাদের ইতিহাস; দীর্ঘ অবক্ষয়ের ইতিহাস। তাদের গৌরবের ইতিহাস স্বল্পকাল স্থায়ী। কেন্দ্রীয় খাজাঞ্জিখানা পূর্ণ রাখার জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কঠোরভাবে কর আদায় রীতি অবলম্বন করে। একেবারে প্রথম দিকে মাত্র দুএকটি ক্ষেত্রে কর কাঠামোর সমন্বয় করতে দেখা যায়। যেমন সোয়াদের নয়া মুসলিমরা কর হিসেবে তাদের উৎপন্ন ফসলের ৫০% সরকারকে দেয়া সত্ত্বেও কর আদায়কারীরা তাদেরকে মুসলিমদের যে কর আদায় করার অনুমতি চাইলে বার্মেকিরা তাতে রাজি হয় নি। ফারেস প্রদেশের কৃষকরা করভারের অভিযোগ করলে তা লাঘব করা হয়। এরূপ মাত্র দুটি ঘটনা হতে মনে হতে পারে, তাদের রাজস্ব প্রশাসন খুবই নমনীয় ছিল; কিন্তু মূলত সর্বত্র তারা কর আদায়ে সর্বদা কঠোরতাই অবলম্বন করে।[২৭] পূর্বে যেখানে খারাপ আবহাওয়ায় পূর্বের প্রদেয় কর আদায় না করে হয়ত আংশিক আদায় করা হত, বাকি অংশের জন্য সরকারের নিকট ঋণ হিসেবে থাকত; কিন্তু হয়ত বিশেষ সময় সেটা রেয়াত দেয়া হত। বারমেকী কর আদায়কারীরা করদাতাদেরকে সে সুযোগ না দিয়ে এবং বাকি বকেয়াসহ কঠোরভাবে কর আদায় করত। মসুলে ঠিক এরকম ঘটনাই ঘটে। যার পরিণতিতে মসুলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং অনেক আরব আজারবাইজানে চলে যায়। আজারবাইজান বিদ্রোহ অথবা খাজার বিদ্রোহের মূলেও ছিল একই বার্মেকিদের রাজস্বনীতি, মিশরেও একই প্রকার ঘটনা ঘটে।[২৮] মিশরে পূর্বে কখনো উদ্ধারকৃত আবাদি জমির উপর কর আরেপ করা হয় নি। বারমেকীরা নতুন করে সে সব জমির উপর কর আরোপ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাদের জমি জরিপের সময় প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়া হয়। এর ফলে মিশরে বিদ্রোহ দেখা দেয় যা বাগদাদ হতে সৈন্য প্রেরণ করে দমন করা হয়।[২৯] তদরোক্ত সম্পত্তির উপর কর আরোপ করলে সমস্যা দেখা দেয়। মুসলিমরাও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মধ্যে তদ্রুপ কর ফাঁকি দেবার সুযোগ দিতে চায়। এ জন্য হানাফি কাজিরা এরূপ ওয়াক্‌ফ পছন্দ করত না বলে মালেকী কাজি নিয়োগ করা হয়।[৩০] আরো পশ্চিমে রাক্কা ও সাইরেনিকায় উৎপন্ন জলপাই এবং গবাদিপশুর উপর কর আরোপ করা হয়। উত্তর আফ্রিকার টিউনিসিয়ায় আরব-বার্বারদের বিবাদের ফলে অশান্ত অবস্থা বিরাজ করে। মাঝে মাঝে খোরসানী বাহিনী প্রেরণ করা হলেও স্থায়ী শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ইব্রাহিম বিন আগলাবের নেতৃত্বে অবশেষে বারমেকীদের দ্বারা গঠিত নয়া আব্বাসী বাহিনী তথায় প্রেরণ করা হয় এবং

তাকে শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তার সাথে এক চুক্তিতে ইবনে আগলাব বাগদাদকে বার্ষিক ৪০ হাজার দীনার দেয়ার বিনিময়ে তাকে টিউনিসিয়ায় স্বায়ত্তশাসন অধিকার দেয়া হয়। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদকেই উৎসাহিত করা হয়।[৩১]

কেন্দ্রীয় আব্বাসী কোষাগার পূর্ণ রাখার প্রতি বারমেকীদের আগ্রহ সহজে অনুমান করা যায়; কিন্তু হারুন এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকে অভাবনীয় সম্পদশালী করার জন্য বারমেকীদের অস্বাভাবিক আগ্রহের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কাজ করতে গিয়ে অন্যান্যদের স্বার্থ উপেক্ষা করে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে তারা দ্বিধা করে নি। দোকান-ঘর, হাট-বাজার, শহরের বিভিন্ন মুস্তাগিল্লা (যা হতে শুল্ক আদায় করা হয়) পরিত্যক্ত সম্পত্তি, বেওয়ারিস সম্পত্তি যা আব্বাসী সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, জনসাধারণের মালিকানাধীন চারণভূমি, এসব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে হারুন ও তার পরিবারের লোকজনের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। দ্বিতীয় মারওয়ানের সকল সম্পত্তি জুবাইদাকে দেয়া হয়। মিশরে তাঁর এত সম্পত্তি ছিল যে, সেগুলোকে তদারকির জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হয়। এভাবে সাধারণ জনতার স্বার্থের বিনিময়ে প্রভুভক্তি প্রদর্শনে বারমেকীরা সকল ন্যায়নীতি উপেক্ষা করেন।[৩২]

খোরাসান বা পূর্বাঞ্চলে বারমেকী রাজস্ব নীতি ছিল লক্ষণীয়ভাবে উদার ও নমনীয়। তারা কেবল পূর্বাঞ্চলেই প্রচুর কর ছাড় দেয়। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, সৈন্য সংগ্রহের জন্য হারুন ইয়াহহিয়া পুত্র ফজলকে পূর্বাঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং ফজল মিশন খুবই সফল হয়। পূর্বাঞ্চল হতে সৈনিক সংগ্রহ করে নয়া আব্বাসী বাহিনী গঠন করা হয়। এবং রাক্কায় সেনানিবাসে প্রেরণ করা হয়। ফজলের এ সাফল্য এসেছিল এ অঞ্চলে প্রচুর রাজস্ব ছাড়ের বিনিময়ে। তারা উচ্চ সামরিক বৃত্তির চেয়েও কর-রেয়াত-ই পছন্দ করে। তাদের বকেয়া কর মৌকুফ করার জন্য তাদের রেজিস্টার পুড়িয়ে ফেলা হয়। বারমেকীরা ইতিপূর্বে পূর্বাঞ্চলীয় আগলাবী বংশকে তিউনিসিয়ায় স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল। পূর্বাঞ্চলে তাদের এরূপ নমনীয় রাজস্বনীতি কি তদ্রুপ স্বায়ত্তশাসনের পায়তারা?[৩৩]

আব্বাসী বাহিনী গঠনের জন্য পূর্বাঞ্চলে বারমেকী রাজস্বনীতি বাগদাদদের আবনা অভিজাত ও জনতা আদৌ ভাল চোখে দেখেন নি। প্রসঙ্গত প্রথমে তাদের পরিচয়টি বিবেচ্য। এরা হলেন খোরাসানী বিপ্লবী বাহিনীর বংশধর। তারা তাদের পূর্ব-পুরুষের মত ধন-মানে বাগদাদের প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণী। হাদীর সিংহাসন আরোহণের সময় তাদের প্রভাব বাগদাদের নাগরিকদের সামনে স্পষ্ট হয়। খোরাসানী বাহিনীর বংশধরকে শ্রদ্ধার সাথে আবনাউদ্দৌল্লা সংক্ষেপে আবনা বলা হয়।[৩৪] এরা সামরিক জীবন বিমুখ নগরজীবনে অভ্যস্ত। পুনশ্চ বিত্তশালী করমুক্ত বড় ব্যবসায়ী। তাদের নিয়ন্ত্রণ করা ছিল কঠিন কাজ। এদের প্রভাববলয়ের বাইরে থাকার ইচ্ছায় রাক্কায় হারুনের সদরদপ্তর স্থানান্তরের অন্যতম কারণ ছিল।[৩৫]

বাগদাদ জনতার মনে বারমেকী নীতির প্রতি সংশয়, আবনাদের বারমেকী পূর্বাঞ্চলীয় নীতির ঘোরবিরোধিতা এমন এক সময় সংঘটিত হয় যখন বারবার ব্যর্থতার কারণে স্বয়ং হারুন বারমেকী প্রশাসনিক নীতির প্রতি আর আস্থা রাখতে পারছেন না।[৩৬] বৃদ্ধ ইয়াহহিয়ার নিকট হতে রাজকীয় সীলমোহর ফিরিয়ে নেয়া হয়, এবং বারমেকীদের চূড়ান্ত পতনের ছয় বছর পূর্বে ফজলকে বরখাস্ত করা হয়। ফজল রাক্কায় গিয়ে ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা হলেও পুনরায় তাকে ক্ষমতায় বহাল করা হয় নি। ধীরে ধীরে বারমেকী অনুগামীদেরকে অপসারণ করে শূন্য পদগুলো বারমক বিরোধীদের দ্বারা পুরণ করা হয়। বারমাক বিরোধীদের একজন ছিলেন ফজল-বিন-রাবী। তার পিতা ছিলেন মনসুরের মাওলা। ইবনে রাবীকে কেন্দ্র করে বারমেকী বিরোধী একটি সামাজিক শক্তি সংঘবদ্ধ হয়। বাগদাদের অন্যতম আবনা নেতা আলী-বিন-ঈসা-বিন মাহানও বারমেকী পূর্বাঞ্চলীয় নীতির কড়া সমালোচনা করেন। তাকে পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি পূর্বাঞ্চলের উপর কেন্দ্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বারমেকী প্রদত্ত সকল প্রকার কর রেয়াত বাতিল করা হয়।[৩৭] এরূপ পরিস্থিতিতে বাগদাদের প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণী সহজে হারুনকে বারমেকীবিরোধী করে তুলতে সক্ষম হয়। হারুন সহজে ধরে নিয়েছিলেন যে, বারমেকী নীতির ফলে কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না, যে কোনো মুহূর্তে তিউনিসিয়ার মত খোরাসানও বিচ্ছিন্ন হতে পারে। হারুন আব্বাসী বংশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ধ্বংস করতে পারেন না। তাই শেষ জীবনে ধীরে ধীরে বারমেকীদের ধ্বংস সাধন করেন। এ ধ্বংসের মাধ্যমে তিনি বারমেকীবিরোধী অভিজাতদের আস্থা অর্জন করার চেষ্টা করেন। এটাই ইতিহাসের স্বৈরাচারী আচরণের নমুনা। ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হারুনের চেয়ে স্বৈরাচারতন্ত্রী হারুন বারমেকীদের পতনের জন্য বেশি দায়ী। বস্তুত হারুনের পদক্ষেপটি ছিল প্রধানত রাজনৈতিক, বারমেকীদের পতন তাই তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তব অবস্থার আলোকে বিবেচ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উপরের আলোচনা হতে অনুমান করা যায় যে, বাগদাদে নয়া অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটতে যাচ্ছে এবং এক নয়া রাজনীতির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে যার প্রভাব মঙ্গলজনক হয় নি—যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

তথ্যপুঞ্জি

১. M.A. Shaban, op. cit. p. 27
২. Ibid. p. 27
৩. Ibid. p. 28
৪. সৈয়দ আমীর আলী পৃ. ২৪০
৫. ঐ পৃ. ২৪১

৬. ঐ পৃ. ২৩৭-৩৮
৭. ঐ পৃ. ২৩৪-৩৫
৮. Shaban, op cit. p. 28-29
৯. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৪১-২৪৪
১০. Hitti op cit., p. 298
১১. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৩৬
১২. ঐ পৃ. ২৪৬-৪৭
১৩. ঐ পৃ. ২৪৭
১৪. ঐ পৃ. ২৩৮
১৫. Hitti, op cit. p. 294
১৬. Shaban, Abbasi Revoma. p. 27
১৭. Ibid. p. 28
১৮. Hitti. p. 295
১৯. সৈয়দ আমীর আলী-প্রাগুক্ত পৃ. ২৩
২০. Hitti. op cit. p 205
২১. Ibid. p. 205
২২. Ibid. p 201
২৩. Ibid. p 205
২৪. Ibid. p. 206
২৫. Ibid. p. 206
২৬. Shaban, op. cit. p. 32
২৭. Ibid. p. 32, 33
২৮. Ibid. p. 33
২৯. Ibid. p. 34
৩০. Ibid. p. 34-35
৩১. Ibid. p. 35
৩২. Ibid. p. 35-36
৩৩. Ibid. p. 36
৩৪. Ibid. p. 37
৩৫. Ibid. p. 37
৩৬. Ibid. p. 35
৩৭. Ibid. p. 36

পঞ্চম অধ্যায়

গৃহযুদ্ধের আবর্তে আব্বাসী খেলাফত

৫.১ বাগদাদ সিংহাসনে মোহাম্মদ আল আমিন (৮০৯-৮১৩ খ্রি.) : তার জীবনধারা

খলিফা হারুনের মৃত্যুর পর রাজ অনুজ্ঞা অনুসারে মুহম্মদ আল আমিন খিলাফতে সমাসীন হন। অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলিফা হারুন পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ দমন অভিযানে রায়নগরে পৌঁছানোর পর অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হন। এ সময় তাঁর ব্যবস্থা অনুসারে আল-আমিন বাগদাদে ছিলেন, মামুন ছিলেন মার্ভে এবং কাশেম কিন্নাসিরিনে। তার মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলেন তাঁর অন্যতম পুত্র সালেহ্। বাগদাদে তার মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে আসেন ডাক বিভাগের প্রধান হামাওয়াই। সালেহ্ যথাসময় রাজকীয় সীলমোহর, তরবারি ও রাজপোশাক আমিনের নিকট প্রেরণ করেন। খলিফার মৃত্যুর সংবাদ এবং রাজকীয় প্রতীকসমূহ হাতে পাওয়ার পর পরই আল আমিন কসরুল খুলদ ত্যাগ করে কসরুল খেলাফতে চলে যান।[১] বাগদাদ জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। মামুন তাঁর প্রতি আনুগত্যসূচক অভিনন্দন ও উপঢৌকন প্রেরণ করেন।[২] সম্রাজ্ঞী জুবাইদা রাক্কা হতে বাগদাদে আগমন করেন। এভাবে আমিনের খেলাফতের শুভ সূচনা হয়। তিনি মাত্র চার বছর (৮০৯-৮১৩) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে আব্বাসী সাম্রাজ্য এক প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধে নিপতিত হয়। আমিন ও মামুন তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন; কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতির মামুন শিক্ষণীয় বিষয় আত্মস্থ করেন আর আমোদপ্রিয় চপলমতি আমিন তা গ্রহণ করেন স্থূলভাবে। উভয়ের জীবনবোধ, রুচিশীলতা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। হারুন তার পুত্রদ্বয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করেন। তাঁর সম্পাদিত ইচ্ছাপত্র যাতে মক্কা শরীফে রক্ষিত হয়, তিনি সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; কিন্তু তা কোনো কাজে আসে নি।

আমিনের ভোগসর্বস্ব জীবনধারা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য তাঁর রাজপ্রাসাদে যে নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হত, সৈয়দ আমীর আলী তার এক অনুপম বিবরণ দিয়েছেন এভাবে: খেজুর পাতা দুলিয়ে মোতিখচিত ও হীরকশোভিত চমকপ্রদ পোশাকে একশ সুন্দরী যুবতী মৃদুমধুর সঙ্গীত লহরীর ঐকতানের সাথে নৃত্য করত। একবার আগে, পর মুহূর্তে পিছে গমনাগমন করে, তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে ঘন ঘন গোলকধারার মত ব্যূহ রচনা করে তার ভেতর আসা-যাওয়া, আবর্তন ও অঙ্গভঙ্গি করত—যেন আলো ও রঙের এক সুদৃশ্য বৃত্ত বিশেষ। এতদ্ব্যতীত তিনি নৌবিহারের জন্য সিংহ, হাতী, ঈগল, সাপ ও অশ্বাকৃতির পাঁচটি স্বর্ণমণ্ডিত ও সুসজ্জিত বজরা

তৈরি করেন, দজলা নদীর বুকে এসব বজরায় চলত আনন্দোৎসব।[৩] এভাবে কাটত তার দৈনন্দিন জীবন।

৫.২ গৃহযুদ্ধের পটভূমি

তার ব্যক্তি জীবনধারা এরূপ হাওয়ায় তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ছেড়ে দিয়েছিলেন উচ্চাভিলাষী ফজল-বিন- রাব্বির হাতে। আলী-বিন-ইসা-বিন মাহান ছিলেন তার আর একজন উচ্চাভিলাষী পরামর্শদাতা। এরা ছিলেন বারমেকি বিরোধী বাগদাদের নয়া অভিজাতদের প্রতিনিধি। বাগদাদের নয়া রাজনীতিতে তাদের ভূমিকার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা তরলমতি আমিনকে কুপরামর্শ দেয়ার ফলে তিনি বাগদাদের ধনভাণ্ডার উজাড় করে পণ্যোৎসব করেন। তদুপরি সেনাবাহিনীর আনুগত্য ক্রয় করেন।[৪] তাবারীর মতানুসারে আমিন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাজকোষে যথেষ্ট অর্থ সম্পদ ছিল; দেশের সীমান্ত ছিল শান্ত; সেনাবাহিনীর বোনাসসহ বেতনাদি দিতে কোনো অভাব হওয়ার কথা নয়।[৫] তাঁর পরামর্শদাতাদের কুপরামর্শে মামুনের নিকট অর্থের আব্দার করে একটি বড় ধরনের চাল চালেন। মামুন সে আব্দার রক্ষা করতে পারেন নি। এ জন্য মামুনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল আরো বিস্তার করা হয়। প্রথমত মামুনের উত্তরাধিকার বাতিল করা হয়; দ্বিতীয়ত, তাঁকে বাগদাদে তলব করা হয়। খোরাসানের নিরাপত্তার প্রশ্নে বাগদাদ গমনের অপারগতার কথা জানালে মামুনকে খোরাসানের শাসনকর্তার পদ হতে বরখাস্ত করা হয়। আমিন তার শিশুপুত্র মুসাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তাকে নাতিক বিল হক উপাধিতে ভূষিত করেন।[৬] অল্প কিছুদিন পর আর এক পুত্রকে কায়েস বিল হক উপাধি দান করা হয় এবং নাতিকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়। বাগদাদে নওফেলের নিকট গচ্ছিত রাখা মামুনের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৭] এসব কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে তিনি কারাগৃহে ঝুলিয়ে রাখা অঙ্গীকারপত্র ও ইচ্ছাপত্রদ্বয় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন। এভাবে দুভায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়।[৮] দেশ গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

আমিনের অকারণ এরূপ বৈরী আচরণের বিরুদ্ধে মামুনকে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। মামুন তার শাসনাধীন এলাকার পশ্চিম সীমান্তে অবরোধ গড়ে তোলেন। দেহ তল্লাশি ব্যতিরেকে পশ্চিমাংশ হতে কেউ যাতে পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দুভাই দু'অঞ্চলে স্ব স্ব অবস্থান সুদৃঢ় করে পরস্পরের মোকাবিলা করার মহড়া সম্পন্ন করেন।

৫.৩ গৃহযুদ্ধের সূচনা

আমিনের অন্যতম উপদেষ্টা আলী বিন ইসা বিন মাহানের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী রায়নগর অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। মামুনের প্রতিনিধি সেনাপতি

তাহির বিন হুসাইন বিপুল বিক্রমে তার অগ্রাভিযানে বাধা দেন। আলী-বিন-ইসা-বিন মাহান পরাজিত ও নিহত হন।[৯] মামুনের বিরুদ্ধে প্রেরিত আরো কয়েকটি সেনা অভিযান একইভাবে বিপর্যয়বরণ করে। তাহির বিন হাসান পার্বত্য অঞ্চল শত্রুমুক্ত করে কাজাবিন দখল করেন ও হালওয়ানে পৌছান এবং তথায় একটি সেনানিবাস নির্মাণ করেন।[১০] ইতোমধ্যে মামুনের অন্যতম সেনাপতি হারসামা আহওয়াজ, ইয়ামেন, বাহরায়েন ও ওমান অধিকার করে ওয়াসিত দখল করেন। তার এই বিরাট সাফল্যের প্রভাব সর্বত্র পড়তে থাকে।[১১] কুফা, বসরা ও মক্কা-মদিনার শাসনকর্তাগণ মামুনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। উত্তর দিক হতে তাহের-বিন-হুসাইন মাদাইন দখল করে বাগদাদের উপকণ্ঠে উপনীত হন। হারসামাও বাগদাদ সীমান্তে পৌছে যান; সেনাপতি বাগদাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। বাগদাদ অবরুদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়।[১২]

আমিনের বিরুদ্ধে মামুন বাহিনীর এরূপ সাফল্যের ফলে পূর্বাঞ্চলে মামুন আমিরুল-মোমেনিন রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। মামুন দ্রুত পূর্বাঞ্চলে তাঁর শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ফজল-বিন-সহলকে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তারূপে নিয়োগ করা হয়। তাকে একই সাথে সমর সচিব ও রাজস্ব সচিব পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তার সামরিক সহকারী ছিলেন আলী বিন হাশিম এবং রাজস্ব বিষয়ের সহকারী ছিলেন নুয়াইম বিন খাজিম।

এদিকে অবরুদ্ধ বাগদাদ নগরী যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে, তার বাসিন্দারাও অশেষ দুঃখ দুর্দশায় পতিত হয়। দলে দলে আমিনের পক্ষ ত্যাগ করে। অনুন্যোপায় হয়ে আমিন সেনাপতি হারসামার নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন এবং রাজকীয় প্রতীকসমূহ তাহিরের নিকট প্রেরণ করেন। আমিন নৌকাযোগে হারসামার নিকট যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু জনৈক দুর্বৃত্ত তাকে হত্যা করে।[১৩] ইসলামের ইতিহাসের ঐ তৃতীয় গৃহযুদ্ধ এভাবে শেষ হয়। আমিনের হত্যাকাণ্ডে মামুন মর্মাহত হন।[১৪]

৫.৪ গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ঃ একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ

এই তৃতীয় গৃহযুদ্ধ যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সে কথা আধুনিক গবেষকরা স্বীকার করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ হতে ঐ তৃতীয় গৃহযুদ্ধটি ছিল মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী গৃহযুদ্ধের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দুপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কোনো পক্ষের প্রতি সমর্থন থাকলেও তারা যুদ্ধের সাথে জড়িত হতে চান নি; তারা এর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এই তৃতীয় যুদ্ধে দুপক্ষ চিহ্নিত হলেও বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন স্তরের জনতা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং এই গৃহযুদ্ধটি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শাবানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ In Previous civil wars fighting had been limited to protagonist whose interests had been

directly involved and on the whole other section of the population had chosen to remain out of the struggle, even when their sympathies had been with one party or the other. In this civil war although the opponents were clearly identified, almost every section of the population in every region became involved and the profonged struggle spreed to all corners of the empire.

তৃতীয় গৃহযুদ্ধটি প্রকাশ্যত ঘটেছিল আমিন ও মামুন এ দুভায়ের মধ্যে; কিন্তু বাস্তবে দুভায়ের পশ্চাতে ছিল দুটি অঞ্চল এবং দুটি ভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট সেনাবাহিনীর সক্রিয় সমর্থন। তাই এ গৃহযুদ্ধ দুটি জাতিসত্তার মধ্যকার দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। আমিনকে সমর্থন দিয়েছিল বাগদাদের অভিজাত শ্রেণী ও আবনা ও তাদের সমর্থক গোষ্ঠী; মামুনকে সমর্থন করেছিল বারমেকী গঠিত আব্বাসী বাহিনী ও তাদের সমর্থক পূর্বাঞ্চলের জনতা। বারমেকীদের পূর্বাঞ্চল নীতির ঘোর বিরোধিতা করে আবনা অভিজাত শ্রেণী। তারা ঐ নীতি দ্বারা তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা তাদের কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্য হারুনকে তাদের পক্ষে টেনে বারমেকীদের পতন ঘটায় এবং আমিনকে তারা এ কাজে পুরোপুরি ব্যবহার করে। পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠী তাদের ভাগিনা মামুনের প্রতি দুটি কারণে সক্রিয় সমর্থন দেয়। প্রথমত তাদের অর্জিত স্বার্থ রক্ষা করা; দ্বিতীয়ত আব্বাসী সাম্রাজ্যের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশের বড় ধনিক-বণিকরা যারা বাগদাদ ও বিভিন্ন বন্দরে কর রেয়াত ভোগ করত তারা প্রধানত আবনাপন্থী ছিল; অথচ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দরিদ্র দোকানি ও জনতা এবং যারা বৃহত্তর ইসলামি উম্মা গঠনের পক্ষে ছিল তারাই পূর্বাঞ্চলীয়দের মত মামুনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। অথচ সৈয়দ আমীর আলী বাগদাদের দরিদ্র লোকদেরকে নিচু জাতের লোক বলে তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।[১৫] ইতিহাসে সাধারণত আমিন-মামুনের মধ্যকার এ দ্বন্দ্বটি উল্লিখিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বিবেচনা না করে তাদের দুভায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করলে একটি জটিল ঐতিহাসিক ঘটনার অতি সরলীকরণ করা হয় মাত্র।

৫.৫ আল মামুন

আল মামুন একজন বড় মাপের বিদ্যোৎসাহী আলোকিত খলিফা হিসেবে সমধিক পরিচিত। এ খ্যাতি অবশ্য তার প্রাপ্য; তিনি মধ্যযুগে মুসলিম ইতিহাসের অগাস্টাস ছিলেন। তিনি একজন বড় মাপের কূটকৌশলী, উদার সংস্কারক, শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রদূত ছিলেন। পিতা হারুনের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে মামুন প্রাদেশিক রাজধানী মার্ভে অবস্থান করে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের শাসনে মনোনিবেশ করেন। মৃত্যুকালে খলিফা হারুন বাগদাদ খাজাঞ্চিখানায় যথেষ্ট অর্থ-বিত্ত রেখে যান। তখন বাইজানটাইন সীমান্ত ছিল

শান্ত। এতদসত্ত্বেও আমিন খলিফা হয়ে মামুনের নিকট হতে অর্থ বা সামরিক এবং অন্য এক বিবরণীতে উভয় প্রকারের সাহায্য দাবি করেন। মামুনের বুঝতে বাকি রইল না—এরূপ আব্দারের রহস্য কি? বাগদাদের অভিজাত সমাজ আবনা ও তাদের পার্শ্বচরদের চাপেই আমিন নতুন রাজনৈতিক খেলায় মেতে ঐ চাল চেলেছেন। বারমেকীদের পতন ঘটাতে তাদের সাফল্য এবং হারুনের মৃত্যু আবনা অভিজাতদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষকে আরো উৎসাহিত করে। বারমেকী প্রাচ্যনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে তারা তাদের পূর্বের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করতে ছিল দৃঢ় সংকল্প।

৫.৬ আমিনের আবদার প্রতিহত ও বাগদাদ দখল ঃ মামুনের সাফল্যের সামাজিক প্রেক্ষিত

মামুন আমিনের আবদার প্রত্যাখান করেন। হারুনের জীবদ্দশায় আবনা প্ররোচিত পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্রোহের নেতা রফি বিন লায়েস মামুনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় মামুনের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হয়। তুখারিস্থান ও সোগদিয়ানার সামন্ত রাজারাও তখনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলেও মামুন বারমেকীদের নিকট হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহল পুত্রদ্বয় ফজল এবং হাসানের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তারা মার্ভ প্রশাসনের ভিত্তি রচনা করতে মামুনকে সাহায্য করেন। বারমেকীদের সব নীতি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হলেও তারা বারমেকীদের প্রাচ্যনীতির দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।[১৬] ফজলকে 'জুলরিয়াসাতায়েনুল হারব ওয়াতাদবীর উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তাকে যুদ্ধ ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান পদে নিয়োগ করা হয়। সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এক চতুর্থাংশ কর রেয়াত দেয়া হয়। এরূপ প্রণোদন দেয়ায় সহল পরিবারের পক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় জনতাকে আমিনের বিরুদ্ধে সমাবেশ করা সম্ভব হয়।[১৭] আব্বাসী বাহিনী প্রধান হারসামার প্রতি সহল ভ্রাতৃদ্বয়ের আস্থা ছিল না, বরং তারা হাণ্ডালী নেতা তাহির বিন হাসানকে অনেক বেশি বিশ্বাস করত। তাহেরের নিজস্ব ৫ হাজারের এক সেনাবাহিনী ছিল। তাহের সহলদের নিকট হতে আরো সুযোগ গ্রহণ করে বাগদাদের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তাহের বিন হুসায়েন তার সেনাবাহিনী রায়নগরে আলী বিন ইসা বিন মাহানের নেতৃত্বাধীন আবনা বাহিনীকে ধ্বংস করে বাগদাদ নগরের উপকণ্ঠে উপনীত হয়ে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।[১৮] এ সংবাদ পেয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য মামুন হারসামার নেতৃত্বে আব্বাসী বাহিনী প্রেরণ করেন। আব্বাসী বাহিনীর নেতৃত্বে থাকায় সিরীয়-ইরাকি বাহিনীর অনেকে স্বপক্ষ ত্যাগ করে হারসামার বাহিনীতে যোগদান করেন। মামুনের ইচ্ছা ছিল বাগদাদের পতনের পর তাহির রাক্কা দখল করবে এবং হারসামা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ইরাকের অবশিষ্টাংশের উপর মামুনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।[১৯] ইতোমধ্যে হাসান বিন সহলকে বাগদাদ অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল বাগদাদের পতনের পর ফজলের প্রতিনিধি হিসেবে

নগরের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। মামুনের এরূপ পরিকল্পনা কার্যকর হয় নি। তাহির এবং হারসামার মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। হারসামা পরাজিত খলিফার প্রতি নমনীয় নীতি অনুসরণের পক্ষপাতি ছিলেন; কিন্তু তাহির ছিলেন কঠোর নীতি গ্রহণের পক্ষে। তাহের রাক্কায় চলে যান; হারসামাকে মার্ভে ডেকে পাঠানোর পর বন্দি করা হয়। হাসান বিন সহল বাগদাদে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়ে আবনা বিরোধী কঠোর নীতি অবলম্বন করায় বাগদাদের আবনা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের অনেকে নয়া শাসনের প্রতি সহযোগিতা করেন। অনেকে তাদের নিজস্ব অবস্থান রক্ষা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বাগদাদে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আবনা দুদলে বিভক্ত হলেও উভয় পক্ষই হাসান বিন সহল বিরোধী ছিলেন। শিয়া প্রভাবিত এলাকা কুফা, মক্কা, ইয়ামেনে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব বিদ্রোহ সহজে দমন করা গেলেও বাগদাদের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। বরং বলা যায়, আমিনের মৃত্যুর পর বাগদাদে গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ে হাসানের সেনাবাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং সিরীয়-ইরাকি বাহিনী ছিল দোদুল্যচিত্ত। আলী-বিন-ইসা-বিন মাহানের মৃত্যুর পর আবনা বাহিনী নেতা মোহাম্মদ বিন আবি খালিদ যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বা আবনা বাহিনীর নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকলেও তারা ছিল দোদুল্যচিত্ত। সকল পক্ষের নেতৃত্বের এরূপ দুরবস্থার প্রেক্ষিতে হাসান বিন সহলের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাগদাদ নাগরিকরা মাহদীপুত্র ইব্রাহিমকে মামুনের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করে। কয়েক দিন পর ইব্রাহিমের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে মামুনের প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এভাবে বাগদাদ জনতা এই দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।[২০] সমগ্র বাগদাদ জনতা দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক পক্ষ আবনা বিলোপের সপক্ষে; অন্যরা এদের বিরোধিতা করেন। শেষোক্তরা বাগদাদের পূর্বাংশে শক্তিশালী ছিল এবং এখানে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল। তারা জনতাকে হাসানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করে এবং ইব্রাহিমের খেলাফত-এর সমর্থন দেয়। অবরুদ্ধ বাগদাদে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হয় এবং নগদ মুদ্রা প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। এ কারণে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে দ্রব্যে বেতন দানকে স্বাগত জানান হয়। ধনী বণিকদের এরূপ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল উভয়পক্ষের মধ্যে যে কোনো মূল্যে স্থিতাবস্থা রক্ষা করা।[২১] বাগদাদের এরূপ বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে হাম্বলী মাযহাব সুদৃঢ় হয়। এরা ছিলেন আহলুস সুন্নাহ সম্প্রদায়ের সবচাইতে রক্ষণশীল অংশ। এই মাযহাবের করনীতি ছিল ধনী বণিকদের স্বার্থের অনুকূলে; অথচ এ সময় শিয়া সম্প্রদায় ছিল ন্যায্য করনীতির পক্ষে। এ সময় আরব সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়। তারা তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে করভারে জর্জরিত সমাজের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন দেয়। এ কারণে ক্ষুদে ব্যবসায়ী সমাজ শিয়া আন্দোলনের সমর্থন করতে থাকে অথচ ধনীরা হাম্বলী মাযহাবের সমর্থন করে।

বাগদাদ নগরে অশান্ত অবস্থা বিরাজমান থাকায় হাসান বিন সহল তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। বাগদাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মামুন দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথম পদক্ষেপটি ছিল–তিনি একজন আলাবী নেতাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ঘোষণা দান করবেন, তিনি স্বয়ং ইমাম উপাধি গ্রহণ করেন। এ পদক্ষেপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আলাবী দরিদ্র জনতাকে শান্ত করা; তবে অনেকে তাঁর আন্তরিকতায় আস্থা স্থাপন করেন নি। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল তার বাগদাদ গমন। অতি সর্তকতার সাথে তিনি বাগদাদ অভিমুখে রওনা হন। তার মার্ভ ত্যাগ করার পর এক অজ্ঞাত আততায়ী ফজলকে হত্যা করে।[২২] বাগদাদে অবস্থানকারী হাসানকে পাগল বলে ঘোষণা করা হয়। পথিমধ্যে মাশহাদে তাঁর ঘোষিত আলাবী উত্তরাধিকারী আলী রেজা প্রয়াত হন। প্রতিটি ঘটনায় মামুনের ইঙ্গিত ছিল বলে অনেকে সন্দেহ করে। যা হোক তাহিরকে রাক্কা দখল করে বাগদাদ অভিযানের নির্দেশ দেয়া হয়। তাহির ও মামুন প্রায় একই সময় বাগদাদে উপনীত হন। বাগদাদ আকস্মিকভাবে শান্ত পরিবেশ ধারণ করে। বাগদাদে গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। তিনি শিয়া মতবাদ পরিত্যাগ করলেও ইমাম উপাধি পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর পরবর্তী সকল খলিফা তাঁকেই অনুসরণ করেন। এ সময় হতে খলিফা উপাধি এক নয়া ব্যঞ্জনা পায়। এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লার প্রতিনিধি বা আল্লার ছায়া হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করা। মামুন আমিরুল মোমেনিনের শক্তি সুসংহত করার জন্যই কি এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?

রাক্কায় সিরীয়-ইরাকি বাহিনী এবং সগুরের সুবিধাভোগীদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে একটু সময় লাগে। সিরিয়া, ইরাক জাজিরার অবস্থা ছিল শান্ত ও আশাপ্রদ। বাগদাদের সাথে মামুনের সমঝোতা হলে পূর্বাঞ্চল অশান্ত হয়ে ওঠে। ইরাক, সিরিয়া, জাজিরা এবং বাগদাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব তাহিরের উপর ন্যস্ত থাকলেও তাকে পূর্বাঞ্চলেরও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাহের তার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন খোরাসানে। তাঁর আত্মীয়স্বজন প্রীতিভাজনরা বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। বাগদাদে তার সেনাবাহিনী পুলিশের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাহেরকে দশ মিলিয়ন দিরহাম প্রদান করা হয়, পূর্বাঞ্চল মূলত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় এবং তাহেরী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মামুন বাগদাদে আসার সাথে সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পশ্চাতের রহস্য সম্পর্কে সাধারণ ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি। অবশ্য শাবান এ বিষয়ের উপর কিছু আলোকপাত করেছেন। এরূপ পরিস্থিতির মূলে ছিল আহমদ বিন আবু খালেদের অবস্থান। বাগদাদ আগমনের সিদ্ধান্তের সময় আহমদ ছিলেন মামুনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি ৮১৯ হতে ৮২৬ সাল আমৃত্যু যদিও উজির অথবা কাতিবের কোনো পদমর্যাদা গ্রহণ করেন নি, তবুও প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন মামুনের একমাত্র পরামর্শদাতা। তিনি মামুন সরকারের প্রাচ্য প্রশাসনিক

ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করেন। কারণ তাহের ও তার বিশাল অনুসারীর উপর তার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড।

উশ্রাসানার আফশীন ছিলেন তারই নিজস্ব ব্যক্তি। মামুন কেন আহমদকে তাঁর সংকটকালে বেছে নিয়েছিলেন? আবু খালেদের পুত্র আহম্মেদ ও তার পরিবার মূলত মার্ভ আররুদের বাসিন্দা এবং তাহেরের মত হেপ্তালী। তাঁর পিতা আবু খালিদ মাহদী ও হাদীর সময় উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন এবং পূর্বাঞ্চলে সামরিক বিষয়ের সাথে জড়িয়ে ছিলেন এবং এ সম্পর্ক কখনো তিনি ত্যাগ করেন নি। এ কারণে তার পুত্ররা আবনার স্বার্থের সাথে জড়িত ছিলেন। বাগদাদে হাসান নীতির ঘোরবিরোধী বংশটি আবনার নেতৃত্বে ছিল। এই পরিবারের অনেক সদস্য উল্লিখিত সংঘাতে আবনার একপক্ষের প্রতি সমর্থন দিলেও আহমদ স্বয়ং সর্বদা মামুনের প্রতি অনুগত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে ঐ ব্যক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিটিই ছিলেন আবনা ও মামুনের মধ্যে মধ্যস্থতা করার উপযুক্ত। বস্তুত তিনিই মামুনের কথা বাগদাদে পৌছে দিয়েছিলেন বলে ঐ বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়। তাহেরের সাথে মামুনের সমঝোতার ব্যাপারে আহমদের অবদান অনস্বীকার্য।[২৩]

৫.৭ মামুনের বহুমুখী কর্মকাণ্ড

বাগদাদে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর মামুন সিরীয়-ইরাকি বাহিনীর প্রতি মনোযোগ দেন। রাক্কা দখলে এলেও ঐ বাহিনীর অনেকে সগুরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদেরকে দমন করতে তাহেরী বাহিনীর প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগে যায়। এরপর মিশরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাহেরী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। হারুনের বাজত্বের শেষের দিকে মিশরে আরোপিত কর প্রদান করতে মিশরের আরবরা অস্বীকার করে। আমিন তাদের বিদ্রোহ দমনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। গৃহযুদ্ধের সময় এখানকার অবস্থা আরো জটিল রূপ ধারণ করে। কেননা সেনাবাহিনী বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাহেরি বাহিনী সামরিক সাফল্য অর্জন করলেও মূল সমস্যা কর ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন করা হয নি বলে তাহেরী বাহিনী মিশর ত্যাগ করার পর পরই কপট আরব ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত কবে। অবশ্য তাদের এ বিদ্রোহ দমন করা হয়।[২৪]

ক. সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ঃ মামুন সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন। একটি ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি তিন ডিভিশন সেনাবাহিনী গঠন করেন। প্রতিটি ডিভিশন গঠিত হয় আবনা, সিরীয়, ইরাকী ও আব্বাসী জোয়ানদের নিয়ে। এরূপ বাহিনীর মূল নিয়ন্ত্রণভার থাকে মামুনের হাতে। ক. একটি ডিভিশন বাগদাদের তাহেরি সামরিক সরকারের অধীনে কর্মরত থাকে। এর প্রধান কাজ হলো বাগদাদ নগরের শান্তিরক্ষা করা এ ছাড়াও সোয়াদ, ইরাক ও ফারেস প্রদেশ তাদের ক্ষমতার আওতাধীনে ছিল। প্রয়োজনবোধে সাম্রাজ্যের যে কোনো স্থানে শান্তিরক্ষার

তারা অবদান রাখবে। খ. একটি ডিভিশনের নেতৃত্ব ছিল মামুন পুত্র আব্বাসের হাতে। গ. দ্বিতীয় ডিভিশনের মূল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল জাজিরা সগুর ও ওয়াসির উপর। ঘ. তৃতীয়টির উপর কর্তৃত্ব ছিল মুতাসিমের। বাইজানটাইন সীমান্তে শান্তিরক্ষাই তাদের কর্তব্য; তবে আজারবাইজান এবং তৎসংলগ্ন স্থানের জন্য তারা ছিল সংরক্ষিত শক্তি হিসেবে। মুতাসিমের বাহিনী মিশর, সিরিয়ার শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে তবে বাইজানটাইন সীমান্তের জন্য সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবে থাকে। এসব বাহিনীর উপর ছিল মামুনের কর্তৃত্ব।[২৫]

খ. তাঁর বহুমুখী কর্মের মূল্যায়ন ঃ মামুনের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি যুগধর্ম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সে অনুসারে কাজ করতে প্রয়াস চালান। তিনি অনুধাবন করেন বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের শান্তি প্রগতির পথে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ছিল অন্যতম অন্তরায়। তিনি শিয়াদের সহানুভূতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইমাম উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি শিয়া সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট না করতে পারলেও ইমাম উপাধিটি পরিত্যাগ করেন নি; বরং তিনি ভেবেছিলেন যে, যে পথকে তিনি সত্য হিসেবে বিবেচনা করবেন, ইমাম হিসেবে সেই পথের নির্দেশনা দিতে পারবেন। ইতোপূর্বে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হন। কেননা তিনি তার বক্তব্যের পশ্চাতে কোনো তাত্ত্বিক সমর্থন দিতে পারেন নি। অথচ তাঁর এ সময়টি ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ সময় মুসলিম উম্মার বিকাশে উল্লম্ফন ঘটে। অসংখ্য জাতিসত্তা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকায় কেবল ধর্মীয় সমস্যাই বৃদ্ধি পায় নি বরং নতুন নতুন সামাজিক সমস্যাও বৃদ্ধি পায়। সাম্রাজ্যে কুটির শিল্পের বিকাশ, নতুন খনিজ সামগ্রির আবিষ্কার, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচণ্ড অগ্রগতির সাথে ক্ষুদে ও বৃহৎ বণিক সমাজের বিকাশের ফলে শুল্ক সমস্যার সাথে সাম্রাজ্যের নানা রকম নতুন আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একই সাথে বাগদাদ বিশ্ব সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় বিভিন্ন দেশের ও জাতির ধর্মতত্ত্ব, আইন বিধি, নিয়ম ও প্রথা সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে মুসলিম বিদ্যুৎসমাজের নিবিড় পরিচয় ঘটে। তাই তৎকালীন মুসলিম বিদ্যুৎসমাজ কেবল ধর্মতত্ত্ব নিয়েই দিন কাটাতে পারে নি এবং বিকাশমান উম্মার ধর্মীয়, আর্থিক, সামাজিক নানাবিধ সমস্যার সমাধান খুঁজতে তারা ব্রতী হন। ফলে নানা ধরনের ব্যবহারিক বা ধর্মীয় চিন্তা-পদ্ধতি গড়ে ওঠে। বস্তুত এ সময় Schools of law, movements of sects was in the process of formulating its answer not only to theological questions but also to the pressing social and political problem of the time এ সময় দুটি চিন্তা পদ্ধতি প্রাধান্য পায়। প্রথমত মধ্যপন্থী আহালুস সুন্নাহদের মধ্যে আহমদ ইবনে হাম্বলের নেতৃত্বে হাম্বলী মাযহাব পূর্ণরূপ লাভ করে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে। শাবান মনে করেন যে, ঐ মাযহাবের বৈষয়িক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় তারা আহ্লুস সুন্নাহ্র মধ্যে চরম দক্ষিণপন্থী। তারা

মৌলবাদী ইসলামের প্রবক্তা হিসেবে তাদের অবস্থান ক্রমাগতভাবে দৃঢ় করেন। ইসলামের চিরায়ত ব্যাখ্যার সমর্থনে তাঁরা ঐশী বাণীর চিরন্তনতা ও সার্বভৌমত্ববাদে আস্থাশীল ছিলেন। তারা যে কোনো নতুনকে বেদায়াত বলে প্রত্যাখান করাকে সঠিক পথ বলে মনে করতেন।

দ্বিতীয়ত, রক্ষণশীল হাম্বলী মাযহাবের পাশে গতিবাদী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ছিল চিত্তাকর্ষক। এরা ছিলেন অনেকাংশে মুক্তবুদ্ধির অধিকারী। যেহেতু মানব সভ্যতার ইতিহাসে মধ্যযুগে ধর্মই ছিল মানবিক মূল্যবোধের একমাত্র বাহন তাই তারা যুক্তিনির্ভর ধর্মতত্ত্ব নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। তারাই মধ্যযুগে বিশ্বের প্রথম বুদ্ধিজীবী সমাজ যারা অনড় বস্তুতত্ত্ব প্রত্যাখান করে গতিবাদী মানবিক তত্ত্বের প্রতি সমর্থন দান করেন। তারা ধর্ম, বিজ্ঞান, অক্‌ল-নক্‌ল বা কর্তৃত্ববাদ ও যুক্তিবাদ এর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে যুক্তিসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ব (Speculative theology) নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। হাম্বলীদের বিপরীতে তারা বলেন যে, কোরআন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তাই আল্লাহর সাথে ঐশীবাণী অন্যান্য সৃষ্টির মত অনড়, সার্বভৌম, চিরন্তন বা নিরঙ্কুশ নয় বরং আপেক্ষিক। মামুন অনুধাবন করেন যে, তাদের মতাদর্শ বাস্তব সমস্যা বিবর্জিত কোনো কূটতর্কের ধূম্রজাল বিস্তারের বিষয় নয়। ধর্মের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করলে সময়ের প্রয়োজন অনুসারে ধর্মাদর্শের তথা মূল্যবোধের বিকাশ সাধিত হতে পারে। এ কারণে মুতাজিলা মতবাদ তৎকালীন শিয়া বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করে। তিনি আরো অনুধাবন করেন যে, ঐশী নির্দেশনা ব্যতীত সকল প্রকার সামাজিক পরিবর্তন, পরিমার্জন ও প্রগতি সম্ভব। তিনি আরো উপলব্ধি করেন যে, এ মতবাদ শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তি হতে পারে। প্রথমে তিনি নয়া চিন্তনের আলোকে ধর্মীয় মৌলনীতিগুলি নিয়ে বড় বড় আলেমের সাথে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অবশেষে ইসলামি উম্মার বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করেন। সম্ভবত আল মনসুরের কাঙ্ক্ষিত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য ছিল এটা তার বড় পদক্ষেপ। মনসুরের স্বৈরতন্ত্র কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; মামুন সে কাজটি সম্পন্ন করেন।[২৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মনসুর লড়েছিলেন চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে; উদারপন্থীদের পক্ষে; মামুন লড়েন উদারপন্থী সুন্নিদের রক্ষণশীল অংশের বিরুদ্ধে সামাজিক গতিবাদের পক্ষে। দুজনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন, সমস্যা ছিল ভিন্ন, তাই তাদের তাৎক্ষণিক সমাধানও ছিল ভিন্ন। বস্তুত মামুন কেবল একজন জ্ঞান পিপাসু খলিফা ছিলেন না বরং সমগ্র আব্বাসী বংশের অনন্য শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক কূটকৌশলী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

গ. তার কর ব্যবস্থা ঃ মামুনের উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হয় তাঁর গৃহীত কর ব্যবস্থার মধ্যে। পূর্বাঞ্চলে তিনি প্রায় এক চতুর্থাংশ কর হ্রাস করেন। বলা চলে এটা তিনি বিশেষ পরিস্থিতিতে করতে বাধ্য হন। কিন্তু অন্যত্র তার পদক্ষেপ প্রমাণ করে

তাঁর উদার রাজস্বনীতি। রায় প্রদেশে তিনি ২-১০ মিলিয়ন দিরহাম কর হ্রাস করেন। সোয়াদে করদাতাদের মঙ্গলেব জন্য মুকাসামা ব্যবস্থার সমন্বয় করেন, উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে ২.৫ অংশ সরকারি রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। কুম জেলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন বিশেষ কারণে অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ তাবারীর মতে, সেখানে কর নির্ধারণ ন্যায়সঙ্গত ছিল। লোভী ব্যবসায়ীদের দ্বারা ভোক্তারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য বাগদাদে ওজন ব্যবস্থার সংস্কার করেন। মুদ্রাস্ফীতি বেতনভুক নির্ধারিত আয়ের গ্রুপের জনসমাজে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল বলে তিনিই প্রথম সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন।[২৭]

ঘ. অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বাবেক আন্দোলন ঃ বাস্তব বড় রূঢ়। তিনি সাম্রাজ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যখন বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে সময় যুগপৎ তিনটি স্থানে গোলযোগ দেখা দেয়। স্থান তিনটি: ক. বাইজানটাইন সীমান্ত, খ. মিশর, গ. আজারবাইজান। গৃহযুদ্ধের সময় বাইজানটাইন শক্তি কোনো সুযোগ গ্রহণ করে নি। তবে সাগুর এ সময় বাগদাদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এর ফলাফল তারা অনুভব করতে থাকে। বাইজানটাইন সরকার মামুনের সাথে আন্তঃসীমান্ত ব্যবসায়ের সুযোগ ও সুবিধার জন্য আলোচনায় বসলে তা ফলপ্রসূ না হওয়ায় উভয়পক্ষের মধ্যে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং সীমান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আজারবাইজানে গোলযোগ দেখা দেয় এবং অচিরেই তা বিদ্রোহের রূপ নেয়। অনেক সুবিধে দেয়ার বিনিময়ে বিদ্রোহিরা বাইজানটাইন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করে, এভাবে সেখানে বাবেকের নেতৃত্বে তথাকথিত খুররামিয়া বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।[২৮] সৈয়দ আমীর আলী মনে করেন যে, বাবেক ছিল খুররামি সম্প্রদায়ের ম্যাজিয়ান শাখার অন্তর্ভুক্ত। এরা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ছিল। তারা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মের নৈতিক বিধান স্বীকার করত না। তারা সর্বত্র লুটতরাজ চলাত এবং স্বাধীন মানুষদেরকে দাসে পরিণত করত।[২৯]

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন যে, বাবেক বিদ্রোহের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না—বরং এর প্রকৃতি ঐ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে যে, আজারবাইজানে অসংখ্য আরব অভিবাসীদের আগমনে এখানে সম্পদের উপর চাপ পড়ে। আজারবাইজানের কিয়দংশ ছিল উর্বর সমতল ভূমি; অপর অংশ ছিল খনিজ সমৃদ্ধ পাহাড়ি অঞ্চল। সমতল ভূমিতে পুনর্বাসিত আরবরা বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন দেয়; কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলের আরব অধিবাসীরা বিদ্রোহের বিরোধীপক্ষ। এরাই ছিল সমস্যার মূলে। এ অঞ্চলে বিদ্রোহের কারণ মামুনের নিকট স্পষ্ট ছিল। খনিজপণ্যের কর আরোপ-ই ছিল সমস্যার মূলে। ইসলামের প্রথম যুগে খনিজ সামগ্রীর উপর কর আরোপ করা হত না। এ সময় ধরে নেয়া হয়েছিল যে, খনিজ মূলত যুদ্ধেপ্রাপ্ত সম্পদের মত, তাই সরকারের প্রাপ্য এর ১.৫ অংশ। আইনের ভাষায় খনিকে বলা হয় রিকাজ (Treasure trove)। আজারবাইজান অঞ্চল অধিকৃত

হওয়ার পর খনি আবিষ্কার হলে এটা তার অঞ্চলে পরিণত হয়। আইনবেত্তারা খনিজ সম্পদ নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করেন এবং রিকাজের একটি সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেন। রিকাজ সকল খনিজ সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হলে তার উপর কতটা কর নির্ধারণ করতে হয়? সরকার ১.৫ অংশ কর আরোপের পক্ষে এবং ধীরে ধীরে এদিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মনসুর সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে লবণ এবং পরিশোধিত তেলের উপর কর আরোপ করেন। মামুনের সময় প্রায় ৪০ প্রকার খনিজ দ্রব্যের উপর কর আরোপ এবং তা আদায় করা হলে সাধারণ লোকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি রুষ্ট হয়। আরব অধিবাসীরা খনি দখল করে বসলে স্থানীয়রা তাদের অধিকার রক্ষায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। বাইজানটাইনরা আপন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ বিদ্রোহকে উৎসাহিত করে; বস্তুত তাদের সমর্থনে বাবেকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে মিশরে গোলযোগ থাকা সত্ত্বেও মামুন ঐ বিদ্রোহ দমনে আজারবাইজানে গমন করেন।[৩০]

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মিশরে আরবদের মধ্যে অশান্তি বিরাজমান ছিল এবং তারা গৃহযুদ্ধের সময় দুভাগে বিভক্ত হলে মামুনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামরিক অভিযানে মিশরে দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মামুনের শাসনকর্তারা স্থানীয়দের মূল অভিযোগের কোনো প্রতিবিধান করেন নি। এখানে মূল সমস্যাটি ছিল রাজস্ব সংক্রান্ত। এ সময় মিশরে কপটদের মধ্যে ইসলাম সুদৃঢ় হতে থাকে; কিন্তু নব দীক্ষিত মুসলমানরা কর সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়। সাধারণ স্বার্থে তাই আরব কপটদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহ সমগ্র মিশরে ছড়িয়ে পড়লে মুতাসিমের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মামুনকে বাইজানটাইন সীমান্ত রণক্ষেত্র ত্যাগ করে মিশরে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি আফশিন। দ্রুত বিদ্রোহ অবদমিত হয় এবং মামুন রাজস্ব সংস্কার কাজে হাত দেন। মামুন অনুধাবন করেছিলেন যে, মাহদীর সময় কর দ্বিগুণ হওয়া অন্যায় ছিল না কেননা এ সময় মুদ্রাস্ফীতি ছিল আকাশচুম্বী। তিনি যে, আরবদের হাতে জমি একীভূত ছিল; অনেক কপট মুসলিম হওয়ায় কর নির্ধারণ এবং আদায়ের কাজে নিয়োজিত গির্জা অকেজো হয়ে পড়ে। সুতরাং নতুনভাবে কবলা প্রথা গ্রহণ করা হয়। নয়া প্রথা অনুসারে স্থানীয় করদাতা সমাজের মধ্য হতে স্বেচ্ছায় কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণে কর দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইলে সরকার কেবল তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে। তাকে সেচ ব্যবস্থার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে, সে জন্য সকল খরচ সরকার বহন করবে। তৎকালীন সময় কর বকেয়া পড়লে তাও সরকারকে বিবেচনা করতে হবে। ফুসতাত মসজিদে বিভিন্ন স্থানের জন্য নির্দিষ্ট কর নির্ধারণের ঘোষণা দেয়া হয়। অবশ্য কর ব্যবস্থাকে নিলামে চড়ান হয় নি। যে ব্যক্তি সরকার প্রদত্ত ন্যায় শর্ত স্বীকার করে কেবল তার সাথেই চার বছরের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তিনি কোনো কোনো স্থানে কপটদেরকেও কর আদায়কারী নিয়োগ করেন।[৩১]

ঙ. মামুনের বাইজানটাইন নীতি ঃ মিশরে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর মামুন পুনরায় বাইজানটাইন রণক্ষেত্রের দিকে মনোযোগ দেন। এ সময় তার উদ্দেশ্য ছিল তুরাস পর্বতমালা ঘেঁসে আওয়াসিম (সেনানিবাস) গঠন—যার কেন্দ্র হবে আওয়ানা, তায়ানা এর চতুর্মাথায়। বাইজানটাইন সীমান্তে শান্তি রক্ষা কাজে লিপ্ত থাকার সময় তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন।[৩২]

মামুন কেবল শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা চেয়েছিলেন তাই নয়। তিনি আব্বাসী সাম্রাজ্যের ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এ সময় আব্বাসী বিপ্লবের আত্তীকরণ প্রক্রিয়া এক নতুন ব্যঞ্জনা পায়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহ বিকাশে অগ্রগতি হয়; কিন্তু সাম্রাজ্যের অন্য ধর্মাবলম্বীরা কোনোক্রমে অবহেলিত হয় নি। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়েই একটি রাষ্ট্রপরিষদ গঠিত হয়। সকল ধর্মের মানুষে ধর্মীয় অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করত।

৫.৮ মুক্তবুদ্ধি ও মামুন

মামুন ছিলেন সত্যের সন্ধানী। তার সামাজিক সচেতনতা গতানুগতিক পথ-মত তাঁকে অন্ধ করে দিতে পারে নি। মামুন শিয়া মতাদর্শ খুঁটিয়ে দেখেন, কিন্তু এ সময় মুক্তবুদ্ধি আন্দোলন তাঁকে স্পর্শ করে এবং তার মধ্যে তিনি মানবমুক্তি তথা তার দেশ, ধর্ম, সমাজ ও মানুষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখেন। এই মুক্তবুদ্ধির সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের মুতাজিলা বলা হয়। তারা প্রচলিত মতাদর্শের প্রতিবাদ করেন। প্রচলিত ধারা মতে মানুষের প্রত্যেক কাজ পূর্ব নির্ধারিত অর্থাৎ মানুষ স্বাধীন নয়, তারা তাদের ভাগ্য দ্বারা পরিচালিত; শেষ বিচারের দিনে আত্মার পুনরুত্থান ঘটবে; মানবীয় চোখে আল্লাহ পরিদৃষ্ট হবেন; আল্লার গুণাবলী তাঁর সত্তা থেকে পৃথক; কোরআন শরীফ সৃষ্টিবস্তু নয়—তাঁর অস্তিত্বের সাথে আদিকাল থেকে তা বিদ্যমান। শেষোক্ত মতাদর্শ হতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আদিম এবং পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রদত্ত সাময়িক বিধান ও চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। মোতাজিলারা মনে করতেন মানুষ ভালো ও মন্দের বিচার করে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার অধিকারী; আত্মার পুনরুত্থান ঘটতে পারে না; আল্লাহ মূর্তিমান নন, সে কারণে মানবীয় চোখে পরিদৃশ্যমান হতে পারেন না। আল্লাহ্‌র সেফাত তাঁর সত্তা হতে পৃথক নয় এবং কোরআন তার সৃষ্ট; নইলে তাঁর একত্ব থাকে না। মানুষের কাজকর্মের সম্পর্কে কোনো চিরস্থায়ী বিধান থাকতে পারে না। যে স্বর্গীয় বিধান মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তা উন্নতি ও পরিবর্তনের ফলস্বরূপ; স্রষ্টা বিশ্বকে যে পরিবর্তনের অধীন করেছেন তাও ঐ একই পরিবর্তনের অধীনে।[৩৩]

মামুন কেন ও কিভাবে মুতাজিলা মতবাদ গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়। তিনি তাঁর স্বভাবজাত মহৎ উদ্দেশ্যে এ মতবাদ গ্রহণ করেন

এবং অনেক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজে তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং এ মতাদর্শের প্রসারে যত্নবান হওয়ার পূর্বেই তিনি প্রয়াত হন। সমাজের গভীরে তা প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না; কেননা, সমাজে তখন কায়েমি স্বার্থ অনেক দৃঢ়মূল ছিল; প্রথম সুযোগে তাই তার এরূপ মতাদর্শের বিকাশে খড়গহস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

এরূপ বিপ্লবী মতাদর্শ তার সময় কেন বিকশিত হয়? নিঃসন্দেহে এরূপ চিন্তন কোনো সমাজে আকস্মিক জন্ম নেয় না, বস্তুত আল মনসুরের আরব সাম্রাজ্যে যে সংস্কৃতির বীজ বপণ করা হয়, হারুনের যুগে তা বেশখানিক অঙ্কুরিত হয়। মামুনের কালে তা বিকশিত হয়। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাগদাদে বিশ্বজ্ঞান ভাণ্ডার গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন বলে ঐতিহাসিকরা যথার্থই তাঁর যুগকে অগাস্টাস যুগ বলে চিহ্নিত করেন। মামুনের রাজদরবার জাতি ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, চিকিৎসক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, বৈয়াকরণ, হাদিস সংগ্রাহক সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। সকলকে তিনি দিতেন উদার পৃষ্ঠপোষকতা। ফলে তার সময় নয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। মনসুর ও হারুনের সময় বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডুলিপি ও পুস্তক সংগ্রহের কাজ চললেও মামুন গ্রীক, পারসিক ও সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন দেশ হতে অসংখ্য পাণ্ডুলিপি ও পুস্তক যথাযথ সংগ্রহের কাজ করেন এবং একই সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চর্চার জন্য তিনি বাগদাদে ৮৩০ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যানিকেতন 'বায়তুল হিকমা' গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল গ্রন্থাগারই ছিল না, এখানে বিভিন্ন ভাষায় লেখা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি আরবিতে অনুবাদ করার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদুপরি এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রশিক্ষণের কাজেও ব্যবহৃত হত। বস্তুত প্রাচীনকালের আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিকে ছাড়িয়ে যায়।

ইতিপূর্বে গ্রীক নাটক, কাব্য এবং গ্রীক ইতিহাসের প্রতি আর্কষণ সৃষ্টি না হলেও গ্রীক ভেষজবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অংক, দর্শনের প্রতি আরবদের আগ্রহের অভাব ছিল না। প্রথম পর্যায়ের গ্যালেন, হিপোক্রাটিসের চিকিৎসাশাস্ত্রের; ইউক্লিডের এলিমেন্ট, টলেমীর কুয়াড্রি পাবটি-টাম অনুবাদ করা হয় এবং সিরীয় খ্রিষ্টান ইউহান্না বিন সামাওয়াহ্ অনুবাদ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বটে তবে মামুনের সময় পুনরায় সেগুলো অনুবাদ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুবাদ কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন হুনাইন বিন এসহাক, তিনি ছিলেন হিরার একজন ইবাদি খ্রিষ্টান। গ্রীক ভাষায় তার ব্যুৎপত্তি ছিল বলে মুসা বিন শাকিরের তিন পণ্ডিত পুত্র তাকে গ্রীক ভাষাভাষী দেশে প্রেরণ করেন মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার জন্য। তারাও স্বাধীনভাবে অনুবাদকার্যে লিপ্ত ছিলেন। হুনায়েন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ভেষজবিদ জিব্রাইল বিন বখতিওর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। মামুন তাকে বায়তুল হেকমার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ

করেন। পদাধিকারবলে তিনি অনুবাদ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তদীয় পুত্র ইসহাক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হুসাইন বিন হাসান তাকে সাহায্য করেন। তাঁর আরো দুজন ছাত্র ইসা-বিন-ইয়াহিয়া এবং মুসা বিন খালেদও তাকে সহায়তা করেন। সম্ভবত হুনায়েন প্রথমে গ্রীক হতে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাঁর সহকর্মীরা সিরীয় ভাষা হতে আববিতে অনুবাদ করেন। হুনায়েন, গ্যালেন, হিপোক্রেটিস, ডিওম কোরিডেস এর পুস্তক ছাড়াও প্লেটোর রিপাবলিক, এ্যারিস্টটল এর কেটিগোরাস, ফিজিকম এবং ম্যাগনামুরালিয়া অনুবাদ করেন। গ্যালেনের সাতটি জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তক বিনষ্ট হলেও আরবি অনুবাদের মাধ্যমে তা টিকে থাকে। হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ-বিন-মাতার মামুনের জন্য ইউক্লিডের এলিমেন্ট পুস্তকটির অনুবাদ করেন।

মামুনের রাজত্বকালে বিষুবরেখা, গ্রহণ, ধূমকেতুর ছায়া নির্ণয় এবং আকাশ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয় তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের গবেষণা হতে পৃথিবীর গোলাকৃতি প্রমাণিত হয়। তাদমুর প্রান্তরে সামসিয়ায় মামুন প্রথম বিজ্ঞান মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এসব বিজ্ঞান চর্চার কার্যক্রমের ফলে অংক, জ্যামিতি, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যায় প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত হয় বলে কাগজ তৈরি কারখানার যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি সপ্তাহে একদিন সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার জন্য রাজপ্রাসাদে গুণিজনের এক সভা আহবান করতেন।[৩৪]

৫.৯ খেলাফতে মোতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) : তাঁর সেনাবাহিনী গঠন নীতি

মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে আল মামুন আপন পুত্র আব্বাসকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত না করে ভ্রাতা আবু ইসহাক মোহম্মদকে মনোনয়ন দান করেন। এটা একটি বিরল ঘটনা। পুত্র আব্বাস সৈন্যদের এবং আরবদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন, তথাপিও তাঁর দাবি প্রত্যাখান করে মামুন আবু ইসহাক মোহম্মদকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন কেন? আমির আলী মনে করেন যে, মামুন নীতি অনুসরণ করতে পারবেন সম্ভবত পুত্রের উপর মামুন এমন আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি; বরং তিনি তাঁর ভ্রাতা তাঁর কর্মপন্থা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অধিকতর যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন।[৩৫] শাবান বিষয়টি একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখেছেন; মামুনের ঐ কার্যক্রমের মধ্যেও তাঁর সহজাত আপোষমুখিতার আর একটি বড় উদারহণ বলে ভেবেছেন। তাঁর ভ্রাতাও সেনাবাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন, এবং তার সাথে আফশিনের সম্পর্ক হতে ধরে নেয়া যায় যে, পূর্বাঞ্চল হতে আগত সৈনিকদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল অনেক বেশি। তৎকালীন বাস্তব অবস্থায় এটা ছিল একটি জরুরি বিবেচ্য বিষয়।[৩৬]

উক্ত মনোনয়ন অনুসারে তারসুস রণাঙ্গনেই ৮৩৩ সালে আগস্ট মাসে আবু ইসহাক মোহম্মদকে খলিফা ঘোষণা করা হয়। এ সময় হতে তিনি মুতাসিম

বিল্লাহ বলে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। ঐ ঘোষণার সাথে সাথে মামুন পুত্র আব্বাসকে খেলাফতে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর একাংশ বিদ্রোহ করে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আব্বাস স্বয়ং পিতৃব্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় অভ্যুত্থানটি ব্যর্থ হয়।[৩৭]

সেনাবাহিনী পুনর্গঠন সম্পর্কে মোতাসিমের নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা ছিল। এর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে তায়ানা দুর্গ নির্মাণের কাজ স্থগিত করার আদেশ দেন। বাইজানটাইন সরকার এটাকে নব নিযুক্ত খলিফার দুর্বলতা ভেবে সম্ভবত বিদ্রোহী বাবেকের সাহায্য করার জন্য সীমান্ত অঞ্চল কাপাডোসিরা আক্রমণ করে অগ্নি সংযোগ ও লুটতরাজ চালায়। মোতাসিম এর যথাযোগ্য উত্তর দেন। বাইজানটাইন হামলা কেবল প্রতিহত করা হয়, তাই নয়, বরং বসফোরাস অভিমুখে অভিযান পরিচালনাও নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তাঁর আপন শিবিরে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে উক্ত অভিযান মুলতুবি করা হয়। মোতাসিমের বুঝতে বাকি রইল না যে ঐ মারাত্মক চক্রান্তের পশ্চাতে ছিল তাহেরী ও আবনা নেতারা; তারা আব্বাসকে শিখণ্ডি হিসেবে ব্যবহার করছিল। তিনি আব্বাসসহ ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন।[৩৮] আফশিনকে বাবেক বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করা হয়। মুতাসিম বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

বাগদাদে ক্ষমতায় সুদৃঢ় হয়েই মুতাসিম তাঁর বহু দিনের লালিত সেনা পুনর্গঠন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রসর হন। তাঁর ঐ পরিকল্পনায় ছিল দুটি প্রধান অংশ : ক. একটি নিরাপদ সেনানিবাস গঠন; খ. আরব অনারব সকল জাতিসত্তা হতে উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করা। বাগদাদ হতে ৬০ মাইল উত্তরে সামাররা নামক একটি নতুন শহর তিনি নির্মাণ করেন। এই নব গঠিত শহরে তিনি তাঁর সদর দপ্তরও স্থানান্তর করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁর পিতা হারুন ইতিপূর্বে তার সদর দপ্তর রাক্কায় স্থানান্তর করেন। গৃহযুদ্ধের সময় বাগদাদ নগরী এতই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, তার পুনর্গঠন করার চাইতে অন্যত্র একটি রাজধানী নির্মাণের কথা ভাবা হয়েছিল।[৩৯] মোতাসিম নব নির্মিত নগরে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানান্তর করেন বটে; কিন্তু সাধারণ লোক এটাকে বলত আসকার বা সেনা শিবির।[৪০] এটাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। সামাররায় তার নিজের জন্য একটি প্রাসাদ, দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের জন্য সেনানিবাস এবং এক লক্ষ ষাট হাজার অশ্বের জন্য আস্তাবল নির্মাণ করেন। নগরের একটি অংশ সেনাধ্যক্ষদের জন্য রাখা হয়।

নয়া সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য পূর্বাঞ্চলে ও ককেসীয় অঞ্চলে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালান হয়।[৪১] মধ্যএশিয়া, ইয়েমেন, মিশরের উচ্চ ভূমি হতে অসংখ্য ব্যক্তি নয়া সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। যারা অকসাস নদীর অপর পার হতে আসত তাদেরকে বলা হত ফারাগানী; আফ্রিকা-ইয়েমেন হতে আগতদেরকে

বলা হত মাগরেব; তাদের নিজস্ব সেনাপতিরা তাদের পরিচালনা করতেন এবং এই সব সেনাপতি ছিলেন সরাসরি খলিফার অধীন। এরা আরব ও ইরানি সৈন্যদল থেকে সম্পর্ণ পৃথক ছিল।[৪২] বিভিন্ন জাতিসত্তা হতে সৈন্য সংগ্রহ কোনো অভিনব ঘটনা ছিল না। হারুন এ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন; মামুন এ ব্যাপারে বেশ সফলতা অর্জন করেন; তবে মুতাসিমের সাফল্য ছিল অনেক বেশি। এ সাফল্যের মূলে ছিল ঐ সময় ককেসীয় ও মধ্যএশিয়ায় ইসলামের অনুপ্রবেশ, তদুপরি সরকারের নিয়মিত প্রচেষ্টা ছিল।[৪৩]

মোতাসিম কেন রাজধানী বাগদাদ হতে সামাররায় স্থানান্তরিত করলেন—সে প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তার মতামত প্রকাশ করে বলেন যে, সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারিতা হতে সম্ভবত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শঙ্কিত হায় এ কাজটি করেন। শাবান এরূপ মতামত মেনে নিতে পারেন নি বরং তাবারীর বরাত দিয়ে বলেন যে, বাগদাদের নাগরিকরাই সেনা জোয়ানদেরকে উত্যাক্ত করে।[৪৪]

সাধারণ ইতিহাস সাহিত্যে মোতাসিমের নবগঠিত সেনাবাহিনী তুর্কী সৈন্য নিয়ে গঠিত বলে ধারণা দেয়া হয়। আমীর আলী এর উপর একটি উপশিরোনামও করেছেন, অথচ পরক্ষণে তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁর নয়া সেনাবাহিনী তুর্কী ও অতুর্কী-বিভিন্ন জাতিসত্তা সদস্যদের নিয়ে গঠিত।[৪৫] শাবান তাঁর নবগঠিত সেনাবাহিনীর তুর্কী নামকরণের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন তাঁর সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল অতুর্কী।[৪৬]

প্রফেসর শাবান আর একটি সাধারণ ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে, তথাকথিত তুর্কী বাহিনী ছিল মূলত দাস বাহিনী।[৪৭] এরূপ ধারণার সবচেয়ে বড় কারণ পূর্বাঞ্চলের অনারব সৈনিকদেরকে তুর্কী বলে মেনে নেয়া এবং তাদের নেতাদের অনেকের নামের সাথে গোলাম, আবদ বা খাদেম পদ সংযোজিত ছিল। আবদ, গোলাম, খাদেম শব্দত্রয়ের অর্থ দাস ধরে নেয়া হয়। শব্দত্রয়ের অনুসঙ্গের সাথে যে ঐতিহাসিক বিবর্তনধারা জড়িত আছে যে সম্পর্কে শাবানের মতামত খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জাতিসত্তা হতে সেনা সংগ্রহের নীতি হারুনুর-রশীদ, আল মামুন হতে চলে আসছিল, মোতাসিমের সময় তা একটি পরিণতি পায়। হারুনের সমগ্র আব্বাসী বাহিনীকে বলা হত খলিফার মওয়ালী, মামুনের সময় সেনাবাহিনী নেতাদের বলা হত মাওলায় আমিরুল মোমেনিন। প্রাচ্যের জাতিসত্তা হতে সৈন্য সংগ্রহ অভিযান হয় ব্যাপক। প্রাচ্যের জাতিসত্তার সদস্যরা তাদের নিজস্ব নেতার অধীনে দলে দলে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিত; তাদের নেতাদের অধিকাংশই হতেন স্থানীয় রাজপরিবার বা সামন্ত পরিবারের সদস্য। সোগদানিয়ার উশ্রুসানার আফসিন একটি বড় উদাহরণ। তাবারী এরূপ অসংখ্য গ্রুপ নেতাদের একটি তালিকাও পরিবেশন করেছেন।[৪৮] প্রাচীন প্রাচ্যের সামরিক ঐতিহ্য অনুসারে ঐ

নেতাদের অনুগামীদেরকে বলা হত 'চাকর'। এটা একটি ফারসি শব্দ যার অর্থ হল দাস। মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্তরা (নাইট) তাদের রাজার জন্য যেরূপ সামরিক দায়িত্ব পালন করত– ঐ চাকর বাহিনীও তদ্রূপ সামরিক সেবা দিত তাদের নেতাদেরকে। প্রাচ্যের এই সামরিক ঐতিহ্য বাগদাদে চালু করা হয়। চাকর বাহিনীর নেতারা খলিফার মাওলা বলে অভিহিত হন। প্রাচ্য অঞ্চল হতে যারা ব্যক্তিউদ্যোগে এসেছিল এবং যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পেরেছিল, তারা সরাসরি খলিফার চাকর হয়ে যান। তার পদ-মর্যাদা বুঝার জন্য বলা হয় গোলাম। চাকর ও গোলাম সমার্থবোধক। চাকর পদটি আরবিতে এসে হয়েছে শাকেরিয়া। বাগদাদে তাহেরীদের শাকেরিয়া বাহিনী বাগদাদে পুলিশের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

সামরিক যোগ্যতা প্রদর্শন করলে খলিফার গোলামকে ক্বায়েদ বা সেনাধ্যক্ষের পদ দেয়া হয়। এবং বিশেষ প্রশাসনিক যোগ্যতা থাকলে তাকে ওয়াসিফ এবং পরে খাদেম পদমর্যাদা দেয়া হত। এক্ষেত্রে খাদেমকে গৃহভৃত্যের সাথে গুলিয়ে ফেলা চলে না। বস্তুত মাওলা, খাদেম অথবা যে কোনো ব্যক্তির সর্বোচ্চ পদই ছিল আবদে আমিরুল মোমেনিন।[৪৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাধারণত বলা হয় যে, মুতাসিম চার হাজার তুর্কী দাস ক্রয় করে তার একটি বাহিনী সৃষ্টি করেন। শাবান মনে করেন যে, প্রথমত আরবি সূত্রে প্রদত্ত সংখ্যাগুলো আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়; দ্বিতীয়ত তুর্কী দাসের মূল্য এতই চড়া ছিল যে তা ক্রয় করে সেনাবাহিনী গঠন করা ছিল একেবারে অসম্ভব। বস্তুত সমরকুশলী মোতাসিম প্রাচ্য জাতিসত্তা হতে সেনা সংগ্রহের সর্বাত্মক চেষ্টা চালান এবং তাদের যারা সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তিনি তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন; তবে তাদের আন্তঃবিবাহ নিষিদ্ধ করেন। এ জন্য মোতাসিম অনেক দাসী ক্রয় করেন এবং তাদেরকে সৈনিকদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে উৎসাহিত করেন। In short the myth that Turkish slaves were the mainstay of the army at that time has no foundation what so ever.[৫০]

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাবেক এবং তার অনুগামীরা বিগত প্রায় দু দশক ধরে বাগদাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আসছিল। এর কারণও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মোতাসিম ক্ষমতারোহণের পরপরই সম্ভবত বাইজানটাইন সরকারকে আব্বাসী সীমান্ত আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ হয়। মোতাসিম বাইজানটাইন সীমান্ত সমস্যার সমাধান করেই বাবেকের বিরুদ্ধে আফসিনের নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আফশিন বিদ্রোহ দমন করে সামাররায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিজয়গর্বে স্ফীত আফশিন স্বদেশভূমি সোগদানিয়ার উপর তাহেরীদের মত স্বায়ত্তশাসন অধিকার দাবি করেন তাই নয়, বরং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামন্তদের উপর নিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রার্থনা করেন। তার এ আব্দার রক্ষা করা মোতাসিমের পক্ষে সম্ভব ছিল না; কেবল ঐসব অঞ্চলের

উপর তাহেরীদের বশংবদ সামানীদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। প্রাচ্য অঞ্চলে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ঐ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে; আফসিনের আব্দার রক্ষা করলে উক্ত ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি। আফশিন বাড়াবাড়ি করলে তাকে বন্দি করা হয়। মজার ব্যাপার তার অনুগামীরা মোতাসিমের প্রতি অনুগত থাকে।[৫১]

মোতাসিমের সময় তাবারিস্তান অশান্ত হয়ে ওঠে। এখানে স্থানীয় রাজেন্য ম্যাজিয়ার বিদ্রোহ করে বসেন। এতদ্বঞ্চলে মাহদীর সময় হতে ইসলামের অনুপ্রবেশের সূচনা হয়; ম্যাজিয়ার খলিফা মামুনের একজন বিশ্বস্ত মাওলা হিসেবে গর্ববোধ করতেন। তার মত একজন অভিজাত সামন্ত শাসক তাহেরীদের বশ্যতা স্বীকারে স্বচ্ছন্দবোধ না করার কথা। এ কারণে অচিরে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। তদুপরি নিজস্ব জনতার উপর তার নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা দুরূহ হয়ে ওঠে; ক্যাসপিয়ান সাগরের সমৃদ্ধ বন্দরের বণিকদের সঙ্গে তাহেরী শাসক চক্রের সুসম্পর্ক থাকায় ম্যাজিয়ারের কর আদায়কারীদের সাথে তারা সৌজন্যমূলক আচরণ করে নি। তদুপরি মামুন চালুসে একটি সেনা শিবির স্থাপন করেন। এই দুর্গের সৈন্যরা জনসাধারণের সম্পত্তি দখল করে বসে। এ সব কারণে ম্যাজিয়ার অসহিষ্ণু হয়ে সেনা ছাউনী হতে কয়েকজনকে গ্রেফতার করেন এবং সেনানিবাস গুড়িয়ে দেয়ার আদেশ দেন। স্বৈরাচারের পক্ষে এটা ছিল অসহ্য। কেন্দ্রীয় ও তাহেরী দুমুখী আভিযান চালিয়ে তাকে দমন করে।[৫২] আমীর আলী বলেন যে, ম্যাজিয়ারকে আব্দুল্লা বিন তাহির বাগদাদে প্রেরণ করেন। বাগদাদে এসে তিনি বলেন যে, আফশিন তাকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচনা দেয়।[৫৩] মধ্যযুগে এই ঘটনা অসম্ভব নয়। যাহোক তাদের দুজনকে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

মোতাসিম মামুনের মত কূটনীতি বিশারদ অথবা প্রতিভাবান কোনোটাই ছিলেন না। তবে তিনি মামুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যত্নবান ছিলেন। তিনি মামুনের সামাজিক ও ধর্মীয় নীতি অব্যাহত রাখেন। মামুন প্রবর্তিত বিশেষ ধর্ম বিচার আদালত চালু থাকে। তিনি মোতাজিলাদের প্রতি সমর্থন দেন।[৫৪] তাঁর করনীতি অনুসরণ করেই কর ব্যবস্থায় কিছু প্রাসঙ্গিক সংশোধন করেন এবং রাজস্ব প্রশাসনে একটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পূর্বে সর্বদা এ বিভাগটি অভিজ্ঞ সরকারি আমলাদের দায়িত্বে থাকত। এ সময় রাজ্যে বণিক শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার পরিচালনায় তাদের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভূত হয় বলে সরকার তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য বাগদাদের ধনী ব্যবসায়ী মোহম্মদ বিন আব্দুল আজজাইয়াতকে কাতেব বা উজির পদে নিয়োগ করেন। এ পদে তিনি প্রায় বার বছর বহাল থাকেন। এ সময় ইরাকে বসবাসরত অনেক অনারব ধনি-বণিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। এদের অনেকে বড় ভূস্বামী হলেও তারা মূলত বাণিজ্য স্বার্থের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। মোতাসিমের এ পদক্ষেপ সম্ভবত তাঁর অজ্ঞাতসারে সামন্ততন্ত্রী বনাম বণিকতন্ত্রী এক

নতুন ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব বিকাশোন্মুখ হয়। মোতাসিম ইবনে জাইয়াতের অনেক পদক্ষেপ পছন্দ করতেন না। তার মৃত্যুর পর ইবনে জাইয়াত অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন এবং পারস্য উপসাগর দিয়ে মূল্যবান আমদানি পণ্যের উপর হতে নানা ধরনের কর বিলোপ করেন।[৫৫] এরূপ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু বিলাস দ্রব্যের উপর হতে কর বিলোপ করা হয় এতে কেবল ধনীরাই উপকৃত হয়। বস্তুত এ পদক্ষেপটি ধনী শ্রেণীর স্বার্থেই ছিল।[৫৬]

সামাররা নগর নির্মাণের সময় তার পূর্বসূরিদের অনুসরণ করে মোতাসিম অসংখ্য দোকান ঘর নির্মাণ করেন। এতে বার্ষিক প্রায় ১০ মিলিয়ন দিরহাম শুল্ক তাঁর হস্তগত হয়।[৫৭]

মোতাসিমের উপর সামাররা প্রধান বিচারপতি আহমদ বিন দাউদের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। এই বিচারপতি ছিলেন একজন মোতাজেলা। মোতাসিমের বহু পদক্ষেপের পশ্চাতে আহমদ বিন আবু দাউদের প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। মধ্য এশিয়ায় ফারগানায় একটি নদী খনন কাজে তিনি মুতাসিমকে দু মিলিয়ন দিরহাম ব্যয় করতে রাজি করান।[৫৮] তাঁর রাজত্বকালে ভারত মহাসাগর দিয়ে পূর্ব-আফ্রিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাল বিস্তৃত হয়। বস্তুত তাঁর সময়টি ছিল ইসলামি বিশ্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যাহ্নকাল। এ সময় পারস্য উপসাগরের মধ্য দিয়ে ভারতীয় দস্যুদের প্রচণ্ড উৎপাত শুরু হয়। তারা বসরা অঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণ করে এবং উত্তরে ওয়াসিত-বসরার যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটায়। মোতাসিম দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবস্থা আয়ত্বে আনেন।[৫৯] আমীর আলী এদেরকে ভারতীয় জাঠ গোষ্ঠীর লোক বলে অভিহিত করেন।[৬০] মুতাসিম ৮৪২ সালে প্রয়াত হন।

৫.১০ সিংহাসনে ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) : আব্বাসী স্বর্ণযুগের অবসান

মুতাসিম প্রয়াত হলে তার পুত্র আবু জাফর হারুন আল ওয়াসিক বিল্লাহ তার উত্তরাধিকারী হন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন এবং পিতার সকল নীতি অব্যাহত রাখেন। শাসন কাজের প্রতি পিতার মত এত উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হয় না।[৬১] রাজ্যের প্রশাসন মোটামুটিভাবে ইবনে জাইয়াতই নিয়ন্ত্রণ করতেন। দুজন সামরিক ব্যক্তির উপর সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন আশনাস এবং পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন ঈতাখ। এ ব্যবস্থায় পূর্বাঞ্চলে তাহেরী কতৃত্ব আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, এমন কি তারা সোয়াদে পুলিশী দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করে। আব্দুল্লা বিন তাহির প্রয়াত হলে তার পুত্র একই পদমর্যাদা ও দায়িত্বে সমাসীন হন।[৬২]

তাঁর রাজত্বকালে মোতাজিলা মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। গৃহযুদ্ধের সময় হতে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অভ্যুদয় হয়, তারা আবনা

নেতাদের সমর্থন লাভ করে এই প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করে।[৬৩] এ আন্দোলন সহজে দমন করা হয়। নেতাদের কাউকে কারারুদ্ধ, কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আন্দোলনটি অবদমিত করা গেলেও নির্মূলিত করা যায় নি। কেননা মামুন হতে ওয়াসিকের রাজত্বকাল পর্যন্ত যে রূপ ইসলামি সাম্রাজ্যের নয়া আর্থ-সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে নতুন সামাজিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই সামাজিক দ্বন্দ্বের একদিকে ছিল সামন্ত শক্তি অপর দিকে ছিল উদীয়মান সামন্ত-বণিক শক্তি। প্রতিষ্ঠিত সামন্ত শক্তির সমর্থনে মৌলবাদীরাই বিশেষভাবে হাম্বলী সম্প্রদায় পরবর্তীকালে ঘটনার গতিধারা বদলে দেয়।[৬৪] এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোকপাত করা হবে। আমীর আলী মনে করেন যে, ওয়াসিক ছিলেন একজন উত্তম রাষ্ট্র প্রধান, এবং মহানুভব। তাঁর প্রশাসন ছিল দৃঢ় ও উন্নত। আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করলেও তার ব্যক্তি চরিত্র ছিল নিন্দার উর্ধ্বে। সাহিত্যের প্রতি ছিল তার ঝোঁক। এবং সঙ্গীতে পারদর্শী; সম্ভবত তিনি একশ রাগ ও সুর রচনা করেন।[৬৫]

৫.১১ আব্বাসী বৈদেশিক নীতি

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জাবযুদ্ধে উমাইয়া বংশের পতনে সশস্ত্র আব্বাসী বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপ এই তিন মহাদেশব্যাপী গড়ে ওঠা ইসলামি বিশ্বের উত্তরাধিকার বর্তায় আব্বাসী বংশের উপর। স্বাভাবিকভাবে তার সমগ্র উত্তরাধিকারের ঐক্য-সংহতি রক্ষা করা ছিল তার প্রাথমিক দায়িত্ব, তদুপরি তার প্রগতি, সমৃদ্ধি ও শান্তিস্থাপনও ছিল তার প্রধান কর্তব্য। স্পেনে এ সময় এক অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে যায়। জাবযুদ্ধে পরাজয়ের পর ছয় বছর অতিবাহিত হতে না হতে স্পেনে উমাইয়া বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরাজিত পরিবারের মধ্যে যারা আস-সাফফাহ্-এর প্রতিহিংসা এড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন আব্দুর রহমান। তিনি স্পেনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে স্পেনে উমাইয়াদের এক নয়া ইতিহাস রচনা করেন। আব্বাসী বংশের জন্য এটা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। আব্বাসী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মনসুর এ অবস্থাকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি।

৭৬৩ সালে ইফ্রিকিয়ার আব্বাসী শাসনকর্তা স্পেনের পুনঃজয়ের প্রয়াস চালান। কিন্তু স্পেনের সিংহাসনে সদ্য অধিষ্ঠিত আব্দুর রহমান আদ-দাখিল তার প্রচেষ্টা কেবল ব্যর্থই করেন নি, আব্বাসী সেনাপতির ছিন্ন মুণ্ডুটি আব্বাসী খলিফাকে নাটকীয়ভাবে উপহার দেন। আব্দুর রহমানের জনৈক গুপ্তচর আব্বাসী সেনাপতির কর্তিত মস্তকটি সমর্পণে মদিনার দরবারে উপবিষ্ট মনসুরের সামনে ছুড়ে দেয়। কেউ জানতেও পারে নি কে সেটি বয়ে এনেছিল। এ ঘটনায় মনসুর হকচকিয়ে যান এবং এক বাজ পাখি এবং খলিফার মাঝখানে প্রশস্ত সমুদ্র স্থাপন করার জন্য আল্লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[৬৬] বস্তুত ঘটনাটি এবং আব্বাসী বিপ্লব হতে উদ্ভূত ইসলামি সাম্রাজ্যের

অভ্যন্তরীণ বিকাশধারা ও নতুন সমস্যা আব্বাসী বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। আব্বাসী নীতি নির্ধারক মনসুর সম্প্রসারণবাদী অগ্রগামী নীতি পরিহার করে সীমান্তবর্তী দেশসমূহের সাথে সহঅবস্থান নীতি গ্রহণ এবং উত্তরাধিকারের অভ্যন্তরীণ সুদৃঢ়করণ, প্রশাসনিক বিকাশ সাধন এবং নয়া সংস্কৃতি লালন-পালন নীতির স্বপক্ষে আত্মনিয়োগ করেন। সকল আব্বাসী খলিফা মূলত নীতিগতভাবে মনসুরের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেন। তাঁরা ইসলামি বিশ্বের এককেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বহু কেন্দ্রিকতার নীতি গ্রহণ করেন। তারা কোনো দিন স্পেনকে আব্বাসী সামাজ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রয়াস চালান নি। আব্বাসী খলিফাদের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবধর্মী এবং দূরদর্শী।

আব্বাসী খেলাফতের প্রাধান্যের যুগে দশম শতাব্দী পর্যন্ত তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের প্রতি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানই ছিল তার বৈদেশিক নীতির প্রধান দিক। চীন ও ভারতের সাথে গড়ে ওঠে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। তাই ঐ মহান দু দেশের সাথে কোনো প্রকার বৈরী রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা জানা যায় না। হারুনের দরবারে চীনের ফগফুরের (সম্রাটের) প্রেরিত রাজদূতকে জ্ঞাপন করা হয় আন্তরিক অভ্যর্থনা।[৬৭] মনসুর একই নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন পুরনো শক্তি বাইজানটাইনের সাথে; কিন্তু উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যকার ভূ-রাজনৈতিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া এড়ান সম্ভব হয় নি বলে এ নীতি যথার্থ অর্থে কার্যকর হয় নি। কেননা উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক বৈরীতা ছিল ইতিহাসের জের। যে জের মাঝে মধ্যে প্রবল হয় অবস্থার অনুপাতে।

আব্বাসী বিপ্লব চলাকালে বাইজানটাইন আরবের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিতে চাইলে আব্দুল্লা বিন আলীকে গ্রীষ্মকালীন অভিযানে বাইজানটাইন সীমান্তে প্রেরণ করা হয়। পথিমধ্যে মনসুরের মনোনয়নের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করলে বাইজানটাইন শক্তি তাদের আগ্রাসী কার্যকলাপ আরম্ভ করে এবং ৭৫৫ সালের শেষ নাগাদ মালাতীয়া দুর্গটি গুড়িয়ে দেয়। প্রথমে খোরাসানী বাহিনীর একাংশ দিয়ে মালাতিয়া পুনর্দখল করা হয়; দুর্গটি পুনর্গঠিত হলে পুনশ্চ সেখানে সামরিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে খোরাসানী বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। সীমান্তটি সুরক্ষিত রাখার জন্য সিরিয়া এবং জাজিরা হতে সৈন্য সংগ্রহ করে সীমান্তবর্তী শিবিরসমূহের পাশে তাদেরকে জমিজমা মঞ্জুরী দিয়ে অভিবাসনে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয় এবং মাসিক ৮০ দিরহাম বৃত্তি প্রদান করা হয়।[৬৮]

মুসলিম বিশ্ব এবং বাইজানটাইন শক্তির মধ্যকার শতাধিক বর্ষের পুরনো বৈরীতা পুনরায় মাথাচাড়া দেয় খলিফা আল-মাহদীর সময় (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.)। হিট্টি বলেন ঃ The more than century old struggle between the caliphate and Byzantine empire was resumed by the calipha al Mahdi.[৬৯] তাদের মধ্যকার পুরনো

বৈরীতার তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে হিট্টি মনে করেন যে, আব্বাসী বিপ্লবের ফলে তাদের রাজধানী সিরিয়া হতে বাগদাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় সম্ভবত বাইজানটাইনরা তাদের সীমান্ত রেখা ইসলামি অঞ্চলে সম্প্রসারিত করতে উৎসাহিত হয়; প্রাথমিক কিছু ঘটনা এটাই নির্দেশ করে। যাহোক মাহদী অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পর ৭৭৮ সাল হতে তার সেনাবাহিনী সীমান্ত সেনা শিবিরে নিয়োগ এবং গ্রীষ্মকালীন অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৭০] এরূপ ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। বাইজানটাইনরা ইসলামি সীমান্তে প্রবেশ করে মার-আশ দখল করে, বাজার গঞ্জে লুটতরাজ চালায় ও ভস্মীভূত করে। সেনাপতি হাসান বিন কাহতাবা তাদেরকে পশ্চাদাপসরণে বাধ্য করেন এবং স্বয়ং তাদের পশ্চাদধাবন করে অনেকগুলো শহর ও গঞ্জের ধ্বংস সাধন করেন। সুযোগ বুঝে বাইজানটাইনরা পরে পুনরায় ইসলামি সীমান্তে হামলা পরিচালনা করলে স্বয়ং খলিফা মাহদী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তদীয় পুত্র মুসাকে অন্তর্বর্তীকালীন রাজ প্রতিনিধি হিসেবে বাগদাদে রেখে মাহদী মোসুল হয়ে রণক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করেন। আলেপ্পোকে করা হয় রাজকীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়। ইসা বিন মুসা, আব্দুল মালিক বিন সালেহ, হাসান বিন কাহতাবা প্রমুখ সমর নেতাদের সমন্বয়ে একটি অগ্রগামী বাহিনী গঠিত হয়; হারুন এই বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। যথাসময় এই বাহিনী বাইজানটাইনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। এই বাহিনীর প্রবল আক্রমণে সামালিয়ন ও অন্যান্য স্থান অধিকৃত হয়। এই ঘটনার পর মাহদী রাজধানী বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। আর্মেনীয়া ও আজারবাইজানসহ পশ্চিমাঞ্চলে হারুনকে রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ শক্তিশালী করা হয়। শাবান মাহদীর এই পদক্ষেপের ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই অঞ্চলে বিপুল পরিমাণের কর কেবল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বরাদ্দ করা হবে।

৭৮১ সালে মেগাথাকোমিসের নেতৃত্বে বাইজানটাইন শক্তি একবার ইসলামি রাজ্যের উপর ঝাপিয়ে পড়ে।[৭১] অগণিত স্বেচ্ছাসেবী ছাড়াও হারুন এবার ৯৫৭৯৩ জন সৈনিকের এক বিপুল বাহিনী নিয়ে শত্রুর আগ্রাসন প্রতিহত করেন। তার বিজয়ী বাহিনী রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের অপর পারে বসফোরাসে এসে উপস্থিত হয়। রানি আইরীন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শান্তি ভিক্ষা করেন। মজার ব্যাপার চতুর্থ লিওর বিধবা ঐ রানি পুত্র ষষ্ঠ কনস্ট্যান্টিনাইন বাইজানটাইনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ঐ রানি মাতার প্ররোচনায় যুদ্ধের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়। যাহোক পুনরায় বাইজানটাইন সরকারের সাথে তিন বছর মেয়াদি একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। বাইজানটাইন সরকার বছরে দুবার ৭০ হাজার দিনার কর দিতে বাধ্য হয়। হারুনুর রশীদ বাহিনীর পথ প্রদর্শন এবং তাদের প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করতে তারা রাজি হয়। রসদ সরবরাহের জন্য একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। শাবান মন্তব্য করেন যে, এরূপ যুদ্ধ বিগ্রহে সম্ভবত লুটের মাল সংগ্রহ করা তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না।

তিনি বলেন : In deed this was one of the most peculiar featurs of Byzantine Muslim wars in the Abbasid Time, both armies in there advance into each other's territories actually bougth their provisions from the enemies. One can conclude that booty was not a primary objective in these wars or that because of the strong holds on both sids of the frontiers, acquiring booty was only difficult that it was not attemted in exceptional circum stances.[৭২]

মধ্যযুগে দু'পরাশক্তি বাইজানটাইন ও ইসলামি বিশ্বের মধ্যকার বৈরীতা চরম সীমায় পৌঁছায় খলিফা হারুনের রাজত্বকালে (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) হারুনের ক্ষমতারোহণের সময় উভয় শক্তির মধ্যকার সম্পাদিত শান্তিচুক্তির মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়। বাইজানটাইন সমস্যা সম্পর্কে সবচেয়ে সচেতন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্বয়ং খলিফা হারুন। তিনি তাঁর রাজত্বকালের প্রথম চার বছর (৭৮৬-৭৮৯ খ্রি.) আপনাকে সীমান্ত প্রতিরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাখেন। এ সময় সামন্ত এলাকার বাস্তব অবস্থায় বেশ পরিবর্তন ঘটে। তাঁর পিতার সময় বাইজানটাইন সীমান্ত জুড়ে সেনা উপনিবেশ (সগুর) প্রতিষ্ঠিত করে যে শাক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করা হয়েছিল, সামরিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে এ সময় তা অনেকখানি অকেজো হয়ে পড়ে। ঐ সামরিক উপনিবেশগুলো সামরিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে। আব্বাসী সৈনিকরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ বা সীমান্ত রক্ষার চাইতে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা পুনর্বাসনে উৎসাহিত হয়। সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলটি মূলত উভয় দেশের পণ্য বিনিময়ের জন্য বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। বস্তুত সমগ্র এলাকাটি করমুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। শত্রু পক্ষকে সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশে বাধা না দিয়ে বরং তাদের গমনাগমন উৎসাহিত করা হয়। এ অঞ্চলে সামরিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করার জন্য আরবদেরকে জমি মঞ্জুরী দেয়ায় ধীরে ধীরে অঞ্চলটি করমুক্ত হয়ে যায়। তারা তাদের অবসর সময় আপন জমিতে ফসল ফলানোর প্রতি মনোযোগ দেয়। তাদের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত ফসল জমা হয়– যার জন্য তাদের দরকার ছিল বাজারের; আর বাইজানটাইনই ছিল এরূপ প্রয়োজনীয় বাজার। উভয় রাজ্যের সীমান্তে পণ্য লেনদেনের ফলে আরব সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ কারণে হারুন উত্তর সীমান্তের ঐ সকল প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তুরাস পর্বতমালার দক্ষিণ ঢালে তারসুস আলেপ্পোর মাঝে নতুন প্রতিরক্ষা লাইন গঠন করেন। এই নয়া সামরিক ঘাঁটিকে সগুর না বলে নামকরণ করা হয় আওয়াসীম।[৭৩] নবায়নকৃত তারসুস দুর্গে তিন হাজার সৈন্যকে বদলি ভিত্তিতে স্থান দেয়া হয়; পরিত্যক্ত ম্যাসিসা ও এন্টিয়ক সেনা নিবাস হতে আরো দু হাজার সৈন্য নিয়ে আসা হয়। তাদেরকে অতিরিক্ত দশ দিনার বৃত্তি মঞ্জুর করা হয় এবং গৃহায়ণের জন্য ভূমি মঞ্জুর করা হয়, তবে কাউকে আবাদি জমি প্রদান করা হয় নি। কেননা তারসুস ছিল শত্রুর তোপের মুখে। অন্যান্য সেনা উপনিবেশে এ রূপ

ব্যবস্থা দেয়া হয় নি। যা হোক ৭৮০ সালে তারসুসের নতুন আওয়াসিমের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন আব্দুল মালিক বিন সালেহ। এ সকল ব্যবস্থার পর নয়া সামরিক ঘাঁটি মেম্বিজ হতে প্রতি বছর প্রথা-সিদ্ধ গ্রীষ্ম অভিযানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বারবার বাইজানটাইন পক্ষ শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করায় তাদের উপর যুদ্ধ চাপানো হয়। কয়েকবার খলিফা হারুন স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। শত্রুপক্ষ প্রতিবার শোচনীয় পরাজয়বরণ করে নতুন শান্তি ভিক্ষা করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে।

বাইজানটাইন শক্তির বিরুদ্ধে হারুন বহুবার যুদ্ধাভিযান এবং প্রতিবারই সীমিত বিজয়ের পরও তিনি কন্সট্যান্টিনোপল দখল করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালান নি। সম্ভবত তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আদৌ সম্প্রসারণনীতির অনুকূল ছিল না—এ সত্য তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাইজানটাইনের বিরুদ্ধে হারুন কেবল সামরিক অভিযানই চালান নি বরং একই সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। জাব যুদ্ধের পর উমাইয়ারা স্পেনে তাদের বংশ প্রতিষ্ঠা করে এবং স্পেনকে তারা একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশীল বিশ্ব সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত করে। স্পেনের উমাইয়াদের সাথে ইউরোপের উদীয়মান ফ্রাঙ্কীয় শক্তির সাথে ছিল প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব; ফ্রাঙ্কীয় শক্তির সাথে বাইজানটাইন শক্তির মধ্যেও ছিল বিরোধ। হারুন এ বাস্তব অবস্থার সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ফ্রাঙ্কীয় সম্রাট শার্লিম্যানের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। শত্রুপক্ষ উমাইয়া ও বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে ঐ মৈত্রীচুক্তি কাজে লাগানোর আকাঙ্ক্ষা প্রসূত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। শার্লিম্যানেরও একই ধরনের স্বার্থ চেতনা ছিল। শার্লিম্যান যদি হারুনকে বাইজানটাইনের বিরোধিতায় উৎসাহিত করে থাকেন এটাই স্বাভাবিক; বাইজানটাইন তাই বারবার প্রতিটি সুযোগে সীমান্ত অশান্ত রাখতে তৎপর ছিল। এ কারণে অনেকে মনে করেন যে, এটা ছিল কেবল সীমান্ত বিরোধ; কেউই সম্ভবত বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পরস্পরের সাম্রাজ্য দখলের কথা চিন্তাও করে নি এবং এরূপ কল্পনা করাও সম্ভবত কোনো পক্ষের জন্য সম্ভব ছিল না। শার্লিম্যান ও হারুন তাদের পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উভয় দেশের মধ্যে দূত বিনিময় ও উপঢৌকনের আদান-প্রদান করেন বলে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

৮০৬ সালের পর বাইজানটাইন সম্রাট থিয়োফিলাসের রাজত্বকালে (৮২৯—৪২ খ্রি.) উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে দুবার শক্তি পরীক্ষা হয়। মামুনের সময় বাবেক বিদ্রোহকে উৎসাহিত করার জন্য আব্বাসী রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায় এবং লুটতরাজ করে। মামুন স্বয়ং তিনটি অভিযানের নেতৃত্ব দান করেন। গ্রীক রাজা শান্তি ভিক্ষা করলে তা মঞ্জুর করা হয়। মামুন গ্রীক আক্রমণ পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তারসুসের ৭০ মাইল উত্তরে তায়ানায় একটি দুর্গ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন; কিন্তু এ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে ৮৩৩ সালে তিনি প্রয়াত হন।[৭৪] দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ৮৩৮ সালে মুতাসিমের রাজত্বকালে। আব্বাসী সেনাধ্যক্ষ আফশিন মাজেন্দ্রানে বাবেক আন্দোলন

দমনে ব্যস্ত ছিলেন তখন থিয়োফিলাস আব্বাসী অঞ্চল কাপাডোসিয়া আক্রমণ করে এবং খলিফার জন্মভূমি জিবন্দ্রা ভস্মীভূত করে। মুতাসিম এর যথাযোগ্য উত্তর দেন। এক যুদ্ধে সম্রাটকে পরাজিত করে তার জন্মভূমি অ্যামোরিয়াম অবরোধ করা হয়। এর ফলে মুতাসিমের অজেয় বাহিনী প্রপন্টিম ও বসফোরাসের দিকে অগ্রসর হলে সম্রাট তার রাজধানীর পতনের আশঙ্কায় ভেনিসে ফ্রাঙ্ক রাজা এবং স্পেনে উমাইয়া দরবারে দূত প্রেরণ করে মুতাসিমের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে।[৭৫] রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের তাগিদে তার অগ্রগতি বন্ধ হয়।[৭৬] এই ঘটনার পর উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো বড় ঘটনা ঘটে নি। তবুও জনৈক আরব ভূগোলবিদ উল্লেখ করেন যে, বছরে তিনবার সীমান্ত এলাকায় সৈন্য সমাবেশের ঘটনা বার্ষিক রুটিন কাজে পরিণত হয়। প্রথম অভিযান চলত শীতকাল ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে; দ্বিতীয় অভিযান চলে বসন্তকালে ৩০ দিনের জন্য; আরম্ভ হত ১০ মে হতে; তৃতীয় অভিযান চলত ৬০ দিনের জন্য এবং তা আরম্ভ হত ১০ জুলাই হতে। Such raids served to keep the military force in good trim netted profitable spoits এসব সৈন্য সমাবেশের পশ্চাতে কোনো ধর্মীয় উত্তেজনা সম্ভব ছিল না।[৭৭]

তথ্যপুঞ্জি

১. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৮
২. ঐ পৃ. ২৪৯
৩. ঐ পৃ. ২৫১
৪. ঐ পৃ. ২৫০
৫. Shaban, op cit. pp 41-42
৬. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫২
৭. ঐ পৃ. ২৫৩
৮. ঐ পৃ. ২৫২
৯. ঐ পৃ. ২৫৩
১০. ঐ পৃ. ২৫৩
১১. ঐ পৃ. ২৫৩
১২. ঐ পৃ. ২৫৪
১৩. ঐ পৃ. ২৫৫
১৪. ঐ পৃ. ২৫৬
১৫. Shaban. op cit. p 41
১৬. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬০
১৭. Shaban. op cit. p. 42
১৮. Ibid, p. 43

১৯. Ibıd, p 43

২০. Ibıd, p 43-44

২১. Ibıd, p 45

২২. Ibıd, p 46

২৩. Ibıd, pp 46-47

২৪. Ibıd, p 50 51

২৫. Ibıd, p 52

২৬. Ibıd, p 53

২৭. Ibıd, pp 53-55

২৮. Ibıd, p 55

২৯. Ibıd, p 56

৩০. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৫-৬৬

৩১. Shaban pp 57-59

৩২. Ibıd, pp 59-61

৩৩. Ibıd, p 61

৩৪. Ibıd, p 54

৩৫. সৈয়দ আমীব আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭২-৭৩

৩৬ ঐ পৃ. ২৭৩

৩৭. ঐ পৃ. ২৭৫

৩৮. Shaban op cıt p 61

৩৯. Taban, vol III p 1168

৪০. Shaban op cıt p 62

৪১. Ibıd, p 62

৪২. Yaqubı, Buldan p 264

৪৩. Taban p III p 1199

৪৪. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৬

৪৫. Shaban op cıt p 02

৪৬. Ibıd, p 63

৪৭. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৫-৭৬

৪৮. Shaban op cit p 63

৪৯. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৫

৫০. Shaban op cıt p 64

৫১. Ibid, p 65

৫২. Ibıd, p 66

৫৩. Ibıd, p 66-67

৫৪. Ibıd, ppp 67-68

৫৫. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৯
৫৬. Tabari, vol. III, p. 1292
৫৭. Ibid, p 1363
৫৮. Shaban. op. cit. p. 69
৫৯. Yaqubi, Budan, p 257
৬০. Shaban. op. cit.p 68-67
৬১. Ibid, p 69
৬২. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ৯৯
৬৩. Shaban. op. cit. p. 67
৬৪. তারাবী, ৩য় খণ্ড পৃ. ১৩৩৮
৬৫. তারাবী, ৩য় খণ্ড পৃ. ১৩৪৩
৬৬. Shaban. op. cit. pp 63-70
৬৭. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৮০
৬৮. ঐ পৃ. ৪৬৩-৬৪
৬৯. Hitti, op. cit. p 296
৭০. Shaban op. cit. pp 12-13
৭১. Hitti, op. cit. p 299
৭২. Shaban. op. cit. p 25
৭৩. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৭-২৮
৭৪. Shaban. op. cit. p 25
৭৫. Ibid, p 26
৭৬. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৬
৭৭. Hitti, op. cit. p. 301

ষষ্ঠ অধ্যায়

আব্বাসী খিলাফতের রাজনৈতিক সংকটকাল

আধুনিক গবেষক ঐতিহাসিকগণ আব্বাসী খেলাফতের প্রথম ৯ জন খলিফার যুগকে আব্বাসী খিলাফতের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করেন।[১] তাঁরা দ্বিতীয় পর্বের সূচনাকাল ধরেন বংশের দশম খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭—৬১ খ্রি.) হতে এবং এ যুগের সমাপ্তি টানেন আল-মুহতাদি (৮৬৯-৭০) তে। সময়কালটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক উপাত্তের প্রাচুর্যে ভরা।[২] এ যুগকে আব্বাসী খিলাফতের সামাররাহ যুগ বলে অভিহিত করা হয়। তাদের রাজধানী ছিল সামাররায়। সামাররা যুগের খলিফাদের তালিকা নিম্নরূপ—
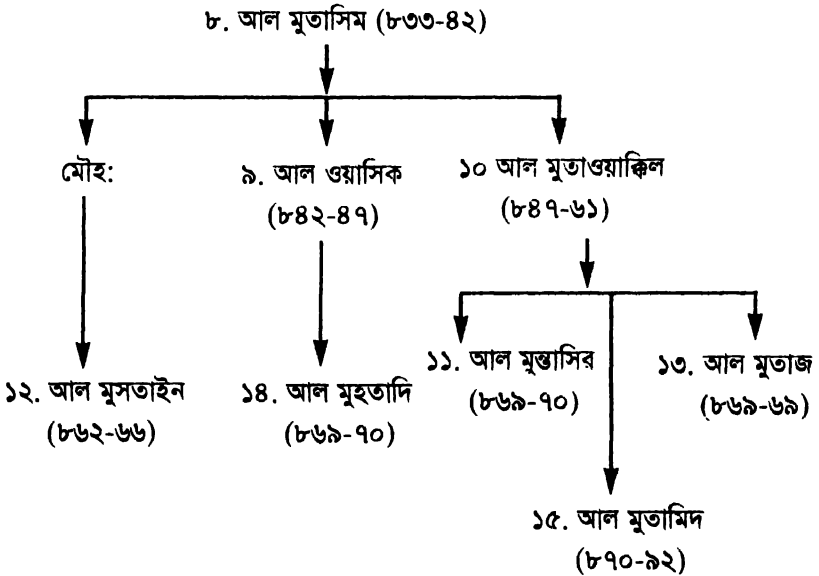
সাধারণত ইতিহাস সাহিত্যে মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালকে অবক্ষয়ের সূচনাকাল বলে ধরা হয়। ইতিহাসের আলোকে ৮৪৭-৭০ খ্রিষ্টাব্দের এই স্বল্প সময়ে উল্লিখিত ৫জন খলিফার উত্থান-পতনের কাহিনী বিবৃত করে তাদের রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ উপলব্ধি ও নয়া রাজনীতির উন্মেষের কার্যকারণ সম্পর্ক অনুধাবনের প্রয়াস চালানো হবে।

৬.১ নির্বাচনী কলেজে মোতাওয়াক্কিলের খেলাফতের মনোনয়ন : নয়া রাজনীতির সূচনা

আল ওয়াসিক ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত কবেন নি। কেউ কেউ মনে করেন শাসন কার্যক্রমে তিনি এতই অনাসক্ত ছিলেন যে, তিনি উত্তরাধিকার মনোনয়নের কাজটিও করেন নি।[৩] আধুনিক গবেষকরা এরূপ ভাবেন না; তারা মনে করেন যে, সে সময সম্ভবত ওয়াসিক অনুধাবন করেছিলেন যে, তার পরিবারে এমন কোনো সদস্য ছিলেন না, যিনি তার পূর্বসূরি মামুন-মুতাসিমের নীতির সফল প্রয়োগ করতে সক্ষম।[৪]

যা হোক, তাঁর মৃত্যুর পব আমীর অমাত্যগণ উত্তরাধিকার প্রশ্নে মীমাংসার জন্য এক সভায় মিলিত হন। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রধান বিচারপতি আহম্মেদ বিন আর দুয়াদ, দুজন সামরিক অধ্যক্ষ এবং প্রভাবশালী উজির ইবনে জাইয়াতসহ তিনজন বেসামবিক কর্মকর্তা। এ সময় এ বিষয় সামরিক কর্মকর্তাদের নিজস্ব কোনো পছন্দের ব্যাপাব ছিল না।[৫] তখন পর্যন্ত সমর নেতারা রাজা তৈরির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নি, যদিও সামসুদ্দীন মিয়া বিষয়টি অন্যভাবে দেখেছেন।[৬] ওয়াসিকেব নাবালক পুত্রেব মনোনয়নের প্রস্তাব গৃহীত না হলে প্রধান বিচারপতির প্রস্তাবক্রমে ওযাসিকের ভ্রাতা ২৬ বছব বযস্ক মুতাওয়াক্কিল খলিফা নির্বাচিত হন। আরবেব ইতিহাসে এটা কোনো অভিনব ঘটনা না হলেও আব্বাসী খিলাফতের বিগত একশ বছরে এই প্রথম এরূপ একটি ঘটনা সংগঠিত হয়। লক্ষণীয় যে, পরবর্তীকালে অনুরূপ ঘটনার এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত। মুতাওয়াক্কিল ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৬১ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫ বছব বাজত্ব করেন।

তাঁর পদক্ষেপসমূহ

মুতাওয়াক্কিল সম্পর্কে নির্বাচক মণ্ডলীর কিরূপ ধারণা ছিল তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে তাঁর কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে তাঁর মনন ও মানসিকতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। তাঁর কার্যকলাপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিকের মতাদর্শ বা শাসন পদ্ধতি কিছুই পছন্দ করতেন না। অথবা তিনি ভেবেছিলেন তৎকালীন বাস্তব অবস্থায় তাদের শাসন নীতি অকার্যকর। সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্বে আবু দুয়াদ বা ইবনে জাইয়াত যদি তার চিন্তাধারা বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতেন তাহলে হয়তো ঘটনা অন্যাখাতে প্রবাহিত হতো। খিলাফতে সমাসীন হয়েই তিনি সরকারের মধ্যে বেশ বড় ধরনের রদবদল শুরু করেন। প্রথমেই তিনি ইবনে জাইয়াতকে বরখাস্ত করেন। তিনি বিগত বিশ বছর ধরে প্রভাবশালী উজির বা কাতিবের পদে বহাল ছিলেন। তার সাথে তার অনুগামীকে সরকারি পদ পরিত্যাগ করতে হয়।[৭] তাঁর স্থানে আবুল ফজল আল জারজারাইকে

নিয়োগ করা হয়। উভয়ই ছিলেন তৎকালীন প্রধান দুটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিত্ব। ইবনে জাইয়াত ছিলেন মোতাজিলা মতবাদে বিশ্বাসী এবং বণিকতন্ত্রী। ক্ষমতায় সমাসীন থেকেও তিনি নানা ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। বণিক শ্রেণীর স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বস্তুত তারা ধনের পাহাড় নির্মাণ করেন। উচ্চ সমাজে খ্যাতিমান ব্যক্তি হলেও তিনি খুব জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন না।[৮] পক্ষান্তরে আল জারজারাই ছিলেন একজন ইরাকি রক্ষণশীল ভূস্বামী, অথচ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ আমলা। তাবারির মতে, তিনি ও তার সহকর্মীরা সামন্ত-ভূস্বামী হওয়ায় গ্রাম সমাজের উপর তাদের ছিল প্রচণ্ড প্রভাব।[৯]

সচেতনভাবেই আল-মুতাওয়াক্কিল গুরুতর প্রশাসনিক রদবদলের কাজে হাত দেন। তার প্রশাসনিক রদবদলের ইতিহাস পর্যালোচনা করে শামসুদ্দীন মিয়া যথার্থই মন্তব্য করেন।'Be Viewed in the perspective of this political aim.[১০ক] প্রশাসনিক পরিবর্তনের চেয়েও তাঁর মনে আরো দুটি বড় পরিকল্পনা ছিল :

ক. বিদ্যমান সামরিক শক্তি কাঠামোর পরিবর্তন ঘটান এবং তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে একটি ঐক্যবদ্ধ সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন। তাঁর এবং তাঁর জোয়ানদের মাঝে আফশিনের মত কোনো প্রভাবশালী সেনাধ্যক্ষের অবস্থান ছিল অবাঞ্ছিত।

খ. পূর্বাঞ্চল হতে তাহেরীদের স্বায়ত্তশাসন অধিকার ও বাগদাদ, সোয়াদ এবং ফারেসের উপর হতে তাদের দায়-দায়িত্ব রহিতকরণ।[১০]

পরিকল্পনাদ্বয়ের বাস্তবায়ন আদৌ সহজসাধ্য ছিল না বরং তা করতে গেলে তিনি শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হবেন তা ছিল নিশ্চিত, তবে তার আস্থা ছিল সতর্কতার সাথে এ পথে অগ্রসর হলে তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে তিনি একটি সহজ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাধারণ জনতার আস্থা অর্জন করেন। তিনি একজন সচেতন ব্যক্তি হিসেবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পূর্বসূরি মুতাসিম-ওয়াসিক জনতার ওপর মোতাজিলা মতবাদ চাপিয়ে দেয়ায় মৌলবাদী সুপণ্ডিত আহম্মদ ইবনে হাম্বলের নেতৃত্বে একটি প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে।[১১] এই প্রতিরোধ আন্দোলনের পশ্চাতে ধনী সামন্ত শ্রেণীর পূর্ণ সমর্থন থাকায় আপামর জনতার মধ্যে এ আন্দোলন দৃঢ়মূল হয়। সরকারি নির্যাতনের মুখে রক্ষণশীল মহলে হাম্বলীর প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পায়। মুতাওয়াক্কিল এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। এবং রক্ষণশীল ভূ-স্বামী শ্রেণী ও জনতার সমর্থন আদায় করার জন্য বিতর্কিত মতবাদ সরকারিভাবে বাতিল করেন। তাবারির মতে, যুক্তিবাদ নিষিদ্ধ এবং সনাতন মতবাদ পূর্ণদ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বলে ঘোষণা করে খলিফা একটি ফরমান জারি করেন। সরকারি পদ হতে যুক্তিবাদীদের বরখাস্ত করা হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে সভা-বক্তৃতা নিষিদ্ধ করা হয়।[১২] তার জেহাদ কেবল মুক্তবুদ্ধিদের উপর নির্যাতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি শিয়া-বিরোধী অবস্থানও গ্রহণ করেন। ইমাম হুসাইনের

সমাধি-সৌধ ধ্বংস করেন। তাদের ফাদাকের সম্পত্তিও পুনরায় বাজেয়াপ্ত করেন।[১৩] এখানেই তিনি ক্ষান্ত হয় নি। মামুনের সময় হতে যে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হয়, তিনি তা স্তব্ধ করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অমুসলিমদের গাধা-খচ্চর ব্যতীত ঘোড়ায় চড়া নিষিদ্ধ হয়; তাদের ধর্মমন্দির ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেয়া হয়; অমুসলিম শিশুরা মুসলিম স্কুলে প্রবেশাধিকার পাবে না বলে আদেশ জারি করা হয়।[১৪] যদিও তার বিঘোষিত অনেক নীতি ছিল প্রতিকী ধরনের তবুও দুটি ছিল প্রকৃতই অমুসলিম বিরোধী। ক. তাদেরকে সরকারি পদে নিয়োগ না করা; খ. তাদের বাসগৃহের উপর কর আরোপ করা। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বল প্রয়োগ করে তা প্রয়োগ করার উদ্যোগ নিলে সিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাবারী মনে করেন যে, বারংবার তার এ পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের ঘোষণা হতে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো কার্যকর করতে সরকারকে প্রচুর প্রতিরোধের মুখোমুখী হতে হয়।[১৫]

নয়া সেনাবিন্যাস

সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের জন্য তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল সেনা নেতৃত্ব দুর্বল করা। তার সৌভাগ্য তিনি সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই আশনাসের মৃত্যু হয়। তাহেরীদের নীরবতার সুযোগে মুতাওয়াক্কিল তার একজন প্রভাবশালী সেনাধ্যক্ষ ইতাখকে হজ্জব্রত হতে প্রত্যাবর্তনের সময় বাগদাদে গ্রেফতার করেন।[১৬] এ ঘটনার পর হতে তিনি তাহেরী শক্তি হ্রাস করার দিকে মনোযোগ দেন। মামুনের সময় হতে প্রায় ত্রিশ বছর যাবত তারা যে অধিকার ভোগ করছিল, তিনি তা বাতিল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তাহেরীরা বাগদাদ, সোয়াদ ও ফারেসে দৃঢ়মূল ছিল। তারা বাগদাদের রাজস্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেই প্রাচ্য অঞ্চলের উপর তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়। তদুপরি ভাগ্য তার প্রতি ছিল সুপ্রসন্ন। প্রথমত তাহেরীরা অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছিল। দ্বিতীয়ত একই বছরের মধ্যে তাদের অন্ততপক্ষে ৫ জন ব্যক্তিত্ব অপসারিত হয়। তিনজন প্রয়াত হন। ইয়াকুবী মনে করেন দুজনকে হত্যা করা হয়। তাবারী বলেন এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাহেরীদের অনেকে বাগদাদে আশ্রয় গ্রহণ করলে মুতাওয়াক্কিল শঠতার সাথে তাদেরকে শূন্য পদে নিয়োগ করেই তাহেরী নেতৃত্বে ক্ষমতা হ্রাস করেন।[১৭] তাদের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য তিনি আরো সূক্ষ্ম চাল চালেন। তাবারী মনে করেন যে, তিনি তার তিন পুত্রকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তাঁর ইচ্ছাপত্রে বিস্তারিতভাবে কোন পুত্র কি উপাধি ধারণ করবে এবং কখন কে সিংহাসনে আরোহণ করবে তার সব খুঁটিনাটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়। এটাও কোনো নতুন ঘটনা নয়। অবশ্য তার পূর্বসূরি মুতাসিম বা ওয়াসিক আদৌ উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন নি। কিন্তু তার তিন পুত্রের মনোনয়ন করার পশ্চাতে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র মুনতাসিরকে সিরিয়া ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল, মুতাজকে খোরাসান, তাবারীস্থান, আজারবাইজান ও পারস্য এবং মুয়াইয়াদকে হিম্‌স, দামাস্কাস, সিরয়া ও প্যালেস্টাইনের শাসনভার অর্পণ করা হয়। যেহেতু নব নিযুক্ত কর্মকর্তারা ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক তাই তাদের কাজের জন্য স্বয়ং মোতাওয়াক্কিল আইনগতভাবে দায়ী থাকবেন--অর্থাৎ প্রতিটি ব্যাপারে যে কোনো প্রদেশে সরাসরি তিনি হস্তপেক্ষ করতে পারবেন।[১৮] পূর্বাঞ্চলে তাহেরীরা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে তাদেরকে সৈন্যবাহিনী রাখার অনুমতি দেয়া হয়।

তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল সামাররা সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া। এ কাজটিও তিনি সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তাঁর পুত্রদের নিজস্ব শক্তিশালী সেনাবাহিনী না থাকলে ব্যাপক অঞ্চলের উপর তাদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সামাররা বাহিনী তিন ভাগে ভাগ করে তিন পুত্রের নিকট প্রেরণ করা হয়। যেহেতু প্রতিটি অঞ্চলের সকল দায়িত্ব অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদের উপর ছিল, সে কারণে তাদের প্রত্যেকের জন্য যোগ্য প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এভাবে তিনি প্রাদেশিক শাসন বস্তুত স্বহস্তে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[১৯] এভাবে তিনি একটি অভূতপূর্ব নয়া ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। এ ব্যবস্থাটি হল, শাসন কাজে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক মৈত্রীজোট গঠন।[২০] তাবারী যথার্থই বলেন, এরূপ ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে আরব সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে নয়া মোড় নেয়।

এই ব্যবস্থা হতে আরো একটি প্রতিষ্ঠান নয়া রূপ লাভ করে। তা হল ভূমি মঞ্জুরী (land grant) যা প্রতিটি বিভাগের উচ্চ কর্মকর্তাদের দেয়া হয়। সাধারণ জায়গীর হতে প্রশাসকরা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাত; নতুন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল কর্মকর্তাদেরকে আকৃষ্ট করা। তাবারী বলেন, তাহেরীদের ক্ষতিপূরণের জন্য জায়গীর প্রদত্ত হয়। উল্লেখ্য, ইকতা কোনো নতুন ব্যবস্থা নয়—তার পূর্বে শাসক পরিবার সদস্যদের এবং বিশেষ কাজের জন্য প্রিয় পাত্র-পাত্রীদেরকে জায়গীর দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এখন তা সামরিক নেতাদেরকে দেয়া হয়। যেখানে তারা প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে। বস্তুত মুতাওয়াক্কিলের নয়া ব্যবস্থাতেই সামরিক-প্রশাসনিক ইকতা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। এখানেই নিহিত ছিল তার অভিনবত্ব; পরবর্তীকালের রাজনৈতিক সংকটের কেন্দ্রবিন্দুও বটে।[২১]

মুতাওয়াক্কিল আপন অবস্থানকে সুদৃঢ় করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উজির জারজারাইকে বরখাস্ত করেন। উজিরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি এ কাজ করেন নি—বরং তিনি আরো নিশ্চিত দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অধিকতর যোগ্য এবং বিশ্বস্ত উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহহিয়া বিন খাকানকে তার স্থালাভিসিক্ত করেন। তার ইচ্ছা ছিল তিনি একটি নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করবেন, যা শাকিরিয়া (দেহরক্ষী বাহিনী) বাহিনীর মতই খলিফার একান্ত অনুগত হবে। তাবারীর মতে রাজস্ব ব্যাপারে খলিফার

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য মহা-হিসাব নিরীক্ষক পদের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। কিন্তু দেখা গেল এতে উজির উবাইদুল্লাহর ক্ষমতা হ্রাস পায়। এ কারণে উক্ত পদের বিলোপ করা হয়; ইবনে খাকানের পদ পুনরায় শক্তিশালী হয়।[২২] এবার উজির সেনাবাহিনী গঠনে তৎপর হন। সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের সব স্থান-সিরিয়া, জাজিরা, জাবাল, ইরাক, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, ককেসিয়া ইত্যাদি অঞ্চল হতে সৈন্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালান। বাগদাদের অনেকে এ বাহিনীতে যোগদান করে। সেনাবাহিনী গঠন কাজ পুরোদমে চলাকালে খলিফা রাজধানী সামাররা হতে অন্যত্র স্থানান্তর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ৮৫৮ সালে তিনি প্রথম দামাস্কাসে চলে গেলে সামাররা বাহিনী বিদ্রোহ করে। তিনি পুনরায় সামাররায় প্রত্যাবর্তন করেন।[২৩] অচিরেই সামাররার উপকণ্ঠে জাফরী নগর গঠন করেন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত হয়; কিন্তু নবগঠিত শহরে প্রযুক্তিগত বিভ্রান্তির কারণে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল।[২৪] এত সাফল্যের পর তিনি তাঁর অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি শাকিরিয়া বাহিনীর সাথে সামাররা বাহিনীর ঐক্য সাধনে ব্রতী হন। তিনি অনুমান করেছিলেন যে, তিনি সামাররা বাহিনীর অধ্যক্ষদের অপসারণ না করে এ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি সেনানেতাদের প্রদত্ত ভূমি মঞ্জুরী বাতিল ঘোষণা করেন। তাবারী বলেন যে, এই পদক্ষেপের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অর্থ অনুধাবন করতে সামাররা সমর নেতাদের বাকি রইল না। সমর নেতারা অবিলম্বে খলিফাকে ধরাধাম হতে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জাফরী নগরে তাঁকে হত্যা করা হয়।[২৫] সেই সাথে উজিরের ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেহ বিন খাকান ও শাকিরিয়া বাহিনীর সংগঠককেও হত্যা করা হয়। এভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের। এক নতুন রাজনৈতিক খেলায় পুরোপুরি বিজয়ের দ্বারদেশে উপনীত হয়েও তিনি ব্যর্থ হন। তার এই রাজনৈতিক খেলার ব্যর্থতা হতে জন্ম নেয় এক নতুন রাজনৈতিক সংকট।

৬.২ অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁর কৃতিত্ব একেবারে কম নয়। বাইজানটাইন সীমান্ত এলাকা প্রায় এক দশক শান্ত থাকার পর মুতাওয়াক্কিল এর সময় হঠাৎ উত্তপ্ত হয়। বাইজানটাইন শক্তি পূর্ব ভূমধ্যসাগরে নৌবহরের কার্যক্রম বৃদ্ধি করে এবং ৮৫২ সালে মিশরীয় উপকূলবর্তী দেমিয়াতের উপর নৌ-আক্রমণ চালায় এবং সিলিসিয়া বিধ্বস্ত করে। এই দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা রক্ষার জন্য সিরিয়া ও মিশরে নতুন করে দুর্গায়ন করা হয়। মিশরে নতুন নৌবাহনী গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাইজানটাইনের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। আলী বিন ইয়াহহিয়ার নেতৃত্বে বাইজানটাইন সীমান্তে পুনরায় নিয়মিত গ্রীষ্মকালীন অভিযান শুরু করা হয়। সামাররা বাহিনীর একাংশ সুমাইয়াতে সমাবেশ করা হয়।[২৬]

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, বাবেক বিদ্রোহ অবদমিত হয়েছিল; কিন্তু মুতা-ওয়াক্কিলের সময় পুনরায় তারা মাথাচাড়া দেয় এবং আরমেনিয়া ও আজারবাইজানে বিশৃঙ্খলা শুরু করে। বাবেক সমর্থক জনৈক আরর সামারবার কারাগার হতে পলায়ন করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা কবে। উক্ত বিদ্রোহেব প্রতি জনসাধারণের সমর্থন না থাকায় অতি সহজে তা দমন করা হয় এবং উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭] আরমেনিয়ায় গৃহ-কর পদ্ধতি চালু করা হলে আরব ও আরমেনীয়রা ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করলে সেখানেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৮] সিরিয়ায় গৃহ-কর আরোপ করায় হিম্‌সের খ্রিষ্টানরা বিদ্রোহ করে এবং অনেক মুসলিম তাদের প্রতি সমর্থন জানায়। অবশ্য এ বিদ্রোহ সহজে দমন করা হয়।[২৯] মামুন নুবীয়দেব সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুতাসিম তা এতই দৃঢ় করেন যে, নুবীয় রাজা কায়রো ও ইরাকে বাসগৃহ নির্মাণ কবেন। আবব কর্তৃক মিশর জযের পর লোহিতসাগর তীরবর্তী মিশরীয় সুদানী বেজা সম্প্রদায়ের লোকেরা মিশরের সাথে ভাল সম্পর্ক বক্ষা করে আসছিল; কিন্তু মুতাওয়াক্কিলের সময় তারা মিশরের উপর চড়াও হয়। মিশব বিজয়ের পব হতে শান্তিচুক্তি অনুসারে তারা আরবদেবকে কর হিসেবে বার্ষিক ৭৫ আউন্স সোনা দিত। উক্ত চুক্তি অনুসারে তাদের জায়গায় আরবদেরকে খনি হতে রৌপ্য উত্তলনের অনুমতি ছিল—এ সময তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে; খনিজ সামগ্রীব উপর কর আরোপ করা হলে তারা এটাকে চুক্তি ভঙ্গ বলে মনে করেন। মুতাওয়াক্কিলেব সময় তারা কর বন্ধ করে এবং আরব-মুসলিমদেরকে তাদের অঞ্চলে খনিজ পণ্য উত্তোলন বন্ধ করে দেয়। মুতাওয়াক্কিল একটি অভিযান প্রেরণ করে আরবদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করেন।[৩০] এভাবে তিনি তার প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সঙ্কোচিত হতে দেন নি।

৬.৩ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা

অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁর রাজত্বকালকে বিচার করলে সাম্রাজ্যের কোনো পশ্চাতগতি লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর রাজত্বের শেষেও কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চীখানায় চার মিলিয়ন দিনার এবং ৭ মিলিয়ন দিরহাম সংরক্ষিত ছিল। ৮৫৫-৬০ সালের মধ্যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কুমিস, জাজিরা, সিরিয়া, এন্টিওক ইত্যাদি ভূমিকম্পনের খবর দিয়েছেন তাবারী। শাবান মনে করেন এ সময় ইরাকে ইসলামের অগ্রগতি হয় কেননা অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়। শাবান চমৎকার এক তথ্য পরিবেশন করেছেন। বসরা অঞ্চলে আরব মুসলিমরা বছরে ছয় মিলিয়ন দিরহাম কর দেয়; বাগদাদে অমুসলিমরা ১,৩০,০০০ দিরহাম এবং ওয়াসিতে ৩০,০০০ দিরহাম জিজিয়া প্রদান করে। একটি সাধারণ হিসাব অনুসারে ধরা হয় মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বের শেষ প্রান্তে বাগদাদে ৪ হাজার এবং ওয়াসিতে এক হাজার অমুসলিম বসবাস করত। মুসলিম সমাজের এ বিস্তৃতি সম্ভবত তাঁর বৈষম্যমূলক নীতির ফলশ্রুতি।[৩১]

ব্যক্তি জীবনে খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল কতটুকু ধর্মপরায়ণ ছিলেন সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা কঠিন। তবে জনপ্রিয়তার জন্য তিনি রক্ষণশীল ধর্মীয় মতাদর্শ আঁকড়ে ধরেন।[৩২] যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মূলত তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রগতি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সমালোচনা করা গেলেও সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায় তাঁকে এক 'নিরো' বলে আখ্যায়িত করা চলে না। তাঁর সময় আর্থ-সামাজিক বা সামাজিক বিস্তৃতি না ঘটলেও তিনি তার উত্তরাধিকার আমরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময় সাম্রাজ্যের অবক্ষয় হয় বলে তাঁর সময়ের ইতিহাসকে অতি সরলীকরণ করা হয়। বস্তুত ঐ অবক্ষয় তাঁর অনেক পূর্বেই শুরু হয়। অবশ্য তাঁর সময় আব্বাসী রাজনীতির নতুন এক সংকট প্রকট হয় এবং তিনি সচেতনভাবে তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং শেষ অবধি প্রাণ হারান। সামরিক নেতা কর্তৃক মুতাওয়াক্কিলকে খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল আব্বাসী ইতিহাসের এক নয়া অধ্যায়। মুতাওয়াক্কিলের সেনাবাহিনীর নেতাদের ভূমি মঞ্জুরী দানও ছিল এক অভিনব অথচ এক বিপজ্জনক পদক্ষেপ। পুনশ্চ সামাররার সামরিক নেতারা তাঁকে হত্যা করে আব্বাসী ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই হত্যাকাণ্ড হতে আব্বাসী খলিফাদের রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের অবসান হয়। আমলা–সামরিক স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস আরম্ভ হয়। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে সূচিত হয় আব্বাসী সাম্রাজ্যের নবতর অধ্যায়। পরবর্তী কোনো খলিফাই তাদের পূর্ব-পুরুষদের মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি।

৬.৪ আল মুন্তাসির (৮৬১-৬২ খ্রি.)

সামাররা বাহিনী মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করার পর পরই তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মুন্তাসির বিল্লাহকে জাফরী নগরে খলিফা নির্বাচন করে। মুন্তাসির সাথে সাথে সেনাবাহিনীসহ সামাররায় প্রত্যাবর্তন করেন। অনেকে বলেন ফতেহ বিন খাকানের প্রভাবে মুতাওয়াক্কিল তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুতাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন বলে মুন্তাসির বাবার প্রতি রুষ্ট ছিলেন এবং সামাররার বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ঘটনা যাই হোক, মুন্তাসির শাকিরিয়া বাহিনীর সমর্থন লাভ করেন।[৩৩] আততায়ী সামাররা বাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তার প্রথম কাজ ছিল মুতাওয়াক্কিলের সামরিক বিন্যাস বাতিল করে মুতাসিমের ব্যবস্থানুসারে সামাররা বাহিনীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।[৩৪] তিনি তাদের আরো আস্থা অর্জনের জন্য তার দু ভ্রাতার উত্তরাধিকার বাতিল করে আপন পুত্রের মনোনয়ন দান করেন। তাঁর রাজ-দরবারে দু'ব্যক্তির উত্থান ঘটে : ক. সামাররা বাহিনীর প্রভাবশালী নেতা উতামিশ; খ. ইরাকের ভু-স্বামী পরিবারের নাগরিক সমাজের দক্ষ প্রশাসক আহমদ বিন খাসির। তাঁর তাৎক্ষণিক সমস্যা ছিল শাকিরিয়া বাহিনী সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আহম্মেদ বিন খাসিরের পরামর্শক্রমে ওয়াসিকের

নেতৃত্বে শাকিরীয় বাহিনীকে বাইজানটাইন সীমান্তে প্রেরণ করা হয় এবং ৪ বছরের জন্য মালাতিয়ায় অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয়।[৩৫] মুন্তাসির মাত্র ছমাস রাজত্ব করার পর হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে প্রয়াত হন।

৬.৫ আল মুস্তাইন বিল্লা (৮৬২-৬৬) : প্রথম সংকট, বাগদাদ–সামাররা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব : খলিফার ক্ষুণ্ন স্বৈরতন্ত্র

মুন্তাসিরের মৃত্যুর পর পরই আমীর অমত্যগণ এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। প্রকাশ্যত প্রচলিত নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তারা মুন্তাসিরের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মনোনয়ন বাতিল করে, তবে তারা মুতাওয়াক্কিলের কোনো পুত্রকেও খেলাফতে সমাসীন করতে চায় নি; তাই মুতাসিমের ১৮ বছর বয়স্ক পুত্রকে মুস্তাইন বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করে ৮৬২ সালে খেলাফতে সমাসীন করা হয়।[৩৬] মোতাজ এবং মুয়াইদকে খেলাফতের দাবি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। বাগদাদের নাগরিকেরা বিনা প্রতিবাদে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। বাগদাদের শাসকর্তা তাহেরের পৌত্র বাগদাদে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভাবশালী সামাররা বাহিনীর সমর নেতা উতামিশ উজির পদ গ্রহণ করেন; কাতিবের পদে অধিষ্ঠিত হন আহম্মদ বিন খাসির। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মূলত সামরিক বিভাগ হতে রাজস্ব বিভাগকে স্বতন্ত্র রাখার নীতিই প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উতামিশের প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্য রকম। তিনি রাজস্ব বিভাগকে এরূপ স্বতন্ত্র রাখা পছন্দ করতে পারেন নি। আহম্মদ বিন খাসিরকে বরখাস্ত করে ক্রিটে নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়। উতামিশ উজির পদে সমাসীন থেকে একজনকে কাতিব নিয়োগ করেন; যিনি তাঁর সহকারী প্রশাসক হিসেবে কাজ করবেন। এভাবে তিনি সরকারের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ স্বহস্তে গ্রহণ করেন।[৩৭] এটা পরবর্তীকালের আমীরুল উমারা পদের পূর্বাভাস। এ ব্যবস্থায় বহুদিন সমর নেতা ও বেসামরিক প্রশাসকদের মধ্যে এ প্রশ্ন দ্বন্দ্ব-সমন্বয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং দু'ধারার রাজনীতির বিকাশ ঘটে। উতামিশ সামাররা বাহিনীর প্রাধান্য রক্ষার স্বপক্ষে ছিলেন বলে শাকিরিয়া বাহিনীকে অন্যত্র অপসারিত করা হয়; কিন্তু মুস্তাইন নিহত হওযার পর ওয়াসিফ সামাররায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাই উতামিশের পক্ষে এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। ওয়াসিফ এবং বুগা সামাররা বাহিনী ও শাকিরিয়া বাহিনী সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ বাহিনীতে রূপান্তরিত করে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের পক্ষে ছিলেন। এরূপে প্রতিরক্ষা বিভাগেও মতবিরোধ প্রকাশ হয়ে পড়ে। যাহোক এ সময়ে একটা সাময়িক সমঝোতা হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-খাট গোলযোগ চলতে থাকে। বুগার নেতৃত্বে শাকিরিয়ার একাংশ জাবাল অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়; ওয়াসিফ বাকি অংশ নিয়ে সামাররায় অবস্থান করেন।

পেশাদার সমরনেতা উতামিশ সামাররা বাহিনীকে সংগঠিত করেন। ১০ জন জোয়ান নিয়ে একটি গ্রুপ; কয়েকটি গ্রুপ নিয়ে একটি কোম্পানি, কয়েকটি কোম্পানি নিয়ে একটি ব্যাটালিয়ান-ইত্যাদি ছোট বড় প্রতিটি ইউনিটের উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয় একজন যোগ্য সেনাধ্যক্ষকে। সেনা সংগঠনের সাথে তিনি ঘোষণা করেন যে, সকল বৃত্তি ও বেতন নিয়মিত করা হবে। সেনাবিন্যাস ও বেতন কাঠামোতে সকল প্রকার অসংগতি ও অনিয়ম দূরীভূত করা হয়। যদিও তিনি সামরিক ও বেসামরিক সকল ক্ষমতা স্বহস্তে নিয়ন্ত্রিত করতেন, তবুও তিনি আহম্মদ বিন খাসিরের মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কোনো সমর নেতাকে কোনোক্রমে রাজস্ব বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে দিতে রাজি ছিলেন না। তার ব্যবস্থা সম্ভবত সর্বোত্তম ছিল; কিন্তু এতে কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল শংকিত হয় এবং তাঁকে হত্যা করে।[৩৮] দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নিয়জিত বাগদাদ নগরীর পরিস্থিতি অবশেষে ওয়াসিফ ও বুগা নিয়ন্ত্রণে আনেন। উতামিশের মত প্রশাসনিক দৃষ্টি না থাকায় তিনি তার একজন দক্ষ বেসামরিক আমলার হাতে প্রশাসনিক দাযিত্ব অর্পণ করেন।[৩৯] বুগা ও ওয়াসিফ অভিজ্ঞতা হতে অনুধাবন করেছিলেন যে, প্রদেশসমূহে সেনাবাহিনী রাখা অথবা সামরিক আমলাতান্ত্রিক ইকতা প্রদানের বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই। তবে তারা বুঝেছিলেন যে, সেনা কর্মকর্তাদেরকে ভূমি দানকালে সেনাবাহিনীর মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেগ করতে পারে এবং জনতার সাথে বিরোধও বৃদ্ধি পেতে পারে।[৪০] মুতাওয়াক্কিলকে হত্যার পুরস্কার স্বরূপ বাঘারকে কুফায় সামরিক প্রশাসনিক ইকতা দেয়া হয়, ফলে সেখানে শিয়া বিদ্রোহ দেখা দেয়। বুগার মিত্ররা বাঘার লোকজনের অপকর্মে বাধা দেয় তখন তারা বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়। বাঘারকে হত্যা করা হলে ঘটনা উল্টো স্রোতে প্রবাহিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বুগা এবং ওয়াসিক সামাররা বাহিনীর সমর্থন হারায় তবে শাকিরিয়া বাহিনী তাদেরকে সমর্থন দেয়। এভাবে সামাররা ও শাকিরিয়ার বাহিনীদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে উঠে। তারা নানাভাবে সামাররা বাহিনীকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হলে সামাররায় তাদের অবস্থান দুর্বল হয়। তারা খলিফা মুস্তাইনকে সঙ্গে নিয়ে বাগদাদে চলে আসে এবং বাগদাদের তাহেরী গভর্নরের সমর্থন চায়।[৪১]

উল্লিখিত বাহিনীদ্বয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব অচিরে বাগদাদ ও সামাররার মধ্যকার দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথমে সামাররা নেতৃবৃন্দ বুগা ও ওয়াসিফের সাথে আপোষ আলোচনা করতে চাইলে তা তারা অস্বীকার করেন এবং তারা তাদের সকল শক্তি বাগদাদে সমাবেশ করতে আরম্ভ করে। বাগদাদের প্রভাববলয়ের অধীন সকল অঞ্চলে অবস্থিত সেনা ইউনিটকে বাগদাদে এনে শাকিরিয়া বাহিনীকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদেশিক রাজস্ব সরাসরি বাগদাদে প্রেরণ করার নির্দেশ জারি করা হয়। বাগদাদের এরূপ সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে সামাররায় সীমাশারারী নামক জনৈক সমর নেতার অভ্যুত্থান হয়। তিনি বাগদাদের মোকাবিলা করার জন্য একটি কৌশল

অবলম্বন করেন। মুতাওয়াক্কিলের এক পুত্রকে কারামুক্ত করে আল-মুতাজ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাকে আমীরুল মোমেনীন বলে ঘোষণা করেন। তদীয় ভ্রাতা আবু আহম্মদ (ভাবী) আল মোয়াফফাককে বাগদাদ অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। আবু আহম্মদকে সাহায্য করেন একজন উজির। অবশ্য সামাররার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ থাকে সীমার সেক্রেটারির হাতে। সীমা স্বয়ং ডাক বিভাগ ও সিল স্বহস্তে রেখে প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করেন। রাজস্বের উপর তদারকী করেন।[৪২] সীমা ও স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সামাররায় অবস্থান করেন এবং বিপুল বাহিনী বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করে। সামাররা বাহিনী বাগদাদ অবরোধ করে এবং এ অবরোধ ৮৬৫ সাল পর্যন্ত চলে। পুনরায় বাগদাদ নগরীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নাগরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়।[৪৩] দীর্ঘদিন অবরোধ চললেও কোনো পক্ষই সুবিধা করতে পারছে না দেখে আবু আহম্মদ বাগদাদের শাসনকর্তা ইবনে তাহেরের নিকট কতগুলো প্রস্তাব দেন। নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ইবনে তাহের অবশেষে আবু আহম্মদের সাথে একটি চুক্তিতে আসেন। ঐ চুক্তি অনুসারে শাকিরিয়া বাহিনীকে বাগদাদে স্বতন্ত্র বাহিনী হিসেবে থাকার অনুমতি প্রদান করা হয়। তাদের খরচার এক তৃতীংশ সামাররা বহন করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। মুস্তাইনকে বরখাস্ত করে ওয়াসিতে নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়; মুতাজকে খলিফা করার চুক্তি হয়। অনেক আলাপ আলোচনার পর তাদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ওয়াসিফকে জাবালে এবং বুগাকে হেজাজের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়; তবে তাদেরকে সামাররায় অবস্থান করতে বলা হয়। তাবারী বলেন, ষড়যন্ত্রের পথ পরিহার করতে না পারায় তারা নিহত হন।[৪৪]

বাগদাদে এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বটে; কিন্তু বাগদাদ শাসনকর্তা ইবনে তাহের এক নতুন সংকটে পড়েন। বাগদাদ অবরোধকালে ইবনে তাহের পূর্বাঞ্চল হতে সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। তারা শান্তি চুক্তির পর বাগদাদ এসে উপস্থিত হন। এই নবাগত সৈন্যদের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও তাদের বেতন দেয়ার প্রয়োজন ছিল। ইবনে তাহের অনন্যোপায় হয়ে সামাররা সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন। এটা বাগদাদের নিজস্ব ব্যাপার বলে সামাররা সরকার ইবনে তাহিরের আবেদন নাচক করে দেয়। ইবনে তাহির শাকিরিয়া ও নবাগত বাহিনী উভয় গ্রুপের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন; কিন্তু এ প্রয়াস ব্যর্থ হলে উভয় গ্রুপের মধ্যে যুদ্ধ বাধে; তবে তাহেরীরা এ যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়।[৪৫]

৬.৬ ক্ষমতায় আল মুতাজ (৮৬৬-৬৯ খ্রি.); তাঁর ইকতা নীতির বিরুদ্ধে সমর নেতাদের অবস্থান : বেসামরিক আমলাদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির সূচনা

সাম্রাজ্যের এরূপ বাস্তব অবস্থায় খলিফা আল মুতাজ ভাবতে শুরু করেন যে, গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তিনি স্বপদে দাঁড়াতে সমর্থ হবেন। প্রথমেই তার পরম সুহৃদ ভ্রাতা

আবু আহম্মদকে বন্দি করেন এবং অপর ভ্রাতা মুয়াইদকে বরখাস্ত করে ওয়াসিতে প্রেরণ করেন। মুতাজের নির্দেশক্রমে মুসতাইনকে ওয়াসিতে হত্যা করা হয়। এ সকল ব্যবস্থার পর মুতাজ কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। তাঁকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে সেনাপতিদের আনুগত্য একান্ত কাম্য। মুতাজ এক নতুন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। এ নতুন ব্যবস্থা পুরোপুরি সামরিক প্রশাসনিক ইকতা ব্যবস্থা নয়-অথচ ঐ ব্যবস্থা হতে একেবারে ভিন্নও নয়। তিনি প্রত্যেক সেনাপতিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। একই সাথে কিছু সৈন্যসহ তাঁর এক বিশ্বস্ত বেসামরিক আমলাকে তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রদেশে প্রেরণ করেন। সেনাধ্যক্ষ অথবা তাঁর প্রতিনিধি কাউকে কোনো ভূমি মঞ্জুরী দেয়া হয় নি; অথচ প্রাদেশিক রাজস্ব ব্যাপারে সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপও নিষিদ্ধ হয়। প্রতিটি প্রদেশে একজন করে স্বতন্ত্র রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এই ব্যবস্থার মূল তাৎপর্য এই যে, এতে সামরিক ও রাজস্ব বিভাগকে স্বতন্ত্র রাখার নীতিই প্রতিফলিত হয়। অবশ্য সেনাপতি শাসনকর্তা যাতে তার সেনাবাহিনীর নিয়মিত বেতন দিতে পারে সে জন্য প্রাদেশিক রাজস্বের উপর তার অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন বায়েকবাক। মিশরে তার ডেপুটি ছিল আহম্মেদ বিন তুলুন। বায়েকবাক রাজস্ব ব্যাপারটি আহম্মদ বিন আল মুদাব্বিরের হাতে ছেড়ে দেন। প্রাদেশিক সেনাপতি এবং প্রশাসনের মধ্যকার যোগসূত্র হবেন স্বয়ং আহাম্মদ বিন ইস্রাইল—যার বড় দায়িত্ব ছিল প্রদেশের রাজস্ব আদায় ও বিতরণ ব্যবস্থার উপর তদারকি করা।[৪৬] সেনাপতি সালেহ বিন ওয়াসিকের সাথে উজির আহম্মেদ বিন ইস্রাইলের মতানৈক্য দেখা দিলে এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। সেনাপতি উজিরকে বন্দি করে। সুতরাং মুতাজের সাথে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। মুতাজ সামরিক বিভাগকে রাজস্ব বিভাগের স্বতন্ত্রতার নীতিতে অটল ছিলেন অথচ সেনাবাহিনী রাজস্ব বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই জটিল পরিস্থিতিতে আমলারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এ দ্বন্দ্বে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা জয়ী হয় এবং সালেহ বিন ওয়াসিক রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। তাবারী বলেন যে, মুতাজকে বরখাস্ত করে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মুহতাদী উপাধিতে ভূষিত করে খেলাফতে সমাসীন করা হয়।[৪৭]

৬.৭ খেলাফতে আল-মুহতাদী (৮৬৯-৭০ খ্রি.) : নতুন গৃহযুদ্ধ : তার মৃত্যুতে খেলাফতের সংকটের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত

বাগদাদ নগরীতে নয়া ব্যবস্থা গ্রহণে এবং নতুন মনোনীত খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বেশ ইতস্তত দেখা দেয়। নয়া খলিফার পক্ষ হতে যখন বিভিন্ন প্রান্তিক সুবিধা আসতে শুরু করে তখন সকলেই তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। বড় ঘটনা হল বাগদাদে আবু আহম্মদের প্রতি অনেকের আস্থা ছিল। সামাররা দীর্ঘদিন শান্ত ছিল না। জাবালে কর্মরত জেনারেল মুসা বিন বুগা বাগদাদের এরূপ অবস্থার কথা জানতে পেরে

সরাসরি বাগদাদে এসে উপস্থিত হন; এবং সালেহ বিন ওয়াসিফ বাগদাদ হতে অন্তর্ধান হন। অন্য সেনাপতি বায়েকবাক সব দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। মুসা বিন বুগা মুহতাদির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করতে পারছিলেন না অথচ বিকল্প প্রস্তাব দিতে অক্ষম ছিলেন। এতদিন সেনাবাহিনীর জোয়ানরা সমর নেতাদের মতপার্থক্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, তারা শান্তির খাতিরে মুহ্তাদির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে চায় নিম্নলিখিত শর্তাধীনে :

ক. সরকারি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ পুনরায় আমিরুল মোমেনিনদের হাতে থাকবে;
খ. উতামিশের ব্যবস্থাপনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে;
গ. নারী ও শিশুদের প্রদত্ত বৃত্তি বন্ধ করতে হবে;
ঘ. সেনা জোয়ানদের প্রতি দু মাসে নিয়মিতভাবে বৃত্তি প্রদান করতে হবে;
ঙ. কোনো সেনাধ্যক্ষ প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগে কোনো প্রকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে ন া;
চ. ভূমি-মঞ্জুরী বাতিল করতে হবে;
ছ. সেনাবাহিনীর পদোন্নতির সকল দায়িত্ব খলিফার;
জ. খলিফা তাঁর ভাইকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করবেন।[৪৮]

মুহ্তাদির পক্ষে এসব দাবি পূরণ করা সম্ভব ছিল না। পুনরায় খেলাফত গৃহযুদ্ধে পতিত হয়; তাকে বরখাস্ত করারও চেষ্টা চলে। মুহ্তাদি জনতার নিকট তার প্রতি সমর্থনের আবেদন করেন। তিনি কতিপয় সেনাপতিকেও বন্দি করেন। বায়কবাক নিহত হন। গৃহযুদ্ধ চলা অবস্থায় মুহ্তাদি আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং মাত্র এক বছর রাজত্ব করার পর (৮৬৯-৭০ খ্রি.) প্রয়াত হন। সেই সাথে আব্বাসী খেলাফতের রাজনৈতিক সংকটের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। এ পর্যাযে খলিফার ক্ষমতা ও পদ-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। সামরিক ও বেসামরিক লোকদের রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় সরকারে এত ঘটনা সংগঠিত হয় এবং তাহেরীদের শক্তি দ্রুত হ্রাস পায়; তথাপি সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন কিছু ঘটতে দেখা যায় নি যা কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করতে পারে। ছোটখাট যে সব বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তা সহজে অবদমিত রাখাও সম্ভব হয়। ৮৬৩-৬৪ সালে হিম্সের স্থানীয় বিদ্রোহ সহজে দমন করা হয়। মোসুলে স্থানীয় লোকেরা তাদের প্রশাসক নির্বাচন করে; কিন্তু যেহেতু তারা সামাররার শাসকের প্রতি অনুগত থাকে সে জন্য কেন্দ্রের কোনো দুর্ভাবনা হয় নি। বাইজানটাইন সীমান্তে নিয়মিত গ্রীষ্মকালীন অভিযান চলে। ফারেসে তাহেরী বাহিনীর জনৈক স্থানীয় সেনা নায়ক ক্ষমতা গ্রহণে কোনো বিদ্রোহ দেখা দেয় নি। সিস্তানে সাফফারী আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে কেন্দ্রীয় সরকার সাফফারী দল নেতাকে ফারেসের গভর্নর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা ঘটে তাবারিস্থানে। এখানে আলী বংশের এক ব্যক্তি ৮৬৪ সালে বিদ্রোহ করে এবং তাহেরীদেরকে বিতাড়িত করে। এবং রায় পর্যন্ত

দখল করে নেয়। কেন্দ্রীয় সামাররা সরকার মুসা বিন বুগার নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করে এবং আলী বংশীয় দুজন বিদ্রোহীকে দমন করে। অবশ্য ৮৬৯ সালে মুসা বিন বুগা ঐ উপদ্রুত অঞ্চল ত্যাগ করে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলে সেখানে এবং অন্যত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

৬.৮ আব্বাসী খেলাফতের রাজনৈতিক সংকটের দ্বিতীয় পর্যায় : দলীয় রাজনীতির প্রকাশ : রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের অবক্ষয়ের সূচনা

এ পর্যায়ে খেলাফতে সমাসীন ছিলেন ১৫. মোতামিদ (৮৭০-৯২ খ্রি.), ১৬. আল মোতাজিদ (৮৯২-৯০২ খ্রি.) আল মুক্তাফী (৯০২-৯০৮ খ্রি.)

উপরের আলোচনা হতে এ সত্য বেরিয়ে আসে যে, একক রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র অচল হলে কেবল বেসামরিক আমলা অথবা সামরিক বাহিনী কেউ এককভাবে নয়া স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার অবস্থায় ছিল না। আপাতত কোনো চরমপন্থা কার্যকর নয় বলেই সামাররায় মধ্যপন্থীদের বিকাশ ঘটে। তারা বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য একটি সম্মিলিত আপোষ ফর্মুলা রচনা করে মোহতাদীর নিকট পেশ করে। মোহতাদি তাদের শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হলে মুতাওয়াক্কিলের জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল আব্বাস আল মুতাজিদকে খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর ফলে মোতামিদ এবং তদোত্তরকালে বেশ কিছু দিনের জন্য বাগদাদে এক নয়া রাজনীতির বিকাশ ঘটে। এবং এটা ছিল অনেককাংশে আজকের দিনের দলীয় রাজনীতির মত এবং মধ্যযুগের জন্য ছিল একেবারে অভিনব। দুর্ভাগ্যবশত এ রাজনীতি আর বিকশিত হতে পারে নি। যাহোক উক্ত আপোষ মীমাংসা কার্যকর করার দায়িত্ব বর্তায় মুতামিদের উপর। উক্ত আপোসনামায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল; খলিফা তার এক ভ্রাতাকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করবেন। এ জন্য মোতামিদ আবু আহমদকে ঐ দায়িত্ব অর্পণ করেন। অবশ্য তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিক বিচারে ঘটনাটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। খলিফার নিকট হতে সর্বোচ্চ সামরিক দায়িত্ব প্রত্যাহার করার সরল অর্থ হল—রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের অবসানের সূচনা। এই প্রথমবারের মত উক্ত দায়িত্ব অর্পিত হল আব্বাসী বংশের একজন দক্ষ-অভিজ্ঞ সদস্যের উপর যিনি খলিফার পুত্র নন; অথবা উত্তরাধিকারী তালিকাভুক্ত ছিলেন না। তাঁকে মোয়াফফাক (সকল মতের সমন্বয়কারী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি ২২ বছর বয়স্ক আমিরুল মোমেনিনের রিজেন্ট বা অভিভাবকও ছিলেন না। সকল সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে রাখার বড় দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। আপোস চুক্তির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অনুসারে মুতাওয়াক্কিলের অধীনে শাকিরিয়া বাহিনীর সংগঠক উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহিয়া বিন খাকানকে উজির পদে নিয়োগ করা হয়। নব নিয়োগপ্রাপ্ত উজির তৎকালীন সামরিক বাহিনীর সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। দুই অভিজ্ঞ প্রশাসকের প্রচেষ্টায়

তৎকালীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় স্থিতিশীলতার সূচনা হয়।[৪৯] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সময় তাহেরীদের পূর্বাঞ্চলেও তাদের অবস্থান শক্তির ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরে; বাগদাদ বা পশ্চিমাঞ্চলেও তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। অতএব, তাহেরী প্রভাব বলয়ের প্রশাসনিক দায়িত্বও মোয়াফফাকের উপর ন্যস্ত হয়। তাবারী বলেন তিনি তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন বাগদাদে। তাঁর এ পদক্ষেপে সামাররা বাহিনীর একাংশের মধ্যে শংকা ও সংশয় দেখা দেয়। তারা ধারণা করে যে, এটি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বাগদাদ নগরীর পুনরুত্থানের পূর্বাভাস। এ অবস্থায় খলিফাকে তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করতে হয়। তিনি আপন পুত্র মুফাওয়াজকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন, এবং বাগদাদে তাঁকে মোয়াফফাকের সহযোগী করেন এবং মোয়াফফাককে উত্তরাধিকারসূত্রে দ্বিতীয় স্থান দান করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে না হতে অভিজ্ঞ উজিরের মৃত্যুতে সামাররা বাহিনীর চরমপন্থীরা পুনরায় মাথাচাড়া দেয় এবং দুর্বল খলিফাকে তাদের মনোনীত হাসান বিন মাখলাদ বিন জাররাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে বাধ্য করে। এ সময় সামাররা বাহিনীর একটি উপদলের শক্তিশালী নেতা মুসা বিন বুগা বাগদাদে প্রবেশ করলে হাসান বিন মাখলাদ আত্মগোপন করেন। তদস্থলে অধিকতর অভিজ্ঞ প্রশাসক সুলাইমান বিন ওয়াহাবকে নিয়োগ করা হয়। সুলাইমানের পুত্র উবাইদুল্লা যুগপৎ ছিলেন মুসা বিন বুগা, মুয়াফফাক এবং মুফাওয়াজের কাতিব। উবাইদুল্লাকে এরূপ দায়িত্ব কেন দেয়া হয়? তখন কি আর কোনো যোগ্য প্রশাসক দুর্লভ ছিল? এর পশ্চাতে বাগদাদের প্রশাসনের সাথে সামাররা প্রশাসনের সমন্বয় ঘটানই ছিল মূল চিন্তা। এ সব ব্যবস্থায় সামাররা বাহিনীর চরমপন্থীদের চাপের মুখে মোতামিদ সুলাইমানকে বরখাস্ত করে তদ্স্থলে হাসান বিন মাখলাদকে তাঁর স্থলাভিসিক্ত করতে বাধ্য হন। মুয়াফফাক তদীয় ভ্রাতা খলিফা মোতামিদের এ পদক্ষেপ মেনে নিতে পারেন নি। তিনি সামাররায় গমন করে খলিফাকে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সামাররা বাহিনীর চরমপন্থী সমর নেতা মুসা বিন উতামিশ ৮৭৭ সালে সামাররা ত্যাগ করেন। এই সাথে সামাররা বাহিনীও সামাররার প্রাধান্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। বেচারা খলিফাও তার শেষ ক্ষমতাটুকু হারান এবং ৫ বছরের জন্য ৮৮২ সালে তাকে ওয়াসিতে প্রেরণ করা হয়।[৫০] বাগদাদের অবস্থান দৃঢ় হয় কিন্তু ৫০ বছর পূর্বের অবস্থানে বাগদাদ ফিরে যেতে পারে নি।

দলীয় রাজনীতির বিকাশ

সাম্রাজ্যব্যাপী আর্থ-সামাজিক ভিন্নধর্মী নানা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় খলিফার রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। নগরীতে দুটি পরস্পর স্বার্থবিরোধী সামাজিক শক্তি স্ব স্ব স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়। শুরু হয় দলীয় রাজনীতির পালা। একটি সামাজিক শক্তির নেতৃত্ব দেয় জাররাহ পরিবার, অপরটির নেতৃত্ব দেয় ফুরাত

পরিবার। প্রথমোক্ত দলকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী। তারা কেবল ভূমির উপর কর আরোপ এবং বাণিজ্যে কর রেয়াতের প্রবক্তা ছিলেন। কেন্দ্রের স্বার্থে আঞ্চলিক স্বার্থ বলিদানে তাদের কুণ্ঠা ছিল না বলে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি ছিল। অতএব, তারা ছিল সামরিক প্রশাসনিক ইকতা ব্যবস্থার প্রবক্তা ও সমর্থক। হাসান বিন মাখলাদ ছিলেন তাদের মুখপাত্র। দ্বিতীয় দলকে বলা চলে তৎকালীন বামপন্থী প্রগতিবাদী। এরা ছিল সামরিক প্রশাসনিক ইকতার ঘোর বিবোধী। এ ব্যবস্থার কুফল তারা অনুধাবন করতেন। এ ব্যবস্থার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাই ছিল প্রধান দিক। দলটি সামরিক বাহিনীকে বাজস্ব বিভাগ হতে দূরে রাখতে আগ্রহী ছিল বলে সেনাবাহিনীর নিয়মিত ও উপযুক্ত বৃত্তি প্রদানের পক্ষে ছিল এবং তারা সামরিক কর্মচারীদের দুর্নীতির ঘোরবিরোধী। তাদের সংস্কারমূলক মনোভঙ্গি তাদের কর ব্যবস্থাতেও প্রতিফলিত হয়। তারাই সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ যারা আঞ্চলিক স্বার্থের সাথে কেন্দ্রীয় স্বার্থের সমন্বয় ঘটনোর কথা ভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পর্যায়ে সামরিক অথবা বেসামরিক আমলা একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার মত অবস্থানে ছিল না সত্য, তবে তাদের সামাজিক শক্তি প্রবল হওয়ায় সমব নেতারাই দেশের সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে তা সহজে অনুমেয়।[৫১]

মোয়াফফাকের যুগ্ম সরকার

যাহোক উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সামরিক-বেসামরিক যুগ্ম আমলা সরকারের ধারণা গড়ে ওঠে। মোয়াফফাকের জীবদ্দশায় তাঁব বাজনৈতিক প্রজ্ঞা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তীব্র বাস্তববোধের কারণে উক্ত পরস্পরবিরোধী দলদ্বয়ের সহ-অবস্থান সম্ভব হয়। কেননা রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট মতামত থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় তিনি তার প্রয়োগ ক্ষেত্রে কোনো চরমপন্থা অনুসরণ না করে বরং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তা প্রয়োগ করেন। বাগদাদে নতুন কর আরোপের খরব পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মিশরে আহম্মেদ বিন মুদাব্বর কর সংস্কার সাধন করেন। তিনি সামরিক প্রশাসনিক ইকতা প্রতিনিধি আহম্মেদ বিন তুলুন হতে নিজেকে স্বাধীন রাখতে পেরেছিলেন বলেই ইবনে তুলুনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি লোনা মাছের উপর কর আরোপ করতে সক্ষম হন। এ পর্যায়ে বাগদাদে মোয়াফফাকের নীতি ছিল সামরিক বাহিনীকে পুরোপুরি রাজস্ব বিভাগ হতে দূরে রাখা। এই উদ্দেশ্যেই মাহদ বিন মাখলাদকে তার সহকারী কাতিব নিয়োগ করেন। যতদূর সম্ভব তিনি সামরিক বিভাগ হতে রাজস্ব বিভাগের স্বতন্ত্র নীতির প্রয়োগ করেন। যেখানে কোনো উপায় ছিল না কেবল সেখানে সামরিক প্রশাসনিক ইকতা ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। এটা করেন মন্দের ভালো হিসেবে। এরূপ এলাকায় প্রবল বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিহত করাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাবারী বলেন, এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি কেবল বিশ্বস্ত সেনা কর্মচারীকে এরূপ স্থানে শাসক হিসেবে নিয়োগ

করেন এবং সব বিষয়ে কর্তৃত্ব দেন।[৫২] মোয়াফফাকের নেতৃত্বে বাগদাদে নয়া রাজনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এমন এক সময় যখন সাম্রাজ্যের অবক্ষয় দ্রুততর হয় এবং তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এ সময় প্রথম পূর্বাঞ্চলে তাহেরীরা দ্রুত পতনোন্মুখ হয়; কিন্তু আঞ্চলিক স্বার্থ চেতনা কেন্দ্রের সাথে সংঘাতে আসে এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে দুটি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। একটি সাফফারী আন্দোলন অপরটি জানজ বিদ্রোহ।

৬.৯ বিচ্ছিন্নতাবাদের নবরূপ ঃ সাফফারী আন্দোলন

প্রথম আন্দোলনটি পূর্বের আগলাবী বা তুলুনী বংশের বা তাহেরী বংশের প্রতিষ্ঠা হতে ছিল ভিন্ন ধরনের ও ভিন্ন অবস্থায়। সাফফারী বা তাম্রকার বংশের সঠিক পরিচয় জানার উপায় নেই। অনেকে মনে করেন যে তারা প্রথম পর্যায়ে ছিল দস্যু। সিস্তানে সর্বত্র লুটতরাজের মধ্য দিয়ে তারা একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করে রাজ্য স্থাপন করে। আবার অনেকে মনে করেন যে তারা ছিল মূলত খারেজী। বসওয়ার্থ C E Boswoll তাঁর গবেষণায় খারেজী মতাদর্শের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি।[৫৩]

আমীর আলী সাফফারী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়া'কুব বিন লাইসকে একজন সাধারণ সৈনিক জীবন হতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখেছেন।[৫৪] এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এ ঘটনাকে একটা আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং কেবলমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। আধুনিক গবেষক ঐতিহাসিক শাবান বলেন Saffarid movement cannot be understood in violation from others. বস্তুত তৎকালীন আরব সাম্রাজ্যের সামগ্রিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে সাফফারী বংশের উত্থান প্রক্রিয়াটি বিবেচনা করা উচিত। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল, আন্দোলনটি আরম্ভ হয় পশ্চিম সিস্তানে। এলাকাটি আরব কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর হতে সর্বদাই উপেক্ষিত ছিল। এর পূর্বে জাবালিস্তানে আরব সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা প্রায় দুশ বছর ধরে জাবালিস্থান রাজ্যটির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখে। আরবরা এই রাজ্য এড়িয়ে বরং দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল দিয়ে সিন্ধু প্রদেশে তাদের উপস্থিতি জোরদার করে। সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূল দিয়ে ক্রমবর্ধমান বিশ্ববাণিজ্য প্রবাহমান ছিল, আব্বাসী শাসকরা স্বর্ণযুগে বিষয়টি উপলব্ধি করে উবুল্লাহ, বসরা, সিরাজ ও দেবল বন্দরে তাদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করে। জলদস্যুদের আক্রমণ হতে বিশ্ববাণিজ্য নিরাপদ রাখার জন্য খলিফা মুতাসিম উপকূল অঞ্চলে জল ও স্থলে অভিযান প্রেরণ করেন। তারা দেবল ও সিরাজের মধ্যবর্তী কিরমান-মাকরান এলাকাটি উপেক্ষা করে; কিন্তু ওমানে আজদ বংশের বণিকদের অনেকে ঐসব এলাকায় বাণিজ্যিক উপনিবেশ গঠন করে এবং তারা আরেকটি সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করে প্রচুর ধন সঞ্চয় করার সুযোগ পায়। এ কারণে আব্বাসী খলিফারা অনেকটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সমগ্র অঞ্চলটি

তাহেরীদের হাতে ছেড়ে দেয়। তাহেরীবা কেবল স্থানীয় প্রভাবশালী দেহকানদের নিকট হতে শান্তি চুক্তি অনুসারে খাজনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত।[৫৫] এখানকার কৃষি অর্থনীতিতে কোনো রূপান্তর আসে নি অথচ চতুর্পার্শ্বে এ সময় বিশ্ববাণিজ্যে প্রচণ্ড বিকাশ হয়। সোগদিয়ানা হতে বলখ এবং হিন্দুকুশ পেরিয়ে ভারতের সাথে যে বাণিজ্য পথ গড়ে উঠেছিল তা জাবালিস্তানেব রাজা জানবিল প্রচণ্ডভাবে বাঁধা দেয়। আলোচ্য সময়ে সিন্ধু খোরাসানের মধ্যে যোগাযোগের অনুপস্থিতি হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জানবিলের বিরুদ্ধে এক ধরনের অর্থনৈতিক বয়কট চলছিল। সিস্তানের উপর এরূপ অর্থনৈতিক বয়কটের প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক।[৫৬] এরূপ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর মত কোনো পদক্ষেপ তাহেরীরা নেয় নি। তাই এ অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। তদুপরি তাহেরী অবক্ষয়ের কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, উপেক্ষিত অঞ্চলের অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন স্বার্থ মহলে নতুন দ্বন্দ্ব বিকশিত হয়।[৫৭] দলে দলে দস্যুরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে লুটতরাজ, রাহাজানি করে সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করে। স্থানীয় বাসিন্দারা আত্মরক্ষার জন্য আইয়ার বা স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করে। ইয়াকুব বিন লাইসের দক্ষ নেতৃত্বে এরূপ একটি আয়ার বা সেচ্ছাসেবী দল সুশৃঙ্খল মিলিশিয়ায় পরিণত হয়।[৫৮] তিনি প্রথমে সিস্তানে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বুখারাজ আক্রমণ করেন; ৮৭০ সালে জাবালিস্তানের রাজপরিবারকে বিতাড়িত করেন।[৫৯] সাফফারীদের এরূপ অভ্যুত্থানে তাহেবী বংশেব পতন ত্বরান্বিত হয়। সোগদিয়ানা ব্যতীত তাদের প্রভাব বলয়ের প্রায় সর্বত্রই স্থানীয় শক্তিশালী ব্যক্তিরা বিদ্রোহ করে এবং তারা স্ব স্ব অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সোগদিয়ানের সামানীরা শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বৃহত্তর পারস্যে এরূপ বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না পেয়ে আকসাস নদীর দক্ষিণ হতে সমগ্র এলাকায় শাসনের দায়িত্ব ইয়াকুবের হাতে ন্যস্ত করে। তাকে কেন্দ্র হতে সাহায্য দেয়া হয়। ইয়াকুব তাবারিস্তানে শিয়া বিদ্রোহীদের দমন করতে গেলে সামানীরা তাকে সাহায্য না করায় তিনি দক্ষিণাঞ্চলে তার শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইয়াকুবের সাথে অধিকতর সহযোগিতার জন্য আলোচনা করতে চাইলে তিনি সামানীদের উপর কর্তৃত্বের অধিকারের দাবি করেন। আলোচনা ব্যর্থ হলে ইয়াকুব ফারেসের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনযোগী হন; কিন্তু মোহাম্মদ বিন ওয়াসিল প্রতিরোধ করেন। তিনি বাগদাদ অভিমুখে অভিযান করলে মোজাফফর বাহিনী তাকে পর্যুদস্তু করে। তার উত্তরাধিকারী আমরের সাথে কেন্দ্রের আপোষ হয় বটে; কিন্তু আমর তাবারিস্তানের শিয়া বিদ্রোহ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। এ সময় সামানিরা সক্রিয় হলে তাবারিস্তানে শিয়া বিদ্রোহ অবদমিত হয়। আমরকে খোরাসান হতে বিতাড়িত করা হয়। এভাবে সামানীরা তাহেরী প্রভাব বলয়ের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। সাফফারীরা সিস্তানের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সন্তুষ্ট থাকে।[৬০] এভাবে আরব সাম্রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ নবরূপে বিকশিত হয়।

৬.১০ জানজ বিদ্রোহ : বাগদাদ কেন্দ্রীয় সরকারের ভিত্তিমূল প্রকম্পিত

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল জানজ বিদ্রোহ। সাফফারী আন্দোলন চলাকালে জানজ বিদ্রোহ দক্ষিণ ইরাকে গতিবেগ পায়। এটি বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য প্রকৃতই হুমকির সৃষ্টি করে। ইতিহাস সাহিত্যে এ বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এই বিভ্রান্তির মূলে রয়েছে নলডেকের (Noldeke) এর সূত্র।[৬১] তিনি একে দাস বিদ্রোহ বলে বিবেচনা করেন। পরবর্তীকালে তাকে অনুসরণ করে এটা নিগ্রো বিদ্রোহ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।[৬২] তাবারীর মত একজন সচেতন ঐতিহাসিক ঘটনাটি সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বিবরণটি ভাল করে তলিয়ে দেখলে ভ্রান্ত ধারণাটি সহজে সংশোধিত হতে পারত। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সমগ্র ঘটনাটিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এটা আর যাই হোক দাস বিদ্রোহ নয়; যদিও অনেক দাস এতে অংশগ্রহণ করে। এতে নিগ্রোদের বড় অবদান থাকলেও এটাকে নিগ্রো বিদ্রোহ বলাও যথার্থ নয়। প্রথমত সেকালের মুসলিম সমাজে দাস প্রথা ছিল এবং দাস কৃষ্ণ ও গৌর উভয় বর্ণের ছিল। দ্বিতীয়ত প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার মত পশ্চিম এশীয় সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় দাস কখনো প্রাধান্য পায় নি। আমাদের মননের উপর আরোপিত ইউরোপীয় ঐতিহ্যগত চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমগ্র ঘটনাটি তুলে ধরলে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব। বসরায় লবণাক্ত জলাভূমিতে কর্মরত দাসরা দুরাবস্থা হতে মুক্তির জন্য বিদ্রোহ করে তাই এটা দাস বিদ্রোহ এবং দাসরা ছিল কৃষ্ণবর্ণের নিগ্রো তাই এটা দাস নিগ্রো বিদ্রোহ। এরূপ একটি সহজ ধারণা হতেই ভ্রান্তির সূচনা হয়।[৬৩]

বস্তুত এই ঘটনার মূলে ছিল স্থানীয় স্বার্থের সাথে বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এই ঘটনার প্রেক্ষিতটির উপলব্ধির প্রয়োজন সর্বাধিক। তাবারীর বিবরণ অনুসারে এ বিদ্রোহের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের আরবরা। অবশ্য তাদের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দেয় পূর্ব আফ্রিকার মানুষ-যারা ছিল এ অঞ্চলের অধিবাসী। এরা আরবের বাহিলা, হামদান, আইয়াজ, জিল, কায়েস, আব্দুল ফয়েজ ও তামিম গোত্রের সদস্য। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বের মধ্যে আরব-নিগ্রো মৈত্রী ছিল লক্ষণীয়।[৬৪] কেউ কেউ বলেন এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জনৈক আলী বিন আবদুর রহিম। অর্থাৎ এরা ছিলেন আরব; অনারব নয়। বিদ্রোহী নেতাদের অন্যতম ছিলেন মোহাম্মদ বিন হাসান বিন সহল; তিনি আরব না হলেও আব্বাসী বংশের সহযোগী অভিজাত পরিবারের সদস্য ছিলেন। মহাল্লবীদের অনেকে এ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইহুদীরা এ বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। সুতরাং বলা হয় দাস নেতৃত্ব দূরে থাক নিগ্রোদেরও একক নেতৃত্ব ছিল না।[৬৫]

এ বিদ্রোহের পশ্চাতে অর্থবল, জনবল, সুশৃঙ্খল নৌশক্তি এবং সুসজ্জিত সেনা-বাহিনী ছিল বলেই দীর্ঘ ১৫ বছর (৮৬৯-৮৮৩) ধরে এরূপ ব্যাপক বিদ্রোহ পরিচালনা

সম্ভব হয়। তাদের কিরূপ অর্থবল থাকলে তাদের পক্ষে অন্তত দুটি দুর্ভেদ্য শহর নির্মাণ করা যায়? এসব শহরে ছিল অস্ত্র ভাণ্ডার, রণতরী নির্মাণ কারখানা। এর বাজারগুলো বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী দিয়ে পূর্ণ ছিল। বস্তুত এদের শক্তির প্রধান উৎস ছিল এ অঞ্চলের বণিক সমাজ। এ সম্পর্কে তাবারীর বিবরণ হতে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোনো দাস বিদ্রোহে এরূপ দীর্ঘস্থায়ী সুশৃঙ্খলা সর্বাত্মক সাংগঠনিক তৎপরতা কদাচ পরিলক্ষিত হতে পারে। এরূপ বিদ্রোহ কি আদর্শবর্জিত হতে পারে? এদের অবশ্য মতাদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল। তাই বলে দাসদের মুক্তিদান তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এই বিদ্রোহে কিছু সংখ্যক পলাতক দাসও ছিল। ইতিহাস হতে জানা যায় যে, দাসরা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ করতে পারে; কিন্তু সংগঠিত আন্দোলন করতে পারে না। সিন্তানের অগ্রগামী সমাজের তুলনায় উপসাগরীয় এলাকার বণিক সমাজের স্বার্থচেতনা তীব্র হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাদের আঞ্চলিক স্বার্থের সাথে বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থের সংঘাত এ সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিশ্ব সভ্যতায় আব্বাসী স্বর্ণযুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ছিল আরবদের অন্যতম ঐতিহাসিক অবদান। পারস্য উপসাগর অঞ্চলের আরব বণিকরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তারা সুদূর চীনের ক্যান্টন শহরেও বণিক উপনিবেশ গড়ে তোলে। তাদের অনেকে সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করেও পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকায় যায় বাণিজ্য ব্যাপদেশে। তাদের সাথে পূর্ব আফ্রিকার বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল স্মরণাতীতকাল হতে। আরবে আফ্রিকার পণ্য সামগ্রীর চাহিদা ছিল বহু দিন ধরে। বাণিজ্যকার্যে যেমন আরব নাবিকেরা অনেকে আফ্রিকায় বসবাস করে, তেমনি পূর্ব আফ্রিকার অনেক পরিবারও পারস্য উপসাগর অঞ্চলে বসবাস করে এবং তাদের সকলে না হলেও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে তাদের স্বদেশের সাথে সম্পর্ক ছিল গভীর। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে অগ্রসর আরব নিগ্রো বণিকরা মূলত আফ্রিকার পণ্য আমদানি ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য করত। কেন্দ্রীয় আরব সাম্রাজ্য লোহিত সাগরের আইজায়ের পথটি উন্মুক্ত করায় উপসাগরীয় বণিকেরা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় ও তাদের একচেটিয়া হুমকির মুখোমুখী হয়। তদুপরি ৮৪৭-৬১ সালে ওয়াসিক উপসাগরীয় বন্দর হতে আগত পণ্যের উপর হতে শুল্ক প্রত্যাহার করেন। কিন্তু মোয়াফফাকের কর নীতি ছিল অন্য রকমের। মিশরে নতুন নতুন শুল্ক আরোপ করা হয়। তাই অমুসলিম অঞ্চলের পণ্যের উপর ২০% শুল্ক বসানোই ছিল স্বাভাবিক। এ সময় ইব্রাহিম বিন আল মুদাব্বিরকে বসরায় শুল্ক আদায় করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে যাদের স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার ভয় ছিল তারা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারে নি। তারা তাদের স্বার্থ রক্ষায় একটা কিছু করবেই। শাবান বলেন, Without this contribution of wealth and manpower, the zanj revolt would not have been possible।[৬৬] এরূপ আর্থ-সামাজিক অবস্থাই ছিল জানজ বিদ্রোহের পটভূমি।

বিদ্রোহীরা দ্রুততার সাথে মাত্র তিন বছরের মধ্যে ৮৭২ সালে প্রায় সমগ্র পারস্য উপকূলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরে আহওয়াজ পর্যন্ত তাদের প্রভাববলয়ের বিস্তৃতি ঘটায়। বসরা বন্দর অচল করে দেয়, ওয়াসিতকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। উত্তরের সাথে যোগাযোগের জন্য বিকল্প স্থলপথ উন্মুক্ত করে। বাহরায়েন তাদের কব্জায় আসে। তারা এ এলাকা হতে সরকারি সেনাবাহিনী হটিয়ে দেয় এবং মোয়াফফাক প্রেরিত অভিযান বার বার পর্যুদস্তু করে। অবশেষে ৮৮৩ সালে তাদের মুখতারা নগরের কেল্লার পতন হলে জানজরা আত্মসমর্পণ করে এবং দীর্ঘ ১৪ বছর পর বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মোয়াফফাক নীতি : মিশরে তুলুনী বংশ প্রতিষ্ঠা

জানজ বিদ্রোহের বিপদ অনুধাবন করে মোয়াফফাক যাবতীয় আর্থিক ও সামরিক শক্তি এর বিরুদ্ধে সমাবেশ করেন। প্রথমেই তিনি নতুন করে সেনাবিন্যাস করেন আর এ কাজ করেন সে সময়ের বাস্তব অবস্থার সকল দিক বিবেচনা করে। সেনাবাহিনী হতে জাতিগত সকল পার্থক্য দূরীভূত করা যায় এমন পদক্ষেপ নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনী গঠন করেন। এতে সেনাবাহিনীতে এই প্রথম আরব সেনাদলের উপর আজম সেনাপতি এবং আরব সেনাদলের উপর আজিম সেনাপতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেনাবাহিনী হতে জাতিগত বিভেদ চলে যায়। সৈনিকদের বৃত্তি নিয়মিত করা হয়। তাই উক্ত আপৎকালীন সময়ের জন্য সামরিক প্রশাসনিক ইকতা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। আর এ কাজটি করা হয় যেখানে সরকারের দৃঢ় অবস্থানের প্রয়োজন ছিল। এমন একটি প্রদেশ ছিল মিশর। যেখানে আহম্মদ ইবনে তুলুনকে সকল ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আহম্মদ ইবনে মুদাব্বিরকে লিবিয়ায় বদলি করা হয়। মোয়াফফাকের পুত্র তাঁর নীতির ঘোরবিরোধিতা করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাফফারীদের আন্দোলন এবং জানজ বিদ্রোহের ফলে আব্বাসী সাম্রাজ্য দারুন হুমকির সম্মুখীন হলে মিশরে ইবনে তুলুনকে সামরিক প্রশাসনিক ইকতা দেয়া হয়। আহম্মদ ইবনে তুলুন এই সুযোগে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে কর্তৃত্ব পেয়ে বাইজানটাইন সীমান্তবর্তী শত্রুগুলোর উপর প্রভাববলয়ের সম্প্রসারণের জন্য অভিযান চালায় এবং তার অভিযান সার্থক হয় নি বটে, তবে তদীয় পুত্র খুমারাইয়া ক্ষমতাসীন হয়ে পুনরায় ঐ সব অঞ্চল দখলের চেষ্টা করে। এ সময় মোয়াফফাক জানজ বিদ্রোহ দমন করে তাকে বাধা দেয় এবং প্রায় তিন বছরব্যাপী তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলে; কিন্তু কোনো পক্ষই সুবিধে করতে পারছে না দেখে একটি আপোষ রফা হয়। মোয়াফফাক তুলুনীদের দামাস্কাস ও প্যালেস্টাইনে বংশানুক্রমে শাসন করার অধিকার প্রদান কনে। তুলুনীরা বাগদাদকে বার্ষিক ২/৩ লাখ দিনার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। মিশর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব হতে মুক্ত হয়।

প্রধান সমস্যাগুলো হতে মুক্ত হয়ে মোয়াফফাক পুনরায় বাগদাদের প্রভাববলয়ের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। এই নীতির পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রথমে তিনি সাইদ বিন মাখলাদকে ৮৮৫-৬ সালে বরখাস্ত করেন। প্রায় ১৩ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে সকল ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য তাকে জুররিয়াসাতায়ন বলা হত। তার স্থানে ইসমাইল বিন বুলবুলকে বসান হয়। সেই সাথে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে ফুরাত পরিবারের অনুসারীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এরা ছিলেন সামরিক প্রশাসনিক ইকতা বিরোধী। মোয়াফফাক নবনীতি প্রতিষ্ঠায় এতই দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যে, তৎপুত্র আহম্মেদ মুতামিদ তাঁর বিরোধিতা করলে তাকেও কারাবন্দি করা হয়। অচিরে তিনি এবং তদীয় ভ্রাতা খলিফা মুতামিদ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন।

৬.১১ আল মুতাজিদ (৮৯২-৯০২ খ্রি.) : শূন্য রাজকোষ; জাররাহ্ ফোরাত দলের ক্ষমতার পালাবদল ব্যাপক বিচ্ছিন্নতাবাদ

আব্বাসী সাম্রাজ্যের নির্বাহী পরিচালক মোয়াফফাক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পক্ষে ঝঞ্ঝাময় সাম্রাজ্য পরিচালনা আর সম্ভব ছিল না। এত দিন নির্বাসিত ক্ষমতা বঞ্চিত খলিফা মোতামিদের পক্ষেও পুনরায় রাজ্য পরিচালনা ছিল অসম্ভব। এরূপ বাস্তব অবস্থায় মোয়াফফাক পুত্র খলিফা মুতামিদের ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদকে তার অনুসারীরা কারামুক্ত করে ডিফ্যাকেটো শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। খলিফাও মোয়াফফারের মৃত্যুর পর তিনি মোতাজিদ উপাধি গ্রহণ করে খিলাফতে সমাসিন হন। দশ বছর তিনি রাজত্ব করেন। পিতার শাসননীতির বিরোধিতা করার জন্য তাকে কারাবরণ করতে হয়। জাররাহ্ পরিবার ও তার অনুসারীরা তাঁকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। মন্ত্রী ইসমাইলকে গ্রেফতার করা হয়। ফুরাত পরিবার ও তাদের অনুসারীরা আত্মগোপন করে। এভাবে মোয়াফফাক কর্তৃক প্রবর্তিত ফুরাত ও জাররাহ্ পরিবারদ্বয়ের কোয়ালিশন সরকারের ধারণা বিদায় নেয়। খলিফা মোতামিদ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ হতে প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ এলেও এবং একের পর এক রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলেও মোয়াফফাক তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বাস্তববোধ দিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এক এক করে সব সংকট কেটে যায়। তাঁর সামরিক কৌশল ব্যর্থ হলে তিনি রাজনৈতিক ছাড় দিয়ে সংকট নিরসন করেন। তখন পর্যন্ত রাজস্বের গতি স্তব্ধ না হওয়ায় এরূপ রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা রক্ষা করা সম্ভব হয় বটে; কিন্তু যে প্রবণতা প্রাধান্য প্রায় তা হল বিভিন্ন অঞ্চল ক্রমাগত স্বার্থ সচেতন হয়ে ওঠে। এর ফলে কেন্দ্রীয় কোষাগারে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় হয়ে উঠে। ৮৯২ সালে মোতাজিদ যখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তখন বাগদাদের কোষাগার ছিল প্রায় শূন্য। এরূপ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটে নি। স্বাভাবিকভাবে মোতাজিদকে শূন্য খাজাঞ্চিখানা পূরণ করার পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন হয় সর্বাধিক। দশ বছর ধরে তিনি বাস্তব অবস্থার

পরিবর্তনের প্রয়াস চালান; কিন্তু তার কোনো প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হয় নি। কারণ তিনি তার পিতার গতিশীল নীতির পরিবর্তে একটি স্থবির নীতি অনুসরণ করেন। সামরিক প্রশাসনিক ইকতা ব্যতীত প্রদেশসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার বিকল্প কোনো ব্যবস্থাই তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি।[৬৭] এর বিষময় ফল দেখা দেয়। প্রথমে বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। দ্বিতীয়ত এ পর্যন্ত সামরিক ও নাগরিক আমলাদের সম্মিলিত স্বৈরতন্ত্র চলমান থাকলেও বাগদাদের রাজনীতিতে এক নয়া শক্তির বিকাশ ঘটে। মুতাগাল্লিবুন বা আরবদের ভাষায় আসহাবুল আতরাফ বা আজমী সমরনেতাদের আবির্ভাব ঘটে এবং ক্রমাগত আব্বাসী রাজনীতিতে তারা প্রাধান্য বিস্তার করে।[৬৮] আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য সরকারের সেনাবাহিনী ছিল অপরিহার্য তাই প্রয়োজন ছিল অর্থের।

কর ইজারাদারি প্রথার প্রবর্তন

রাজস্ব আদায়ের জন্য কর ইজারাদারি প্রথা প্রবর্তন করতে হয়। কর ইজারা নেয় সমর নেতারা এবং তারা এ ব্যবস্থাকে আপন স্বার্থে ব্যবহার করে। তাদের চাপে অসংখ্য ক্ষুদে কৃষক ভূমি হতে বিতাড়িত হয়: যাযাবরদের কলেবরে বৃদ্ধি পায়; তারা দস্যুতা চালিয়ে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পথের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যের প্রতি এই হুমকি নতুন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং অশুভ আতাত গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা বিধান জরুরি হয়ে পড়ে; এজন্য সামরিক-প্রশাসনিক ইকতা সম্প্রসারিত করতে হয়. বিভিন্ন বাণিজ্য পথে, বাণিজ্যের উপর, আন্ত-আঞ্চলিক শুল্ক আরোপ করা হয় এবং তাতে ইকতা ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। বস্তুত এরূপ পরিস্থিতিতে ক্যাসপিয়ন সাগর তীরের দাইলামিরা কেন্দ্রীয় সরকার ভাঙ্গনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। দেশের এরূপ বাস্তব অবস্থায় শিয়াদের বিপ্লবী আদর্শের প্রতি গ্রাম সমাজের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

এরূপ বাস্তব অবস্থা মোয়াফফাকের সময়ও বিদ্যমান ছিল, তবে তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও বাস্তবতাবোধ দিয়ে রাষ্ট্রকে বাঁচান। তিনি দীর্ঘমেয়াদি নীতির কথাও ভেবেছিলেন; কিন্তু বার্ধক্য ও মৃত্যুর কারণে তা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। তিনি জানতেন তাঁর নীতির বিরোধিতা আসবে কায়েমি স্বার্থ মহল হতে, যাদেরকে তিনিই শক্তিশালী করেছিলেন। মুতাজিদ তাঁর বাবার মতই সাহসী ও শক্তিশালী হলেও তাঁর মধ্যে বাবার মত দূরদর্শিতা ছিল না। তদুপরি তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য কেবল ছোটখাট কৌশলগত পরিবর্তন মেনে নিতে রাজি ছিলেন। তাঁর দশ বছরের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সামাজিক অস্থিরতা প্রবল হয়। তিনি তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। কাজেই যে মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, সে পথে তিনি যেতে পারেন নি। তিনি কেবল সাম্রাজ্যের উপর তার থাবা দৃঢ় করতে যত্নবান

ছিলেন। তার মত রক্ষণশীল খলিফার পক্ষে সামরিক ও রাজস্ব বিভাগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অর্থ তিনি বুঝতেন উভয় বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করা। তাঁর মধ্যে এরূপ স্থবির চিন্তার জন্য তিনি তার সমস্যা সমাধানে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার ফল হয় উল্টো।[৬৯]

উত্তরাধিকারসূত্রে মোতাজিদ পেয়েছিলেন একটি সমন্বিত একক শক্তিশালী সেনাবাহিনী। এ বাহিনী ছিল জাতিগত ভেদাভেদ বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ বাহিনীকে যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারের সুযোগ ছিল। তার পরিকল্পনা অনুসারে তিনি তার বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেন।

ক. প্রথম অভিজাত বাহিনী এরা ছিল বাগদাদে অবস্থিত স্থায়ী বাহিনী এবং প্রাসাদেই রাজকীয় কার্যধারায় ব্যবহৃত হয়। পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর প্রায় সকল সদস্য সুদানী হলেও দাইলামিরাও ছিল। এরা ব্যারাকে থাকত বলে মোসাফিফরা নামে অভিহিত করা হয়। ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে সাধারণত জেনারেলদের প্রতিভাধর সন্তান ও আরবদের প্রাধান্য থাকলেও রাজার সদস্যরাও ছিল। এরা প্রাসাদে খলিফার দেহরক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব পালন করত। এদেরকে ফারসান, খাসসা, হুজুরিয়া-গিলমান, মামলুক ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কোনো রকম অস্থিরতা দেখা দিলে তাদেরকে অকুস্থলে প্রেরণ করা হয়।

খ. দ্বিতীয় বিভাগকে বলা হত আসকার আল খিদমাহ। এদের শুরতা বা পুলিশ বাহিনী বলা হত। তারা প্রধানত বাগদাদ নগরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং শহরের প্রবেশ পথ নিরাপদ রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

গ. তৃতীয় বিভাগের সদস্যদেরকে আসকার আদ-দীন বা মেয়োনো বলেও অভিহিত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বেসামরিক আমলাদের সাহায্য করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা হত। তারা প্রত্যন্ত প্রদেশে পুলিশের দায়িত্ব পালন করত।[৭০]

তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য উবাইদুল্লাহ বিন সুলাইমানকে উজির পদে নিয়োগ করা হয়। বস্তুত তিনি ছিলেন তৃতীয় বাহিনীর অধ্যক্ষদের উপরও কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন বিশ্বাসভাজন, রাজপ্রতিনিধি নাগরিক আমলা, প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগ হতে সামরিক বাহিনীকে দূরে রাখার দায়িত্ব তিনি পালন করেন। তাঁর এই কঠিন কাজ সম্পাদন করার জন্য তদীয় পুত্র কাশেমকে তার সহকারী নিয়োগ করা হয়। এরূপ একটি ব্যবস্থাও বাস্তবে কার্যকর হয় নি। কেননা তৎকালীন বাস্তবতায় আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী মূল সমস্যা সমাধানের কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয় নি।[৭১]

অর্থ সংগ্রহ নীতি

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, মুতাজিদের তাৎক্ষণিক সমস্যা ছিল শূন্য কোষাগার পূর্ণ করা। ৮৯২ সালে সামানী শাসনকর্তার মৃত্যু হলে ঐ সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সামানী রাজ্যের প্রতি বিভিন্ন শক্তির লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। খোরাসানের তাহেরী অনুসারীরা, তাবারিস্থানের শিয়ারা এবং সাফফারী আমর ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাফফারীদের সাথে দর কষাকষি শুরু করে। সাফফারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোনো অর্থ মঞ্জুরীর আবেদন না করে বরং খলিফাকে বার্ষিক চার মিলিয়ন দিরহাম দিতে রাজি, যদি তিনি সাফফারী আমরকে সামানী রাজ্যের শাসক নিয়োগ করেন। সাফফারীরা প্রথম দিকে সাফল্য অর্জন করলেও অবশেষে সামানীদের হাতে পরাজয় বরণ করেন। আমরকে বন্দি করে বাগদাদে প্রেরণ করা হয়। খলিফা সামানী ইসমাইলকে কেবল পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করতে বাধ্য হয় নি বরং আরো দশ মিলিয়ন দিরহাম মঞ্জুরী দিতেও বাধ্য হন। তাবারী মনে করেন এতে খলিফার মর্যাদার হানি হয়; আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি পায়; বাগদাদে নতুন করে তাহেরী খোরাসানী সৈনিকের স্থান দেয়ায় এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসন বাষ্পায়িত হয়।[৭২]

পঞ্জিকা সংস্কার

উজির উবাইদুল্লাহ রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে পঞ্জিকা সংস্কার করতে চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাসের প্রবর্তন করেন। তিনি ইসলামের উত্তরাধিকার আইনেরও সংস্কার সাধন করেন। মোয়াফফাকের কঠোর শাসনের পূর্বে উত্তরাধিকার বিষয়টি কাজির ক্ষমতাধীন ছিল। উজির একটি উত্তরাধিকার বিভাগ গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল লাওয়ারিশ সম্পত্তি সরকারের অধীনে আনা। বাস্তবে দেখা গেল এই ব্যবস্থায় আয়ের তুলনায় ব্যয়ের মাত্রা বেশি হয়েছে যাচ্ছে—কাজেই বিভাগটি উঠিয়ে দিয়ে পুনরায় উত্তরাধিকার বিষয়টি কাজির ক্ষমতাধীন করা হয়। তিনি আরো একটি সংস্কার সাধন করেন। সরকারি কর্মচারীদের জন্য দুদিন ছুটির দিন ধার্য করা হয়। একদিন হবে বিনা বেতনে ছুটি। এর উদ্দেশ্য ছিল, সরকারি ব্যয় সঙ্কোচন করা। এসব ছোটখাটো সংস্কারে অবশ্যই সামান্য লাভ হয় বটে; কিন্তু মূল সমস্যা সমাধানের কোনো দিক-নির্দেশনা ছিল না।[৭৩]

ফুরাত মন্ত্রী গঠন

এরপর উজির ফুরাত ভ্রাতাদেরকে মুক্ত করে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তাদের শাসন পদ্ধতিতে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, তারা ইকতা বিরোধী ছিল এবং তারা জানত যে, মিশরে মামুনের সময় হতেই কাবালা ব্যবস্থা ভালভাবে কার্যকর ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও বাগদাদের বিরাজমান বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে

কর ইজারাদারি প্রথার প্রবর্তন করা হয়। তাই বংশের আহমদ বিন মুহাম্মদকে বাগদাদের চার পার্শে এই শর্তে কর ইজারাদারি প্রদান করা হয় যে, তিনি সরকারের কর হিসেবে প্রতিদিন ৭ শত দিনার অর্থাৎ বার্ষিক ২,৫২,০০০ দিনার দেবেন। মিশরের তুলুনীদের সাথে চুক্তি নবায়ন করা হয়। তারা সরকারকে বার্ষিক ৪,৫০,০০০ দিনার দিতে সম্মত হয়; কিন্নাসিরিনের উপর হতে তুলুনী অধিকার প্রত্যাহার করা হয়। ফুরাত এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে; কিন্তু ফল হয় উল্টো।[৭৪] প্রতিটি অঞ্চলের সমরনেতারা স্ব স্ব অঞ্চলের রাজস্বের উপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। যাযাবর প্রধান এবং স্থানীয় দেহকান সকলেই এরূপ সুযোগ গ্রহণ করে অথবা স্থানীয় স্বার্থ রক্ষার দাবি শুরু করে। তাদের দাবি পূরণের জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে তারা পিছপা হয় নি। মুতাজিদ প্রথমে তার এলিট বাহিনী দিয়ে এসব বিদ্রোহী অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হন। সমগ্র ইকতার পূর্ণ প্রয়োগ করতে হয়।[৭৫] তাবারী আরো বলেন যে, সামাজিক অস্থিরতার মোকাবিলা করার জন্য ইজারাদাররা তাদের লভ্যাংশ দিয়ে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গঠন করে।[৭৬] বস্তুত এরূপ পরিস্থিতিতে ইজারাদারি ও ইকতার মধ্যকার পার্থক্য রইল না। সমরনেতারা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। সরকারি কর্মচারীরাও পিছিয়ে থাকেন নি। তারাও ইজারাদারি সংগ্রহ করে। ফুরাত পার্টির আদর্শ অচল হয়ে পড়ে। তারা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং জাররা ক্ষমতাসীন হন। বাগদাদের দ্বিতীয় ডিভিশনের সেনাধ্যক্ষরাও বসে থাকে নি, তারাও কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বিভাগে নাক গলাতে শুরু করে। এভাবে খিলাফতের ঐক্য ও সংহতি বিনাশকারী শক্তি জোরদার হয়।

ইবনে আবি সাজ মুতাজিদকে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সামরিক-প্রশাসনিক ইকতা দিতে বাধ্য করেন। হামদানীদের মত স্থানীয় প্রধানরাও জাজিরায় সেনা উপনিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে নেয়।[৭৭] আরবরা ব্যবসায়ীদের নিকট হতে শুল্ক আদায় করেই সন্তুষ্ট থাকে। এ সময় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে দস্যুতা বৃদ্ধি করে। তাদের এরূপ কার্যকলাপ মিশর, সিরিয়া ও বাইজানটাইন সকলের জন্য ছিল বিব্রতকর।[৭৮] অনেক আরব প্রধান সুমিয়াত, মারদিন এবং আমিদে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ব্যবসায় অংশ নেয়ার জন্য তারসুসের সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। তারা বাগদাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে ছিল আগ্রহী। তাদের পড়শি আরমেনীয়রা ও আজারীরা ককেসাস অঞ্চল দিয়ে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহী ছিল; কিন্তু তাদের বাণিজ্য সামানীদের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়।

এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়ে মুতাজিদের সমস্যার মোকাবিলার জন্য অগ্রাধিকার প্রশ্ন বিবেচনা করতে হয়। তার স্বার্থ নিহিত ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত রাখার মধ্যে; বিশেষ কোনো বাণিজ্য পথের প্রতি তার কোনো মোহ ছিল না। বস্তুত তিনি স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন। এ কারণে সামানীদের সাথে তাঁর

যুদ্ধ ছিল নিষ্প্রয়োজন, তিনি ইবনে আবি সাজকে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে ছাড় দেন, বাইজানটাইনের সাথে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। তিনি তুলুনীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। তাঁর তাৎক্ষণিক সমস্যা ছিল বাগদাদ-রায় সংযোগ সড়কের উপর নিরাপদ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, জাজিরায় গোলযোগপূর্ণ সড়কসমূহে শৃঙ্খলা রক্ষা করা বাইজানটাইনদেরকে অযথা উত্যক্ত না করা। এসব উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিনি অগ্রসর হন। রায়-বাগদাদ সড়কের নিরাপত্তা বিধানে তাঁর সামরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি তার উজিরকে রায় নগরে প্রেরণ করেন। সেখানে পুনরায় সামরিক প্রশাসনিক ইকতা প্রতিষ্ঠা করে সমস্যার সমাধান করা হয়। মুতাজিদ স্বয়ং জাজিরার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এখানে তার শত্রুপক্ষ দ্বিধা-বিভক্ত থাকায় তার সামরিক সাফল্য অর্জিত হলে আরব-কুর্দী মৈত্রী জোট তার এলিট বাহিনীর সামনে টিকতে পারে নি। আরব-শিয়া হামাদানীর খারেজীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাগদাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। এর বিনিময়ে তাদেরকে মোসুল প্রদান করা হয়। এভাবে হামাদানীরা কেন্দ্রীয় সরকারের অংশে পরিণত হয়। সগুরের অন্যান্য আরবরা হামাদানীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।[৭৯]

তারসুস সমস্যা সম্পর্কে মুতাজিদ ভেবেছিলেন যে, শান্তি প্রচেষ্টায় দস্যুদেরকে দস্যুবৃত্তি হতে নিবৃত্তি করা যাবে। তারসুস সমস্যা অনুধাবন করার জন্য তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে প্রেরণ করেন। তারসুসে কিছু ঘটে নি। কিন্তু আজারবাইজানে ভীষণ গোলযোগ দেখা দেয়। জনৈক ওয়াসিক এখানকার ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ অঞ্চলের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য তিনি মালাতিয়া আক্রমণ করেন। বাইজানটাইনও তাতে আপত্তি করেন নি। মুতাজিদ অনুধাবন করেন যে, দক্ষিণাঞ্চলে জাজিরায় ও পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই কালক্ষেপণ না করে তিনি ওয়াসিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেন। ওয়াসিক টিকতে না পেরে বাইজানটাইনে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করতে চেষ্টা করলে ধৃত হয়। এই সাফল্যের পর মোতাজিদ সগুর ভ্রমণ করেন; তারসুসে এসে তিনি বাইজাইনটাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সমর নৌবহর ধ্বংস করেন।[৮০] এই ঘটনার পর পরবর্তী তিন বছর তিনি এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি দক্ষিণ ইরাকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন অথচ সেখান হতেই নতুন মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। মুতাজিদ ভেবেছিলেন যে, তিনি যে সব রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাতে সাম্রাজ্যে শান্তি অব্যাহত থাকবে। তাই এখানে নয়া বিস্ফোরণ ঘটায় অনেকে হতবাক হয়। অথচ এটা ঘটার পূর্বাভাস ছিল; কিন্তু ক্ষমতান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। এটা ছিল কারামিতা বিপ্লব। বহু দিন হতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র আঞ্চলিক স্বার্থ চেতনা, বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকাশ এবং গ্রামাঞ্চলে অসন্তুষ্টি বিরাজ করছিল। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে কারামিতারা সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে সমর্থ হন।[৮১]

৬.১২ আল মুক্তাফী (৯০২-৯০৮ খ্রি.)

মোতাজিদের মৃত্যুতে মক্কায় অবস্থানকারী উত্তরাধিকারী দ্রুত বাগদাদে আগমন করেন এবং তার পিতার ভূগর্ভস্থ কারাগারগুলো ধ্বংস করে সেগুলো উপাসনা গৃহে রূপান্তর করেন। মুতাজিদ তার প্রাসাদ নির্মাণ করতে যে সব জমি হুকুম-দখল করেন সেগুলো মালিকদের ফেরত দিয়ে তিনি তার মহাসংস্কারের পরিচয় দেন এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেন।[৮২] মুক্তাফীর সাথে বাইজানটাইন সম্রাট ষষ্ঠ লিও এর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাঁরা পরস্পরের উপঢৌকন ও দূত বিনিময় করেন। অথচ উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তে অনেকে তাদের মধ্যকার সুসম্পর্ক চিড় ধরাতে চেষ্টা করে যাতে মোসুলে তিনি হামাদানীদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে তিনি যতটুকু সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন, পূর্বাঞ্চলে ততটুকু সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হন। পূর্বাঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ফারেস ও কিরমানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কর ইজারাদারির সুবিধে ভোগ করতেন। তার কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি খলিফাকে সাফফারীদের সাথে সম্মানজনক আপোষ বফার উপর গুরুত্ব দিতেন। অথচ সমরনেতারা তাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর চাপ দেয়। তাদের মনোভাবের প্রতি বাগদাদের নাগরিকদের বৃহদাংশের সমর্থন ছিল। এরূপ অবস্থায় উজিরের সাথে সামরিক নেতাদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘাতে উজির পক্ষ জয়লাভ করে; অথচ সাফফারীদের মাঝে বাগদাদের কোনো সমঝোতা হয় নি। ৯০৩ সালে উজির কাসেম মারা গেলে আব্বাস বিন হাসান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও ছিলেন সামানীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি তাঁর পূর্বসূরির নীতি অনুসরণ করেন। সামানীদের সাথে যে ব্যবস্থা ছিল তার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকে আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা সামানীদের বিরুদ্ধে সাফফারীদের উৎসাহিত করার নীতি অনুসরণ করে। এ নীতির ব্যর্থতা অনুধাবন করে বাগদাদ অন্য উপায় অনুসরণ করতে থাকে। রায়, তাবারীস্থান ও জুরজানে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকারও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু সাসানীরা এ বিদ্রোহ দমন করতে সফল হওয়ায় বাগদাদের রণকৌশল অকেজো হয়ে পড়ে। সামানী গভর্নর পারস এবং ৪০০ ব্যক্তিসহ সামানী পক্ষ ত্যাগ করে বাগদাদের দিকে যাত্রা করেন। অসন্তুষ্ট উজির এদের বাগদাদে আগমনকে স্বাগত জানান। তাদের বাগদাদে পৌঁছানোর পূর্বেই মুক্তাফী মাত্র ৩২ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে সংকোচিত সাম্রাজ্যে নতুন সংকট দেখা দেয়।

৬.১৩ আব্বাসী খেলাফতের রাজনৈতিক সংকটের চরম পর্যায় (৯২২-৯৪৬ খ্রি.)

এ সময়ের খলিফাগণ : ১৮. আল মুক্তাদির (৯০৮ – ২৩ –৩২ খ্রি.) ১৯. আল কাহির (৯৩২ – ৯৩৪ খ্রি.) ২০. অরজী (৯৩৪ – ৪০ খ্রি.) ২১. মুত্তাকী (৯৪০ –৪৪ খ্রি.)

২২. মুস্তাকফী (৯৪৪-৪৬ খ্রি.) আল মুক্তাদির (৯০৮-৩২ খ্রি.) সমর নেতাদের ক্ষমতায়নের পায়তারা : দলীয় রাজনীতির অধিক বিকাশ : যুগ্ম সরকারের যুগ।

আল মুক্তাফির অকাল মৃত্যুতে উত্তরাধিকার সমস্যা দেখা দেবে খলিফা অসুস্থ থাকার সময়ে অভিজ্ঞ উজির অনুধাবন করেছিলেন। অসুস্থ থাকার সময় খলিফার সন্তানেরা সবাই ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। ভ্রাতা জাফর তাঁর উত্তরাধিকারী হতে পারেন বলেও খলিফা এক সময় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সাম্রাজ্যে তিনটি স্বতন্ত্র বাহিনীর মধ্যে তৃতীয় বাহিনী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় এ বাহিনী নিয়ে দুশ্চিন্তার বড় কারণ ছিল না। প্রথম ডিভিশন অভিজাত বাহিনী এবং দ্বিতীয় ডিভিশন পুলিশ বাহিনী সুসংহতভাবে রাজধানীতে অবস্থান করত; এবং এই বাহিনীর পুনর্গঠনের সময় হতে সেনাধ্যক্ষরা শক্তিশালী খলিফার আজ্ঞাধীন ছিল। অল্প বয়স্ক দুর্বল খলিফার আজ্ঞা তারা কিভাবে গ্রহণ করবে তা পূর্বাহ্নে বলা কঠিন। তদুপরি সেনাপতিদের একজন ছিলেন রাজার মাতুল। এ কারণে অভিজ্ঞ মন্ত্রী আব্বাস মনে মনে আশংকা পোষণ করতেন যে, শক্ত উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতে সমস্যার জ্বালামুখ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পারসের বাগদাদ আগমনের বার্তা পেয়ে উজির আশান্বিত হয়েছিলেন, হয়ত তার আগমনে একজন বয়স্ক খলিফার মনোনয়ন সম্ভব হবে। পারসের বাগদাদ প্রবেশের পূর্বেই মুক্তাফীর মৃত্যু হলে জাফর মুক্তাদীর উপাধিতে ভূষিত হয়ে খেলাফতে সমাসীন হন।[৮৩] চার মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই মন্ত্রীর আশংকা বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। কয়েকজন সমরনেতা বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখল করে মুক্তাদিরকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং মন্ত্রীকে হত্যা করে। এই ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিজাত বাহিনী পাল্টা ক্যু করে মুক্তাদিরকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে।[৮৪]

এরূপ বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে বাগদাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে ৪ জন সামরিক ব্যক্তিত্বের উদয় হয়। এরা প্রায় ২৫ বছর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। এরা হলেন : ১. নসর আল কাশুরী—তিনি ছিলেন জাতিতে খাজার এবং অভিজাত বাহিনীর অধ্যক্ষ, তাঁকে মাওলায় আমিরুল মোমেনিন বলা হত। তিনি আরবি ভাল বলতে পারতেন না। ২. গারিব আল খাল—একজন প্রভাবশালী সেনাপতি, মোক্তাদিরের মামা এবং নসরের ঘনিষ্ঠ মিত্র, তিনিও খাজার। ৩. মুনিস আল কাহল—তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বাহিনী বা বাগদাদের পুলিশ প্রধান। ৪. মুনিস আল খাসিয়া—তিনি ছিলেন তৃতীয় বাহিনী প্রধান। যেহেতু এরা সবাই ছিলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য-এজন্য বলতে হয় যে, এ পর্যায়ে যদিও রাষ্ট্রীয় চরিত্রের প্রধান দিক হল সামরিক নাগরিক আমলাতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, তথাপি-সামরিক বাহিনী বেসামরিক আমলাদের তুলনায় অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত চার ব্যক্তিত্বের মধ্যে একই নামের দু মুনিসের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের উপাদান ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে নসর ও গরিবের সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের, এবং এটাই ছিল এ

সময়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এদের এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয় প্রক্রিয়ায় নিহিত ছিল বুওয়াইয়াদের অচিরে ক্ষমতা দখলের পটভূমি।[৮৫] মুক্তাদিরের অবয় প্রাপ্তিকালে রাণীমাতা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করার ফলে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব জটিল হয়। প্রাসাদ রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে মুক্তাদিরের ২৫ বছর রাজত্বকালে ১৫ জন মন্ত্রীর উত্থানপতন এবং পাঁচবার ক্ষমতা দখল বা ক্যু সংগঠিত হয়। এ সময় যদিও সামরিক ব্যক্তিত্ব বাগদাদের রাজনীতির নিয়ামক শক্তি বলে বিবেচ্য হয়, তথাপি বেসামরিক আমলাদের উৎখাত করা সম্ভব হয় নি। দীর্ঘ ২৫ বছরের রাজনৈতিক আবর্তে জাররা ও ফুরাত পরিবারের মতাদর্শ ও কার্যক্রম দ্বারা বিশ্লেষণ করা চলে। নীতি নির্ধারকরা যেই হন না কেন, তারা মোটামুটি দুদলের যে কোনো একটি মতাদর্শ অনুসরণ করে তা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালায়।[৮৬]

জাররাহ্ ও ফোরাতের আদর্শগত প্রশ্ন : ইতিপূর্বে জাররাহপন্থী ও ফুরাতপন্থীদের মতাদর্শগত পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে। সময়ের অগ্রগতিতে তাদের মতামতে বেশ কিছু রদবদল দেখা দিলেও মৌলিকভাবে তা ছিল অপরিবর্তিত। বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তাদের স্ব স্ব মতাদর্শে কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সামরিক কর্তৃত্ব প্রাধান্য পাওয়ায় বাস্তব অবস্থায় নতুন উপাদান সংযোজিত হয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, জাররাহপন্থীরা ছিল রক্ষণশীল এবং সামরিক আমলাতান্ত্রিক ইকতার ঘোরতর সমর্থক। এ সময় তারা পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়। তাদের নীতিগুলো ছিল দেশের সামন্ত-বণিকদের স্বার্থের রক্ষাকবচ। তারা সুদী-মহাজনী কারবারের সমর্থক। ফুরাতপন্থীরা কোনো বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন না করতে চাইলেও তাদের শত্রুপক্ষ তাদেরকে সাম্যবাদী কারামতি বলে অপবাদ দেয়। তারা কর ইজারাদার ব্যবস্থা অন্যায় বলে ভাবত; তাদের সংস্কারনীতি অনেকাংশে করদাতাদের জন্য ছিল সম্মানজনক। তারা দৃঢ়তার সাথে বলত যে, সামরিক বাহিনীকে সর্বদাই বেসামরিক কর্তৃত্বের অধীনে থাকা উচিত। তারা সরকারি মহলের দুর্নীতিকে মন্দের ভাল বলে গ্রাহ্য করে; তবে এর মধ্য হতেও সরকারি কোষাগার যাতে উপকৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখত।[৮৭]

ক্ষমতায় ফুরাত দল

৯০৮ সালে প্রথম ডিভিশন কর্তৃক দ্বিতীয় ক্যু সম্পাদন সফল হলে মুক্তাদির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এর পশ্চাতে ফুরাত পরিবারের পূর্ণ সমর্থন থাকায় তারা শাসনকার্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। এ সময় কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চিখানায় কোনো ঘাটতি ছিল না বরং ৬ লাখ দিনার মজুদ ছিল এবং বাদশাহের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছিল ১৫ মিলিয়ন। বাগদাদের শাসকবর্গের সন্তুষ্টি অটুট রাখতে পারলেও ফুরাত মন্ত্রী সামরিক নেতাদের তুষ্ট রাখতে পারে নি। কেননা ফুরত মন্ত্রী পরিষদ সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক কর্তৃত্বাধীনে

আনতে যত্নবান ছিল।[৮৮] উজিরের কাজে বাধা দিতে চাইলে তাদের একজনকে হত্যা করা হয়। জেনারেল মুনিস উজিরের এরূপ কাজে বাধা দেন নি। তার একান্ত কাম্য ছিল তার বাহিনীর নিয়মিত বেতনের নিশ্চয়তা। ফুরাত মন্ত্রী পরিষদও তাই চাচ্ছিল বলে বাজেটে কিছু সমন্বয় সাধনে অগ্রসর হয়। মন্ত্রী পরিষদ মনে করত তৃতীয় বাহিনীর কোনো প্রয়োজন ছিল না। নয়া পরিস্থিতিতে বাগদাদ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তার দায়িত্ব দ্বিতীয় বাহিনীর উপর দিয়ে অন্য দু বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং রাজকীয় কার্যাবলী সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজাত বাহিনী সদস্য প্রাসাদে সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্টাংশ প্রদেশসমূহে প্রেরণ করলে সরকারি ব্যয় হ্রাস পাবে। পারস বাহিনী বাগদাদে এলে হামদানীদের মোকাবিলার জন্য তাদেরকে জাজিরায় প্রেরণ করা হয়। তারা তাদের বেতন ও বৃত্তি স্থানীয় খাজাঞ্চিখানা হতেই নিতে পারবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার সাথে খাজার তিগিন আল খাসমকে মিশরে নিয়োগের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মন্ত্রীর যে পদক্ষেপে তার শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং উচ্চ বেতনের সম্ভাবনা থাকবে তাতে মুনিসের বাধা দেয়ার কোনো কারণ ছিল না। অথচ সেনাবাহিনীর উপর হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ ছিল না। সেনাবাহিনীতে সমন্বয় সাধন করতে গেলে মন্ত্রীর সাথে মুনিসের বিরোধ বাধে। তিন বছর আট মাস ক্ষমতায় থাকার পর মন্ত্রীকে ৯১২ সালে পদচ্যুত করা হয়।[৮৯]

তৎকালীন বিদ্যমান সমস্যা মোকাবিলার জন্য মোহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন খাকানকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রী সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। ৯১৩ সালে তাকে বরখাস্ত করা হয়।[৯০] এ সময় পুলিশ প্রধান দাঁড়িওয়ালা মুনিসও প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন রাজ তখতের বড় সমর্থক। যা হোক রাজমাতা ও নসর ফুরাতদের ক্ষমতাসীন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলেও মুনিসের বিরোধিতার ফলে তা সম্ভব হয় নি।

পাঁচ বছর ধরে মক্কায় বন্দি জীবন যাপনের পর জাররা সমর্থক আলি বিন ইসা মন্ত্রী পদে নিয়োগ পান।[৯১] মুনিস তার কর্মস্থল প্রদেশের রাজস্ব বিভাগে কোনো হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না- তিনি চাইতেন যে তার সৈনিকদের বেতন-বৃত্তি বৃদ্ধি পাক। মুনিসের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মন্ত্রীর পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় এবং উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সুসম্পর্ক প্রায় দু'দশক ধরে বজায় থাকে।[৯২] সিরিয়া ও মিশরে শিশু রাজপুত্রকে শাসক নিয়োগ এবং মুনিসকে তার অভিভাবক ডেপুটি নিয়োগ করা হয় এবং মুনিসের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয় ঐ দু অঞ্চলের রাজস্ব হতে। নগরকে তার পুলিশ সদস্যদের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ইরাকের কতিপয় জেলার রাজস্ব হতে মেটানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ রকম অনুকূল অবস্থায় মন্ত্রী দক্ষতার সাথে তার পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া সকল বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করতে সক্ষম হন। এবং কেন্দ্রীয় বাজেটে সমন্বয় সাধন করেন। কেন্দ্র প্রদত্ত সকল বেতন ও বৃত্তি বন্ধ করে সরকারের

উপর আর্থিক চাপ হ্রাস করে। কিয়ৎপরিমাণ কর সংস্কারে কেন্দ্রের স্বল্প পরিমাণে ক্ষতি হয় এবং তিনি ন্যায়পরায়ণ মন্ত্রীর খ্যাতি অর্জন করেন।[৯৩] মন্ত্রী রক্ষণশীল মহলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হলেও হাম্বলীদের মন জয় করতে ব্যর্থ হন।[৯৪] তিনি ওয়াকফহ্ বিষয়ে তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও মিশরে মামুনের সময়ের প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় চালু করা হয়। ধীরে ধীরে তা অনেকাংশে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেও মূলত তা বিতর্কিত থেকে যায়। একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টির জন্য মন্ত্রী বাদশাহকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বাগদাদ ও আশেপাশে তার কিছু সম্পত্তি ওয়াকফ করার উপদেশ দেন। এতে ব্যয় নগণ্য হলেও এর ফলাফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ; ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তা গৃহীত হলে পরবর্তীকালে সহজে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থে ব্যবহৃত হত। হাম্বলীরা এটা আদৌ পছন্দ করে নি।[৯৫] রানিমাতা যখন তার বিপুল সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন-তার প্রতিবাদে বাগদাদে হাঙ্গামা হয়। দলিল দস্তাবেজগুলো অকার্যকর ঘোষণা করার দাবি উত্থাপিত হয়।[৯৬]

হাম্বলীদের নেতৃত্বে মনসুর হাল্লাজকে নিয়ে রাজধানী বাগদাদে বেশ রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে কেবল তাকে বিপদগামী বলে ভাবে নি বরং সমগ্র সনাতনী ধর্ম ও দেশের জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে মনে করে। মন্ত্রী আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু কট্টরপন্থী হাম্বলীরা তার মৃত্যুদণ্ডের দাবি করে। জেল তার অপরাধের জন্য যথেষ্ট শাস্তি নয়। অনেকে তার মত একজন মানসিক রোগীকে কারাগারে নিক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন মনে করত। পরবর্তী নয় বছর ধরে হাল্লাজ প্রশ্নটি মীমাংসিত হয় নি বরং ৯২২ সালে তাকে কারাগার হতে বাইরে এনে প্রকাশ্য বিচারের পর হত্যা করা হয়।[৯৭] এ ঘটনা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় বাগদাদে রক্ষণশীল সমাজের বাস্তব অবস্থাটি কিরূপ ছিল। কট্টর শিয়া ও সুন্নিরা প্রায়শ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তোলে।

এ সময় অজ্ঞাত কারণে মন্ত্রী বাহরাইনের কারামতিদের সাথে সমঝোতায় আসেন। উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমী আন্দোলন হতে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে কারামতিদের সাথে মন্ত্রী উদার ব্যবহার করেন। যা হোক ফাতেমীরা সাইরেনিকা দখল করেই ৯১৫ সালে মিশরের আলেকজান্ডার আক্রমণ চালায়। মুনিস ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে তা প্রতিহত করেন। কারামতিরা কোনো প্রকার শত্রুতা করে নি। হামদানীরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধে নেয়ার চেষ্টা চালায়। মুনিস ফাতেমীদের আগ্রাসন প্রতিহত করে, হামদানীদের উচ্চাভিলাষ স্তব্ধ করে দেয়। এ সব সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। মন্ত্রী তাই সরকারি ব্যয় সঙ্কোচন নীতি অবলম্বন করেন। এতে তার প্রতি অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ৯১৭ সালে মন্ত্রী আলী বিন ইসাকে বরখাস্ত করা হয়। পুনরায় ফুরাত পার্টি তাদের

স্থলাভিষিক্ত হন।[৯৮] এবার ফুরাত পার্টি একটু ভিন্ন পরিবেশে ক্ষমতাসীন হয়। জেনারেল মুনিস এবং তাঁর অনুগামীরা বিদ্যমান ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকলেও খলিফা মুক্তাদির এবং রানিমাতা সরকারি কোষাগার হতে অধিক পরিমাণে বৃত্তির দাবি করেন।

ফুরাত সরকার রাজকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য দৈনিক অতিরিক্ত ১৫০০ দিনার মঞ্জুর করে। কাজেই রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করতে হয়।[৯৯] সরকারের দুর্নীতি ছিল সর্বগ্রাসী। তাই সরকার খলিফা উমরের একটি নিয়ম পুনঃজারি করেন। প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে তার সম্পদের হিসাব প্রকাশ করতে হতো এবং তার বরখাস্তের সময় অনিয়মের জন্য প্রচুর পরিমাণে জরিমানা দিতে হত। এরূপ নিয়মের কার্যকারিতা নির্ভর করত খলিফার মর্জির উপর। কাজেই এ ব্যবস্থার কার্যকারিতা ছিল খুবই কম। পুনরায় ফুরাত সরকার একটি দুর্নীতি বিরোধী দপ্তর সৃষ্টি করে সকল কর্মচারীর অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের উপর কর আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[১০০] কিন্তু ক্রমবর্ধমান সরকারি ব্যয় নির্বাহ করার মত প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করতে সরকার ব্যর্থ হয়। তাই ৯১৮ সালে ফুরাত সরকারকে বরখাস্ত করা হয়।[১০১]

হামিদ বিন আব্বাসকে সরকার প্রধান বা উজির পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের ইজারাদার। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং বাগদাদ ও ওয়াসিতের বিখ্যাত সম্পদশালী ব্যক্তি। তার কোনো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা না থাকায় এককালের জাররাহ মন্ত্রী আলী বিন ইসাকে তিনি তার সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেন। তার দায়িত্ব ছিল যথাসম্ভব সরকারি ব্যয়ভার হ্রাস করার উপায় উদ্ভাবন করা এবং স্বয়ং উজির রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় সৃষ্টি করবেন। তাই আশা করা হচ্ছিল যে, তিনি কর-ইজারাদারি ব্যবস্থা যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করে কর কর্মকর্তা ও ইজারাদারের মধ্যকার পার্থক্য দূরীভূত করবেন। মন্ত্রী স্বয়ং বাগদাদ ও তার আশেপাশে ৫৪ মিলিয়ন দিরহামের ইজারাদারি গ্রহণ করেন এবং তিনি পুনশ্চ অন্যদেরকে উপ-ইজারাদারি দেন। সহকারী উজিরের সহযোগী মিশর ও সিরিয়ার কর কর্মকর্তাদেরকে তিন মিলিয়ন দিনারের বিনিময়ে সেখানকার কর ইজারাদারি দেয়া হয়।[১০২]

এরূপ ব্যবস্থায় রাজস্বের স্রোত অব্যাহত থাকলেও এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা দূরীভূত হয় নি। বরং তা ধীরে ধীরে প্রকট হয়। উজিরের ছিল ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী এবং তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী পদ্ধতিতে সরকার পরিচালনা করেন। কর ইজারাদারি দপ্তরটি কালওয়াধীনের যোগ্য পরিচালনায় থাকায় তা প্রায় এক দশক স্থিতিশীল থাকে। উজিরের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন ইবনুল হাওয়ায়ী। মূলত তার নিয়োগ ছিল দুর্নীতির ফলশ্রুতি। তিনি ছিলেন আটাকল মালিক এবং শস্য ব্যবসায়ী। তার সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতির ফলে খাদ্য-শস্যের মূল্য এত ঊর্ধ্বগামী হয় যে, বাগদাদে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়।[১০৩] বল প্রয়োগ করেই তা দমন করা হয়। সেই সাথে সংস্কারমূলক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। উজিরের ইজারাদারি চুক্তি বাতিল করা

হয়। সহকারী উজিরকে কর আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। কর ইজারাদারি একেবারে বন্ধ করা না গেলেও তা সীমিত করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের জন্য ইজারাদারি নিষিদ্ধ করা হয়। উজিরের পার্শ্বচক্র অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ায় ক্ষমতাবঞ্চিত হওয়ার তিন বছর পর তাকে পদচ্যুত করা হয়।[১০৪]

যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকলো কেন

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, জাররাহ ও ফুরাতদের সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি অনেক দিন টিকে থাকার পশ্চাতে একটি কারণ ছিল। এ সময় সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমে নয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পশ্চিমাঞ্চলে উদীয়মান ফাতেমী শক্তি এক নয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তারা মিশর আক্রমণ করে এবং আলেকজান্দ্রিয়া, গাজা ও ফাইউম দখল করে নেয়। এই প্রচণ্ড হুমকির মোকাবিলা করতে হয় জেনারেল মুনিসকে। রাজ্যের তাৎক্ষণিক ফাতেমী বিপদমুক্ত করতে তার প্রায় দুবছর সময় লাগে। তারসুস নৌশক্তির আঘাতে শত্রু বিতাড়িত হয়। এ জন্য মুনিসকে পুরস্কৃত করা হয়। মিশর ও সিরিয়ার উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয়।[১০৫] পূর্বাঞ্চলের অবস্থা ছিল অনেক জটিল। মধ্য এশিয়া হতে আজারবাইজান পর্যন্ত বিস্তৃত এ অঞ্চলের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে উত্তর বাণিজ্যপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়। ইতিমধ্যে উত্তর বাণিজ্যপথে পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠে। এতে সামানীদের মঙ্গল নিহিত থাকলেও তারা তখনো সে সম্পর্কে সচেতন হয় নি; খাওয়ারিজম এতে সমৃদ্ধশালী হয় এবং তাবারিস্তান মুষড়ে পড়ে। অথচ দু অংশই ছিল সামানীদের প্রভাব বলয়াধীন; একই সাথে তাবারিস্তানের ঘটনার প্রতিক্রিয়া পড়ে খোরাসানের নিশাপুরে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামানী সরকারের অভ্যন্তরে নীতিগত প্রশ্নে জেনারেল পারস ৯০৭ সালে স্বপক্ষ ত্যাগ করে বাগদাদে গমন করেন। অথচ তিন বছর পর সামানী সরকার বাগদাদে মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করে। একই সাথে রায় নগরের উপর প্রাধান্য বিস্তার নীতি অবলম্বন করে।[১০৬] ৯১৪ সালে হাসনী উত্রুসের নেতৃত্বে তাবারিস্তানে শিয়া বিদ্রোহ দেখা দেয়। উত্রুসী দাইলামীদের মধ্যে প্রায় ১৩ বছর বাস করেন। তার সাথে দাইলামীদের যোগাযোগের ফলে তারা জায়দী শিয়া ইসলামে দীক্ষা নিতে আরম্ভ করে। তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের প্রাধান্য কার্যালয় চালুসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাবারিস্তান-কাজবিন বাণিজ্য পথের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজারবাইজানে এক প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ উত্থিত হয়। কাজারদেশের সাথে ককেশীয় স্থলপথ সংযোজিত হয়। খাজার প্রদেশের সাথের তাবারিস্তানের জলপথ বিপন্ন হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে সামানী শাসক নিহত হলে সামানীবিরোধী প্রতিপক্ষের দাবি উপস্থাপনের সুযোগ আসে এবং বস্তুত সমরকন্দ ও নিশাপুরে বিদ্রোহ হয়। যা হোক সামানীরা দ্রুত বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক সামানী

শাসকের রিজেন্ট ছিলেন একজন দক্ষ ব্যক্তি এবং তিনি বাগদাদ ও বোখারার পারস্পরিক সহযোগিতায় গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বাগদাদ উজির হামিদ এবং জেনারেল নসর এরূপ একটি সমঝোতার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেও জেনারেল মুনিস এটাকে ভাল চোখে দেখেনে নি। হামিদ বাইজানটাইনের সঙ্গে একটি চুক্তিরও প্রবক্তা হয়ে উঠেন।[১০৭] বাইজানটাইন এরূপ সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ৯১৮ সালে বাগদাদে একটি বাণিজ্য মিশন প্রেরণ করে। বাগদাদ হতেও ৯২১ সালে বালগার দেশের রাজধানীতে একটি মিশন প্রেরণ করা হয়। এই মিশনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন এই মিশনের অন্যতম সদস্য ইবনে ফাজলান।[১০৮] জায়হানী, বালগার প্রধানের মিলিত প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়। এই মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য সফল না হলেও একটি সমঝোতা গড়ে ওঠে। সমঝোতার ফলে কাজার ও তাবারিস্তানের শিয়া বংশ পতনোমুখ হয়। দায়লামীরা সম্ভাব্য পরিণতি মেনে নিতে চায় নি। তারা রায়-বাগদাদ-ভায়া-কাজবীনে এবং ভায়া হামাদান বাণিজ্য পথের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। আজরা দায়লামী আগ্রাসন ঠেকাতে ঝাপিয়ে পড়ে। বাগদাদ ও বোখারা তাদের অঞ্চলের সংযোগ স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদের সকল প্রচেষ্টাই দায়লামীদের জন্য সুবিধাজনক হয়। দায়লামীরা বাগদাদ ও বোখারা সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় নিক্ষেপ করে। বাগদাদ সরকার প্রথমে সামরিক অভিযান প্রেরণ করলে তা ব্যর্থ হয়। তাদেরকে ইকতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও শান্ত করা যায় নি।[১০৯]

অশান্ত বাগদাদ : হাম্বলী শক্তির উদ্ভব

দায়লামী হাঙ্গামা স্তব্ধ করতে বাগদাদ সরকারের ব্যর্থতা তার দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে। এই সুযোগে বাগদাদ নগরে প্রতিক্রিয়াশীল হাম্বলীরা সামাজিক অস্থিরতা এত বৃদ্ধি করে যে, তাদের দাবি অনুসারে কারারুদ্ধ মনসুর হাল্লাজকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মিসকাওয়াহ্ তাদের উশৃঙ্খল আচরণের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, ৯২৩ সালে ঐতিহাসিক তাবারি ইহলোক ত্যাগ করলে তারা তাকে সমাধিস্থ করতে বাধা দেয় এবং লাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে। আমীর আলী বলেন : প্রতিক্রিয়াশীল হাম্বলীরা মুক্তাদিরের সময় বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করে। তাদের দুর্দমনীয় ধর্মোমত্ততায় বাগদাদে প্রায় দাঙ্গা বেধে যায়। তারা সরকারের দুর্বলতায় উৎসাহিত হয়ে জনসাধারণের বিধানকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা বাড়ির আন্দর মহলে হানা দিত। এসব আবাসস্থলে হামলা চালিয়ে তাদের গোড়া রুচির পরিপন্থী সমস্ত কিছু জোর করে কেড়ে নিত এবং ধ্বংস করে ফেলত।[১১০] সরকারের প্রতিক্রিয়াশীলদের পিঠ চাপড়ানো নীতি কোনো কাজে আসে নি। কেননা সরকারের মূল সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক। বারবার দায়লামীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ফলে একদিকে যেমন সামরিক ব্যয়

প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায় তেমনি সমগ্র উত্তরাঞ্চলের দায়লামী হাঙ্গামার ফলে রাজস্ব হ্রাস পায় লক্ষণীয়ভাবে। অন্যূনপায় হয়ে সরকারি উজির ব্যয় সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করলে সামরিক বাহিনী তার প্রতিবাদ করে।[১১১] হামিদের জাররাহ মন্ত্রীসভার পতন হয় এবং ফুরাত পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়।

৬.১৪ কারামিতি অভ্যুত্থান

৯২৩ সালকে আব্বাসী বংশের ধ্বংসের বছর বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১১২] আক্ষরিক অর্থে কথাটি অবশ্যই ঠিক নয়, কেননা এদের ধ্বংসের বীজ পূর্বে বপিত হয় এবং এর পরিসমাপ্তি আসে আরো পরে। বস্তুত আব্বাসীদের অবক্ষয় কালটি দীর্ঘ। যা হোক উক্ত বক্তব্য অবশ্যই অর্থহীন নয়। ইতিপূর্বে জানজ বিদ্রোহ যেমন এর অবক্ষয়ের গতি ত্বরান্বিত করে, দায়লামী সমস্যা আব্বাসী শক্তিকে পঙ্গু করে। ৯২৩ সালে জাররাহ মন্ত্রী সভার পতনের ঠিক চারদিন পর কারামতিদের বাণিজ্য পথ ও বসরা আক্রমণ ছিল আব্বাসীদের জন্য নতুন অশনিসঙ্কেত। এ পর্যায়ে তারা মাত্র ১৭০০ সদস্য নিয়ে বসরা দখল করে এবং ১৭ দিন ধরে চতুর্দিকে লুটতরাজ পরিচালনা করে।[১১৩] এর দশ মাস পর মক্কাধাম হতে বাগদাদে প্রত্যাবর্তনকারী তীর্থযাত্রীদের উপর চড়াও হয় এবং অনেক নামী-দামী তীর্থযাত্রীকে আটক করে। এ ঘটনার ঠিক ১৭ বছর পূর্বে সর্ব প্রথম তারা এ রকম বাণিজ্যপথে লুটতরাজ আরম্ভ করেছিল। এবং সিরাফে তাদের বাণিজ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এটা তাঁদের আকাঙ্ক্ষার বিচারে ছিল সমুদ্রের এক বিন্দু জলের মত। কারামতিদের প্রথমে সংগঠিত করেন হাসান বিন জান্নাবী। তিনি ৯১৩ সালে নিহত হলে তৎপুত্র আবু সাইদ জান্নাবী নেতৃত্ব দেন, কিন্তু তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিতে অক্ষম হলে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুলাইমান দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। বিগত ১৭ বছর শান্ত জীবন যাপন করে পুনরায় তারা বাণিজ্য পথ লুণ্ঠনের কার্যক্রম হাতে নেয়। সুলায়মানের নেতৃত্বে তারা উমান বন্দর হস্তগত করে এবং দ্রুততার সাথে পারস্য উপসাগরের আরব উপকূলে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। এবার তারা উপসাগরের পারস্য উপকূলে হানা দেয়ার প্রস্তুতি নেয় এবং বসরায় তারা সফল আক্রমণ চালায়। গোটা অঞ্চলের বাণিজ্যের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা বন্দরের দিকে সকল বাণিজ্য বহর প্রবাহিত করে। বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবে তারা তাদের বাণিজ্যিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা বাগদাদ-মক্কা বাণিজ্য স্থলপথে প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য হজের দিনে অকস্মাৎ মক্কার উপর আপতিত হয়ে তীর্থযাত্রীদের লুণ্ঠন করে কাবাগৃহের কৃষ্ণ প্রস্তর নিয়ে চলে যায়।[১১৪] এবার তারা সিরিয়া-ইরাক মালভূমির পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বাণিজ্যপথের উপর তাদের প্রভাব বলয় বিস্তারিত করার ঘোষণা দেয়।[১১৫] তাদের এত বড় সাফল্যের পশ্চাতে তাদের সৈন্যদল ছিল বললে ভুল হয়; কেননা তাদের বাহিনীতে ২৭০০ সদস্যের বেশি ছিল না। সম্ভবত এখানে তারা স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত

সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল বলেই এ রূপ সাফল্য অর্জিত হয়।[১১৬] তাদের পশ্চাতে জনসমর্থনের কারণ তৎকালীন শিয়া মতাদর্শ; কারামতি আন্দোলন স্থানীয় স্বার্থের সাথে একাকার হয়ে যায়। বস্তুত এরূপ পরিস্থিতিতে বাগদাদ সরকার স্বাভাবিকভাবে শঙ্কিত হয়। আরব রাজ্য উদ্ধারের জন্য যে বিপ্লবী আর্থ-সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন ছিল, তা ছিল তাদের সাধ্যের অতীত। তাই ৯২৩ সালের পর বাগদাদ সরকার নতুন এক রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত হয় এবং ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব নষ্ট হয়।

৬.১৫ পতনের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার : সামরিক বেসামরিক নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই

এরূপ পরিস্থিতিতে কি করা উচিত-এ প্রশ্নে সমরনেতারা ঐকমত্য পোষণ করতেন না। এ সময় সবচেয়ে প্রভাবশালী সমরনেতা ছিলেন জেনারেল মুনিস। তিনি ইচ্ছা করলে অতি সহজে স্ব-হস্তে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারতেন। সাধারণ সৈনিকদের বিশ্বাস ছিল যে, তারা মুনিসের অধীনে থাকলে তাদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত হতে পারে।[১১৭] তাঁর হিসেব ছিল অন্য রকম। ইতিপূর্বে বেসামরিক প্রশাসক আমলাদের সাথে তাঁর এক চুক্তি ছিল। যতদিন তার ও তার লোকজনের বেতন-ভাতা নিশ্চিত ও নিয়মিত থাকবে, ততদিন তাদের প্রতি তার সমর্থন থাকবে। তিনি সামরিক প্রশাসনিক ইকতার বিরুদ্ধে ছিলেন না। তবে সেখানে তার লোকদের বেতনের জন্য রাজস্ব বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে এটার প্রয়োগ পছন্দ করতেন না। অন্যান্য প্রাদেশের সামরিক নেতারা মনে করতেন যে, দায়লামী সৃষ্ট অবস্থায় সামরিক প্রশাসনিক ইকতা ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত আছে তাদের সমস্যার সমাধান। বাগদাদের সেনাধ্যক্ষ মনে করতেন বাগদাদে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই সমাধানের একমাত্র পথ।[১১৮] বাগদাদ বা প্রাদেশিক বেসামরিক কর্মকর্তারা এ প্রশ্নে দ্বিধা-বিভক্ত ছিলেন। জাররাহ সমর্থকরা মনে করত এরূপ পরিস্থিতিতে সামরিক বেসামরিক সহযোগিতার দরকার; এমন কি সামরিক শাসনেও তাদের আপত্তির কোনো কারণ ছিল না। ফুরাত ও তাদের অনুগামীরা মনে করতেন সামরিক বাহিনী সর্বদাই বেসামরিক কর্মকর্তাদের অধীনে থাকবে। তারা তখনো সামরিক প্রশাসনিক ইকতার বিরোধী ছিল এরূপ মতামতে দৃঢ় থাকায় – ফুরাত সরকারের পতন হয় ৯২৪ সালে। মুক্তাদিরের রাজত্বকালে পরবর্তী আট বছরে বাগদাদের রাজনীতিতে এক নতুন মোড় নেয় এবং রাজনৈতিক সংকট নতুন পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সামরিক এবং বেসামরিক স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার লড়াইতে মেতে উঠে। এ সময় মোক্তাদির বয়োপ্রাপ্ত হন। তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে অবস্থা আয়ত্তে আনার মত পরিস্থিতিও তৈরি হয় নি। তিনি যদিও বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মধ্যে নয়জন মন্ত্রীর উত্থান-পতনই ঘটে। এরা গড়ে ২·মাস করে ক্ষমতায় থাকে। অথচ সমস্যার কোনো সমাধান

হয় নি। এ সময় রাজস্ব হ্রাস পাওয়ায় জেনারেল মুনিসর প্রমাদ গনেন এবং মোক্তাদিরকে ৯২৯ সালে ক্ষমতাচ্যুত করে আল কাহিরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পুলিশ বাহিনীর সমর্থন পেয়ে বাগদাদের অভিজাত বাহিনী ক্যু সংগঠিত করে মোক্তাদিরকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুক্তাদির এবার পুনরায় বেসামরিক সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ৯৩১ সালে হুসায়েন বিন কাসিমকে সরকার পরিচালনার সকল ক্ষমতা দান করেন। এ সময়ে কিছুটা অনুকূল আবহাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে বেসামরিক সরকার গঠনের আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল। অনেক বেসামরিক প্রশাসক নিজ এলাকায় স্থানীয় লোক নিয়ে নিজস্ব বাহিনী গঠন করছিল। দায়লামীদেরকেও তাদের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দান করছিল এবং তারা স্ব স্ব এলাকায় মূলত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এসব সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণ কেন্দ্রে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ বয়ে আনে বলেই খলিফা ও তার মন্ত্রীর নিকট প্রতীয়মান হয়। স্থানীয় সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃতি দেয়।[১১৯] এ পর্যন্ত কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি; কিন্তু উজির সামরিক বাহিনীর দিকে মনোযোগ দেয়ায় অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করে। মুনসি ৯৩২ সালে পুনরায় ক্ষমতা দখল করে মুক্তাদিরকে হত্যা করে এবং আল-কাহিরকে ক্ষমতাসীন করে। আল কাহির নির্বোধের মত মুনিসকে হত্যা করে রাজ্যের একটি স্থিতিশীল উপাদানকে সরিয়ে দেয়। উচ্চ পর্যায়ে এরূপ ক্ষমতার লড়াই চলাকালে বাগদাদ নগর কট্টর-হাম্বলী ও কট্টর শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতে থাকায় নাগরিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে চক্রান্ত চলতে থাকে এবং অবশেষে ৯৩৪ সালে কাহিরকে ক্ষমতা হতে বিদায় নিতে হয়।

এ পর্যায়ে সামরিক নেতারা অনুধাবন করে যে, সম্ভবত তাদের এত ক্ষমতা নেই যে, তারা অন্যের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাই তারা রাজনীতিবিদদেরকে তাদের সমস্যা সমাধানে সুযোগ দিতে চায়। এরূপ একটি সমাধানের কথা ভেবেই সকলে মুক্তাদির পুত্র আর-রাজীকে খলিফা মনোনীত করে। রাজী-জাররাহ ও ফুরাত দলের একটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের আদেশ দেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বাগদাদে তৎকালীন বিদ্যমান অবস্থায় সামরিক বাহিনীর স্বার্থের সাথে জাতীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছিল এক রকম নিশ্চিত। দীর্ঘ এক বছর ধরে সরকারের সাথে সামরিক এবং কেন্দ্রের সাথে প্রদেশের স্বার্থের সমন্বয়ের চেষ্টা চালিয়ে তাকে বাধ্য হয়ে কিছু কঠিন পদক্ষেপ নিতে হয়। এর কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে মন্ত্রী ভাবতে শুরু করেন যে, তার অবস্থান যেন বেশ দৃঢ়। তাই সমস্যাগুলোর সমাধানে অগ্রসর হতে চান। এ কারণে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করে তার পুত্রকে দ্বিতীয় উজিরের পদে নিয়োগ করে। তিনি নিজেকে বেশি শক্তিশালী ভেবেছিলেন; কিন্তু সামরিক বাহিনী তাকে অপসারিত করে এবং জাররাহ মন্ত্রী সভা গঠিত হয়।[১২০] দুমাসের মধ্যে এ মন্ত্রীসভাকেও পদত্যাগ করতে

হয়। এভাবে মন্ত্রীদের রদবদলের পালা চলে। অতএব, বেসামরিক দেউলিয়াত্ব দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়। রাজী অন্যনোপায় হয়ে সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। এ ঘটনা ঘটে ৯৩৬ সালে।[১২১]

৬.১৬ আমিরুল উমরাহ পদ সৃষ্টি : রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের অবসান

৯৩৬ সাল হতে আরেকটি অরাজকতার দশকের সূচনা হয়। এ সময় আমিরুল উমরা নামক একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পদ সৃষ্টি করা হয়। আমিরুল উমরার উপর সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত করা হয়। রাজস্ব বিভাগসহ সকল বেসামরিক বিভাগের উপর ছিল তার একক কর্তৃত্ব। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো অস্তিত্ব থাকলে অসম্ভব এরূপ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কার্যকর হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো অস্বিত্বই ছিল না। বাগদাদের কোষাগার ছিল শূন্য। আব্বাসী সাম্রাজ্য এ সময় বাগদাদ নগরী ও তার উপকণ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; সামানীরা তখনো সমগ্র পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছিল বটে, কিন্তু তারা সামানী রাজ্যে দায়লামীদের অনুপ্রবেশ ঠেকাচ্ছিল। দায়লামীরা মধ্য ইরানে তাদের অবস্থান দৃঢ় করতে ব্যস্ত ছিল। তাদের একাংশ দক্ষিণ ইরাকে গমন করে সেখানে আব্বাসী সরকারের প্রাক্তন কর্মচারী বারীদদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। কারামতিরা একটু দুর্বল হলেও পূর্ব আরবে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপে তাদের উপস্থিতি অনুভূত হত। জাজিরা এবং সাগুরে হামাদানী শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মিশর ও সিরিয়ায় ইখশিদরা রাজত্ব করত।[১২২]

খলিফা তাঁর বিশেষ ক্ষমতা আমিরুল উমরাহকে অর্পণ করেন। দীর্ঘ দিনের রাজস্ব বিভাগকে সামরিক বিভাগ হতে পৃথক রাখার নীতিও পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের মৌলিক অবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় নি। কেননা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে এ সময় সাম্রাজ্যের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও যা ছিল খুবই লক্ষণীয় তা হলো বাগদাদ নগরের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল নিরর্থক দম্ভ ও আভিজাত্য; আর ক্ষমতার মোহ। বাগদাদ নগরের গণ্ডির মধ্যে এ সময় আমিরুল উমরাহ পদটি হয়ে উঠে সোনার হরিণ। ঐ হরিণ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে পাঁচটি উপদলের মধ্যে: ইবনে রাইক, রাজকাম, বারিদী ও হামদানীরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। ফলে ৯৩৬-৪৫ সাল পর্যন্ত বাগদাদ নগর অরাজকতার এক নতুন নজির সৃষ্টি করে। তারা তাদের ক্ষমতার লড়াইয়ে পালাক্রমে জয়-পরাজয় বরণ করে। তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এমন এক ন্যাক্কারজনক অবস্থায় উপনীত হয় যে, তারা সবাই ক্ষণিকের জন্য ভাবতে শুরু করে যে, আমিরুল উমরাহ পদটি আব্বাসী পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট করাই উচিত। কারামতি অথবা উদীয়মান দায়লামী শক্তি এ পর্যায়ে এরূপ ক্ষতার লড়াইতে অংশ না নিয়ে বরং তারা যুদ্ধবাজদের সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করে। ইরানের উদীয়মান বুওয়াইহী-দায়লামী শক্তির লক্ষ্যবস্তু অবশ্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

কেন্দ্র বাগদাদ ছিল: কিন্তু বাগদাদে চলমান ক্লান্তিকর যুদ্ধে যুদ্ধবাজদের অবক্ষয় শেষ সীমায় না পৌছান পর্যন্ত তারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। ৯৪০ সালে খলিফা রাজী প্রয়াত হলে মুত্তাকী তার স্থলাভিসিক্ত হন এবং অচিরেই তিনি ঐ ক্ষমতার লড়াইয়ের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হন। ৯৪৪ সালে তাঁকে অন্ধ করে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তাঁর ভ্রাতা মুস্তাকফী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আমিরুল মোমেনিন পদটি বেসামরিক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়। অর্থাৎ দীর্ঘ দশ বছরের অস্থির অবস্থার প্রেক্ষিতে সমরনেতারা পুনরায় পশ্চাৎপসারণ করে। বাগদাদে দেখা দেয় বিরাট ক্ষমতাশূন্যতা। বাগদাদের এই ক্ষমতাশূন্যতা বুওয়াইহীদের বাগদাদ দখলে প্রলুব্ধ করে। যে কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

তথ্যপুঞ্জি

১. Hitti, P K . History of the Arabs (

২. Shaban M.A Islamic History 2

৩. Yaqubi, Ahmad b. Abi Yaqub, Tarekh VII (Bernt 1970), p 483

৪. Shaban. op cit. p. 71

৫. Ibid , p. 71

৬. Miah, M Shsmsuddin; The Reign of al-Mutawakel (Dacca, 1963) p. 19

৭. Ibid , pp. 22-32; 35

৮. Shaban. op. cit p. 72

৯. Al-Tabari, Muhammad b. Jarir, Tarikh al Rusul wa Muluk ed M. J. de Goeje, vol. III, Thaiden (1901), pp. 137-9.

১০ক. Shamsuddin, op. cit., p. 35

১০. Shaban. op cit. p. 72

১১. Tabari, op. cit., pp. 1412-13 also Miah op. cit., 77-88

১২. আমীর আলী, সৈয়দ,

১৩ Miah. op. cit. pp. 88-95

১৪. Imamuddin S.M., A political History of the Munem. Vol. II (Dacca, N. D.) p.17

১৫. Tabari. op. cit., Vol. III, 1403-6

১৬. Yaqubi, op. cit. p. 1419

১৭. Shaban, op. cit. p.74

১৮. Ibid. p. 74

১৯. Tabari, op. cit., pp 1398-900

২০. Shaban, op. cit p.75

২১. Ibid. p. 75

২২. Tabari, op. cit., 1441-7

২৩. Ibid. pp. 1435-6

২৪. Ibid. p. 1436
২৫. Shaban, op. cit. p.77
২৬. Miah Shamsuddin, op.cit. pp.55-60
২৭. Ibid. p 50-51
২৮. Ibid p. 51-59
২৯. Ibid. pp. 61-62
৩০. Ibid. pp. 63-68
৩১. Shaban. op. cit. p.79-80
৩২. Miah op. cit. p.10
৩৩. Miah. op. cit pp.40-41
৩৪. Shaban. op. cit. p. 80
৩৫. Tabari op cit p.79-80
৩৬. Ibid p. 1509
৩৭. Ibid p 1508
৩৮. Yaqubi. op. cit. p. 496
৩৯. Al- Tabari, Vol. III, op cit. p. 1512
৪০. Shaban op cit p 82
৪১. Tabari. op cit. p.1539
৪২. Ibid, III, p. 1544
৪৩. Shaban op. cit. p 83
৪৪. Tabari. op. cit. pp 1687-96
৪৫. Shaban. op. cit. pp. 84-85
৪৬. Ibid p. 85
৪৭. Tabari. op. cit. p.1647-96
৪৮. Ibid. pp. 1796-9
৪৯. Ibid. pp. 1839
৫০. Ibid. p. 2064
৫১. Shaban. op. cit. pp. 95
৫২. Ibid. p. 95
৫৩. Ibid. p. 95
৫৪. আমীর আলী সৈয়দ, প্রাগুক্ত, ২৮৬
৫৫. Ibnul Athir, Izzudin, Al Kamil fit Tarekh Vol. VIII, p. 5 ed. C.J. Toruberg (Leiden, 1866).
৫৬. Shaban. op. cit. p. 96
৫৭. Ibid. p. 97
৫৮. Al-Istakhri, Abul Isher Kitabul Masalik wal Mamalik, ed. M. J. ed Goeje, (Leiden 187), p. 246
৫৯. Ibnul Athir, op. cit. pp. 246-7

৬০ Shaban op cit pp 99-100
৬১ Noldeke A servile war in the East in Sket ches from Eastern History tr by J S Black (Edenburgh 1892) pp 146 75
৬২ আমীর আলী সৈযদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৭-৮৮
৬৩ Shaban op cit pp 100 01
৬৪ Tabari op cit Vol III pp 1751
৬৫ Shaban op cit pp 100 02
৬৬ Ibid pp 103 04
৬৭ Ibid p 117
৬৮ Ibid p 115
৬৯ Ibid p 116
৭০ Ibid pp 116 17
৭১ Ibid pp 107 118
৭২ Tabari op cit p 2141
৭৩ Ibid pp 2151
৭৪ Shaban op cit pp 120 21
৭৫ Ibid p 121
৭৬ Muhammad b Abdul Malik al Hamdeni Takmilat Tarith at Tabari, ed A Y Kanan (Beirt 1961) p 20
৭৭ Tabari op cit pp 1222 2185
৭৮ Ibid pp 2141 5
৭৯ Shaban op cit pp 120 29
৮০ Ibid p 129
৮১ আমীব আলী সৈযদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯২
৮২ Shaban op cit pp 125 26
৮৩ Miskawayh Vol I p 4
৮৪ Ibid pp 5 8
৮৫ Shaban op cit pp 138 40
৮৬ Ibid p 140
৮৭ Ibid pp 140 41
৮৮ Al Sabi Hilal, Kitabul Wazara ed M F Amedroze
৮৯ Miskawayh, op cit p 20 25 (Leiden 1904) p 72
৯০ Ibid pp 23-5
৯১ Sabi op cit pp 30-263
৯২ Shaban op cit p 143
৯৩ Ibid p 143
৯৪ Sabi op cit p 935
৯৫ Shaban op cit p 144

৯৬. Miskawayh, op cit Vol I p 245
৯৭. Shaban op cit p 144
৯৮. Miskawayh op cit pp 91-2
৯৯. Shaban op cit p 145
১০০. Miskawayh, op cit pp 42
১০১ Shaban op cit p 146
১০২ Miskawayh, op cit pp 58 70-71
১০৩. Shaban op cit p 146
১০৪ Miskawayh, op cit pp 56-100
১০৫. Ibid pp 56-100
১০৬. Ibid pp 39-45
১০৭. Shaban op cit pp 148-49
১০৮ Ibid pp 151-52
১০৯. Ibid p 152
১১০ আমীর আলী সৈযদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৩
১১১. Miskawayh Vol I, pp 85-8
১১২ Shaban op cit p 152
১১৩. Miskawayh Vol I, pp 104-5
১১৪. আমীব আলী সৈযদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
১১৫ Miskawayh op cit pp 145-46
১১৬ Al Sabi, Thabit, Jarekh Akhbar Qaramita ed Z Bakkar (Damascus 1970) p 49, Shaban, p 145
১১৭. Miskawayh op cit pp 115
১১৮. Shaban op cit pp 154-55
১১৯. Miskawayh op cit pp 147-59
১২০. Ibid p 366
১২১. Ibid p 351-2
১২২. Ibid pp 366-7

সপ্তম অধ্যায়

আব্বাসী যুগে শিয়া সম্প্রদায়ের ভূমিকা

৭.১ শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ : মতাদর্শ

আব্বাসী যুগে ভিন্নমতাবলম্বী শিয়া সম্প্রদায় ইসলামি বিশ্বে আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথমত ও প্রধানত বিরোধী ভূমিকা পালন করে। মোয়াবিয়া তথা উমাইয়া বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শিয়া সম্প্রদায়ের উন্মেষ ঘটলেও তাদের আন্দোলনটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে আব্বাসী যুগে। তাদের মতাদর্শ রণনীতি ও রণকৌশল সাধারণ মুসলিম চিন্তাধারা হতে এতই ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয় যে, ইসলামি সমাজের অভ্যন্তরে তারা একটি স্বতন্ত্রধারা সৃষ্টি করে। ইসলামি বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয় শিয়া সম্প্রদায়। উমাইয়া বিরোধী ব্যাপক হাশেমী আন্দোলনটি কিরূপে আব্বাসী বিপ্লবে পরিণত হয়—সে সম্পর্কে অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষণে আব্বাসী বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার আলোকে শিয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বিকাশক্রম এবং বিভিন্ন কারণে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক পর্যালোচনার অবতারণা করা হবে।

আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, হাসান যে ভাবেই হোক উমাইয়াদের পক্ষে তাঁর উত্তরাধিকার অধিকারটি ত্যাগ করেন বটে; কিন্তু আলী-ফাতেমার অন্য পুত্র হুসাইন আপন উত্তরাধিকার রক্ষায় আপোসহীন সংগ্রামে আত্মাহুতি দেন। তাঁর বিরোচিত মৃত্যুবরণের পর ৭৪০ সালে কুফায় জায়েদের বিদ্রোহ অবদমিত না হওয়া পর্যন্ত আলী সমর্থক শিয়ারা উত্তরাধিকারের সংগ্রাম অব্যাহত রাখে এবং তারা তৎকালীন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। নবীবংশের বিভিন্ন সদস্যরা উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং নানা উপদলে বিভক্ত হলেও হুসাইনী উত্তরাধিকার প্রশ্নটি কোনো প্রকার প্রভাবিত হয় নি।[১]

উমাইয়াদের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীরা ক্ষমতা দখল করলে হাসানের বংশধরেরা তাদের উত্তরাধিকার প্রশ্নটি পুনরুজ্জিবীত করেন। আল মনসুরের সময় হাসান প্রোপৌত্র মোহম্মদ আন্নাফসুজ্জাকিয়া এবং তার ভ্রাতা ইব্রাহিমের বিদ্রোহে তারই প্রতিফলন ঘটে।[২] উল্লেখ্য মদিনায় হাশেমী আন্দোলনের এক গোপন বৈঠকে নফসুজ্জাকিয়া উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু হুসাইনের প্রোপৌত্র জাফর সাদিক উপস্থিত ছিলেন না। নফসুজ্জাকিয়ার বিদ্রোহ সহজে অবদমিত হলেও তাঁর বংশধরেরা ৭৮৯ সালে মরক্কোয় ইদ্রিসী বংশ প্রতিষ্ঠা করে; ইয়ামেন ও তাবারিস্তানে প্রভাব বলয় সৃষ্টি করে। শেষোক্ত অঞ্চলে তারা আপনাদেরকে আলাভী বলে দাবি করতেন এবং এভাবে তারা তাদের পুরনো পরিত্যক্ত উত্তরাধিকারের দাবি জোরদার করে। পক্ষান্তরে হুসায়েনের

বংশধরেরা শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে শান্ত জীবন যাপন করতে থাকেন। মামুনের মার্ভ জীবনের বিশৃঙ্খল সময় মুসা আল কাজিম পুত্র আলী রিজার সাথে মামুনের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত মামুন একবার তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করার কথাও ভাবেন। তিনি প্রয়াত হওয়ায় সম্ভাব্য রাজনৈতিক জটিলতার স্বাভাবিক নিষ্পত্তি হয়। যাহোক দীর্ঘদিন ধরে তাদের রাজনৈতিক তৎপরতার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে তাদের ইমামত সিলসিলাটি অব্যাহত থাকে। তাদের ইমামতের তালিকাটি নিম্নরূপ :

১. হযরত আলী (মৃ : ৬৬১ খ্রি.), ২. আল হাসান (মৃ: ৬৬৯ খ্রি.), ৩. আল হুসাইন (মৃ: ৬৮০ খ্রি.), ৪. আলী জয়নুল আবেদিন (মৃ: ৭১২ খ্রি.), জায়েদ, ৫. মোহাম্মদ আল বাকের (মৃ: ৭৩১ খ্রি.), ৬. জাফর সাদিক (মৃ: ৭৬৫ খ্রি), ইসমাইল (মৃ: ৭৬০ খ্রি.) ৭. মুসা আল কাজিম (৭৯৯ খ্রি), ৮. আলী আররিজা (মৃ: ৮১৮ খ্রি.), ৯. মোহম্মদ জাওয়াদ (মৃ: ৮৩৫ খ্রি.), ১০. আলী আল হাদী (মৃ: ৮৬২ খ্রি, ১১. আল হাসান আল আসকারী (মৃ: ৮৭৪ খ্রি.) ১২. মোহম্মদ আল মুন্তাজির (মৃ: ৮৭৮ খ্রি.)।

৬৬০ সালে আলী-মোয়াবিয়ার মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান এবং ৮৭৮ সালে মোহাম্মদ আল মুন্তাজিরের অন্তর্ধ্যানের এই দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহে শিয়া মতাদর্শ একটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে।

খলিফা আল ওয়াসিকের মৃত্যুর পর মোতাওয়াক্কিল তাঁর মহান পূর্বসূরিদের উদারনৈতিক পথ পরিহার করেন; দক্ষিণপন্থীদের প্রতি প্রচণ্ড সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। মুক্তবুদ্ধির ও সকল সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর নির্যাতন চালান হয়। তাই শিয়া সম্প্রদায় ও সরকারি নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। নাজাফে আলীর কবর এবং কারবালায় হুসায়েনের কবর গুড়িয়ে দেয়া হয়।[৩] বস্তুত সময়টি ছিল আব্বাসী খেলাফতে রাজনৈতিক সংকট ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির সূচনালগ্ন। এ সময় গ্রাম ও শহরের বৈষম্য, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় স্বার্থ-চেতনা ও গণঅসন্তুষ্টি বেড়ে যায়।[৪] এরূপ আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে শিয়া ইমামদের উপর অত্যাচার চলে।[৫] আমীর আলী বলেন যে, হাসান আসকারীকে বন্দি করা হলে তাঁর পাঁচ বছরের শিশুপুত্র মোহাম্মদ তার পিতার অন্বেষণে ৮৮৭ সালে সামাররা মসজিদের এক গুহায় প্রবেশ করেন, কিন্তু শিশুটি তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নি। হাসান আসকারীর শিষ্যরা মনে করতেন যে, মৃত্যু ঐ শিশুকে স্পর্শ করে নি বরং তিনি সাময়িকভাবে অন্তর্ধ্যান করেন; তিনি পুনরায় পৃথিবীতে সকলের মুক্তির জন্য প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি হচ্ছেন অপেক্ষিত বা মুন্তাজার।[৬]

উপরিউক্ত তালিকায় বার ইমামের প্রতি অনুগত শিয়াদেরকে বার ইমামপন্থী শিয়া বলা হয়। আব্বাসী সাম্রাজ্যের ঐ আর্থ-সামাজিক সংকটকালে শিয়াদের দ্বাদশ ইমামের

অন্তর্ধ্যানের পর শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্য হতে সপ্তম ইমামপন্থী শাখার অভ্যুদয় ঘটে। তাদেরকে ইসমাইলি বলা হয়। শিয়া সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিক পর্যন্ত তাদের মধ্যে বড় ধরনের কোনো মতপার্থক্য ছিল না। জাফর সাদিক তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন; কিন্তু ইসমাইল মদাসক্ত হলে তার মনোনয়ন বাতিল করে জাফর সাদিক এর কনিষ্ঠপুত্র মুসা আল কাজিমকে মনোনীত করেন। যারা শেষোক্ত মনোনয় গ্রহণ করেন তারাই বার ইমামপন্থী; যারা ইসমাইলকে ইমাম বলে গ্রহণ করেছিলেন তারাই সপ্তম ইমামপন্থী বা ইসমাইলি নামে পরিচিতি লাভ করে। ইসমাইলিগণ তাদের ইমামকে গুপ্ত মাহদী ইমাম বলে গ্রহণ করেন।

আহলুস সুন্নাহ হতে শিয়াদের মৌলিক পার্থক্য সূচিত হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে বা ইমামত প্রশ্নে। শিয়াদের মধ্যে নানা দল উপদল থাকলেও সবাই ইমামত প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করে। মহানবীর পরলোকগমন প্রাক্কালে কাউকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন নি। তবে সে সময় মহানবীর সাথীরা আবু বকরকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে আনুগত্য প্রকাশ করেন; কিন্তু নবী কন্যা ফাতেমা তা চ্যালেঞ্জ করেন। ঐ ঘটনার ছয় মাস পর ফাতেমা প্রয়াত হলে আলী আবু বকরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, তাইনা, বরং পরবর্তী উমর এবং উসমানের প্রতিও আনুগত্য প্রকাশ করেন। তৎকালীন একটি আইনগত প্রশ্নে মোয়াবিয়ার সাথে আলীর দ্বন্দ্ব হয়। এটা ছিল তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ঘটনা প্রবাহের রাজনৈতিক ফলশ্রুতি। এ কারণে সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায় খেলাফত ইমামতকে একটি নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে। জনতা যার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করবেন তিনিই হবেন তাদের খলিফা বা ইমাম বা আমীর। তাই এটা সাধারণ অর্থে উত্তরাধিকারের বিষয় নয়। শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ইমাম জনতা দ্বারা নির্বাচিত হতে পারেন না; মানব সন্তান ভ্রমশীল; সে জন্য ইমাম অবশ্যই স্বর্গীয়ভাবে নিযুক্ত হবেন। তিনিই হচ্ছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র আইন সঙ্গত প্রধান; তিনি অভ্রান্ত, অকাট্য, ত্রুটি বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে। হিট্টি বলেন : The Institution of Imamate was a product of theocratic opposition to the profane conception of might. According to its theory as opposed to the Sunnite view the Imam is the sole legitimte head of the mostem community, devinely designated for the supreme office.[৭] তাই আল্লার রসুল ও তার বংশধরদের মধ্যে ইমামত সীমাবদ্ধ। মহানবীর অলৌকিক ক্ষমতা আলী-ফাতেমার মাধ্যমে তাদের উত্তর পুরুষে উৎক্ষেপিত বা স্থানান্তরিত হয়। তাদের মধ্য দিয়ে প্রত্যাদেশের স্রোত প্রবাহমান থাকে। চরমপন্থী শিয়ারা আরো বলে যে, আল্লার প্রত্যাদেশ বাণী জিব্রাইল ভুলক্রমে আলীর পরিবর্তে মোহাম্মদের নিকট প্রেরণ করেন।[৮] শিয়াদের উদারপন্থী উপদল জায়দীরা মনে করেন যে, ফাতেমার যেকোনো বংশধর ইমাম হতে পারেন; বিশেষ পরিস্থিতিতে কারো ইমামতের দাবি উপেক্ষা করে অন্য কাউকে মনোনীত করা যায়।[৯]

শিয়া সম্প্রদায় ইমামতত্ত্বের সাথে মাহদীতত্ত্ব ও নিজেদের মত করে সৃষ্টি করেন। উমাইয়া বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে বারবার তাদের পরাজয়ের পর মুখতার তার বিদ্রোহকে জোরদার করার জন্য মাহদী যে কোনো মুহূর্তে আবির্ভূত হচ্ছেন বলে প্রচার করেন। তারা বলেন যে, দেশ বা মানুষের সকল দুর্দশা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্য ইমাম মাহদী দুনিয়ায় আবির্ভূত হবেন এবং ন্যায় শান্তি ও স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন—সে জন্য সবাইকে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাদের কেউ কেউ প্রথমে প্রচার করেন যে, আলী পুত্র মোহম্মদ ইবনুল হানাফিয়াকে আল্লাহ মানব চোখের অন্তরালে গোপন রেখেছেন; তিনি যথাসময় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে ন্যায় ও সত্য শাসন কয়েম করবেন। যা হোক গুপ্ত ইমামের স্পষ্ট ধারণা রূপ লাভ করে দ্বাদশ ইমাম মুন্তাজার হতে। বস্তুত মাহদী তত্ত্বটি শিয়া মতাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়। সুন্নিরা মাহদী তত্ত্বকে এত গুরুত্ব দিয়ে এভাবে দেখে না।[১০]

শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করলে আরো দুটি উপতত্ত্বে উপনীত হতে হয়। প্রথমত তাদের অনেকে মানবাত্মার দেহান্তরণ (Transmigration of Soul) এ বিশ্বাস করেন। তাদের ধারণা যে ইমামের আত্মা তার উত্তরাধিকারীর দেহে স্থানান্তরিত হয়। তাদের অনেকে আত্মাবাদেও বিশ্বাসী। তারা অন্তস্তমবাদের ধারক ও বাহক। তারা মনে করেন কোরআনের বাণীসমূহের দুপ্রকার অর্থ হতে পারে: একটি বাহ্যিক (জাহিরী); দ্বিতীয়টি অন্তস্তম বা বাতেনী। এই সিদ্ধান্তানুসারে কোরআনের প্রতিটি বাণীর অর্থকে শব্দ হতে পৃথক করা সম্ভব এবং কোরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিহিত থাকে প্রতিকী (Allegornical) অর্থে; এবং কেবল এই পথেই সত্য নির্ধারণ করা যায়।[১১] দ্বিতীয়ত যেহেতু শিয়া সম্প্রদায় ছিল সর্বদাই প্রতিবাদী এবং বৈরী পরিবেশে তাদের মতাদর্শ প্রচারের জন্য তাকিয়া নামক এক নৈতিক মতবাদের প্রবর্তন করে। এ মতবাদ অনুসারে অবস্থার চাপে শিয়াদের প্রকৃত মতাদর্শ গোপন রাখার অনুমতি ছিল। তাদের এমনভাবে কথা বলা অথবা কাজ করা দরকার যেন শত্রুপক্ষ তাদেরকে সনাক্ত করতে না পারে। যে পরিস্থিতিতে তাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে সে রূপ অবস্থায় তারা তাদের নিজস্ব মত গোপন রেখে বিরোধী মতের প্রতি বাহ্য আস্থা প্রকাশ করার অনুমতি থাকে।[১২]

উল্লিখিত শিয়া মতাদর্শের উপর বহিরাগত প্রভাব ছিল কি? সামাজিক ইতিহাসের এরূপ প্রশ্নের প্রতি কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সর্বদা মানব চিন্তনের একটি বৈষয়িক ভিত্তি থাকে এবং তা সর্বদা সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থার মধ্যে খুঁজতে হয়। মানুষের চিন্তা-চেতনার মূল ভিত্তি তার বাস্তব পরিবেশে থাকলেও তা অবশ্য বাহিরের প্রভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে। বস্তুত শিয়া মতাদর্শ যদি ইরানী, ইহুদী, খ্রিষ্টান ও গ্রীক মতাদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে

থাকে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে তাদের প্রভাব কতটুকু বা কিভাবে এসেছিল সে সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত তথ্য দিয়ে বলা যায় না। হিট্টি বলেন- How much shia in its birth and evolution owned to persian nations and how much to Indo-Christian ideas is hard to acertain.[১৩]

অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা শিয়া মতাদর্শ নির্মাণে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার বেশ বড় অবদান ছিল। তিনি সম্ভবত ইয়ামেনের ইহুদি সন্তান এবং উসমানের খেলাফতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আলীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করতেন যা স্বয়ং আলী অপছন্দ করতেন।[১৪] শিয়া সম্প্রদায় ইমাম মাহদী তত্ত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। এ রূপ মসিয়া ধারণার বহুল প্রচার বাইবেলে ছিল; ধীরে ধীরে গ্রীক দর্শন বিশেষভাবে নব্যপ্লেটোবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব খোদাতত্ত্ব এবং পিথাগোরাসের সংখ্যাতত্ত্বের প্রভাব ইসমাইলীদের উপর ছিল খুবই লক্ষণীয়।[১৫]

প্রাথমিক পর্যায়ে ইরাক ও পারস্য তাদের মতাদর্শের বিকাশে উর্বর ভূমি বলে বিবেচিত হয়। এখানে প্রচলিত পুরনো মননশীল ঐতিহ্যের প্রভাবও ছিল স্বাভাবিক। নব্য পারস্য বার ইমামপন্থী শিয়াদের এখনো মাতৃভূমি। তাদের মতাদর্শের পুনর্গঠন, তাদের রণনীতি ও রণকৌশল নির্মাণ করেন পারস্যের আহওয়াজ নিবাসী জনৈক গুহ্যবাদী ময়মুনপুত্র আব্দুল্লাহ। জেরুজালেমে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন চক্ষু চিকিৎসক। বিদগ্ধপণ্ডিত আব্দুল্লাহ এমন এক চমৎকার শিয়া প্রচার অভিযানের আয়োজন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল আব্বাসী শাসকদের উৎখাত এবং আলী বংশের ক্ষমতায়ন। সৈয়দ আমীর আলী মনে করেন যে, তিনি প্রাচীন পারস্যের দার্শনিক মনির মতবাদের সাথে তাদের চিন্তনের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি গুহ্যবাদী মতাদর্শ গড়ে তোলেন। তাঁর মতে প্রকৃত ধর্মীয় বাহ্য আইনের চেয়ে ধর্ম পুস্তকের নিগূঢ়ার্থই কাম্য; কর্মে নয়, বরং বিশ্বাসেই মুক্তি নিহিত। ইমামের প্রতি অবিচল অন্ধ আনুগত্যই মুক্তির একমাত্র পথ। দীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অনুসারে নতুন দীক্ষিতদের শ্রেণীবিন্যাস করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপযোগী মতাদর্শগত সবক তৈরি করেন। নিম্নস্তরের দীক্ষিতরা কেবল তাদের গুরুকে জানবে আর কাউকে নয়। দীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত দায়ীদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল ধর্মীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করা এবং সেই সাথে তাদের মনে এ প্রত্যয় জন্মায় যে, সকল সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি ইমাম। জগৎ কখনো ইমাম ব্যতীত চলতে পারে না। ইমাম কখনো নতুন প্রত্যাদেশও লাভ করেন না। তিনি কোরআনের আলোকে জনগণকে পরিচালিত করেন। ইসমাইল ছিলেন সর্বশেষ ইমাম। হিট্টি এ ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন : Quietly and cautiously the noviec was initiated under oth of secrecy in the esoteric doctrine including such reconditte ones as the formation of the Universe by emanating from divine essense transmigrotion of souls, the immananse of the Divinity in Ismail and the expectation of his carly return as Mahdi.[১৬]

ইসমাইলী

ইতিপূর্বে আব্বাসী সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। এ বাস্তব অবস্থা অনুধাবন না করলে নবম শতাব্দীর শেষে ইসমাইলীদের উত্থান, বিকাশ এবং তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। যা হোক তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শিয়া সম্প্রদায়ের বিভক্তি, বার ইমামপন্থীদের পশ্চাদপসারণ, ইসমাইলীদের পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শের বিকাশ প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষণে ইসমাইলী শিয়াদের বিকাশধারার উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হবে। ইসমাইলীরা প্রধান তিনটি খাতে প্রবাহি হয় : ক. তাদের প্রধান মূল ধারায় ছিল ফাতেমীরা যারা মিশরে স্বাধীন শিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। খ. দ্বিতীয় ধারায় প্রবহমান ছিল কারামিতা বিপ্লব ও গ. তৃতীয় ধারায় ছিল পারস্যের এ্যাসাসিন গ্রুপ।

ফাতেমী ইসমাইলের কট্টর অনুগামীরা তদপুত্র মোহম্মদ আলী মকতুমকে ইমাম বলে গ্রহণ করে এবং তারাই ইসমাইলী শিয়া বলে পরিচিত। মকতুম প্রয়াত হলে তদপুত্র মোহম্মদ আল হাবীব ইমামতের আসনে সমাসীন হন। তিনি হিমসের নিকট নিভৃত এক পল্লি, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের পাশে অবস্থিত সালামিয়ায় আবাসন গ্রহণ করেন। সালামিয়ায় মৃত্যু শয্যায় মোহম্মদ আল হাবীব আপন পুত্র উবায়দুল্লাকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তাঁকে আল মাহদী বলে ঘোষণা করেন। উবায়দুল্লাহ ইমামতে সমাসীন হয়ে প্রচার অভিযান অধিক জোরদার করেন। ইসমাইলী মতাদর্শ প্রচারের জন্য গঠিত গোপন সংগঠন নতুনভাবে নয়া কেন্দ্র হতে আব্বাসী সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচার অভিযান পরিচালনা করে। এ মতাদর্শটি দ্রুত ইয়েমেন, বাহরায়েন, সুদূর ভারতীয় সিন্ধু প্রদেশ, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে। দায়ী প্রচারকদের তাকিয়া বা প্রতারণামূলক নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। ইসমাইলী মতাদর্শের দ্রুত প্রসারের মূলে ছিলেন আব্দুল্লা ইবনে ময়মুনের জনৈক শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল হুসায়েন। তিনি ছিলেন ইয়ামেনের সানার অধিবাসী, অক্লান্ত উদ্যোগী প্রচারক (দায়ী)। তিনি এক সময় বসরার মোহতাসেব ছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি আবু আব্দুল্লাহ আশশিয়ী হিসেবে পরিচিত হন।

হজের মৌসুমে আগত আলজেরিয়ায় কোতাম গোত্রের লোকদেরকে তিনি সাফল্যের সাথে ইসমাইলী মতাদর্শে দীক্ষা দিতে সক্ষম হন এবং ৮৯৩ সালে তিউনিসিয়ায় গমন করেন। এ সময় তিনি মিশরের কথা ভাবেন নি বাস্তব কারণে। তখন ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়া ব্যতীত সর্বত্র কিবতী অমুসলিমরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদেরকে ইসলামে দীক্ষা দেয়ার চাইতে বরং মুসলিম সমাজে ইসমাইলী মতবাদ প্রচার সহজসাধ্য ছিল। উত্তর আফ্রিকা নানা দিক হতে তার কাজের উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়। এখানে মুসলিমরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ এভাবে ভিন্ন

মতাবলম্বীদের জন্য কোনো সমস্যা ছিল না। এখানে শিয়া ইদ্রিসী বংশ এবং খারেজী রুস্তামীরা একশ বছর ধরে রাজত্ব করে এবং তা সে সময় এখানে কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল না। কিন্তু আগলাবী শাসন আমলে তিউনিসে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। প্রথমত সেখানে সেনাবাহিনীতে আরব, খোরাসানী ও বারবার জাতিসত্তা থাকায় তাদের মধ্যে চলত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ; দ্বিতীয়ত আগলাবীদের পুরোপুরি কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল, অথচ তার পূর্ব ও পশ্চিমে পড়শি দেশ সাহরার পথে প্রাচীন বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যস্ত ছিল। একারণে আগলাবীরা বিচ্ছিন্নতায় ভুগছিল এবং এর সমাধানের জন্য সিসিলি জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করে। তাদের ব্যয়বহুল সিসিলি অভিযান চালাতে নগদ মুদ্রায় ভূমিকর প্রথার প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থা জনতা মেনে নেয় নি। এভাবে তার সংকট লেগেই থাকে। অবু আব্দুল্লা আশশিয়ী তিউনিসিয়ায় এ বাস্তব অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।[১৭] তিউনিসিয়ার জনতা তাদের মুক্তির জন্য তাদের মাহদীর শুভগমনের শুভ মুহূর্তে অপেক্ষায় থাকে। এরূপ মহেন্দ্রক্ষণে মহম্মদ আল হাবীব তার সালামিয়া ঘাটি ত্যাগ করে উত্তর আফ্রিকার দিকে যাত্রা করেন। সিজিলমাসে পৌছালে আগলাবী শাসনকর্তা তাকে গ্রেফতার করে। আবু আব্দুল্লা আশশিয়ী আগলাবী শাসক জেয়াদাতুল্লাকে পরাজিত করে সিজিলমাস বন্দি শিবির হতে মুক্ত করে বিজিত আগলাবী রাজধানী রাক্কায় এনে তাকে আমিরুল মোমেনিন ও ইমাম পদে অভিসিক্ত করেন। অপেক্ষমান জনতার সামনে তিনি মাহদী হিসেবে আবির্ভূত হন। ইফ্রিকিয়ার সর্বত্র তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনার প্রায় ষাট বছর পর ৯৬৯ সালে মিশরে শিয়া ইসমাইলী ফাতেমী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যযুগে ইসলামের ইতিহাসে শিয়া সম্প্রদায়ের এটাই ছিল প্রথম ও প্রধান রাজনৈতিক সাফল্য এবং প্রাচ্য ইসলাম উম্মায় আব্বাসী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বড় চ্যালেঞ্জ। যা হোক এভাবে ইসলামি বিশ্বের এককেন্দ্রিকতার বদলে ত্রিকেন্দ্রিকতা বাস্তব রূপ লাভ করে।

কারামাতা বিপ্লব

আব্বাসী খেলাফতের চরম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটকালে কারামাতা বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এরাও ইসমাইলি শিয়াদের অন্য আর একটি শাখা। উভয় শাখা একই স্রোতধারা হতে নির্গত হলেও দু দলের রণনীতি ও রণকৌশলে ছিল মৌলিক পার্থক্য। উভয় দলের নেতা ছিলেন আব্দুল্লা আল মায়মুনের শিষ্য; কিন্তু দুজনের সামাজিক অবস্থা ভিন্ন হওয়ায় তারা চিন্তা চেতনায় রণনীতি ও কৌশলে ভিন্ন দুটি অবস্থান গ্রহণ করেন। ইবনে ময়মুন তার মৃত্যুর পূর্বে ৮৭৪ সালে হামদান কারামত নামক একটি ইরাকি কৃষক সন্তানকে তাঁর শিষ্য হিসাবে পান। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বিস্তর আলোচনা হয়েছে। যা হোক কথিত আছে যে, তিনি রাশিচক্র অধ্যয়ন করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, ইরানীরা সত্বর আরবদের নিকট হতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে। তিনি স্বতন্ত্রভাবে যে গোপন সংগঠনটি গড়ে তোলেন তার নামানুসারে

কারামিতা বলে অভিহিত করা হয়। হামদান ৮৯০ সালে কুফার সন্নিকটে দারুল হিজরা গৃহে তার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। তার প্রচারক বাহিনী স্থানীয় কৃষক, কারিগর, শিল্পী, ক্ষুদে দোকানীদের মধ্যে প্রচার অভিযান পরিচালনা করেন এবং দ্রুত দরিদ্র জনতার মধ্যে তার সমতাবাদী ধারণা দৃঢ়মূল হয়। ব্যাপক জনতার মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ করে শাবান বলেন যে, এ সময় আব্বাসী সরকারের শুল্ক নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। বড় ব্যবসায়ীরা কর রেয়াত পেলেও কারিগর-শিল্পী ছোট দোকানীরা করভারে নুইয়ে পড়ে। কৃষকরা হয় শোষিত। তদুপরি এ সময় কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় স্বার্থ সম্পর্কে হয়ে ওঠে উদাসীন। কারামিতারা এদের অসন্তুষ্টি দূরীভূত করার আশ্বাস দেয়। তাদের সমতাবাদী নীতির জন্য তাদের শত্রুরা যে, প্রচার করে তারা সম্পদ ও নারীদের ভেদাভেদ রহিত করে। একথা অবশ্য সত্য যে তারা সকল ধর্ম-বর্ণের সঙ্গে খাপখাওয়ানোর কথা বলতেন এবং সকলের মধ্যে সমতা ও সহনশীলতার আদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ কবতেন। তারা শ্রমিকদেরকে গিল্ডে সংগঠিত করেন। সম্ভবত তাদের দ্বারা প্রভাহিত হয়ে পবিত্র সংঘ তাদের অষ্টম গ্রন্থে গিল্ডের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে। সম্ভবত তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইউরোপে গিল্ড আন্দোলন জোরদার হয়।[১৮] তারা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। কারামাতা নেতা আবু সাইদ আল হাসান আল জান্নবী ৮৯৯ সালে পারস্য উপসাগর তীরে আল আহমাকে রাজধানী করে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি দ্রুত এতই শক্তি সঞ্চয় করে যে, বাগদাদের জন্য তা হুমকি হয়ে ওঠে। তারা তাদের রাজধানীর চতুর্দিকে আক্রমণ পরিচালনা করে। ইয়ামেন দখল করে; উমামার উপর আক্রমণ চালায়। তার পুত্র আবু তাহের সুলায়মান নিম্ন ইরাকে অভিযান চালিয়ে তীর্থ পথ দখল করে নেয়; ৯৩০ সালে তারা কাবা শরিফের কৃষ্ণ-পাথরটি লুণ্ঠন করে, তবে তা ৯৫১ সালে ফেরত দেয়। আধুনিক গবেষকরা মনে করেন যে, তারা মূলত বাণিজ্য পথ নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালায়। যেহেতু তাদের প্রতি সাধারণ জনতার সমর্থন ছিল—তাই তারা বেশ সাফল্য অর্জন করে। তাদের বিদ্রোহে বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়। বস্তুত ৯৪৬ সালে বাগদাদ বুওয়াইহীরা দখল করে নেয়।[১৯]

এ্যাসাসিন

এ্যাসাসিন তৃতীয় বৃহৎ ইসমাইলী শাখা। এ্যাসাসিন সম্পর্কে অন্যত্র সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এরা ছিল সন্ত্রাসবাদী, তবে একথাও সত্য যে, সুন্নি সেলজুকরা বাগদাদে ক্ষমতা দখল শিয়াদের জন্য ছিল হুমকিস্বরূপ—এ জন্য তারা মরিয়া হয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। এরা প্রাচ্য ইসলামি সমাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং তাদের উৎপাত হালাকু খানকে বাগদাদ ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারামাতা আন্দোলনে প্রচুর ইতিবাচক দিক ছিল; কিন্তু এ্যাসাসিনদের মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

উত্তর সিরিয়ার নুসাইরিয়া শিয়ারা বসবাস করত। এরা একাদশ ইমাম হাসান আল আসকারীর সহপাঠী মোহাম্মদ বিন নুসহিরের নামে এই ফেরকার নামকরণ করা হয়। এরা পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে ইসমাইলী মতে দীক্ষা নেয়। এ কারণে এই ফেরকার সাথে অন্যান্য শিয়াদের বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তারা মনে করত আলী ছিলেন অবতার। এ কারণে তাদেরকে আলাভীও বলা হয়। তারা অনেক খ্রিষ্টীয় উৎসব ও পালন করত এবং খ্রিষ্টান নামকরণ পছন্দ করত।[২০]

নুসাইরিয়া, এ্যাসাসিন, দ্রুজ কারামিতাদেরকে চরমপন্থী শিয়া বলা হয়। তাদের মধ্যে কোনো গ্রুপ মনে-করে যে, জিব্রাইল ভুলবশত ঐশীবাণী মোহাম্মদের নিকট প্রেরণ করে।

শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে জায়দীরা সুন্নিদের কাছাকাছি। তারা ছিলেন উদার; গুপ্ত ইমামে বিশ্বাসী নন; তারা মুতা বিবাহ বা তাকিয়া নৈতিক নীতি গ্রহণ করে নি।[২১]

শিয়াদের রাজনৈতিক ভূমিকা যাই হোক না কেন শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইখওয়ানুস সাফার অবদান খুবই মূল্যবান। দর্শন বিভাগে এদের সম্পর্কে আলোচনা হবে।

তথ্যপুঞ্জি

১ Shaban, op cit p 126
২. Ibid p 127
৩. Ibid p 127
৪. Ibid p 128
৫. Hitti, op cit p 442 & 446
৬. Shaban, op cit p 126
৭. Ibid p 126
৮. Hitti, op cit p 441
৯. আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮
১০. Hitti, op cit p 248
১১. Ibid p 449
১২. Ibid p 441
১৩. Ibid. p 441
১৪. Ibid. p.443
১৫. Ibid. p.440
১৬. Ibid. p. 248
১৭. Ibid. p 248
১৮. Ibid. p.443
১৯. Ibid. p 443
২০. Shaban, op cit. p. 191
২১. Hitti, op cit. p. 445

৭.২ ফাতেমী আন্দোলন : ফাতেমীবংশ (৯০৯-১১৭১ খ্রি.)

উবাইদুল্লাহ আল মাহদী কর্তৃক তিউনিসিয়ায় ৯০৯ সালে ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠা ছিল সমগ্র মধ্যযুগে ইসলামের ইতিহাসে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রথম ও প্রধান রাজনৈতিক সাফল্য। প্রফেসর হিট্টি মনে করেন তৎকালীন প্রাচ্য মুসলিম উম্মার উপর আব্বাসী বংশের সুন্নি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এটা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।[১] তাদের এ সাফল্যে একই সময় কর্ডোভা, কায়রো ও বাগদাদ-এই ত্রিকেন্দ্রিক মুসলিম বিশ্বের ধারণা বাস্তব রূপ লাভ করে; এককেন্দ্রিক মুসলিম বিশ্বের ধারণা অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়।

গতানুগতিকভাবে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ইসমাইলী শিয়া সম্প্রদায়ের আব্বাসী বিরোধী সর্বাত্মক গোপন আন্দোলন এবং সুকৌশলী প্রচারণা তৎপরতার চূড়ান্ত ফলশ্রুতিতে ফাতেমী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়; তারা আরো মনে করেন যে, পূর্ববর্তী আব্বাসী বিপ্লবের সাথে এই বিপ্লবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শিয়া ইমাম জাফর সাদিক তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাইলের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ পুত্র মুসা আল কাজিমকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। শিয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক মুসা আল কাজিমকে তাদের ইমাম হিসাবে গ্রহণ করলেও কিছুসংখ্যক শিয়া ইসমাইল পুত্র আল মাকতুম (গুপ্ত) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আল মাকতুম এব অনুগামীরাই ইসমাইলী শিয়া বলে পরিচিতি লাভ করেন। কালক্রমে তাদের মতবাদের সাথে প্রাচীন পারস্যের দার্শনিক মনির দর্শন থেকে গৃহীত বহু গূঢ় তত্ত্ব সম্পৃক্ত হয়। এই ইসমাইলী সম্প্রদায়ের একাংশ মনিপন্থী হয়ে পড়েন—তারা শরিয়ী আইনের চেয়ে ধর্ম পুস্তকের নিগূঢ়ার্থকে বেশি গুরুত্ব দেন; এক কথায় তাদের মতাদর্শ ছিল 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বা কর্মে বহুদূর'। এরাই ইসমাইলী গুহ্যবাদী (বাতেনী) নামে পরিচিত। এই ফেরকার প্রতি আব্বাসীদের কড়া নজর থাকত এবং তাদের অনেকে আব্বাসী নির্যাতনের শিকার হন। যা হোক আল মাকতুম পুত্র জাফর আল মুশদাক এর মৃত্যুর পর তদপুত্র আল হাবিব মোহাম্মদ ইসমাইলী ইমাম পদে অভিসিক্ত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য, উচ্চাভিলাষী। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মকুশলী ব্যক্তি; এবং ইসমাইলী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণ পুরুষ। আব্বাসী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদের সাথে যোগ্যতায় ও সাংগঠনিক তৎপরতায় তার সাদৃশ্য ছিল বৈকি। তিনি শহরে জনকোলাহল ত্যাগ করে হিমসের নিকটবর্তী সালামিয়া নামক মিশর-আফ্রিকার তীর্থ যাত্রীদের গমনাগমন পথে অবস্থিত এক নিস্তরঙ্গ গ্রামে আবাসন গ্রহণ করেন। এখান হতে তিনি তাঁর মতাদর্শ প্রচার অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর সংগঠিত প্রচার স্কোয়াডকে চর্তুদিকে গোপন প্রচার অভিযানে প্রেরণ করতেন।[৩] তাঁর প্রচারক বাহিনীর সবচেয়ে উদ্যমী প্রতিভাধর অক্লান্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন আবু আবদুল্লাহ হুসাইন। এককালে তিনি ছিলেন বসরার মুহতাসিব। পরে তিনি আশাশিয়ী বা সর্বোত্তম শিয়া বলে খ্যাতি অর্জন করেন। লোকজনকে শিয়া মতবাদে দীক্ষা দিতেন বলে তাকে মোয়াস্তি বলা হয়। ইয়ামেনের

সানার অধিবাসী আব্দুল্লাহ আল হুসাইন তাঁর প্রচার কৌশল রপ্ত করেন পারস্যের আবদুল্লাহ ইবনে মায়মুনের নিকট। প্রচারক বাহিনীর প্রচেষ্টায় নয়া মতবাদ দ্রুত ইয়ামেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, ভারত, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

সালামিয়ার নিভৃত গৃহে মৃত্যুশয্যায় ইমাম আল হাবীব মুহাম্মদ আপন পুত্র উবাইদুল্লাহকে তাঁর ইমামত পদে মনোনীত করেন এবং মুমূর্ষু পিতা তাকে বলেন "তুমিই মাহদী", আমার মৃত্যুর পর তোমাকে দূরদেশে চলে যেতে হবে, সেখানে তুমি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।[৪] এভাবে আল হাবীব মুহাম্মদ তাঁর দায়ীদেরকে প্রচারের আর একটি উপাদান সরবরাহ করেন। মানুষের দুঃখদুর্দশা মোচনকারী আল মাহদী এখন পৃথিবীতে আবির্ভূত।

উল্লিখিত আবু আবদুল্লাহ আশশিয়ী মক্কায় তিউনিসিয়ার কিতামা গোত্রের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করার পর সেখানে এ মতবাদের সাফল্যের সম্ভাবনা বুঝতে পারেন। নব দীক্ষিত আলজেরিয়ার কাতামা গোত্রের লোকদের সাথেই তিনি ৮৯৩ সালে তিউনিসিয়ায় গমন করেন। মিশরের কথা না ভেবে তিনি কেন তিউনিসিয়ার কথা এত গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন? মিশরের কথা সম্ভবত এ জন্যই ভাবেন নি যে, তখনো কায়রো এবং আলেকজেন্দ্রিয়া ব্যতীত সর্বত্র কিবতি অমুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদেরকে ইসলামে দীক্ষা দেয়ার চাইতে বরং মুসলিম সমাজে ইসমাইলী মতবাদ প্রচার সহজসাধ্য। উত্তর আফ্রিকা নানা দিক দিয়ে তার কাজের উপযুক্ত স্থান বলে প্রতীয়মান হয়। এতদ্‌অঞ্চলে মুসলিম জনতার সংখ্যাই বেশি অথচ ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য কোনো সমস্যা ছিল না। এ অঞ্চলে শিয়া ইদ্রিসী এবং খারেজী রুস্তামীরা একশ বছর ধরে রাজত্ব করে। এখানে কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল না; তবে আগলাবী শাসন ব্যবস্থায় তিউনিসিয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। প্রথমত আগলাবী সেনাবাহিনীতে খোরাসানী, আরব, বার্বারী নানা জাতিসত্তার সদস্য থাকায় তাদের মধ্যে চলত দ্বন্দ্ব ও সংকট; দ্বিতীয়ত আগলাবীরা পুরোপুরি কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল; অথচ তারা পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল সাহারার পথে প্রাচীন বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যস্ত ছিল; এ কারণেই তারা সিসিলি জয়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। এই ব্যয়বহুল অভিযান পরিচালনার জন্য নগদ টাকায় ভূমি-কর প্রথার প্রবর্তন করে। এ পদক্ষেপ কোনো ভাল ফল বয়ে আনে নি। অবশেষে ব্যবসায় উৎসাহিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বস্তুত তিউনিসিয়ার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন আবু আবদুল্লাহ আশশিয়ী।[৫] তিউনিসিয়ার বার্বারী কিতামা গোত্র যখন তাদের প্রাণকর্তা আল মাহদীর আগমনের জন্য প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষমান তখনই উবাইদুল্লাহ আল মাহদী ৯০২ সালে সালামিয়া ঘাঁটি ত্যাগ করে উত্তর আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে ছিলেন পুত্র আবুল কাসেম, শিয়ী ভ্রাতা আবুল আব্বাস এবং কতিপয় অনুরক্ত শিষ্য। তারা সওদাগরের ছদ্মবেশে যাত্রা করেন।

সর্বোচ্চ সতর্কতা সত্ত্বেও আব্বাসী শাসক চক্র তাঁর সালামিস ত্যাগের আভাস পেয়ে তাকে পাকড়াও করে বন্দি করার আদেশ দেন। ত্রিপলীতে সহযাত্রীদের ছেড়ে শিয়া ভ্রাতা আবুল আব্বাস কায়রোয়ান গমন করেন। এখানে তিনি ধৃত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। আল মাহদী ও তদপুত্র শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে আধুনিক মরক্কোর অদূরে সিজিল মাসে পৌছেন। এখানকার শাসককর্তা তাঁকে সদয়ভাবে গ্রহণ করলেও আগলাবি শাসনকর্তা জিয়াদাতুল্লাহর পত্র পেয়ে তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[৬]

সমগ্র অঞ্চলে আবু আবদুল্লাহর মতবাদ জনপ্রিয় হচ্ছে দেখে তৎকালীন ইফ্রিকিয়ার শাসনকর্তা ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ ইসমাইলী আন্দোলন দমন করতে প্রয়াসী হন; কিন্তু ইসমাইলী আন্দোলনের অগ্রগতি স্তব্ধ করা সম্ভব হয় নি। এমতাবস্থায় ইব্রাহিম প্রয়াত হলে জিয়াদাতুল্লাহ (৯০৩-৯০৯ খ্রি.) তদস্থলে ক্ষমতায় সমাসীন হন। এ সময় জনগণের মুক্তিদাতা অচিরেই অবির্ভূত হচ্ছেন—এরূপ প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া হয়। এমতাবস্থায় বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন স্তব্ধ করার পথ বেছে নেন জিয়াদাতুল্লাহ। কিন্তু তাঁর প্রেরিত দুটি বাহিনী শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। জিয়াদাতুল্লাহ ত্রিপলীতে পলায়ন করেন। ৯০৯ খ্রি. আবু আবদুল্লাহ বিজয়ীবেশে আগলাবী রাজধানীতে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে নগরের শাসনভার গ্রহণ করেন। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সমগ্র প্রদেশে শাসনকর্তা প্রেরণ করেন। তিনি কায়রোয়ান হতে তদীয় ভ্রাতা আবুল আব্বাসকে মুক্ত করেন। এর পর সিজিলমাসার কারাগার থেকে উবাইদুল্লাহকে মুক্ত করা হয়। ৪০ দিন সিজিলমাসায় অবস্থান করার পর তিনি রাজধানী রাক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। খলিফা, আমিরুল মোমেনিন এবং ইমাম হিসাবে প্রায় সকলেই আল মাহদীর প্রতি আনুগত্যের শপথ করেন।[৭] এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ফাতেমী বংশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত বংশ তালিকাটি মাকরেজী ও ইবনে খালদুন প্রদত্ত বংশ তালিকা অনুসারে লিখিত। ফাতেমী বংশের উপর প্রচুর গবেষণা কর্ম হয়েছে। বার্ণাড লিউইস এরূপ গবেষণা কর্মের সূচনা করেন; হল্যান্ড হতে প্রকাশিত ইসলামি বিশ্বকোষে কোনোর্ড এসব গবেষণা কর্মের একটি সারসংকলন পরিবেশন করেছেন এবং তিনি তার নিজস্ব গবেষণালব্ধ মতামতও ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক গবেষক অধ্যাপক শাবান এসব গবেষণা কর্মের মধ্যে একটি বড় দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন এবং তা হচ্ছে ফাতেমীদের উত্থান-বিকাশ ও পতনের বাস্তব প্রেক্ষাপট একেবারেই অবহেলিত হয়েছে। গবেষকরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন তাদের বংশ পরিচয়ের উপর।[৮] আধুনিক গবেষকরা সনাতন আরব ঐতিহাসিকদের প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। মজার ব্যাপার ১০১১ খ্রি. পূর্বে ফাতেমীদের বংশপরিচয় নিয়ে কারো কোনো সংশয় ছিল বলে মনে হয় না; কিন্তু ঐ বছর খলিফা আল কাদির বিল্লাহ কিছু সংখ্যক সুন্নি আইনজ্ঞ ও ধর্মতত্ত্ববিদ এবং শিয়া বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সম্বলিত এক ইশতেহার প্রচার করেছেন। উক্ত ইশতেহারে বলা হয় যে, আব্বাসীদের প্রতিপক্ষ মিশরের

খলিফারা ফাতেমী বংশধর নন বরং জনৈক বেদাতী দায়সানের বংশধর। এরপর হতে ঐতিহাসিকরা দুভাগে ভাগ হয়ে পড়েন। ইবনুল আসির, ইবনে খালদুন এবং মাকরেজী ফাতেমী প্রদত্ত বংশ তালিকায় কোনো সংশয় প্রকাশ করেন নি: কিন্তু ইবনে খাল্লিকান, ইবনে ইছায়ী এবং আস সুয়ূতী প্রচণ্ডভাবে দ্বিমত পোষণ করেন। তাদের অন্তত ৮টি বংশ তালিকাও পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন তারা মূলত ইহুদী সন্তান। হিট্টি উবাযদুল্লাহ আল মাহদীব আসল নাম সাইদ বিন হুসাইন বলে উল্লেখ করেছেন।[৯]

এরূপ পরিস্থিতিতে ঐসব স্বনামধন্য ঐতিহাসিকদের মতামতের সত্যতা যাচাই করার কি কোনো উপায় আছে? সম্ভবত তার কোনো প্রয়োজনও নেই। এসব তর্কবিতর্কের উর্ধ্বে একটা কথাই স্পষ্ট যে, তাদের উত্থানের পশ্চাতে অসংখ্য মানুষের সমর্থন ছিল।

তিউনিসিয়ায় উবায়দুল্লাহ আল মাহদী প্রথমে ৯০৯ সালে ফাতেমী বংশ প্রতিষ্ঠা করলেও ষাট বছর পর আল মুইজ ৯৬৯ সালে মিশর দখল না করা পর্যন্ত তারা সেখানেই তাদের শাসননীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। মিশর জয়ের পর উত্তর আফ্রিকা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে তারা মিশরের উপর রাজত্ব করেন। আল মাহদী হতে আল মনসুর পর্যন্ত (৯০৯-৯৫২) সময়কে তাদের রাজত্বের প্রস্তুতি পর্ব বলা হলে আল মুইজ হতে আল হাকিমের রাজত্বকালকে (৯৫২-১০২১ খ্রি.) তাদের রাজত্বের স্বর্ণযুগ বলা চলে। এর পর আসে দীর্ঘ অবক্ষয়ের যুগ; ১১৭১ সালে সালাহউদ্দীন আয়ুবী ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে ফাতেমী বংশের অবসান হয়। এই বংশে ১4 জন রাজত্ব করেন; নিম্নে তাদের তালিকা দেয়া হলো :

প্রস্তুতি পর্ব

১. আল মাহদী (৯০৯-৯৩৪ খ্রি.)
২. আল কায়েম (৯৩৪-৯৪৬ খ্রি.)
৩. আল মনসুর (৯৪৬-৯৫২ খ্রি.)

স্বর্ণযুগ এবং ৯৬৯ খ্রি. হতে মিশরী যুগ

৪. আল মুইজ (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.)
৫. আল আজীজ (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.
৬. আল হাকীম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.)
৭. আল জহির (১০২১-১০৩৫ খ্রি.)
৮. আল মুনতাসির (১০৯৪-১১০১ খ্রি.)
৯. আল মুসতালী (১০৯৪-১১০১ খ্রি.)

১০. আল আমীর (১১০১-১১৩০ খ্রি.)
১১. আল হাফিজ (১১৩০-১১৪৯ খ্রি.)
১২. আল জাকির (১১৪৯-১১৫৪ খ্রি.)
১৩. আল ফাইজ (১১৫৪-১১৬০ খ্রি.)
১৪. আল আজিজ (১১৬০-১১৭১ খ্রি.)

৭.৩ প্রস্তুতি পর্বে (৯০৯-৯৩৪ খ্রি. পর্যন্ত) ফাতেমী খলিফাদের শাসননীতি

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কায়রোয়ান শহরতলী রাক্কাদায় আগলাবী রাজ প্রাসাদে উবায়দুল্লাহ আল মাহদীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রস্তুতি পূর্বে উবায়দুল্লাহ আল মাহদী স্বয়ং ছিলেন ফাতেমী শাসন নীতির স্থপতি। তিনি দীর্ঘদিন (৯০৯-৯৩৪) শাসনকার্য পরিচালনা করে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, তার বংশের নিরাপত্তার জন্য একটি সুরক্ষিত রাজধানী প্রয়োজন। রাজধানীর স্থান নির্বাচনের জন্য তিনি সমুদ্রকূল পরিদর্শন করে সমুদ্রের ভিতব একটি স্থান পছন্দ করেন। পাঁচ বছরে তার রাজধানী নগর মাহদীয়া (৯১৬ খ্রি.) তৈরি হয়। লৌহ ফটক সমন্বিত এক সুদৃঢ় প্রাকারবেষ্ঠিত এই নগরের অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছিল মার্বেল পাথরের জমকালো সুবৃহৎ জল সরবর এবং ভূগর্ভস্থ রসদ ভান্ডার। নগরীটি দেখে তিনি বলেন, আমি এখন কাতেমীদের সম্পর্কে নিশ্চিত।[১০] রাজধানী নির্মাণে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ মেলে। তার শাসননীতি ছিল সুদৃঢ় ও তেজোদীপ্ত।

ফাতেমী বংশের স্থপতিদের মধ্যে প্রথম হতে বিভিন্ন নীতিগত প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। তিউনিসিয়ার আগলাবী সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কিরূপ আচরণবিধি গ্রহণ করা হবে—এই প্রশ্নে আবু আব্দুল্লাহ আশশিয়ী এবং তাঁর জেষ্ঠ্য ভ্রাতা, আল মাহদীর উপদেষ্টা আবুল কাসেমের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। আবুল কাসেম তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু আবু আবদুল্লাহ আশশিয়ী তাদের প্রতি নমনীয় আচরণের প্রবক্তা ছিলেন।[১১] রাজস্বনীতিতে আবু আবদুল্লাহ শিয়ী এবং খলিফা আল মাহদীর মধ্যে অচিরেই মতপার্থক্য প্রকাশ পায়। আবু আবদুল্লাহ মনে করতেন যে, ইসলামের প্রাথমিক রাজস্বনীতিতে প্রত্যাবর্তন করাই শ্রেয়; ফসলে ভূমি কর প্রদান পদ্ধতি এবং গবাদি পশুর উপর করারোপ বাঞ্ছনীয়। আল মাহদী মনে করেন যে, বার্বারীরা এরূপ কর প্রদানে অভ্যস্ত নয়, তাই এটা জারি করা অনুচিত। তিনি ভিন্ন ধরনের করনীতি অবলম্বন করেন। গবাদি পশুর উপর করারোপ না করে বরং প্রতি একর ভূমির উপর নির্দিষ্ট হারে মুদ্রায় রাজস্বনীতি প্রবর্তিত হয়। মাকরেজী বলেন, আগলাবীরা পতনের পূর্ব মুহূর্তে এরূপ নীতি বর্জন করে। অবশ্য এ নীতির মন্দ দিকটি সংশোধিত করেই তা চালু করা হয়। উক্ত রাজস্ব নীতির প্রশ্নে উভয়ের মধ্যকার মতভেদ সম্ভবত দূরীভূত হতে পারত যদি আরো মৌলিক প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে

মতপার্থক্য দেখা না দিত। প্রথমত বহুদিন ধরে বার্বারীদের মধ্যে অবস্থান করায় আবু আবদুল্লাহ তাদের মনোভঙ্গির এবং জীবনধারার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত তিনি আল মাহদীর মত উচ্চাভিলাষীও ছিলেন না—তাই তিনি পূর্বাঞ্চলে মিশরের দিকে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ না করে বরং পশ্চিমাঞ্চলে ইদ্রিসী ও রুস্তামী রাজ্য নবগঠিত ফাতেমী রাজ্যে সম্পৃক্ত করে তাকে সুদৃঢ়করণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। এতদঞ্চলে নবাগত আল মাহদী এরূপ স্বল্প আকাঙ্ক্ষায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি; তিনি এতদঞ্চলে আব্বাসীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার দুর্বার অভিলাষ শোষণ করতেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, পূর্বাঞ্চলে সম্প্রসারণের মধ্যেই নিহিত ছিল তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়। একান্ত নীতিগত প্রশ্নেই আবু আবদুল্লাহ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবুল কাসেমকে মাহদীর উচ্চাভিলাষের বেদীতে আত্মাহুতি দিতে হয়।[১২] আবু আব্দুল্লাহর মৃত্যুরপর তার বার্বারী শিষ্যরা বিদ্রোহ করলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, উবায়দুল্লাহ আল মাহদী এবং তার সকল উত্তরসূরি উমাইয়া স্পেনের প্রতি কোনো রকম গুরুত্বারোপ করে নি। অথচ উত্তর আফ্রিকায় ছিল তাদের প্রচুর বাণিজ্যিক স্বার্থ, আলেকজেন্দ্রিয়া এবং ক্রীট দ্বীপে ছিল স্পেনের বাণিজ্যিক উপনিবেশ। এসব কায়েমী স্বার্থে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ বা বিরোধিতার অর্থ ছিল স্পেনের শক্তিশালী উমাইয়াদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। আল মাহদী উমাইয়াদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার নীতি অবলম্বন করেন। তাঁর উত্তরসূরিরা তাঁর অনুসরণ করেন মাত্র। সুন্নি উমাইয়াদের প্রতি শিয়া মতাদর্শের ধারক ও বাহকদের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তাদের বাস্তবতাবোধের জয় লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক শাবান বলেন।"Therefore the Fatımids, the Claimants to all Shıte heritage, Chose ofall things to leave alone an umayyad Amirul Muminin in nearby Spain and tolarate the challange to their universal Claims."[১৩] এ পর্যায়ে পূর্বাঞ্চলে তাদের রাজ্যের সম্প্রসারণের কি কোনো পরিকল্পনা ছিল? আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে এরূপ কোনো পরিকল্পনা আদৌ থাকলে তার বাস্তবায়নের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। কেননা তারা তাদের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাদের সামরিক শক্তি কোতামাদের মধ্যে সীমাব্ধ ছিল; অথচ কোতামারাই ছিল বার্বারদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি উপজাতি। আগলাবীদের উত্তরাধিকারী হিসাবে সিসিলি ও ত্রিপলটানিয়া তারা দখল করে। এতে তাদের সামরিক অবস্থানে বেশ পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তারা জলস্থল উভয় দিকে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে। তাদের নব নির্মিত রাজধানী মাহদীয়াতে একটি পোতাশ্রয় এবং দুটি ড্রাইডক নির্মিত হয়। পোতাশ্রয়ে ৯০০টি রণতরী প্রস্তুত রাখা হয়। ফাতেমী নৌবহর ইটালির বিভিন্ন বন্দরে এমন কি সুদূর জেনোয়া এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে আক্রমণ পরিচালনা করে। এসব আক্রমণের ফলে লুণ্ঠিত মালামাল তাদের হস্তগত হলেও এরূপ ব্যয় বহন

অভিযানের জন্য তা আদৌ যথেষ্ট ছিল না। পুনশ্চ স্মরণ করা যেতে পারে যে, ফাতেমী নৌবহর স্পেনের শক্তিশালী উমাইয়া নৌবহরের বিরুদ্ধে কখনো আক্রমণ পরিচালনা করে নি। ফাতেমী নৌ-বহরের উপর ইটালি প্রতি আক্রমণ না চালালেও সিসিলির আরব বণিকরা তার উপর আক্রমণের পাল্টা জওয়াব দেয়। এমন কি তিউনিসিয়া নৌঘাঁটি আক্রমণ করে। ফাতেমীরা ইটালির বাজারে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত রাখতে এবং সিসিলির শক্তি খর্ব করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। অথচ সিসিলির অবস্থান ছিল ইটালি ও স্পেনের মধ্যকার বাণিজ্য পথের মধ্যবর্তী স্থানে। যেহেতু স্পেন তাদের পথে বাধা ছিল না তাই অকারণে স্পেনের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণের আদৌ প্রয়োজন ছিল না।

স্থলভাগে ফাতেমীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল সুবিবেচনাপ্রসূত। এ পর্যায়ে আব্বাসীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া অথবা মিশর জয় করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা তাদের সম্পদ এবং সামরিক শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিল। এ সময় তাদের উদ্দেশ্য ছিল নীলনদ অববাহিকা এবং ত্রিপলটানিয়ায় তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে উপকূলীয় বন্দর ও মরুভূমির উপর তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। এতদাঞ্চলে ৯১৩—১৫, ৯১৯-২১,৯৩৫ সালে অভিযানের উদ্দেশ্য মিশর বিজয় নয়; বরং সাইরেনিকা হতে মিশরী প্রভাব বিনষ্ট করা। এ সব অভিযানের সময় ফাতেমী বাহিনী আলেকজেন্দ্রিয়া সীমান্তে ঘেসে মরুভূমি ফুসতাতের পথ ধরে ফায়উম মরুদ্যান হয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মিশরী মরুদ্যানে পৌছে যায়। এই বিবরণ হতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ফাতেমীরা আফ্রিকার বাণিজ্যের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় যত্নবান ছিল। ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশ অধিকারের সাথে তারা আফ্রিকা বাণিজ্যের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত করতে পারত।[১৪] এর জন্য তার প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী নৌবহরের। ফাতেমীদের বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং যুদ্ধবিগ্রহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর মূলে ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থ চেতনা। অধ্যাপক শাবান এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন- There is no doubt that trade was the most important motive in almost every action taken by the fatimids throughout their history.[১৫]

তাদের গৃহীত নীতি ও কর্মকাণ্ড আশানুরূপভাবে ফলপ্রসূ হয় নি, বরং এতে উল্টো ঘটনা ঘটে। তাদের বিজয়ের পূর্বে উত্তর আফ্রিকায় বহু দিন যাবত বিদ্যমান স্থিতাবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। ৯০৯ সালে খারেজী রুস্তামীদের পতনে তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র তাহরতের সমৃদ্ধি ধ্বংস হয়। আন্তঃসাহারা বাণিজ্য পথের আরো পশ্চিমে সরে যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধে হতে বঞ্চিত হওয়ায় দেশের সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বার্বারীরা অসংখ্যবার বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কিরাদের পুত্র আবু ইয়াজিদ মাঘলাদ নামক একজন খারেজী শিক্ষক। শিষ্যরা তাকে শায়খুল মুসলিমিন উপাধি দান করে। এসব বিদ্রোহে ফাতেমী সৈন্যদল বারবার পরাজিত হয়;

নগরের পর নগর তাদের দ্বারা অধিকৃত হয়; চলে নৃশংসতা। আল মাহদী এই ঘটনার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থান খারেজী স্কুল শিক্ষকদের হাতে চলে যায়। এমন কি আল কারিমের শাসন রাজধানী মাহদীয়ার প্রাচীরের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যা হোক আল মনসুরের সময় মাখলাদের মৃত্যুর সাথে বিদ্রোহের অবসান হয়।[১৬]

৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের সামরিক সাফল্যে সাইরেনিকায় তাদের প্রভাব বলয় বিস্তৃত হয় বটে; কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আলেকজেন্দ্রিয়া ও তার আশ-প্যাশে পলায়ন করে। সাইরেনিকায় যারা থেকে যায় তারাই ফাতেমীদের বিরুদ্ধে ত্রিপলিটানে সংঘটিত বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়। এরূপ অবস্থায় মরুদ্যানের বাণিজ্য পথ পুনরায় নুবিয়ার মধ্য দিয়ে চলে যায়। মজার ব্যাপার নুবিয়ার রাজা তার রাজ্যের বাণিজ্য পথ বিনিষ্ট হওয়ায় ৯৫০ খ্রি. মরুদ্যানে অভিযান চালান। এ আক্রমণ ফাতেমীদের কোনো সাহায্য হয় নি; বরং ফাতেমীদের এতদাঞ্চলীয় নীতি পরিবর্তনে উৎসাহিত করে। সাইরেনিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বরং ফাতেমীদের দৃষ্টি পড়ে সম্ভাবনাময় আলেকজেন্দ্রিয়ার প্রতি।

ফাতেমীদের ভূমধ্যসাগরীয় নীতি তাদের জন্য মঙ্গলজনক হয় নি। তাদের ভূমধ্যসাগরীয় কার্যকলাপে উমাইয়া ও বাইজানটাইন এর মধ্যে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়; উভয় দেশে দূত বিনিময় কার্যক্রম চলে। উত্তর আফ্রিকায় উমাইয়াদের মিত্রের অভাব না থাকলেও তারা সিউটা দখল করে সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে। এসব ঘটনা পরম্পরায় ফাতেমীরা অনুধাবন করতে শুরু করে যে, তাদের গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পুনশ্চ উল্লেখ্য ফাতেমীদের প্রস্তুতি পর্বে রণনীতি ও রণকৌশলের স্থপতি আল মাহদী ও তাঁর দু উত্তরসূরি ৪০ বছর ধরে অনুসরণ করেন।[১৭] উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আল মাহদী সম্পর্কে আস সুয়ুতি মন্তব্য করেন যে, তিনি জনসাধারণের প্রতি ন্যায় বিচার ও উদার নীতি গ্রহণ করেন এবং তারাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।[১৮]

৭.৪ মিশরে ফাতেমী বংশের প্রতিষ্ঠা : তাদের স্বর্ণ যুগ (৯৫২-১০২১ খ্রি.)

ইতিপূর্বে তিউনিসিয়ায় ফাতেমী বংশের প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে তাদের সামরিক সংগঠন, স্পেনের উমাইয়াদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ভূমধ্যসাগরীয় এবং পূর্বাঞ্চলীয় নীতি, এবং শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, তাদের ৪০ বছরের শাসন অভিজ্ঞতা হতে স্পষ্ট হয় যে, তাদের জন্য আরো বাস্তবমুখী রণনীতি, রণকৌশল ও শাসনতন্ত্রের নয়া ভিত্তি রচনার প্রয়োজন ছিল। আলোচ্য যুগে বিভিন্ন নয়া নীতির পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলে।

খলিফা মনসুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবু তামীম মাদ আল মুইজ ফাতেমী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিকরা তাঁকে জ্ঞানী, উদ্যোগী, সাহসী রাষ্ট্র নায়ক, বিদগ্ধ পণ্ডিত, বিজ্ঞান দর্শন বিশারদ, এবং শিল্প-জ্ঞান বিজ্ঞানের উদার পৃষ্টপোষক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন কতগুলো নিয়মনীতির ভিত্তিতে। নতুন সৈন্যবাহিনী ও নৌবহরের পুনর্গঠন সম্পন্ন করেন। ইফ্রিকিয়া ও মাগরিবে তাঁর ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়। ৯৫৫ সালে আল মুইজের একটি জাহাজ উমাইয়া শক্তি কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে ফাতেমী খলিফা সিসিলির রাজপ্রতিনিধি হাসান বিন আলীকে স্পেনের দিকে অগ্রসর হয়ে আলমারিয়া উপকূল ধ্বংস করার দির্দেশ দান করেন।[১৯] ক্রীট দ্বীপটি অনেক দিন ধরে আরবদের দখলে থাকলেও ৯৬১ সালে দ্বীপটি বাইজানটাইনদের দখলে চলে যায় বটে; কিন্তু একই সময় সিসিলি হতে বাইজানটাইন শক্তি নির্মূল হওয়ায় ক্রীটের হস্তচ্যুতির আংশিক ক্ষতিপূরণ হয়। তখনো সিসিলির কয়েকটি সুরক্ষিত স্থান হতে বাইজানটাইনরা আরবদের হয়রানী করত। রাজপ্রতিনিধি আহম্মদ বিন হাসান নগরগুলো জয় করেন। ৯৬৬ সালে সিসিলি পুরোপুরিভাবে ফাতেমী শাসনাধীনে আসে। এখানকার পালার্মো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কর্ডোভা ও বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ ছিল।[২০]

৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করে মিশর জয়ের জন্য আল মুইজ জওহরের নেতৃত্বে একটি সুনির্বাচিত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। জওহর বিনা বাধায় রাজধানী ফুসতাতে প্রবেশ করেন এবং ফাতেমী খলিফার নামে খোতবা পাঠ করেন। আজানে হাই আলা খায়রুল আলম সংযোজন করে শিয়া-সুন্নি আজানের পার্থক্য সূচিত করা হয়। জওহর আল কাহিরা (কায়রো) নগরের গোড়াপত্তন করে ফাতেমী শাসনের সূচনা করেন। এ সময় বিশ্ববিখ্যাত আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠিত হয়। হেজাজ ও সিরিয়া ফাতেমীদের শাসনাধীনে আনা হয়; মক্কা মদিনায় মুইজের নামে খুতবা পাঠ করা হয়; কারামতিদের প্রভাব ধ্বংস করা হয়। ৯৭৩ সালে মুইজ কায়রো প্রবেশ করলে সিরিয়া হেজাজের প্রতিনিধিরা মুইজের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এখন হতে ফাতেমীদের মিশরী যুগের সূচনা হয়। আল মুইজ ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রয়াত হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আবুল মনসুর নিজার আল আজীজ। তাঁকে পিতার ন্যায় সদাশয়, সাহসী, জ্ঞানী ও উদার বলে বর্ণনা করা হয়। তিনি বুলক্কীন বিনজিরী ও তাঁর পিতার নিয়োগকৃত অন্যান্য কর্মচারীদেরকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন। আজীজের রাজত্বকালে ফাতেমীরা সমগ্র সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার বেশ কিছু অংশ জয় করতে সমর্থ হয়। তাঁর নামে কেবল হেজাজ, ইয়ামেনে নয় বরং মৌসুল, আলেপ্পো, হামা, শায়জার ও অন্যান্য স্থানেও খোতবা পঠিত হয়। বস্তুত এ সময় ফাতেমী সাম্রাজ্য ইউফ্রেটিস নদীর তীর হতে আটলান্টিক তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২১] আল আজীজের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র আবু আলী

আল মনসুর আল হাকীম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ১০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হলেও তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের উদার ও মহানুভব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফাতেমী রাজ্যের অবক্ষয় দেখা দেয়।

৭.৫ মিশরে ফাতেমীদের শাসননীতি ও পদ্ধতি : নয়া রণনীতি ও রণকৌশলের পর্যালোচনা

৯৫৩ সালে আল মুইজ ফাতেমী খেলাফতে সমাসীন হয়ে ভিন্ন নীতি অবলম্বন করেন এবং তাঁর দশ বছরের মহা পরিকল্পনা ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি সামরিক সংগঠনের ভিত্তিমূলে বিস্তৃতি ঘটান; এবং সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন স্থান হতে সৈন্য সংগ্রহ করার নীতি গৃহীত হয়। নবগঠিত সেনাবাহিনীতে সিসিলি, ইটালি ও রুমী কন্টিনজেন্ট ছিল; কাতাম গোত্র হতে সেনাবাহিনী সংগ্রহ নীতি অব্যাহত থাকলে তাদের উপর হতে নির্ভরশীলতা দূরীভূত করা হয়; এ সময় ত্রিপলটানিয়া জুওয়াইয়া গোত্র হতে সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। তিনি সানহাজা গোত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কারেন এবং গোত্রটিকে তার শক্তি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। ৯৫৮ সালে উত্তর আফ্রিকায় তাঁর শক্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিসিলির সেনাধ্যক্ষ জওহারের নেতৃত্বে এবং সানহাজা গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। প্রকাশ্যত এ অভিযান ছিল ব্যর্থ; সিউটা উমাইয়াদের হাত হতে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি বটে; তবে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে এ অভিযান ছিল স্বার্থক। এই অভিযানের মধ্য দিয়ে সানহাজা গোত্রকে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার ঘটনা ঘটে। মুইজ এখন হতে দশ বছর ধরে গড়া নয়া নীতি বাস্তবায়নের প্রতি· মনোনিবেশ করেন।

মিশর বিজয়ের পটভূমি : ৯০৫ সালে তুলুনীদের পতনের পর প্রায় ত্রিশ বছর মিশর পুনরায় বাগদাদের সরাসরি শাসনাধীনে আসে; তুলুনী সামরিক বাহিনী সিরিয়ায় প্রেরিত হয়। এবং বাগদাদ হতে একটি সামরিক বাহিনী মিশরে প্রেরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জেনারেল মুনিসের ব্যবস্থানুসারে দু স্থানের রাজস্ব কর্মকর্তাদের হাতে ছিল মূল ক্ষমতা। মুনিসের পতনের পর বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙ্গে যায়। এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। সিরিয়ায় হামদানীদের উত্থানে মিশরে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে; তদুপরি এ সময় এতদ্বকালে ফতেমীদের পুনঃপুনঃ আক্রমণের কারণেও মিশরে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়ে। তাই ৯৩৫ সালে সিরিয়ায় অবস্থিত ইখশিদের অধীনস্থ তুলনী বাহিনীকে মিশরে প্রেরণ করা হয়। ইখশিদকে মিশরের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়; তাকে এ অঞ্চলের সামরিক প্রশাসনিক ইকতা মঞ্জুর করা হয়। অর্থাৎ পুনরায় মিশরে তুলুনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ইখশিদ মিশরী বাহিনীর পুনর্গঠন করেন এবং ৯৩৫-৪৬ সাল পর্যন্ত হামদানী

আগ্রাসন প্রতিহত করেন; সিরিয়া-মিশরের ঐক্য, বহিত হয়; প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কারামিতাদের পোষ মানান হয়।

ইখশিদ বংশের ক্ষমতা মূলত কাফুরের হাতে চলে যায়; কারণ তিনি অচিরেই সৈন্যধক্ষ্যের পদ লাভ করেন। তিনি সুদানীদের জন্য সেনাবাহিনীর দ্বার খুলে দেন। তিনি অবশ্য মিশর সিরিয়ার স্বার্থ রক্ষা করতে সফল হন। ৯৫৫ সালে আসওয়ান আক্রান্ত হলে নুরিয়দের মোকাবিলা করেন; দক্ষিণ সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন। কাফুরের সমস্যা ছিল বহুমাত্রিক; হামদানী ও ফাতেমী আক্রমণ প্রতিহত করা; মিশরে বিভিন্ন মহলের স্বার্থের সমন্বয় ঘটান। আমৃত্যু ৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি মিশর-সিরিয়ার স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কাফুরের মৃত্যুর পর মিশরে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় মুইজ সেনাধ্যক্ষ জওহার তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হন। ইখশিদের মৃত্যুর পর মাত্র তিন বছরের মধ্যে ফাতেমী বাহিনী আলেকজেন্দ্রিয়ায় প্রবেশ করে। মিশর বিজয়ের পর জওহার সকলের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন; সকল ধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এরূপ ধর্মীয় সহনশীলতার ঘোষণা আদৌ আকস্মিক ছিল না; বরং মুইজের দীর্ঘদিনের লালিত নীতিরই দীপ্ত ঘোষণা মাত্র। আর তাঁর এই বিঘোষিত ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি ছিল তার অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। দীর্ঘদিন ধরে ইসমাইলী মতাদর্শে দীক্ষা দেয়ার নানা কলাকৌশল অবলম্বল করেও উত্তর আফ্রিকায় তা আদৌ ফলপ্রসূ হয় নি-অথচ দেশটি ছিল এ মতাদর্শের জন্য উর্বর ভূমি। এ তুলনায় মিশরের অবস্থা আদৌ অনুকূলে ছিল না; মিশরে খ্রিষ্টানরা তিন দলে বিভক্ত ছিল; এবং ঐ সময় মিশরের সংখ্যালঘু মুসলিমরা বিভিন্ন মাযহাব অনুসরণ করে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে মুইজ ইসমাইলী গুহ্যতত্ত্ব প্রচার সীমিত করে দেন।[২২] কাজি নোমান দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি, কেননা তার মতাদর্শ অন্যান্য শিয়া মৌলবাদীদের মত। যা হোক ফাতেমীরা পরবর্তীকালে প্রায় সর্বত্র এরূপ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ব্যবহার করেন।[২৩]

জওহর ৯৭০ সালে ফুসতাতে আগমন করে বিখ্যাত আল কাহিরা (কায়রো) নগরের গোড়াপত্তন করেন এবং বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। কায়রোর গঠন কর্ম সমাপ্ত করা হলে ৯৭৩ সালে আল মুইজ নয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন। এখান হতে তিনি তার নয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[২৪]

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিগত তিন শতকের অভিজ্ঞতার আলোকে মুইজ বহুদিন ধরে তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনায় সমগ্র ইসমাইলী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের উদার মতাদর্শের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্বারোপ করা হয়। অতীতের সকল ভ্রান্তি পরিহার করে ঐ দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের

ইতিবাচক দিককে বিকশিত করে লাভবান হওয়াই ছিল তার মহা পরিকল্পনার মূল সুর। মুইজ মনে করতেন তিনি সর্বদা বিধাতা পরিচালিত নেতা এবং তার নিয়োগকৃত শাসক। অর্থাৎ সে যুগে তিনি দেবদত্ত অধিকার তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন। এরূপ মহান নেতার দায়িত্ব হল সবাব জন্য ন্যায় বিচাব নিশ্চিত করা। যদিও তিনি দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত তবু তিনি এমন আচবণবিধি মেনে চলতে চান যা সার্বজনীন এবং সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য। একটি কেন্দ্র হতে তাঁর পরিকল্পনা পরিচালিত হলেও তাদের আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক তাকে সার্বজনিনতা দান করবে। ফাতেমী প্রধান সর্ব প্রথম গ্রামীণ দারিদ্র্য প্রপীড়িত জনতাব দুঃখ দুর্দশা অনুভব করতেন। শহরবাসীদের এক শ্রেণীর সুবিধাভোগীর অবস্থান সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল। দেশেব প্রচলিত এরূপ দুটি অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে একটি অধিকতর সমতাবাদী সমাজ গঠন ছিল ঐ পরিকল্পনাব মর্মবস্তু। তাদের এই নয়া ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি মিশরে করতে চেয়েছিলেন।[২৫]

তিউনিসিযায ফাতেমীদের শাসন ব্যবস্থাব ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তিউনিসিযাকে মানসিক ও দৈহিকভাবে ত্যাগ করেই মুইজ মিশবে আগমন কবেন। তিউনিসের শাসন ব্যবস্থা তাদেব নয়া মিত্র সানহাজ বার্বারীদের হাতে ছেড়ে দেন, মুইজ সেখানে বিচাবক নিয়োগ এবং কর প্রশাসনের দায়িত্ব আপন উদ্যোগে রাখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বাস্তবে এই নিয়ম জিরী বা সানহাজ নেতাবা কখনো পালন করেন নি এবং মিশব হতেও কখনো তাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নি। সিসিলির শাসনভাব কালবিদেব হাতে ন্যস্ত করা হয়। ত্রিপলতানিয়াব দায়িত্ব ছিল কুতামা বার্বারীদের উপব। অবশ্য সাইরেনিকাব দায়িত্ব ফাতেমীদের হাতে ছিল। তত্ত্বগতভাবে মাগরিবে ছিল ফাতেমী সার্বভৌমত্ব, কিন্তু বাস্তবে যা ছিল তা পুরোপুরি স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। ৯৭৫ সালে জিরীরা ফাতেমীদেব খুবই প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেয়; ৯৮৩ সালে কায়রোতে কেবল উপঢৌকন প্রেরণ করে; ৯৮৭ সালে তারা ত্রিপলতানিয়া দখল করে; ১০১২ সালে সাইরেনিকার সকল দায়দায়িত্ব তাদের হাতে ছাড়তে হয়। ১০২৫ সালে তারা ইসমাইলী মতবাদ পরিত্যাগ করে; ১০৪৬ সাল হতে তারা ফাতেমীদের সার্বভৌমত্বের দাবি অস্বীকার করে এবং ফাতেমীদের প্রতি বৈরী আচরণ শুরু করে। ইতিমধ্যে জীরীরা তাদের জাতীয় স্বার্থ বৃদ্ধি করতে আফ্রিকা বাণিজ্যে অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণের জন্য ফাতেমীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়।[২৬]

মিশরে ফাতেমীরা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এরূপ শাসন কাঠামোর প্রধান স্থপতি ছিলেন ইয়াকুব বিন কিলিস। তিনি ছিলেন জনৈক ইহুদির সন্তান; জন্মগ্রহণ করেন বাগদাদে; মিশরে এসে মালিক কাফুরের অধীনে চাকরী করেন প্যালেস্টাইনে পরে তিউনিসিয়ায় চলে যান; এবং মুইজের সাথে মিশরে আগমন

করেন। সমগ্র শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু ছিলেন স্বয়ং ইমাম-যিনি বিশ্বে আল্লাহর প্রতিনিধি; তিনি সফল কর্তৃত্বের মালিক এবং সকলেই তার নিকট দায়ী। রাজ্যের সকল কার্যাবলীই তিনটি বিভাগে বিভক্ত; প্রশাসনিক; বিচার; মিশনারী বা ধর্মীয় প্রচারণা। শেষোক্ত বিভাগদ্বয় স্ব স্ব বিভাগীয় কর্মকাণ্ডেই সীমিত ছিল না। যেমন প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব ছিল বিচার করা কিন্তু তাকে টাকশাল তদারকির দায়িত্বও পালন করতে হত। প্রধান মিশনারী ছিলেন প্রধান বিচারপতির সমমর্যাদাসম্পন্ন। ফাতেমী রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রধান মিশনারীর একজন করে প্রতিনিধি থাকত। তাছাড়া সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেও তার প্রতিনিধি থাকত। মিশনারীর দু ধরনের কাজ ছিল; প্রথমত অভ্যন্তরীণভাবে দেশে শিক্ষা বিভাগ তাদের দায়িত্বে ছিল এবং তাঁর প্রতিনিধিদের তদারকির দায়িত্বও পালন করতে হত। তাঁর প্রতিনিধিদের প্রত্যেক ইসমাইলী সদস্যের নিকট থেকে প্রাপ্য কর/চাঁদা আদায় করতে হত। প্রধান মিশনারীকে বৈদেশিক দূতাবাস, বিদেশ সম্পর্ক এবং বৈদেশিক বাণিজ্য তদারকির দায়িত্ব পালন করতে হত। প্রশাসনিক বিভাগসমূহের প্রধানগণ একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে পরিচালিত হতেন। ঐ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বলা হত ওয়াসিত। তাঁব অবস্থান ছিল ইমাম এবং অন্যান্য প্রশাসকদের মধ্যবর্তী স্থানে। কোনো কোনো সময় ওয়াসিতকে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। এ সময় তিনি উজিরের পদমর্যাদা পেতেন। সামরিক বাহিনী সাধারণত কাজির অধীনে থাকত, তবে কখনো কখনো কমান্ডার ইন-চীফের অধীনেও থাকত। উজির অথবা ওয়াসিতকে কখনো কখনো প্রধান মিশনারীর দায়িত্বও পালন করতে হত; তবে এ ব্যবস্থা ছিল সাময়িক এবং আপৎকালীন সময়ের জন্য।[২৭]

৭.৬ ফাতেমী অর্থনীতি

মিশরে প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পর ফাতেমী সরকার দেশের অর্থনীতির প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। মিশর জয় করার পরপরই নানাবিধ খরচ মিটানোর তাগিদে জওহর ভূমি রাজস্ব দ্বিগুণ করেন। অবশ্য এটা ছিল সাময়িক ব্যবস্থা। দ্রুত স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে পদক্ষেপ নিতে হয়। এ ব্যাপারে ফাতেমীদের মতাদর্শগত সুবিধে ছিল। ফাতেমী খলিফা যেহেতু সরাসরি আল্লাহর প্রতিনিধি, তাই তিনি সাম্রাজ্যের সকল ভূমির মালিক। তিনি যাকে খুশি ভূমি দান করার অধিকারী ছিলেন। ভূমির উপর কারো ব্যক্তিমালিকানা সত্ব ছিল না। জমি যাদের দখলে ছিল ভূমির উপর তাদের সকলের মালিকানা বাতিল হয়ে যায়, তবে তাদেরকে জমি ব্যবহার করার অধিকার দেয়া হয়। কাউকে অযথা ভূমি থেকে উৎখাত করা হয় নি। ভূমির উপর ব্যবহার অধিকার বংশপরম্পরায় চলতে পারে। ভূমি ব্যবহারকারীরা ইউরোপীয় সার্ফের সাথে তুলনীয় এবং তাদের প্রদত্ত খাজনাকে বলা হয় কিরা। কর আরোপের জন্য জমি জরিপ করা হয়

এবং তৎকালীন নিয়মানুসারে কর নির্ধারণ করা হয়। কাবালা ভিত্তিতে ভূমি কর আদায় করা হয়। (প্রদত্ত এলাকার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়ার চুক্তিই হল কাবালা) মুইজের কাবালার সাথে মামুন প্রতিষ্ঠিত কাবালার পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। ১. মুইজের কাবালা নিলামের মাধ্যমে সম্পাদিত হত। এতে করদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ২. মুইজের কাবালাদার কর সমাজের লোক হওয়া আবশ্যিক ছিল না; বরং সরকারি কর্মকর্তা, সেনানায়করাও কাবালাদার হওয়ার অধিকারী হতেন। এমতাবস্থায় প্রায় ক্ষেত্রে এসব চুক্তি কর ইজারার সমগোত্রীয় হত। শক্তিশালী কাবালাদার এটাকে পুরুষানুক্রমিক রূপ দিতে পারত। এটা বস্তুত ইকতায় পরিণত হতে পারত। ৩. তৃতীয় পার্থক্যটি আরো মারাত্মক। মূল কাবালা অনুসারে চুক্তিকারীরা খাল, বাঁধ ইত্যাদি নষ্ট হলে তার মেরামতের কাজ করতে বাধ্য থাকত। এভাবেই দেশে সেচ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখা হত। অবশ্য মেরামতের কাজের জন্য তাকে অতিরিক্ত খরচ দেয়ার রেওয়াজ ছিল। ফাতেমীরা মিশরের কৃষি ব্যবস্থায় এ দিকের প্রতি উপেক্ষা করায় জাতীয় সেচ ব্যবস্থা দরিদ্র কৃষক পরিবারের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এর কুফল দেখা দেয়। মিশরে দুর্ভিক্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়; রাজস্ব হ্রাস পায়। মাকরেজী এ ব্যবস্থার নিন্দা করেন।[২৮]

ফাতেমীরা প্রথম হতে বাণিজ্য সচেতন ছিল। তাদের গোপন সংগঠনের বিস্তৃতি লাভ করে বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যের মাধ্যমে। তদুপরি তারা সর্বদা গ্রাম সমাজের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত ছিল। এ কারণে তারা প্রথম হতে একটি বাণিজ্য নীতি ও শিল্প নীতি অনুসরণ করে। তাদের বাণিজ্য নীতির দুটি উদ্দেশ্য ছিল; প্রথমত ইসলামি সাম্রাজ্যে প্রচুর শহুরে সম্পদ সৃষ্টি হয়; কিন্তু তাদের সম্পদদের উপর কোনো কর আরোপ করা হত না। ফাতেমীরা এদের উপর কর আরোপ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাদের বাণিজ্যনীতির আর একটি উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে সমগ্র দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা।

শহরে বন্দরে যে সব বৃত্তিজীবী কুটির শিল্পে নিয়োজিত থেকে শহুরে সম্পদ সৃষ্টি করেছিল তাদের উপর বা তাদের পণ্যের উপর নানা রকম কর আরোপ করে রাজ্যে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করা। শহরে তৈরি নানাজাতের পণ্যের উপর এই প্রথম কর ধার্য করা হয়। তাই শহরে কামার, কুমার, তাঁতি, চর্মকার, তৈলকার, মদ্য চোলাইকার, বেশ্যালয় ইত্যাদির উপর কর ধার্য করা হয়। তদুপরি কোনো শহরে যত রকম পণ্য প্রবেশ করে তার প্রত্যেকটির উপর কর আরোপ করা হয়। সমুদ্র তীরে মাছের উপর কর ধার্য করা হয়। গবাদি পশুর উপর কর আরোপ করা হয়, তার চারণ ভূমি অথবা পরিবহণে বা কসাইখানায়। প্রত্যেকটি আমদানি বা রপ্তানি পণ্যের উপরও কর আরোপ করা হয়। বস্তুত কোনো পণ্য, বাণিজ্য বা বৃত্তি ফাতেমী কর হতে অব্যাহতি পেত না-এবং এর জন্য তারা বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলে। মুসলিম অমুসলিম সবার উপর শুল্ক আরোপ করা হত।

ফাতেমীদের বাণিজ্য নীতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সর্বাধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ। এ উদ্দেশ্য সাধনে মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল খুবই অনুকূলে। আফ্রিকার পণ্য সামগ্রী ছিল ফাতেমীদের হাতের মুঠোয়, তারা ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য পারস্য উপসাগর ও লৌহিত সাগরের দিকে আকৃষ্ট করার সফল প্রচেষ্টা চালায়। ইসমাইলী মিশনারীরা ইয়ামেনে সক্রিয় থাকলেও তারা বিশেষ কোনো সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তবে ধীরে ধীরে এখানে তাদের সাফল্য আসে; ১০৪৮ সালে ইয়ামেনের ইসমাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। হেজাজে তারা কখনো শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। বস্তুত লোহিত সাগরের পূর্বতীরে তাদের রাজত্ব করার কোনো তাগিদ ছিল না। কেননা তার পশ্চিম তীরের ভারতীয় পণ্য কেনাবেচার জন্য ছিল সচেষ্ট। নুবীয় সহযোগিতা ফাতেমীদের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কেননা আফ্রিকা পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ ছিল।

বাণিজ্য উৎসগুলো পাওয়া সহজ; কিন্তু পণ্যের বাজার পাওয়া একটি কঠিন প্রক্রিয়া। ফাতেমীদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় সিরিয়ার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সিরিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ কোনো সহজ কাজ ছিল না বরং এ কাজ করতে গিয়ে ফাতেমীদের জন্য তা বুমেরাঙ হয়ে দেখা দেয়। ফাতেমীদের মিশর বিজয়কালে ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে বাইজানটাইনরা সিরিয়ার উত্তর সীমান্তে আগ্রাসন চালায় এবং তারা তুরান পর্বতমালার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়। বস্তুতপক্ষে এ সময় সিরিয়ার অবস্থা ছিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এই জনাকীর্ণ প্রদেশের প্রত্যেক নগর শহরে চলে স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ। এরূপ পরিস্থিতিতে সিরিয়ায় ফাতেমীদের উপস্থিতি এখানকার অবস্থা আরো জটিল করে তোলে।[২৯]

সিরিয়ার বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং বাইজানটাইনদের সাথে সংঘাত সত্ত্বেও ফাতেমী ও বাইজানটাইনদের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ হয় নি। সিরিয়ার বন্দরসমূহ সাইপ্রাসের মধ্য দিয়ে কনস্টাইটিনোপলের সাথে কারবার চালিয়ে যায়। বাইজানটাইন নৌবহর মালামাল নিয়ে কায়রোতে যাতায়ত করত। বাইজানটাইন সম্রাট দ্বিতীয় বেসিল আল আজিজকে (৯৭৬-৯৯৬ খ্রি.) মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। ইটালির নগর রাষ্ট্রগুলো বাণিজ্য ব্যাপদেশে কায়রো ও আলেকজেন্দ্রিয়াতে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এই বিকল্প দ্বিতীয় পথে বাণিজ্যিক সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে আল আজিজ সিরিয়া ফাতেমী সামরিক অবস্থানের উন্নতি সাধনে প্রাচ্য অঞ্চল হতে সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আজিজের এ পদক্ষেপ উজির ইয়াকুব বিন কিলিস পছন্দ করতে পারেন নি। বার্বার বাহিনীও এ পদক্ষেপ পছন্দ করে নি। যা হোক তার সেনা সংগ্রহ নীতির ফলে সেনাবাহিনীদ্বয়ের মধ্যে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তার মৃত্যুর পর সুদানী বাহিনীর প্রভাব বৃদ্ধিতে কায়রোর রাজনীতিতে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আজিজ ক্রীতদাসদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সেনা বাহিনীতে ভর্তি করেন। এটাই ছিল

দাস বাহিনীর প্রথম সূত্রপাত। তাদেরকে আবিদ বা আবদ বলা হতো না; মাকরেজি তাদেরকে তারাবি বলে অভিহিত করেছেন।[৩০]

মিশরে বিকাশমান বাণিজ্যের প্রয়োজনে বাণিজ্য পুঁজির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। যাদের নিকট পুঁজি আছে তাদের পুঁজির জটিল বিনিয়োগের যোগ্যতা নেই; যাদের পুঁজি বিনিয়োগের যোগ্যতা আছে তাদের আবার পুঁজি নেই। এরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে সুদি কারবার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ইসলামে ব্যবসা হালাল; কিন্তু রেবা (সুদ) হারাম। রেবা খুবই বিতর্কিত বিষয় হলেও বাগদাদের দীর্ঘ সুদিনে সুদের ব্যবসাটা জমজমাট ছিল। উদীয়মান মিশরে পুঁজির সংকট দেখা দেয়। আজিজ এর সমাধান খুঁজছিলেন। ব্যবসায়ের সাথে উত্তর আফ্রিকার অল্প সংখ্যক শিয়া পণ্ডিত সুদি ব্যবসা উৎসাহিত করেন। তারা বলতেন সুদি কারবার অন্য এক ধরনের ব্যবসা বৈ অন্য কিছু নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে কাজি নোমান সুদের আরেকটি নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে সুদ সমস্যার সমাধান দেন। তিনি বলেন ধরা যাক কেউ একশ স্বর্ণ মুদ্রা (দিনার) কর্জ নিয়ে একশ এক স্বর্ণ মুদ্রা (দিনার) ঋণদাতাকে প্রত্যার্পণ করে তবে নিশ্চয়ই ঐ এক স্বর্ণ মুদ্রা রেবা বলে গণ্য হবে এবং তা নিশ্চয়ই অবৈধ; কিন্তু কেউ যদি একশ রৌপ্য মুদ্রা (দিরহাম) এবং একটি স্বর্ণ মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করে ঋণদাতাকে প্রত্যার্পণের সময় দুশ রোপ্য মুদ্রা দেয় তবে এটা আদৌ সুদ হবে না–তা হবে ব্যবসা, এবং এ নিয়েমে পণ্য বেচাকেনা চলে।[৩১]

এটা ছিল মিশরে বাণিজ্য বিকাশ কৌশলের একটি দিক। তিনি রাজ্যের বাণিজ্য বিকাশের স্বার্থে আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেন। বাণিজ্য বিকাশে খ্রিষ্টান প্রজাদেরকে ব্যবহার করেছিলেন। এ সময় মিশরে কৃষিজীবীদের মধ্যে খ্রিষ্টান মেনোফেসাইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; কিন্তু কায়রো এবং আলেকজেন্দ্রিয়ার মালেকী বা গ্রীক গির্জার অনুসারী খ্রিষ্টানের ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। তিনি তার স্ত্রীর ভ্রাতা ওরেমটেসকে জেরুজালেম গির্জার প্রধান নিয়োগ করেন। এবং অন্য আরেক ভ্রাতা আরমেনিয়াসকে ৯৮৬ সালে কায়রোর প্রধান গির্জার প্রধান নিয়োগ করেন। এ ঘটনা অবশ্যই ফাতেমী শাসনের স্বরূপের নির্দেশক। তদুপরি খ্রিষ্টান প্রজাদের মাধ্যমে তাঁর রাজ্যে ও বাইজানটাইনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনার অবস্থা প্রকাশ পায়। এতে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধির সোপান হতে পারে।[৩২] আল হাকিমের সময় এ নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় মিশরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭.৭ আল হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.) : তাঁর শাসন নীতি ও পদ্ধতি

ইতিপূর্বে মিশরে ফাতেমী বংশের শাসননীতি ও পদ্ধতি এবং তাদের রণনীতি আলোচনা করতে গিয়ে আল মুইজের শাসনতান্ত্রিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা বাস্তবায়নে তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল আজিজের কর্মদ্যোগও আলোচিত হয়েছে। উল্লেখিত দু খলিফার সময় ফাতেমী

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে বাণিজ্য ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তৎকালীন যুগে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌছায়, Fatimid empire reached its zenith.[৩৩] কিন্তু তাদের রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় অচিরেই মিশরে যে সামরিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি হয় তার বড় দায়ভাগ পোহাতে হয় আল আজিজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী খলিফা আল হাকিমকে। ইতিপূর্বে তার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ তাকে উন্মাদ বলেছেন; তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন বলেই এক এক সময় অদ্ভুত আইনকানুন জারি করতেন; কখনো অমুসলিমদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেন; কখনো বা আবার তাদের ধর্মমন্দির ধূলিসাৎ করেন। অনেকে তাঁর আদর্শবাদিতা, উদারতা ও বদন্যতার প্রশংসা করে তাকে প্রতিভা বলে উল্লেখ করেন। একজন ঐতিহাসিক বলেন, তিনি মূলত মহান মামুনের সাজুয্যের দাবিদার ছিলেন।[৩৪] প্রফেসর হিট্টি তাঁর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার অনেক উদাহরণ দিয়েছেন : উজির হত্যা, গির্জা ধ্বংস করা, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদেরকে কালো পোশাক পরিধান ও গাধায় চড়তে বাধ্য করা ইত্যাদি নানা ধরনের শক্ত বিধান অমুসলিমদের উপর চাপান হয়। তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপের সহজ ব্যাখ্যা না থাকায় হিট্টি তাকে রহস্যময় ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৩৫] কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের অধ্যয়ন তাঁর সমসাময়িক সঠিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে করলে তাঁর মূল্যায়নে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় একই ব্যক্তিত্বকে যথাযথ পটভূমিতে উত্থাপন না করলে তাঁর কর্মকাণ্ডকে একেবারে বিপরীত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। প্রফেসর হিট্টি প্রদত্ত হাকিমের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তির প্রেক্ষিত উল্লেখ না থাকায় সহজে তাকে নিষ্ঠুর বা উন্মাদ বলতে দ্বিধা থাকে না। এ কারণে তাঁর কর্মকাণ্ডের সঠিক প্রেক্ষিত আলোচনার দাবি রাখে। উজির হত্যার ঘটনা কেন ঘটল? উল্লেখ্য আল-হাকিম নাবালক অবস্থায় এগারো বছর বয়সে খেলাফতে সামাসীন হন। এ সময়টি ছিল তার জন্য অশুভ। মুইজ এবং আজিজ ব্যাপক ভিত্তিতে ফাতেমী সেনাবাহিনী গঠনে যে নীতি অবলম্বন করেন এ ক্ষেত্রে তাঁর ফল ভাল হয় নি বরং প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য সেনাবাহিনীর মধ্যে এক নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। খলিফার নাবালকত্বের সুযোগ সদ্ব্যবহার করে কুতামী বার্বার সমর নেতারা সেনাবাহিনীতে প্রাচ্য সেনাদের বিরুদ্ধে এক শুদ্ধি অভিযান চালায় এবং আজিজের নিয়োগকৃত খ্রিষ্টান ওয়াসিতকে হত্যা করে বার্বারীদের গণ্যমান্য নেতা হাসান বিন আম্মারকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে। বার্বারীদের ধারণা হয়েছিল তারা যথেষ্ট শক্তিশালী। অথচ তারা বুঝতে পারে নি নীলনদের পানি ইতিমধ্যে কতদূর গড়িয়েছে। ইতিপূর্বে ফাতেমী শক্তি কাঠামোতে অনেক নয়া শক্তির উদ্ভব ঘটেছে। প্রাচ্য সেনা নেতারা বারজাওয়ানকে নয়া ওয়াসিত পদে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি খ্রিষ্টানদের (তারা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ) সাহায্যে দেশের প্রকৃত ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি সিরিয়া হতে কুতামা বার্বার সৈন্যদের বহিষ্কার করেন। বারজাওয়ানের শেষ একটি ইতিবাচক

কাজ ছিল ১০০১ সালে কনস্টান্টিনোপলের মিশরের দশ বছরের একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন। ইতিমধ্যে হাকিম ষোল বছর বয়সে পদার্পণ করলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের সকল কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু শক্তিধর বারজাওয়ান ছিলেন তার বড় বাধা। তাই তাকে হত্যা করা হয়। এটা ছিল একটা রাজনৈতিক ইস্যু; নিষ্ঠুরতা চরিতার্থ করার জন্য নয়। দু-স্বৈরাচার একখাপে রাখা সম্ভব ছিল না। যাহোক হাকিম ১০০০ সালে তাঁর মামা আরসেনিয়াসকে আলেকজেন্দ্রিয়া গির্জার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দান করেন। এ ঘটনায় অনেকে ভেবেছিলেন যে তিনি তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। মালেকি খ্রিষ্টানদের প্রতি তাঁর আচরণ প্রসঙ্গটি পরে আলোচিত হবে। এখানে এতটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, তাঁর মহান পিতার সময়ের বাস্তব অবস্থা তার সময় বিদ্যমান ছিল না। সম্ভবত অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ১০০৫ সালে সাইরেনিকায় মারাত্মক বিদ্রোহ হয়; আলেকজেন্দ্রিয়ায় বসবাসরত আরবরা তাদের প্রতি সমর্থন দেয়। যা হোক এ বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং বিদ্রোহী নেতা নুবিয়ায় পলায়ন করে। অবশ্য নুবীয় রাজা তাকে মিশর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে। সাইরেনিকায় সমস্যা অব্যাহত থাকায় তিউনিসিয়ার জীরীদের হাতে এখানকার শাসনভার অর্পণ করা হয়।[৩৬]

পূর্বে বলা হয়েছে যে, আল আজিজ কাবালা কৃষিনীতি গ্রহণ করেন। এই কৃষি নীতিতে একটি মারাত্মক দুর্বল দিক ছিল। এটা হল সেচ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের পুরো দায়িত্ব কৃষকের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। অথচ মিশরে সেচ ব্যবস্থা ছিল চিরকালই সামষ্টিক তথা সরকারি ব্যাপার, সাধারণ কৃষকের ক্ষমতার বাইরে। তাই আল আজিজের কৃষিনীতির ফলে অল্প দিনের মধ্যে যদি সেচ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, নীল নদের খাল-নালা ভরাট হয়ে যায়, অসময় বন্যা দেখা দেয় অথবা খরায় ফসল নষ্ট হয় তাতে আশ্চর্যের কি আছে? এতে খুব স্বাভাবিকভাবে চাষবাস হ্রাস পায়, আবাদি ফসল ও আবাদি জমি যদি হ্রাস পায় তাহলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় অনিবার্যভাবে। বিগত ত্রিশ বছরের সেচ ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষার ফলে এদেশের চরম সংকট দেখা দেয়। দুর্ভাগ্যবশত আল হাকিমকে এরূপ চরম অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করতে হয়। সংকট সমাধানের তাৎক্ষণিকভাবে এমন কিছু পদক্ষেপ তাকে গ্রহণ করতে হয় যে জন্য বাহ্য দৃষ্টিতে তাকে পাগল বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন-এরূপ মন্তব্য করার পূর্বে তিনি যে অবস্থায় পতিত হন সে বাস্তব অবস্থাটির অনুধাবন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তৎকালীন বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর পদক্ষেপগুলি বিবেচ্য। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কি চাচ্ছিলেন? তিনি চাচ্ছিলেন খাদ্য দ্রব্যের যথেষ্ট সরবরাহ অব্যাহত রাখতে; যতদূর সম্ভব দ্রুত অবনতিশীল কৃষি উৎপাদন উৎসাহিত করতে। তিনি তাঁর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ক. মধ্যপান ও মদ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ; খ. কায়রো নগরের চারিপাশ হতে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র ধ্বংস করা গ. লিউপিন নামক কলাই জাতীয় উদ্ভিদ, ওয়াটারক্রেস নামক উদ্ভিদ (এ

দুটি ক্ষুধা/রুচিবর্ধক উদ্ভিদ) এবং আইশ ছাড়া এক ধরনের মৎস্য আহার নিষিদ্ধ এবং ঘ. শিকারী কুকুর ব্যতীত সকল কুকুর হত্যা করার আদেশ দান।[৩৭]

আমাদের আলোচ্য সময়ে যে দেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ স্বল্প এবং রুটিই প্রধান খাদ্য সে দেশের মধ্যদিয়ে মদ চোলাই বা আঙ্গুর দিয়ে মদ তৈরি করা চলতে দেয়া চলে না। মদ্য কেবল গুটিকতক ধনিক লোকের জন্য প্রয়োজন। একই কারণে কায়রোর পার্শ্ববর্তী এলাকায় আঙ্গুর চাষের পরিবর্তে আবাদি জমিতে খাদ্য শস্য ফলান একান্ত কাম্য। বস্তুত তাঁর অনেকগুলি নিষেধাজ্ঞার মর্মবস্তুই আবাদি জমিতে খাদ্য শস্য ফলান। যে মাছ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয় ঐ সময় তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণের একটি ভূমিকা ছিল। একই অর্থনৈতিক কারণে কুকুর হত্যার আদেশ দেয়া হয়। সে যুগে এদের জন্য আলাদা টিনজাত খাদ্য দেয়া হত না এদেরকে রুটি খেতে দেয়া হত।[৩৮] তাঁর আর একটি নিষেজ্ঞাও মজার। তিনি রুটিখানায় আটা তৈরির কাজে মানুষের পা ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। এর পশ্চাতে জনস্বাস্থ্য স্বার্থ জড়িত ছিল।[৩৯] কৃষির অবনতি ঠেকানোর জন্য কৃষকদের উপর থেকে কয়েক প্রকার করও মওকুফ করেন তিনি। তবে তিনি কাবিলা ব্যবস্থা আদৌ রহিত করেছিলেন কি-না তা জানা যায় না। সম্ভবত তা করেন নি, কেননা এতে কায়েমি স্বার্থ মহল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত এবং তারা ক্ষিপ্ত হলে খিলাফত টিকে থাকা সম্ভব ছিল না।

৭.৮ অ-শিয়াদের প্রতি ফাতেমী দৃষ্টিভঙ্গি

খ্রিষ্টান, গির্জা এবং বাইজানটাইন এর প্রতি আল হাকিমের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ কি? তাদের প্রতি কি তিনি সব সময় একই রকম নীতি অনুসরণ করেন? সকলেই স্বীকার করবেন যে, তার রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায় তিনি তাঁর মহান পিতা আল আজিজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি ১০০০ সালে তাঁর মামা আরসেনিয়াসকে আলেকজেন্দ্রিয়ার গির্জার প্রধান বিশপের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অন্য এক খ্রিষ্টান মামা জেরুজালেমের মঠাধাক্ষ্য ওরেটিস কনস্টান্টিনোপলের সাথে দশ বছরের এক চুক্তি সম্পাদনে অবদান রাখেন। পরবর্তীকালে তাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক ব্যাপার। এর পশ্চাতে আর যাই হোক ধর্মীয় অসহনশীলতার কোনো লক্ষণ কাজ করে নি। কোনো স্বৈরাচারী প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে এ রকম কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি বরদাস্ত করতে পারে না। ফাতেমী রাজ্যে মালেকী গির্জার অনুসারীরা খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে বেশ সুবিধাভোগী প্রভাবশালী সমাজে পরিণত হয়। তিনি এটা পছন্দ করতেন না। দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করার সময় তিনি অনুভব করেছিলেন যে মনোফিস্টীয় কিবতি খ্রিষ্টান কৃষকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা অথচ তারা বহু সরকারি সুযোগসুবিধা বঞ্চিত। কৃষি পুনর্বাসনে তাদের সমর্থন ও সহানুভূতিই তাঁর একান্ত

কাম্য। এটা তিনি অনুধাবন করেই দেশের রাজনীতিতে মালেকী গির্জার প্রভাব হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমেই খ্রিষ্টান রাজ্য মাতার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন; এর পর বিভিন্ন মালেকী গির্জার দেবোত্তর সম্পত্তিও ধ্বংস করেন এবং ১০০৯ খ্রি. জেরুজালেমের প্রধান গির্জাও গুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দান করেন। এই আদেশনামায় স্বাক্ষর ছিল তাঁর খ্রিষ্টান সেক্রেটারি ইবনে আব্দনের। ১০১০ খ্রি. তাঁর অন্যতম প্রভাবশালী মামা আরসেনিয়াসকে হত্যার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাঁর খামখেয়ালীপনা চরিতার্থ করার কোনো মতলব কাজ করে নি বরং এগুলো ছিল ঠাণ্ডা মাথায় রাজনৈতিক চিন্তাপ্রসূত। তিনি তাঁর মাতা ও গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং মালেকীদের প্রভাবকেন্দ্র জেরুজালেম গির্জা ছাড়া অন্য কোনো গির্জা ধ্বংস করেন নি এবং গির্জার অনুসারীদের উপরও আক্রমণ চালান নি। তিনি মালেকী গির্জাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। অবশ্য তাঁর এ নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক কিবতি খ্রিষ্টানদের সহানুভূতি ও সমর্থন কামনাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কিবতি কৃষকদের উপর হতে অনেক রকম কর প্রত্যাহার করেন এবং এতে তারা সন্তুষ্ট হয়েছিল বলে জানা যায়।[৪০]

মালেকী খ্রিষ্টানদের প্রতি আল হাকিমের বৈরী আচরণ বাইজানটাইন সরকার ভাল চোখে দেখে নি। উভয় দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। যা হোক এর প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী আরব গোত্রের মধ্যে। তারা বিদ্রোহ করে মক্কার জনৈক আলাবীকে আমিরুল মোমেনিন পদে অভিষিক্ত করে। অবশ্য এ ঘটনা বেশি দূর গড়ায় নি। ১০১৫ খ্রি. বাইজানটাইন সম্রাট দ্বিতীয় বেসিল ফাতেমীদের সকল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেদ করে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল। এর ফলে ফাতেমী বাণিজ্যে অবক্ষয় দেখা দেয়। ফাতেমী বাণিজ্যিক অবক্ষয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় ডেকে আনে।

মালেকী খ্রিষ্টানদের সাথে আল হাকিমের সম্পর্ক অবনতিশীল হলেও দেশের সুন্নি ও ইসমাইলী সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। খ্রিষ্টানদের তুলনায় সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও মূলত তারাই ছিল তার শক্তি কাঠামোর সামাজিক ভিত্তি। এ জন্য সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১০০৮ সালে তিনি তাঁর ধর্মীয় নীতি প্রকাশ করেন। তিনি অইসমাইলীয়দের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেন। সুন্নিদের জন্য পীড়াদায়ক কতগুলো ইসমাইলীয় রীতি ও প্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এতে গোড়া ইসমাইলীয়রা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; কিন্তু তিনি সাহসিকতার সাথে তাদেরকে দমন করেন এবং তাদের নেতা কাজি নোমান পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১০১২ সালে তিনি ইমাম উপাদি ত্যাগ করেন এবং কেবল আমিরুল মোমেনিন উপাধি ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, প্রজা-জনতা শাসকের

দাস হিসাবে পরিচিত হবে না। পরের বছর ইসমাইলী মনোনয়নের মৌল বিধি জ্যেষ্ঠতার নীতি বর্জন করে তার এক পিতৃব্য পুত্রকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তার আদর্শগত প্রশ্নে এরূপ বিপ্লবী পরিবর্তনে অনেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। এর বেশ পার্শ্বক্রিয়া হয়। তার অন্ধ অনুসারীদের অনেকে ভাবতে শুরু করে যে, তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে দেবত্ব লাভ করেছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে ১০১৭ সালে শিয়া ইসমাইলীদের মধ্যে দ্রুত আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। অবশেষে ১০২১ সালে তাঁকে হত্যা করে ধরাধাম হতে সরিয়ে দেয়া হয়। সম্ভবত তিনি এ্যাসাসিনদের দ্বারা নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় ইসমাইলী মতাদর্শের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়; কিন্তু পুরনো রূপ পায় নি কখনো। তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি; সিরিয়ার সমস্যা বৃদ্ধি পায়, বাণিজ্যিক উন্নতি হয় নি; কৃষির অবনতি রুদ্ধ হয় নি; ফাতেমী সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা আসে নি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উদার পৃষ্ঠপোষক আল হাকিম নির্জনতা ভালোবাসতেন এবং রাত্রি বেলা ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। প্রায়ই তিনি মোকাত্তমা পাহাড়ের চূড়ায় নির্জন গৃহে গমন করতেন। তিনি সেখানে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন না উপাসনা করতেন এবনে খলদুন তা নিশ্চিত করে বলতে পারেন নি। অভ্যাস মত সে দিন দুজন সহচর নিয়ে সেখানে যান এবং পর্বতের পাদদেশে তাদেরকে বিদায় দেন-আর তিনি ফিরে আসেন নি। কয়েক দিন পর জানা গেল পাহাড়ে তার টাট্টু ঘোড়ার সামনের পা দুটো তরবারি দিয়ে কাটা; অদূরে চৌবাচ্চায় ছুরিকা দ্বারা বিদীর্ণ তার জামা; যার বোতামগুলো আটকানো অথচ লাশের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। এভাবে সমাপ্ত হয় তাঁর রাজত্বকাল।[৪১]

৭.৮ মিশরে ফাতেমী বংশের অবক্ষয় ও পতন (১০২১–১১৭১ খ্রি.)

ফাতেমী খলিফা আল হাকিমের মৃত্যুর পর প্রায় ১৫০ বছর ধরে ফাতেমী বংশ মিশরে টিকে থাকে সত্য; কিন্তু রুগ্ন অবস্থায়। আল হাকিমের জীবদ্দশায় দেশের অবক্ষয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঘটে যায়-সে সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। পুনশ্চ এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, প্রথমত আজিজের কৃষিনীতির কুফল আল হাকিমের সময় দেখা দেয়, তবে হাকিম অবশ্য তাৎক্ষণিক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সাময়িক বিপর্যয় ঠেকান সম্ভব হয়; যেহেতু আজিজের কৃষিনীতিতে কোনো মৌলিক সংস্কার পরিকল্পনা ছিল না তাই পরবর্তীকালে কৃষির ব্যর্থতার ফলে সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত মালেকী খ্রিষ্টানদের প্রতি হাকিমের বৈরী নীতি এবং জেরুজালেমের প্রধান গির্জা ধ্বংস করায় বাইজানটাইন সরকারের সাথে মিশরের রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং মিশর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে তার অর্থনীতি আরো বিপর্যয়ের মুখে পতিত

হয়। তৃতীয়ত ব্যাপক ভিত্তিতে আজিজের ফাতেমী সেনাবাহিনী সংগঠনের নীতি সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারায় সেনাবাহিনী ফাতেমী শক্তি উৎস না হয়ে আরো অবক্ষয়ের কারণে পরিণত হয়। সেনাবাহিনী দ্বিধাবিভক্ত ও আত্মকলহে নিমজ্জিত হয়। এসব অভ্যন্তরীণ কারণে মিশরে দীর্ঘ দিন সামাজিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করতে থাকে। তদুপরি মুস্তানসিরের রাজত্বকালের শেষ দিকে পশ্চিম এশিয়ায় দুটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটে; প্রথমত ইউরোপের ক্রুসেডারগণ জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য পশ্চিম এশিয়ায় ঝাপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘদিন ধরে ক্রুসেড চাপিয়ে দেয়; দ্বিতীয়ত এ সময় নয়া সেলজুক শক্তির উত্থান ঘটে এবং তারা এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া দখল করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত ছিল এবং তারা তত্ত্বগতভাবে সুন্নি ইসলামের প্রবক্তা ছিল। মিশরে এরূপ আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থা এবং পশ্চিম এশিয়ায় নয়া শক্তির উত্থানের প্রেক্ষাপটে ফাতেমীদের ১৫০ বছরের ক্ষয়িষ্ণু মিশরের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বিবেচনার দাবি রাখে। পুনশ্চ পশ্চিম এশিয়ার ঘটনা পরম্পরায় তার দ্রুত পতন না ঘটিয়ে তার অবক্ষয় দীর্ঘায়িত করে মাত্র।

খলিফা আল হাকিমের পর ক্ষয়িষ্ণু মিশরের নিম্নলিখিত খলিফাগণ ইমামত ও খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন :

৭. আজ জহির (১০২১-১০৩৫ খ্রি.)
৮. আল-মুস্তানসির (১০৩৫-১০৯৪ খ্রি.)
৯. আল মুস্তালী (১০৯৪-১১০১ খ্রি.)
১০. আল আমীর (১১০১-১১৩০ খ্রি.)
১১. আল হাফিজ (১১৩০-১১৪৯ খ্রি.)
১২. আজ জফির (১১৪৯-১১৫৪ খ্রি.)
১৩. আল ফাইজ (১১৫৪-১১৬০ খ্রি.)
১৪. আল আজীদ (১১৬০-১১৭১ খ্রি.)

অবক্ষয়ী যুগে ফাতেমী বংশের উল্লেখিত আটজন খলিফার কেউ শাসনকার্য বা রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাদের প্রায় সকলেই বাল্যাবস্থায় ক্ষমতায় সমাসীন হয়েছিলেন। কাজেই দেশের শাসন ক্ষমতা দু'এক ক্ষেত্রে অভিভাবকের এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়াসিত বা উজিরের হাতে চলে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ইমামত পদই হয়ে উঠে হাস্যকর। খলিফা এবং ইমাম নিছক পুতুলে পরিণত হওয়ায় দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয় উজির পদ এবং এ পদের জন্য লড়াই চলে দেশের অভিজাত শ্রেণীর বিভিন্ন উপদলের মধ্যে। এই ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে সামরিক বাহিনীর দল উপদল তথা বার্বার-তুর্কী এবং সুদানী বাহিনীর সদস্যরাও জড়িয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় ঐ দীর্ঘ দিনের মিশরীয় রাজনীতিতে দেশের স্বার্থের স্থানে দলীয় বা ব্যক্তিগত

স্বার্থই প্রাধান্য পায়। এ কারণে ফাতেমী সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি প্রবল হয়। এর অবক্ষয় রোধ করার প্রশ্ন হয় অবান্তর।

হাকিম প্রয়াত হলে তাঁর পুত্র আবু হাশিম আলীকে আজ জহির উপাধিতে ভূষিত করে খেলাফতে অধিষ্ঠিত করা হয়। তখন তার বয়স ছিল ষোল বছর। তার নাবালকত্বের সুযোগে তার ফুফু সিত্তুলমুলক প্রায় ৫ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। সিত্তুলের মৃত্যুর পর সিজাদ ও নাফির নামক হাকিমের দুজন আমলা শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ সময় সিরিয়ার বড় একটা অংশ কায়েমী শাসন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সালেহ বিন মিরদাস নামক জনৈক আরব সর্দার আলেপ্পো ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।[৪২] খলিফা জহিরের সময় গোঁড়া ইসমাইলী মতাদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়; কিন্তু এরূপ ইমাম কি পূর্ব মর্যাদা লাভ করতে পারে? তাঁর সময় ফাতেমী সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়। আজ জহির বাইজানটাইন সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের নিকট হতে তাঁর রাজ্যের মসজিদে খলিফার নামে খোতবা পাঠের অনুমতি পেয়েছিলেন এবং কনস্ট্যান্টিনোপল মসজিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুমতি লাভ করে। এর বিনিময়ে জেরুজালেমে খলিফা আল হাকিমের ধ্বংসকৃত হোলিসিপালচারের পুনর্গঠনের অনুমতি দিতে হয়। আজজাহির ১০৩৬ সালে প্রয়াত হলে তাঁর পুত্র আবু তামিম মায়াদ আল মুস্তানসির উপাধি ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় (১০৩৬-১০৯৫ খ্রি.) খেলাফত আসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁর মাতা (যিনি একদা ছিলেন সুদানী ক্রীতদাসী) তার বিক্রেতাসহ তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে সকল ক্ষমতা ভোগ করেন।[৪৩]

তাদের অপশাসনে সাম্রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধির দ্রুত অবনতি ঘটে এবং অবক্ষয় প্রক্রিয়া দ্রুত হয়। ফাতেমী সাম্রাজ্য মিশরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১০৪৩ খ্রি. হতে সিরিয়া পুরোপুরি ফাতেমীদের হাত ছাড়া হয়ে যায়; প্যালেস্টাইনে বিদ্রোহের পালা চলে; সেলজুকরা এ সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় আছড়ে পড়ে; ১০৪৭ খ্রি. মক্কা-মদিনা আল মুস্তানসিরের আনুগত্য অস্বীকার করে এবং এর পাঁচ বছর পর ইফ্রিকিয়ার জিরীবংশীয় মুইজ বিন বাদিস ফাতেমীদের অধিকার নাগপাশ বিছিন্ন করে। মুস্তানসিরের নামে খোতবা পাঠ বন্ধ করে দেন এবং আব্বাসী খলিফা আল কায়িমকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা বলে স্বীকার করেন।[৪৪] মুস্তানসিরের খেলাফতের এরূপ সংকটকালে বাগদাদে খলিফা কায়িমের বিরুদ্ধে আল বাসাসিরি বিদ্রোহ করলে অল্পদিনের জন্য মনে হয়েছিল যে মুস্তানসিরের অনুকূলে ঘটনার মোড় নিচ্ছে। বাগদাদ খলিফার রাজপোষক, রাজদণ্ড, পাগড়ি, ধর্মীয় মঞ্চ মিশরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাগদাদ প্রভাবাধীন সকল মসজিদে মুস্তানসিরের নামে খোতবা পাঠ করা হয়। বাগদাদের সুন্নি মুসলিমদের স্বীকৃতি ছিল ক্ষণস্থায়ী। বাসাসিরি স্বয়ং পরাজিত ও নিহত হন। বাগদাদে আল কায়িম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। এটাকে কি ফাতেমী সামাজ্যের বিস্তৃতির উচ্চ পর্যায় বলা চলে?

শাবান যথার্থই বলেন "If that was the high water mark of Fatimid expansion one wonders what would be considered the low water mark."[৪৫]

সমগ্র অবস্থাটা ছিল হাস্যকর। মুস্তানসিরের রাজত্বের শেষ দিকে আরেকটি ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে। এ সময় ফাতেমী সেনাবাহিনীর বার্বার, তুর্কী ও সুদানী জোয়ানদের মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে তুর্কী সেনাশক্তি নাসির কায়রো অধিকার করে। ১০৬৮ খ্রি. খলিফার প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়। সেনাবাহিনীর মধ্যে এরূপ সংঘর্ষ ফাতেমী বংশকে দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে নেয়।

প্রাসাদ লুণ্ঠনের পর সাত বছর স্থায়ী বড় আকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই ভয়াবহ ও মহামারী দুর্ভিক্ষে মিশর জনশূন্য হয়ে পড়ে। শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিকল হয়ে যায়। এই ঘোরতর বিপর্যয়কালে খলিফাকে সাহায্য করার জন্য আক্রার সামরিক শাসনকর্তা আর্মেনিয় বংশোদ্ভূত বদর আল জামালিকে কায়রোয় ডেকে পাঠান হয় এবং তাকে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। নব নিযুক্ত আমিরুল জুয়ুশ রাজ্যে বহু কষ্টে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং ফাতেমী খিলাফতের সাময়িক নব জীবন দান করে। এতদসত্ত্বেও তিনি এবং তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মন্ত্রী মালিকুল আফজাল সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেও ফাতেমী অবক্ষয় রোধ করতে পারেন নি। মুস্তানসিরের পরবর্তী ফাতেমী খলিফাদের রাজত্বকালে উজির পদ নিয়ে চলে কাড়াকাড়ি। প্রতিটি পদপ্রার্থীকে সমর্থন যোগায় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন উপদল।

১০৯৪ খ্রি. খলিফা মুস্তানসিরের মৃত্যুর পর বদরে জামালির পুত্র মন্ত্রী মালিকুল আফজাল স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়াত খলিফার কনিষ্ঠ পুত্র আল মুস্তালীকে খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিযার অসন্তুষ্ট হয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তার আশ্রয়ে আলেকজেন্দ্রিয়ায় পলায়ন করেন এবং সেখানে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা দেন। মালিকুল আফজাল দ্রুত বিদ্রোহ দমন করেন। পুনশ্চ মালিকুল আফজাল খলিফা মুস্তালীর পাঁচ বছর বয়স্ক পুত্রকে আল আমির উপাধিতে ভূষিত করে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। আমিরের বয়োপ্রাপ্তিকাল পর্যন্ত আফজাল দৃঢ়ভাবে দেশ শাসন করেন। এবং দেশে শান্তি বজায় রাখেন। তার পুত্র শরফুল মায়ালী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কয়েকবার সাফল্য অর্জন করলেও উপকূলবর্তী নগরগুলো ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। এদিকে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে খলিফা আমির উজিরের অভিভাবকত্বে অতিষ্ঠ হয়ে কৌশলে তাকে হত্যা করেন। আমিরও কয়েক বছর পর ফিদায়ী দ্বারা নিহত হন।[৪৬] আমিরের মৃত্যুর পর তাঁর রানি সন্তানসম্ভবা থাকায় তার পিতৃব্যপুত্র আবুল মায়মুন আবদুল মজিদ আল হাফিজ উপাধিতে ভূষিত হয়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্মকাল পর্যন্ত অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। সন্তানটি মেয়ে হওয়ায় আল হাফিজ নিজেকে খলিফা ও ইমাম বলে ঘোষণা করেন। জনসাধারণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু মালিকুল আফজাল পুত্র উজির আবু আলী আহমদ তাঁকে পদচ্যুত ও বন্দি করেন এবং

ইসনা আশারার শেষ ইমামের নামে ক্ষমতা দখল করেন। আল হাফিজ কারাগার হতে চক্রান্ত করে আবু আলী আহমদকে হত্যা করে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে এবার তিনি উজির আমিরুল জুয়ুশ ইয়ানিসের ক্রীড়নকে পরিণত হন। পুনশ্চ হাফিজ ইয়ানিসকে হত্যা করে বিরহাম নামক জনৈক আর্মেনীয়কে উজির পদে নিযুক্ত করেন। অন্য এক রাজকর্মকর্তার রিজওয়ানের সাথে মন্ত্রী বিরহামের কলহে কায়রো অশান্ত হয়ে ওঠে; এমতাবস্থায় মন্ত্রী বিরহামকে হাফিজ বন্দি করেন এবং রিজওয়ানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। আমলাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে হাফিজ আমৃত্যু আর কাউকে উজির নিয়োগ করেন নি।[৪৭]

১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হাফিজের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আবু মনসুর ইসমাইল আজ জাকির উপাধি ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু শাসন কাজে অবহেলা করলে তাঁর মন্ত্রী আবুল হাসান আলী ইবনুস সালার আল মালিকুল আদিল উপাধি ধারণ করে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। মন্ত্রী মালিকুল আদিল ইবনুস সালার বেশি দিন ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন নি। সম্ভবত আল জাকিরের ইঙ্গিতে ইবনুস সালার তার পুত্র আব্বাস কর্তৃক নিহত হন এবং আব্বাস আজজাকিরের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। যা হোক কায়রোর এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভূমধ্যসাগর তীরের বিখ্যাত সুন্দর বন্দর নগরী আসকালান ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। মন্ত্রী আব্বাসের পুত্র নসর খলিফা আজ জাকিরকে হত্যা করেন। কিন্তু সকল দোষ চাপান হয় আজ জাকিরের ভ্রাতা জিব্রাইল ও হউসুফের উপর। যথাসময়ে তাদেরকে ঐ অভিযোগে হত্যা করে জাকিরের শিশুপুত্র আবুল কাসেম ইসাকে আল ফাইজ উপাধিতে ভূষিত করে খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এভাবে আব্বাস রাজ্যের সর্বেসর্বা হওয়ার জন্য পাকাপোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ষড়যন্ত্রের রাজ্যে কি কারো ক্ষমা আছে? জাকিরের বোনদের নিকট ষড়যন্ত্র ফাঁস হলে তারা মিশরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা তালাইয়ে বিন রুজিকের নিকট খলিফা হত্যার প্রতিশোধের আহবান জানান। তালাইয়ে কায়রো আক্রমণ করলে আব্বাস ও নসর কায়রোর বিপুল ধনরত্ন নিয়ে সিরিয়ায় পলায়ন করে। ইতিমধ্যে আজ জাফিরের বোনেরা আসকালানের ক্রুসেডারদের বড় অংকের টাকার পুরস্কারের বিনিময়ে আব্বাস ও নসরকে ধরে দেওয়ার আহবান জানান। ক্রুসেডাররা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। আব্বাস ক্রুসেডারদের সাথে এক যুদ্ধে নিহত হন। নসরকে বন্দি করে কায়রো পাঠানো হয়। তালাইয়ে আল মালিকুস সালিহ উপাধি ধারণ করে উজির পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল ফাইজের মৃত্যু হয়; রাজপরিবারের বয়স্কদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি সকলেই উজির মালিক আস সালিহ হাফিজের ভ্রাতুষ্পুত্র শিশু আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আলীকে সিংহাসনে বসান এবং তাঁকে আল আজিদ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মালিক আস সালিহ মিশরের সকল কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। যে পথে তার আগমন হয় নির্বাসনও হয় একই পথে। তিনি ইবনে খালদুনের মতে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হন। অবশ্য

তার পুত্র রুজ্জিক আল মালিকুল আদিল উপাধি ধারণ করে ১১৬৪ সালে শিশু খলিফার উজির পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনিও শাওয়ার আসসাদী কর্তৃক পদচ্যুত হন।[৪৮] শাওয়ার অচিরেই কায়রোর ষড়যন্ত্রে নিপতিত হন। উল্লেখ্য এ সময় জেরুজালেমের রাজা আমালরিক আপনাকেও কায়রোর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ফেলেন এবং যেহেতু এ সময় মিশর ইউরোপীয়দের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাই জেরুজালেম ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে মিশর বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। শাওয়ার কায়রো ষড়যন্ত্রের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দামাসকাস সরকার প্রধান নুরুদ্দীনের সাহায্য কামনা করেন। নূরুদ্দীন শেরকুহকে তার সাহায্যার্থে কায়রো প্রেরণ করেন। শেরকুহের সাহায্যে ক্ষমতায় ফিরে এসে শাওয়ার ফ্রাঙ্করাজা আমলরিকের সাহায্য প্রার্থনা করে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং শেরকুহ আলেকজেন্দ্রিয়া দখল করে। অবশেষে ফ্রাঙ্ক ও শেরকুহের মধ্যে এক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে আমলরিক মিশর হতে সৈন্যবাহিনী তুলে নিয়ে যাবে এবং কায়রোর রাজনীতিতে আর হস্তপেক্ষ করবে না; শেরকুহও পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে আলেকজেন্দ্রিয়া ত্যাগ করে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু শাওয়ারের সাথে এক গোপন চুক্তি অনুসারে ফ্রাঙ্করা কায়রোতে একজন প্রশাসক রাখার, কয়েকটি নগর দখলে রাখা এবং বার্ষিক এক লাখ স্বর্ণ মুদ্রা কর গ্রহণের অধিকার লাভ করে। এটা ছিল শেরকুহের সাথে সম্পাদিত চুক্তির বরখেলাপ। তদুপরি এ সময় ক্রুসেডারদের আচরণ এতই অসহ্য হয় যে, খলিফা আল আজিজ স্বয়ং নূরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। খলিফার আবেদনে সাড়া দিয়ে নূরুদ্দীন শেরকুহকে মিশর অভিযানে প্রেরণ করেন। ১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে শেরকুহ কায়রো প্রবেশ করলে খলিফা তাকে ত্রাণকর্তারূপে স্বাগত জানান। শাওয়ার নিহত হয়। খলিফা শেরকুহকে প্রধানমন্ত্রী ও আমীরুল জুয়ুশ নিযুক্ত করেন। দুমাস পর শেরকুহের মৃত্যু হলে তদস্থলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দিন অধিষ্ঠিত হন।[৪৯] ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে আল আজিজের মৃত্যুর সাথে সাথে কায়রোর ফাতেমী বংশের অবসান ঘটে এবং আয়ুবী বংশের গোড়াপত্তন হয়।

উপরের আলোচ্য সময়ে ইবনুল আসির মিশরের অবস্থার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। যার হাতে ক্ষমতা থাকত তিনিই মিশরের উজির হতে পারতেন; খলিফা ছিলেন ক্ষমতাহীন; উজিরই ছিলেন ক্ষমতাবান; আল আফজালের পর যুদ্ধ-হত্যাকাণ্ড ব্যতীত কেউই উজির পদ লাভ করে নি। উসামা বলেন, কায়রো বিদ্রোহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ষড়যন্ত্র, পাল্টা ষড়যন্ত্র ও অরাজকতার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের জন্য রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।[৫০]

৭.১০ ফাতেমী মিশরের সাংস্কৃতিক অবদান

সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি মুসলিম মতবাদের বিপরীতে তাদের নিজস্ব প্রচার কলাকৌশলে জনমত গঠনের সাথে শক্তি প্রয়োগ করেই ফাতেমী বংশ প্রথমে তিউনিসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত

হয়। মিশর ছিল তাদের সামরিক বিজয়ের ফলশ্রুতি। মিশরে তারা তাদের মতাদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ ধর্ম গঠন করে। কেবল মিশর ইফ্রিকিয়ায় নয় ,সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় তাদের স্মৃতি হয়ে আছে। আব্বাসীদের মত ফাতেমী খেলাফতে কোনো নির্বাচনী উপাদান ছিল না। তত্ত্বগতভাবে ফাতেমী খলিফা ও ইমাম ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। তিনি মানুষের উপর ইহলৌকিক ও আধ্যাত্মিক শাসন পরিচালনা করেন আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার বলে। তাই ফাতেমী খলিফা ইমামের সার্বভৌমত্ব ছিল নিরঙ্কুশ এবং নির্ভেজাল স্বৈরতন্ত্রী। মিশরে এরূপ আদর্শ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন আল মুইজ, আল আজিজ এবং তাদের মন্ত্রী ইবনে কিলীস। বাহ্যত তাদের প্রশাসনিক কাঠামো আব্বাসী মডেলের অনুরূপ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মর্মবস্তু ছিল প্রাচীন পারস্যের আদলে প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে সুন্নি রাষ্ট্রতাত্ত্বিক নিজামুলমুলক তুসী অনেকখানি এরূপ একটি রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। ফাতেমীদের প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থার একটি ম্যানুয়েল রেখে গেছেন কালকাশান্দি। তাদের এরূপ আদর্শ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনীর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। বস্তুত তাদের সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই অল্প। মিশরে ফাতেমী প্রশাসনের আমিরুল জুয়ুশ নামক পদটি বাগদাদ-কায়রোর শাসন পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সূচক। এই পদের অধিকারী একাধারে উজির এবং প্রধান সেনাপতি। এ কারণে প্রথম দশজন খলিফা তাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষা করলেও অবক্ষয়ের যুগে খলিফা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে একেবারে নগণ্য হয়ে পড়েন। তিনটি প্রধান পদের সমন্বয়ে তাদের সামরিক বাহিনী গঠিত; ক. আমীরগণ অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এবং খলিফার সশস্ত্র প্রহরী; খ. প্রহরা কর্মকর্তাগণ–এটি গঠিত হত উস্তাজ এবং নুপুংশক দিয়ে; গ. বিভিন্ন নামধারী বাহিনী যেমন হাফিজিয়া, জুয়ুশিয়া সুদানীয়া। এসব নামকরণ হয় খলিফা, উজির বা আঞ্চলিক জাতিসত্তার নামের অনুকরণে। প্রাচীন পারস্য রাষ্ট্র কাঠামোর উজির ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ফাতেমী উজির ছিলেন দু ধরনের ক. সর্বোচ্চ উজির হতেন সশস্ত্র, (Men of Sword), যিনি সেনাবাহিনী, যুদ্ধ অধিদপ্তর, প্রাসাধ্যক্ষ এবং চেম্বারলেনদের উপর খবরদারি করতেন। তিনি বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে রাজদরবারে উপস্থিত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। খ. আরেক ধরনের উজির ছিলেন উচ্চ বুদ্ধিজীবী (আহলুল কলম) এরা ছিলেন কাজি, মোহতাসিব ও খাজাঞ্চী, বাদবাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারি কর্মচারীদের নিম্নস্তরের বুদ্ধিজীবী (আহলুল কলম) বলা হয়।[৫১] বস্তুত অভিজাত আমলা ও সেনাবাহিনী সমন্বয়ে ছিল ফাতেমী শাসক শ্রেণী। মিশরে ফাতেমী কৃষিনীতির ফলে জনতার সিংহভাগ কৃষক বা ফাল্লাহের অবস্থান ছিল সার্ফদের মত। রাজপরিবার, শাসক শ্রেণী ও দাস সার্ফ নিয়েই ছিল ফাতেমী মিশর।

ফাতেমীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল কায়রো নগর। মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে কায়রো ছিল বাগদাদ ও কর্ডোভার সাযুজ্যের দাবিদার।

মন্ত্রী জওহর ছিলেন এই বিজয়ী নগরীর রূপকার। মিশর বিজয়ের পর খলিফা মুইজের অভ্যর্থনার জন্য এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুইজের মিশরে আগমনের পূর্বেই এই নগবেব নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এ নগরের চর্তুদিকে গড়ে উঠে চমকপ্রদ হর্মরাজি। নগরের মধ্যে ছিল অসংখ্য সড়ক ও রাস্তা। শহরতলীর দিকে প্রসারিত রাস্তাগুলিকে বলা হত হাবাত; নগব প্রাকাবের মধ্যকার রাস্তগুলিকে বলা হত তরিক। দ্বাদশ চত্ববিবিশিষ্ট খলিফার বিশাল প্রাসাদ আল কাসরুলকবিরুশশায়খ অবস্থিত ছিল কায়বোব পূর্বাঞ্চলে। একে কাসরুল মুইজিও বলা হত। দশটি ফটকের মধ্য দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হত। ফটকগুলি ছিল সুরক্ষিত। এই নগরের অভিজাত আমিরদের অট্টালিকাগুলি রাজপ্রাসাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। শহর ও শহরতলীতে খলিফার বাগ-বাগিচা ছিল সুবিশাল এবং নয়নাভিরাম। বাগান বাড়িগুলি ছিল রুচিশীলভাবে সুসজ্জিত। বিশাল বিশাল মসজিদ হাসপাতাল এবং সরাইখানা নগরের শোভা বর্ধন করে। কাযবো নগরের জামে আল আজহার, জামি উল হাবিব, জামি উল মুইজ ছিল খুবই বিখ্যাত এবং আকর্ষণীয় ও ফাতেমী স্থাপত্যের নিদর্শন। কায়রোতে কাববালাব স্মৃতিচাবণেব জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় হুসনী দালান। শহরের বিভিন্ন অংশে মেয়ে-পুরুষের জন্য ছিল পৃথক পৃথক সুদৃশ্য স্নানাগার। সুদৃঢ় প্রাচীব দ্বাবা নগরীটি ছিল বেষ্টিত এবং প্রাকারে ছিল বাবুল নসব, বাবুল ফাতহ এবং বাবুল কানতারা ইত্যাদি নামক সুশোভিত তোবণ।[৫২]

এই বিজয়ী নগরীতে রাজপরিবাব ও অভিজাত শাসক শ্রেণী যে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন তা বলাই বাহুল্য। ফাতেমী স্বর্ণযুগ মুইজের সময় হতে আরম্ভ হয়ে আজিজের যুগে গৌরবের শীর্ষ শিখরে আরোহণ করে এবং আল মুস্তানসিরের সময় পর্যন্ত মিশর তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম অগ্রগামী দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়। শিয়া ধর্ম প্রচারক নাসিরী খসরু ১০৪৬—৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশবে অবস্থান করেন। তিনি মিশরের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রচণ্ড অবক্ষয়ের পূর্ব মুহূর্তের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনাকালেও রাজপ্রাসাদে ৩০ হাজার ব্যক্তি বাস করতেন। প্রাসাদের ফটকগুলোতে পাহারারত থাকত পাঁচশত পদাতিক ও পাঁচশত অশ্বারোহী। প্রায় বারো হাজার ভৃত্য প্রাসাদের ফাইফরমায়েশ খাটত। তিনি খলিফা আল মুস্তানসিরকে একটি উৎসবের দিনে একটি খচ্চরে আরোহণ করে মিছিলে অংশগ্রহণ করতে দেখেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন শুভ্র কোফতান ও পাগড়ি পরিহিত। খলিফার মাথার উপর মূল্যবান পাথরখচিত চাঁদোয়া শোভা পাচ্ছিল। খলিফার ছিল ইটের নির্মিত পাঁচ ছয় তলা বিশিষ্ট গৃহ, ২০ হাজার বিপণী। প্রতি দোকানগৃহ মাসিক ২-১০ দিনারে ভাড়া দেয়া হত। বাজারগুলো ছিল নানা জাতের পণ্যে থরে থরে সাজানো এবং জমকাল। রাস্তাগুলো পাকা এবং আলোকসজ্জিত।[৫৩] নাসিরি খসরুর ধারণা ছিল মুস্তানসির ছিলেন সবচেয়ে ধনী। মাকরেজী তাঁর সম্পত্তির একটি তালিকা

প্রদান করেছেন।[৫৪] নাসিরি তার এক মন্তব্যে বলেন: I Could neither.....nor estimate its wealth and moreover have I seen such prosperity as I soaw there.[৫৫]

শিক্ষা-সংস্কৃতি, সেবা এবং বাণিজ্য ছিল শিয়া ঐতিহ্য। তাদের ঐতিহ্য অনুসারে প্রথম দিকের প্রায় সকল ফাতেমী খলিফা-ইমাম ছিলেন যথার্থই সংস্কৃতিবান। খলিফা আল আজিজ ছিলেন একজন কবি এবং শিক্ষানুরাগী। তিনি আজহার মসজিদকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। খলিফারা প্রায়শই জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক সভা আহ্বান করতেন। অধ্যাপক, নৈয়াকার, গণিতজ্ঞ, আইন ও চিকিৎসা বিশারদ এ সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। আল আজিজের দরবারে ফকিহ বা আইনবেত্তাদের প্রাধান্য ছিল, যদিও তাদের অনেকেই কবি বা ঐতিহাসিক ছিলেন। এ কথাও সত্য যে, ফাতেমী খলিফাগণ কট্টর শিয়া হওয়ায় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কায়রো গমনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। আল আজিজের মন্ত্রী ইবনে কিলিসও একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ব্যয় বাবদ মাসে এক হাজার দিনার বরাদ্দ করতেন। একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক মোহম্মদ তামিম তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।[৫৬]

ফাতেমীদের আর একটি সৃষ্টি ছিল দারুল হিকমাহ্ বা দারুল ইলম্। খলিফা আল হাকিম ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কলেজ, সাধারণ গ্রন্থাগার, গণিত বিষয়ক যন্ত্রপাতি এবং বহু পেশাদার নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। এই জ্ঞানভাণ্ডারটির দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল; এর লিখন সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত। এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বড় আকারের তহবিল সৃষ্টি করা হয়। দারুল হিকমাহ্ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল একটি বিশাল গৃহ; সেখানে ইসমাইলী গুহ্যতত্ত্বে দীক্ষা নিতে ইচ্ছুকদের নিয়মিত শিক্ষা দেয়া হত। প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বুধবার এই প্রচারণা দপ্তরের উজির বা প্রধান কাজি দায়ী উদ্-দাওয়াত একটি সভা আহ্বান করতেন। শুভ্র পোশাক পরিহিত শিক্ষার্থীরা এখানে আসন গ্রহণ করতেন। দীক্ষাদানের পূর্বে প্রধান দায়ী ইমাম খলিফার নিকট গমন করতেন এবং তাঁর বক্তব্য তাঁকে পড়ে শোনাতেন। ইমাম-খলিফার অনুমোদনক্রমে দায়ীর পাঠদান সমাপ্ত হলে শিষ্যরা তার হস্ত চুম্বন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।[৫৭]

দারুল হিকমাহ্র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল লাইব্রেরি। এই রাজকীয় গ্রন্থাগারটি শুরু করেন খলিফা আল আজিজ। ক্রমান্বয়ে এই বৃহৎ গ্রন্থাগারে প্রায় দু লাখ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এতে ২৪.০০ সুশোভিত কোরআন ছিল; ইবনে মুকালাহর বিখ্যাত লিপিবিদদের নকলকৃত বহু পাণ্ডুলিপি জমা ছিল। তাবারীর হস্তাক্ষর সম্বলিত ইতিহাস

গ্রন্থটি রক্ষিত ছিল। ১০৬৮ সালের ঘটনায় লাইব্রেরিটা লুণ্ঠিত হলে বর্ণনাকারীরা ২৫টি উটকে পুস্তক বহন করতে দেখেন। এই লাইব্রেরির পুস্তকের পৃষ্ঠা অনেক তুর্কী কর্মকর্তাদের গৃহে আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, এবং এর চামড়া তাদের দাসদের জুতা মেরামত করার কাজে লাগান হয়। মুস্তানসিরের উত্তরাধিকারী লাইব্রেরিটা পুনর্গঠিত করেন। গাজী সালাহউদ্দিন তখনো এতে প্রায় এক লাখ পুস্তক দেখতে পান।[৫৮]

ফাতেমী খলিফা আল হাকিম জ্যোর্তিবিদ্যার প্রতি সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি আল মুকাত্তিমে একটি বিজ্ঞান মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বয়ং অনেক সময় এ মান-মন্দিরে কাটাতেন। তার দরবারে শোভাবর্ধন করেন তৎকালীন মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোর্তিবিদ আলী বিন ইউনুস এবং মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ ও চক্ষু বিশারদ আবুল হাসান আলী ইবনে হাইসাম যিনি পাশ্চাত্য জগতে আল হাজেস নামে খ্যাত ছিলেন। আলী বিন ইউনুস তাঁর মৌলিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা রচিত জ্যোর্তিবিদ্যা বিষয়ক সারণিতে তৎকালীন প্রচলিত ভ্রান্তিগুলো দূরীভূত করেন।[৫৯]

আবু আলী আল হাসান অংক, জ্যোতিবির্দ্যা এবং দর্শনের উপর প্রায় একশখানা পুস্তক রচনা করেন; তবে তিনি বিশ্বে খ্যাত হয়েছিলেন কিতাবুল মানজির শীর্ষক চক্ষু বিষয়ক পুস্তকটির রচয়িতা হিসাবে। পুস্তকটি দুষ্প্রাপ্য হলেও ক্রেমনার জেরার্ড (Gerard of Cremona) এর সময় অথবা তার পূর্বে অনুবাদ করা হয় এবং ১৫৭২ সালে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশ করা হয়। মধ্যযুগে চক্ষু বিজ্ঞান বিকাশে পুস্তকটি বিশেষ অবদান রাখে। মধ্যযুগে চক্ষু বিষয়ে সকল গবেষক ও লেখক তার উক্ত পুস্তকের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন। রোজার বেকন, লিওনার্দো দ্যা ভিন্সি এবং জোনাস্ন কেপলার-এর উপর এই পুস্তকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐ পুস্তকে ইউক্লিড এবং টলেমির তত্ত্বের বিরোধিতা করা হয়। গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে চক্ষু হতে আলোক রশ্মি দৃশ্যমান বস্তুতে পতিত হয় বলে আমরা বস্তু দেখতে পাই। তিনি শরীরতাত্ত্বিক (anatomical) এবং জ্যামিতিক প্রমাণ দ্বারা বলেছিলেন যে মূলত দৃশ্যমান বস্তু হতে আলোকরশ্মি চোখের উপর পতিত হওয়ায় আমরা দেখতে পাই। তিনি পরীক্ষা-নীরিক্ষা দ্বারা ম্যাগনিফাইংলেন্সের তত্ত্বের আবিষ্কারের নিকট পৌছে গিয়েছিলেন, যা ইটালিতে তিনশ বছর পর আবিষ্কৃত হয়।[৬০]

খলিফা আল হাকিমের সময় আম্মার বিন আলী মৌসিলী মুনতাখাব ফি ইলাজিল আয়েন শীর্ষক একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে লেখক তার সমসাময়িক ইবনে ইসার তাজকিরা হতে অধিক মৌলিকত্ব প্রদর্শন করেন; যদিও তাজকিরাটি চক্ষু বিদ্যার বিশ্বকোষের মত।

মধ্যযুগে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে ফাতেমীদের অবদান একেবারে নগণ্য নয়।

তথ্যপুঞ্জি

১. Hitti, op cit. p. 617
২. Ibid. op cit. p. 617
৩. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৯
৪. ঐ পৃ. ৬৮২
৫. Shaban, M. A. Islamic Histy Vol 2,
৬. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮২
৭. ঐ পৃ. ৫৮২
৮. Shaban, op cit. p. 188
৯. Hitti, op cit. p. 618
১০. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৪
১১. Shaban, op cit. p. 191
১২. Ibid. pp. 191-2
১৩. Ibid. p. 192
১৪. Ibid. p. 193
১৫. Ibid. p. 193
১৬. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৫–৬
১৭. Shaban, op cit. p. 194
১৮. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৪
১৯. ঐ পৃ. ৫৮৭–৮৮
২০. ঐ পৃ. ৫৮৯
২১. ঐ পৃ. ৫৯১–৯২
২২. Ibmul athir, Izzudden al Kamilfi tharilch edly tornberre (Radn 1966017) Vol. VIII. p. 389
২৩. Shaban, op cit. p. 198
২৪. Ibid. p. 198
২৫. Ibid. p. 198-9
২৬. Ibid. p. 199
২৭. Ibid. p. 200
২৮. Ibid. p. 201
২৯. Ibid. p. 203-4
৩০. Ibid. p. 204
৩১. Al Qadi al Nwman, Ktabal Istisar, ed. M. W. Mirign, (Damas 195)
৩২. Shaban, op cit. p. 206
৩৩. Hitti, op cit. p. 620
৩৪. Maqrizi, Ahmad b. ali, Ittias. al- Humafa, ed. ed. M. Hilmi ahmmad Vol. II. p. 17

৩৫. Hitti, op cit. pp. 620-21
৩৬. Shaban, op cit. p. 207
৩৭. Ibid. p. 207
৩৮. Ibid. pp. 207-8
৩৯. Marrisi, Khitat Vol I pp. 188-211
৪০. Ibnial-Athir, Lzzaldın, al Kánil tial Tarclch, ed. C. G. Torrbag (Hecdin 1866-7.) Vol ix p. 88
৪১. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩–৯৪
৪২. ঐ পৃ. ৫৫৪
৪৩. Hitti, op cit. p. 621
৪৪. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫
৪৫. Shaban, প্রাগুক্ত, 9-211
৪৬. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮
৪৭. ঐ পৃ. ৫৯৫
৪৮. ঐ পৃ. ৬০১–২
৪৯. ঐ পৃ. ৩৩৮–৯
৫০. ঐ পৃ. ৬০০
৫১. Hitti, op cit. p. 627
৫২. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩–৪
৫৩. Marreri, Vol. II p. 64
৫৪. Hitti, op cit. p. 626
৫৫. Ibid. p. 226
৫৬. Ibid. p. 228
৫৭. আমীর আলী, পৃ. ৬০৬–৭
৫৮. Hitti, op cit. p. 629
৫৯. Ibid. p. 628
৬০. Ibid. p. 629

অষ্টম অধ্যায়

বাগদাদে বুওয়াইহী সামরিক স্বৈরতন্ত্র (৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.) : ইসলামি বিশ্বে এক নতুন ধারার প্রবর্তন

৮.১ পূর্বকথন

ইতোপূর্বে বাগদাদে আব্বাসী কেন্দ্রীয় সরকারের অবক্ষয় এবং এর পতন প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে যুগপৎ আব্বাসী কেন্দ্রীয় সরকারের পতন এবং দাইলামি বুওয়াইহীদের অভ্যুদয় প্রাচ্য খেলাফত বা আরব সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক নবতর অধ্যায় সংযোজিত হয়। বুওয়াইহীদের বাগদাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ছিল অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাগদাদের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থায়ী হয় একশ বছরের উপর (৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.)। এই দীর্ঘ সময় নিম্নলিখিত খলিফাগণ নামকাওয়াস্তে খেলাফতের আসন অলঙ্কৃত করেন।

১. আলমুস্তাকফী (কয়েকসপ্তাহ ডিসেম্বর ৯৪৫-জানুয়ারি ৯৪৬ খ্রি.)
২. আল মুত্তাকী (৯৪৬-৭৪ খ্রি.)
৩. আত তাই (৯৭৪-৯৯১ খ্রি.)
৪. আল ক্বাদির (৯৯১-১০৩১ খ্রি.)
৫. আল ক্বায়েম (১০৩১-১০৫৫ খ্রি.)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আব্বাসী সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে মরোক্কোতে ইদ্রিসী বংশ, (৭৮৮-৯৭৪ খ্রি.) মিশরে আগলাবী বংশ (৮০০-৯০৯ খ্রি.), তুলুনী বংশ (৮৬৮-৯০৫ খ্রি.), ইখশিদ বংশ (৯৩৫-৯৬৯ খ্রি.), এবং ফাতেমী বংশ (৯৬৯-১১৬০ খ্রি.), সিরিয়ায় হামদানী বংশ (৯২৯-১০০৩ খ্রি.), প্রাচ্য অঞ্চলে তাহেরী বংশ (৮২০-৮৭৪ খ্রি.); সাফফারী বংশ (৮৬৭-৯০৮ খ্রি.) এবং সামানী বংশ (৮৭৪-৯৯৯ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। এ সব খুদে বংশের মধ্যে ইদ্রিসী, রুস্তামী এবং ফাতেমী বংশ আব্বাসীদের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক না রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ফাতেমী যুগে কায়রো স্বতন্ত্র তৃতীয় আরব সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়। আব্বাসী বিপ্লবের সাথে সাথে স্পেনে উমাইয়ারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্ডোভায় দ্বিতীয় আরব সংস্কৃতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এ সময়ে ইসলামি উম্মায় বহুকেন্দ্রিকতার আদর্শই প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বংশের প্রতিষ্ঠাতারা প্রথমে ছিলেন আব্বাসী সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আপন আপন কর্মস্থল প্রদেশে স্বাধিকার বা স্বাধীনতা অর্জন করে। কেন্দ্রের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের। এক্ষেত্রে বুওয়াইহীদের

অবস্থান ছিল অনন্য। তারা ফাতেমীদের মত আব্বাসী প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলে নিজদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নি বরং খেলাফতের মূল কেন্দ্রভূমি এবং বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র বাগদাদ তাদের পদানত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং বাস্তবে স্বয়ং খলিফাকে আশ্রিতের মর্যাদায় নামিয়ে আনে। খেলাফতের সনাতনী ধারণার পাশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা সালতানাতের নয়া ধারণা প্রবর্তনের সূচনা করে। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

আব্বাসী ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহে বুওয়াইহীদের উত্থানে কি তাৎপর্য নিহিত ছিল তা উপলব্ধির জন্য একত্রে ক্ষুদে বংশগুলোর পুনরুল্লেখ করা হল এবং একই সাথে বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশধারার বিশেষ মৌলিক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হল। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে তার অন্তর্নিহিত একটি সার্বজনীন প্রবণতা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়; তা হল সকল শক্তির কেন্দ্রীভবন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ—এরূপ পরস্পরবিরোধী প্রবণতা বা ঝোঁক ঐ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অপরিহার্য উপাদানের উপস্থিতি। আব্বাসী ইতিহাসে ঐ ঐতিহাসিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আব্বাসী বংশের মোতাওয়াক্কিল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তথা খলিফার সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল; এরপর বিচ্ছিন্নতাবাদ সর্বত্র মাথাচাড়া দেয়; কেন্দ্রের শক্তি শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আব্বাসী যুগে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে ইদ্রিসী, ফাতেমী এবং হামদানীরা ছিল আরব জাতি গোষ্ঠীর লোক; কিন্তু অন্যরা সবাই ছিল অনারব প্রতিনিধি। উল্লেখ্য যে, প্রাচ্যের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনতা আব্বাসী বিপ্লবের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দেয়। আব্বাসী সরকারের সাথে সহযোগিতার পথ ধরে ধীরে ধীরে তারা তাদের আত্মপরিচিতি লাভ করে এবং স্থানীয় স্বার্থ সচেতন হয়ে ওঠে। তারা তাদের মেধা, দক্ষতা ও চাতুর্য দিয়ে স্বাধীকার ও স্বাধীনতা অর্জন করে। এটাই ছিল বহুজাতিক (Multi national) প্রাচ্য আরব সাম্রাজ্যের ক্ষুদে জাতিসত্তাসমূহের বিকাশের সাধারণত ধারা। বুওয়াইহীরা এক নবতর ধারার দিক নির্দেশনা দেয় এবং ক্ষুদে জাতিসত্তার বিকাশধারাকে বেগবান করে। ক. আরব জাতির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য তারা অস্বীকার করে নি সত্য, কিন্তু তাদের আর্থ-সামাজিক সংগঠনে আরব নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ছুড়ে ফেলে দেয়। খ. আরব খেলাফতের পাশে প্রাচ্য জাহানদারি বা সালতানাতের ধারণার বীজ বপন করে। পরবর্তীকালে এ ধারণাটি মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এভাবে বুওয়াইহীরা আরব ইতিহাসে তৎকালীন অবস্থায় মৌলিক রূপান্তর ঘটায়।

ইসলামি উম্মার ইতিহাসে বুওয়াইহীরা সর্বপ্রথম আরব বিশ্ব ও পারস্য বিশ্ব ও দ্বিবিধ জাতিগত নয়া মানচিত্রের উদ্বোধন করে। তাদের উত্থানে আব্বাসী সাম্রাজ্যের (বাস্তবে তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও তার আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল)

মানচিত্র দুটি প্রধান ভূভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উভয় অংশের মধ্যে এক কাল্পনিক ছেদ রেখা টানা যেতে পারে। রেখাটি উত্তরে জ্যাগ্রস পর্বতমালার পশ্চিম ঢাল দিয়ে দক্ষিণে পারস্য উপসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত অঙ্কন করা যায়। এই কাল্পনিক রেখার পূর্বে তৎকালীন ইরানি বিশ্বের অবস্থান ছিল। কালক্রমে ইরানি বিশ্বের পূর্ব উত্তর পাশ ঘেঁসে তুর্ক-তুরানি বিশ্বের বিকাশ ঘটে। পূর্বাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ঐক্য সংহতি না থাকলেও আব্বাসী বিপ্লবের পর হতে ক্রমশ তা স্বকীয় পরিচিতি লাভ করে। উক্ত রেখাটির পশ্চিম গা ঘেঁসে শুরু হয় আরব বিশ্ব। আরব বিশ্ব বাস্তবে শতধা বিচ্ছিন্ন হলেও এর মনায় অস্তিত্ব সর্বদাই প্রবল। নিঃসন্দেহে আরব বিজেতারা ইরাক অতিক্রম করে চীন সীমান্ত পর্যন্ত তাদের প্রভাববলয় বিস্তৃত করে; কিন্তু ইরানের পূর্বাঞ্চলকে তারা পূর্বাঞ্চল বলে অভিহিত করে। বস্তুত এ অঞ্চলটি পরবর্তীকালে তুরানি বিশ্ব বলে পরিচিত হয়ে ওঠে। স্মরণ করা যেতে পারে, অঞ্চলটি আরবদের বিজয় মুহূর্ত হতে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। অঞ্চলটি শাসিত হয় বিজেতা-বিজিতদের মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি দ্বারা।[১] সাসানীদের মূল স্নায়ু কেন্দ্র পশ্চিম ইরান অনেকাংশে আরবিকৃত (Arabisized) হয়ে পড়ে। তাই আরব প্রাধান্যের দু শতাব্দী ধরে দাস্তে কবীরের উত্তরে তাবাসেয়ন ছিল আরব সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অঞ্চলের প্রবেশদ্বার। তাহেরীদের প্রাধান্যের যুগে উক্ত প্রবেশদ্বার পশ্চিমদিকে রায়নগর পর্যন্ত সঙ্কুচিত হয়, অর্থাৎ আজমদের প্রভাববলয়ের বিস্তৃতি ঘটে। দাইলামি বুওয়াইহীরা উক্ত প্রবেশদ্বারটি রায় হতে একেবারে ইরাক সীমান্তে এনে ঠেকিয়ে দেয়। এ কাল্পনিক রেখা হতে আধুনিক আরব বিশ্ব বিদ্যমান। দাইলামি উত্থানে এরূপ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভৌগোলিক রূপান্তর সংগঠিত হয়।[২] বলাই-বাহুল্য এরূপ ভৌগোলিক বিভাজন প্রাচ্য জাতি সত্তাসমূহের বিকাশের পথ প্রশস্ত করে।

৮.২ বুওয়াইহীদের পরিচয় ও উত্থান; বাগদাদে তাদের প্রাধান্যের স্বরূপ

বুওয়াইহী দাইলামিদের পরিচয় কি? তাদের আদি আবাস ভূমি ছিল ক্যাসপিয়ান সাগর উপকূলে আলবুরজ উচ্চ মালভূমি এবং তাবারিস্তান গাইলানের মধ্যবর্তী এলাকা। এই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সাসানি যুগ এমন কি আরব প্রাধান্যের যুগেও তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখে।[৩] প্রাচীনকালে তাদের কোনো কোনো গোত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এরূপ অনেক রাজ পরিবার সাসানিরাজ বাহরাম গোরের বংশধর বলে গৌরববোধ করত। অনেক গোত্র শাসিত হত তাদের গোত্রপতি দ্বারা; অর্থাৎ সমাজ বিকাশের ধারায় তারা নানা পর্যায়ে আটকে ছিল বহু দিন ধরে। তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা এতই প্রবল ছিল যে, তাদের অনেকে তাদের পিতৃভূমি পরিত্যাগ করতে চাইত না। অনেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেও একেবারে ছিন্নমূল হতে পছন্দ করত না। মুসাফিরি দাইলামিরা তাদের আবাসভূমি ত্যাগ না করে ককেসাস অঞ্চলে তাদের প্রভাব বহুদিন অক্ষুণ্ন রাখে। উমাইয়া অথবা আব্বাসী খলিফারা এ অঞ্চলের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

করতে ব্যর্থ হয়। কিছুসংখ্যক স্বল্প খ্যাতিমান দাইলামি গোত্রপতি আরব প্রাধান্যের যুগে তাদের অনুগামীদের নিয়ে আদি আবাস ভূমি ত্যাগ করে পূর্বদিকে গমন করে এবং সামানি বংশের অধীন সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। এই প্রথম তারা উন্নত সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। এরা অবশেষে তাবারিস্তান ও জুরজানে প্রবশে করে জিয়ারী দাইলামী বংশ প্রতিষ্ঠা করে। তাবারিস্তানে তারা সর্বপ্রথম জায়দী শিয়া ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে তাদের সামাজিক বিকাশধারা নয়া গতিবেগ পায়।[৪] তাবারিস্তানে জিয়ারী দাইলামিদের প্রাধান্যের যুগে আবু সুজা বুওয়াইহীর নামানুসারে দাইলামিদের এক নতুন পরিবারের উত্থান হয়। জিয়ারী বংশ প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা ছিল প্রবল। অথচ জিয়াবী প্রধানরা এই উদীয়মান পরিবারের সাথে বেশি দিন সুসম্পর্ক রাখতে ব্যর্থ হয়। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা আবু সুজা বুওয়াইহী এবং তার প্রতিভাবান তিন পুত্র আলী, হাসান এবং আহমদ। জিয়ারী প্রধান মারদাভিজ এই পরিবারের বীরত্বে মুগ্ধ হযে আবু সুজার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলীকে জাবাল প্রদেশের কারাজ এর গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি আলীব আনুগত্যের প্রতি সন্দিহান হয়ে তাব নিয়োগ বাতিল কবেন। এ কাবণে আলী বিদ্রোহ করে এবং দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে বাগদাদের খলিফা আল কাহিরের সেনা ছাউনী উড়িয়ে দিয়ে ফারেস দখল করেন। যাহোক আলী জিয়াবীদের প্রতি অধিকতর শত্রুতা না করে বরং মারদাভিজেব সাথে সন্ধি করেন এবং তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা হাসানকে জিয়ারী সরকারের কর্তৃত্বে সমর্পণ করেন। অচিরেই জিয়ারী সবকার প্রধান নিহত হলে বুওয়াইহীদের নিজস্ব ভাগ্য নির্মাণের সুযোগ আসে। হাসান ও তার বন্দিদশা হতে মুক্ত নয়। আবু সুজার তিন পুত্র ইতিমধ্যে কয়েক শ লোক নিয়ে গড়ে তোলে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী। তাদেব এ ক্ষুদ্র বাহিনীর দিগ্বিজয়ে সাফল্য দেখে দাইলামিদের অনেকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যাহোক হাসান দ্রুত রায় ও জাবালে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহমদ ৯৩৫ ও ৩৬ সালের মধ্যেই কিরমান ও আহওয়াজ দখল করেন। এভাবে দ্রুততার সাথে বুওয়াইহী পরিবারের নেতৃত্বে পারস্যের বিপুল এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে এক নয়া পারস্য সাম্রাজ্য। সিরাজ নগরী হয় নয়া রাজ্যের রাজধানী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তারা দক্ষিণে সমতল ভূমিতে অবতরণ করেই ইরান ভূমি তাদের নিজস্ব বলে ভাবে তাই নয়–বরং দ্রুত আরব সংস্কৃতি আত্তীকরণ করে এবং ফারেসের ইরানিদের ইরাকের আরবিকৃত ইরানিদের উপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারের মনোভাব গড়তে অনুপ্রেরণা জোগায়। এই সময় হতে বস্তুত ইরানিরা ধীরে ধীরে ইতিহাস সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। ইরানের ঐক্য প্রক্রিয়া চলার সঙ্গেই ইরানি বিশ্বও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।[৫]

তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা। তারা ছিল আঞ্চলিক স্বার্থ সচেতন; তারা তাদের প্রভাব বলয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার নীতি গ্রহণ করে। পারস্যে তাদের বিজিত অঞ্চলকে তিন

ভাগে বিভক্ত করে তিন ভ্রাতাকে এক এক অঞ্চলের প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে ছিল রায় জাবাল প্রদেশ এলাকা; হাসানের নেতৃত্বে ছিল ফারেস। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহমদের অধীনে ছিল কিরমান, আহওয়াজ ও খুজিস্তান। এভাবে ইরানে তাদের বিজিত এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বুওয়াইহী রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Buyid confederacy)[৬]।

বাগদাদ দখলে নেতৃত্ব দেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহমদ। শাবান মনে করেন যে, আহমদের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য। এ অঞ্চল হতে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রচণ্ড সুযোগ ছিল। বাগদাদ ছিল হাতের নাগালে। তাই বাগদাদের পতনের দিন ঘনিয়ে আসে।

পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঐ নয়া শক্তির অভ্যুদয়ে স্বাভাবিকভাবে বাগদাদ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বাগদাদের তখন পর্যন্ত যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাও নয়া হুমকির সম্মুখীন হয়। খলিফা রাজির আমিরুল উমারা বাজকাম উদীয়মান শক্তির বিরুদ্ধে এক অভিযানের নের্তৃত্ব দেন, কিন্তু রাজধানী বাগদাদে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে আর অগ্রসর না হয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। বুওয়াইহীরা তাদের নবগঠিত সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করার সময় ও সুযোগ পায়। বুওয়াইহীরা এ সময় বাগদাদ দখলের জন্য আদৌ অস্থির হয় নি-অথবা বাগদাদের তথা কথিত আমিরুল উমারা পদের প্রতি কোনো মোহ থাকার কথা নয়। তাই তারা বাগদাদ সম্পর্কে অপেক্ষা করে এবং দেখ-এ নীতি অবলম্বন করে। বাগদাদের সংকট এতই ঘনীভূত হচ্ছিল যে, তা বুঝতে তাদের আদৌ কষ্ট হয় নি। বাগদাদ নগরের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রের কারণেই ৯৪১-৪২ সালে বাগদাদ হামদানী কতৃত্বাধীন হয়। বহুজাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত বাগদাদ নগরীর শাসন কোনো আরব পরিবারের পক্ষে আর সমম্ভব ছিল না; সেনাধ্যক্ষ তুজুন বলপূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলে বেচারা খলিফা তাকে আমিরুল উমারা পদ দিয়ে অভিনন্দিত করেন। ঘটনা এখানে থেমে থাকে নি। তুজুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে দেখে খলিফা মুত্তাকি বাগদাদ ত্যাগ করে রাক্কায় গমন করেন। মিশরের ইখশিদ অধিপতি অথবা সিরিয়ার অধিপতি হামদানি কারো প্রতি আস্থা রাখতে না পেরে খলিফা বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তুজুন খলিফাকে অন্ধ করে খেলাফত হতে অপসারণ কারেন। ৯৪৪ সালে মোস্তাকীর ভ্রাতুষ্পুত্র আল মুস্তাকফী খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। তুজুনের মৃত্যুর পর বাগদাদের অবস্থার প্রচণ্ড অবনতি ঘটে। বাগদাদ নগরীতে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। বাগদাদের এরূপ করুণ অবস্থায় আহমদ বুওয়াইহী বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। পতিমধ্যে ওয়াসিত হস্তগত হয়। ৯৪৫ সালে ডিসেম্বর মাসে বিনা বাধায় আহম্মদ বাগদাদ নগরে প্রবেশ করে। খলিফা মুস্তাকফী তাকে আমিরুল উমারা হিসাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং তাকে মুইজ্জুদৌলা এবং

হাসানকে রুকনুদৌলার উপাধি প্রদান করেন। এই ছিল বাগদাদের উপর বুওয়াইহীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী।

বাগদাদের উপর বুওয়াহীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার স্বরূপ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। উল্লিখিত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের মত আব্বাসী সাম্রাজ্য কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন অধিকার ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তারা পোষণ করবে কেন? ইতিপূর্বে ইরানে তারা তাদের বাহুবল দিয়ে তাদের নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে; এরপর তারা হয় সম্প্রসারণবাদী শক্তি। বাগদাদে তাদের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত করে। তারা অবশ্য খলিফা পদটি কৌশলগত কারণে উচ্ছেদ না করে বরং সংরক্ষণ করে। তবে খলিফাকে সর্বপ্রকার প্রশাসনিক দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতা হতে বঞ্চিত করে খলিফাকে দৈনিক ৫ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার একজন বৃত্তিধারী ব্যক্তির মর্যাদায় সমাসীন করা হয়। বস্তুত খলিফাকে মহামান্বিত আশ্রিত ব্যক্তিতে পরিণত করা হয়। তিনি কেবল সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবন তদারকির কাজ করবেন। বাগদাদের সকল প্রশাসনিক রাজনৈতিক দায়িত্ব বহন করবে বিজয়ী বুওয়াইহী শাসক। বস্তুত রাজ্য শাসন বা জাহানদারি তাদের হাতে রেখে তারা আরব রাষ্ট্র শাসন চরিত্রে এক নয়া উপাদান সংযোজন করে। আব্বাসী স্বর্ণযুগে খলিফার রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোতাওয়াক্কিলের সময় হতে দীর্ঘদিন ধরে খলিফাকে বাস্তবে পর্দার অন্তরালে রেখে সামরিক ও নাগরিক অভিজাত আমলাদের যৌথ স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। সেই সাথে চলে সমর নেতা ও অভিজাত আমলাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই এবং এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু বাগদাদের রাজনীতিতে সামরিক ও আমলাদের দ্বন্দ্বের কোনো পক্ষই সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয় নি।[৭] এরূপ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বহিরাগত দাইলামি জাতিসত্তা সামরিক শক্তি নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করে; সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তগত করে; নির্ভেজাল সামরিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। তারা যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠা খেলাফতের ধারণার সাথে জাহানদারি বা সালতানাতের ধারণা প্রবর্তন করে। অর্থাৎ খলিফা হবেন মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক প্রধান; সুলতান হবেন রাজনৈতিক প্রধান। এ যেন পরবর্তীকালে ইউরোপের ইতিহাসে যাজক ও রাজার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতা ভাগাভাগির পূর্বাভাস। এরূপ সালতানাত বা জাহানদারির ধারণা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল গ্রহণযোগ্যতাই অর্জন করেন নি বরং ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থাকে মফিজুল্লাহ কবির তাদের ধর্মনিরপেক্ষ (Secularism) নীতির কথা বলেছেন। নিঃসন্দেহে মধ্যযুগে জাহানদারি ছিল অভিনব ধারণা যা স্বাভাবিকভাবে মানব সমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় নব দিগন্তের উন্মোচনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। এ সব বিবেচনায় বুওয়াইহী কর্তৃক বাগদাদ দখল এবং শাসন ইসলামের ইতিহাসে শাসনতান্ত্রিক বিকাশের একটি নয়া ধারাই প্রবর্তিত হয়।

বাগদাদে বুওয়াইহী শাসকদের তালিকা নিম্নরূপ :
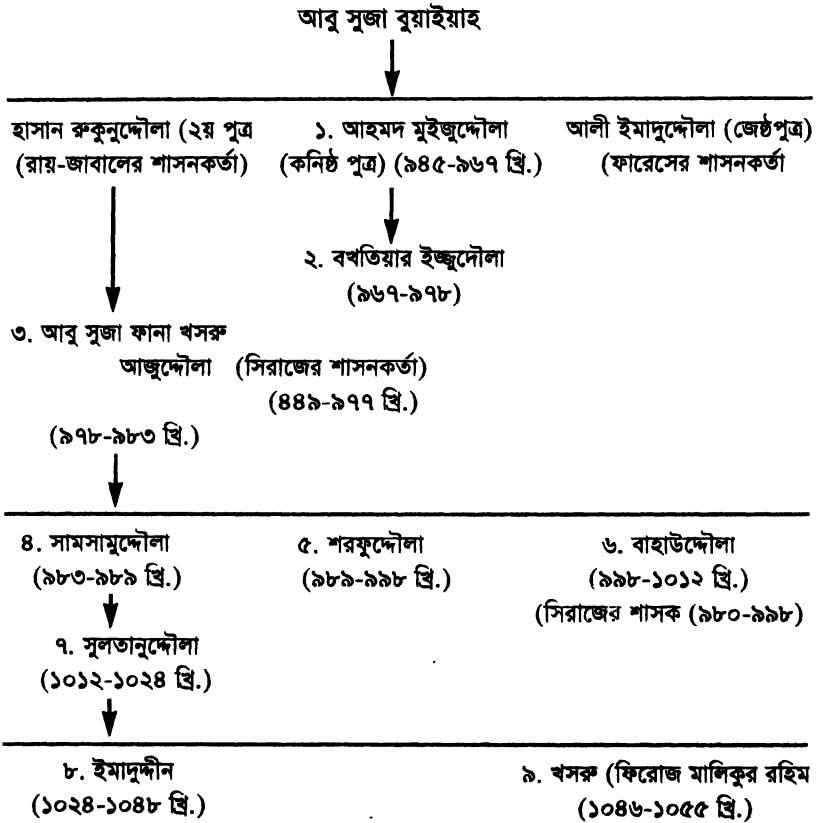
৮.৩ বুওয়াহী রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীন বাগদাদ : মুইজুদৌল্লার বাগদাদ শাসন নীতি ও পদ্ধতি

দাইলামি বুওয়াইহী বংশের আহমদ কেবল সফল বাগদাদ অভিযান পরিচালনা করেন তাই নয়, বরং দীর্ঘদিন বাগদাদ ইরাকের শাসন পরিচালনা করে তিনি পারিবারিক শাসননীতি ও শাসন পদ্ধতির স্থপতির মর্যাদা লাভ করেন। বিজয়ীবেশে তিনি বাগদাদে প্রবেশ করলে খলিফা তাঁকে আমিরুল উমারা হিসেবে অভিনন্দিত করেন বটে; কিন্তু ঐ পদের প্রতি কি তাঁর কোনো মোহ বা শ্রদ্ধা থাকার কথা? বস্তুত তিনি অপ্রয়োজনীয় খলিফা পদেরই পরিসমাপ্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময় কৌশলগত কারণে পদটি

সংরক্ষণের জন্য সভাসদেরা তাকে পরামর্শ দেন বলে ইবনুল আসির তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন।[৮] বুওয়াইহী শাসননীতি ও তাদের শাসন পদ্ধতি সুদৃঢ় করার জন্য ক্ষমতা হস্তগত করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে খলিফা মুস্তাকফীকে তিনি পদচ্যুত করেন, এবং আল মুতীকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করেন। শুক্রবারের জুমার নামাজের খোতবায় তাঁর নিজের নাম পঠনের রীতি প্রবর্তন করেন; তখনই সার্বভৌমত্বের বাস্তব প্রতীকে তাঁর নাম অঙ্কিত করার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দখলকৃত বাগদাদ তথা ইরাক শাসিত হবে বুওয়াইহী সাম্রাজ্যের শাসন কাঠামোর মধ্যে। বুওয়াইহীদের শাসন ব্যবস্থার মূল প্রস্তাবনা গ্রহণ করে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো কিরূপে বাগদাদের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায় সেটাই ছিল মুইজের এক নম্বর সমস্যা। তারা বাগদাদে প্রবেশ করে পেয়েছিল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এ জন্য তাঁকে একটা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তাই ফারেস হতে আমলা বাহিনী সংগ্রহ করতে হয়। এসব আমলারাই বাগদাদে নয়া শাসন ব্যবস্থা চালু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আব্বাসীরা যদিও তাদের স্বর্ণযুগে পারস্যের অনুকরণে উজির পদের প্রবর্তন করে তবুও আব্বাসীদের অনেক খলিফাই উজির ব্যতীত চলতো। আর এ কারণে এ পদের গুরুত্ব কখনই বৃদ্ধি পায় নি, অথচ বুওয়াইহী শাসনে উজির ছিল কেন্দ্র বিন্দু। যেহেতু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বুওয়াইহী আমির/মালিক বা সুলতানের হাতে হস্তান্তরিত, কাজেই খলিফার উজির নিয়োগ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে রহিত হয়। বুওয়াইহী সুলতান মুইজ উজির নিয়োগের নিয়ম চালু করেন।

পতিত কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বাহিনী নিয়ে মুইজকে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এরূপ সমস্যা বিভিন্ন এলাকায় থাকলেও বাগদাদের সমস্যাটি ছিল অনেক বেশি জটিল। মুইজ তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। তাদের স্বজাতি গোষ্ঠী দাইলামিদের মধ্যে এত বেশি জনবল ছিল না যে, তা নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সেনাবাহিনী গঠিত হতে পারে। তদুপরি দাইলামিরা ভাল পদাতিক হলেও ভাল ঘোড় সওয়ার ছিল না; অথচ দক্ষিণ পশ্চিম সমতল ভূমিতে শক্তিশালী ঘোড় সওয়ার বাহিনীর প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। এ সব সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে মুইজ পতিত আব্বাসী বাহিনীকে বুওয়াইহী বাহিনীতে অধিকরণ নীতি অনুসরণ করেন। অন্যান্য অঞ্চলে এ প্রক্রিয়া সহজসাধ্য ছিল—কেন না অন্যত্র এদের সংখ্যাধিক্য ছিল না। তাদের বেতন ভাতা বুওয়াইহীদের সমমর্যাদায় দেয়া হয়। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, এ সমস্যার সমাধান করা হয়; আব্বাসী পরিবার ও তাদের স্বজনদের সকল ভূসম্পত্তি বুওয়াইহী সরকার অধিগ্রহণ করে; তারা নতুন ধরনের ইকতা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সেনাবাহিনীর বেতন বা প্রান্তিক সুবিধাদি হিসাবে ভূমি মঞ্জুরী প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গোটা ব্যবস্থা অনেকাংশে সামগ্রিক হলেও বুওয়াইহীদের পতন অবাধি এ

ব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল। বাগদাদের সমস্যাটি ছিল বেশি। প্রথমত বাগদাদে সৈন্যবাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হলেও তারা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি; দ্বিতীয়ত শহরে কোনো আবাদি জমি ছিল না, তবে আশেপাশে সমগ্র অঞ্চলে প্রচুর আবাদি জমি ছিল। ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে বাগদাদে নগদ মুদ্রা ছিল প্রচুর; নয়া বুওয়াইহী শাসককে বাগদাদে দৃঢ়ভাবে থাকতে হলে অসংখ্য দাইলামি সৈন্যের উপস্থিতি ছিল প্রয়োজন; অবশিষ্ট ইরাকি অঞ্চলে তাঁর শাসনের বিস্তৃতি ঘটাতে পুরনো সৈন্যবাহিনী ব্যবহারই ছিল যুক্তিসঙ্গত। এ সব বিবেচনায় অদাইলামিদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদের দাইলামি বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব ছিল না—এদেরকে নিজস্ব নেতৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাদের বেতন দেয়ার জন্য বুওয়াইহী ইকতা ব্যবস্থা সমগ্র ইরাকের আবাদি ভূমিতে বিস্তৃত করা হয়। একই সাথে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য ইকতাভুক্ত করা হয়। এতে বাগদাদে দাইলামি ও তুর্কি হতে উদ্ভূত অভিজাত শ্রেণীর বুওয়াইহীদের সামাজিক ভিত্তি হলেও তাদের স্ব স্ব স্বার্থ চেতনা ও স্বাতন্ত্রবোধ হতে উদ্ভূত নতুন সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা বাগদাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয় এবং তা কারো জন্য মঙ্গল হয় নি।[৯] বুওয়াইহীরা কোনো দলকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে নি।[১০]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বাগদাদে শিয়া সমাজের বৃদ্ধি পাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। সম্ভবত সাম্ভাব্য শিয়া প্রাধান্য ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মুস্তাকফী বুওয়াইহী মুইজের বাগদাদ প্রবেশকালে একজন শিয়া নেতাকে কারারুদ্ধ করেন। তবে মুইজের নির্দেশে তাকে মুক্ত করা হয়। সুন্নিদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধার জন্য তাদের স্বীকৃত আমিরুল মোমেনিনকে সীমিত অর্থে খেলাফতের পদে সমাসীন রাখেন এবং শিয়া সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের পছন্দসই এক ব্যক্তি আবুল হুসাইন আহমদ বিন আলী আল কাউকাবীকে নকীব পদে নিয়োগ করেন। এভাবে তারা সুন্নি নকীব হতে মুক্ত হয়। তাদের দাবি অনুসারে বাগদাদে বসবাসরত শিয়া সমাজের জন্য কারবালার হত্যাকাণ্ডের স্মরণে ১০ই মহররম শোক দিবস এবং গাদিরুল খাম এ কথিত মহানবী কর্তৃক আলীকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনয়নের দিনকে আনন্দ দিবস হিসাবে উদযাপনের প্রথার অনুমতি দান করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ এবং মফিজুল্লাহ কবির মুইজ তথা বুওয়াইহীদের উত্থান ও পতনে শিয়া ধর্মনীতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন।[১১] এ প্রসঙ্গে সম্ভবত শাবানের মতামত খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বুওয়াইহীদের উত্থান বা পতনে তাদের রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে শিয়া মতাদর্শের প্রাধান্যের প্রমাণ পান নি। বুওয়াইহীরা তাবারিস্তান অবস্থানকালে নিঃসন্দেহে জায়দী শিয়া ইসলাম গ্রহণ করে সত্য; কিন্তু ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিয়ে মাতামাতি করার সময়-সুযোগ কখনই তাদের ছিল না। তারা ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে সকল ধর্মমতের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। এ সময় বাগদাদে সুন্নি

সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী চরম দক্ষিণপন্থী হাম্বলীদের সামাজিক অনাচার ও গোঁড়ামিতে হস্তক্ষেপ করেন নি; এবং তারাও বুওয়াইহীদের জাহানদারি নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় নি।[১২] মধ্যযুগে বহুমাত্রিক সমাজের স্বীকৃতি এবং সবার জন্য বিবেকের স্বাধীনতা দান অবশ্যই একটি অগ্রগামী রাজনৈতিক নীতি। এটা আরব সাম্রাজ্যেব একটি অনুকরণীয় ঐতিহ্য হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত।

বাগদাদে নয়া শাসন ব্যবস্থায় অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন বুওয়াইহীদের কর্তৃত্ব বজায় থাকে। মুইজ প্রথম হতে শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করেন। বাইজান্টাইন অথবা মিশরের সাথে যে কোনো রকম সংঘর্ষ এড়ানোই ছিল মুইজি পররাষ্ট্র নীতি। তাইবলে বাগদাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে ছেড়ে দিতে তিনি পারেন না। এ রকম একটি প্রদেশ ছিল বসরা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বসরা ছিল বাগদাদের ধমনিতুল্য। বাবিদরা কারামাতিদেরকে বিতাড়িত করে নিজেরাই এ সময়ে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাগদাদ দখলের পর মুইজ বাবিদদেরকে বিতাড়িত করে বসবা দখল করে বাগদাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। জাররা মন্ত্রীদের শাসনামলে বিগত বিশ বছর যাবত বসরা হতে বাণিজ্যিক শুল্ক রহিত কবা হয়—বুওয়াইহীরা পুনরায় বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করে। এ অঞ্চলে কর ইজারাদাররা যে কৃষি-কব বৃদ্ধি করেছিল মুইজ তা হ্রাস করেন।[১৩]

বসরায় তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হলে মুইজ কারামিতাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। কারামিতারাও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। বস্তুত মুইজ কারামিতাদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এতই সফল হল যে, তারা বিগত ত্রিশ বছর ধরে কাবাশরিফের পবিত্র কৃষ্ণ পাথরটি অপহরণ করে রেখেছিল; কিন্তু সেটাই স্বেচ্ছায় প্রত্যার্পণ করে। বসরায় কারামিতাদেরকে তাদের নিজস্ব শুল্ক অফিস প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয় এবং এ সুবিধে কুফায়, বাগদাদ এবং তীর্থ পথেও সম্প্রসারিত হয়। কারামিতাদেরকে দক্ষিণ ইরাকে জমি মঞ্জরী দান করা হয়; কুফা ও বাগদাদে তাদের উপস্থিতি সহজে সহ্য করা হয়। পরবর্তীকালে কনফেডারেসির রাজপরিবারের উত্তরাধিকার সমস্যায় কারামিতারা নাক গলাতে চাইলে ৯৮৬ সালে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে সায়েস্তা করা হয়। এরপর তারা বাহরাইনে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে। এ ব্যবস্থার ফলে এ অঞ্চলে বাণিজ্য পুনরায় অনেকাংশে নির্বিঘ্ন হয়। পূর্ব আফ্রিকার জানজরা ওমান দখল করলে বুওয়াইহীরা প্রথমে ৯৬৫ সালে এবং আরো পরে দু দুবার অভিযান চালিয়ে তা পুনরুদ্ধার করে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা বুওয়াইহীরা গ্রহণ করে। কাতার অঞ্চল হতে জল দস্যুদেরকে বিতাড়িত করে। রায়ের উপর বুওয়াইহী প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সফল অভিযান প্রেরণ করা হয়। সামানিরা রায় হতে উঠে যায়। তাদের এ নীতির ফলে উপসাগরীয় তথা সমগ্র দক্ষিণ বাণিজ্য পথ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের আমলের প্রথমাংশে

বাগদাদের সমৃদ্ধির মূল রহস্য ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনর্বাসনের মধ্যে। দক্ষিণ ইরাকে ও ওয়াসিত ও বসরার মাঝখানে বাহিতা নামক একটি ক্ষুদ্র কৃষি প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠে এবং একশ বছর ধরে তারা তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখে। মুইজ তাদের দমন করতে ব্যর্থ হয় এবং কোনো বুওয়াইহী তাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান করতে পারে নি।

মুইজ উত্তর পশ্চিম কোণে হামদানি সমস্যার মুখোমুখী হন। হামদানিরা মূলত ছিল খারেজী, তবে তারা শিয়া ধর্ম মতে দীক্ষা গ্রহণ করে। তাদের স্বার্থ বাইজানটাইনদের সাথে জড়িয়ে ছিল। এই আরব গোত্রের প্রতি আরবদের চাইতে তাদের প্রভাব বলয়ে বসবাসকারী অনারবদের সমর্থন বেশি ছিল। বুওয়াইহীরা বাগদাদের ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রায় চার বছর পূর্ব হতে হামদানিরা মোসুল ও জাজিরায় তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে এবং বাগদাদের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। ৯৪২ সালে তারা আমিরুল উমারা পদ অর্জন করেন। বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকারের শোচনীয় অবস্থা অনুধাবন করে মোসুলেই তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। এলাকাটি বাগদাদের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বিধায় এর উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল অনিবার্য। মুইজের কূটকৌশলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যদিও শর্তাবলী মেনে চলার সদিচ্ছা হামদানিদের ছিল না।

সামানীদের নিকট হতে রায় দখল করে পূর্ব-উত্তর বাণিজ্য পথের উপর বুওয়াইহী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই ছিল মুইজের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এভাবে তার শাসনামলে আরব সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথের উপর বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে পুনরায় আরব সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সূচনা করেন।

মুইজ আমৃত্যু পারিবারিক প্রশাসনিক ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেন। বুওয়াইহী কন-ফেডারেসির আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সাম্রাজ্যের সংহতি ও সমৃদ্ধি রক্ষার নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন। তিনি ৯৬৭ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৮.৪ ফানা খসরু আজদুদ্দৌলার শাসননীতি : তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার

মুইজুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তদীয়পুত্র এখতিয়ার ইজ্জুদ্দৌলা বাগদাদসহ সমগ্র ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় এগার বছর রাজ্য শাসন করেন। ইবনে খাল্লিকান তাঁর বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেন বটে; কিন্তু শাসক হিসেব তাঁর কোনো যোগ্যতা ছিল না। ইবনে জওজী বলেন যে, তিনি প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন; কিন্তু তিনি ছিলেন প্রচণ্ড আবেগপ্রাণ দুর্বলচিত্ত ও অস্থির মতিত্ব, অবিমৃশ্যকারী এবং অদূরদর্শী। তার মত ব্যক্তির পক্ষে উদীয়মান তুর্কি ও দাইলামি সামরিক অভিজাতদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ সমন্বয় করে তাদের আনুগত্য লাভ করা সম্ভব হয় নি। রাজনৈতিক অদূরদর্শীতার কারণে তিনি তাঁর পিতৃব্য ফারেসের প্রভাবশালী শাসনকর্তা আজুদ্দৌলার

সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। অজুদ্দৌলাকে ৯৭৮ সালে ক্ষমতা হতে অপসারিত করে তিনি সমগ্র ইরাকের অধিপতি হন। এই সাথে বুওয়াইহী সাম্রাজ্যে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

আবু সুজা ফানা খসরু

আবু সুজা ফানা খসরু ছিলেন রুকনুদ্দৌলার জেষ্ঠ্যপুত্র। বুওয়াইহী পরিবার পধান ইমাদুদ্দৌলা ফানা খসরুকে ফারেসের মত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইমাদুদ্দৌলার মৃত্যুর পর ৯৪৯ সালে তিনি সিরাজের মসনদে আরোহণ করেন। খলিফা আল মুতি ৯৬০ সালে তাঁকে আজুদুদ্দৌলাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বেশ অনুকূল পরিবেশে ক্ষমতাসীন হন। এ সময় সামানিরা তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। প্রত্যন্ত অঞ্চল কিরমান ও সিস্তানে তার ঢেউ লাগে। ফারেস শাসনকালে ইজুদ্দৌলা কিরমান ও উমান পর্যন্ত তাঁর রাজ্য সীমা বিস্তৃতি করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বুওয়াইহী পরিবারের কনিষ্ঠ আহমদ মুইজদ্দৌলা কিরমান জয় করলেও সেখানে বুওয়াইহী শাসন সুদৃঢ় করার পূর্বেই তাকে অন্যত্র ডেকে পাঠান হয়। সুযোগ বুঝে কিরমানের বিভিন্ন স্থানের গোত্রপ্রতিরা স্ব স্ব স্থানে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। তাই মুইজুদ্দৌলার এ অসমাপ্ত কাজটি সম্পাদন করে আজুজ্জদ্দৌলা। সিজিস্তানের শাসক তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তিনি ধীরে ধীরে পারস্য উপকূলে মাকরান ও হরমুজের উপর তাঁর প্রভাব বলয় সম্প্রসারিত করেন। বস্তুত তাঁর মূল রাজ্য ফারেসের সাথে কিরমান সম্পৃক্ত হওয়ায় তিনি পতনোন্মুখ সামানি শাসকদের সমকক্ষ হয়ে উঠেন। ফারেস একটি শক্তিরূপে বিকশিত হওয়ায় সামানি শাসনকর্তা মনসুর বিন নুহ তাঁর সাথে সম্মানজনক এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। খলিফা এবং সামানিরা আজুদৌল্লাকে মর্যাদা দেয়ায় তিনি আরো উৎসাহিত হয়ে উমান দখলে মনোনিবেশ করেন; কেনা না পারস্য উপসাগরের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য উমানের উপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল অপরিহার্য। মুইজুদ্দৌলার মৃত্যুর পর উমান বুওয়াইহীদের হাত ছাড়া হয়। এবং এ সময় নিগ্রোরা বিদ্রোহ করে। আজ্জদ্দৌলা এ বিদ্রোহ ৯৭২ সালে দমন করেন। মফিজুল্লাহ কবির মনে করেন যে, উমান দখলের পর হতে তিনি বাগদাদ দখলের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তবে তৎকালীন পরিবার প্রধান তার পিতা রুকনুদ্দৌলার জীবদ্দশায় তার এ উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা সম্ভব হয় নি। তার মৃত্যুতে সে পথের বাধা অপসারিত হয়। তদুপরি পিতৃব্য পুত্র বখতিয়ারের নির্বুদ্ধিতা, ভাবাবেগ এবং অদূরদর্শিতা তাঁর উচ্চাভিলাষ পূরণ করা সহজ হয়।[১৪] মধ্যযুগে তাঁর মত একজন শক্তিশালী প্রতিভাধর ব্যক্তির মধ্যে সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা থাকা আদৌ বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়-এত দিনে গড়ে ওঠা পারিবারিক ঐতিহ্য পদদলিত করে বিশাল বুওয়াইহী রাষ্ট্র সংঘকে একক কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কেন? শাবান এর একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন

গজনীতে সবুক্তগিনের সামরিক অভ্যুত্থানে এতদঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থায় এক নয়া উপাদান সংযোজিত হয়। ৯৭৭ সালে ঐ উদীয়মান শক্তির বাসিত দখল ছিল বুওয়াইহীদের জন্য ভয়াবহ ঘটনা। এ ঘটনা আজুদ্দৌলাকে বেশি পরিমাণে স্পর্শ করে। এ সময় বুওয়াইহী রাষ্ট্র সংঘের বাস্তব অবস্থা ছিল নাজুক। বাগদাদ ছিল ষড়যন্ত্রের স্নায়ু কেন্দ্র, দাঙ্গাবাজ হাম্বলী ও শিয়াদেরকে সাম্প্রদায়িক অনাসৃষ্টি হতে নিবৃত রাখার মত কর্তৃত্ব তখন বাগদাদে ছিল না। সেনাবাহিনীর মধ্যেও ছিল উপদলীয় কোন্দল। এরূপ পরিস্থিতিতে আজুদ্দৌলা সম্ভাব্য গজনী হুমকি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কনফেডারেসির সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করার তাগিদেই বাগদাদ দখল করেন।[১৫]

তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা আছে বৈ কি? তবুও মনে হয় এর প্রকৃত ব্যাখ্যা নিহিত ছিল মধ্য যুগে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় চরিত্রের মধ্যে। এ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত উপাদান হচ্ছে একীভবন ও বিচ্ছিন্নতার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। তাহলে অনুকূল পরিবেশে তিনি সকল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করবেন না কেন? উক্ত বাস্তব অবস্থায় এটাই একটি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য।

বাগদাদ দখলের পর তিনি তথায় দ্রুত আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় বাইজানটাইন শক্তি বুওয়াইহী সাম্রাজ্যের জন্য কোনো হুমকি ছিল না বরং মোসুলের হামদানিরা ছিল বিপজ্জনক। সে জন্য তিনি মোসুলের অধিপতি আবু তাগলিবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে দিয়ারে বকর, দিয়ারে রাবিয়া এবং দিয়ারে মুজার তাঁর প্রভাব বলয়াধীন করেন। পরে সমগ্র জাজিরা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। উল্লেখ্য এর পর কুর্দী ও হামদানীদের পুনর্বাসিত করা হলেও তারা আর কখনো সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি। ইরাক সীমান্তে আরব গোত্রগুলোকে দমন করা হয়। তাবে বাতিহা প্রজাতন্ত্রকে নির্মূল না করে বরং তার সাথে এক সম্মানজনক চুক্তি সম্পাদিত হয়। মোসুল বিজয়ের পর বাগদাদে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁকে বীরোচিত অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য বাগদাদ পথে কেবল অসংখ্য বিজয়তোরণই নির্মিত হয় নি; বরং খলিফা স্বয়ং তাকে সুস্বাগতম জ্ঞাপন করার জন্য নগরের বাইরে কাত্রাবুল্লে গমন করেন এবং তাকে অভিনন্দিত করে। এই ঘটনার কয়েক দিন পর খলিফা তাঁকে আরো দুটি মর্যাদা প্রদান করেন। জুমাআর খোতবায় তার নাম পাঠ; খলিফার রাজপ্রাসাদের ফটকে সকাল-সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে যেভাবে নহবত বাজানোর রেওয়াজ চালু ছিল, অনুরূপ সুলতানের প্রাসাদেও নহবত বাজানোর রেওয়াজ চালু করা হয়।[১৬] আজুদ্দৌলাকে খলিফার প্রাসাদে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য যে বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তার একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন মফিজুল্লাহ কবির। তার প্রতি এরূপ অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করা হয় ফাতেমী রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে। জাজিরা দখলের পর উত্তরাঞ্চল হতে দাইলামি এবং সামানি প্রভাবমুক্ত করে হামাদান, জাবাল, রায়, জুরজান, তাদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৃত্যুকালে তিনি একীভূত এক বিশাল সাম্রাজ্য রেখে যান। এই সাম্রাজ্য কাস্পিয়ান সাগর হতে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর; পূর্বে মহা মরু হতে পশ্চিমে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার সমসাময়িক রাজ্য সামানি অথবা ফাতেমি কোনোটাই এত বিশাল ছিল না। বিশালতায় এ সাম্রাজ্য হারুন অর রশীদের সাম্রাজ্যের সমতুল্য ছিল। ফারেস, আমাজান, কিরমান, উমান, ইরাক ও জাজিরা ছিল তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে; রায় ইস্পাহান, হামদান, নিহাওয়ান্দ, জুরজান তাবারিস্তান শাসিত হয় তদীয় ভ্রাতা মুয়াইদুদ্দৌলা দ্বারা। জাবালের একাংশ কুর্দী নেতা বদর বিন হাসনাওয়াই শাসন করতেন। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইয়ামেনি শাসক তাঁকে উপঢৌকন প্রেরণ করত; কিরমানের পূর্বে সিজিস্থান ও সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্তারা জুমাআর খোতবায় তাঁর নাম পাঠ করতেন; আলেপ্পোর হামদানি শাসক সায়ফুদ্দৌলা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[১৭] বস্তুত এরা সবাই ছিলেন তাঁর অধীনস্থ সামন্তরাজা। হিট্টি যথার্থই বলেন তাঁর সময়ে বুওয়াইহী সাম্রাজ্য তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়।[১৮] এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি আজদুদ্দৌলা প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রাচীন পারস্য ঐতিহ্য অনুসারে আপনাকে শাহান শাহ ঘোষণা করেন।[১৯]

পারিবারিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন তিনি উপেক্ষা করেছিলেন সত্য; একই সাথে তাঁর সাম্রাজ্যের বহুমুখী সামাজিক (Plural Society) ও বহুজাতিক (Multi racial) চরিত্রটি অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বাগদাদ নগরে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে উদার ও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করায় সাফল্য অর্জন করেন। সকল সম্প্রদায়ের মসজিদ কিংবা রাস্তায় প্রকাশ্য ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করেন; কোনো সাহাবার নাম নিয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা না করার নির্দেশ দান করেন। তাঁর মতে আল্লাহর আর্শিবাদ কামনা করতে হয় কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে।[২০] তিনি দায়লামি ও তুর্কি জাতিসত্তাদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেন। অমুসলিমদের প্রতি তাঁর আরচণ ছিল অনুকরণীয়। তিনি তাঁর খ্রিষ্টান মন্ত্রী নসর বিন হারুনকে গির্জা নির্মাণে উৎসাহিত করেন।[২১] তিনি আপন শক্তিতে শাহান শাহ হয়েও সুন্নি সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক সমর্থন লাভের জন্য প্রথমত: নিবীর্য খলিফার নিকট হতে জাহানদারী অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি এত ঘটা করে উল্লিখিত খলিফার দরবারে সংঘটিত করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, দ্বিতীয়ত তিনি আব্বাসী খলিফার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নীতিও অবলম্বন করেন। তিনি স্বয়ং খলিফা আত্তাই এর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং আপন কন্যাকে খলিফার সাথে বিবাহ দেন। বস্তুত আব্বাসী বিপ্লবের মহান আদর্শ আত্তীকরণ নীতি (Principle of Assimitlation) এবং ধর্মীয় সহনশীলতার নীতির তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ প্রবক্তা।

অধ্যাপক শাবান এই, মহান সুলতানের ৫ বছরের কর্মময় জীবনে বাগদাদের রাজস্ব সংস্কার পদক্ষেপকে চিত্তাকর্ষক বলে চিত্রিত করেছেন।[২২] তিনি তাঁর পিতৃব্য

মহান মুইজের নীতিমালাকে উপেক্ষা না করে বরং অনেক ক্ষেত্রে অবস্থানুসারে সংশোধন অথবা বিকাশ সাধনের চেষ্টা করেন। মুইজের বুওয়াইহী ইকতার ব্যাপক সম্প্রসারণ নীতিকে সামরিক কর্মচারীদের বেতনের জন্য সীমিত করেন মাত্র; দায়লামি নেতাদের স্বার্থের প্রতিও তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। মুইজনীতি অনুসারে যাদের সরকারি খাজাঞ্চিখানা হতে বেতন দেয়া হত, তিনি কঠোরভাবে তা নিয়মিত করেন। তিনি অযথা কর ও বেতন বৃদ্ধির পক্ষে ছিলেন না; অবশ্য সামরিক বিজয়কে পুরস্কৃত করতেন। যদিও তিনি পিতৃব্যের মত কর ইজারাদারি জারি রাখেন, তবে তার ব্যবস্থাপনার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। ফারেসে তিনি তাঁর কর্মচারীদেরকে বিপ্লবাত্মক কর আরোপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুমোদন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শহুরে সম্পত্তির উপর ন্যায়সঙ্গত করারোপ। ঐ সব কর্মকর্তারা নতুন করারোপ করতে গিয়ে প্রাচীন ইরানি কর ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন করেন। তারা বেশ্যালয়ের উপর অথবা জল-কর আরোপ করেন। এগুলো ধর্ম সম্মত ছিল না। শহরে কর দাতাদের উপর কর্মচারীদের থাবা ছিল দৃঢ়। কর দাতা শহরবাসীদের শহর ত্যাগের জন্য পাসপোর্ট রাখতে হত। শহরের প্রবেশ পথে প্রতিটি পণ্য বোঝার উপর ত্রিশ দিরহাম করে কর দিতে হত। শহরের মধ্যে সরকারি বাজার বসান এবং পণ্যাগার নির্মাণ করা হত। এখান হতে দ্বিগুণ কর উসুল করা হত। দালালদের জন্য আড়ৎ গৃহ নির্মাণ করা হত এবং এখানে পাইকারী বেচাকেনা চলত। এ রকম একটি আড়ৎ হতে দৈনিক দশ হাজার দিরহাম কর উসুল করা হত। আইসক্রীম, রেশমী বা সুতি বস্ত্র শিল্পে ছিল সরকারের একচেটিয়া অধিকার। সকল খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গোলাপ জল কারখানাও ছিল সরকারি সংস্থা। বাজারে পশু বিক্রয়ের উপরও নতুন নতুন কর বসানো হয়। আমদানি রপ্তানি সকল পণ্যের উপর করারোপ করা হয়। নাগরিকদের উপর কোনো আয়কর আরোপের কথা অবশ্য জানা যায় না। এটিই বোধ হয় উক্ত শহুরে সম্পত্তির উপর কর বৃদ্ধির মূল কারণ। আয়কর আরোপ না করার সম্ভবত উদ্দেশ্য ছিল ধনী অভিজাতদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করা।

গ্রাম সমাজ হতে কর সংগ্রহের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। বেদুইনদের পশুর উপর করারোপ করা হয়। তাঁর সাম্রাজ্যের প্রায় দুলাখ বেদুইন পরিবারকে সংগঠিত করে উক্ত ব্যবস্থাধীন রাখা হয়। তারা কাফেলা বাণিজ্যের নিরাপত্তা এবং মরুপথে তাদের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করত। বেদুইনরা এবং তাদের এই সেবার জন্য মূল্য দেয়া হত। ভূমি করের জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট জটিল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কর আরোপ ও কর উসুলের ব্যাপারে সরকার যেমন কঠোর ছিল, তেমনি সরকারি দায়িত্ব পালনেও কখনো দ্বিধা করা হতো না। দেশের পুরনো সেচ ব্যবস্থা রক্ষা করা হয় এবং তাকে আরো উন্নত করা হয়। সেচ প্রকল্প ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ও তদারকির জন্য যোগ্য প্রকৌশলীদের নিয়োগ করা হত। পিসাসফল্ট (Pissasphalt) ব্যতীত সকল খনিজ সম্পদের উপর করারোপ করা হয়।

বাগদাদ দখলের পরপরই ফারেসের অভিজ্ঞতার আলোকে বেশ সাফল্যের সাথে সিরাজের কর ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়। সেচ ব্যবস্থার খরচ হ্রাস না করে বরং খরচ বাবদ ১০% কর বৃদ্ধি করা হয়।

মধ্যযুগের একজন সমাজ সচেতন কল্যাণকামী স্বৈরাচারী শাসকের প্রতিকৃতি অনুধাবনের জন্য উক্ত সংক্ষিপ্ত রেখা চিত্রটি যথেষ্ট। যা হোক প্রাচীনপন্থী ঐতিহাসিকগণ আজদুদ্দৌল্লার রাজস্ব সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলোর চেয়ে তাঁর দৈনন্দিন জীবন কেমন নির্দিষ্ট সময় সূচি হিসাবে কাটাতো তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তার দৈনন্দিন কর্মসূচি ছিল এরূপ: অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে গোসল ও সকালের নামাজান্তে মন্ত্রী পরিষদ ও তার স্টাফ সদস্যদেরকে দর্শন দিতেন; তার সচিব আব্দুল আজিজ ইবনে ইউসুফ সুলতানের সম্মুখে উপবেশন করে তার সামনে কালি-কলম স্থাপন করতেন। তার অনুমতিক্রমে তাঁর উজির তার সম্মুখে উপস্থিত হতেন; পূর্বে কার্যাবলীর পর্যালোচনা করতেন এবং নতুন কিছু ঘটলে সে সম্পর্কে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় ইত্যাদি সম্পর্কে সুলতানের সাথে আলোচনা করতেন।

এরপর তিনি তুর্কি ও দায়লামি দুজন সেনাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ দান করেন। এরপর তিনি ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের দর্শন দেন। খবরাখবর বা যোগাযোগের সময়ের কোনো প্রকার হেরফের বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হতো না। সিরাজ হতে বাগদাদের ৬০০ মাইল পথ মাত্র ৭ দিনের মধ্যে খবরাখবর আদান প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ডাক কর্মকর্তা সকল চিঠিপত্র তার সামনে উপস্থিত করতেন। সুলতান স্বয়ং প্রতিটি চিঠি পাঠ করে সচিবকে দিতেন; সচিব পুনরায় পত্রগুলো পাঠ করে সেগুলোর উত্তর সম্পর্কে সুলতানের উপদেশ প্রার্থনা করেন। প্রয়োজন হলে সুলতান তার মতামত দিয়ে একটি স্মরণিকাসহ পত্রগুলো উজিরের নিকট প্রেরণ করতেন। ডাক সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড শেষ হলে তার আহারের ব্যবস্থা হত। আহারের সময় তার নিকট একজন চিকিৎসক উপস্থিত থাকতেন। সুলতান তাকে বিভিন্ন আহার্য দ্রব্যে খাদ্য প্রাণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আহারের পর কিছু সময় শয়ন কক্ষে বিশ্রাম করে মধ্যাহ্ন নামাজ সমাপন করতেন। বিকালটা বিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এখানে খোশ আলাপের ফাঁকে ফাঁকে হালকা ধরনের সরকারি কাজও তিনি সম্পাদন করতেন। সন্ধ্যায় তিনি প্রমোদ কক্ষে প্রবেশ করতেন। এখানে চলত নাচ, গান, বাজনা, কবিতা পাঠ ইত্যাদি। সঙ্গীতের উপর তিনি নানা প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। এসব কাজের মধ্যে উজিরের নিকট উত্তরসহ পত্রাদি দিয়ে সুলতানের মতামতের প্রার্থনা করতেন। এখানে যথেষ্ট সময় কেটে যেত। এখান হতে সরাসরি শয়ন কক্ষে প্রবেশ করতেন। এবনে জৌজি তার গ্রন্থে সবিস্তারে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। উৎসবের দিন কিভাবে কাটত, কিভাবে তিনি জনসাধারণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন এবং বিদগ্ধজনের সাথে সময় কাটাতেন তার বিশদ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৮.৫ বুওয়াইহীবংশের অবক্ষয় : খলিফার প্রতিক্রিয়া ও নয়া রাজনীতি

আজদুদ্দৌলা বুওয়াইহী পারিবারিক ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে শক্তিশালী এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন বটে; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতার একীভবন নীতি পদদলিত হয়। যা হোক তাঁর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হিসাবে তদপুত্র শামসুদ্দৌলা বাগদাদ তথা ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ৯৮৩-৯৮৭ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন; তদীয় ভ্রাতা শরফুদ্দৌলা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ৯৮৭-৯৮৯ সাল পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন এবং তিনিও তদীয় ভ্রাতা বাহাউদ্দৌলা কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। বাহাউদ্দৌলা ৯৮৯-১০১২ খ্রি: পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর রাজত্ব করেন। তিনিই ছিলেন বুওয়াইহী বংশের শেষ শক্তিশালী সুলতান আমীর। তাঁর নির্দেশে খলিফা আত্তাই ৯৯১ সালে খেলাফত পদ হতে অপসারিত হন এবং আল কাদির বিল্লাহ তদস্থলে অভিষিক্ত হন। তার সময় হতে বুওয়াইহী বংশের অবক্ষয় শুরু হয়। তিনি স্বয়ং মাত্র চার বছর বাগদাদে অবস্থান করতে পারেন; পরবর্তী ছয় বছর তার দরবার বসরা অথবা ওয়াসিতে বসত। অবশিষ্ট চৌদ্দ বছর তিনি সিরাজ নগরীতে অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ দিন অশান্ত বাগদাদ নগরী শাসিত হতো তার প্রতিনিধি দ্বারা। বাগদাদে তার উজির পদে চলত পুতুল নাচের খেলা।[২৩] ইরাকের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সরদাররা স্ব স্ব এলাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে; তার প্রভাব বলয়ের সর্বত্র চলে বিদ্রোহ দমন কার্যক্রম। দেশ সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার শিকারে পরিণত হয়।

বাহাউদ্দৌলার পর সুলতানুদ্দৌলা ১০১২-১০২৪ খ্রি. এবং ইমাদুদ্দীন ১০২৪-১০৪৮ খ্রি. এবং সর্বশেষ আমির খসরু ফিরোজ মালিকুর রহিম ১০৪৮-১০৫৫ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তুগ্রীল বেগ দ্বারা তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলে বুওয়াইহী বংশের পতন ঘটে।

একাদশ শতকের প্রথম হতে বুওয়াইহী বংশের অবক্ষয়ের গতি ত্বরান্বিত হয়। দীর্ঘ কালীন অবক্ষয়ের সময় বাগদাদ নগরে অভূতপূর্ব এক নয়া রাজনীতি শুরু হয়। এই রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দুতে ছিলেন আব্বাসী খলিফা; আল কাদির বিল্লাহ এবং আল কাউম বি আমরিল্লাহ। এ সময় বাগদাদ নগরের অভ্যন্তরে এবং বাইরের বাস্তব অবস্থায় বেশ রূপান্তর ঘটে। মোতাওয়াক্কিলের নিষ্পেষণ ও নিবর্তনমূলক শাসনের ফলে আরব সাম্রাজ্যে মোতাজেলা বা অনুরূপ যুক্তিবাদী মতবাদের চর্চায় বেশ ভাটা পড়ে; কিন্তু বাগদাদের উপর বুওয়াইহীদের ধর্মনিরপেক্ষ শাসন প্রবর্তনের ফলে নতুন উদ্যোগে উদার জ্ঞান চর্চার পরিবেশ তৈরি হয়। এরূপ অবস্থায় সনাতনপন্থী রক্ষণশীল মহলে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। বাগদাদের অভ্যন্তরে শিয়া সম্প্রদায়ের ক্রমাগত সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও সনাতনী মহলের নিকট গ্রহণ যোগ্য ছিল না। যার ফলে বাগদাদ নগরে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা লেগে থাকত। দুর্বল বুওয়াইহী শাসকরা-অনেককাংশে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেও সম্পূর্ণ নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়। তদুপরি এ সময় মিশরে আব্বাসী প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতেমী বংশ প্রতিষ্ঠা এবং চতুর্দিকে তাদের বিস্তার

ঘটেছিল। আল মুইজের উত্তরাধিকারী আল আজীজ; এমেসা, হামা, আলেপ্পো ইত্যাদি অঞ্চলে তার প্রভাব বলয়ের বিস্তৃতি ছিল বাগদাদের আহলুস সুন্নাহের জন্য অশনিসঙ্কেত। এটা ছিল তৎকালীন বাস্তব অবস্থার একটা দিক। আরব সাম্রাজ্যের (আধ্যাত্মিক অর্থে) পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে যায়। এ বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন গজনী বংশ। পূর্বাঞ্চলের সামানীরা সুন্নি হলেও তাদের প্রভাব বলয়াধীন মসজিদে খোতবায় খলিফার নাম পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়, যেহেতু খলিফা ছিলেন শিয়া বুওয়াইহীদেব আশ্রিত। গজনী অধিপতি সুলতান আহমুদ সামানি শাসনকর্তা আব্দুল মালিককে মার্ভে পরাজিত করে খোবাসান হতে সামানিদেব বিতাড়িত কবেন এবং বাগদাদেব খলিফাকে একপত্রে আহলুস সুন্নাহদের ইমাম ও আমিরুল মোমেনিন হিসাবে আনুগত্য প্রকাশ করেন। পুনরায় খোতবায় তাঁর নাম পাঠ শুরু হয়। মাহমুদ তাঁরা মার্ভ জয়কে আবু মুসলিমের মার্ভ জয়ের সাথে তুলনা করেন। বস্তুত খলিফাকে তাঁর পূর্বপুরুষদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কবার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। প্রাচ্যের উদীয়মান তারকার সুন্নি সুলতানেব আনুগত্য, উপঢৌকন, পৌত্তলিক বিরোধী যুদ্ধ ঘোষণা খলিফাব জন্য ছিল খুবই আনন্দের। খলিফা মাহমুদকে ইয়ামিন উদ্দৌলা (সাম্রাজ্যের দক্ষিণ হস্ত) এবং আমিন উল মিল্লাত (ধর্মের জিম্মাদার) উপাধিতে ভূষিত কবেন। খোরাসান হতে বিতাড়িত হওয়ার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে সামানিদের শেষ ঘাঁটি বোখারাও তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। সমগ্র ট্রান্স অক্সিয়ানায় প্রতিষ্ঠিত হয় তারকেস্তানের সুন্নি ক্বাবখানী বংশ।

উল্লেখ্য যে, মাহমুদের মৃত্যুর সাথে গজনি রাজ্যের গুরুত্ব হ্রাস পায়, কিন্তু এ সময় সুন্নি গুজতুর্কি বংশের উত্থান হয়। সুলতান মাহমুদের মৃত্যু এবং কায়েম বিন আমেরিল্লাহে খলিফা পদে আরোহণ প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সেলজুক নেতা তুঘ্রীল বেগ দ্রুত জুরজান, পারস্য, ইয়াওয়াবিজ এবং পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ দখল করেন। শ্রীঘ্রই তিনি উপনীত হন উত্তর পারস্যে। বুওয়াইহীরা সেখানে তার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় বাগদাদের খলিফা কায়েম বিআমরিল্লাহ্ স্বাভাবিকভাবে উৎসাহিত হবেন।

উল্লেখিত পরিস্থিতির আলোকে বাগদাদের খলিফাদ্বয়ের আচরণ ও কার্যকলাপ বিবেচ্য। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, কাদির বিল্লাহ বাহাউদ্দৌলার নিদের্শে খেলাফতে সমাসীন হন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, তিনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ, সৎ, গুণবান মানুষ। তিনি তাঁর অধিকাংশ রাত্রি উপাসনায় অতিবাহিত করতেন। তিনি ছিলেন দানশীল এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। বাগদাদের খলিফাগণ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হতে বঞ্চিত হলেও সমগ্র আহলুস সুন্নাহ সম্প্রদায়ের উপর তাদের ছিল আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব। উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে যেমন তার ধর্মীয় প্রতিপত্তিও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা ছিল। তেমনি তা রক্ষা করার মত অবস্থা ও সৃষ্টি হয়। তাই দেখা যায় তিনি

ধর্মীয় নেতৃত্ব দৃঢ় করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ধর্মীয় অধিকারে কারও হস্তপেক্ষ বরদাস্ত করতে রাজি নন।

বাহাউদ্দৌলাহ আলী বংশীয় আবু আহম্মদ মুসাভীকে প্রধান বিচারপতি, মাজালিম আপিল কোর্টের প্রধান এবং শিয়া নকিব হিসাবে নিয়োগ দান করেন। খলিফা তার এ নিয়োগকে ধর্মীয় অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ করেন। এর ফলে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ব্যতীত খলিফার অন্যান্য কাজি নিয়োগের অধিকার স্বীকৃত হয়। আরো একটি ঘটনা ঘটে। মোসুলের শিয়া শাসনকর্তা কিরওয়াস বিন মুকাল্লাদ তার খোতবা হতে খলিফার নাম খারিজ করে ফাতেমী খলিফা আল হাকিমের নাম পাঠের ব্যবস্থা নেয়। খলিফা আল কাদের বিল্লাহ -এর প্রতিবাদ করেন। সিরাজে অবস্থানরত বাহাউদ্দৌলার নিকট তার দূত আবু বকর বাকিলানীকে প্রেরণ করেন। বাহউদৌলার তৎক্ষণাৎ মোসুলের শাসককে তার কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করেন। মোসুলে পুনরায় খোতবায় খলিফার নাম পাঠ চালু হয়। এই সাফল্যে আল কাদির বিল্লাহ উৎসাহিত হন এবং সম্ভবত সুন্নি জনতার সামনে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[২৪]

এবার তিনি আরো গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। মিশরে ফাতেমী বংশ ছিল আব্বাসীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তারাই অন্তত তত্ত্বগতভাবে ইসলামি উম্মাহর ধর্মীয় নেতৃত্বের দাবিদার। তাই খলিফা ফাতেমীবিরোধী প্রচার অভিযান পরিচালনা করেন। মিশরের ফাতেমীদের বংশ পরিচয়ের সত্যতা সম্পর্কে জনতার মধ্যে প্রশ্ন উত্থান করেন। ধর্মীয় প্রধান হিসাবে তাঁর সভাপতিত্বের ধর্ম বিশারদমণ্ডলীর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় তৈরি হয় একটি ঘোষণাপত্র। এতে ফাতেমীদের বিরুদ্ধে অভিসম্পদ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং চতুর্দিকে এই ঘোষণাপত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। মজার ব্যাপার উক্ত ঘোষণাপত্রে অসংখ্য গণ্যমান্য সুন্নি পণ্ডিত তো বটেই অনেক শিয়া বুদ্ধিজীবীও স্বাক্ষর করেন। এবার দেশের অভ্যন্তরে অকৃত্রিম মৌল ইসলামের রক্ষক হিসাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খলিফা আল কাদির ধর্মীয় সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মূল ধর্মের স্রোতধারায় যুগযুগ ধরে যে সব বেদায়াত নতুন ভাবধারা বা বিধর্মী আচরণ মিশে আছে তার বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন। যুক্তিবাদী চেতনা ও মোতাজিলা মতবাদ ইসলাম ধর্মের মূল সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। পুনশ্চ খলিফা সুন্নি ইসলাম বিশেষজ্ঞদের একটি সভা আহবান করেন। উক্ত সভায় সুন্নি ইসলামের সংজ্ঞা এবং তার একটি সারসংকলন করে আরেকটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। তাদের সংজ্ঞায়িত সুন্নি ইসলামের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রকার প্রচার হবে ধর্মবিরোধী। যুক্তিবাদ নিন্দনীয় এবং মৌল মতাদর্শের অবিকল অনুসরণ একান্ত প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণাপত্রে জোর দেয়া হয়। খলিফা কায়েম বিন আমরিল্লাহ তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং ফাতেমীদের প্রচলিত দিনার দিয়ে ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন।[২৫] সৈয়দ আমির আলী এসব কর্মকাণ্ডের জন্য তাদেরকে সংকীর্ণমনা, মৌলবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে

মূল্যায়ন করেছেন।[২৬] যুক্তিবাদ স্তব্ধ করা বা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করা নিঃসন্দেহে প্রগতি বিরোধী পদক্ষেপে; মোতাজিলা নিধনকে পরমত অসহিষ্ণুতার নিদর্শন। এ সবের ফলে বাগদাদ নগরীতে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে দাঙ্গা নতুন মাত্রা পায়। এ সম্পর্কে মফিজুল্লাহ কবির এক চমৎকার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন এ সব দাঙ্গায় সুন্নিরাই উদ্যোগী ভূমিকা নেয়।[২৭] ঘোষণাপত্রে ধর্মীয় মতাদর্শকে কঠোরতা দেয়ার অর্থই হল অবস্থানুসারে ধর্মীয় চিন্তার বিকাশ ধারাকে স্তব্ধ করা। আল কাদির বা আল কায়েম সমগ্র সুন্নি জনতাকে তাদের পশ্চাতে সমবেত রেখে বুওয়াইহী হতে মুক্তি পাওয়ার আশায় বাগদাদ নগরীতে সূক্ষ্ম ধর্মীয় রাজনীতি চালু করেন।

৮.৬ বুওয়াইহী বংশের পতনের কারণ বিশ্লেষণ

সবদিক বিবেচনা করলে বলা যায় যে বুওয়াইহীরা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ জাহানদারি সালতানাতের প্রবক্তা। উল্লিখিত বুওয়াইহী অবক্ষয়ের সময় প্রাচ্যে আর এক নয়া শক্তির বিকাশ ঘটে। এই শক্তি হল তুগ্রিল বেগের নেতৃত্বাধীন তুর্কি জাতিসত্তার গুজ গোত্রের সেলজুক পরিবার। এই উদীয়মান পরিবার ১০৪৩ সালে বলখ জুরজান, তাবারিস্তান, খাওয়ারিজম, হামাদন, রায়, ইস্পাহান ইত্যাদি প্রদানত করে। তুগ্রিল বেগের লক্ষ্যস্থল ছিল বাগদাদ। ১০৫৫ সালে তাকে বাগদাদ দখল করার আমন্ত্রণ জানান হয়। এই অনুন্নত অথচ উদীয়মান শক্তি এরূপ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে না।

তুগ্রিল বেগের বাগদাদে আমন্ত্রণের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল মালিকুর রহিমের প্রধান তুর্কি সেনাধ্যক্ষ আবুল হারিস আরসালান আল বাসাসিরি এবং খলিফা আল কায়িমের সচিব ইবনে মাসলামার মধ্যকার ক্ষমতার লড়াই। বাগদাদে এ প্রধান দু কর্ম কর্তার মধ্যে বাসাসিরি ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইবনে মাসলামা ছিলেন একজন কট্টোরপন্থী হাম্বলী সুন্নি। উভয়ের মধ্যে প্রাধান্যের লড়াইতে পরস্পরের প্রতি দোষারূপ শুরু হয়। বাসাসিরিকে বলা হয় ফাতেমী এজেন্ট, ইবনে মাসলামাকে বলা হয় সেলজুকি এজেন্ট। উভয় পক্ষের রেষারেষি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, আল বাসাসিরি যখন কুরাইশ বিন বাদরানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন তখন ইবনে মাসলামা ইবনে বাদরানের পক্ষাবলম্বন করেন। ইবনে মাসলামাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য তার আত্মীয়স্বজনের বাণিজ্য বহরের উপর সরকারি কর আরোপ করা হয়; এবং তাদের অনেকের বেতন ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বাসাসিরি মালিকুর রহিমের সাথে ওয়াসিত অভিযানে বাগদাদ ত্যাগ করেন। বাসাসিরির অনুপস্থিতির সুযোগে ইবনে মাসলামার উদ্যোগে খলিফার অনুমতিক্রমে শরিয়ত আইন বলবত করার জন্য অসংখ্য মদের পাত্র রাজধানীর রাজপথে ভাঙ্গা হয়; এবং তথাকথিত বেদায়তির কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; বাগদাদের তুর্কি সমাজের লোকজনকে বুঝান হয় যে, তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য বাসাসিরিই দায়ী। উন্মত্ত জনতা খলিফার অনুমতিক্রমে বাসাসিরির গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে।

ইবনে মাসলামা খলিফাকে জ্ঞাত করান যে, বাসাসিরি কায়রোর ফাতেমি খলিফা মুস্তানসিরির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন খলিফা তৎক্ষণাৎ মালিকুর রহিমকে বাসাসিরির সাথে সকল সম্পর্ক ছেদ করার জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেন। একই সাথে রায় নগরে অবস্থানকারী উদীয়মান তারকা সুন্নি তুগ্রিলবেগকে বাগদাদে আগমনের আমন্ত্রণ জানান। তুগ্রিল অপেক্ষা না করে খলিফার প্রতি সকৃতজ্ঞ আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং বাগদাদের আবাসিক তুর্কি সমাজের প্রতিও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তুগ্রিলবেগ মক্কায় হজব্রত পালন করে সিরিয়া হতে ফাতেমী বংশ উচ্ছেদ করে। এরপর তিনি বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। এ খবর পেয়ে মালিকুর রহিম ওয়াসিত হতে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। বাসাসিরি অনুন্যোপায় হয়ে রাহিবাহে গমন করে কায়রোর ফাতেমী খলিফা মুস্তান সিরের নামে খোতবা পাঠ করেন। ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। খলিফা বাগদাদের মসজিদসমূহের খতিবদেরকে খলিফা নামের পর এবং মালিকুর রহিমের নামের পূর্বে তুগ্রিল বেগের নাম পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করেন। ইত্যাবসরে সদলবলে তুগ্রিলবেগ বাগদাদের উপকণ্ঠে উপনীত হয়ে খলিফার নিকট বাগদাদে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। ইবনে মাসলাম তড়িৎ বেগে নাহরোয়ান খালে উপস্থিত হয়ে তুগ্রিলবেগকে মুস্বাগতম নিবেদন করেন। তুগ্রিলবেগ ১০৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বাগদাদে প্রবেশ করেন। বেচারা মালিকুর রহিম তুগ্রিল বেগের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। তার বিরুদ্ধে তিনি কোনো রকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি সত্য, কিন্তু বাগদাদ নগরীর একদল লোক ঐ আগন্তুকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যত দোষ নন্দ ঘোষ। এর সকল দায়দায়িত্ব মালিকুর রহিমের উপর চাপান হয়। ভাগ্যের কি পরিহাস। বাগদাদ প্রবেশের কয়েক দিনের মধ্যে মালিকুর রহিম ও তাঁর দলবলকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে প্রথমে জাবাল প্রদেশে এবং পরে রায় নগরের এক দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। এই কারাগারেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২৮]

চরম রাজনৈতিক সংকট, সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং পঙ্গু অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বুওয়াইহীরা বাগদাদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলে বাগদাদের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয়; আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়; বুভুক্ষু নগরবাসী পায় খাদ্য শস্য; বাণিজ্যিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। শহরের রাস্তাঘাট রুগ্ন বসতবাড়ি মেরামত করা হয়; খাল, নালা খনন বা পুনঃখনন করে সেচ ব্যবস্থার পুনর্বাসন করা হয়, পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু বাগদাদের এ অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। বরং একাদশ শতকের প্রথম হতে বুওয়াইহীদের অবক্ষয় শুরু হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে চলে তাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং অবশেষে তুগ্রিল বেগের অভ্যুত্থানে তাদের পতন ঘটে। তাদের পতনের কারণ বিশ্লেষণে পি. কে. হিট্টির একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : The wars between Baha Sharf and their borther Samsamuddawla the dynastic and family quarries carried on among their

Successor and the Buwayhid Shite ...... Which were deeply resented in sunnite Bagdad, led to the fall of the dynasty.[২৯]

মধ্যযুগের সামন্ত সমাজ জীবন বেশি পরিমাণে নিস্তরঙ্গ হওয়ায় সকল রাজবংশের উত্থানপতনের মূল কাহিনী প্রায় এই রকম হয়। প্রফেসর হিট্টির উক্ত মন্তব্যে এরূপ মতামতের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নিঃসন্দেহে যে কোনো শাসক পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিরোধ সমগ্র শাসক শ্রেণীর মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ে, ফলে স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়। বস্তুত আজুদুদ্দৌলার মৃত্যুর পর বুওয়াইহীদের পরিবারের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে; বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সফল হয়; আমলা অভিজাত, সেনাবাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাই পারিবারিক দ্বন্দ্ব অবশ্যই তাদের পতনের একটি কারণ বটে; তবে এরূপ অনৈক্যের মূলে অন্য মৌলিক কারণ থাকাই স্বাভাবিক। আব্বাসী খেলাফতের যুগে বুওয়াইহী সুলতানের নিকট রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্থানান্তরের ফলে অবশ্যই একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। খোলাফায়ে রাশেদীন যুগের পর উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা ছিল যেমন একটি নয়া অভিজ্ঞতার বিষয়; এক্ষেত্রে দেখা দেয় হেজাযী ঐতিহ্যে নয়া ব্যঞ্জনা। তেমনি এটাও ছিল আরেকটি অভিনব ঘটনা; ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের নয়া বিভক্তি; আরো একটি অভিনব অভিজ্ঞতা আরব সাম্রাজ্যের প্রবল সংখ্যা গুরু আহলুস সুন্নার উপর তথাকথিত শিয়া মতাবলম্বীদের শাসন। অবশ্যই শিয়া শাসন স্বয়ং খলিফার নিকট যেমন ছিল অস্বস্তিকর ব্যাপার, তেমনি সুন্নি জনতার নিকটও ছিল বেসুরো। তাই বাগদাদের অভিজাত সুন্নি মহলে গভীর ক্ষোভের কারণ বলে হিট্টি মন্তব্য করেন। নিঃসন্দেহে শিয়া মতাবলম্বী বুওয়াইহী সুলতান পেয়ে শিয়া জনতার উৎসাহিতবোধ করাই স্বাভাবিক এবং বিশেষ করে এ সময় তারা তাদের বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের স্বাধীনতা পায়। অবশ্য এটা ছিল বহুমাত্রিক সমাজের একটি অংশের সাংস্কৃতিক অধিকার প্রাপ্তির বিষয় মাত্র। অন্য অংশের তাতে ক্ষোভের কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু মধ্যযুগে এরূপ রাজনৈতিক চেতনা ছিল দুর্লভ। এরূপ একটি নয়া পরিস্থিতিতে কট্টর পন্থী শিয়া সুন্নি দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। একই সাথে একথাও স্মরণীয় যে, এ দ্বন্দ্ব বুওয়াইহী সুলতানদের সৃষ্টি নয়; তারা এটা আদৌ পছন্দ করত না, বরং তারা এ বিরোধ নিরসনের জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং তাদের সাফল্য কম নয়। শিয়া সুন্নি দ্বন্দ্ব বুওয়াইহীদের পতনের অন্যতম কারণ হলেও তা অবশ্যই গুরুতর কারণ নয়। বরং এরূপ দ্বন্দ্বের পশ্চাতে নিহিত ছিল আরো গভীর কারণ। আরব সাম্রাজ্যে বুওয়াইহীদের ব্যাপক ইকতা ব্যবস্থা প্রবর্তন অবশ্যই দেশের জন্য মঙ্গলজনক হয় নি। এতে কৃষক, শিল্পী, উৎপাদকরাই বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার পুঞ্জিভূত কুপ্রভাব শহরবাসীর উপর পড়ে। তুর্কি-বুওয়াইহীদের সেনাবাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের একটি বড় কারণ ছিল ইকতা ব্যবস্থা। এতে নতুন সমাজ বিন্যাস দেখা দেয়, নতুন সামাজিক সমস্যাও দেখা দেয়।

এতদসত্ত্বেও আধুনিক গবেষক শাবান মনে কবেন যে, বুওযাইহী আমলেব প্রথমাংশে বাগদাদেব যে সমৃদ্ধি পবিলক্ষিত হয তাব মূলে ছিল বুওযাইহীদেব বাণিজ্যনীতি, ভেঙ্গে পড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে পুনবায চাঙ্গা কবতে তাবা সক্ষম হয এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত বাখাব জন্য পাবস্য উপসাগব ও ভাবত মহাসাগবেব উপব তাদেব নিযন্ত্রণ ছিল। তাদেব শাসনামলেব শেষার্ধে সমগ্র বিশ্ব পবিস্থিতিতে এক নযা অবস্থাব সৃষ্টি হয। এই পবিস্থিতিতে বিশ্ব বাণিজ্য কাঠামোব আমূল পবিবর্তন হয। ঘটনাব সাবসংক্ষেপ এরূপ মধ্য এশিযাব পেচেঙ তুর্কি জনগোষ্ঠী এ সময বিকাশ উন্মুখ হয। এই যাযাবব নবগোষ্ঠী ভলগা অববাহিকায ক্রমাগত দস্যুতা ও আক্রমণ পবিচালনা শুরু কবে। এই উদীযমান যাযাববদেব ক্রমবর্ধমান আক্রমণেব মুখে রুশ জাতিসত্তাব আত্মবক্ষাব তাগিদে বাশিযাব উত্থান ঘটে। রুশদেব সাথে বলগাবদেব সুসম্পর্ক স্থাপিত হয। চীনাসহ সমগ্র উত্তবেব বাণিজ্য কিভ ও কনস্টান্টিনোপলস দিযে প্রবাহিত হয। ইতালীব উদীযমান বণিক বাষ্ট্রগুলো উক্ত বাণিজ্যে অংশগ্রহণ কবে। ভূমধ্য সাগব হযে উঠে বাণিজ্য চঞ্চল। এই নযা বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হওযায সমগ্র মধ্য এশিযা ও ককেশাস অঞ্চল নযা বাণিজ্য প্রতিযোগিতায পবাজয ববণ কবে। এব ফলে ইবান-ইবাক বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয। আমাদেব আলোচ্য সমগ্র অঞ্চলেব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থুবড়ে পড়ে। যে বায নগবেব বাণিজ্য পথ নিযে সামানি-বুওযাইহীদেব মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল–তাব বাণিজ্যিক গুরুত্ব একেবাবে শেষ হযে যায। সামানিদেব পতন অনিবার্য হযে পড়ে। এখানেই কাহিনীব শেষ নয। উত্তব বাণিজ্যব সাথে দক্ষিণ বাণিজ্যেব পথও আবব সাম্রাজ্যেব হাত ছাড়া হয। এ সময ফাতেমীবা ভাবত মহাসাগবীয বাণিজ্য মিশবেব দিকে আকর্ষণ কবে। বস্তুত উত্তব দক্ষিণ বাণিজ্যে বিনষ্ট হওযায বুওযাইহী সাম্রাজ্য দেউলিযা হযে পড়ে। একাদশ শতকেব প্রথমার্ধে এতদঞ্চলেব অবস্থাব এরূপ রূপান্তবেব আলোকেই বাগদাদেব অভূতপূর্ব সামাজিক অস্থিবতা, তুর্কি দাযলামি সামবিক অভিজাতদেব মধ্যে বিবোধ, শিযা-সুন্নিদেব দ্বন্দ্ব, স্থবিব চিন্তাব প্রাধান্য, নতুন নতুন কুসংস্কাবেব জাল বিস্তাবেব বহস্য উদঘাটন কবা সম্ভব। যা হোক উল্লিখিত বাস্তব পবিস্থিতিতে ১০২৯ সালে বুওযাইহী সাম্রাজ্যেব পূর্বাঞ্চলেব বড় অংশেব উপব চবম বক্ষণশীল সুলতান মাহমুদেব সামবিক শক্তিব প্রভাব বলয সৃষ্টি হয। বুওযাইহীবা মূলত এই পবিস্থিতিব শিকাব।[৩০] বুওযাইহীদেব পতনেব মৌল ও প্রধান কাবণ নিহিত ছিল এরূপ পবিস্থিতিতে।

আঠাব শতকের পূর্ব পর্যন্ত এই উদীযমান পবিস্থিতিব তাৎপর্য উপলব্ধি কবা যায নি। ববং বুওযাইহীদেব পতনেব সাথে মুসলিম উম্মাব জগতে সামন্ততান্ত্রিক আমলা তান্ত্রিক সমবতন্ত্রেব বিকাশ হয। মজাব ব্যাপাব এ সময ক্রসেডেব ঘটনা এবং বাগদাদ নগবেব পতন যতই দুঃখজনক হক না কেন, কি ইসলামি বিশ্বেব সম্প্রসাবণ এবং দিগ্বিজযেব নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হয। উদীযমান তুর্কি জাতিসত্তা পূর্বে ভাবতীয উপমহাদেশ ও পশ্চিমে পূর্ব ইউবোপেব ভিযেনা নগবেব দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত বিজয কেতন

উড়িয়ে দেয়। এত বিজয় উল্লাসে তারা ঐ মূল অবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে নি বলে তাদের সমরতন্ত্র ও অচল হয়ে পড়ে। ক্রুসেডেই তার প্রথম প্রমাণ মেলে। আঠার শতক হতে ইউরোপীয় নয়া বাণিজ্য শক্তির আঘাতে সমগ্র ইসলামি বিশ্বের উপর দুর্ভাগ্যের করাল ছায়া নেমে আসতে শুরু করে এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তার পতন সম্পূর্ণ হয়।

তথ্যপুঞ্জি

১. Shaban, Abbasid Revolution, op. cit pp -15
২. Shaban, Islamic Histoy, II op. cit p 159
৩. Mafizullah Kabin, The Buwayheed Dynasty of Bagded (Calcutta, 1967) pp 1-2
৪. Ibin Hawqal, Saratul Ard, ed J.H Kremer, (Feiden 1938) pp 577-92
৫. Shaban, op. cit. pp. pp. 160-61
৬. Ibid p 161
৭. Ibid pp 161
৮. Mafizullah Kabir, op. cit pp 146-7
৯. Shaban, op cit pp 162-64
১০. Ibid p 165
১১. Mafizullah Kabin, op. cit pp 201-213
১২. Shaban, op cit p 162
১৩. bid p 166
১৪. Mafizullah Kabin, op. cit pp 42-46
১৫. Shaban, op cit p 183
১৬. Mafizullah Kabin, pp 56-57
১৭. Ibid p 54
১৮. Hitti, op cit p 471
১৯. Ibid p 472
২০. Mafizullah Kabin, op. cit p 212
২১. Hitti, op. cit p 472
২২. Shaban, op cit p 148
২৩. Mafizullah Kabin, op. cit p 58-59
২৪. Ibid p 85
২৫. Ibid pp 96-98
২৬. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৯
২৭. Mafizullah Kabir, op. cit p 205
২৮. Ibid p 113-115
২৯. Hitti, op. cit. p. 473
৩০. Shaban, op. cit p 186-87

নবম অধ্যায়

ক্রুসেড (১০৯৫-১২৯২ খ্রি.)

৯.১ ক্রুসেড: কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

অজস্র মধুর-বিধুর স্মৃতি বিজড়িত এবং ইহুদি-মুসলিম-খ্রিষ্টানদের পবিত্র ধাম প্যালেস্টাইন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার সময় তৎকালীন বৃহৎ শক্তি বাইজানটাইনকে বিতাড়িত করে স্থানীয় জনতার সাথে একটি শান্তিচুক্তির মাধ্যমে প্যালেস্টাইন তথা সমগ্র সিরিয়া আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উদীয়মান আরব জাতির জন্য এ মহতী বিজয় ছিল বিস্ময়কর; অথচ সহজসাধ্য;[১] উক্ত শান্তিচুক্তিটি ছিল মধ্যযুগের বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের একটি অনুপম দলিল।[২] উক্ত পবিত্র স্থানটি মুসলিম কবল হতে মুক্ত করার নামে পবিত্র ক্রুস পরিহিত অভূতপূর্ব ধর্মীয় উন্মত্ততা ও যুদ্ধের নেশায় বিভোর ইউরোপের উদীয়মান খ্রিষ্টান জগতের অসংখ্য ব্যক্তি ১০৯৫ সালে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তাল তরঙ্গের মত উপচে পড়ে এবং ১২৯২ সাল পর্যন্ত এতদাঞ্চলে তাদের উপস্থিতিতে যে যুদ্ধাবস্থা প্রবাহমান থাকে এবং দীর্ঘ সময়ের মাঝে মধ্যে এর জ্বালামুখ হতে যে যুদ্ধলাভা নির্গত হয়, মধ্যযুগের ইতিহাসে তাই ক্রুসেড নামে সমধিক পরিচিত। এ যুদ্ধাবস্থা প্রায় দু'শো বছর ব্যাপী স্থায়ী হয়।

অনেক ঐতিহাসিক সমগ্র ক্রুসেডকে ৭, ৮, ৯টি সংখ্যায় ভাগ করে থাকেন; কিন্তু প্রফেসর হিট্টি ক্রুসেডকে এরূপ সংখ্যায় বিভাজন সন্তোষনজক নয় বলে মনে করেন।[৩] কেননা সামগ্রিকভাবে ক্রুসেড ছিল একটি ঘটনাপ্রবাহ, তাই বিভিন্ন ক্রুসেডের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ছেদ রেখা টানা চলে না। তিনি আরো বলেন যে, এই ঘটনা প্রবাহের গতি-প্রকৃতি ও পরিণতির সহজ উপলব্ধির জন্য একে তিনটি অংশে বা পর্বে যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাগ করা যেতে পারে। পর্বগুলি নিম্নরূপ : প্রথম পর্ব ১০৯৫-১১৪৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সূচনা হয় রুমী সেলজুকের উপর ইউরোপীয় খ্রিষ্টান জগতের প্রথম আক্রমণ দিয়ে এবং ১১৪৪ সালে মোসুলের আতাবক জঙ্গী কর্তৃক রূহা বা এডেসার পুনরুদ্ধার দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই পর্বে পশ্চিম এশিয়া ও এশিয়া মাইনরে ইউরোপীয় খ্রিষ্ট শক্তি ছিল প্রবল আগ্রাসী ভূমিকায়। দ্বিতীয় পর্ব ১১৪৪-১১৯২ সাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এ পর্বে তুর্কি জঙ্গী পরিবারের নের্তৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, প্রতি আক্রমণ এবং বিজয় অর্জনের সূচনা হয় এবং জঙ্গী পরিবারের অনুগৃহীত কুর্দী বীর সালাহদ্দীনের বিজয় এবং ১১৯২ সালে তার মৃত্যুতে এই পর্বের ছেদ পড়ে। তৃতীয় পর্ব ১১৯৩ সালে আরম্ভ হলেও এয়োদশ শতাব্দীর ১২৯১ সালে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এ পর্বে ক্রুসেডাররা সিরিয়া-প্যালেস্টাইন হতে বিতাড়িত হয়। পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম শিবিরে ছোটখাট গৃহযুদ্ধ থাকলেও এ সময়কে আইয়ুবীয় মামলুক

বংশের নের্তৃত্বে সিরিয়া-মিশরের একত্রিকরণের যুগ বলা চলে। এ সময় ক্রুসেডাররা ১২০২-৪ সালে কনস্ট্যান্টিনোপলের বিরুদ্ধে একটি, মিশরের বিরুদ্ধে (১২১৮-২১ সালে) দুটি এবং ১২৭০ সালে তিউনিসের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করে।[৪]

ক্রুসেড কি কোনো আকস্মিক ঘটনা? ইতিহাসে কি কোনো আকস্মিক ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়? সাধারণ আলোচনায় মনে হয়, ক্রুসেডের পশ্চাতে কেবল ধর্মীয় প্রেরণাই ছিল একমাত্র চালিকা শক্তি। অবশ্য আজকাল আধুনিক গবেষকরা এরূপ প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে চান না; যদিও এ কথাও সত্য যে, আজকাল দেশ জাতির সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে আত্মরক্ষামূলক অথবা আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে এক কাতারে সামিল করা সম্ভব হলেও মধ্যযুগে ধর্মের বিকল্প কি কিছু ছিল? ধর্ম ছিল সে যুগের রাজনৈতিক ভাষা ও মূল্যবোধের অভিব্যক্তি।[৫] একইভাবে একথাও সত্য যে, মধ্যযুগে ঐ ধর্মের আড়ালে ছিল আরো গভীর বাস্তব আর্থ-সামাজিক কারণ। এই বাস্তবতার উদঘাটন ব্যতীত ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহের অতি সরলীকরণের নামান্তর হয়, সত্য দৃষ্টি হতে অনেক দূরে চলে যায়। বস্তুত ক্রুসেডের কারণ-গতি প্রকৃতি ও তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য ক্রুসেড প্রাক্কালে ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার বাস্তব অবস্থা বা তার প্রেক্ষাপট বিবেচনার দাবি রাখে।

ক্রুসেড প্রাক্কালে প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বের বাস্তব অবস্থা

প্রথমে আমরা প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বের বাস্তব অবস্থাটির দিকে দৃষ্টিপাত করি। ইতিপূর্বে আব্বাসী খেলাফতের বিচ্ছিন্নতাবাদের নয়া প্রকাশ এবং দশম শতাব্দীর ৯২৩ সাল হতে তার চরম রাজনৈতিক সংকট এবং খেলাফতের প্রচণ্ড অবক্ষয়ের কথা এবং একই সাথে প্রাচ্যের অনারব মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণ ও তাদের স্বকীয় বিকাশ-বুওয়াইহী কর্তৃক বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ, রাজ্য শাসন; পুনশ্চ তাদের অবক্ষয়, পতন; সেলজুক তুর্কি জাতিসত্তার উত্থান এবং সমগ্র আরব সাম্রাজ্যের ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রতাপের সাথে অর্ধশতাব্দী সাম্রাজ্য শাসন এবং ইসলামের নয়া দেশ বিজয়ের গৌরবের ইতিহাস সৃষ্টির ইতিকথার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অল্পদিনের মধ্যে একাদশ শতকের শেষের দিকে সেলজুকদের অবক্ষয় শুরু হয়। বস্তুত ইসলামি বিশ্বের উন্নয়ন-অবক্ষয়- পতন চক্রাকারে যেন আবর্তিত হতে থাকে। এটা ইসলামি বিশ্বের বিশেষ অবস্থা নয়; এটা সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। সামন্ততন্ত্রের সম্ভাব্য বিকাশের পর তার মূল সমস্যার সমাধান না হলে অবক্ষয় ও পতন চক্রে আবর্তন দেখা দেয়, বিকাশ হয় না। কৃষি বিপ্লব না হওয়ায় ইসলামি বিশ্বের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বিকশিত করা দূরের কথা তাকে ধরেও রাখতে পারে নি। এরূপ বাণিজ্যিক অবক্ষয়কালে সেলজুকদের উত্থান হয় এবং একই সাথে তারা পতনের মুখোমুখী হয়।

মালিক শাহের সময় সেলজুকরা গৌরবের উচ্চ শিখরে ওঠে। এশিয়া মাইনর ও আর্মেনিয়াকে তাবা পদানত করে এবং এশিয়া মাইনরে তুর্কিকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা করে। পূর্ব ইউরোপে তাদের প্রভাব বলয় বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কায় বাইজানটাইন সাম্রাজ্য সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

ইতালী ও কনস্টান্টনোপলের উদীয়মান ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য বেশ বড় রকমের হুমকির মুখোমুখী হয়। মালিক শাহের মৃত্যুর পর সেলজুক পরিবারের ঐক্য বিনষ্ট হয়। এশিয়া মাইনের স্বতন্ত্র রুমী সেলজুক পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র মুসলিম প্রাচ্য একীভূত করার উদ্দেশ্যে তারা সিরিয়াকে পদানত করে। ১০৭০ সালে আলপ আরসালান আলেপ্পোর আরব শাসন কর্তাকে তার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে; এবং তার সেনাধ্যক্ষ আতসিজ জেরুজালেমে প্রবেশ করে ফাতেমিদেরকে উৎখাত কবেন। এর পাঁচ বছর পর আতসিজ দামাস্কাস হতে শিয়া কর্তৃত্ব ধ্বংস কবে; কিন্তু ১০৯৮ সালে ফাতেমিরা জেরুজালেম পুনঃদখল করে এবং শক্তিশালী রণতরী ব্যবহার করে পুনরায় আসকালান, আক্রা, টায়ার এবং জরায়েল দখল করে নেয়। আলপ আরসালান পুত্র তুতুশ সিরীয় সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আর খোরাসান উত্তরাধিকারের সাথে আলেপ্পো, রূহা ও মোসুল সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু পববর্তী বছরে এক যুদ্ধে তার পতন ঘটলে তার সিরিয়া রাজ্য বাটওয়ারা হয়ে যায়। তদীয় পুত্র রিজওয়ান আলেপ্পোকে তার রাজধানী করে এবং এখানে ১০৯৫-১১১৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অপর পুত্র দায়রুক দামাস্কাসে ১০৯৫-১১০৪ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১০৮৯ সালে ত্রিপলি শিয়া বনু আম্মার দ্বারা শাসিত হয়। ১০৮১ সালে বনু মুনকিদ শায়জার দখল করে Byzantins were time and again capturing and losing town, along the east and on the northern fronteer· বাইজানটাইন শক্তি সিরিয়ার উপকূলীয় এবং উত্তর সীমান্তের বিভিন্ন শহর দখল ও পুনঃদখল করে।[৬] উপরের বর্ণনা হতে পশ্চিম এশিয়ার বাস্তব অবস্থা ফুটে ওঠে; এখানে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ, সেলজুকদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব মিলিয়ে এক দুর্বল অবস্থার সৃষ্টি করে। ঐক্য শক্তি এখন অতীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। বিচ্ছিন্নতা ও অবক্ষয় প্রাধান্য পায়।

৯.২ ইউরোপের রূপান্তর প্রক্রিয়া

শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির যে কোনো ক্ষেত্রে দ্বাদশ শতকের প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বের সাথে সমসাময়িক ইউরোপের কোন তুলনা হয় না। তবে একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয় তা হলো, মুসলিম বিশ্ব এ সময় যেন একটি আন্তঃসারশূন্য শক্তি। বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হলেও উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে এর উত্তরণ না ঘটিয়ে তার অবক্ষয় হয়ে ওঠে প্রকট; এটা ছিল দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। সমসাময়িক ইউরোপ ব্যাহত তুলনামূলকভাবে খুবই পশ্চাৎপদ হলেও বাস্তবে সে তখনই উদীয়মান শক্তি; কোনোক্রমে ক্ষয়িষ্ণু নয়। ইতিহাসে উদীয়মান শক্তি খুব কমই তুচ্ছ হয়।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ৪৭৬ (খ্রি.) 'মহাবিশৃঙ্খলার' মধ্যে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যেব পতন ঘটে। পতনের পূর্বে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বারবার দাস বিদ্রোহ এবং পেট্রিসিয়ান-প্লেবিয়ান দ্বন্দ্বের পরিণতিতে গ্রীকো রোমক শক্তির মূলভিত্তি দাসতা অর্থনীতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।[৭] নগর ও শহর আক্রমণকারী ও বিদ্রোহীদের লক্ষ্যবস্তু হওয়ায় অনেকে দাসদেরকে মুক্ত করে গ্রামে গ্রামে তাদের আবাসন প্রক্রিয়া ও কৃষিকর্মের নয়া প্রণালী শুরু করে। তদুপরি সমগ্র ইউরোপ প্রচণ্ড অশান্ত পরিবেশে প্রাণোচ্ছল জার্মান জাতিসমূহের সৃজনশীল প্রতিভায় গ্রামভিত্তিক যে নতুন আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাই ইউরোপীয় সামন্তবাদ নামে পরিচিত।[৮] পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের পতন হতে ইউরোপে প্রাক শিল্প বিপ্লবের যুগকে এক সময় ইউরোপীয় মধ্যযুগ তথা অন্ধকাব যুগ বলার প্রবণতাই ছিল প্রবল। আধুনিক গবেষণায় অন্ধকার-যুগ তত্ত্ব ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।[৯] বস্তুত পশ্চিম ইউরোপের ভৌগোলিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্যাস সাধনে জার্মান জাতিসমূহের ভূমিকা ছিল প্রবল।[১০]

জর্মান জাতিগুলোর মধ্যে যখন সামাজিক শ্রেণী ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তখন তারা প্রচণ্ড সামরিক অভিযানে রোমক সাম্রাজ্যের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ জয় কবে রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে বসতি স্থাপন করার পর তারা অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথমে পশ্চিমে গথ রাজ্য পরে বার্গাণ্ডী রাজ্য গড়ে ওঠে। উত্তরাঞ্চলে ফ্রাঙ্কদের রাজ্য ছিল বেশ প্রবল; তাছাড়া ব্রিটেনে কতকগুলো এ্যাংলো স্যাকসন রাজ্য গড়ে ওঠে, সর্বশেষে ভ্যাণ্ডাল এবং ইটালিতে ওয়েস্ট গথ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল রাজ্য সমান স্থায়ী হয় নি; ভাঙ্গা গড়ার খেলা চলে। কতকগুলো বিলুপ্ত হয় এবং কতকগুলো অন্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রিটেনে তাদের তিনটি রাজ্য গড়ে ওঠলেও নবম শতকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রাঙ্কদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ; এ সময় শার্লিম্যান মহান চার্লস উপাধি গ্রহণ করেন। নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়; তদস্থলে ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, লোরেন ইত্যাদি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।[১১] রাজ্য বা সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা গড়ার প্রক্রিয়া যা-ই হোক না কেন সর্বত্র এর সমাজ কাঠামো ছিল একই রকম এবং তা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। রাজার অধীনে সামন্ত, সামন্তের অধীনে ভূমিদাস কৃষক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মানব সভ্যতার ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র ও সভ্যতার বিকাশের একটি বিশেষ স্তর। এর উদ্ভব বিকাশ, অবক্ষয় ও পতন আছে। এর বিকাশ ধারার গতি মন্থর বলে বলা হলেও অনড় নয়; গতিহীন নয়। এর বিকাশ ধারার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তাই এক স্তরের একটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে গোটা অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

পূর্বে বলা হয়েছে দাস সমাজের বিরাট অংশ মুক্ত হয়ে তাদের অনেকে নিজ মনিবের নিকট হতেই ভিটেমাটি, হাল-গরুর মালিক হয়; তার নিজস্ব সংসার তৈরি

হয়। এর বিনিময়ে তাদেরকে প্রভুর খামারে তার শ্রম দিয়ে খাজনা, পরবর্তীকালে ফসলে খাজনা, আরো পরে মুদ্রায় খাজনা দিতে হয়। এরূপ শ্রমে, ফসলে সর্বোপরি মুদ্রায় খাজনা প্রচলনে সামন্ত ব্যবস্থার সংকট, সমাধান এবং এর বিকাশ ধারারই ইঙ্গিত বহন করে। উল্লেখ্য, শ্রমে খাজনাকে কর্ভি এবং ফসলে খাজনাকে কুইটরেন্ট বলা হত। অধীনস্থ কৃষকদের বিচার মনিবই করত; তার অপরাধেব জন্য জরিমানা করা হত। কৃষকের জমির সাথে থাকত মনিরের শিকার ভূমি। মনিবের শিকারের সময় তাদের আহার ও বাসের ব্যবস্থা করতে হত কৃষককে। ফসল নষ্ট হলে তা চুপ করে সহ্য করতে হত।[১২]

ভূস্বামীর এলাকাভুক্ত জায়গাকে বলা হত ম্যানব। ম্যানরেব মধ্যবর্তী স্থানে ভূস্বামীর বাসগৃহ থাকত; এর চাবপাশে ফল, ফুল ও সব্জি বাগান, রাস্তার নিকটে ভূস্বামীব পরিচালকদের ঘরবাড়ি, গোয়াল, আস্তাবল, কামারশালা ইত্যাদি থাকত। দক্ষিণ দিকে গ্রাম; আরো দূরে চারণ ভূমি, এব পাশে কৃষকের জমি। সকলেই প্রায শস্যোৎপাদন করত; পণ্য হত না বললেই চলে। এ ব্যবস্থাটি ছিল মূলত সরল অর্থনীতি; ম্যানব অর্থনীতির মূল কথা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা। শিল্পজাত দ্রব্যাদি স্থানীয় কারিগরেরাই তৈরি করত। মনিব কিংবা কৃষক বাইরের আমদানি দ্রব্য কমই ব্যবহাব করত। তবে লবণ ব্যবসায় ছিল ভূস্বামীর একচেটিয়া। নব পর্যাযেব ইউরোপে দশম শতাব্দী পর্যন্ত হস্তশিল্প কৃষি হতে পৃথক হয় নি।[১৩]

সামন্ত প্রভু সুরক্ষিত দুর্গে বসবাস করত। তার থাকত সশস্ত্র সৈন্যদল, তিনি নিজেই একজন প্রথম শ্রেণীর সৈনিক, বিচারক এবং শাসক, তাব নিজস্ব এলাকায তিনিই মূলত সার্বভৌম অধিপতি। রাষ্ট্রের সাথে ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভূস্বামীরা ছিলেন অভিজাত ও শাসক শ্রেণী। ভূমিই ছিল আভিজাত্যের মাপকাঠি। সম্পত্তির অনুপাতে তাদের মর্যাদার তারতম্য হত। বস্তুত সমস্ত সমাজ কাঠামো পিরামিডের মত শক্ত সুশৃংখলভাবে স্তর বিন্যস্ত ছিল। এই পিরামিড সমাজের শীর্ষে অবস্থান করতেন স্বয়ং রাজা; তার নিচে প্রিন্স, ডিউক, কাউন্ট ইত্যাদি। তাদের নিচে ভাইকাউন্ট, ব্যারন, তাদের নিচে আর্ল নাইট ইত্যাদি। এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পূর্বে বলা হয়েছে যে, সামন্ততন্ত্রের সময় ছিল সরল অর্থনীতি; বাণিজ্য বিনিময় কম; টাকার বিনিময় বিরল। এরূপ অবস্থায় সৈন্যদের টাকায় বেতন দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই রাজা তার অধীনস্থ বড় লোক বা সামরিক কর্মচারীদের জমি দিত এই শর্তে যে, তারা নিজেদের সৈন্য নিয়ে রাজাকে যুদ্ধকালে সাহায্য করবে। এই ব্যবস্থার নামই সামন্ততন্ত্র বা ফিউডালিজম। ফিউড কথাটির অর্থ শর্তাধীনে জমিদান, রাজার নিকট হতে যে সকল ভূস্বামী সরাসরি জমি পেত, তা নয়; রাজার নিকট হতে ডিউক, ডিউকের নিকট হতে জমি পেত ব্যারন; ব্যারন হতে নাইট ইত্যাদি। এটাই ছিল সামন্ত রাষ্ট্রের সড়ন।[১৪] মধ্যযুগে মুসলিম সম্প্রদায় এরূপ সুবিন্যস্ত আর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে সামন্ততন্ত্র গড়তে

পারে নি। সামন্ততন্ত্রের যুগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চার্চের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। কারণ চার্চও ছিল বড় ভূস্বামী। নানা উপায়ে চার্চ ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়। জমিদারদের মতই চার্চ কৃষকের নিকট হতে কর আদায় করত। নানা অজুহাতে চাঁদা আদায় করত। চার্চই প্রথমে শস্য বিক্রি করে এবং গির্জার জমিদারীতে প্রথম বাজার বাসায় এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করে দেয়। বৈষয়িক সমৃদ্ধির সঙ্গে চার্চের রাজনৈতিক প্রভাব গড়তে থাকে। চার্চ রাজার নিকট হতে শুল্ক আদায় ও বিচার আচারের ক্ষমতা লাভ করে। এভাবে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত গির্জা ক্যাথেড্রাল, ঘন্টা, বাইবেল আর তাদের নিজস্ব পোশাক নিয়ে গড়ে ওঠে এক আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য। শাসক সামন্ত অভিজাত শ্রেণীর সহায়ক শক্তি রূপে গড়ে ওঠে যাজক শ্রেণী।[১৫]

রোমের ধর্মযাজকই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী; চতুর্থ শতক হতে তাঁকে বলা হত রোমের পোপ। তাকে বলা হত রোমক চার্চের প্রতিষ্ঠাতা সন্ত পিটারের প্রতিনিধি। পোপের অধীনেই সমগ্র চার্চ সংগঠন কেন্দ্রীভূত হয়। পোপ রাজরাজড়াদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতেন। এভাবে সারা পশ্চিম ইউরোপে পোপই খ্রিষ্টধর্ম ও চার্চের প্রধান ব্যক্তি।

অষ্টম শতকে ফ্রাঙ্কদের রাজা পোপকে মধ্য ইটালির শাসনভার প্রদান করে; তখন হতে মধ্য ইটালি হয় পোপের জমিদারী। লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে পোপ ফ্রাঙ্কদের রাজাকে সাহায্য করেন। এর পুরস্কার স্বরূপ তিনি এর জমিদারী পান। ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক রাজা পিপিন শার্টের পুত্র চার্লসের অভিষেক হয় রোমে; রোমের পোপ তাকে সম্রাট ঘোষণা করেন। নানা দিক দিয়ে মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইনিই হলেন শার্লিম্যান, মহান চার্লস। প্রথমত পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর নতুন আর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে এটাই হল নয়া সাম্রাজ্যের উত্থান। দ্বিতীয়ত; এ ঘটনাতে রাজতন্ত্রের ও পোপতন্ত্রের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে ঐক্য-দ্বন্দ্ব। সমন্বয় প্রক্রিয়ার সূচনা হলেও এর ফলে ইউরোপে বৃহত্তর ঐক্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। শার্লিম্যানের মৃত্যুর পর পোপ দাবি করে যে, চার্চ সম্পূর্ণ স্বাধীন; ধর্ম যাজকের বিচার হবে চার্চের নিজস্ব আদালতে। রাষ্ট্রের আইন চার্চের আইনের বিরোধী হতে পারে না। নবম শতকে পোপের ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। সে সময় দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর সম্রাট চতুর্থ হেনরী পোপ সপ্তম গ্রেগরীর নিকট পরাভব স্বীকার করেন।[১৬]

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর উদীয়মান নব আর্থ-সামাজিক পরিবেশে প্রথম হতে জগত ও জীবন সম্পর্কে হিব্রুবাদ-হেলেনবাদ-এ দ্বিবিধ ঐতিহ্যের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব সমন্বয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এর ফলে ইউরোপে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ এক নবরূপ লাভ করে। উল্লেখ্য গ্রিকো-রোমক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রভাবে

রোমক সাম্রাজ্যে হিব্রুবাদ প্রবেশ করে। রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপে ফ্রাঙ্ক-জার্মান জাতির প্রতিষ্ঠা হলে উভয়বিধ সাংস্কৃতিক প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয় নি। প্রকৃতি-সত্য, প্রজ্ঞা ও কর্ম-এই ছিল হেলেনবাদের মর্মবস্তু। হিব্রুবাদের সারৎসার: দৈবসত্য: আনুগত্য ও বিশুদ্ধ জীবন সাধনাই মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য; কারণ ইহজীবন ক্ষণস্থায়ী। হেলেনবাদে ইহলৌকিক জীবনেই মানবের পরম সার্থকতা এবং এ জন্যই পারলৌকিক ভাবনা। এভাবে যুক্তিবাদ বনাম শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যকার সংঘাত চলতে থাকে। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বেই চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দের শেষ প্রান্তে অগাস্টাইন খ্রিষ্টধর্মে নব প্লেটোবাদের আংশিক উপাদান গ্রহণের পথ প্রদর্শন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, গ্রিক দার্শনিকদের প্রজ্ঞা প্রশংসনীয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের প্রজ্ঞা আয়ত্ত করে পরম সত্যে উপনীত হতে পারে। এই পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব সমন্বয় প্রক্রিয়ায় কখনো দ্বন্দ্ব, কখনো সমন্বয় প্রাধান্য পায়। এই প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে মধ্যযুগের ইউরোপীয় মূল্যবোধ। চার্চ কৃষকদেরকে শেখায় : এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী; স্থায়ী সুখ-শান্তি আসে পরকালে; চিরস্থায়ী শান্তির জীবন পেতে হলে এ জীবনের দুঃখ কষ্ট নীরবে সইতে হয়। সবাইকে নম্র, বাধ্য ও ধৈর্যশীল হতে হয়; আত্মার মঙ্গল গতির জন্য উপবাস কাম্য: দেহকে ঐহিক সম্ভোগ হতে বঞ্চিত রাখতে হয়। সকল প্রকার পাপ হতে মুক্তির পথ চার্চকে দান করা। গির্জার এ শিক্ষার সদ্ব্যবহার করে রাষ্ট্র। আরো উল্লেখ্য, চার্চ বিজ্ঞানের ধারধারত না; বিজ্ঞান ছিল ধর্মতত্ত্বের দাস, যাজকরা মনে করত ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান। বাইবেল তাদের একমাত্র পঠিতব্য গ্রন্থ; তাও ল্যাটিন ভাষায় লেখা। সে জন্য সবাইকে যাজকের ধর্মোপদেশ শুনতে হত। এই দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক প্রকাশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[১৭]

রোমক সাম্রাজ্যের পতন হতে একাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে শহর খুব কমই ছিল। সে সময় হস্ত শিল্পের তেমন বিকাশ হয় নি। মৃৎশিল্প, কামার প্রভৃতি কারিগর ছিল, কিন্তু তখনো হস্ত শিল্প কৃষিশিল্প হতে আদালা হয় নি। একাদশ শতক হতে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হতে থাকে; কাঁচা মাল হতে নানা রকম দ্রব্য তৈরি হতে থাকায় নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। সেই সময়ে এখানে একটা শ্রেণী গড়ে ওঠে; শহরে সম্পত্তির বিকাশ ঘটে; কৃষি হতে হস্ত শিল্প পৃথক হয়; শ্রম বিভাগ দেখা দেয়। সমাজ বিকাশের দিক হতে এটা ছিল বড় ধরনের অগ্রগতি, শহর গড়ে উঠতে শুরু হয়। শহরে বণিকদের গিল্ড গঠিত হয়, তারা পণ্যের দাম সংরক্ষণ করে; শিল্পীদেরও সংগঠন গড়ে ওঠে ইটালীতে। জমিদারদের অত্যাচার হতে রেহাই পাওয়ার জন্য বণিকরা জমিদার হতে মুক্ত শহর গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। ইটালীর পিসা, জিনওয়া, ভেনিস ইত্যাদি বণিক শাসিত নগর রাষ্ট্রগুলোর সমৃদ্ধি আসে। একাদশ শতকের ইউরোপের এ উদীয়মান দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একাদশ শতক হতে ইউরোপ আর কখনো পশ্চাৎ মুখী হয় নি।[১৮]

একাদশ শতকে ইউরোপীয় বাস্তবতায় এরূপ রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃত্ব ও যাজক তন্ত্রের মধ্যে একটি সমন্বয় গড়ে ওঠে। উক্ত দু'চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনের জন্য পণ্ডিত এ্যানসেলম একাদশ শতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সর্বপ্রকার ধর্মের সাথে যুক্তিবাদের সমন্বয় করতে যত্নবান হয়েছিলেন। মধ্যযুগে বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের এই কঠিন কাজের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। পিটার আডেলার্ড এবং টমাস এ্যাকুইনা ও এ কাজের অগ্রগতি সাধন করেন।[১৯] একাদশ হতে ত্রয়োদশ এই তিন শতাব্দী ধরে গির্জায়, শিক্ষায়তনে সর্বত্র এই কাজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলে।[২০] এরূপ বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্রুসেডের উদ্ভব, গতি, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য বিবেচ্য।

একাদশ শতকের বিকাশ উন্মুখ ইউরোপের বাস্তব অবস্থায় ১০৯৪ সালে বাইজানটাইন সম্রাট এ্যালেকসিয়াস কমেনাস উদীয়মান তুর্কি জাতিসত্তার আগ্রাসনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পোপ দ্বিতীয় আরবানের সাহায্য প্রার্থনা করলে তৎক্ষণাৎ ইউরোপ জেরুজালেমের পবিত্রভূমি উদ্ধারের জন্য যে জিহাদ ঘোষণা করে তাই মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে ক্রুসেড নামে অভিহিত করা হয়।

১০৯৫ সালে মার্চ মাসে পোপ দ্বিতীয় আরবান প্লাসেনটিয়ায় একটি সর্ব ইউরোপীয় সম্মেলন আহ্বান করেন এবং নভেম্বর মাসে আরো একটি সভা ডাকেন ক্লেরমন্টে। এখানে তিনি যীশু খ্রিষ্টের সমাধি ভূমিতে দখলদার অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে হুকুম জারি করেন এবং এ ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারীদের পাপ মোচন ও যুদ্ধে নিহতদের স্বর্গলাভের প্রতিশ্রুতি দেন।[২১] তিনি বলেন "Enter upon the road to the Holy Sipulcher, wrest it from the wicket race and subject it."[২২]

সারা খ্রিষ্টান জগত ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়। তারা দলে দলে জিহাদে যোগদান করে। পোপ আরো বলেন, যারা এরূপ ধর্মযুদ্ধ হতে দূরে থাকবে তাদের স্থান হবে জাহান্নামে। এরূপ সারা খ্রিষ্টান জগতের অধ্যাত্মিক নেতার পবিত্রভূমি উদ্ধারের আহ্বানে সমগ্র ক্রুসেডের আবরণ যদি ধর্মীয় হয় তাতে আশ্চর্যের কি আছে? মধ্যযুগে গোটা ইউরোপের ঐক্য সাধনে ধর্মীয় আহ্বানের কি আর কোনো বিকল্প থাকতে পারে? প্রফেসর হিট্টি মধ্যযুগে ক্রুসেডেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাতময় মিথস্ক্রিয়া হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, প্রাচীনকালে ট্রয় পারস্য সংঘাত সংঘর্ষ যদি পূর্ব পশ্চিমের মিথস্ক্রিয়ার প্রথম ঘটনা হয় এবং আধুনিককালে প্রাচ্যের উপর প্রাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন যদি আপাত শেষ অধ্যায় হয়, তাহলে ক্রুসেড হয় মধ্যযুগীয় অধ্যায়। Viewed in their righful setting the Crusaders apear as the mediacval chapter in the long story of the inter action between east and the west, of which the Troyan and Persian ware of entiquity forms prelude and the imperealist expansion of modern western Enrope the latest ohapter. The geographical fact of diffence between east and west requires it

only significance the competing religons, racial and linguistic diffrence More specifically the crusades repesent the reaction on of Christion Enrope gainst Moslem Asia which had been on offensces since 632 not of in Syria and Asia Minor, but in Spain and Sceily. [২৩]

৯.৩ ক্রুসেডের প্রথম পর্ব : প্রত্যক্ষ করণ : মুসলিম বিশ্বের উপর তাদের আগ্রাসন

পূর্বে মন্তব্য কবা হয়েছে যে, ক্রুসেড আদৌ আকস্মিক ঘটনা নয়। সপ্তম শতাব্দীতে পশ্চিম এশিয়ায় আরব সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে বৃহত্তব সিরিয়া ও মিশব হতে বাইজানটাইন শক্তি বিতাড়িত হয়; ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ড স্পেন এবং পরে সিসিলিও আরবদেব পদানত হয। একাদশ শতাব্দীর আশির দশক অবাধি আরব আগ্রাসনেব বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউবোপ হতে কোনো তীব্র প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় না এবং সেখানকার বাস্তব অবস্থাতে এরূপ কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। আরবদের সাথে বাইজান্টাইনেব রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের এবং তাও ছিল সীমান্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। একাদশ শতকেব শেষার্ধে সেলজুকবা বাইজানটাইন শক্তিকে তাদের প্রভাব বলয় আর্মেনিয়া ও এশিয়া মাইনর হতে বিতাড়িত করে ইসলামের নয়া বিজয় অভিযানেব সূচনা করে। তারা মারমাবা সাগর তীবে উপনীত হয। বাইজান্টাইন রাজধানী কন্সট্যান্টিনোপল সেলজুকদের হুমকির মুখোমুখি হয়। বাইজানটাইন শক্তি মারাত্মকভাবে আতঙ্কিত হয়। তদুপরি সিরিয়া প্যালেস্টাইনে ও তাদেব প্রভাববলয় বিস্তৃত হয। এর ফলে বাইজানটাইন ও ইটালির ভূমধ্যসাগরীয় বিকাশমান বাণিজ্যস্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় তারা আবো বিব্রত হয়ে ওঠে। তুর্কি সম্প্রসারণবাদ স্তব্ধ করতে রাইজানটাইন সম্রাট ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অনুন্যোপায় হয়ে উদীয়মান ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সহায়তা লাভের জন্য রোমান ক্যাথলিক প্রধান রোমের পোপের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সময়টি ছিল অনুকূল। রাজতন্ত্র ও পোপতন্ত্রের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র ইউরোপের উপর পোপের প্রভাব ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[২৪]

গ্রিক চার্চের পৃষ্ঠপোষক বাইজানটাইন সম্রাটের এরূপ সাহায্যের আবেদনের মধ্যে পোপ দ্বিতীয় আরবান একটি শুভ সংকেত পান। প্রথমত ১০৫৪ সালে চার্চ রোমান ক্যাথলিক চার্চ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও পোপ তাদের একত্রীকরণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখেন। দ্বিতীয়ত পোপের নের্তৃত্বে পবিত্র ধাম জেরুজালেম তাদের কথিত বিধর্মী মুসলিমদের হাত হতে উদ্ধার করা গেলে ক্যাথলিক চার্চের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণে তিনি জেরুজালেম উদ্ধারের প্রশ্নটি সর্বত্র উত্থাপন করেন এবং ধর্মের জিগির তুলে ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। ১০০৯ সালে কিভাবে ফাতেমী খলিফা আল হাকিম দ্বারা পবিত্র গির্জা ভূলুণ্ঠিত হয়; তীর্থযাত্রীরা কিরূপে নির্যাতিত হয়—এর আধা সত্য আধা মিথ্যার অজস্র কাহিনী প্রচারের ফলে পশ্চিম ইউরোপে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি

হয়। সহজ সরল লোকেরা পাপমুক্তি ও স্বর্গ লাভের আশায় দলে দলে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে। সামন্ত শোষণে মুহ্যমান ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, লোবেন্স এর সার্ফ কৃষকরা অধিক পরিমাণে ধর্মযুদ্ধে সাড়া দেয়। এভাবে পোপ একটি ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিতে সাফল্য অর্জন করলেও ক্রুসেডের আসল সংগঠক ছিল তৎকালীন ইউরোপের উন্নয়নশীল ইটালির নগররাষ্ট্র ভেনিস পিসা, জেনওয়ার বণিকরা। তারাই নৌবহর গড়ে তোলে। অস্ত্রশস্ত্র রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করে। কেননা পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলো মুক্ত করা ও হাত করার মধ্যে তাদের প্রচণ্ড বাণিজ্যিক স্বার্থ নিহিত ছিল। অনেকের মধ্যে ধর্মীয় বাসনা থাকলেও বোহেমণ্ডের মত সামন্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষাই ছিল প্রবল।[২৪] স্বয়ং পোপেরও দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষা কিছু কম ছিল না। বস্তুত এভাবে চার্চের ক্রস, সৈনিকের তলোয়ার আর বণিকদের থলে সকলে একত্রে মিলে তথাকথিত ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড সংঘটিত হয়।[২৫]

ক্রুসেডের প্রথম পর্ব

ক্রুসেডের প্রথম পর্ব (১০৯৫-১১৪৪ সাল) ছিল ক্রুসেডদের বিজয় পর্ব হাজার হাজার ক্রুসেডাব সর্ব প্রথম কন্সট্যান্টিনোপলে সমবেত হন। প্রথমেই নেতৃবর্গকে কন্সট্যান্টিনোপলেব সম্রাটের প্রতি সামন্ত বশ্যতার শপথ গ্রহণ করতে হয়। সমুদ্রের অপর পাড়ে অবস্থিত এশিয়ার মাইনরের পথেব নির্দেশনা দেযা হয়। এখানে ছিল রুমী সেলজুক সুলতান তরুণ কিলিজ আবসালানের রাজ্য (১০৯২-১১০৭ খ্রি.)। এখানে তাদেব প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয এবং একমাস অবরোধেব পর কিলিজের রাজধানী নাইসিযাব পতন ঘটে; দ্বিতীয যুদ্ধ সংঘটিত হয় ডোরিলিয়াজ বা ইস্কেশহবে। এখানেও তুর্কিরা পরাজয়বরণ কবে। শর্তানুসারে এই অন্তবীপের বিজিত অঞ্চলে সম্রাটেব সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয। তুর্কিদের এই পরাজয়ের ফলে তুর্কি কর্তৃক ইউরোপের বিজয়াভিযান প্রায সাড়ে তিন শতাব্দী পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়। This Victorious march restored to Alexius. Who had exacted from almost all Crusading leaders an cath of feudal allegiance The western half of the Peninsuler and helped to delay, the Turkish invaseon of Europe for three centuries and a half [২৬]

দক্ষিণের বিজয়াভিযানের পূর্বে তৌবস পবর্তমালা অতিক্রম করে বেলিত কাউন্ট পুত্র বলডইন ১০৯৮ সালে রুহা দখল করেন। এই আর্মেনীয় খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় ক্রুসেডার কর্তৃক প্রথম ল্যাটিন উপনিবেশ এবং প্রথম ল্যাটিন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বলডইন এই রাজ্যের প্রথম রাজা। দক্ষিণ ইটালির নরম্যান ট্যানক্রেডের নের্তৃত্বে সাইলেসিয়ার বিপরীত দিকে অভিযান শুরু করে এবং সপ্তম পলের জন্মভূমি তারসুস পদানত করে। ট্যানক্রেডের আত্মীয় বোহিমন্ডের নেতৃত্বের ইতিমধ্যে ক্রুসেভারদের প্রধান দলটি এন্টিয়ক নগরে পৌছে যায। নগর তখন মালিক কর্তৃক নিয়োজিত

সেলজুক আমীর ইয়াগাসিয়ানের শাসনাধীন ছিল। নগরটি ১২৯৭ সালের ২১ অক্টোবর হতে ৩১ জুলাই ১০৯৮ সাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখা হয়; অবশেষে জনৈক আর্মেনিয়া সেনাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে উত্তর সিরিয়ার ঐ বিখ্যাত নগরটির পতন হয়। এর পতনের পূর্বে আলেপ্পোর শাসনকর্তা রেজওয়ানের সাহায্য কোনো কাজে আসে নি। ক্রুসেডাররা নগরে প্রবেশ করতে না করতে তুর্কি সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক অবরুদ্ধ হলেও অবশেষে তাও ব্যর্থ হয়। তাই নগরীর শাসনভার গ্রহণ করেন বোহেমান্ড। তিনি ছিলেন বড় ধরনের কূটকৌশলী। নগরটি খ্রিষ্টানদের হাতে ছিল প্রায় এক শতাব্দী , ধরে।[২৭]

ফ্রাঙ্কদের ধনী নেতা তুলুসের রায়মন্ড অসন্তুষ্টচিত্তে এন্টিয়ক ত্যাগ করে দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মারাতুন্নোমান শহরটিতে লক্ষাধিক লোক হত্যা করে নগর ত্যাগ করে এবং হাসনুল আরকাদ দখল করেন। এটা ভূমধ্যসাগর ও আল আসি সমতল ভূমির মধ্যে কৌশলগত গিরিপথ। তিনি উত্তর লেবাননের পশ্চিম ঢালে অবস্থিত আরবাহ্ অবরোধ করেন; বিনা বাঁধায় উপকূলবর্তী আনতারতুস দখল করেন। বলডাইন ভ্রাতা লোরেনের কাউন্ট বুইলিনের গডফ্রের আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি উক্ত অধিকৃত নগরগুলো পরিত্যাগ করে জেরুজালেম অভিমুখী প্রধান সেনাবাহিনীর সাথে যোগদান করে। পথিমধ্যে পরিত্যক্ত নগরী রামলা দখল করেন এবং জেরুজালেমের এটাই ছিল প্রথম ল্যাটিন রাজ্য।[২৮] ১০৯৯ সালে ৭ জুন ৪০ হাজার ক্রুসেডার জেরুজালেমের প্রধান ফটকের সামনে সমবেত হয়। এখানে মিশরীয় দুর্গে ছিল নগণ্য সংখ্যক সৈন্য। তাই জেরিকোর মতই এ নগরের সহজ পতন হবে নিশ্চিত হয়ে তারা নগ্নপদে শিঙ্গা ফুৎকার করে নগরের চতুর্দিকে কুচকাওয়াজ করে। ১৫ জুলাই অবরোধকারীরা নগরের উপর আঘাত হানে এবং এখানেও তারা নরহত্যা অনুষ্ঠিত করে।[২৯] জেরুজালেম নগরের পতনের একমাস পর আসকালানের নিকটবর্তী একটি স্থানে তারা মিশরীয় বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করায় জেরুজালেমে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। তবে আসকালানে তখনো মিশরীয় নৌঘাঁটি এবং সেনানিবাস ছিল। মিশরীয় উজির মালিক আল আফজালের নেতৃত্বে খ্রিষ্ট শক্তিকে উত্যক্ত করা হয়। যা হোক এভাবে পশ্চিম এশিয়ায় তৃতীয় ল্যাটিন রাষ্ট্রও গড়ে ওঠে। রায়মন্ড এই নব গঠিত জেরুজালেম রাষ্ট্রের রাজমুকুট পরিধান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে গডফ্রেকে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। তিনি হন এই রাষ্ট্রের প্রথম ব্যারন ও পবিত্র গির্জা রক্ষক। প্যালেস্টাইনে খ্রিষ্ট রাষ্ট্র গড়ে ওঠায় অসংখ্য ক্রুসেডার ভাবে যে, তাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তাই তাদের অনেকে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করে।

গডফ্রের তাৎক্ষণিক দায়িত্ব ছিল উপকূলীয় শহরগুলোর উপর ক্রুসেডারদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা; নইলে জেরুজালেম রক্ষা করা এবং তাদের মাতৃভূমির সাথে যোগাযোগ রক্ষার কাজ হবে দুরূহ ব্যাপার। ইতালির নৌবহর ব্যবহার করে যোগাযোগ সমস্যার সমাধান হয় সহজে। ইতালির নৌবহর জলপথ চালু করে এবং ইতালির বণিকরা

সঠিকভাবে বুঝেছিল যে, এখানকার উপকূলীয় শহরগুলো হবে তাদের পণ্যের জন্য খোলা বাজার। ১১০০ সালে পিসা ফাজা শহরে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হয়; অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আরসুফ, কায়সারিয়া এবং আক্রার সাথে সংক্ষিপ্ত চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এসব নগর হতে তারা শুল্ক পায়। গডফ্রের মৃত্যুর প্রাক্কালে ভেনিসের রণতরী আক্রার বিরুদ্ধে অভিযান চালায় এবং গডফ্রের মৃত্যুর পর হাইফা দখল করে নেয়। হাইফার অধিবাসীদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য আমন্ত্রণ করে হত্যা করা হয়।[৩০]

ইতিমধ্যে ট্যাঙক্রেড জরডনের আসে পাশে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ভূমধ্যসাগর ও দামাস্কাসের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত বায়সান নগর দখল করেন। নাবলুস স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। ট্যাঙক্রেড গডফ্রেডের সামন্ত হিসেবে তাইবেবিয়ায় বসবাস করেন এবং ১১০১ সালে মার্চ মাসে এন্টিয়কের অনুকূলে তিনি তার জায়গীর ত্যাগ করেন। এন্টিয়ক ছিল তার পিতৃব্য বোহেমন্ডের রাজ্য। বোহেমন্ডকে তুর্কি সেনাপতি গুমিশতিগেন বন্দি করে রাখে। ১১০৩ সালে তিনি মুক্তি পান।

গডফ্রে প্রয়াত হলে তদীয় ভ্রাতা বলডুইন তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন। তার রাজত্বকালে (১১০০-১৮ সাল) তার রাজ্যসীমা লোহিত সাগরের আল-আকারা হতে বৈরুত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বলডুইন রূহা হতে আগমন করে বেথেলহেমে অভিষিক্ত হন; কিন্তু এটা বিশপরা চাচ্ছিল না, কেননা গির্জা রাজ্যে জেরুজালেমের অন্তর্ভুক্তিকরণই ছিল তাদের একান্ত কাম্য। যাহোক তার পির্তৃব্য পুত্র এবং উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বলডুইনের সময় (১১১৮-৩১ সাল) আরো কতকগুলো নগরের উপর তার প্রভাববলয় বিস্তৃত হয়। ১১১০ সালে বৈরুত ও সিডন তাঁর দখলে আসে। এ সময় কেবল দামাস্কাস হতে আগ্রাসনের ভয় ছিল এবং দামাস্কাস তখন শাসিত হচ্ছিল আতাবেগ তুগতাগিন দ্বারা— অবশ্য তাঁর সাথে বলডুইনের ছিল শান্তিচুক্তি। শান্তিচুক্তির স্বল্পকাল পরেই আরসুফ ও সিজারিয়ায় জেনোয়ার বণিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়; আর এর লুণ্ঠিত মালামালের এক তৃতীয়াংশ পায়; বসবাসের জন্য বাসস্থান পায়। ১১২৪ সাল পর্যন্ত টায়ার, ১১৫৩ সাল পর্যন্ত আসকালান মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। মৃত সাগরের দক্ষিণে ১১১৫ সালে বলডুইন আসসাওবাক দুর্গ নির্মাণ করে দামাস্কাস-হিজাজ-মিশর যোগাযোগ পথের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

ক্রুসেডের ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজনে এবং প্রাচ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড অবক্ষয়ের পটভূমিতে এভাবে পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া প্রদেশের ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ইউরোপীয় ল্যাটিন রাজ্য গড়ে ওঠে। রূহা ও এন্টিয়কে প্রতিষ্ঠিত হয় বার্গান্ডী রাজ্য; এন্টিয়কে নরম্যান, ত্রিপলীতে প্রভেন্স্যাল রাজ্য, রূহা-এন্টিয়ক ত্রিপলি ছিল জেরুজালেমের সামন্ত রাজ্য, রাজ্যগুলো সিরিয়ার উত্তরে ক্ষুদ্রাংশে সীমাবদ্ধ ছিল; তদুপরি এসব রাজ্যে মুসলিম সংখ্যাধিক্য ছিল। আলেপ্পো, হামা, হিম্স, বালাবাক্ক রাজস্ব দিতে বাধ্য হলেও ক্রুসেডারদের দখলিভুক্ত হয় নি।[৩১]

৯.৪ ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্ব (১০৪৪-১১৯২ খ্রি.)

জঙ্গী পরিবার কর্তৃক ক্রুসেডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম

পূর্বের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রুসেডাররা স্বল্প অথবা প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পশ্চিম এশিয়ায় ৪টি ল্যাটিন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের অব্যাহত সাফল্যের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ এবং প্রথম প্রতি আক্রমণের সূচনা করেন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী। তিনি ছিলেন সেলজুক সুলতন মালিক শাহেব আকসাংকার নামক একজন বিখ্যাত প্রশাসকের পুত্র। পিতা প্রয়াত হলে পুত্র ইমাদুদ্দীন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন—সকল আমির অমাত্য তাঁব প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ১১২৭ সালে তিনি সেলজুক সুলতান মাহমুদের নিকট হতে ওযাসিত নগবের জায়গীর লাভ করেন এবং বসরার সুলতানের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এ ঘটনাব চার বছর পর তিনি আতাবেগ উপাধিতে ভূষিত হন। তাকে মোসুল ও উত্তর মেসোপটোময়ার শাসনভার অর্পণ করা হয়। তিনি ছিলেন মোসুলে দীর্ঘস্থায়ী আতাবেগ বংশেব প্রতিষ্ঠাতা। ক্রুসেড আক্রান্ত আলেপ্পোব অধিবাসীদেব আমন্ত্রণে তিনি নগরটি দখল করেন। ক্রুসেডের বিরুদ্ধে ছোটখাট অনেক প্রতিরোধ গড়ে তুলে অবশেষে ১১৪৪ সালে এডেসা বা রূহা ক্রুসেডাবদেব হাত হতে উদ্ধার করে তিনি এক নতুন ইতিহাস বচনা করেন।[৩২] এডেসা ছিল খ্রিষ্টানদের অন্যতম পবিত্র স্থান এবং প্রথম ল্যাটিন রাষ্ট্র। এর রাজা ছিলেন জোসেলিন। নগরটি দখলের পর তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা কবে তার মহানুভবতা প্রকাশ করেন। তিনি তার সুসংগঠিত সেনাবাহিনী নিয়ে ক্রুসেডারদের অধিকৃত বিভিন্ন নগব মুক্ত করার কাজে আপনাকে নিয়োজিত করেন; কিন্তু কালাতজাবির অবরোধকালে জনৈক বিশ্বাসঘাতক তাকে হত্যা করে। এতে তাঁব বিজয়াভিযান স্তব্ধ হয় নি বরং তার যোগ্য পুত্র নুরুদ্দীন জঙ্গী তাঁব বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখেন।

এডেসার পতন সমগ্র ইউরোপ প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এরূপ মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে ক্লেয়ারভক্সের সপ্তম বার্নার্ড ইউরোপের খ্রিষ্টান জগতে ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন আর এক ধর্ম যুদ্ধেব ডাক দেন। সমগ্র ইউরোপ জেগে ওঠে; নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লাখ লাখ মানুষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। ১১৪৭ সালে জার্মানির সম্রাট তৃতীয় কনরাড এবং ফ্রান্সের সম্রাট সপ্তম লুই তথাকথিত দ্বিতীয় ক্রুসেডে নেতৃত্বেব জন্য এগিয়ে আসেন। এ যুদ্ধে যোগদান করেন ফ্রান্স ও জার্মানির নাইটগণ, হস্পিটালার টেম্পলোর নাইটগণ। সিরিয়া অভিমুখে অভিযানকালে কনরড এবং লুই শোচনীয় পরাজয়বরণ করেন। লওডিসিয়ার সন্নিকটে কনরাডের সৈন্য দলের বড় অংশ ধ্বংস হয়; অন্যদিকে সমুদ্রোপকূলের পথ দিয়ে যাত্রাকালে কাদমাসের উচ্চভূমিতে লুইয়ের সৈন্যদল পরাজিত হয়।[৩৩] ক্রুসেড যোদ্ধারা এন্টিয়কে বিশ্রাম করার পর তাদের সম্মিলিত বাহিনী দামাস্কাস অবরোধ করে। তাদের এ অবরোধ মাত্র চারদিন স্থায়ী হয়।

নুরুদ্দীনের আগমনে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। নেতৃদ্বয় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শেষ হয় তথাকথিত দ্বিতীয় ক্রুসেড।

ঐ দ্বিতীয় ক্রুসেডের পরিসমাপ্তির পর নুরুদ্দীন ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে ফ্রাঙ্কদের অন্যতম সুরক্ষিত দুর্গ আল আরিসা অধিকার করেন এবং কয়েকমাস পর এন্টিয়কের নিকটবর্তী রাগবা নামক স্থানে তাদেরকে পরাজিত করেন। অন্য আর এক যুদ্ধে এন্টিয়ক রাজপরিবারের রেমন্ড নিহত হন।[৩৪] ১১৬১-৬২ সালে তাঁর জয়যাত্রা বিস্তৃত হয়। তিনি ১১৬১ সালে দ্বিতীয় জোসেলিনকে বন্দি করেন এবং রূহা বিজয় পূর্ণ করেন। তিনি এন্টিয়কের কিয়দংশ জয় করেন এবং এন্টিয়ক অধিপতি তৃতীয় বোহেমন্ড এবং ত্রিপলির রায়মন্ডকে বন্দি করেন। অবশ্য এরা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত হন।[৩৫]

নুরুদ্দীন ক্রুসেডের প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, দামাস্কাসের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তাঁর পক্ষে ক্রুসেডের বিরুদ্ধে আর অগ্রগতি সম্ভব হবে না; বস্তুত এ পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে বিশেষ কোনো রকম অগ্রতি হয় নি। এ কারণে ১১৬৪ সালে তিনি দামাস্কাসের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি সরাসরি জেরুজালেম সম্পর্কে ভাবার অবসর পান। ফাতেমীরা প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আসকালানের পতন ঠেকিয়ে রেখেছিল। ইতিমধ্যে ১১৫৩ সালে আসকালান জেরুজালেমের অধিপতি তৃতীয় বলডুইনের পদানত হয়। যা হোক বলডুইনের আসকালানের পতন ঘটলে মিশর তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং বলডুইন মেবার প্রাসাদ চক্রান্তে মেতে উঠেন। তাই মিশর-বলডুইন-দামাস্কাসের মধ্যে এক নতুন কূটনৈতিক খেলা আরম্ভ হয়।

ফাতেমী বংশের শেষ খলিফা আল আজিজ ছিলেন অসুস্থ এবং রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা উজির শাওয়ারের হাতে ন্যস্ত ছিল। এ সময় কায়রোর প্রাসাদ চক্রান্তের সাথে জেরুজালেমের ক্রুসেডারও জড়িত হয়। সমূহ বিপদ লক্ষ্য করে ফাতেমী খলিফা নুরুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করলে নুরুদ্দীন শেরকুহের নেতৃত্বে একটি সেবাবাহিনী কায়রোতে প্রেরণ করেন। কিন্তু খলিফার উজির শাওয়ার শেরকুহের সাহায্যে স্বপদে বহাল হয়ে ফ্রাঙ্কদের সাথে পুনরায় চক্রান্তে মেতে যায়। ১১৬৭ সালে জেরুজালেমের রাজা আমরী (Amalree) কায়রো দখলের অভিপ্রায়ে মিশরী মন্ত্রী শাওয়ারের সাহায্যে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এবারোও শেরকুহ তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয়, কিন্তু মিশরে ক্রুসেডারদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে খলিফা আল আজিদ পুনরায় নুরুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবারও নুরুদ্দীন শেরকুহকে মিশরে প্রেরণ করে। শেরকুহ কায়রোয় আগমন না করতেই ক্রুসেডাররা কায়রো ত্যাগ করে। এবার ফাতেমী খলিফা তাঁকে ত্রাণকর্তারূপে অভ্যর্থনা জানান এবং তাকে প্রধানমন্ত্রী ও

প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তির মাত্র দু'মাস পর শেরকুহ প্রয়াত হন। তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দীন তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হন।[৩৬]

সালাহউদ্দিন ও ক্রুসেড

সালাহউদ্দীন তাইগ্রীস তীরে অবস্থিত তাকরিতে ১১৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কুর্দী নেতা আয়ুবকে আতাবেগ জঙ্গী বালাবাক্কর সেনাধ্যক্ষ পদে নিযোগ করেন। ১১৬৪ সালে সালাহউদ্দীন পিতৃব্য শেরকুহের সাথে মিশর অভিযানে যান এবং ১১৬৯ সালে মিশরে পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন।

সালাহউদ্দিনের জীবনে দৃটি স্বপ্ন ছিল; ক. মিশর হতে শিয়া প্রভুত্ব উৎখাত করে সুন্নি ইসলামের প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজটি তিনি সহজেই করতে পেরেছিলেন। ১১৭১ সালে জুমার খোতবায় মিশরের ফাতেমী খলিফার স্থলে আব্বাসী খলিফার নাম পাঠ করেন। খ. তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল পবিত্র ভূমি হতে ফ্রাঙ্ক ও ক্রুসেডারদেরকে বিতাড়িত করা। দ্বিতীয় স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি নুরুদ্দীনের মত ভেবেছিলেন যে, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম শক্তির একত্রীভবন হবে ক্রুসেডবিরোধী বিজয়ের প্রথম শর্ত। ১১৭৪ সালে নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তিনি মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর কয়েকটি সংঘর্ষের পর করণহামা যুদ্ধে তিনি নুরুদ্দীন তনয় এগার বছর বয়স্ক ইসমাইলের নিকট হতে সিরিয়া দখল করেন। এগুলো মিশরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১১৭৫ সালে খলিফার নিকট হতে মিশর, মাগরেব, নুবিয়া, পশ্চিম আরব প্যালেস্টাইন ও মধ্য এশিয়ার সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এর দশ বছর পর তিনি মোসুল দখল করেন; মেসোপটেমিয়ার অনেক সামন্ত তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এভাবে তিনি মিশর-সিরিয়া-আরব-মেসোপটেমিয়ার ঐক্যসাধন করেন। এ্যাসাসিনদের ভয় হতে নিজকে মুক্ত করে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন।[৩৭]

এবার তিনি ক্রুসেডারদের উৎখাত এবং জেরুজালেম উদ্ধার কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১১৮৭ সালে ছয়দিন অবরোধের পর বোন তাইবেরিয়া জয় করেন। এরপর বিখ্যাত হিত্তিন যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে সালাহউদ্দীনের জন্য গৌরবের হলেও ফ্রাঙ্কদের জন্য ছিল দুঃখজনক। একদিনে প্রায় বিশ হাজার লোক গরমে ও তৃষ্ণায় মারা যায়। জেরুজালেমের রাজা গাইড্যালুমিঙ্গা এবং শান্তি ভঙ্গকারী রেজিনাল্ড বন্দি হন। সালাহউদ্দীন জেরুজালেমের রাজার প্রতি রাজকীয় সৌজন্য প্রদর্শন করেন; কিন্তু রেজিনাল্ড হস্পিটালার ও টেম্পলার সৈনিকদেরকে হত্যা করেন।[৩৮]

হিত্তিন যুদ্ধে পরাজয় ফ্রাঙ্কদের দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। ১১৮৭ সালে এক সপ্তাহের অবরোধে জেরুজালেমের পতন হয়। আকসা মসজিদে পুনরায় আজান ধ্বনিত হয়। 'ডোম অব দি রক' এর শীর্ষ হতে সোনালি ক্রস অপসারিত হয়। পরাজয়ের ফলে সিরিয়া প্যালেস্টাইনের প্রায় সকল নগর সালাহউদ্দীনের করায়ত্ব হয়। উত্তর দিকে

লাতাকিয়া, জাবালা ও সিহিওয়ান এবং দক্ষিণে কারাক, শাওবাক ও
পদানত হয়। ১১৯২ সাল পূর্ণ হতে না হতে শকিফআরজন, কাও
সালাহউদ্দীনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ফ্রাঙ্কদের হাতে এন্টিয়ক ত্রিপলি,
ছোটখাট কয়েকটি শহর রয়ে যায়।[৩৯]

জেরুজালেমের পতন খ্রিষ্টান জগৎ সহজে মেনে নিতে পারে নি। তাই ইউরোপের সর্বত্র পুনরায় ধর্মীয় যুদ্ধান্মোদনার ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইউরোপের রাজন্যবর্গ সাময়িকভাবে তাদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে জেরুজালেম উদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা সিংহ হৃদয় প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিফ অগাস্টাস সকলে ক্রস পরিধান করেন। এভাবে সংঘটিত হয় বিখ্যাত তৃতীয় ক্রুসেড। এ ক্রুসেড চলে ১১৮৯ সাল থেকে ১১৯২ সালে পর্যন্ত। তৃতীয় ক্রুসেডের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত এর কেন্দ্রবিন্দু হয় আক্রা অবরোধ। এর অবরোধ আরম্ভ হয় ২২ আগস্ট ১১৮৯ সাল হতে ১২ জুলাই ১১৯১ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত এই ক্রুসেডে সালাহউদ্দীন ও ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড ছিলেন [illegible] ব্যক্তিত্ব। আর তাদের নিয়ে নানা রকম কাহিনী সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত সংখ্যার দিক দিয়ে এটা ছিল বৃহত্তম, চতুর্থত: এ যুদ্ধে যেমন একদিকে লোমহর্ষক নরহত্যা হয় তেমনি এ যুদ্ধের জয় পরাজয় ছাপিয়ে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা প্রথম স্থলপথে যাত্রা করেন কিন্তু সাইলোসিয়ার এক নদী অতিক্রম করার সময় তার সলিল সমাধি হয়। তাঁর অনুগামীদের অনেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। রিচার্ড জেরুজালেমে আসার পথে সাইপ্রাস দখল করেন। এদের গন্তব্যে পৌছানোর পূর্বে পবিত্র ভূমিকে বসবাসকারী লাতিন জনতা ভাবে যে, আক্রা হবে তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি এবং তারা আক্রার দিকে যাত্রা করে। তাদের সঙ্গে যোগদান করে ফ্রেডারিকের অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী। পরদিন সালাহউদ্দীন নগরটি রক্ষার জন্য শত্রুর মুখোমুখী তার শিবির স্থাপন করেন। জল-স্থলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রিচার্ডের আগমন ক্রুসেডারদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ যোগায়। দীর্ঘ দিন এ যুদ্ধ চলে অথচ কোনোপক্ষই সুবিধা করতে পারছে না দেখে উভয়পক্ষই শান্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রিচার্ড এবং সালাহউদ্দীনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ না হলেও নানাভাবে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলে। নানা ধরনের প্রস্তাব প্রতি প্রস্তাবের পর অবশেষে ২ নভেম্বর ১১৯২ সালে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৪০] এই শান্তি চুক্তি অনুসারে উপকূলীয় শহরগুলো ক্রুসেডারদের হাতে থাকবে; এবং অভ্যন্তরীণ অংশের উপর মুসলিম সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব থাকবে। অতঃপর এই মর্মে ঘোষণাপত্র-প্রকাশিত হয় যে, শেষ পর্যন্ত মুসলিম-খ্রিষ্টানদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের রাজ্যসমূহ সমানভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে;

পরস্পরের রাজ্যে নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারবে উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন। এই সুখবর শুনতে সমবেত হয় অজস্র মানুষ এবং উভয়পক্ষে অনুভূত হয় চরম আনন্দ।[৪১] এভাবে শুভ সমাপ্তি ঘটে তৃতীয় ক্রুসেডের এবং এই সাথে ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্বেরও পরিসমাপ্তি হয়।

৯.৫ ক্রুসেডের শেষ পর্ব (১১৯২-১২৯২ খ্রি.)

ক্রুসেডের শেষ পর্বটি ছিল প্রায় সমগ্র ত্রয়োদশ শতাব্দী ব্যাপী। এ পর্বে কোনো রকম চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় নি; কোনো উৎসাহ উদ্দীপনাও এ পর্বে পরিলক্ষিত হয় নি। কেননা এ পর্বে স্থান-কাল পাত্রের বাস্তব অবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটে। সালাহউদ্দীন তাইগ্রীস হতে নীল নদ পর্যন্ত যে একটি একাঙ্গীভূত সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন তা তাঁর সন্তানদের মধ্যে বাটওয়ারা হওয়ায় একক কোনো শক্তিশালী কর্তৃত্ব আর রইল না। সালাহউদ্দীনের পুত্র মালিক আল আফজাল দামাস্কাসে, আল আজিজ কায়রোতে, আজ জহির আলেপ্পোতে পিতার মুকুট পরিধান করেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করে সালাহউদ্দীন ভ্রাতা আল আদিল স্বয়ং কারাক ও শাওবাকে নিজ রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন এবং ১১৯৬-৯৯ সালের মধ্যে সিরিয়া ও মিশরের উপর তার আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আইয়ুবী রাজ্যের বাহ্যিক সংহতি বজায় রাখেন, তাঁর এক পুত্রকে ১২০০ সালে মেসোপটোমিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য ১১৯২ সালে শান্তি চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়ায় যেহেতু আদিলেরও ভূমিকা ছিল–তাই ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি ক্রুসেডারদের সাথে শান্তি বজায় রাখার প্রতি যত্নবান ছিলেন; ফ্রাঙ্কদের উপনিবেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করেন; ভেনিসের বণিকদেরকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নানা প্রকার বাণিজ্যিক সুবিধে দান করেন। ভেনিস এবং পিসার বণিকদেরকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাণিজ্যিক সুবিধে এবং কনসল প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়া হয়। তথাপিও আদিলের মৃত্যুর পর তাদের প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের অস্তিত্ব টিকে থাকে নি।[৪২] ফলে বৈরুত, সাফাদ, তাইবেরিয়া আসকালান এমন কি জেরুজালেমও (১২২৯ সালে) ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। সৌভাগ্যের কথা এ সময় পশ্চিম এশিয়ায় ফ্রাঙ্কদের অবস্থা শক্তিশালী না হওয়ায় এতদ্বঞ্চলের বিদ্যমান অবস্থার কোনো সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা করতে পারে নি। তারা তাদের উপনিবেশগুলো রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি ইউরোপ হতে আমদানি করার উপায় না থাকায় তারাও স্থানীয়দের উপর নির্ভর করে। তদুপরি তাদের নিজেদের মধ্যে দলীয়-উপদলীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব লেগে থাকত। তাদের বিভিন্ন দল স্ব স্ব দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্থানীয় মুসলিমদের সাহায্য কামনা করত।[৪৩]

বাস্তব অবস্থায় পরিবর্তনের ফলে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ বিশেষ করে ইটালির বণিক রাষ্ট্রগুলো অনুধাবন করেছিল যে, ইসলামি কেন্দ্রীয় শক্তি সিরিয়া হতে মিশরে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ জন্য আদিলের মৃত্যুর অল্প পূর্বেই দিমিয়াত তারা দখল করে

নেয়। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, দিমিয়াত তাদের অধীনে থাকলে তারা সহজে লোহিত সাগরে প্রবেশ করতে পারবে এবং ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে পারবে। যা হোক আদিল পুত্র আল কামিল দুবছর (১২১৯-১২২১ খ্রি.) যুদ্ধ করে ফ্রাঙ্কদের দিমিয়াত ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তবে তাদেরকে অবাধ যাতায়াতের সুবিধে প্রদান করেন।[৪৪] আদিল পুত্র আল কামিল জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্ড ফ্রেডারিক এক ক্রুসেড অভিযান পরিচালনা করে ১২২৯ সালে তার উপর এক ন্যাক্কারজনক চুক্তি চাপিয়ে দিয়ে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন এবং আক্রা প্রবেশ পথের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন ও এরূপ অসম্মানজনক চুক্তির বিনিময়ে আদিল তার আত্মীয় আয়ুবী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্যের নিশ্চয়তা লাভ করেন।[৪৫]

মালিক আস্ সালিহ্ (১২৪০-৪৯ খ্রি.) যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তখন খবর আসে যে, ফ্রান্সের রাজা নবম লুই তথাকথিত ষষ্ঠ ক্রুসেড পরিচালনা করে মিশরের উপর ঝাপিয়ে পড়েছেন এবং দেমিয়াত্তার পতন হয়েছে। তবে ক্রুসেড বাহিনী মিশরের মধ্যে প্রবেশ করলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এখানকার অস্বাস্থ্যকর ভৌগোলিক পরিবেশ মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে তার সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয়, স্বয়ং লুই ও তার পার্শ্বচর বন্দি হন।[৪৬]

আয়ুবী মালিক আস্ সালিহ ১২৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর বিধবা পত্নী শাজারুদ্দার ১২৫০ সালে ক্ষমতা দখল করে আপনাকে মিশরের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করেন। এ সময় মিশরে আয়ুবী বংশের পতন ও মামলুক বংশের উত্থান ঘটে। এই বংশের চতুর্থ সুলতান আল বাইবার্স (১২৬০-৭৭ খ্রি.) এতদ্বঞ্চল হতে ক্রুসেডারদেরকে বিতাড়িত করার কাজে প্রবল ভূমিকা রাখেন। ক্রুসেডার বিতাড়নের গৌরব অর্জনের পূর্বে মামলুক নেতা কুতুজের নেতৃত্বে আইনে জালুতের রণাঙ্গনে (১২৬০ খ্রি.) মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি মিশর তথা সমগ্র পশ্চিম এশিয়াকে রক্ষা করেন। যাহোক, বাইবার্স ক্ষমতায় দৃঢ় হয়েই ১২৬৩-১২৭১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। বাইরার্স ১২৬৩ সালে কারাক উদ্ধার করে নাসিরত গির্জাটি ধ্বংস করেন। ১২৬৫ সালে সিজারিয়া দখল হয়; ৪০ দিন অবরোধের পর হস্পিটালারদের নিকট হতে তিনি আরসুফের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেন। ১২৬৬ সালে টেম্পলারদের দুর্গ আফাদ অধিকৃত হয়। মাকরেজীর বরাত দিয়ে হিট্টি বলেন যে, দুর্গস্থ সকল নাইটদের প্রাণ রক্ষা করা হবে এই শর্তে তারা আত্মসমর্পণ করলেও তাদেরকে হত্যা করা হয়। সাফাদ প্রাচীর গাত্রে এবং জর্ডন নদীর উপর স্মৃতিসৌধ হিসেবে একটি সেতু নির্মাণ করা হয়।[৪৭] ১২৬৮ সালে বিনা বাঁধায় তিনি জাফা অধিকার করেন; স্বল্পকালীন অবরোধের পর শকিফ অরনুন দখল করা হয়। এন্টিয়ক বিজয়টি ছিল বড় ধরনের। বলা হয় দুর্গস্থ ১৬ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এবং এক লাখ মানুষকে

দাসে পরিণত করা হয়। মাকরেজির বরাত দিয়ে হিট্টি বলেন, নগরের গির্জাটি ভস্মীভূত করা হয়।[৪৮] এন্টিয়ক বিজয়ের পর আশেপাশে ছোটখাট ল্যাতিন উপনিবেশগুলো আত্মসমর্পণ করে। ১২৭১ সালে হস্পিটালারদের দুর্গ হসনে আরকাদ এর পতন ঘটে, এর নিকটবর্তী মাসইয়াদ, কদমাস, কাহ্ফ এবং খাওয়াবী দুর্গসমূহ আত্মসমর্পণ করে। এ সকল দুর্গে এ্যাসাসিনদের আড্ডা ছিল এবং এদের সাথে ক্রুসেডারদের সুসম্পর্ক ছিল। এরপর আনতারতুসের টেম্পলার এবং মারকারের হস্পিটালার নাইটগণ রাইবার্সের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হন।

বাইবার্সের উত্তরসূরি কালাউন (১২৭৯-৯০ খ্রি.) রাইবার্সের অসমাপ্ত স্বপ্ন অনেকাংশে বাস্তবায়িত করেন। আনতারতুসের টেম্পলারদের চুক্তি দশ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। বৈরুতের নিয়ন্ত্রা টায়ারের রানিও কালাউনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। ১২৮৯ সালে ত্রিপলি আত্মসমর্পণ করে। আক্রা এ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের হাতেই ছিল; নগরটির দখলের প্রস্তুতির মধ্যে কালাউনের মৃত্যু হলে তদপুত্র আশারাফ (১২৯০-৯৩ খ্রি.) পিতার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; ১২৯১ সালে নগরটির পতন ঘটান হয়; সেই সাথে অন্যান্য শহরগুলো মামলুকদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। Thus one of the most dramatic chapter in the history of syria closed.[৪৯]

৯.৬ ক্রুসেডের আর্থ-সামাজিক ফলাফল

মধ্যযুগে ক্রুসেড কি কেবলই রক্তক্ষয়ী নরহত্যাযজ্ঞ ছিল? দীর্ঘদিনব্যাপী ইউরোপ পশ্চিম এশিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্বই কি প্রধান? সমন্বয় প্রক্রিয়া কি অনুপস্থিত? উভয় অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া কি একেবারেই নিষ্ফল? এর কি কোনো ইতিবাচক ফলাফল ছিল না? ক্রুসেডের আবর্জনা হতে আধুনিক গবেষকগণ এর ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক ফলাফলের সন্ধান পেয়েছেন। মুসলিম বিশ্বে এর ধ্বংসাত্মক ফল প্রকট হলেও নয়া ইউরোপের বিকাশে এর প্রভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হল।

পূর্বেই মন্তব্য করা হয়েছে যে, ক্রুসেড প্রাক্কালে ইউরোপ ছিল উদীয়মান মহাদেশ; কোনোক্রমে উন্নত নয়। পশ্চিম এশিয়া ছিল দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু তবে পতিত নয়। ক্রুসেডাররা পশ্চিম এশিয়ার 'বর্বর, বিধর্মী ও পৌত্তলিক' মানুষকে যিশুখ্রিষ্টের অমর শিক্ষা দ্বারা সভ্য ও ধার্মিকে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল অন্যরূপ। প্রত্যক্ষদর্শী উসামা বলেন তারা সাহসী নরপশু যারা তখনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক স্তরেও পদার্পণ করে নি; বরং পশুশক্তি দিয়ে সত্য-মিথ্যার যাচাই করে।[৫০] বস্তুত পশ্চিম এশিয়াকে দেয়ার মত তাদের কিছু ছিল না: রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক জীবনে আরব সংস্কৃতি হতে তাদের গ্রহণ করার কি কিছুই ছিল না? অবশ্যই ছিল; কিন্তু বাস্তবে ক্রুসেডাররা আরবদের মানসিক সংস্কৃতি হতে

লক্ষণীয় কিছু গ্রহণ করে নি। এর কারণ, প্রথমত পূর্বে বলা হয়েছে বহু পূর্ব হতে এ অঞ্চলে আসে অবক্ষয়। নুরুদ্দীন-সালাহউদ্দীনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আরব সংস্কৃতির মৌলিকতা ও সৃজনশীলতা ধরে রাখা যায় নি; বরং এ সময় সিরিয়া ও মিশর মুসলিম স্পেন ও সিসিলি হতে বহুগুণে পাশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। তাই অন্যকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা এদের ছিল না। দ্বিতীয়ত ক্রুসেডাররা পশ্চিম এশিয়ায় তাদের প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশের দুর্গে বসবাস করত; তাদের যোগাযোগ ছিল স্থানীয় কৃষক ও কারিগরদের সাথে; এদের অন্তর্মুখী শাসক শ্রেণীর সাথে আরব বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিবানদের কোনো যোগাযোগ ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয়ত তাদের আত্মম্ভরিতা, পূর্ব সংস্কার এবং অলিক জাত্যাভিমান স্থানীয় উচ্চ মানসিক সংস্কৃতি গ্রহণেও কম বাঁধা ছিল না।[৫১] একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এসব বাস্তব অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর বিজ্ঞান, দর্শন ও মানববিদ্যার সঞ্চালন প্রক্রিয়া একেবারে স্তব্ধ ছিল না। আরব জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্রের একজন প্রধান অনুবাদক বাথের আডেলার্ড দ্বাদশ শতকে এ্যান্টিয়ক ও তারসুস ভ্রমণ করেন; পিসার স্টিফেন ১১২৭ সালে এ্যান্টিয়কে আল মাজুসির চিকিৎসা বিদ্যার পুস্তক লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তা স্বদেশে প্রেরণ করেন। আর একটি বিষয় কোনো ঐতিহাসিকের চোখ এড়াতে পারে না; তা হল-দ্বাদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পশ্চিম এশিয়ার অনুরূপ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে সমগ্র ধারণাটি এসেছিল পশ্চিম এশিয়া হতে; তাছাড়া জনতার হাম্মামখানা (Public bath) ও পশ্চিম এশিয়া হতে আমদানি করা হয়।[৫২] এতদ্ব্যতীত ত্রিপলির জনৈক ফিলিপ ১২৭৬ সালে এ্যারিস্টটলের অনুবাদ বলে কথিত সিররুল আসরার গ্রন্থটিও ল্যাটিনে ভাষান্তর করেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় কথাশিল্পে পশ্চিম এশিয়ার সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়; Holy Israil এর রূপকথা মূলত সিরিয় উৎস হতে গৃহীত হয়; ক্রুসেডাররা কালিলাওয়াদিমনা এবং আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবশ্যই শুনে থাকবে এবং মুখে মুখে তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এদের প্রভাব চসারের স্কয়ার টেলস এবং বোকাচ্চোর ডেক্কামেরোন এ পরিলক্ষিত হয়। যাজকদিগকে আরবি ভাষা এবং প্রাচ্য বিদ্যায় পারদর্শী করার জন্য ১২৭৬ সালে মিরামার এ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপে আরবি ভাষা ও প্রাচ্যবিদ্যার প্রসার ঘটনোর জন্য অক্সফোর্ড সোরবণ, পাদুয়া, প্যারি, লুভ্যোঁ এবং আলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা ফ্যাকালটি চালু করার জন্য খ্রিষ্টানদের ভিয়েনা কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৫৩] উল্লেখ্য আরব মানসিক সংস্কৃতির অতি নগণ্য অংশই ক্রুসেডারদের মাধ্যম ইউরোপে গেলেও একাদশ হতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত আরব বিজ্ঞান ও দর্শনের কি বিপুল চাহিদা বাড়ে এবং কিভাবে তাদের উদীয়মান বিদ্বৎ সমাজ সিসিলি টলেডোতে ব্যাপক অনুবাদ কর্মযোগ্য চালায় এবং ইউরোপের শাসন নতুন স্বপ্ন যোগায় তা পরে আলোচিত হয়েছে।

বস্তুত ক্রুসেড সময়কালীন ইউরোপে আরব মানসিক সংস্কৃতির প্রভাব প্রকাশ্যত ক্ষীণ বলে প্রতীয়মান হলেও নিঃসন্দেহে আরব বৈষয়িক সংস্কৃতির দ্বারা তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেই বুঝতে পারে যে এদের রণকৌশল, অস্ত্র-শস্ত্র কত উন্নত। এ জন্য সামরিক ক্ষেত্রে ক্রসবো, ভারী বর্ম, অস্ত্রের নিচে সুতি প্যাডের ব্যবহার, সামরিক বাদ্যে তারাও নাকারার ব্যবহার, সামরিক সংবাদ প্রেরণের কৌশল, বিজয় উৎসবে আলোকসজ্জা শারীরিক কসরতের জন্য খেলাধুলা, অগ্রদৌতিক কাজের, নগর অবরোধের কৌশল— সবকিছু তারা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে।[৫৪] এ সব গ্রহণে তাদের জন্য গোড়ামি বা সংস্কার কোনো বাধা হয় নি। ক্রুসেড যুগে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইউরোপের উপর পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও তাৎপর্যপূর্ণ। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে পশ্চিম এশিয়ার অসংখ্য উদ্ভিদ ও ফসল যেমন চিনি, চানা, ধান, লেবু, তরমুজ, খরবুজ, কাকুত, ফুটি, আসকালান পেয়াজ ইত্যাদির চাষ খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[৫৫]

এতদ্বঞ্চলে বহুদিন অবস্থান করার ফলে এখানকার উন্নত বৈষয়িক সংস্কৃতি সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব হয় নি; বরং এদের সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় নতুন রুচিবোধ ও নতুন স্বাদ। সিরিয়ার বিভিন্ন বাজারে স্তূপীকৃত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বিলাসদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, নানা ধরনের সুগন্ধি, নানা জাতের সুস্বাদু মসলা, হাজার রকমের মিষ্টি সামগ্রি তাদের রসনাকে আকৃষ্ট করে। এসব বিলাসদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নয়া স্বাদ ও নয়া রুচিবোধ। ইউরোপে দ্রুত সব পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইটালি ও ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর হতে ইউরোপের অভ্যন্তরে রপ্তানি করা হয়। ১১০১ সালে সিজারিয়া নগর দখলেব পর জেনওয়ার অংশ গ্রহণকারীদের ভাগে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ১৬ হাজার পাউন্ডের ঝাল লঙ্কা, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচি, কর্পূর, আদা মিলে ছিল। বস্তুত দ্বাদশ শতকে পাশ্চাত্য দেশে এসব ভোগ্য পণ্যের এতই প্রচলন হয় যে, এসব মসলা ব্যতীত ইউরোপের উচ্চশ্রেণীর সমাজে ভোজসভা সম্পূর্ণ হত না। এ সময় ইউরোপ প্রথম চিনির ব্যবহার শেখে। পূর্বে ইউরোপীয়রা মধু দিয়ে মিষ্টি তৈরি করত। এ সময় চিনি খুবই জনপ্রিয় হয়। ফ্রাঙ্করা সিরিয়াতেই চিনি, আখ চাষ এবং চিনি তৈরি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হয়। চিনি শিল্প তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। টায়ারের উইলিয়ম ১১৯০ সালে আখ চাষ ও চিনি সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করেন। চিনির সাথে লাল ধরনের পানীয়ের প্রচলন ইউরোপে হয়।[৫৬] ক্রুসেডাররা ১১৮০ সালে সিরিয়া হতে নরম্যানডিতে বায়ু চালিত কলের প্রবর্তন করে। জলচক্র যদিও ইউরোপে একেবারে অজানা ছিল না তবুও ক্রুসেডাররা সিরিয়া হতে উন্নতমানের জলচক্র আমদানি করে। এই যন্ত্রদ্বয়ের প্রচলন সম্পর্কে মার্কসে একটি মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে, যন্ত্রদ্বয়ের প্রচলনের ফলে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র ইউরোপে আরো দীর্ঘস্থায়িত্ব পায়।

ক্রুসেডাররা কেবল পশ্চিম এশিয়ার খাদ্য-বিদ্যায় (gastonang) পারদর্শিতা অর্জন করে নয়া রুচি বৃদ্ধি করে নি, সেই সাথে পরিধান সম্পর্কেও নয়া চেতনা অর্জন করে। সুন্দর পরিধেয় পরিচ্ছদ ও ঘর সাজানোর তাগিদে ইউরোপে নতুন নতুন বিলাস দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করে। ক্রুসেডাররা ইউরোপে দাড়ি রাখার রেওয়াজ করে; কাচের গ্লাস নিত্য কাম্য বস্তু হয়; তারা স্বদেশে কম্বল, কার্পেট, বুনট গালিচা, মসলিন, মখমল, বুটিদার চাদর, ভ্যালভেট, মার্টিন, রেশমি ও পশমি পোশাক, হাতির দাঁতে, মণিমুক্তা ও মূল্যবান পাথর ইত্যাদি বিলাস দ্রব্য প্রেরণ করে। সুন্দর পরিচ্ছদ ও ধাতব দ্রব্যের সাথে নানা রঙ এবং রঞ্জক দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। প্রাচ্যের মূল্যবান দ্রবাদি ও কাঁচামাল আমদানি হওয়ায় ইউরোপে কুটির শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়।

উল্লিখিত বিকাশমান পরিস্থিতিতে ইউরোপে প্রাচ্য কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের নয়া বাজার, পশ্চিম এশিয়ার সাথে ক্রুসেডারদের এবং তীর্থযাত্রীদের জলপথে গমনাগমন বৃদ্ধিতে ভূমধ্যসাগরে অভূতপূর্ব নৌকার্যক্রমে জাহাজ শিল্প ও নৌশক্তির বিকাশ অনিবার্য হয়। বহুদিন ইটালির বণিক রাষ্ট্রসমূহ জাহাজায়নে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে; কিন্তু অচিরেই মার্সাই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ইউরোপে দ্রুতগতিতে মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। মুদ্রার অধিকতর সঞ্চারণ ও সঞ্চালন এবং দ্রুততর সরবরাহের তাগিদে পিসা, জেনওয়ায় নতুন ধরনের আর্থিক কাঠামো বা ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। ব্যাংকের শাখা সিরিয়ায়ও খোলা হয়। জেনওয়ার বণিকরা সর্ব প্রথম আক্কাতে ১১৮০ সালে বাণিজ্যিক কনসোলেট প্রতিষ্ঠা করে। নৌচালনা কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে চীনে আবিষ্কৃত আরবদের ব্যবহৃত দিকদর্শন যন্ত্রের সর্বাত্মক ব্যবহার করে ইটালির বণিকরা, পরবর্তীকালে ইউরোপ কর্তৃক ভৌগোলিক আবিষ্কারে ঐ দিকদর্শন যন্ত্রের একটা ভাল ভূমিকা ছিল।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় যে, একাদশ শতকের শেষ প্রান্তে ইউরোপ ছিল কেবল উদীয়মান শক্তি; ক্রুসেডকালে সমগ্র ইউরোপে দ্বন্দ্ব-সমন্বয় প্রক্রিয়ায় পশ্চিম এশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠযোগাযোগের পরিণতিতে তারা দ্রুত বিকাশের বাস্তব উপাদান আয়ত্ত করে। প্রায় সমগ্র ইউরোপে কৃষি, শিল্প বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। ইউরোপে উৎপাদিত শক্তির নয়া বিকাশে ম্যানর বা সামন্ত অর্থনীতিতে সংকট দেয়া দেয়। একদিকে কৃষি বিদ্রোহ এবং স্বাধীন কৃষক শ্রেণীর বিকাশ অন্যদিকে শহুরে সম্পদ ও কারিগর শ্রেণীর বিকাশে এক নয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ইউরোপে এক মনোবিপ্লব সংঘটিত হয় যার প্রকাশ ঘটে পরবর্তী রেনেসাঁস আন্দোলন ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে। কুটির শিল্পের বিকাশে দেশ বাণিজ্য বিপ্লবের মুখোমুখী হয়। এভাবে সমগ্র ইউরোপ আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের স্তরে পৌছে যায় এবং রচিত হয় আধুনিক ইউরোপের পটভূমি।

ক্রুসেডে পশ্চিম এশিয়ায় কি ঘটল? শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও সত্য যে, ক্রুসেড প্রাচ্য মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয় তাই না, বরং এটাকে একটা বড় ঘটনা বলেও অনেকে ভাবতে পারে নি। দশম শতাব্দী হতে বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের সাথে প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বে সামন্ত শক্তি ক্রমাগত শক্তিশালী হয়। বিশ্ব বাণিজ্য হতে ক্রমাগত দূরে সরে থেকে প্রগতির পথ হারিয়ে ফেলে; গোঁড়ামী বা মৌলবাদ প্রধান্য পায়; ভুলে যায় তাদের গৌরবময় সংস্কৃতি; ধীরে ধীরে তারা পতনের দিকে ধাবিত হয়।

তথ্যপুঞ্জি

১. Hitti, op, cit p 153

২. Ibid p 150

৩. Ibid p 636

৪. Ibid pp 636-7

৫. মুসা আনসাবী, ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, ঢাকা, ১৯৯২ পৃ. ১২৩-২৪

৬. Hitti, op, cit pp 533-4

৭. রেবতী বর্মন, সমাজ ও সভ্যতাব ক্রমবিকাশ (ঢাকা ১৯৫২) পৃ. ১১২-১৮

৮. D W Nabuder, The Political Economy of Imperrcalism (London) p 1777 -6

৯. মুসা আনসারী হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা পৃ. ১২৭-৪৩

১১. রেবতী বর্মন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

১২. ঐ পৃ. ১২০

১৩. ঐ পৃ. ১২১

১৪. ঐ পৃ. ১২২

১৫. ঐ পৃ. ১২৩

১৬. ঐ পৃ. ১২৪

১৭. মুসা আনসারী, সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, প্রাগুক্ত পৃ. ১২৩

১৮. রেবতী বর্মন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১৩০

১৯. মুসা আনসারী, সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

২০. R N Strombage, An Intellectual History of Modern Europe (New Javery 1975) p 10

২১. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩

২২. Hitti, op, cit p 636

২৩. Ibid p. 635

২৪. Ibid p 536

২৫. রেবতী বর্মন, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৩

২৬. Hitti, op, cit p. 636

২৭. Ibid p. 538
২৮. Ibid p. 536
২৯. Ibid p. 639
৩০. Ibid p. 640
৩১. Ibid p. 640-3
৩২. Ibid pp. 644-5
৩৩. আমীর আলী প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩৫
৩৪. ঐ পৃ. ৩৩৬
৩৫. Hitti, op, cit p. 645
৩৬. আমীর আলী, প্রগুক্ত পৃ. ৩৩৭-৩৪০
৩৭. Hitti, op, cit p. 646
৩৮. Ibid p. 647
৩৯. Ibid p. 648
৪০. Ibid p. 651
৪১. আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬৪
৪২. Hitti, op, cit p. 653
৪৩. Ibid p. 653
৪৪. Ibid p. 654
৪৫. Ibid p. 654
৪৬. Ibid p. 654
৪৭. Ibid p. 656
৪৮. Ibid p. 657
৪৯. Ibid p. 658
৫০. Ibid p. 662
৫১. Ibid p. 662
৫২. Ibid p. 663
৫৩. Ibid p. 663
৫৪. Ibid p. 665
৫৫. Ibid p. 665
৫৬. Ibid p. 667

দশম অধ্যায়

তুর্কি সেলজুক বংশের অভ্যুদয় : মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব

১০.১ সাধারণ মন্তব্য

ইতোপূর্বে বুওয়াইহী যুগে বাগদাদে আব্বাসী খেলাফতের বাস্তব অবস্থা কিরূপ ছিল–তার উপর বিস্তৃত না হলেও যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। একাদশ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধের প্রথম দিকে (১০৫৫ খ্রি.) তুর্কি জাতিসত্তার অন্যতম গোত্র সেলজুক কর্তৃক বাগদাদ বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। প্রফেসর হিট্টির মতানুসারে তাদের অভ্যুদয়ে ইসলাম এবং আব্বাসী খেলাফতের ইতিহাসে এক নয়া ও উল্লেখযোগ্য যুগের সূচনা করে।[১] তার ভাষায় : The advent of Saljuq Turks ushers in a new and notable era in the history Islam and Chaliphate পুনশ্চ তাদের অভ্যুদয় প্রাক্কালে ইসলামি বিশ্ব কিরূপ বহুকেন্দ্রিক বা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তিনি তার বাস্তব অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও দিয়েছেন। তিনি বলেন : If their appearence from the east in the early part of the eleventh century the caliph held out a shadow of her power and his empire had been almost his membered. The Umayyads in Spain and shiite Fatimids in Egypt and north Africa were eslablished beyond any hope of displacement from Bagdad. North Syria and upper Mesopotamia... were in the hands of turbulent Arab chieftain, some of whom had succeeded in foundeing dynasties persis Transoxina and the lands to the east and south were percelced among Buwayhid and Ghaznavids power or had by sundray petty dynasties, each waiting for an opportunity to fly at the throat of the other, Political and military anancly prevalid every were. Shiite Sunm confusion was the order of the dey. Islam seemed crushid to the ground.[২] তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের এরূপ বাস্তবতা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাদের অভ্যুদয় প্রাক্কালে এরূপ বিশৃঙ্খল অরাজক প্রসঙ্গ উত্থাপন একেবারে গতানুগতিক বলে মনে হয়। এ বর্ণনায় দশম ও একাদশ শতকের মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলের গভীরতর ঐতিহাসিক প্রবণতার প্রতিফলন হয় নি। অথচ তিনি সামানি রাজ্যে তুর্কিদের আক্রমণ প্রসঙ্গে অন্যত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। This for the first but not the last time we note Turkoman hords of Central Asia thursting them selves to the fore front of Islamic affair the struggle between Iranian and Turkoman of supremacy for the borderland of Islam.[৩] তিনি একাদশ শতকে ইসলামি বিশ্বের পূর্বাঞ্চলের উপর প্রভাব বলয় সৃষ্টির

জন্য ইরানি তুরানি জাতিসত্তাদ্বয়ের মধ্যকার নয়া দ্বন্দ্বের কথা যথার্থভাবে উত্থাপন করেছেন। এ দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রতি বিশেষ জোর দেন নি বলেই ঐতিহাসিক সত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় নি। তদুপরি সেলজুক কর্তৃক বাগদাদ বিজয়ে আব্বাসী খেলাফতের জন্য কি কোনো মঙ্গল বহন করে? বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের রায় অন্য রকম। ১০৫৫-১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসী খলিফাদের অবস্থা অন্তত বুওয়াইহী যুগের মতই ছিল। আব্বাসী খেলাফতের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল যথাপূর্বং তথাপর।

তাহেরিরা অচেতনভাবে ইরানি জাতিসত্তার বিকাশের যে বীজ বপন করে এবং সামানিরা তা সযত্নে লালন-পালন করায় দাকিকী ও ফেরদৌসীর শাহনামানায় ইরানি ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাঙময় হয়ে ওঠে।[৪] আরব-ইতিহাস অনুধাবন করার জন্য তাবারীর ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়।[৫] বুওয়াইহী যুগে তা মহিরূপে পরিণত হয়ে ইরানি জগত গড়ে ওঠে। আমীর আলী যথার্থই বলেন যে, এ সময় মানুষের দৃষ্টি নিপতিত হয় সিরাজ, ইসপাহান, গজনা, সমরকন্দ ও বোখারার উপর—বাগদাদ তাদের ঔজ্জ্বল্যের নিকট ম্লান হয়ে পড়ে।[৬] জেগে ওঠে প্রাচ্য মুসলিম সাম্রাজ্যের জাতিসত্তাসমূহ, তারা কৌশলগতভাবে আরব নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেয়। একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ইরানি জগতে প্রবেশ করে আর এক বিজিত জাতিসত্তা। এরা তুর্কি জাতিসত্তা। দশম শতাব্দীর পূর্বেও ইসলামি বিশ্বে তুর্কি অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা ছিল বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন, সামাজিক উদ্দেশ্য বর্জিত। দশম শতাব্দীর নয়া বিশ্ব পরিস্থিতিতে তুর্কি জাতিসত্তার উগুজ বা গুজ গোত্রের সেলজুক পরিবার ইসলামি বিশ্বে প্রবেশ করে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। তারা ইরানি বুওয়াইহীদের মত, বিশালতর এক রাষ্ট্রসজ্ঞ প্রতিষ্ঠা করে। তারা তাদের স্বর্ণযুগে প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বের একত্রিভন সম্পাদন করে এবং নয়া সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করে। তাদের মৌল সংস্কৃতির সাথে ইরানি আরব সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়ে মধ্যযুগে এক নয়া সামন্ততান্ত্রিক সমরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের সূচনা করে। ফলে এই নয়া সংস্কৃতি ভিত্তি রচনা করেন নিজামুলমুলক তুসি। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা হবে। ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উসমানী তুর্কি পরিবার ইসলামি বিশ্বের উপর তাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক নেতৃত্ব দেয়; ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া—এই তিন মহাদেশের বিপুল অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের প্রভাববলয়। তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত। মধ্যযুগে বিশ্ব সভ্যতায় তাদের অবদান মূল্যায়ন অপেক্ষায় আছে।[৭]

১০.২ তুর্কি জাতিসত্তার পরিচয়

তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পূর্বে তাদের অভ্যুদয় প্রাক্কালে বিশ্বের বাস্তব অবস্থার প্রতি একটু নজর দেয়ার প্রয়োজন আছে। বিশ্ব-সভ্যতার দশম শতাব্দীতে রূপান্তর প্রক্রিয়া

জোরদার হয়। ইউরোপের ইতিহাসে এটা ছিল প্রাক-রেনেসাঁস যুগ। মধ্যযুগের প্রথমার্ধে বহুদিন আরব সভ্যতার প্রাধান্যের ফল হিসেবে বাগদাদ হয়ে ওঠে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রাণ-কেন্দ্র। বাগদাদ হতে আরব জগতের সাথে চীন-ভারত-সিংহল, জাভা, সুমাত্র-আফ্রিকা, পশ্চিম ইউরোপ স্ক্যানডিনেভিয়া, বাইজানটাইন হতে পূর্ব-ইউরোপ রাশিয়া দক্ষিণ ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বাণিজ্যিক জাল বিস্তৃত ছিল। ভারত মহাসাগর, পারস্য উপসাগর, আরব ও লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর, ক্যাস্পিয়ন সাগর ভূমধ্যসাগর তীরে ছিল অসংখ্য বন্দর।[৮]

দীর্ঘদিনের আরব বাণিজ্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে একাদশ শতকে মধ্য এশিয়ার তুর্কি জাতিসত্তায় জাগরণের জোয়ার দেখা দেয। এ জাগরণের বৈশিষ্ট্য ছিল দ্বিবিধ। ক. পেচেনেগ তুর্কি (Pecheneg turk) গোত্র তাদের নিজস্ব অঞ্চল হতে ক্যাস্পিয়ন সাগবের উত্তরে ভলগা নদী অববাহিকায় ক্রমাগত আক্রমণ চালানোর ফলে রুশ জাতিসত্তাব বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। সাধারণ বিপদের মুখে রুশ ও বলগারদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের সাথে বাইজানটাইনের সুসম্পর্ক থাকায় সমগ্র সনাতন উত্তর বাণিজ্য পথ রুদ্ধ হয়ে নতুন কিভ-কন্সট্যান্টিনোপল হয়ে এক নয়া বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হয়; উদীয়মান ইটালিব বণিক রাষ্ট্রসমূহ এই পথে ইউরোপে পণ্য আমদানি এবং ভূমধ্যসাগর দিয়ে রপ্তানি শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে মধ্যএশিয়া এবং ককেশীয় অঞ্চল বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।[৯] খ. তুর্কি জাতিসত্তার উগুজ গোত্রের একটি অংশ দস্যুতার পথ না মাড়িয়ে নয়া আবাসভূমির সন্ধানে তৎকালীন তুখারিস্তান বা আধুনিক উজবেকিস্তানে প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বোখারা অভিমুখে রওনা হয়। এ সময় সামানিদের অবক্ষয় দ্রুত হয়। তাদের রাজ্যের একাংশে প্রতিষ্ঠিত ইলাকখান রাজ্য অনেকাংশ সমগ্র খোরাসানে প্রতিষ্ঠিত হয় গজনি রাজ্য; কিন্তু গুজ তুর্কিরা সামানিদের সাহায্য করায় সুলতান মাহমুদের অগ্রাভিযান আমুদরিয়ার দক্ষিণ তীরে স্তব্ধ হয়। মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনি রাজ্যের অবক্ষয় দেখা দেয়। পারস্য ও ইরাকে বুওয়াইহী রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবক্ষয়ও দ্রুততর হয়। বস্তুত ইসলামি বিশ্বের বিশৃঙ্খল অবস্থার যে বর্ণনা হিট্টি দিয়েছেন তা সবই যথার্থ। যে কথা হিট্টি বলেন নি, তা হলো আরব সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক অবক্ষয় প্রকট হওয়ায় এতদ্বঞ্চলে সর্বত্র আর্থ-সামাজিক অস্থিবতা প্রচণ্ডতা পায়; সামানি বুওয়াইহীদের পতনের মূল নিহিত ছিল বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের মধ্যে। আধুনিক ঐতিহাসিক শাবান তার গবেষণার এ সত্যটির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরূপ পটভূমিতে সেলজুকে তুর্কি জাতিসত্তার উত্থান, তাদের শাসন নীতি ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হওয়া উচিত।

ইসলামি বিশ্বের সাধারণ বাস্তব অবস্থার সাথে বাগদাদ খেলাফতের বাস্তব অবস্থাটি বিবেচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সেলজুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীন আব্বাসী খলিফাদের অবস্থান আলোচনাই মুখ্য বিষয়। বুওয়াইহী যুগে বাগদাদে আব্বাসী

খেলাফতের বাস্তব অবস্থার উপর ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। বুওয়াইহী যুগে খলিফাদেরকে প্রশাসনিক ক্ষমতা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়। তারা কেবল সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। সুন্নি ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণই তাদের একমাত্র পবিত্র দায়িত্ব। মিশরে ফাতেমী বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আধ্যাত্মিক প্রাধান্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে সর্বত্র, এমন কি আব্বাসী প্রভাব বলয়ে জায়দী, ইসমাইলী তৎপরতা বাগদাদ নগরে শিয়া-সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক বৌদ্ধিক প্রভাব আব্বাসী খলিফাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ধর্মীয় অধিকারও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলেও তাদের মনে হয়। বাগদাদ সমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে শিয়া পণ্ডিতদের প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাগদাদ নগরে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে সহঅবস্থান দুর্বিসহ হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে একদিকে বুওয়াইহীদের রাজনৈতিক অবক্ষয়, অন্যদিকে প্রাচ্য অঞ্চলে উদীয়মান গজনি তুর্কিদের নেতৃত্বে সুন্নি ইসলামের বিজয়ে আশান্বিত হয়ে খলিফা আল ক্বাদির অন্তত সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর তার প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্য হতে মৌল ইসলামবিরোধী সকল প্রকার তথাকথিত বেদায়াত বা নয়া চিন্তন দূরীভূত করার জন্য মতাদর্শগত শুদ্ধি আন্দোলন পরিচালনা করেন। আল ক্বায়িমও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সুযোগ বুঝে তিনি সনাতন রক্ষণশীল ইসলামের প্রবক্তা সালজুকী তুর্কি জাতিসত্তার মুখপাত্র তুগ্রিল বেগকে বাগদাদে আমন্ত্রণ করে তার হস্তে সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এ কথাও ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এরূপ ঐতিহাসিক বাস্তবতায় তুগ্রিল বেগের বাগদাদ দখল ও শাসনে খেলাফত প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো নতুন যুগের সূচনা করে নি। সেলজুকদেরকে পূর্ব-পশ্চিমের সুলতান বলে খলিফার অভিনন্দনের অর্থ হল তাদেরকে জাহানদারী বা সালতানাতে সমাসীন বলে স্বীকৃতি দেয়া; খলিফা পূর্বের মত সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে থাকতে পারলেই সন্তুষ্ট। তাই খলিফাদের অবস্থানের কোনো উন্নতি হয় নি। বরং তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রবণতাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে শাসন ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশধারার পরোক্ষ ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়। সুন্নি-সেলজুকদের ঐতিহাসিক অবদান স্বীকৃত ব্যাপার। বৃহত্তর মানব সমাজ সংগঠনে কোরাইশ গোত্রীয় নেতৃত্ব অপরিহার্য নয়। তাই আরব নেতৃত্বের প্রয়োজন শেষ। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে দিল্লী সালতানাত মোগল বাদশাহী এবং তিন মহাদেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত উসমানী সাম্রাজ্যে। এরূপ শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নের পটভূমির রচয়িতা সেলজুক তুর্কিরা।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মধ্য এশিয়ার তুর্কি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক রকম জাগরণ দেখা দেয়। উগুজ গোত্রটি দস্যুতার পথ না মাড়িয়ে বরং ইসলামি বিশ্বের তুখারিস্তান বা আধুনিক উজবেকিস্তানে অভিবাসনকল্পে কিরঘিজিয়ার স্তেপভূমি ত্যাগ

করে। এই অভিবাসীদের নেতৃত্ব দেন বিখ্যাত যোদ্ধা পশুপাল মালিক দুকাক এর পুত্র সেলজুক। দুকাক রাজপরিবারের সাথে আপোষ করলেও পুত্র সেলজুক গোত্রপতি হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে উজবেকিস্তানের আমুদরিয়ার মুখে জন্দ এলাকায় বসতি স্থাপন করেন এবং স্বগোত্রকে সংগঠিত করার জন্য উইগুর খাকানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। নয়া আবাসভূমিতে উদীয়মান গোত্রটির তাদের প্রতিষ্ঠাতা সেলজুকের নামানুসারে নামকরণ করা হত। সেলজুককে রায়পু বা গুজ সোত্রপতি বলা হত। এ সময় তিনি একা অথবা গোটা গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। সম্ভবত জন্দের বাসিন্দাদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই হয়ত সুন্নি ইসলাম গ্রহণ করে। রুশ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, সেলজুক পরিবারে বাইবেল ব্যক্তিত্ব যেমন মিকাইল, ইস্রাফিল, ইত্যাদি নাম গ্রহণ হতে মনে হয় তারা খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

নয়া আবাসভূমিতে তাদের শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ দিল। সমগ্র ট্রান্স ওয়াকসিয়ানার উপর প্রভাব বলয় বিস্তারের জন্য কারাখানী ও সামানীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। তাদের ক্ষমতার লড়াইতে নিরপেক্ষ না থেকে বরং সেলজুকরা সামানিদের পক্ষ অবলম্বন করে গোত্রের শক্তি বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করেন। সেলজুক প্রায় ১০৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলে তাঁর পুত্রদের নেতৃত্বে গোটা পরিবার বোখারার নিকটে আবাসন গ্রহণ করে ৯৮৫ সালে। ইস্রাইল বা আরসালান পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১০০৩ সালে সামানি সেনাধ্যক্ষ মুন্তাসিরকে সাহায্য করার কারাখানিরা পরাভূত হয়। আলী তাগান বোখারা দখল করলে আরসালান তাঁর সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন।[১০]

গজনী অধিপতি সুলতান মাহমুদ উত্তরাভিয়ানে খোরাসান হতে সামানিদের উৎখাত করতে সমর্থ হলেও আমুদরিয়া অতিক্রম করতে পারেন নি। নবাগত সেলজুক তুর্কিরা প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। খোরাসানে সুলতান মাহমুদের শাসন জনপ্রিয় হয়নি, তাই তিনি ১০২৫ সালে ট্রান্সওকসিয়ানা অভিযান করেন। এখানে কারাখানী শাসকের সাথে মাহমুদের সাক্ষাৎ হলে তাঁর নিকট হতে মাহমুদ সেলজুকদের ক্ষমতার আভাস পেয়ে তাদেরকে আমুদরিয়া অতিক্রম করে খোরাসানের বিশাল এলাকায় বসবাস করার আমন্ত্রণ করেন। তাই আরসালানের নেতৃত্বে সেলজুকদের একটি অংশ খোরাসানে আসে। সুলতান মাহমুদ আরসালানকে গজনিতে নিয়ে অবশেষে মুলতানের কালিঞ্জার দুর্গে কারা রুদ্ধ করেন। মাহমুদের এ কৌশলে তার উদ্দেশ্য হাসিল হয় নি, বরং তুর্কি নেতা ইয়াঘগুর, কিজিল, বুকা ও কোবতাসের নেতৃত্বে গজনি রাজ্য সীমার বাইরে দামঘনি, সামান, রায় ইস্পাহান, মারাগা, হামদান এবং ইরাক আজারবাইজানের বিভিন্ন নগরেও গঞ্জের উপর আক্রমণ ও লুটতরাজ শুরু করে।[১১] বায়হকি তাদেরকে ইরাকি গুজ বলে অবহিত করেন। সেলজুক তনয় মিকাইলের প্রতিভা ধর পুত্র তুগ্রিল বেগ,

চাগ্রী বেগ, দাউদ ও মোহামদের নেতৃত্বে সেলজুকরা আলী তোগতনের আমৃত্যু নুরে বোখারায় নিপাপদে বসবাস করে। এখানে চারণভূমি পর্যাপ্ত না থাকায় খাওয়ারিজম অঞ্চলে শীতকালে তাদের বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। আলী তেগীনের মৃত্যুর পর সেলজুকদের সাথে আলী তেগীনের উত্তরাধিকারী সামন্তদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়। খাওয়ারিজমে থাকা তাদের অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরূপ পরিস্থিতিতে গজনি সরকারের নিকট তারা আমুদরিয়া অতিক্রম করে খোরাসান প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। গজনি সরকারের সাথে তাদের আলোচনা ব্যর্থ হলে তুগীল বেগ চাগ্রী বেগ এবং ইব্রাহিম নায়ালের নেতৃত্বে তারা খোরাসানে পবেশ করে এবং ১০৩৮ সালে মার্ভ ও নিশাপুর দখল করে। এরূপ পরিস্থিতিতে গজনি সুলতান মাসুদের সাথে সেলজুকদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১০৪০ সালে দানকান যুদ্ধে মাসুদ পরাভূত হলে সমগ্র খোরাসানে সেলজুক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্ভ হয় নবগঠিত তুর্কি রাজ্যের প্রথম রাজধানী এবং সেলজুক পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য তুগ্রিল বেগ এই বংশের প্রথম নৃপতি। সমগ্র খোরাসানে তুগ্রিল বেগের নামে খোতবা পাঠ করা হয়। তাঁর নিকট খলিফা আল ক্বায়েম একজন দূত প্রেরণ করে। দূত তাঁর নিকট বিভিন্ন স্থানে বায়হকি কথিত ইরাকি গুজদেব বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন।[১২] গজনীদের ধ্বংসস্তূপে সেলসুক রাজ্য প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য শাবান কাহেনের ভাষায় প্রকাশ করেন : Ghagnands tled to India, Khurasan was lost, and the Iranioan plateus was wide open, The evolution of Iranians and Turkis worlds had led the formen admit the Turkis into its own bosom like that of the Germen empire. The conquest by the Turks, from then on, was acconplished from Inside.[১৩] যাকে তুগিল বেগের নেতৃত্বে প্রথম খোরাসানে যে সেলজুক রাজ্যের সূচনা হয় ইতিহাসে মহান সেলজুক (Great Salyuk) নামে পরিচিত। বাগদাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে এই মহান সেলজুকদের ইতিহাস জড়িত। সেলজুক রাজত্বকাল ১০৩৮-১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। মহান সেলজুক যারা সমগ্র পশ্চিম এশিয়া, এশিয়া মাইনর, ইরাক-পারস্য মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য ঐক্যবদ্ধ করে এক নয়া বৃহদায়তনের সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেন এবং আরব সভ্যতার পতাকা উড্ডীন রাখেন তারা হলেন :

ক. তুগ্রিল বেগ (১০৩৮-১০৬৩) খ্রি.);
খ. আলপ আরসালান (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.);
গ. মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২ খ্রি.)
ঘ. মাহমুদ ও বর কিয়ারুক (১০৯২ খ্রি.)
ঙ. মালিক শাহ
চ. মুহম্মদ (১১০৪-১১১৭ খ্রি.)
ছ. সানজার (১১১৭-১১৫৭ খ্রি.)

মহান সেলজুকদের শাসন আমলে বাগদাদে খেলাফতের আমলে সমাসীন ছিলেন:

২৬। আল কাইম (১০৩১-১০৭৫ খ্রি.)
২৭। আল মুকতাদী (১০৭৫-৯৪ খ্রি.)
২৮। আল মুস্তাজহীর (১০৯৪-১১১৮ খ্রি.)

১০.৩ সেলজুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীন বাগদাদ : তুগ্রিল বেগের বাগদাদ শাসননীতি ও পদ্ধতি

১০৩৮ সালে মার্ভ নিশাপুর দখলের পর ১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পার হতে না হতে বলখ, খাওয়ারিজম, জুরজান, তাবারিস্তান, রায়, ইসপহান ইত্যাদি স্থানে উদীয়মান সেলজুকি রাজ্য সম্প্রসারিত হয়। এ সব ছোট ছোট রাজ্যের অনেকগুলোর শাসকরা স্বেচ্ছায় তুগ্রিল বেগের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। জুরজান এবং তাবারিস্তানে স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করে। খাওয়ারিজম এবং পারস্যের অবশিষ্টাংশ দখল করতে হয়। চার্ঘি বেগের পুত্র কার্বুদ কারা আরসালান একদল গুজ সদস্য নিয়ে ১০৪১ সালে কিরমান জয় করেন এবং ১০৪৮ সালে কিরমান রাজধানী বারদাসির দখল করেন। আরো পরে গারমাশির এবং উমানে তা প্রভাববলয় সৃষ্টি হয়। তুগ্রিল বেগ তার এসব কর্যকলাপ অনুমোদন করেন।[১৪]

১০৪৮ সালে আবখাজ নেতা লিপারিটিসকে বন্দি করা হয় এবং এশিয়া মাইনরে আগ্রাসন শুরু হয়। এশিয়া মাইনর অভিযানে নেতৃত্ব দেন ইব্রাহিম নিয়াল। তিনি এরজুরাম ও ত্রিবিজান্দ পর্যন্ত অগ্রসর হন। হামদান ও জাবাল দখল করেন। তার নেতৃত্বে এরূপ বিজয়ে স্ফিত হয়ে তিনি সেলজুক পারিবারিক যৌথ নেতৃত্ব নীতি মানতে অস্বীকার করতে চাইলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়। নিয়াল এতে নিহত হন। এরূপ পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলে এতদঞ্চলে তাদের অগ্রগামী নীতি কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।[১৫] যাহোক তুগ্রিলের নেতৃত্বে সামানী, গজনী, বুওয়াইহী শক্তিসমূহের ধ্বংসস্তূপে প্রতিষ্ঠিত হয় উদীয়মান সেলজুক রাষ্ট্রসঙ্ঘ। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসন করে তুগ্রিল বেগ সিরিয়া, আরমেনিয়া দখল করেন এবং বাগদাদ তখন ইরাক দখলের পায়তারা করছিলেন। ১০৫৫ সালে বাগদাদ দখলের সুযোগ এসে যায়। এ সময় বাগদাদে বুওয়াইহী সুলতান মালিকআররহিমের সেনাধ্যক্ষ বাসাসিরির সাথে খলিফা আল ক্বাযিমের সচিবের মধ্যকার দ্বন্দ্বে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। খলিফা কায়িম ঐ রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য অপেক্ষমান তুগ্রিল বেগকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানালে তিনি সানন্দে ১০৫৫ সালে বাগদাদ নগরে প্রবেশ করলে বাসাসিরি বাগদাদ হতে পলায়ন করেন। খলিফা তুগ্রিল বেগকে ত্রাণকর্তা হিসেবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং খোতবায় তাঁকে বেবিলনের সুলতান বলে ঘোষণা করে। তুগ্রিল বেগ শহরের সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে মালিকআররহিম তাই নিরাপত্তার আশ্বাস পান। কিছুদিনের মধ্যে বাগদাদের

জনতার সাথে তুর্কি সামরিক বাহিনীর সংঘাত বাঁধলে তা দ্রুত আয়ত্তে আনা হয়। নগরে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তবে জনতার এ বিদ্রোহের জন্য মালিক আর রহিমের উপর দোষ চাপান হয় এবং তাকে রায়নগরে কয়েদখানায় বন্দি করা হয়।

১০৫৭ সালে তুগ্রিল বেগ নিসিবিন ও মোসুলে সফল বিজয় অভিযান পরিচালনা করে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলে খলিফা তাকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। দরবার কক্ষে পর্দার অন্তরালে পূর্ণাঙ্গ দরবারি পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে নবীর যষ্টি হাতে এক মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন খলিফা; তুগ্রিল বেগের দরবারে প্রবেশকালে ধীরে ধীরে পর্দা উন্মোচিত হয়; পার্শ্বে তৈরি আর এক মঞ্চে উপবেশন করেন তুগ্রিল বেগ। দোভাষীর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে আলাপচারিতা শুরু হয়। হিট্টি ইবনুল আসিরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: খলিফা বিজয়ীকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অভিভাবক হিসেবে প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের সুলতান বলে অভিনন্দিত করেন।[১৬] আরব ও পারস্যের প্রতীক দুটি মুকুট দ্বারা খলিফা তুগ্রিলের মস্তক অলঙ্কৃত করেন এবং সাতটি ইসলামি দেশের নিদর্শন হিসেবে তাকে সাতটি পরিচ্ছদে বিভূষিত করেন।[১৭] তার সরকারি উপাধি ছিল সুলতান; লেনপোল তার এ উপধি উৎকীর্ণ একটি মুদ্রার উল্লেখ করেছেন।[১৮] তদীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম নায়ালকে দমন করার জন্য তুগ্রিল বেগ বাগদাদ ত্যাগ করলে পলাতক বাসাসিরি ১০৫৮ সালে স্বীয় দায়লামী বাহিনী নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে খলিফাকে পদচ্যুত করে এবং তদস্থলে ফাতেমী খলিফা আল মুস্তাসির বিল্লাকে (১০৩৫-৯৪ খ্রি.) ইসলাম ধর্মের নেতা বলে ঘোষণা করেন। আব্বাসী খলিফা তার ধর্মীয় নেতৃত্বের দাবি ত্যাগ করে এক দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন; তাঁর পোশাক, নবীযষ্টি ও ধর্মীয় মঞ্চ সব কিছু মিশরে প্রেরণ করেন। ইরাকের সকল মসজিদে মুস্তানাসিরের নামে খোতবা পাঠিত হয়।[১৯] হিট্টি বলেন : The Caliph al Qaem was forecd to resign a document renounacing his right and rights of all other Abbasids in fovour of the rival Fatimid al Mustanser (1025-99) in Cairo to whom he now sent the emblems of the caliphate including the mantle and other sacred reliecs.[২০] তুগ্রিল বেগ বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলে বাসাসিরি বাগদাদ হতে পলায়ন করেন। তুগ্রিল বেগ পুনরায় কযেমকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দায়লামী বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয়। বাসাসিরি ওয়াসিতে পলায়ন করেও প্রাণ রক্ষা করতে পারেন নি। সালজুক বাহিনী তাকে ১০৬০ সালে হত্যা করে। এভাবে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ হতে বুওয়াইহী দায়লামীরা চিরতরে অপসারিত হয়।

সেলজুকি শাসননীতি ও শাসন পদ্ধতি: সেলজুকি রাষ্ট্রসঙ্ঘ

তুগ্রিল বেগ সালজুক শাসননীতি ও পদ্ধতির স্থপতি ছিলেন। বুওয়াইহী রাষ্ট্র সঙ্ঘের আওতায় মুইজুদ্দোলা বাগদাদের শাসনের নীতিমালার রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু তুগ্রিল বেগ কেবল বাগদাদ শাসন নীতিই নয় বরং সমগ্র সালজুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের ও শাসন নীতির

স্থপতি ছিলেন। উভয় বংশের শাসন নীতিতে বেশ একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় লোক গোষ্ঠী উন্নত আরব সভ্যতার সংস্পর্শে এলে, তাদের যাযাবরী জীবন ব্যবস্থা হতে নাগরিক সভ্যতায় দ্রুত উত্তোরণ ঘটে; তবে তারা উভয় জাতি গোষ্ঠী গোত্রতান্ত্রিক ঐতিহ্য সমতাবোধ ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারি নি। উভয় লোক গোষ্ঠী একই ধরনের শাসননীতি গ্রহণ করে তবে একই ধরনের কারণে নয়। বুওয়াইহীদের উত্থানের সময় ও মুসলিম বিশ্বে বাণিজ্যিক অর্থনীতির প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং বুওয়াইহীরা তৎকালীন বাণিজ্যিক অর্থনীতির প্রবক্ত জায়দী শিয়া ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কারণে বুওয়াইহীরা, এককেন্দ্রীক রাষ্ট্র ব্যবস্থা (Unitary form of Government) এর পরিবর্তে রাষ্ট্রসঙ্ঘ পদ্ধতি (Confederated form of Government) প্রবর্তন করে। কেননা সে সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রভাবে স্থানীয় স্বার্থ চেতনা প্রকট হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের স্বার্থের সমন্বয় ঘটানর জন্য ঐ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অথচ সেলজুকরা ঐ একই রকম রাষ্ট্র পদ্ধতি গ্রহণ করে ভিন্ন কারণে। তাহল তাদের উত্থান ঘটে মুসলিম বিশ্বে প্রচণ্ড অবক্ষয়ের সময়; বিশ্ব বাণিজ্যে মন্দাভাব বিরাজ করায় মুসলিম বিশ্বে কৃষি অর্থনীতির উপর গুরুত্ব পড়ে। এ সময় সামরিক ইকতা প্রথা বা ভূমি মঞ্জুরি প্রথা সার্বজনীন রূপ লাভ করে; এর ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদ এক নব রূপ লাভ করে। তদুপরি মতাদর্শগতভাবে তারা মৌলবাদী সুন্নি মুসলিম ছিল। এ সময় সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে উদার পন্থী হানাফী, সহনশীল শাফী অনুসারীদের সাথে রক্ষণশীল হাম্বলীদের ছোটখাট বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও মূল বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল। বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্নীদের ঐক্যের সন্ধানের প্রবণতা দেখা দেয়। যা হোক এ সময় কৃষি অর্থনীতি প্রবল হওয়ায় আঞ্চলিক স্বাধিকার প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। এরূপ আর্থ-সামাজিক বৌদ্ধিক পরিবেশে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটনার জন্য বুওয়াইহীদের মত রাষ্ট্রসঙ্ঘ পদ্ধতি প্রবর্তন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তুগ্রিল বেগ কর্তৃক গঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের ও রাষ্ট্রতত্ত্ব গঠন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করেন সালজক উজির নেজামুলক তুসী এ সম্পর্কে পৃথক আলোচনা করা হবে। তুগ্রিল বেগ কর্তৃক রাজতন্ত্র বা জাহানদারী গঠনটা ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ সাধ্য। বুওয়াইহীরা মতাদর্শগতভাবে শিয়া মতাবলম্বী হওয়ায় আব্বাসী খলিফাদেরকে রাজ্যের যাবতীয় প্রশাসনিক ও জাগতিক ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য করে; কিন্তু সেলজুলকরা সুন্নি মতাবলম্বী হওয়ায় খলিফা সেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের নিকট জাহান্দারি হস্তান্তর করেন। আরব-অনারব ও সুন্নি ইসলামের অধিকতর ঐক্য সাধন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংহতি মজবুত করতে প্রথমত তিনি আব্বাসীদের সাথে বৈবাহিক নীতি গ্রহণ করেন। উইলিয়াম ম্যুররের মতে তুগ্রিল বেগ স্বয়ং খলিফা মোকতাফীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় নীতি ছিল পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে মধ্যে একীভবন করার নীতি; তৃতীয়ত তিনি সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করেন। প্রফেসর হিট্টি তার সম্প্রসারণবাদী নীতির কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন যে, সেলজুকদের বিস্ময়কর সাফল্যে উল্লসিত হয়ে তুর্কি

জনগোষ্ঠী বিভিন্ন গোত্র সেলজুক পতাকা তলে সমাবেত হয়। As fresh turkish tribes man swelled their armies the Saljuqs extended their conquests in all directin until once more western Asia was united into Moslem Kingdon and the fading glony Moslem armies recovered. A new race from Central Asia was now pouring its blood into the struggle for Islami world supremcay.[২১]

জনশক্তির বিস্ফোরণে সাম্রাজ্যের অর্থ নীতির উপর চাপ পড়াই স্বাভাবিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাজস্ব বৃদ্ধির একমাত্র উপায় সম্প্রসারণনীতির অনুসরণ। যেহেতু তুগ্রিল বেগ ভূমি রাজস্ব নির্ভর অর্থনীতর প্রবক্তা তাই তিনি রাজ্য বিজয় নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই নীতির অনুসরণ করার অর্থ হল নতুন করে সমরতন্ত্রের প্রবর্তন করা। এর ফলে নতুন ভাবে তুর্কি জাতিসত্তা ভারতীয় উপমহাদেশ ও পূর্ব ইউরোপে বিজয় অভিযানে দিকে আসেন। বস্তুত মধ্যযুগে যেহতু ধর্মই ছিল রাজনীতির ভাষা সম্ভবত সে কারণে হিট্টি ধর্মের গৌরব পুনরুদ্ধারের কথাটি বলতে চেয়েছিলেন। অথচ দেশ জয় ছিল তাদের আপন সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। যাহক তুগ্রিল বেগ বাইজানটাইন সীমান্ত তারসুস হতে এরজুরাম পর্যন্ত রাজ্য সীমা বিস্তৃত করেন। আর এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে বাইজানটানের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১০৬০ সালে বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন; তাদেরকে কাপাডোসিয়া ও ফ্রিজিয়া হতে বিতাড়িত করেন। অবশ্য এ সকল বিজিত অঞ্চলে সালজুকী শাসন সুদৃঢ় করার পূর্বে ১০৩৬ সালে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য রেখে যান তার সম্প্রসারণবাদী সমরতন্ত্রী ঐতিহ্য। ইবনুল আসির তুগ্রিল বেগকে জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, উদার ধার্মিক, পরধর্মে সহনশীল, জীবনযাত্রায় আড়ম্বর এবং দ্যোৎসাহী বলে বর্ণনা করেন।[২২]

১০.৪ আল্প্ আরসালান (১০৬০-১০৭২ খ্রি.)

সেলজুক সংযুক্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা তুগ্রিল বেগের মৃত্যুর পর, তাঁর কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলপ আরসালান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। খলিফা কায়িম তাঁকে আজদুদ্দৌলাহ্ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১০৬৩-১০৭৩ সাল পর্যন্ত সগৌরবে অধুনা প্রতিষ্ঠিত সংযুক্ত সেলজুক সাম্রাজ্যের রাজধানী ইসপাহান হতে শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় কখনো তিনি বাগদাদ পরিদর্শনের সুযোগ পান নি।

আলপ আরসালান তাঁর মহান পিতৃব্য তুগ্রিল বেগের রণনীতি ও রণকৌশল কেবল অনুসরণই করেন, তাই নয়, তিনি তার বিকাশ সাধন করেন। তিনি ও সর্বাগ্রে শাসক পরিবারের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির মূল্য দিতেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তুগ্রিল ভ্রাতা চাগ্রী বেগের পুত্র কাবুর্দকারা আরসালান বেগের নেতৃত্বে কিরমানসহ বিভিন্ন স্থান অধিকার করার অনুমতি পেয়েছিলেন; কিন্তু আলপ আরসালান সিংহাসনে উপবেশন

করলে কার্বুদ ১০৬৭ সালে তার অধিকৃত অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এটা ছিল অশনিসঙ্কেত। এ জন্য স্বয়ং আলপ আরসালান কিরমান অভিযানে নেতৃত্বে দেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য করেন। প্রথম পরীক্ষায় তিনি সাফল্য অর্জন করেন। আলপ আরসালান তুগ্রিল বেগের সম্প্রসারণনীতির অনুসরণ করেন। রাজনৈতিক কারণে বাইজানটাইন শক্তির সাথে তিনি সংঘর্ষের নীতি অবলম্বন করেন। ১০৬৪ সালে আরমেনিয়ার রাজধানী এ্যানি দখল করেন; জার্জিয়া, ক্যাপাডোসিয়া, সাইলেসিয়া, মেলিদেনো, সিরিয়া একের পর এক রাজ্য তাঁর পদানত হয়। জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার চূড়ান্ত বিজয় লাভের পর আজারবাইজানের খোই নামক স্থানে অবস্থানকালে তিনি সংবাদ পান যে, ডায়োজিনিস রোমানাস সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়ার সাহায্যে বধ্যভূমি থেকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বাগদাদের ধ্বংস এবং সমগ্র পশ্চিম এশিয়া জয়ের পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে রোমক সম্রাট প্রায় দু'লাখের ও অধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এটা ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। রোমকরা যখন অগ্রসর হচ্ছিল, তুর্কি বাহিনী তখন কৌশলগত পশ্চাৎপসরণ করে উপনীত হয় ইরজুরাম ও ভ্যানহ্রদের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত বিখ্যাত মানজেকার্দ দুর্গে। এখানে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই সংঘটিত হয়। সংখ্যাধিক হলেও রোমক বাহিনী তুর্কি বাহিনীর শৌর্যবীর্যের নিকট পরাভূত হয়। বহুদিন পর মানজেকার্দ রণাঙ্গনে নতুন করে এরূপ একটি বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়। এ যুদ্ধে রোমক সম্রাট সপরিবারে শত্রু হস্তে বন্দি হন। তাঁকে সুলতান শিবিরে আনয়ন করা হয়। শত্রুর পদমর্যাদা অনুসারে পরাজিত সম্রাটের সাথে আলাপ আরসালিন যথাযোগ্য সৌজন্যমূলক আরচণ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রোমক সম্রাট আলপ আরসালানের পুত্রদের সাথে তাঁর কন্যাদের বিবাহ দিতে এবং সকল তুর্কি রাজ বন্দিদের প্রত্যার্পণ করতে; মুক্তিপণ হিসেবে দশ লক্ষ ও বার্ষিক রাজস্ব, হিসেবে তিন লক্ষ ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিতে রাজি হন। রোমক সম্রাট এবং সকল রাজবন্দিকে মুক্ত করা হয়। স্বদেশের উদ্দেশ্যে তারা সুলতান শিবির ত্যাগ করলে তাদেরকে সুলতানের সুসজ্জিত বাহিনীর প্রহরায় বিদায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। পথিমধ্যে রোমক সম্রাট জানতে পারেন যে, তিনি পদচ্যুত হয়েছেন। রোমক সম্রাটকে তাঁর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আলপ আরসালান তাঁকে সাহায্য করতে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুলতানের সাহায্য পৌঁছনোর পূর্বে রোমকরা তাদের পদচ্যুত সম্রাটকে হত্যা করে।[২৩] ইসলামের ইতিহাসে মানজকার্দ কেবল সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ ছিল না; এ যুদ্ধ গভীর তাৎপর্য বহন করে। এতদঞ্চল হতে বাইজানটাইন প্রভুত্ব বিলোপের সূচনা হয়; এশিয়া মাইনরের তুর্কীকরণ প্রক্রিয়ার পটভূমি রচিত হয়। অচিরে তুর্কিদের স্থায়ী আবাস ভূমি হিসেবে তুরস্কের জন্ম হয়। মানজকার্দ যুদ্ধজয়ের পর সমগ্র অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ

করা হয় আরসালান পিতৃব্য কতলামিশের পুত্র সুলাইমানের উপর। সুযোগ্য বিচক্ষণ এবং দক্ষ শাসনকর্তা সুলাইমান তার রাজ্য সীমান উত্তরে হেলেস্পন্ট এবং পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন; বাইজানটাইন শাসকদের নিকট হতে কর আদায় করেন। বুসনিয়ার নাইসিয়ায় তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রুসেড যুদ্ধে এ রাজধানীর পতন ঘটলে ১০৮৪ সালে কুনিয়া বা আইকোনিয়ামে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। মোঙ্গল কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত এশিয়া মাইনরে সুলাইমানের বংশধরেরা রাজত্ব করেন। সাধারণভাবে এই সামন্ত রাজ্য রোমের সেলজুক রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। মরমি সাধক সুফি কবি জালালুদ্দীন রুমি এখানেই তাঁর মসনভী কাব্য রচনা করেন।[২৪] ইবনুল আসিরের অনুসরণ করে আমীর আলী বলেন যে, আলপ আরসালান ছিলেন উদার প্রকৃতির, মহানুভব, দয়ালু, সাহসী নৃপতি। তুর্কি জাতিসত্তার বিকাশ সাধনে নয়া উপনিবেশ গঠনের পথিকৃত ছিলেন আলপ আরসালাম।

১১.৫ মালিক শাহ (১০৭৩-১০৯২ খ্রি.) : কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থা

আলপ আরসালানের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আবুল ফাতাহ মালিক শাহ সালজুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার শাসনকালে সালজুক ক্ষমতা গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়।[২৫] তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং সালজুকি সাম্রাজ্যের ঐক্য-সংহতি এবং সম্প্রসারণবাদী নীতি সফলভাবে অব্যাহত রাখেন। পূর্বপুরুষের রণনীতি ও রণকৌশল সফল করার জন্য পিতার সুযোগ্য মন্ত্রী নিজামুলমুলককে স্বপদে বহাল রাখেন এবং সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক উন্নয়নের সকল দায়িত্ব উজিরের উপর ন্যস্ত করেন।

মধ্যযুগে সামন্ত ব্যবস্থাপনায় যুগপৎ নিহিত থাকে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতা ঃ ক. সকল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া; খ. বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারা। মালিক শাহের রাজত্বকালে ইতিহাসের নীতি-বিধানে (Low of motion in history) এর কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে অনেক স্থানে বিশৃঙ্খলা ও গোলোযোগ দেখা দেয়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অন্যতম ছিলেন চাগ্রি বেগের পুত্র কারা আরসালান যিনি কিরমান বিজয়ের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, কিন্তু আলপ আরসালান তাকে দমন করেন। মালিক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করার পর উক্ত কারা আরসালান তার উত্তরাধিকার চ্যালেঞ্জ করে বিদ্রোহ করেন। মালিক শাহ দ্রুত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন এবং হামদানের নিকট এক যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে কারারুদ্ধ করেন। ১০৭৪ সালে সম্ভবত তাকে হত্যা করা হয়। তিনি কিরমান রাজধানী বাদরিসার জয় করেন। যা হোক শেষ অবধি কারবুদ কারা আর সালানের বংশধররা উত্তরাধিকার সূত্রে কিরমানের শাসন কাজ পরিচালনা করেন। ইতিহাসে এটা কিরমান সেলজুক বংশ বলে পরিচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর ভ্রাতার সাথে যুদ্ধ চলাকালে তুস নগরে ইমাম আলী রেজার সমাধিতে প্রার্থনা করার পর তাঁর উজির নিজামুলমুলকের নিকট মালিক শাহ্ জানতে চেয়েছিলেন আল্লার দরবারে তিনি কি প্রার্থনা করলেন? উজির বলেন, তাঁর প্রার্থনা ছিল এই যে, যেহেতু মালিক শাহের শাসন জনগণের জন্য মঙ্গল জনক, তাই আল্লার নিকট মালিক শাহের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। মালিক শাহ উজিরকে বলেন যে, তাঁর প্রার্থনা ছিল এই যে, তার ভ্রাতার শাসন যদি জনগণের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক হয়, তবে আল্লাহ তাঁকেই সাফল্য দান করুন। ইবেন খালিকানের উদ্ধৃতি দিয়ে আমীর আলী এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। ঘটনাটি যদি সত্যি হয়, তাহলে এতে মালিক শহরে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। আমীর আলী মন্তব্য করেন যে, অতি অল্প রাষ্ট্র প্রধান বিজ্ঞ, মহান ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে মালিক শাহের মত খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন।[২৬]

মূল তুর্কি ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী যারা সমগ্র মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে দমন করে মালিক শাহ তাদের মাতৃভূমির ঐক্য সাধন প্রক্রিয়া শুরু করেন। বোখারা, সমরকন্দ খাওয়ারিজম, কিরখিজিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে তার্কিস্তানের সীমানা চীন সীমান্ত কাশগড় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়।[২৭]

আলপ আরসালান পশ্চিম এশিয়ার ঐক্য সাধন প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। সিরিয়ার মারওয়ানী নসর আলপ আরসালানের প্রতি ১০৭১ সালে বশ্যতা স্বীকার করেন। পরে জনৈক তুর্কি সেনাধ্যক্ষ ইবনে আওয়াক প্যালেস্টাইন আক্রমণ করে, আসকালান ব্যতীত বাসলা, জেরুজালেমও জুদিয়া দখল করে। আসকালান তখনো ফাতেমীদের দখলে ছিল। সে সময় আসকালান দখল করতে ব্যর্থ হয়ে দামাস্কাস জয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়, তবে ১০৭৬ সালের পূর্বে তা দখল করতে পারেন নি। তিনি মিশর জয়ে ব্যর্থ হন। সিরিয়ায় তার অবস্থান নড়বড়ে হলে তুতুশের সাহায্য কামনা করা হয়। তুতুশ সিরিয় সেলজুক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত মালিক শাহের সময় সেলজুক সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভবন ও সম্প্রসারণ নীতি অনেকাংশে সফল হয় এবং তার সময় সেলজুকী সংযুক্ত রাষ্ট্র পূর্বে মহাচীনের পশ্চিম সীমান্ত শহর কাশগড় হতে ভূমধ্যসাগর উপকূল এবং উত্তরে জর্জিয়া হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তার সময় ঐ বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান ছিল।[২৮]

এ কারণেই সম্ভবত প্রফেসর হিট্টি মনে করেন যে, মালিক শাহ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসকের চেয়ে ও অধিক কিছু ছিলেন; Malik Shah was more than a ruler of an extensive empire.[২৯] আমীর আলী বলেন যে, মালিক শাহ্ তার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। বণিক, পথিক, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাণিজ্য ও তীর্থ পাথে বিশ্রামাগার ও প্রহরাগৃহ নির্মাণ করেন। ইবনে খালিকানের বরাত দিয়ে হিট্টি বলেন যে, এক বা দু

ব্যক্তি উজবেকিস্তান হতে সিরিয়া পর্যন্ত বিনা প্রহরায় পরিভ্রমণ করতে পারত।[৩০] আমীর আলী আরো বলেন যে, হাসপাতাল. মসজিদ ও অট্টালিকা দিয়ে এশিয়ার নগরগুলো তিনি সুসজ্জিত করেন। ভূমির উৎপাদিতকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন।[৩১] মালিক শাহী সরকারি উদ্যোগের সাথে তাঁর রণনীতি ও রণকৌশল ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মোতাওয়াক্কিলের সময় হতে ইসলামি প্রভাববলয়ে এশীয় অঞ্চলসমূহে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছিল তা একটি পরিণতি লাভ করে সেলজুক যুগে এবং এর প্রধান রূপকার ছিলেন স্বয়ং মালিক শাহ। তিনি মধ্যযুগে এশীয় জায়গীর প্রথার সার্বজনীন রূপ দান করেন। ইবনে খালিক্কানের বিবরণ হতে তার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। এর কারণ পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, সেলজুকদের উত্থান ঘটে পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, ইরান ও আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে। তুর্কি জাতিসত্তার বিস্ফোরণ এবং তাদের বিকাশমান সমরতন্ত্র হতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য সাম্রাজ্যের একীভবন এবং সম্প্রসারণ নীতি যথেষ্ট ছিল না; বরং তাদের গৃহীত কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে আরো জোরদার করার জন্য কৃষি উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অব্যাহত রাখার প্রতিও মনোযোগ দিতে হয় মালিক শাহকে। এ কারণেই তিনি দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতেন এবং একই সাথে কৃষি পণ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাল-খনন বা পুনঃখনন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর দেহকান ও সামন্ত প্রভুদের উপর চাপ প্রয়োগ করতেন। এ কাজের সাফল্যের জন্য যাযাবর যারা সরকারি অত্যাচার এড়ানোর জন্য রাহাজানি পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, তারা পুনরায় কৃষিকর্মে ও পশু পালনের মনোযোগ দেয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অব্যাহত রাখার জন্য বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা বিধান করেন। এ সব উদ্যোগের ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি দেখা দেয়। এ কারণে তাঁকে তার পূর্বসূরি বুওয়াইহী আজদুদ্দৌলার মত সমাজ-সচেতন জনকল্যাণকামী স্বৈরাচারী বলা চলে। বস্তুত সেলজুক রাষ্ট্রে দৃশ্যত রাষ্ট্রসঙ্ঘ কাঠামো বজায় থাকলেও মূল শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল।

কৃষি অর্থনীতিতে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির জন্য যেমন কৃষিপণ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় সেই সাথে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা এবং তার জন্য সঠিক সময় নির্ধারণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বীর সৈনিক সুলতান মালিক শাহ সম্ভবত তার পিতার মতই নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতা এবং আর্থ-সামাজিক সচেতনতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর বর্ষপঞ্জি সংস্কার কাজের মধ্যে। ১০৭৪-৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইসপাহান ও নিশাপুরে বিজ্ঞান মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি অর্থনীতি নির্ভর একটি রাজ্যে ফসলি মৌসুম এবং রাজস্ব আদায়ের সাথে সময়ের সামঞ্জস্য একান্ত প্রয়োজন। রাজস্ব আদায়ের জন্য সময় নির্ধারণে তৎকালীন প্রচলিত চন্দ্রমাস আদৌ উপযুক্ত ছিল না বিধায় তৎকালীন বিখ্যাত

জ্যোতির্বিদ এবং খ্যাতনামা ফারসি কবি ওমর খাইয়ামের নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিকদের একটি কমিটির উপর প্রচলিত বর্ষপঞ্জীর সংস্কার গঠনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তৎকালীন প্রচলিত বর্ষ গণনায় নব বর্ষের দিন সূর্যের মীন রাশির মধ্যস্থলে উপনীত হওয়ার সময়ের পরিবর্তে মেষ রাশির প্রথম বিন্দুতে সূর্য প্রবেশ করার সময়কে নববর্ষের দিন বলে ধার্য করেন। বস্তুত প্রচলিত গণনা পদ্ধতির ভ্রান্তি সংশোধন করে চন্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌর মাস অনুযায়ী বর্ষ গণনা প্রথার প্রবর্তন করা হয়। এই সংশোধিত বর্ষপঞ্জীকে সুলতানের নামানুসারে জালালী বর্ষপঞ্জী বলা হয়। এই বর্ষপঞ্জীর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক গিবন বলেন যে, জুলীয়গণনা সংশোধিত হয়ে জালালী বর্ষপঞ্জী পরবর্তী গ্রেগরি গণনার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ১৫৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রেগরী বর্ষপঞ্জী গণনা পদ্ধতিতে ৩৩৩০ বছরে একদিনের হেরফের হয়, কিন্তু জালালী সাল গণনা পদ্ধতিতে ৫০০০ বছরে একদিনের বিভ্রান্তি দেখা দেয়।[৩২] বস্তুত একাদশ শতকের জালালী বর্ষপঞ্জ তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষতার প্রমাণ মেলে।

প্রফেসর হিট্টি মালিক শাহের জনহিতকর কাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাগদাদ শহরের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার প্রচেষ্টায় তিনি শহরের গণ-গোছলখানার দূষিত পানি তাইগ্রিস হতে অন্যত্র প্রবাহিত করার সকল উদ্যোগ নিয়েছিলেন The sanitary measures introduced in to Bagdad at this lime and credited by Ibnul Athir to the Caliph muqtadir were more likely initiated by this Saljuq Sultan (Malikshl), These measurs induced the diversion of the dirty water of the public bath from the tigris into specal cess pools and allotment of special places for clearing and curing fish.[৩৩] মালিক শাহের শাসননীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। মালিক শাহের সাথে রোমক সম্রাট আলেকিসয়াস কমনিনাসের কন্যার সাথে বৈবাহিক সূত্র গৃহীত হওয়ার সব বন্দোবস্ত হয়; কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে তা সম্পাদিত হতে পারে নি। এ কাজ সুসম্পন্ন হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলের জন্য মঙ্গলজনক হতে পারত বলে আশা করা হচ্ছিল।

একুশ বছর রাজত্বের পর মালিক শাহ ১০৯২ সালের ১৮ নভেম্বর প্রয়াত হন।[৩৪] মালিক শাহের রাজত্বকাল সম্পর্কে আমীর আলীর মন্তব্য দিয়ে ইতি টানা যায়। তিনি বলেন: আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য এবং জনসাধারণের সমৃদ্ধিতে মালিক শাহের রাজত্বকাল ছিল রোমক বা আরব শাসনের শ্রেষ্ঠ যুগের সমকক্ষ।[৩৫]

মালিক শাহের মৃত্যুর সাথে সাথে সেলজুক সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগের অবসান হয়; আরম্ভ হয় আর এক দীর্ঘ অবক্ষয়ের যুগ। ঐ অবক্ষয় যুগ সম্পর্কে পরে আলোচনা হবে।

১০.৬ উজির নিজামুলমুলক তুসী (১০১৮-১০৯২ খ্রি.) ঃ মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র দর্শন রচয়িতা

অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে যে, আব্বাসী খলিফাগণ ইরানী উজারাত প্রতিষ্ঠানটির প্রবর্তন করেন; কিন্তু বারমেকি পরিবারের যুগ ব্যতীত আব্বাসী যুগে এ প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না। কেননা আব্বাসী খলিফাদের অনেকেই উজির ব্যতীতই চলতেন। বুওয়াইহী এবং সেলজুকি সুলতানগণ এ প্রতিষ্ঠানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। অবশ্যি তৎকালীন ঐতিহাসিক কারণে প্রতিষ্ঠানটির উচ্চতর পর্যায়ে উত্তোরণ ঘটে নি। এ প্রসঙ্গটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। সেলজুকদের গৌরবময় যুগের স্বদেশ বা বিদেশ নীতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করেন আলপ আরসালান ও মালিক শাহের উজির নিজামুলমুলক তুসী। হিট্টি তাঁকে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের অলঙ্কার বলে অভিহিত করেন। The guiding hand throught the adminis tration of Alp Arsalan and Malik Shah was that of illustrious vizir Nizamul Mulk (The orgamsation of the kingdom), One of the ornaments of political history of Islam. If we are to believe Ibn Khaldun, For the twenty years covering the reign of malik shah Nizamul Mulk had all the power concentrated in his hand.[৩৬] তিনি কেবল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করে নি; তিনি ছিলেন মধ্যযুগের নয়া আরব রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রধান প্রাণ পুরুষ। তাঁর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়; তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা আমাদের প্রতিপাদ্য।

সেলজুক সুলতান আলপ আরসালান তাঁকে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করে নিজমুলমুলক উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ইতিহাসে তিনি এই নামেই পরিচিত। তার আসল নাম ছিল আবু আলী হাসান। তার পিতা আবুল হাসান আলী ছিলেন তুস নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত রাজকান গ্রামের দেহকান (তালুকদার ভূস্বামী)। গজনি সরকারের খোরাসান প্রদেশের প্রশাসক তাকে ঐ অঞ্চলের কর আদায়কারীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। আবু আলী হাসান পিতার তালুকে ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক পরিবেশে ফারসি, আরবি ভাষা, ব্যাকরণ অলঙ্কার শাস্ত্র, তর্ক বিদ্যা, জ্যামিতি, হাদিস, তফসির এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি ব্যবহারিক বিদ্যা বা ফেকাহ্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করবেন এবং এ জন্য তিনি বিখ্যাত আইন বিশারদ আব্দুস সামাদ ফান্দুরাজির নিকট ফিকাহ্ পাঠ গ্রহণ করেন। কথিত আছে নিশাপুরে ইমাম মুওয়াফফাকের নিকট অধ্যয়নকালে সহপাঠী হিসাবে পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও কবি ওমর খৈয়াম এবং বাতেনী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হাসান বিন সাব্বাহকে। অধ্যয়ন সমাপন করে চাকুরীর সন্ধানে বোখারা, মার্ভ ও বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করেন। এসব স্থানে কোনো চাকুরী না পেয়ে অবশেষে তিনি গজনিতে গমন করেন। এখানে প্রশাসনিক বিভাগে নিযুক্তি লাভ করেন। এখানেই

প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁর হাতে খড়ি হয়। ১০৫২ সালে গাজি সুলতান আব্দুর রশীদ নিহত হলে গজনি ত্যাগ করে বলখে গমন করেন এবং সেলজুক প্রশাসক আলী বিন শাদানের অধীনে একটি চাকরী গ্রহণ করেন। বলখের গভর্নরের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে রাজধানী মার্ভ নগরে গমন করেন। খোরাসানের শাসনকর্তা চাগ্রি বেগ তাঁকে তাঁর পুত্র আলপ আরসালানের মুশির (উপদেষ্টা) ও সচিব পদে নিয়োগ করেন। আলপ আরসালান সিংহাসনে আরোহণ করলে আমিরুলমুলক কুন্দুরীর সাথে যুগ্ম মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। কুন্দুরী নিহত হলে তিনি পূর্ণ মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। এভাবে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তার রাজনৈতিক জীবন।[৩৭]

দক্ষ প্রশাসক নিজামুলমুলক মধ্যযুগের রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজনীতি শাস্ত্রের মৌলিক তাত্ত্বিক ভিত্তি রচয়িতা হিসেবে ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেন। ফারসি ভাষায় রচিত তার দুটি গ্রন্থ : ক. সিয়াসত নামা, খ. দস্তুরে উজারা হতে তাঁর যুগের দুটি প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ১. রাজতন্ত্র , ২. মন্ত্রণা দফতর সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। প্রথম পুস্তক রচনা প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, সেলজুক সুলতান মালিক শাহ তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদেরকে তাঁর সাম্রাজ্যের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এমন কতকগুলো আচরণবিধি (Princples of conduct) রচনা করার নির্দেশ দান করেন যা তার পূর্বসূরিরা অনুসরণ করেছিলেন এবং তার উত্তরসূরিদের জন্য হবে অনুকরণীয়।[৩৮] মালিক শাহ নিজামুলমুলকের সিয়াসত নামাটি গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুস্তকটি দৈনন্দিন প্রশাসনিক উন্নয়নের প্রায়োগিক নির্দেশনামূলক কোনো পুস্তক ছিল না; বরং পুস্তকটি ছিল তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত রাজনৈতিক তাত্ত্বিক পুস্তক। এ জন্য সম্ভবত তিনি তাঁর পাণ্ডিত্ব জাহির করতে অথবা নিছক রাজ নির্দেশে তিনি পুস্তকটি রচনা করেন নি। এটা মূলত তাঁর বহু দিনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা ভাবনার ফলশ্রুতি। রাজাদেশ নিমিত্ত মাত্র। তার তুর্কি ফারসি ও আরব ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা এবং তৎকালীন ইসলামি বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর বাস্তব জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, উদীয়মান তুর্কি জাতিসত্তার সম্ভাবনা এবং ইসলামি বিশ্বের ভাবী নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী রাজনৈতিক তত্ত্ব বিনির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ থেকে সিয়াসতনামা লিখিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ ওয়াসিয়া তাঁর জীবন সায়াহ্নে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফখরুলমুলকের জন্য লেখেন। তিনি ছিলেন সুলতান বাবকিয়ারুকের মন্ত্রী। এতে একজন মন্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী ছিল—তাই এটাকে মন্ত্রীত্বের তাত্ত্বিক পুস্তক বললে অত্যুক্তি হয় না।

মাওয়ার্দী ও তুসী

রাজনৈতিক বিষয়ক প্রস্তাবনা নির্ধারণে অথবা দৃষ্টিভঙ্গিতে বা রচনাশৈলীতে নিজামুলমুলকের সাথে তাঁর সমসাময়িক বা পূর্বসূরিদের পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। সীমিত অর্থে হলেও নিজামুলমুলক তার রচনাশৈলীতে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে

প্রয়াস পেয়েছিলেন। আবুল হাসান আল মাওয়ার্দী ব্যতীত তার কোনো পূর্বসূরি এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি।

নিজামুলমুলক তুসীর ফার্সি ভাষায় লিখিত সিয়াসত নামা রচনার ৪০ বছর পূর্বে আবুল হাসান আল মাওয়ার্দী তাঁর বিখ্যাত পুস্তক আস সুলতানুল আহকামীয়া আরবি ভাষায় রচনা করেন। সময়ের নিরিখে পুস্তকদ্বয়ের দূরত্ব এমন বেশি নয়; কিন্তু পুস্তকদ্বয়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। পুস্তকদ্বয়ের প্রতিপাদ্য নির্বাচনে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল মৌলিক পার্থক্য। আল মাওয়ার্দি ছিলেন খলিফার অধীনস্থ কাজি বা বিচারক, প্রধান বিচারপতি নন তবে নামী আইনবেত্তা। ব্যবহারিক বিদ্যায় পাণ্ডিত্ব থাকলেও তুসী ছিলেন দক্ষ প্রশাসনিক মন্ত্রী। সুলতানুল আহকামিয়া রচিত হয় বুওয়াইহীদের প্রচণ্ড অবক্ষয়কালে; সিয়াসতনামা লিখিত হয় সেলজুকদের উন্নতির মধ্যাহ্নকালে। আল মাওয়ার্দির সময় খলিফা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হতে বঞ্চিত হয়ে কেবল তাঁর ধর্মীয় অধিকারটুকু রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন এবং সমগ্র সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর তাঁর আধ্যাত্মিক প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তৎপর ছিলেন। কেননা এ ক্ষেত্রেও তিনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হচ্ছিলেন। এরূপ রূঢ় বাস্তবতা এড়িয়ে আল মাওয়ার্দি আদর্শ খেলাফতের তত্ত্ব তাঁর সুলতানুল আহকামিয়ায় সূত্রপাত করেন। স্বাভাবিকভাবে এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে খলিফার পদ, তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব, তার নির্বাচন, যোগ্যতা, বিভিন্ন ধরনের উজিরদের মধ্যকার ক্ষমতার পার্থক্য, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন জিজিয়া, জাকাত, ফাই ইত্যাদি। আল মাওয়ার্দি বা অন্যান্য আইনবেত্তারা অবশ্য সুলতান, আমির বা উজির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাদের মতে তত্ত্বগতভাবে বুওয়াইহী সুলতানরা ছিলেন মূলত আমির বিন ইস্তালা বা জবরদখলকারী আমির তবে খলিফা তাদেরকে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন মাত্র। তারা তাই খলিফার ডেপুটি।[৩৭] ঘটনা হল, খেলাফত সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিল বাস্তব বিবর্জিত এবং খলিফা ও সুলতানের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ে ছিল বৈপরিত্য। মাওয়ার্দী কেবল খলিফার প্রিয়পাত্র ছিলেন তাই নয়, তিনি বুওয়াইহী সুলতানদেরও আনুকূল্য লাভ করেন। দুকূল রক্ষার জন্যই সম্ভবত তিনি আদর্শ খেলাফত তত্ত্ব নির্মাণ করেন; যার অস্তিত্ব শুধু তত্ত্বে ছিল-বাস্তবে নয়। নিজামুলমুলকের পুস্তকে উল্লিখিত প্রতিপাদ্য ছিল একেবারে অনুপস্থিত। যা হোক অন্যান্য ব্যবহারিকবিদদের তুলনায় আল মাওয়ার্দির কৃতিত্ব বা অভিনবত্ব নিহিত ছিল তার খেলাফত তত্ত্ব নির্মাণের পদ্ধতি ক্ষেত্রে। আইনবেত্তা হয়েও তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যতই স্থূল হোক তিনি অনেকাংশে ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে মীমাংসায় পৌছতে চেয়েছেন। এখানেই তার অভিনবত্বের পরিচয় মেলে। তিনি রাজনৈতিক দর্শন আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে পদ্ধতিগত ব্যাপারে নিজামুলমুলকের সাথে একটু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

নিজামুলমুলক তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব নির্মাণে প্রধানত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি কেবল অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন ছিলেন তাই নয় বরং তিনি সমকালীন ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থার প্রবণতা সচেতন বোদ্ধা পাঠক ছিলেন বলে তিনি তার বিচারধারায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও অবলম্বন করেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি হয়ে ওঠেন একজন দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। বস্তুত একজন ব্যবহারজীবী এবং একজন প্রশাসকের সমস্যা এক নয়।

যুগ প্রবণতা

আমাদের আলোচ্য কালটি আব্বাসী খেলাফত তথা আরব নেতৃত্বের পতন বা অবক্ষয়কাল বলে চিহ্নিত হলেও প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বের জন্য কোনোক্রমে অবক্ষয়কাল নয় বলেই এ সময় বুওয়াইহী-সেলজুক স্বর্ণযুগের সাক্ষাৎ মেলে। বস্তুত সময়টি ছিল একটি ক্রান্তিকাল-যুগসন্ধিক্ষণ; পুরনো নেতৃত্বের অন্তিমকাল আর নয়া নেতৃত্বের আগমনকালের উষালগ্ন—তাই নয়া সমস্যা এবং এটাই ঐতিহাসিক বিকাশধর্ম। নিঃসন্দেহে আব্বাসী স্বর্ণযুগের প্রাচ্য জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে ইরানি জাতিসত্তা তার স্বকীয় পরিচিতির সন্ধান পায়—সামানী, গজনি ও বুওয়াইহী যুগে যার বহিঃপ্রকাশ ছিল দাকিকী, বেরুনী ও ফেরদৌসের শাহনামায় এবং ফারসি ভাষার পুনরুত্থানে। গজনি ও বুওয়াইহীরা একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় তবে ভিন্ন পথ ধরে। গজনি-সুন্নি ইসলামের অনুগামী হিসেবে খলিফাকে সুন্নিদের ধর্মীয় নেতার মর্যাদায় রেখে আপনাকে ইহলৌকিক বা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বুওয়াইহীরা বাগদাদ দখল করে কৌশলগতভাবে সুন্নি মুসলিমদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব হতে অপসারিত না করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদেরকে শাহানশাহরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিমধ্যে তুর্কি জাতিসত্তা পারস্য জাতিসত্তার গহ্বরে প্রথমত বিচ্ছিন্নভাবে পরে সমষ্টিগতভাবে প্রবেশ করে তারা দ্রুত তুরানি স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ করে। তারা ইরানি আরব সংস্কৃতির সাথে তুরানি সংস্কৃতি সচেতন হয়। তুরানি মুখপাত্র ছিল সেলজুকরা। গোটা ইসলামি বিশ্বকে পুনরায় একীভূত করার গৌরব অর্জন করলেও তুরানি জাতিসত্তা হতে গোত্রতন্ত্রের সংকীর্ণতার প্রভাব আদৌ নিশ্চিহ্ন হয় নি। তারাও তাই বুওয়াইহীদের মতই এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুমাত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সেলজুকি রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করে। মহান সেলজুক সুলতানের আমলে তুসীর মন্ত্রীত্বকালে বিচ্ছিন্নতা, প্রাসাদ চক্রান্ত এবং মূল্যবোধের অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে অনারব নেতৃত্বে একটি স্থিতিশীল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে রাষ্ট্র দর্শনের প্রয়োজন ছিল প্রতিভাধর তুসী সেরূপ একটি নয়া রাজনৈতিক দর্শন সৃষ্টি করেন। সিয়াসত নামার পটভূমি প্রসঙ্গে এম.এম. শরীফের মন্তব্য নিম্নরূপ: It was an age of change and fusion of social and political ideas and institution.....the rise of Persian ele-

ment in political power in the early period of the Abbasids was followed by a gradual revival of persian institution under the patranage of the Samanids, the Ghaznavid and Saljuqs there institution in there turn togelher with there theoretical foundaton, come to be assimilated by Muslim thought.[৪০]

লেখক এখানে সেলজুকদের পূর্বসূরি এবং গজনীদের উত্তরসূরি দায়লামি ইরানি বুওয়াইহীদের উল্লেখ করেন নি এবং উল্লেখ না করার কোনো কারণও দর্শান নি; অথচ এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন যুগ, সেলজুকদের উত্থানের পটভূমি এবং তুসীর রাষ্ট্র দর্শন রচনার একটি বড় গ্রন্থী। আমাদের আলোচ্যকাল সম্পর্কে রাহুল সংকৃতায়ন তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেন যে, ফারাবীর যুগ অতিক্রম করে এখন আমরা ফেরদৌসী (৯৪০-১০২০ খ্রি.) আবু রায়হান আল বেরুনী (৯৭৩-১০৪০ খ্রি.) মাহমুদ গজনির (মৃ. ১০৩০ খ্রি.) সময়ে উপস্থিত হচ্ছি। এ সময় শাসনের রজ্জু নাম নেহন্দী আরবের হাত থেকে অনারব মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে চলে গিয়েছিল, অথচ তারা কবিলাসাহী সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব দ্বারা প্রভাবিত এমন কি তাদের যুগের তথাকথিত নিম্নশ্রেণী থেকে উত্থিত লোকশক্তিকে নতুন শাসনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের অপূর্ণ বিজয়কে ভিন্নভাবে পূর্ণতা দান করতে চেয়েছিল।[৪১] এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে, ইসলামের সূচনা থেকে তার উপর আরব কবিলাশাহীর স্পষ্ট ছাপ ছিল; দামাস্কাস খেলাফত তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়; বাগদাদ খলিফা তাকে কবরস্থ করে।[৪২] এ সময় উপরে বর্ণিত রাজনৈতিক অবস্থার রূপান্তরের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক রূপান্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তুসীর রাষ্ট্রদর্শন নির্মাণের বেশ পূর্বে বিখ্যাত দার্শনিক আল ফারাবী নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রীতত্ত্ব প্রদান করেন। তিনি মনে করতেন যে, একজন আদর্শবাদী দার্শনিক রাজার শাসনাধীন সমাজ ব্যবস্থা কাম্য। মানুষ তার জীবন চর্চ্চায় পরস্পর নির্ভরশীল। ভৌগোলিক পটভূমি অনুযায়ী কেউ শক্তিশালী, অধিক কষ্টসহিষ্ণু, আবার কেউ দুর্বল। অতএব বিভিন্ন ধরনের মানুষের একজন অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজার অধীনতা স্বীকার করা আবশ্যক। রাজ্যের ভালো-মন্দের দায়িত্ব রাজার উপর ন্যস্ত। রাজা যদি কল্যাণ ও শুভ সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও অর্বাচীন হন, তার নিজের অমঙ্গল হয়। দ্বিতীয়ত ফেরদৌসী তাঁর মহাকাব্য শাহনামায় পারস্যের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলো ঝলমল; ন্যায়পরায়ণ অথচ নিরঙ্কুশ শক্তিশালী আদর্শ রাজার মহিমাভাস্বর হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত বুওয়াইহী শাহানশাহ আজদ্দৌলার কোষাধ্যক্ষ আল মিসকাওয়াই তার নীতিশাস্ত্রের বিখ্যাত পুস্তক তাহজিবুল আখলাক উপহার দিয়েছিলেন। তিনি প্লেটো, এ্যারিস্টটলের গ্রন্থের সাথে ইসলাম শাস্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন। তিনি মনে করেন যে, অল্পসংখ্যক ব্যক্তি স্বভাবত ভাল অথবা মন্দ-বাকি সকলেই প্রথমে ভাল বা খারাপ সামাজিক পরিবেশে ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে তারা ভাল বা মন্দ হয়। মানুষ তখনই সুখী এবং কল্যাণময় হয়, যখন তার আচরণ হয়

মানবিক। সমাজের সব মানুষ এক রকম নয়, কাজেই শুভ ও আনন্দের অনুভূতিও এক একজনের এক এক রকম। যে স্বভাবত ভালও নয় মন্দও নয়, এমন কোনো মানুষকে একাকী রেখে দিলে তার শুভ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অতএব মানুষের যুথবদ্ধ সমাজে বাস করা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সমস্ত রকম শুভাচরণ তথা মানব জাতির প্রতি প্রেম। এ ছাড়া কোনো সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত মানুষের সঙ্গে থেকেই মানুষ সেই সাহচার্য দ্বারা নিজের অন্তরের অভাব পূর্ণ করতে পারে।[৪৩] আব্বাসী অবক্ষয় কালে প্রাচ্যের জাতিসত্তার মুসলিম সম্প্রদায়ের এরূপ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটে নিজামুলমুলকের রাষ্ট্রদর্শন বিবেচ্য।

দক্ষ প্রশাসক নিজামুলমুলক তুসী রূঢ় বাস্তবতাকে না এড়িয়ে রবং তার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁর সময়ের এক শতাব্দী ধরে খেলাফতের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরে যে অনারব অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বে এক স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল- এই রাজনৈতিক বাস্তবতাই ছিল তুসির অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মর্মবস্তু। উদীয়মান ব্যবস্থার সমর্থনে তিনি তার স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রদর্শন নির্মাণ করেন। তুসীর এই স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রকে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে একটি বিশেষ স্তর বা পর্যায় বলে চিহ্নিত করেন ইসলামি চিন্তাশীল পণ্ডিতদের অনেকেই। এস. এম. শরীফ বলেন ঃ His (Tusis) Political theory represents a particuler phase of development of Muslim politys which was chararacterised by kingship As sucht is an essential part of his contribution to Muslim political thougth[৪৪] লক্ষ্য করার বিষয় সমগ্র সিয়াসত নামায় কোথাও তিনি মুসলিম প্রধান হিসেবে খলিফা শব্দের ব্যবহার করেন নি; আল মাওযার্দির মত সেলজুক রাজাদের সুলতান বলেও চিত্রিত করতে চান নি; অথবা তাদেরকে আমির মুসতাউলী (জাব দখলকারী শাসনকর্তা) বলে চিহ্নিত করার প্রশ্নই ছিল না তার চিন্তাধারায়। পরবর্তীকালে ভারতীয় বা উসমানী সাম্রাজ্যে সুলতান পদটি জাহানদার-নৃপতি (King) অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন হলেও তুসীর সময় সুলতান ও আমির পদদ্বয় তৎকালীন ব্যবহারজীবী ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদরা সাংবিধানিক পদ হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাঁরা প্রকৃত শাসকদেরকে সুলতান বললেও মূলত আমির বা প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহার করতেন এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের উপর খলিফার আইনগত প্রাধান্য প্রমাণ করা। ব্যবহারজীবীদের মতে সুলতান বা আমির বিল ইমতিলা এর সকল ক্ষমতার উৎস ছিল খলিফা; খলিফা স্বেচ্ছায় তাদের কর্তৃত্বকে বিধিসম্মত করতেন মাত্র। আমাদের আলোচ্য সময়ে খলিফা সর্বময় কর্তৃত্বের উৎস হিসেবে ভাবা হলেও বাস্তবে তার অস্তিত্ব ছিল না বরং নয়া শক্তির উদয় হচ্ছে বা হয়েছে এই ঐতিহাসিক প্রবণতাকে তারা আমল না দিয়ে বরং আদর্শ খলিফা ভিত্তির উপর তাদের চিন্তাধারা ও যুক্তি খাড়া করেন। অথচ ক্ষমতাবিহীন খলিফা এবং ক্ষমতাবান সুলতান পদদ্বয়ের ব্যবহারে অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতা ছিল—সে বিষয়টি

ব্যবহারজীবীরা পাশ কাটিয়ে গেছেন। তাদের অজ্ঞাতসারে হলেও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অনারব নেতৃত্বের হাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল-এটাই রাজনৈতিক বাস্তবতা। তুসী তার চিন্তাধারায় এরূপ অসামঞ্জস্যতা পরিহার করে বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

স্বৈরাচারী রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের উৎস

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। প্রশ্নটি হচ্ছে সেলজুক স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উৎস কি? সিয়াসতনামার প্রথম অধ্যায়ে এ প্রশ্নের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, যুগেযুগে মানব সমাজের মধ্য হতে সৃষ্টিকর্তা একজনকে নির্বাচন করেন এবং তাঁকে প্রশাসনিক দক্ষতা দান করেন। মানব সমাজের ইহলৌকিক জীবন সংগঠনের গুরুদায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হয়। তিনি প্রজাকূলের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বিধান করেন।[৪৫] সিয়াসতনামা হতে এটা স্পষ্ট হয় যে, তুসীর রাজতন্ত্রীতত্ত্ব ছিল মূলত স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার—সে কারণে তাঁর তত্ত্বের সপক্ষে কোনো যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন নি। বস্তুত প্রাচীনকালে রাষ্ট্র বা সমাজপতিরা নরবেশে নারায়ণ বলে দাবি করতেন; মধ্যযুগে ঐ ধারণাটি পরিশীলিত করে বলা হয় মানব সমাজের উপর শাসন কতৃত্বের অধিকার সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত-যা আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের ভাষা বলা হয় Divine Rights theory বা দেবদত্ত অধিকার তত্ত্ব। আধুনিক চিন্তাধারায় এরূপ তত্ত্বের যে দুর্বলতা ধরা পড়ে তুসীর রাজতন্ত্রী তত্ত্বেও তাই থাকা স্বাভাবিক। সমগ্র বিষয়টি ছিল তাঁর মৌল বিশ্বাসের প্রশ্ন, কোনো যুক্তিবাদী প্রস্তাবনা নয়। উল্লেখ্য যে, সুন্নি ব্যবহারবিদদের খেলাফত তত্ত্বের মৌল ধারণা: সমাজ কর্তৃক সমাজপতি নির্বাচন, গোত্রবাদী ধারণা হতে উদ্ভূত হলেও শিয়াদের অবতারবাদ হতে অনেক উর্ধ্বে। উল্লেখ্য যে, মনোনয়ন ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি জটিলতা দ্বারা কন্টকাকীর্ণ না হত এবং আরব কোরেশ গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করা হত বরং খেলাফতের মৌলভাব নির্বাচন পদ্ধতির ঐতিহাসিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত থাকত তাহলে নিঃসন্দেহে খেলাফত তত্ত্বটি রাজনৈতিক দর্শনের একটি সামাজিক প্রগতিশীল প্রস্তাবনা হতে পারতো। যা হোক তৎকালীন বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে তুসী স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রীতত্ত্ব গঠন করেন। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করে মানব সমাজে এরূপ নৃপতির উদ্দেশ্য ও দায়দায়িত্ব কি, তার উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। সুলতান বা রাজার প্রধান কাজ হল সমাজ হতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূরীভূত করে শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। নৃপতির সমগ্র প্রচেষ্টা পরিচালিত হবে এমন এক সুস্থ অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে মানুষ তার ন্যায় বিচারের ছত্রছায়ায় স্বস্তিতে বসবাস করতে পারে।[৪৬] তিনি আরো বলেন যে, মানুষ যদি সৃষ্টিকর্তার বিধান অমান্য করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তখন তাদের উপর আল্লার গাজব বর্ষিত হয়, রাজার কল্যাণধর্মিতা বিদায় নেয়; তদস্থলে উন্মুক্ত অসি দ্বারা রক্ত গঙ্গা প্রবাহিত হয়। পাপীরা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এ

অবস্থা চলতে থাকে। অবশেষে সৃষ্টিকর্তা যাকে চান তাকে সাফল্য ও জ্ঞান দান করেন; তিনি আল্লা প্রদত্ত যোগ্যতাবলে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন।[৪৭] তার এ বক্তব্য হতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়: প্রথমত রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পশ্চাতে আর্থ-সামাজিক বা বাস্তব অবস্থাকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং একটা রহস্যময় ভাববাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন; প্রজাদের পাপাচারে নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাত অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত আল্লার ইচ্ছায় এবং আল্লার দয়ায় যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হন এবং তিনি পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। নিজামুলমুলক যখন এসব কথা বলেন তখন তার সামনে ছিল সেলজুক বংশের সাফল্য; তারা তাদের যোগ্যতা দিয়েই সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কাজেই সেলজুকরা আল্লার মনোনীত। অতএব সেলজুকদের কর্তৃত্বের উৎস : ক. সৃষ্টিকর্তার মনোনয়ন, খ. আল্লা প্রদত্ত যোগ্যতা; গ. উত্তরাধিকার সূত্র।[৪৮]

নিজামুলমুলক নৃপতিদের বলতেন বাদশাহ। শব্দটি ইরানি ঐতিহ্যজাত। পারস্য সম্রাট নওশেরোয়াঁ তার সিংহাসন লাভ প্রসঙ্গে তার অমাত্যদের যা বলেছিলেন নিজামুলমুলক তা বিবৃত করেছেন তার সিয়াসতনামায়। তার বক্তব্যের সারাংশ এরূপ: প্রথমত তিনি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত শাসক; দ্বিতীয়ত তিনি সিংহাসন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত; তৃতীয়ত তিনি শক্তি প্রয়োগ করে সিংহাসন অর্জন করেন।[৪৯] তাঁর পরিবেশিত তথ্য হতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত ব্যাখ্যায় বিধিবাদী (legilist) অবস্থান গ্রহণ করেন। বাদশাহ তাঁর প্রজাদের নিকট হতে নিষ্ক্রিয়, নিঃশর্ত আনুগত্য এবং জনজীবন ও প্রশাসনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও চূড়ান্ত কর্তৃত্বের দাবিদার। তিনি যদি নিষ্ঠুর হন অথবা দেশকে বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেন-এমতাবস্থায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে কিনা-এ প্রশ্নটি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে পুনশ্চ বলেন যে, দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থা রাজার কারণে হয় না বরং তা হয় প্রজাদের পাপাচারের ফলশ্রুতিতে। প্রজারা রাজার প্রতি অনুগত থাকলে তাঁর অধীনে শান্তি পুনরায় আসবে।[৫০] অতএব তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের সার নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র।

রাজার দায়দায়িত্ব

তুসীর বাদশাহ সরাসরি জনতার শান্তি প্রগতি বা সমৃদ্ধির জন্য নিবেদিত প্রাণ হলেও জনতার নিকট তার কোনো জবাবদিহিতা নেই; সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা সবাই রাজার নিকট দায়ী; তিনি কেবল আল্লার নিকট দায়ী।[৫১] শেষ বিচার দিনে তিনি খোদার কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন।[৫২] পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তার রাষ্ট্র দর্শন ইরানি রাজতন্ত্র বা শিয়া ইমামত তত্ত্বের কাছাকাছি। খেলাফত তত্ত্বের বিপরীতে তিনি ইরানি ধারণার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি অবশ্যই শিয়া মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না, বরং তিনি বাতেনী মতাদর্শের একজন কড়া

সমালোচক ছিলেন। শিয়া মতাদর্শে যতটুকু দার্শনিক গভীরতা পরিলক্ষিত হয়; তুসী তত্ত্বে কিন্তু তা অনুপস্থিত। তিনি ইরানি মডেল অনুসরণ করেন কেন? সম্ভবত তৎকালীন বাস্তব অবস্থা ইরানি মডেলের অনুকূলে ছিল। প্রথমত সেলজুকদের দখলকৃত অঞ্চলে রাজতন্ত্র ছিল জনপ্রিয় আদর্শ। দ্বিতীয়ত তুর্কি জাতিসত্তার মধ্যে বিরাজমান গোত্রতন্ত্রের ধারণার স্থলে পারস্যের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিস্থাপন করার সামাজিক তাগিদ ছিল। তাদের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে তুর্কি খানাত বা গোত্রীয় নেতৃত্ব ছিল বেমানান: তৃতীয়ত তুর্কি জাতিসত্তার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র গোত্রনেতার অভাব ছিল না যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবিদার হতে পারত। এই কারণেই তুগ্রিল বেগ এবং আলপ আরসালান ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত না করে কনফেডারেট গঠন করেন। মালিক শাহের সময় অবস্থা অনুকূলে থাকা রাষ্ট্রসজ্ঘ কাঠামোর আওতায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। এ ব্যবস্থার স্থায়ীত্বের জন্য গোত্রীয় নেতৃত্বকে আঞ্চলিক সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের সাথে খাপখাওনোর জন্য ইরানি মডেলে রাজতন্ত্রীতত্ত্ব নির্মাণ ছিল সময়ের তাগিদ। বস্তুত তিনি ভেবেছিলেন তার সময়ের অবস্থার মোকাবিলা করতে ইরানি রাজতন্ত্রের কোনো বিকল্প ছিল না। ইরানি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রী মডেল অনুসরণ করায় সামন্ত ব্যবস্থারও নয়া বিন্যাস সহজ হয়ে ওঠে। সেলজুক সাম্রাজ্যে ভূমি মঞ্জুরীকে ইকতাদারী বলা হত। আব্বাসী আমলে ইকতা বিষয় নিয়ে নানা বিতর্ক ও জটিলতা দেখা দেয়; বুওয়াইহীরা ইকতা সম্প্রসারণ করে সীমিত এলাকায়; কিন্তু সেলজুকদের একীভূত বিশাল সাম্রাজ্যে এর বিকাশ ঘটানো হয়। সেলজুকরা সমরতন্ত্রের বিকাশ ঘটায় এবং তাদের সামরিক সংগঠনের জন্য ইকতাদারি ব্যাপক করতে হয়। সমরনেতা সৈনিক, কর আদায়কারী এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে ভূমি মঞ্জুরী দেয়ার নীতি গৃহীত হয়। তদুপরি গ্রাম সমাজে প্রাচীনকাল হতে দেহকান বা ভূস্বামী শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ইকতাদারির ব্যাপকতার জন্য বাস্তব অবস্থাও ছিল অনুকূলে। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, দশম শতাব্দীতেই আরব বিশ্ব হতে তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ তার প্রাধান্য হারাতে শুরু করে। শহর বন্দর এবং সমগ্র শাসক শ্রেণী কেবল ভূমি শোষণ নির্ভর হয়ে পড়ে। সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বাণিজ্য এ সময় হতে অতীতের কাহিনীতে পরিণত হতে থাকে। এই সময় হতে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় প্রগতির পথের বদলে প্রতিক্রিয়ার পথ অবলম্বন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইকতাদারি কোনোক্রমেই উত্তরাধিকারীসূত্রে গ্রথিত ছিল না এবং কোনো ইকতাদারকে কোথাও দু-তিন বছরের উপর রাখা হত না।[৫৩] এ ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় ইউরোপীয় সামন্ত ব্যবস্থার সাথে প্রাচ্য সামন্ত ব্যবস্থার পার্থক্য ছিল। প্রাচ্য সামন্ত ভূস্বামী কোথাও স্থায়ীভাবে অবস্থান না করায় স্থানীয় ভূমি উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থার পরিচর্যা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি তাদের নজর দেয়ার কোনো স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ ছিল না বরং শোষণের তীব্রতা বাড়ে।

ইকতা ব্যবস্থার বিকাশে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বুনিয়াদ আরো শক্তিশালী হয়। কেননা প্রজা ও জমির উপর রাজার কর্তৃত্ব ছিল দৃঢ়।[৫৪] সামন্ত প্রভুদের সাথে রাজার

সম্পর্ক বর্ণনা করতে তুসি প্রাচীন ইরানের মন্ত্রী বুজুর্গ মেহেরকে সম্রাট নওশেরোয়া যা বলেছিলেন সিয়াসতনামায় তা উদ্ধৃত করেন। নওশেরোয়া মন্ত্রী বুজুর্গ মেহেরকে বলেছিলেন যে, গোটা রাজ্যের প্রকৃত মালিক রাজা, তবে তিনি ভূ-সম্পত্তি সামরিক বাহিনী ও আমলাদেরকে দান করে দিলেও প্রজাদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তিনি দেন নি। এভাবে সামন্তদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে ইউরোপী ও প্রাচ্য দেশীয় সামন্ততন্ত্রের মধ্যে আরো একটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। ইউরোপের সামন্তরাই ছিল প্রজাদের প্রকৃত প্রভু। তারা ছিলেন রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী স্থানে।[৫৫] যেহেতু প্রজাদের মঙ্গলের জন্য রাজাই দায়ী এ জন্য সামন্তদের উপর খবরদারি করার জন্য রাজা বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করতেন।[৫৬] তুসের নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের উৎস নিহিত ছিল ইরানি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে; তথাপি তিনি ইসলামি তত্ত্বের এবং সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে ইরানি চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করেন। ইরানি বাদশাহ হতেন সাক্ষাৎ দেবতা; কিন্তু নিজামুলমুলকের বাদশাহ কেবল আল্লার মনোনীত ব্যক্তি, দেবজ নন; তার বাদশাহ বহু গুণে গুণান্বিত হলেও তার উপর কোনোক্রমেই দেবত্ব আরোপ করা হয় না।[৫৭] তুসীর বাদশাহ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি বিধায়ক (Law maker) ছিলেন না; বাদশাহও শরিয়া আইনের অধীন; প্রজাদের মঙ্গলের জন্য শরিয়াতের বিধান জারি রাখার দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হত। এ কারণে তাঁর বাদশাহকে কোরআন, সুন্নাহ, ফিকাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হত।[৫৮]

উপরিউক্ত তুসীর বক্তব্যের দুটি গভীর তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত অনুন্নত তুর্কি জাতিসত্তাকে সমসাময়িক প্রচলিত বিধিবিধানের সাথে গভীরভাবে পরিচয় ঘটিয়ে সমগ্র জাতিসত্তাকে সভ্যতার উচ্চ পর্যায়ে উন্নীতকরণ; দ্বিতীয়ত তার বাদশাহ স্বয়ং হবেন একজন ধর্ম বিশেষজ্ঞ। তাই মূলত তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ দায়িত্ব পালন করবেন। ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণের পবিত্র দায়িত্বও তিনি বহন করবেন।[৫৯] তুসীর বাদশাহের ধর্ম অবশ্যই রাজনীতির জন্য নয় বরং তা ধর্ম হবে অকৃত্রিম। তুসীর বাদশাহ ধর্মের সামাজিক মূল্য সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। তাঁর ধর্ম তাকে নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী হতে বিরত রাখে। তিনি হয়ে ওঠেন কল্যাণধর্মী।

তুসীর বাদশাহীতত্ত্বের সাথে ন্যায়নীতির প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যেহেতু ন্যায় বিচার হচ্ছে সুসরকারের মৌল নীতি। এ কারণে তুসীর রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য নৈতিকতাবাদের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। অথচ মজার ব্যাপার তিনি সিয়াসতে ধারাবাহিকভাবে কোনো বিচারতত্ত্ব নির্মাণ করেন নি।[৬০] এমন কি ন্যায় বিচারের কোনো সংজ্ঞা দিতেও চেষ্টা করেন নি। তিনি মনে করতেন ন্যায় বিচার হচ্ছে সামাজিক বিধি-সামাজিক দর্শন নয়। তুসী মনে করতেন যে একটি অধার্মিক রাজ্য টিকতে পারে; কিন্তু অত্যাচারী রাজা টিকতে পারে না। তার নৈতিকতাবাদ দু সূত্র হতে প্রভাবিত হয়। প্রথমত সিয়াসতনামায় ধার্মীক মুসলিম শাসকদের অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়ত ইরানি সাসানি বাদশাহ নওশেরোয়ার উদাহরণ দিয়েও নৈতিকতাবাদে সমাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, নওশেরোয়া ন্যায় বিচারের উপর এতই গুরুত্ব দিতেন যে, প্রয়োজনবশত স্বয়ং বাদশাহ বিচারকের নির্দেশে তার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দ্বিধান্বিত ছিলেন না। জনসাধারণের অভিযোগ শ্রবণের জন্য তার রাজদরবার সাধারণ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে উন্মুক্ত রাখা হত।[৬১] প্রজাকূলের মঙ্গলের জন্য তিনি আল্লার নিকট দায়ী বলে ভাবতেন, এমন কি তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অশুভ আচরণের জন্য তিনি স্বয়ং দায়ী বলে ভাবতেন।[৬২] এ জন্য সৎকর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্ধারণে তার দায়িত্ব এবং তাদের আচরণের প্রতি তদারকি করাও তার কর্তব্য বলে ভাবতেন।

উজির

বাদশাহী কাঠামোর মধ্যে উজারাত প্রতিষ্ঠানটির উপর নিজামুলমুলক তুসী সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিপ্লবের পর আব্বাসীরা সাসানী উজারাত প্রতিষ্ঠানটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সম্ভবত আব্বাসী শাসনের সাথে এটা সম্পৃক্ত হয় নি। কেননা অনেক সময় আব্বাসী খলিফা উজির ব্যতিরেকে প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করতেন। বুওয়াইহী অথবা সেলজুকরা কখনই এটাকে এড়িয়ে চলেন নি। তুসী মনে করতেন উজিরের অবস্থান ছিল বাদশার পর। উজারতের ধারণা সম্পর্কে আল মাওয়ার্দি এবং তুসীর মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আল মাওয়ার্দির মতে তত্ত্বগতভাবে আব্বাসী শাসনে উজিরের ছিল শাসনতান্ত্রিক অবস্থান। নিজামির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্য রকম। তিনি উজিরের শাসনতান্ত্রিক অবস্থানের কথা না ভেবে এবং এটাকে রাজনৈতিক ও নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করতে চেয়েছেন। উজিরের দায়-দায়িত্ব ছিল আল মাওয়ার্দির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। তুসী দেখাতে চেষ্টা করেছেন উজিরের কি হওয়া উচিত- যাতে মন্ত্রিত্ব পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। মন্ত্রিত্বের কলাকৌশলই ছিল তুসীর অধ্যয়নের মূল বিষয়।

তুসীর নিকট উজির পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইরানি রাজনীতিতে উজিরের অবস্থানকে মডেল হিসেবে দেখছেন এবং এটাই স্বাভাবিক। কেননা তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন যোগ্য উজির। আলপ আরসালান ও মালিক শাহের মহান কীর্তির মূলে তার অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি। উজারত সম্পর্কে তার বক্তব্যের সারৎসার ছিল ঃ রাজা-রাজ্য জনতা সকলের মঙ্গল নিহিত থাকে উজিরের প্রজ্ঞা, দক্ষতা, সদিচ্ছা এবং কর্মতৎপরতার মধ্যে।[৬৩] উজির কেবল রাজা প্রজার মধ্যকার যোগসূত্র নন; উজির রাজ প্রতিনিধি বা ডেপুটি। ইরানে ইয়াজদিগিরদের সময় হতে সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব উজিরের উপর ন্যস্ত ছিল। তুসী রাজবংশের ন্যায় উজারতকে উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ করেন। এ ব্যবস্থা ইরানে আরদশির হতে ইয়াজদিগিরদ পর্যন্ত বহাল ছিল।

মধ্যযুগে প্রাচ্য দেশে উজিরদের কি ভূমিকা, তাদের বিরূপ গুণাবলী থাকা দরকার—সে সকল বিবরণের সাথে পদটি কত ভয়াবহ সে সম্পর্কে তুসী আলোচনা করেছেন এবং ঐ পদের জন্য পাঁচটি বিপদ চিহ্নিত করেছেন ঃ ক. যেহেতু প্রতিদিন উজিরকে অসংখ্য নির্দেশনামা জারি করতে হত এবং নতুন নতুন পদক্ষেপ নিতে হয়—এ কারণে অনেক সময় জনতার প্রতি অবিচারের সম্ভাবনা থাকতে পারে।[৬৪] খ. অনেক ক্ষেত্রে একজনকে খুশী করতে গিয়ে অনেকের অখুশীর কারণ হতে পারে।[৬৫] গ. তাঁর কার্যক্রমে রাজপরিবারের সদস্যরা অখুশী হলে স্বয়ং রাজাও তার প্রতি নাখোশ হতে পারেন।[৬৬] ঘ. যেহেতু তাকে রাজ্যের অভিজাত শ্রেণীর সাথে কাজ করতে হয় এবং তাঁর প্রতি তাদের ঘৃণা বা বিদ্বেষের কারণে স্বয়ং রাজা তার প্রতি বৈরী হয়ে যেতে পারেন।[৬৭] ঙ. যেহেতু তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য অসংখ্য ছোট বড় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়–এ ক্ষেত্রে তাদের অসন্তুষ্টি অথবা ষড়যন্ত্র তার সুনাম এবং কর্ম জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।[৬৮]

উল্লেখিত বিপদের মধ্য দিয়ে তাঁকে কাজ চালাতে গেলে কি কি গুণের অধিকারী হতে হয়, সে সম্পর্কেও তিনি সিয়াসতে আলোকপাত করেন এবং তিনি চারটি বিষয়ের প্রতি নজর রেখে তাঁর দৈনন্দিন করণীয় কাজ সম্পাদনের উপদেশ দিয়েছেন। বিষয়সমূহ ক. সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল আনুগত্য; খ. রাজার প্রতি তার দায়দায়িত্ব; গ. রাজার প্রিয় পাত্রদের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করা; ঘ. সাধারণ মানুষের প্রতি তার দায়িত্ববোধ। একজন সফল উজিরকে সর্বদাই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে এবং পার্থিব স্বচ্ছন্দ উপেক্ষা করে বাদশাহকে খুশী রাখতে হবে। তিনি মন্ত্রীদেরকে সামন্তবর্গের প্রভাবশালী ব্যক্তি, অমাত্যবর্গ, রাজার প্রিয়পাত্র, সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও অভিজাতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। তাদের সাথে সুসম্পর্কের পরিবর্তে শত্রুতা দেশের জন্য অকল্যাণ হতে পারে বলে তিনি হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেন। তুসীর আর একটি অনুপম বক্তব্যের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। সামন্ত ব্যবস্থায় নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের মধ্যেও কোনো রকম কূটকৌশল বা পাল্টা ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন না করে তার বাদশাহের মন্ত্রীকে বরং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নৈতিক মানদণ্ড উর্ধ্বে রেখে শিব সুন্দর মঙ্গল ও সত্য পথে চলার আবেদন রেখেছেন।[৬৯] বস্তুত মধ্যযুগে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তৎকালীন রাজনৈতিক দর্শনে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে নিজামুলমুলক তুসী ছিল উজ্জ্বলতম তারকা।

শিক্ষাদর্শন

এ পর্যন্ত আমরা নিজামুলমুলক তুসীকে একজন দক্ষ প্রশাসক, রাষ্ট্র দর্শনে মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক হিসেবে দেখেছি। তৎকালীন সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সংগঠনের প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী তত্ত্ব লিখেই ক্ষান্ত হন নি।

তিনি তার আদর্শ রাষ্ট্রের জনকল্যাণকামী স্বৈরাচারী দার্শনিক রাজার কথা বলেছেন – তার আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এবং সমাজকে সাচ্চা ধর্মপথে পরিচালনার জন্য চাই একদল বুদ্ধিজীবী যারা সচেতনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে উপযুক্ত নাগরিক তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকবেন। এজন্য তিনি একটি আদর্শ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা এখনো পর্যন্ত 'দরসে নিজামী' নামে খ্যাত। এই কলেজের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে তাঁর শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি অনুধাবন করা যায় এবং তার কাজের সঠিক মূল্যায়ন হয়।

আব্বাসী খলিফাদের অনেকেই শিক্ষাদীক্ষায় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা সর্বজনস্বীকৃত। বাগদাদে মামুনের অমর সৃষ্টি বায়তুল হিকমাতের কথা সবাই জানে। বসরা ও কুফায় গড়ে ওঠে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা ছাড়াও প্রাচ্যে সিরাজ, মারাগা, ইসপাহান, গজনি, মার্ভ, নিশাপুর, রায় বোখারা, সমরখন্দ, আরো কত নগর বন্দরে গড়ে ওঠে বিজ্ঞান মানমন্দির। প্রতিটি হাসপাতালে চলে শিক্ষা কার্যক্রম। বিজ্ঞান মানমন্দিরে অংক, জ্যোতির্বিদ্যা, যন্ত্র প্রকৌশলী বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হত। হাসপাতালে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত। অসংখ্য পণ্ডিতদের গৃহে, বিভিন্ন মসজিদে তফসির, হাদিস শিক্ষা দেয়া হত। এ সব প্রচেষ্টায় শিক্ষার বেশ প্রসার ঘটে; এতে শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা ও ব্যাপক শিক্ষা কার্যক্রম ছিল। তুসী প্রথম ও শেষ ব্যক্তি যিনি একটি সুশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। সুইউতির ভাষ্য অনুসারে ১০৬৫-৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নিজামুলমুলক প্রতিষ্ঠিত নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মুসলিম বিশ্বের বহুদিনের আদর্শ প্রতিষ্ঠান।[৭০] এতে একটি পাঠ্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। এই শিক্ষাক্রমে সর্ব প্রথম রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়– এখানেই এর তাৎপর্য নিহিত ছিল। এ কলেজে আরবি ভাষা, ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, সাহিত্য পাঠদানের মধ্য দিয়ে এর মানবিক শাখা গড়ে ওঠে; তফসির, হাদিস, ফেকাহ্ শাস্ত্র পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা বিভাগ গড়ে ওঠে, এবং এই বিভাগে শাফেয়ী ও আশায়েরা মতাদর্শ প্রশিক্ষণই ছিল মুখ্য, তৎকালীন মুসলিম মনিষার উপর এর প্রভাব ছিল লক্ষণীয়।

কলেজ-সংলগ্ন থাকত ছাত্রাবাস, ছাত্রদের অনেকেই ছিল সরকারি বৃত্তিভোগী। লেভি তার বাগদাদ ক্রনিক্যালে লিখেছেন যে, মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো, পাঠ্যক্রম, নিজামীয়ার আদলে গড়ে উঠে।[৭১] নিজামীয়া ছিল সরকার পরিচালিত ধর্মীয় সেমিনারী। ইবনে আমির বলেন যে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কাউকে প্রভাষক পদে নিয়োগ করলে সরকারি অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো কাজ সম্পদন করতে পারতেন না। কলেজ অধ্যাপক একটি উঁচু মঞ্চে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট শিক্ষার্থীরা লিখিত অথবা মৌখিক প্রশ্ন করতেন—অধ্যাপক তার সমাধান দিতেন। প্রতি শিক্ষকের জন্য দু বা ততোধিক সহকারী শিক্ষক থাকতেন—তাদের দায়িত্ব ছিল অধ্যাপকের বক্তৃতা শেষ হলে তার

বক্তৃতাটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে সকলের নিকট বোধগম্য করে তোলা। আল গাজ্জালী এই প্রতিষ্ঠানে ১০৯৬-৯৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ বছর অধ্যাপনা করেন এবং তার বিখ্যাত পুস্তক এহিয়াউল উলুম পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি শিক্ষা সমস্যা উত্থাপন করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? কেবলমাত্র জ্ঞান দান? তিনি মনে করেন যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও সচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম। He brought the problem of education into organic relation with profound ethical system.[৭২] প্রতিষ্ঠানটি হালাকু ও তৈমুরের ধ্বংসযজ্ঞের পরও টিকে ছিল এবং মাদ্রাসায় মুস্তাসেরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা নীতিকে রাষ্ট্র দর্শনের বাহনে পরিণত করতে।

১০.৭ অবক্ষয়ের আবর্তে সেলজুক রাষ্ট্রসঙ্ঘ : এ্যাসাসিন বা সন্ত্রাসবাদের উত্থান

মধ্যযুগে ইসলামের ইতিহাসে যে বিকাশ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তা হল ঃ নতুন নেতৃত্বে নতুন রাজবংশের উত্থান ও স্বর্ণযুগের সৃষ্টি–অবক্ষয়-পতন; পুনরায় নয়া আর এক রাজবংশের উত্থান স্বর্ণযুগের সৃষ্টি–অবক্ষয়-পতন; পৌনঃপুনিকভাবে যেন একই ধারার পুনরাবর্তন ঘটে। ইতিহাসের উত্থান-বিকাশ-অবক্ষয় পতন–এ যেন একটি জৈবিক নিয়মেই ঘটছে; ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়ার একটা বাস্তব উদাহরণ। এরূপ ঘটনা মধ্যযুগে কেবল ইসলামের ইতিহাসের বেলায় সংঘটিত হয়, তা কিন্তু নয়। সমগ্র মানব ইতিহাসে এরূপ পুনরাবৃত্তি সংঘটনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রশ্ন হল ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে কি কখনো হুবহু পুনরাবর্তন ঘটে? এ প্রশ্নে সরল উত্তর হল, না। নিঃসন্দেহে মানব সমাজ ও সভ্যতা অনড় সত্তা নয়; বরং এর পরিবর্তনমানতা, পরিবর্তনশীলতা ও গতিময়তাই এর বৈশিষ্ট্য। তার পরিবর্তনমানতা এবং গতিশীলতা এবং এর রূপান্তর নির্ধারিত হয় এর নিজস্ব সামাজিক নিয়মকানুন দ্বারা, তাকে বলে ঐতিহাসিক গতিবিধি (Historical law of Motion)। সমাজদেহে গতিবেগ সৃষ্টির মূলে অনেক রকম কারণ থাকতে পারে, তবে কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ হয় মুখ্য। পুনশ্চ এক অবস্থায় যেটি মুখ্য কারণ অন্য অবস্থায় সেটা গৌণ কারণও হতে পারে। একটি ঐতিহাসিক পর্ব চিহ্নিত হয় একটি বিশেষ মৌল বাস্তবতা দিয়ে। সেই মৌল বাস্তবতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সমাজে যে গতিবেগ সৃষ্টি হয় তা সাধারণত বৃত্তাকারে হয়। যেহেতু সকল সময় একই অবস্থা হতে খাত সৃষ্টি হয় না, তাই পরিবর্তন হুবহু এক ধরনের হয় না, বরং চলতে থাকে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের পালা; মৌল অবস্থায় রূপান্তর ঘটলে সভ্যতায় আসে উল্লম্ফন। তখন বিদায় নেয় পুরনো অবস্থা; জন্ম নেয় নতুন ব্যবস্থা। এটাই হল ইতিহাসের প্রগতিশীল ধারণা।

যেহেতু আব্বাসী উত্থান হতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক পর্বে মৌল বাস্তব অবস্থা ছিল একই; তাই এই আলোচ্য যুগে সমাজ ও সভ্যতায় কোনো

উল্লম্ফন ঘটে নি। বিভিন্ন অবস্থায় তাদের উত্থান অবক্ষয়-পতন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। আর এর মূলে ছিল সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রবণতা। এটাই তাদের অবক্ষয় ও পতনের অভ্যন্তরীণ কারণ।

আপাতত সেলজুকদের স্বর্ণযুগের পর কিভাবে তার অবক্ষয় ও পতন ঘটে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। ঐ আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আলোচ্য সময়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঐ বংশের অবক্ষয় প্রক্রিয়াকে জোরদার করে এবং ঘটনাদ্বয়কে বহিঃকারণ বলেই নির্দেশ করা যায়। সে সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হবে। বহিঃকারণদ্বয় ক. মুসলিম বিশ্বের উপর খ্রিষ্টান জগতের প্রচণ্ড আগ্রাসন, যাকে বলা হয় ক্রুসেড। ক্রুসেড সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। খ. প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের প্রকাশ।

ইসলামি বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ ঃ এ্যাসাসিন

খোলাফায়েরাশেদিন যুগের পরিসমাপ্তির পর হতে ইসলামের ইতিহাসে বহুদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে শিয়া-সম্প্রদায় প্রতিপক্ষরূপে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। তাদের রণনীতি সর্বদা এক থাকলেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তাদের রণকৌশল পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থায় অনাচারের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে তারা জনগণকে প্রভাবিত করে। কারামিতা ছিল এরূপ একটি উদাহরণ। এরূপ তৎপরতায় আব্বাসীদের অবক্ষয় ত্বরান্বিত হয়; বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি প্রভাব বিস্তার করে; আব্বাসী কেন্দ্রীয় সরকারের পতন হয়; অনারব নেতৃত্বে খেলাফতের স্থলে সালতানাত বা রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। এর একটি বাস্তব রূপ নিতে যাচ্ছিল সেলজুক যুগে মালিক শাহের রাজত্বকালে। এর রূপকার ছিলেন বিদগ্ধ উজির নিজামুলমুলক তুসী। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আরবি চিন্তাধারায় খেলাফতের বিপরীতে আরব-অনারব নির্বিশেষে রাজতন্ত্রীতত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন এবং একই সাথে শিয়া সম্প্রদায়ের আলী-ফাতেমী পারিবারিক অবতারবাদের বিপরীতে গোত্র-জাতি নির্বিশেষে আল্লাহ মনোনীত স্বৈরতন্ত্রী নৃপতিতন্ত্রীতত্ত্বের প্রচার করেন। সম্ভবত তার এ চিন্তাধারা শিয়া তাত্ত্বিকদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। মালিক শাহ কর্তৃক প্রবর্তিত শাক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ অসম্ভব ভেবে যে নতুন কৌশল অবলম্বন করে তাই ঐ যুগের সন্ত্রাসবাদ। এর উদ্দেশ্য ছিল নেতৃস্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে গোপনে হত্যা করে সর্বত্র ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাকে উৎসাহিত করা, জনমতকে বিভ্রান্ত করা এবং নিজেদের শক্তি সুসংহত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা—কেবল গলাকাটা নীতি নয়। দুর্ভাগ্যবশত এদের কোনো ইতিবাচক বক্তব্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তাদের উত্তরসূরিরা যুগের সঙ্গে খাপখাইয়ে একেবারে রূপান্তরিত হওয়ায় তাদের নিকট হতে ও ঐ সন্ত্রাসী আদর্শ সম্পর্কে কোনো ধারণা করা কঠিন।

মালিক শাহের রাজত্বকালের শেষ দিকে সন্ত্রাসীদলের উত্থান দেখা যায়। এদেরকে সৈয়দ আমীর আলী এ্যাসাসিন বলে বর্ণনা করেছেন। এ ইংরেজি শব্দের অর্থ আততায়ী বা গুপ্তঘাতক। তার পুস্তকের পাদটিকায় বলা হয় যে, এ্যাসাসিন শব্দটি হাসানী (হাসান শিষ্য) অথবা হাশিশীন হাশিশ সেবনকারী হতে উদ্ভূত হলেও হতে পারে। আমীর আলী তাদের নাস্তিক্যবাদী বলে অভিহিত করেছেন।[৭৩] হিট্টি তাদেরকে নব্য ইসমাইলী এমন কি অজ্ঞেয়বাদী বলেও আখ্যায়িত করেছেন।[৭৪] আমীর আলী এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হাসান সাবাহকে নিজামুলমুলক তুসীর সতীর্থ বলেছেন; কিন্তু তার মতো পদমর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়ে না কি ঐ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পথে অগ্রসর হন।[৭৫] এটা হাস্যকর গল্প বলে প্রতীয়মান হয়। অনেক ঐতিহাসিক তাকে নিজামুলমুলকের সহপাঠী বলে মানতে রাজি নন।[৭৬] হিট্টির ধারণা কারামাতা রাজ্য না টিকলেও তাদের মতাদর্শ মিশরের ফাতেমীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়; তাদের একাংশ লেবাননে দ্রুজ মতাবলম্বী এবং অন্য অংশ হল এ্যাসাসিন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম হাসান বিন সাবাহ। সম্ভবত তিনি তুসনগরের ইরানি পরিবারের সদস্য, তবে তিনি দক্ষিণ আরবের প্রাচীন হিমইয়ার রাজবংশধর বলে দাবি করতেন। তরুণ বয়সে তিনি রায়নগরে শিয়া গুহ্য তত্ত্বে (বাতেনী মতে) দীক্ষা গ্রহণ করেন; মিশরে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। ফাতেমী খলিফাদের সমর্থক হওয়ায় পূর্বাঞ্চলে ফাতেমী দায়ী (প্রচারক) হিসেবে তিনি তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ইরানে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি ইসমাইলী শিয়া মতাদর্শের প্রচার কাজে লিপ্ত হন।[৭৭] ইবনুল আসিরের বরাত দিয়ে হিট্টি বলেন যে, তিনি মাজেন্দ্রানে আল বুরজ পর্বত শ্রেণীর গিরি সংকটে শক্তিশালী দুর্ভেদ্য দুর্গ আলমুতে ১০৯০ খ্রিষ্টাব্দে অবস্থান গ্রহণ করেন। দুর্গটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১০২০০ ফুট উঁচু-কাজবিনের উত্তর পশ্চিমে কৌশলগত অবস্থানে ছিল; তিনি এটাকে বলতেন ঈগলের বাসা। কি রূপে তিনি এরূপ একটি কৌশলপূর্ণ দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে অবস্থান গ্রহণ করেন, তা কেবল অনুমানসাপেক্ষ। সম্ভবত ছলেবলে-কৌশলে তিনি এ দুর্গটি অধিকার করেন।[৭৮]

তার প্রচার তৎপরতার জন্য তিনি সম্পূর্ণ নতুন সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ইসমাইলীদের ধর্মগুরু সৃষ্টি করতেন একদল শিষ্য যারা গুপ্ত মতবাদের সকল স্তর উত্তীর্ণ হয়ে দায়ী হিসেবে অন্যদেরকে দীক্ষা দিতেন; তাদের নিচে অবস্থান থাকত রফিকদের। তারা ক্রমান্বয়ে তাদের মতাদর্শে আস্থাভাজন হয়ে গুপ্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত হতেন। হাসান উপলব্ধি করেন যে, সতর্কতা ও উদ্দীপনা সহকারে তার মৌল উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য কার্যনির্বাহীদের তৃতীয় শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন, যারা উর্ধ্বতন নেতৃত্বের হাতে কেবল অন্ধ ধর্মোন্মত্ত যন্ত্রের মত কাজ করবে। ফলাফল বিবেচনা না করে নির্বিবাদে মেনে চলবে প্রভুর আদেশ। এরূপ ক্রীড়ানক চক্রকে ফিদায়ী বা উৎসর্গীকৃত বলে অভিহিত করা হয়।[৭৯] গিরিবাসী ধর্মগুরুকে বলা হয় সৈয়েদানা (আমাদের প্রভু); তাঁকে শায়খুল জাবাল বা গিরিবাসী বৃদ্ধ বলা হত। ফিদায়ীরা ছিল

তার দেহরক্ষী বাহিনী। প্রধান গুরুর অব্যবহিত পরের স্থান ছিল দায়ীউল কবিরদের। জাবাল, কুহিস্থান, এবং সিরিয়ায় তাদের সাফল্যের অগ্রগতির জন্য ঐ পৃথক প্রদেশে শাসিত হয় একজন দায়ীউল কবির দ্বারা। দায়ীউল কবিরের অধীনে থাকত দায়ী বাহিনী; এরা বার্তা বাহকেরও কাজ করতেন; সতর্কতার সাথে জনসাধারণের মধ্যে তাদের মতবাদ প্রচার করতেন। শিষ্য ও সহচর (রফিক) গুপ্তমতবাদের বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হয়েই নেতৃত্বের যোগ্য হতেন। ভক্ত ফিদায়ীদের অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে। সাসিক বা নবদীক্ষিতরা সাধারণ সহযোগী ছিল বলে মনে হয়। দলের অদীক্ষিত সদস্যরা ইসলামের ধর্মীয় কর্তব্য কঠোরভাবে পালন করত। দীক্ষিতরা তাদের মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হত এবং শায়খের আদেশানুসারে ফিদায়ীদের অস্ত্র চালনার নির্দেশ দিতেন।[৮০]

চীনে যাওয়ার পথে মার্কোপোলা ১২৭১-৭২ সালে তাদের প্রধান কার্যালয় অতিক্রম করেন এবং আলমুতের উদ্যান এবং এখানে কিরূপে তরুণদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করা হত তার এক চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। উদ্যানের প্রবেশমুখে ছিল সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য কেল্লা। এখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আহরণ করা ১২-২০ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবান সামরিক গুণাবলীর যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণদের কেল্লাচত্তরে আনা হত। গুরুর ভক্ত হতে ইচ্ছুক যুবকদেরকে গুরুর আদেশে উদ্যানে আনা হত। তাদেরকে প্রথমে হাশিশ সেবন করানো হত; তারা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হত কেবল তখনই তাদেরকে উঠিয়ে উদ্যানে আনা হত। তাদের জ্ঞান ফিরলে তারা আপনাদেরকে চমৎকার উদ্যানে দেখতে পেত। এখানে তারা সুন্দরী তরুণীদের সাথে প্রাণভরে নাচগানে মত্ত হয়ে যেত। এখানে গুরু তাদেরকে নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করতেন। এবং বলতেন তারা সফল হয়ে ফিরে এলে, ফেরেশতারা তাদেরকে পুনরায় উদ্যানে আনবে; যদি তাদের মৃত্যু হয় তা হলে ফেরেশতারা তাকে এ উদ্যানে নিয়ে আসবে।[৮১]

এভাবে আলমুত হতে বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের তৎপরতার জাল বিস্তার করা হয়। এই সন্ত্রাসীদের প্রথম শিকারে পরিণত হন স্বয়ং সেলজুক মন্ত্রী নিজামুলমুলক তুসী। চতুর্দিকে তাদের তৎপরতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তারা ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করায় জনজীবন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। মালিক শাহের দুবার আলমুত অভিযান ব্যর্থ হয়। ১২৫৬ সালে হালাকুখান এ দুর্গ চুরমার করে। তাদের নিকট হতে সংগৃহীত নথিপত্র সব কিছু ভস্মীভূত করা হয়।

একাদশ শতকের শেষ প্রান্তে সিরিয়ার আলেপ্পো সেলজুক শাসক তুতুশ পুত্র রিজওয়ান তাদের মতবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১১৪০ সালে সিরিয়ার মাসইয়াত, কাফে, কান্দুর আল উলাহদাহ তারা দখল করে নেয়। রশিদুদ্দীন সিনান সিরিয়ার শয়খুল জাবাল ছিলেন। ১২৭২ সালে বাইবার্স তাদেরকে দমন করেন। এদের উত্তরসূরি বলে পরিচিত আগাখানিরা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে।

১০.৮ সেলজুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবক্ষয় ও পতন

ইতিপূর্বে বিশাল সেলজুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের উত্থান ও বিকাশের ইতিহাস বিবৃত করা হয়েছে। ১০৯২ সালে মালিক শাহের মৃত্যুর পর ঐ বিশাল সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। তুর্কি গোত্রীয় প্রথা অনুসারে রাজ্য শাসন ক্ষমতার অধিকার থাকত সমগ্র গোত্রের, তবে গোত্র জ্যেষ্ঠতার সুবাদে সকল সদস্যদের আনুগত্যের দাবিদার হতেন বটে, তবে কিন্তু এত বড় পল্লবিত স্বার্থ সচেতন গোত্র সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও স্বার্থের সমন্বয় ঘটান ছিল খুব জটিল কাজ। মালিক শাহের মৃত্যুর পর ১১৫৭ সাল পর্যন্ত সঞ্জর বেঁচে থাকা অবধি মূল মহান সেলজুক বংশ টিকে থাকে। বাগদাদে মহান সেলজুক বংশের তালিকা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। মহান সেলজুক বংশ ছিল মহান সেলজুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় শক্তি। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক রাজ্য সরকার পরিচালনা করতেন: ক. সেলজুকে রুমি যা এশিয় মাইনর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই অঙ্গ রাজ্যটি প্রথম ক্রুসেড দ্বারা আক্রান্ত হয়; ১০৭৭-১৩০২ পর্যন্ত সেলজুক সংযুক্ত রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে; খ. সিরীয় সেলজুক শাখা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সে কাহিনী ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে। ক্রুসেডের ধাক্কায় এই ক্ষুদ্র বংশ ১১১৭ সালের পর আর টিকে থাকে নি; গ. কিরমান সেলজুক শাখার উপর কিরমানে শাসন ক্ষমতা অর্পিত ছিল এবং সেখানে ১১৮৬ সাল পর্যন্ত শাসন কর্তৃত্ব বজায় থাকে; ঘ. ইরাকি সেলজুক শাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মালিক শাহের মৃত্যুর পর বাগদাদে মাহমুদ বরকিয়ারুক (১০৯২-১১০৪ খ্রি.) দ্বিতীয় মালিক শাহ এবং মুহাম্মদ (১১০৪-১১১৭ খ্রি.) বাগদাদের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১১১৭ সাল হতে ১১৫৭ সাল পর্যন্ত সঞ্জর মহান সেলজুক বংশের জ্যেষ্ঠ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও বাগদাদসহ সমগ্র ইরাক, ফারেস খুজিস্তান এবং পশ্চিম প্রদেশসমূহের শাসনভার অর্পিত হয় ইরাকি সেলজুক শাখার উপর। অতএব মহান সেলজুক নৃপতি সঞ্জরের সরাসরি কর্তৃত্ব থাকে পূর্বাঞ্চলে।

বাগদাদের উপর ইরাকি সেলজুক শাখার শাসনকাল ছিল ১১১৮-১১৯৪ সাল পর্যন্ত। কিরূপে তারা বাগদাদে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে সেটা প্রথমে আমাদের বিবেচ্য। ইরাকি শাখার সাথে মহান সেলজুকদের সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের। মহান সেলজুক শাখার শেষ নেতা নৃপতি সঞ্জর ইরাকি শাখার সদস্যদের মধ্যকার অন্তঃদ্বন্দ্বে মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করতেন; তিনি স্বয়ং তার খোরাসান ও পূর্ব সীমান্ত প্রদেশসমূহের উপর তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। তিনি গজনি, ঘুরী ও অন্য গুজ পরিবারের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন এবং তোখারিস্তানের স্থানীয় শাসকদের বিদ্রোহ দমনে অনেক সময় ব্যয় করেন। ইরাকি সেলজুক শাখার আশ্রিত আব্বাসী খলিফাগণ :

২৯. আল মুস্তারশিদ (১১১৮-৩৫ খ্রি.)

৩০. আর রসিদ (১১৩৫-৩৬ খ্রি.)

৩১. আল মুকতাফী (১১৩৬-১১৫৫ খ্রি.-১১৬০ খ্রি.)
৩২. আল মুস্তানজিদ (১১৬০-৭০ খ্রি.)
৩৩. আল মুস্তাজী (১১৭০-৮০ খ্রি.)
৩৪. আল নাসির প্রথম পর্ব (১১৮০-১১৯৪ খ্রি. দ্বিতীয় পর্ব ১১২৫ খ্রি.)

মালিক শাহের মৃত্যুর পর রাজমহিষী তুরখান খাতুন জালালিয়া আপন শিশুপুত্র মাহমুদকে সিংহাসনে বসানোর জন্য প্রাসাদ চক্রান্তে লিপ্ত হন। তিনি তার পুত্রকে নাসেরে দীন ওয়া দুনিয়া উপাধিতে ভূষিত করে সুলতানের পদমর্যাদা দেয়ার জন্য খলিফার নিকট আবেদন করেন। এটা ছিল খলিফার জন্য বড় সুযোগ। মালিক শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র বরকিয়ারুখ প্রাসাদ চক্রান্ত ভণ্ডুল করে দিয়ে সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে খলিফা আল মুকতাদী ১০৯৪ সালে প্রয়াত হন এবং মুস্তাজহীর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর পুনরায় নতুন চক্রান্ত শুরু হয়। মালিক শাহের দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ বরকিয়ারুকেব প্রতিদ্বন্দ্বী হন; কিন্তু তিনিও সুবিধে করতে পারেন নি। বরকিয়ারুক ১১০৪ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান হিসেবেই রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের পশ্চিমগগণে কাল মেঘ দেখা দেয়। ইউরোপীয় খ্রিষ্টান শক্তি পশ্চিম এশিয়ায় ক্রুসেড চাপিয়ে দেয়। ১০৯৭-৯৮ সালে ক্রুসেডের প্রথম আক্রমণে নাইসিয়া হতে সেলজুক রুমীদেরকে বিতাড়িত করে। ১০৯৯ সালে তারা ফাতেমীদের হাত হতে প্যালেস্টাইন দখল করে। সেখানকার মুসলিম জনতা বাগদাদ সরকারের নিকট পবিত্র স্থান রক্ষার আকুল আবেদন করে; কিন্তু বাগদাদ তাদের আবেদনে সাড়া দিতে পারে নি। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে ১১০৩ সালে ক্রুসেডাররা বাগদাদ দখলের বৃথা পায়তারা করে। যা হোক এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বরকিয়ারুক ও পিতৃব্য সিরিয়ার তুতুশের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। তুতুশ পরাজিত ও নিহত হওয়ার পরও সাম্রাজ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। কারণ বরকিয়ারুক ভ্রাতা মহম্মদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এ গৃহ যুদ্ধ কয়েক বছর স্থায়ী হয়। ১১০৪ সালে বরকিয়ারুক প্রয়াত হলে সুলতান মহম্মদ তার স্থলাভিসিক্ত হন এবং ১১১৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে প্রয়াত হন। তার মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হন তদীয় পুত্র ইরাকি সেলজুক শাখার উত্তরাধিকারী মাহমুদ। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। পৈতৃক সূত্রে ইরাক, ফারেস, খুজিস্তান এবং পশ্চিম প্রদেশসমূহ ঐ নাবালক সুলতানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করায় ইরাকি সেলজুকদের রাজত্বকাল শুরু হয়।

ইরাকি সেলজুক বংশের নিম্নলিখিত সুলতানগণ সিংহাসনে বসেন: মাহমুদ (১১১৮-১১৩১ খ্রি.); দাউদ (১১৩১-৩২ খ্রি.), দ্বিতীয় তুগ্রীল (১১৩২-৩৪ খ্রি.), মাসুদ (১১৩৪-১১৫২ খ্রি.), দ্বিতীয় মালিক শাহ দ্বিতীয় মাহমুদ (১১৫৩ -৫৯ খ্রি.) সুলাইমান শাহ (১১৫৯-৬১ খ্রি.) আরসালান শাহ (১১৬১-৭৫ খ্রি.) দ্বিতীয় তুগ্রীল (১১৭৫-৯৪

খ্রি.)। উল্লেখ্য যে উক্ত সুলতানদের অনেকেই অপ্রাপ্ত বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাদের অনেকে অকালে মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন।

তুর্কি প্রথা অনুসারে মোহাম্মদের চার পুত্র মাহমুদ, তুগ্রিল, মাসুদ ও সুলাইমান লালিত পালিত হন তুর্কি আমীরদের দ্বারা। বিখ্যাত তুর্কি আমীর আতাবেগ আপন মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাদের নিজস্ব পোষ্য পুত্রকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় রাজপরিবারে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ছিল অনিবার্য। এ রূপ সংঘাতে রাজপরিবার, আতাবেগ এবং স্বয়ং খলিফা-এই ত্রিপক্ষীয় টানাপোড়েনে বাগদাদের রাজনীতি হয়ে ওঠে মারাত্মক জটিল ও ঘোলাটে। সেলজুক গোত্র প্রধান সঞ্জর মাঝে মাঝে তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসায় আসতেন, কিন্তু কোনো লাভ হত না বরং চতুর্বিধ রাজনৈতিক ঘূর্ণিব্যাত্যার সৃষ্টি হয়। তাই বলা চলে যে ১১১৮ হতে ১১৯৪ এই দীর্ঘ সময়টি ছিল বাগদাদ রাজনীতির অন্ধকার যুগ। এরূপ অন্ধকার পরিস্থিতিতে ইরাকি সেলজুকরা বাগদাদ ত্যাগ করে পূর্বাঞ্চলে চলে গেলে সেই সুযোগে খলিফা মুস্তারশিদ (১১১৮-১১৩৬ খ্রি.) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাগদাদে ভ্রাতৃঘাতী কলহ বৃদ্ধির জন্য সুলতান মাসুদের ছোট ভ্রাতাকে বাগদাদ আক্রমণে প্রলুব্ধ করেন; কিন্তু বাগদাদের মেয়র মাহমুদকে খলিফার আগ্রাসন প্রতিহত করার আহ্বান জানান। খলিফার বাহিনী ওয়াসিতে প্রেরণ করা হলে বসরার গভর্নর জঙ্গী তাদেরকে বিতাড়িত করেন এবং মাহমুদ খলিফার প্রাসাদ দখল করেন; তবে নগরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলে। মাহমুদ খলিফাকে বাগদাদ হতে বিতাড়িত করতে সফল হলেও খলিফার সাথে সুলতানকে সমঝোতা করতে বাধ্য করেন। বাগদাদ রাজনীতির এ এক নয়া জটিলতা। উভয় পক্ষই জঙ্গীর মীমাংসা মেনে নেয়; এতে প্রচণ্ড লাভবান হয় জঙ্গী। তিনি বাগদাদ তথা সমগ্র ইরাক, মোসুল, নিসিবিনসহ মেসোপটমীয়ায় গভর্নর হিসেবে স্বীকৃত হন।[৮২]

১১৩২ সালে সুলতান মাহমুদের মৃত্যু হলে খলিফা নতুন করে সেলজুক পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির তৎপরতা চালিয়ে যান এবং খলিফা মুস্তারশিদ সুলতান মাসুদের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এবার খলিফা বাহিনী পরাজিত হয়; কিন্তু পুনরায় আমির ও মালিকদের চাপে পড়ে খলিফাকে স্বপদে বহাল রাখা হয় বটে, কিন্তু ১১৩৬ সালে খলিফাকে রাজকীয় তাবুতে মৃত্যু অবস্থায় পাওয়া যায়।[৮৩]

মুস্তারশিদ পুত্র আর রশিদ খেলাফতে সমাসীন হয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এতে খলিফার কোনো লাভ হয় নি বরং তার প্রাসাদ জনতা দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। স্পষ্টত সব ঘটনার অন্তরালে ছিলেন জঙ্গী; এরপর তিনি আর এক নতুন খেলায় মত্ত হন। যেহেতু জঙ্গীর সাথে সুলতান মাসুদের সম্পর্ক ভাল ছিল না এজন্য জঙ্গী মাসুদের স্থলে অন্য একজনকে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন। এবার মাসুদ বাগদাদ অবরোধ করেন। জঙ্গী বেশি দিন এ অবরোধ ঠেকাতে না পেরে

মোসুলে চলে যান। মাসুদ বাগদাদ দখল করেন এবং রশিদকে পদচ্যুত করেন। রশিদ ইসপাহানে চলে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে নিহত হন। আল মোক্তাফী খেলাফতে সমাসীন হন (১১৩৬-৬০ খ্রি.) সেলজুকিদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সুযোগে আল মোক্তাফী তার ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন এবং সমগ্র ইরাকের উপর তার প্রভাববলয় বিস্তারের প্রচেষ্টা চালান; কিন্তু সুলতানের বিদ্রোহীপুত্রের পক্ষ অবলম্বন করে মারাত্মক ভুল করেন। পুনশ্চ জঙ্গীদের চাপে সুলতান খলিফার সাথে আপোস করে পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করতে চলে যান।

১১৭১ সালে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। নুরুদ্দিন এবং সালাহউদ্দীন এ সময় মিশরের ফাতেমী বংশ উৎখাত করেন। সালাহউদ্দীন সুন্নি মুসলিম বিধায় মিশরে বাগদাদের খলিফা আল মুস্তাজীর নামে খোতবা পঠিত হয়। এতে কি খেলাফত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? তাঁর ইহলৌকিক ক্ষমতা বাগদাদ নগরের সীমানা অতিক্রম করে নি।[৮৪] আল মুস্তাজীর পর আন নাসির (১০৮০-২৫ খ্রি.) দীর্ঘদিন খেলাফতে সমাসীন ছিলেন। এ সময় এক দিকে খলিফার নামে মিশর এবং সিরয়ায় খোতবা পাঠ অন্যদিকে সেলজুকদের অভ্যন্তরীণ কলহ চলায় আন নাসির খুবই উৎসাহিত হয়ে তার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। নাসির সেলজুকী মেয়রকে বাগদাদ হতে বিতাড়িত করেন, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের উপর তাঁর প্রভাববলয় বিস্তার করতে যত্নবান হন। প্রথমত জনতার সামনে রাজকীয় জৌলুস প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন এবং একটি আন্দোলন সংগঠিত করেন। খলিফা ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির; তিনি দুজন উজিরকে হত্যা করেন। কলহরত সেলজুকদের ধ্বংসস্তূপে তার প্রভাববলয় প্রতিষ্ঠাকল্পে খাওয়ারিজম শাহ তাকাশকে (১১৭২-১২০০ খ্রি.) সেলজুক সুলতান দ্বিতীয় তুগ্রীলকে (১১৭৭-৯৪ খ্রি.) আক্রমণের আহ্বান জানান। উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধে তুগ্রিল ১১৯৪ সালে পরাজিত ও নিহত হন। সেই সাথে ইরাকি সেলজুক পরিবার ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ হতে চিরবিদায় গ্রহণ করে।

এভাবে বাগদাদ সেলজুক মুক্ত হয় বটে; কিন্তু খলিফা নাসির কি স্বাধীন হতে পেরেছিলেন? উদীয়মান খাওয়ারিজম শাহ কি বাগদাদ হাতছাড়া করতে পারেন? তিনি ও তাঁর পূর্বসূরি সেলজুকদের অনুসরণে স্বনামে মুদ্রা প্রকাশ করেন এবং বাগদাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা স্বহস্তে তুলে নেন। খলিফা তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যান, তাকে কেবল সুন্নি মুসলিমদের আধ্যাত্মিক প্রধান হিসেবে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাকাশ পুত্র আলাউদ্দিন মোহম্মদ শাহ আব্বাসী খেলাফত উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করেন। বাগদাদে মুসলিম ইমাম পদে জনৈক ফাতেমীকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। নাসির বাঁচার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চেঙ্গিস খানের সাহায্য কামনা করেন।

পূর্বাকাশে মঙ্গলদের অভ্যুদয়ে বাগদাদ নগরের পতন এবং একই সাথে খেলাফতের উৎখাত প্রত্যাসন্ন হয়—সে কাহিনী পরে আলোচিত হবে।

তথ্যপুঞ্জি

১. P. K. Hitti, History of the Arabs (London 1951) p. 473
২. Ibid p. 473
৩. Ibid p. 463
৪. M. A. Shaban, Islamic History VolI, (Cambridge University prees 1976), p. 174
৫. Hitti op cit p. 463
৬. সৈয়দ আমীর আলী, শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন,
৭. মুসা আনসারী 'ইসলামী সমাজ কাঠামোর রূপান্তর ধারা; ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা।
৮. Shaban, op. cit pp 90-91; 96, 102, 104-5
৯. Ibid, pp. 486-7
১০. Ibid, p. 182
১১. Ibid, p. 182
১২. Encyclopedia of Islam (London ....) p. 209
১৩. Saban, op. cit pp. 182-3
১৪. Hitti op cit. p. 479
১৫. Imamuddin S. M. A Political History of the Muslim VolI Part I p. 222
১৬. Hitti, op cit. p. 474
১৭. আমীর আলী, সৈয়দ প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৩
১৮. F. N. in Hitti, op cit p. 474
১৯. আমীর আলী, সৈয়দ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৩
২০. Hitti, op cit. p. 474-5
২১. Ibid, p. 475
২২. আমীর আলী সৈয়দ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০১
২৩. ঐ পৃ. ৩০৫-৬
২৪. ঐ পৃ. ৩০৬-৭
২৫. Hitti, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৭৬
২৬. আমীর আলী সৈয়দ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৮
২৭. Imumuddin S. M. op. cit, p. 224
২৮. আমীর আলী সৈয়দ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৮
২৯. Hitti, op cit. p. 476
৩০. Hitti, op cit. p. 476

৩১. আমীর আলী সৈয়দ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৯
৩২. ঐ পৃ. ৩০৯
৩৩. Hitti, op cit. p. 477
৩৪. আমীর আলী সৈয়দ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩১২
৩৫. ঐ পৃ. ৩০৯
৩৬. Hitti, op cit. p. 472
৩৭. S M Sharif, A History of Muslim philosophy pp. 774-49
৩৮. Siyasat Nama, ed. Ch. Schefer
৩৯. Shanf, op cit p 753
৪০. Ibid, p. 447
৪১. রাহুল সংস্কৃত্যায়ণ, দর্শন দিগদর্শন ১ম খণ্ড।
৪২. ঐ পৃ. ৬৭
৪৩. ঐ পৃ. ৬৭-৬৯
৪৪. Shanf, op. cit p 754
৪৫. Siyasat Nama, op cit p. 5
৪৬. Ibid, p 6
৪৭. Ibid, p 7
৪৮. Ibid, p. 8
৪৯. Ibid, p. 29
৫০. Wasaga Khawjah Nizamul mulk (Bombay 1887) pp 42-3
৫১. Siyasat, op cit. p. 9
৫২. Ibid, pp. 39, 43
৫৩. Ibid, p. 28
৫৪. Ibid, p. 28
৫৫. Ibid, p. 29
৫৬. Ibid, p. 119
৫৭. Ibid, p. 7
৫৮. Ibid, p. 54
৫৯. Ibid, p. 58
৬০. Ibid, p. 26
৬১. Ibid, pp. 38-41
৬২. Ibid, p. 43
৬৩. Ibid, p. 18
৬৪. Waniyn, op. cit. p. 11
৬৫. Ibid, p. 13
৬৬. Ibid, pp. 16-17

৬৭. Ibid, pp 22-23
৬৮. Ibid, pp 27-28
৬৯. Ibid, p 55
৭০. P K Hitti, op cit p 410
৭১. Ibid, p 416
৭২. Ibid, p 411
৭৩. আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০
৭৪. Hitti, op cit, 446
৭৫. আমীব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০
৭৬. Sharif, op cit, 748
৭৭. Hitti, op cit, 446
৭৮. আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩
৭৯. ঐ পৃ. ৩১০
৮০. ঐ পৃ. ৩১১
৮১. Hitti, op cit, 447
৮২. Imamamuddin, op cit, 229
৮৩. Ibid, p 229
৮৪. Ibid, p 230

একাদশ অধ্যায়

বাগদাদের পতন

বাগদাদ তথা আব্বাসী খেলাফতের অন্তিমলগ্নে নিম্নলিখিত খলিফাগণ খেলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন।

৩৪. আন নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রি.)
৩৫. আজ জহির (১২২৫-১২২৬ খ্রি.)
৩৫. আল মুস্তানসির (১২২৫-১২২৬ খ্রি.)
৩৭. আল মুস্তাসিম (১২৪২-১২৫৮ খ্রি.)

পূর্বের দুটি অধ্যায়ে দুটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। একটি অধ্যায়ে তুর্কি জাতিসত্তার অভ্যুদয়, তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, বাগদাদের খলিফার সাথে তাদের সম্পর্ক, মালিক শাহের মৃত্যুর পর সেলজুকদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যের বাঁটওয়ারা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য একটি অধ্যায়ে ইউরোপে সিরিয়ার উপর ক্রুসেড পরিচালিনা এবং পশ্চিম এশিয়ার বাস্তব অবস্থা আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত গাজি সুলতান সালাহউদ্দীনের সময় মিশর হতে ফাতেমী বংশের উৎখাত এবং জুমার খোতবায় ফাতেমী খলিফার পরিবর্তে বাগদাদ খলিফার নাম পাঠ, আরব, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশরের ঐক্যভবন, পুনশ্চ পশ্চিম এশিয়ায় সালাহউদ্দীনের সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়া সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে খলিফা আন নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রি.) আপনাকে সেলজুক কর্তৃত্ব হতে মুক্ত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন এবং যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আপন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সেলজুকদের বিরুদ্ধে খাওয়ারিজম শাহের সাহায্য চেয়েছিলেন।[১] এতদসত্ত্বেও তাঁর বাস্তব অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি। সে সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ায় যখন ঐসব ঘটনা সংঘটিত হয়, সে সময় প্রাচ্য অঞ্চলেও অভূতপূর্ব এবং অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে। দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে প্রাচ্য হতে এক নয়া শক্তির অভ্যুদয় হয় এবং ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। এই নয়া শক্তি ছিল মোঙ্গল জাতিসত্তা। এদের অভ্যুদয়ে বাগদাদের পতন প্রত্যাসন্ন হয়ে ওঠে। বাগদাদ পতন প্রাক্কালে প্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাগদাদের প্রাচ্যাঞ্চল বিভিন্ন শক্তির উত্থান ও পতন ঘটতে দেখা যায়।

পারস্যের মহান সেলজুক রাজ্যের পতন প্রাক্কালে খাওয়ারিজম (খিবা) রাজ্যের উত্থান ঘটে। সেলজুক সুলতান মালিক শাহ তার প্রাসাদাধ্যক্ষ মুসাতাগীনকে

খাওয়ারিজম প্রদেশ জায়গীর হিসেবে দেন। নুসাতাগীন পুত্র কুতুবুদ্দীন মহম্মদ পারস্যের সেলজুক সুলতান সঞ্জরের নিকট হতে খাওয়ারিজম শাহ উপাধি লাভ করেন। মহম্মদ পুত্র আতসিজ সুলতান সঞ্জরেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং সঞ্জরের রাজত্বের শেষ দিকে তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হযে ওঠেন। আতসিজের দৌহিত্র তাকাশ ইরাক-আজমকে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সঞ্জরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও পারস্য সুলতান তুঘরিলকে হত্যা করে পারস্য, খাওয়ারিজম ও খোরাসানের অধিপতি হন। তাকাশের উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীন মোহম্মদ বলখ হেরাত জয় করে খোরাসানের শাসনাধিকার সম্পূর্ণ করেন। তাঁর বিশাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় মাজেন্দ্রান, কিরমান, গজনি এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানা। ১২১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাগদাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন; কিন্তু হামদানের নিকটবর্তী স্থানে তাব সৈন্যদল তুষার ঝড়ে পতিত হয়। বাগদাদেব দিকে অগ্রসর না হয়ে তিনি তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে।[২] এ দফা বাগদাদ বেঁচে যায়। খাওয়ারিজম রাজ্য মোঙ্গল দ্বারা আক্রান্ত হয়—সে কথা পরে আলোচনা করা হবে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ১১৫০ সালে পূর্ব আফগানিস্তানে ঘোরী বংশের অভ্যুদয় ঘটে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তাঁকে জাহান সুজ বা বিশ্ব দগ্ধকারী বলা হয়। তিনি গজনি লুণ্ঠন করেন এবং সবুক্তগীনের বংশধরদেরকে ভারতের লাহোরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। তাঁর উত্থানকালে পারস্যে সেলজুক সুলতান সঞ্জর পূর্ণ ক্ষমতায় সমাসীন থাকায় আলাউদ্দিন পারস্য রাজ্যের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস করেন নি। তিনি তার উদ্যামের পথ খোঁজেন ভারতের দিকে। ১১৫৬ সালে আলাউদ্দিন প্রয়াত হলে পুত্র সইফুদ্দীন তার উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু আলাউদ্দীন ইহলোক ত্যাগ করলে তার পিতৃব্যপুত্র গিয়াসউদ্দিন ১১৬৩ সালে ঘোরী সুলতান পদে অধিষ্টিত হয়ে গজনীকে চূড়ান্তভাবে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তদীয় ভ্রাতা শিহাবুদ্দীন (যিনি মুইজুদ্দীন মহম্মদ বিন সাম বলে ইতিহাসে পরিচিত), ভারত অভিযান শুরু করেন। তরাইন যুদ্ধে ভারতের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হলে কুতুবুদ্দীন আইবকের নেতৃত্বে ১২০৬ সালে বিখ্যাত দিল্লী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

মুসলিম প্রাচ্য অঞ্চলে যখন এ রকম বিভিন্ন রাজ্যের উত্থানপতন সংঘটিত হয়, ঠিক এই সময় ফারাগানার পূর্ব সীমান্ত থেকে সুদূর আমুর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবরর অর্ধযাযাবর মঙ্গল জাতিসত্তার অভ্যুদয় প্রক্রিয়া শুরু হয়। চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে এই নয়া শক্তির উত্থান ঘটে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল তেমুজিন। তিনি ১১৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে পিতার গোত্রীয় কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি তার গোত্রীয় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমগ্র মোঙ্গল জাতিসত্তাকে একিভূত করে একটি নয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] ১২১৮ সালে তার রাজ্যসীমা পশ্চিমে খাওয়ারিজম অবধি বিস্তৃত হয়; উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক। তাদের সহ অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কথিত আছে খাওয়ারিজম রাজ্যের সীমান্তবর্তী একটি

শহরের জনৈক শাসনকর্তা মোঙ্গল রাজ্য হতে আগত একদল বণিককে গুপ্তচর বৃত্তির অজুহাতে হত্যা করে তাদের মালামাল আটক করে। মোঙ্গলরা দোষী শাসন কর্তাকে তাদের হাতে সমর্পণ করার দাবি করে। মঙ্গলদের দাবি উপেক্ষা করে মঙ্গল দূতকে হত্যা করা হয়। এই অবমাননাকর সংবাদ পেয়েই চেঙ্গিস খান হাজার হাজার সৈনিকের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ফারাগানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথম আঘাতে খোজান্দ ভূমিস্মাৎ হয়, এর অধিবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সুগদ নদীর তীরে অবস্থিত কয়েক মাইলব্যাপী প্রাসাদ, প্রমোদোদ্যান ও বাগবাগিচা দ্বারা সজ্জিত প্রাচ্য সাম্রাজ্যের বিখ্যাত শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্র বোখারা ভস্মীভূত হয়। এই শিক্ষা কেন্দ্রের লুণ্ঠন সম্পর্কে ইবনুল আসির এক হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। সুগদ উপত্যকার মধ্যে দিয়ে তারা উপনীত হয় সমরকন্দে। সমরকন্দ কেবল ট্রান্সঅক্সিয়ানার রাজধানী ছিল না, সেদিনের বিশ্ব-বাণিজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রও ছিল। এর পরিধি ছিল তিন মাইল; বারটি লৌহফটক সমন্বিত প্রাচীব ও মাঝে মাঝে দুর্গ দ্বারা ছিল পরিবেষ্টিত। এর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,১০,০০০। মোঙ্গলরা নগরটি অববোধ করেন। ১২১৯ সালে জুন মাসে নগরটি আত্মসমর্পণ করে; কিন্তু লুণ্ঠন এড়ানো যায় নি। নগরের অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। নগরের ৩০ হাজার শিল্পীকে দাসে পরিণত করে তাদেরকে চেঙ্গিস খান তার সন্তানদের মধ্যে বন্টন করেন। দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সম্ভবত মাত্র ৫০ হাজার ব্যক্তি জীবিত ছিল। বোখারা ও সমরকন্দের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখে বলখের অধিবাসীরা তাদের উপর আক্রমণের পূর্বেই চেঙ্গিসকে উপঢৌকন দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। এতদসত্ত্বেও তারা হত্যাযজ্ঞ হতে নিষ্কৃতি পায় নি। গণনার অজুহাতে নগরবাসীকে নগরের বাইরে এনে হত্যা করা হয়। নগরটি ভস্মীভূত করা হয়। ১২২১ সালে সেলজুক রাজধানী নিশাপুর ধ্বংস করা হয়। মীর খান্দের মতে নিশাপুর ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির হত্যাকাণ্ডে ১৭,৪৭,০০০ লোক জীবন হারায়। হেরাত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তারা এক সপ্তাহ ধরে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এই হত্যাযজ্ঞে প্রায় ১৬,০০,০০০ লোক প্রাণ হারায়।[৫]

খাওয়ারিজম রাজ্যে মোঙ্গলদের প্রবল পরাক্রমে এরূপ আগ্রাসন পরিচালিত হলেও খাওয়ারিজম শাহ কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়তে পারেন নি। তিনি স্বয়ং রাজধানী ত্যাগ করে চর্তুদিকে ছুটাছুটি করে বেড়ান। শত্রু পক্ষ তার পশ্চাদ্ধাবন করে। তার পরিবার বর্গ ধরা পড়ে এবং শত্রুর হাতে প্রায় সকলেই নিতহ হয়। সম্রাটের তিন পুত্র রক্ষা পান। তাদের একজন একাকী মোঙ্গলদের সামান্য বাধা দান করতে সমর্থ হন। মোহম্মদ আশ্রয় নেন ক্যাস্পিয়ান সাগরের একটি দ্বীপে। সেখানেই তিনি একাকী ও পারিত্যক্ত অবস্থায় প্রয়াত হন। তাঁর বীরপুত্র জালালুউদ্দীনকে তারা অনুসরণ করে। তিনি খাওয়ারিজম, নেহাবন্দ ও গজনির পথে প্রান্তরে ছুটোছুটি করে কিছু নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং দুটি যুদ্ধে মোঙ্গলদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হন।

অবশেষে চেঙ্গিস খান স্বয়ং জালালের অনুসরণ করেন। জালাল যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে ভারতবর্ষে পলায়ন করেন। চেঙ্গিস খান সিন্ধু নদ অতিক্রম করতে না পেরে ভারত ত্যাগ করেন। উদীয়মান বলবনী দিল্লী সালতানাত মোঙ্গল আক্রমণ হতে রেহাই পায়।[৬]

মধ্য এশিয়ায় অশ্রুতপূর্ব ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত করে মোঙ্গলরা সামাররায় উপনীত হয়; কিন্তু ১২৪১ সালে চেঙ্গিসের জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুতে মোঙ্গলরা আর অগ্রসর হয় নি। এভাবে আকস্মিকভাবেই ১২৪১ সালে পশ্চিম এশিয়া তার আক্রমণ হতে রক্ষা পায়। সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলের ধ্বংসযজ্ঞের কথা বলতে গিয়ে সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক ইবনুল আসিরের শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং বিলাপের সুরে তিনি বলেন যে, তিনি যদি পৃথিবীতে ভূমিষ্ট না হতেন তা হলে ভালই হত! ঐ দুঃখজনক ঘটনা তাকে দেখতে হতনা। প্রায় একশ বছর পর ইবনে বতুতা বোখারা, সমরকন্দ, বলখ এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানা ভ্রমণকালে তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। চেঙ্গিস খানেব অভিযানের উপর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।[৭] Before them the Cultural Centres of eastern Islam were practically wiped out of existence, baring bare deserts or shapeless ruins where formerly stately places and libraries had lifted their heads A crimson stream marked their trail Out of a population of 190000 Hirat was left wrth 40,000; The mosque of Bukhara famed for piety, and learning served as stables for mongolian horses Many of the inhabitahts of Samarkand, Balkh were either butchered of carried into captirity . khawarism was utterly devestated. al the capture of Bukhara (1219) Chengis is reported by a late tradition to have described him self in a speach as the scourge of God sent to man as panishment for their sin.[৮] চেঙ্গিসের মধ্য এশিয়া ধ্বংসযজ্ঞ প্রসঙ্গে আমীর আলীর একটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মনে করেন যে, মোঙ্গল অভ্যুত্থান মধ্য এশিয়ায় মননশীল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। পারস্য ধীরে ধীরে তাদের দুর্ভাগ্য কাটিয়ে উঠলেও বোখারা ও সমরকন্দ তাদের পূর্ববর্তী মানসিক কর্মতৎপরতা ফিরে পায় নি এবং এখান থেকেই তাদের মননশীল কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে কূটধর্মতত্ত্ব ও মবমিবাদে নিয়োজিত হয়।[৯]

চেঙ্গিস খান সামাররা ত্যাগ করার পর হতে বাগদাদের খলিফার অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভাল হওযার কথা। তাদের উপর হতে সেলজুক প্রভুত্ব শেষ হয়, তবে এখনও তাঁর ক্ষমতা বাগদাদ নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মিশর ও সিরিয়ায় আইয়ুবী শাসন ১২৪৯ সাল পর্যন্ত থাকলেও ঐ বছর সালেহ্ আইয়ুবীর মৃত্যুর পর মামলুক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়; আরব ও ইরাকের ছোট ছোট স্থানীয় প্রভাবশালী গোত্রপতিদের অধীন সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয় নি; তাই মোঙ্গল আধিপত্যের দ্বারা বহির্ভূত ইসলামি দেশ অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতি

পরিচালিত হয়। বাগদাদের চতুর্পার্শ্বে এরূপ আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিদ্যমান থাকায় বাগদাদ কোনক্রমেই স্থবিরতামুক্ত হতে পারে নি এবং ১২৪১ সালের পর হতে কয়েক বছর ধরে মঙ্গল আতঙ্ক থাকে নি বটে, কিন্তু বাগদাদের অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বরং অবনতি ঘটে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমাজে প্রভাব বিস্তার করে; হাম্বলীরা অবিরাম গোলযোগের উৎস হিসেবে কাজ করে।[১০] হাম্বলী-হানাফী দ্বন্দ্বের সাথে শিয়া-সুন্নি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাগদাদের নগর জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকারী যথেষ্ট পুলিশ বা সেনাবাহিনী পালন করার উপায় ছিল না বলে মোতাসিম সেনা-বাহিনী ভেঙ্গে দেন। শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে এক দাঙ্গার ফলে শিয়া অধ্যুষিত কার্থ শহরতলী সরকারি আদেশে ধ্বংস করা হয় এবং শিয়াদের উপর নানা নির্যাতন চালান হয়।

বাগদাদ নগরের এরূপ আর্থ-সামাজিক অস্থির অবস্থার প্রেক্ষিতে পুনরায় মোঙ্গল আক্রমণের আতঙ্ক দেখা দেয়। এ সময় মুসলিম প্রাচ্য অঞ্চল মোঙ্গল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও পারস্যে এ্যাসাসিনরা শান্তি শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ালে পারস্যের মোঙ্গল শাসনকর্তা চেঙ্গিস ভ্রাতা মঙ্গুখান ভ্রাতুষ্পুত্র হালাকুখানকে এ্যাসাসিনদের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানের নির্দেশ দান করেন। হালাকুখান বিপুল বাহিনী নিয়ে মঙ্গোলিয়া ত্যাগ করেন এবং প্রথমে খাওয়ারিজম রাজ্য ধ্বংসের পর যে সব ছোট ছোট রাজ্যের মাথা গজাতে শুরু করে তাদেরকে দমন করেন এবং এ্যাসাসিনদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালানোর জন্য খলিফাকে তার কাজে সাহায্য করার আমন্ত্রণ জানান।[১১] কিন্তু খলিফার নিকট হতে কোনো সাড়া আসে নি। যা হোক ১২৫৬ সালে এ্যাসাসিনদের প্রধান কেল্লা আলমুতসহ তাদের অধিকাংশ ঘাঁটি গুড়িয়ে দেয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে হালাকুর নির্মূল অভিযান সফল হয়। ১২৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোঙ্গল বাহিনী তাব্রিজ অভিমুখে যাত্রা করে এবং খলিফার নিকট নিম্নের বার্তাসহ কয়েকজন দূত পাঠান: "যখন আমরা রুদবারে অভিযান করি তখন আমরা সাহায্য চেয়ে তোমার কাছে দূত পাঠিয়েছিলাম, তুমি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, কিন্তু কোনো লোক পাঠাও নি।" এক্ষণে আমরা তোমার আচরণ পরিবর্তন এবং অবাধ্যতা পরিহার করতে অনুরোধ করছি। কারণ তা কেবল তোমার সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যের ক্ষতিই করবে।[১২] বস্তুত ঐ দূতের দ্বারা খলিফাকে আত্মসমর্পণ করে নগর বহিঃপ্রকার ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। খলিফার তরফ হতে এবার একটি দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দেয়া হয়। ১২৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে মোঙ্গলরা রাজধানীর নগর প্রাকার ভাঙ্গার কার্যক্রম শুরু করে। দু একটি স্থানে ফাটল ধরাতে সমর্থ হলে শিয়া উজির আল মুয়াইদ আল কামী একজন খ্রিষ্টান যাজক সঙ্গে নিয়ে হালাকুখানের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান; সেই সাথে আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়েও আলোচনা করার আবেদন করেন; কিন্তু এবার হালাকুখান উজিরের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজি হন নি।[১৩] খলিফার পক্ষ হতে চতুর্দিকে প্রচার করা হয় যে, শান্তিধাম অথবা আব্বাসী খেলাফতের ধ্বংসকারীদের জন্য প্রচণ্ড বিপদ

অপেক্ষা করছে। হালাকুকে জানান হয় "If the Caliph is Killed the whole univese is disorganized, the sun hides its face, rains cease and plants grow no more." রশিদুদ্দীন ফজলুল্লার বরাত দিয়ে হিট্টি লেখেন—হালাকুখান এসব প্রচারে আদৌ কান দেন নি, কেননা তার গণৎকার তাকে কম উৎসাহ দেয় নি। বরং তার বিজয় সুনিশ্চিত বলে বলা হয়েছিল। ১০ ফেব্রুয়ারি হালাকু বাহিনী নগরের মধ্যে প্রবেশ করে। এ সময় স্বয়ং খলিফা তার তিনশ সহচরসহ আত্মসমর্পণ করতে হালাকুর নিকট গমন করেন; কিন্তু তাদের সকলকে হত্যা করা হয়।[১৪] কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে ভয়াবহ লুণ্ঠন, হত্যা, মানবতার অবমাননা। প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধিসৌধগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করা হয়। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ইবনে খলদুন মনে করেন যে, নগরের বিশ লক্ষের মধ্যে ষোল লক্ষ প্রাণ হারায়। ইবনুল আসির জুওয়াইনী, আব্দুল লতিফ আরো আনেকে ঐ লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।[১৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইবনে খলদুন, আবুল ফিদা, মাকরেজী, সুয়ুতী, মীর খাওন্দ এবং ওয়াসসাফ প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, শিয়াদের উপর খলিফার অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে উজির মুয়াইদুদ্দীন মহম্মদ বিন আল কামী মোঙ্গলদেরকে বাগদাদ আক্রমণে প্রলুব্ধ করেন। অথচ রশিদুদ্দীন ফজলুল্লাহ বলেন যে, উজির আল কামী দেশ রক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন; কিন্তু মোতাসিম বিল্লাহ ছিলেন উদাসীন; উজিরের কোনো পরামর্শ কাজে আসে নি। বস্তুত মোঙ্গলদের প্রবণতা লক্ষ্য করলে কি বুঝতে অসুবিধে হয় যে, তারা কেন বাগদাদ আক্রমণ করবে না? বাগদাদের পতন ছিল মোঙ্গলদের একান্ত কাম্য।

তথ্যপুঞ্জি

১. Hitti, op cit p. 481
২. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯-৮০
৩. Dr. Majumdar & others, An Adanced History of India (Cal 1953) p. 227
৪. Spular, Turkstan, p.-20
৫. আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৫-৬
৬. আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৭-৮৮
৭. Hitti, op cit p. 483
৮. Ibid p. 482-3
৯. আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৮
১০. ঐ পৃ. ৩৮৯
১১. Hitti, op cit p. 486
১২. আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৯
১৩. Hitti, op cit p. 487
১৪. Ibid p. 487
১৫. আমীর আলী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯১-৯২

দ্বাদশ অধ্যায়

আব্বাসী রাষ্ট্র : সমাজ : সংস্কৃতি

১২.১ আব্বাসী খেলাফতের রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য : শাসন চরিত্র

আব্বাসী এবং উমাইয়া খেলাফতের মধ্যে কি কোনো মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান ছিল? আরব উপদ্বীপে ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার পর খোলাফায়েরাশেদিনের শাসনকাল মাত্র ত্রিশ বছর (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) স্থায়ী হয়; উমাইয়া খেলাফত স্থায়ী হয় প্রায় নব্বই বছর (৬৬১-৭৫০ খ্রি.), অথচ আব্বাসী খেলাফত অন্তত তত্ত্বগতভাবে বাগদাদে প্রায় পাঁচশ বছর (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) টিকে থাকে।

শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে প্রথমোক্ত শাসন ব্যবস্থা হতে শেষোক্ত শাসন ব্যবস্থাদ্বয়ের মধ্যে বেশ বড় রকমের মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় খোলাফায়েরাশেদিন শাসন ব্যবস্থা ছিল এক ধরনের প্রজাতান্ত্রিক (Republicanistic), উমাইয়া এবং আব্বাসী শাসনদ্বয় ছিল মূলত রাজতান্ত্রিক (Monarchical), নাম যাই হোক না কেন! প্রজাতান্ত্রিক যুগে আরব জাতির সামনে দেশজয়ের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়; একই সাথে তার আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের শুভ সূচনা হয়। দ্রুত বিকাশমান আরব জাতিকে যে নয়া চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তাব মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বা ঐতিহ্য কোনটাই হেজাজী আরবদের ছিল না। খোলাফায়েরাশেদিন যুগে ইসলামি বৈপ্লবিক চেতনা সমুজ্জ্বল থাকা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় প্রথমত অবদমিত গোত্রবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত আরবদের বিস্ময়কর দেশ বিজয়ের ফলশ্রুতিতে আরব আজম (অনারব) এর মধ্যকার এক নবতর দ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটে। তৃতীয়ত স্বল্প সময়ে তাদের যে অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটে একই সাথে সামাজিক অগ্রগতি বনাম সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতা তথা বেদুইন জীবনের সাথে দ্রুত উদীয়মান নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরূপ বিকাশমান পরিস্থিতিতে খলিফা নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান না থাকায় উল্লিখিত প্রধান দ্বন্দ্বত্রয় উত্তরাধিকার সমস্যার বড়খাতে প্রবাহিত হয়; সমগ্র প্রজাতন্ত্র অকল্পনীয় গৃহযুদ্ধে নিপতিত হয়। এরূপ অস্থির পরিস্থিতিতে সিরিয়ার দক্ষ এবং অভিজ্ঞ প্রশাসক মোয়াবিয়া খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি আপন পুত্র ইয়াজিদকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে আপাতত উত্তরাধিকার সমস্যার সমাধান করেন। এ ব্যবস্থা পারস্য অথবা বাইজানটাইন মডেলের সাথে সামঞ্জস্য থাকলেও হেজাজী ঐতিহ্যে এর কোনো নজির ছিল না। যা হোক প্রজাতন্ত্রের পতন ও উমাইয়া বংশের উত্থান এভাবে ঘটে।

উমাইয়াদের গৌরব গাথা সর্বজনবিদিত। আরব ভূখণ্ডে হাশেমী গোত্র, তাদের সহযোগী শিয়া দল এবং বেদুইন ভাবাদর্শের ধারক বাহক খারেজী দল প্রত্যেকে তার স্ব স্ব কারণে উমাইয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। তারা প্রথম হতে অব্যাহত গতিতে উমাইয়া-বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করে।

উমাইয়াদের সৃষ্ট মধ্যযুগের অবিশ্বাস্য বিশাল সাম্রাজ্যের শক্তি ও স্নায়ুকেন্দ্র ছিল দামাস্কাস। আরব গোত্রবাদে নতি স্বীকার না করে মোয়াবিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ সমগ্র সিরিয়া প্রদেশে ও মিশরে বাইজানটাইন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন। এখানে গ্রিকো-রোমক দাসতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংশোধিত আকারে চালু রাখেন। অথচ সাম্রাজ্যের প্রাচ্যাঞ্চলে মেসোপটেমিয়া এবং পারস্য শাসিত হয় স্থানীয় পারসিক সামন্ততান্ত্রিক মডেলে। উমাইয়া শাসকবর্গ তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের আরবিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে; কিন্তু ঐতিহ্য সচেতন পারস্য এ নীতি কখনো মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। তদুপরি পারস্যে তাদের রাজস্ব নীতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পারস্যের নয়া মুসলিম সমাজ মাওয়ালী আন্দোলন শুরু করে। দ্রুত মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে উমাইয়া বিরোধী শক্তির উত্থান ঘটে। উমাইয়া বিরোধীদের ধারণা হয় যে, উমাইয়া বংশ তাদেরকে ইসলামি ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত করেছে। আরব বিজয়ের ফলে অনারবদের মধ্যে যতখানি সামাজিক ও আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-অন্তত আরব-অনারব মুসলিমদের মধ্যেও সেরূপ সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল; কিন্তু উমাইয়া যুগে আরব প্রাধান্যের ফলে ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এতদাঞ্চলে আরব বিজয়ের ফলে অনারব জনতা যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল—অধিকতর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে তারা অধিকতর সমাজ সচেতন হয়ে অনুধাবন করে যে, আরব প্রাধান্যের কারণে তারা আরবদের সমসামাজিক মর্যাদা হতে বঞ্চিত। এরূপ অবস্থা হতে বস্তুত সিরিয়া বনাম মেসোপটেমিয়া-পারস্য ব্যাপক সংঘাতের জন্ম নেয়। ইসলামের সামাজিক নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষে হাশেমী নামে এ অঞ্চল সকল উমাইয়াবিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেই ৭৫০ সালে আব্বাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়; এভাবে উমাইয়াদের পতন এবং আব্বাসীদের উত্থান হয়। এ বিপ্লবকে নিছক পারিবারিক বিপ্লব বললে তার সঠিক মূল্যায়ন হয় না।[১] আব্বাসী বিপ্লবে অনারব পারস্যই ছিল চালিকা শক্তি। তাদেরকে এ বিপ্লবে সম্পৃক্ত করার জন্য আরবদের সাথে ইসলাম প্রদত্ত সম সামাজিক মর্যাদা দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়।[২] এ বিপ্লবের অভিনবত্ব লক্ষ্য করে প্রফেসর হিট্টি একে অভিনব শাসন (Dawla) বলে অভিহিত করেন। সিরিয়ার পতন, পারস্যের উত্থান বা আরব প্রাধান্যের অবসান প্রক্রিয়া এবং অনারব শক্তির ক্রমউত্থানই এ বিপ্লবের মর্মবস্তু। তিনি বলেন : Abbasid government called it self dowlah, a new era, and a new era it was. the Iraqis felt freed from syrian tutalege... the clients became emancipated...Khusasanian formed the caliphat body guard and Persian Occupied

the chicf posts in the government. The original Arabian aristocracy was replaced by a hierarchiy offices drawn from the whole gamut of races under the Caliphate. The old Arabian Moslems and the new foreigin converts were begining to coalese and shape off into each other.[৩] ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া শাসনকে ওয়েলহাউজেন আরব রাজ্য (Arab Kingdom) বলে আখ্যায়িত করেছেন; তাঁর রচিত Arab Kingdom and its fall পুস্তকটির এটাই প্রতিপাদ্য বিষয় বললে অত্যুক্তি হয় না।[৪] নিঃসন্দেহে উমাইয়া শাসন আমলে রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বত্র আরব নেতৃত্বের প্রধান্য ছিল। প্রজাতান্ত্রিক আমলের মত এ সময় আরবরাই ছিল কায়েমী স্বার্থভোগী জাতি। আব্বাসী আমলে অনারব জাতিসত্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দু শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দু ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকলেও উমাইয়া এবং আব্বাসী উভয়ই ছিল বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রী; প্রজাতান্ত্রিক নয়। হাজার সমালোচনা থাকলেও উমাইয়া প্রতিষ্ঠিত শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্যই আব্বাসীরা অনুসরণ করে, অবশ্য তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। এদিক থেকে বিচার করলে উভয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল না। অনেকে আবার উমাইয়া শাসনকে মুলক বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন।[৪] পক্ষান্তরে বার্নাড লিউইস আব্বাসী শাসনকে ইসলামি সাম্রাজ্য (Islamic Empire) বলে আখ্যায়িত করেন। ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে উভয় বংশের শাসন পদ্ধতিতে কি কোনো গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে। মধ্যযুগে মহান রাজা বাদশাহদের অনেকেই বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও ঔদার্য দেখাতে পারেন সত্য তাই বলে তারা ধর্ম- নিরপেক্ষ নীতির অনুসরণ করেন বললে ঐতিহাসিকভাবে তা সঠিক নয়। মধ্যযুগে সমগ্র মূল্যবোধ অনেকাংশে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। উভয় বংশের খলিফাগণ একইভাবে ইহলৌকিক জীবন উপভোগ করতে ভাল বাসতেন; অনেকে ব্যক্তি জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন; এটা ছিল ব্যতিক্রম মাত্র। উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় উমরের মত ধার্মিক আব্বাসী বংশের কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। সামগ্রিকভাবে উমাইয়াগণের বহিরাঙ্গনে আব্বাসীদের মত ধর্মের বাড়াবাড়ি ছিল না; নানা জাতি-ধর্ম সম্প্রদায় অধ্যুষিত বিশাল সাম্রাজ্যে শাসন পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখলেও মূলত তারাও ধর্মকে উপেক্ষা করেন নি। আব্বাসী খলিফাদের অনেকে ব্যক্তিজীবনে আদৌ ধর্মপরায়ণ না হলেও তারা খেলাফত প্রতিষ্ঠানটির উপর বাহ্যিক ধর্মীয় প্রলেপ দিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনে, প্রতি শুক্রবারে মহানবীর পোশাক পরিধান, তাঁর যষ্টি ধারণ, জুমার নামাজে ইমামতি করা, ধর্মবেত্তাদের দ্বারা কখনো কখনো পরিবৃত্ত হওয়া, ধর্ম বিরোধী মতাদর্শ প্রতিহত করার প্রচেষ্টা, শাস্ত্রজ্ঞদের পরিপোষণ করা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের উপদেশ শ্রবণ করা—এ কাজগুলো তাঁরা সতর্কতার সাথে করতেন। প্রচার মারফত জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পুনশ্চ হিট্টি বলেন : As a mark of the reli-

gious character of this exalted office, the Caliph now donned on such ceremonial occasions as the day of his accession and the time of the friday prayers the manttle (burdah) once worn by his distant causin, the Prophet. He surrounded himself with men versed in canon law whom he patronized and whose advice on matters of state affairs he sanght.[৬] তারা এমন ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করে যে, আব্বাসীরা যেহেতু আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত তাদেরকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করলে পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, এবং ঐ বংশই কেবল আখেরি জামানায় ইসা মসিহের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। তাদের ধর্মীয় আচরণ ও ব্যক্তি জীবনের পর্যালোচনা করে হিট্টি বলেন : The religious change was more apparent than real, al though unlike his Umayyad pedecessor he assumed piety and feigned religiosity the Bagded caliph proved as worldly minded as he of Damasus whom he had displaced আব্বাসী খলিফাদেব নামকরণের মধ্যেও তাদের ধর্মীয় আচরণের প্রকাশ ঘটে। খেলাফত প্রতিষ্ঠানটিব এ রূপ ধর্মীয় রূপদানের ফলে বংশের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত হয়। উভয় বংশেব মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; উমাইয়ারা ছিলেন কেবল আরব জাতীয়তার প্রতিনিধি, আব্বাসীরা ছিলেন অনেকাংশে ধর্মীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী।

এ সব সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্যের বাইবে তাদের অস্তিত্বের স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। বস্তুত আব্বাসী খেলাফত ৭৫০-৮৪৭ সালে ওয়াসিক বিল্লাহের মৃত্যু পর্যন্ত সগৌরবে টিকে থাকে। এটা ছিল তাদের সুবর্ণযুগ। এটা ছিল বাগদাদ খলিফাদের রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের যুগ। এর পর ৮৪৭-৯৩৬ সালে আমিরুল উমারা পদ সৃষ্টি না হওয়া অবধি এক নাগাড় ৭৬ বছর চলে প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংকটকাল এবং রাজনৈতিক খেলাফতের অবক্ষয়কাল; এ সময় খলিফাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা শূন্যের কোঠায় উঠলে খলিফার রাজনৈতিক ক্ষমতা কে গ্রহণ করবে—এ নিয়ে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের পালা। এই রাজনৈতিক সংকটকালে খলিফা তার অস্তিত্ব কোনো রকম টিকিয়ে রাখলেও ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করা বা নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা তার ছিল না।[৭] তাই এই সংকটকালটি হল সামরিক ও বেসামারিক আমলাদের যুগ্ম স্বৈরতন্ত্রের যুগ।[৮] অবশেষে খলিফা আররাজী অনুন্যোপায় হয়ে আমীরুল উমারা পদ সৃষ্টি করে ক্ষমতাবান সমর নেতাকে উক্ত পদে বহাল করে তার হাতে সকল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ঘটনা ঘটে ৯২৩ সালে। এ সময় সামরিক শক্তি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা তখনো ক্ষমতা একীভূত করতে সমর্থ হয় নি।[৯] বেসামরিক ও সামরিক আমলাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত থাকে এবং রাজনৈতিক ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকে। ৯৪৬-১০৫৫ পর্যন্ত ইরানি জাতিসত্তার বুওয়াইহী বংশ এবং ১০৫৫-১১৯৪ সাল পর্যন্ত সেলজুক জাতিসত্তা বাগদাদ দখল করে খলিফার সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং সালতানাত বা জাহানদারি প্রতিষ্ঠা

করে। বস্তুত ৯৪৬ সাল হতে বাগদাদের খলিফা কেবল সুন্নি মুসলিমদের ধর্মীয় প্রধান বা আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে বিবেচিত হন। খলিফা বাগদাদ নগর ও তার আশপাশের একজন বড় সামন্ত হিসেবে টিকে থাকেন। আব্বাসী খলিফাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আধ্যাত্মিক খেলাফতের পাশে অনারব সালতানাত বা জাহানদারির ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ইসলামি বিশ্বে এটাই সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে। অনারব মুসলিমরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দু' খেলাফতের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। উমাইয়রা ছিল সম্প্রসারণবাদী অথচ আব্বাসী ছিল মূলত শান্তিবাদী। আব্বাসীরা তাদের গৌরবময় যুগেও সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করে নি। তারা তাদের সীমান্ত রক্ষার প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখত, এ কারণে কয়েক দফা বাইজানটাইনদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়।

দেশ জয়ের গৌরব না থাকলেও দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান খুবই উজ্জ্বল। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সভ্যতার ইতিহাসে মধ্যযুগে তারা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র আলোচনা করা হবে। তারা সম্প্রসারণ নীতির পরিবর্তে সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়ীকরণনীতি অবলম্বন করে বটে, তবে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্লাবনের ক্ষতির দিকটি প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়—তাই তাদের সাফল্যের দিকটি যেমন বিস্ময়কর—তেমনি তাদের ব্যর্থতাও পর্বতপ্রমাণ।

ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহে প্রথম হতে আব্বাসী খলিফাগণ যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নীতি অবলম্বন করেন, তাতে প্রথমত সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিভিন্ন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে এবং অত্যন্ত নীরবে এ সব জাতিসত্তার জনতা ইসলাম গ্রহণ করায় দু'এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র আরব সাম্রাজ্য প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত দেশে পরিণত হয়; দ্বিতীয়ত সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলে কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটায় অসংখ্য নগর, শহর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং সমগ্র সাম্রাজ্য বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

এরূপ ব্যাপক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সাথে সাথে যে অসংখ্য নতুন সমস্যা দেখা দেয়—তার জন্য প্রয়োজন ছিল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্য বিধানের উপযোগী শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটানো এবং সর্বত্র অর্থনৈতিক ঐক্য বিধান করা। অথচ অর্থনৈতিক বিকাশে গ্রাম-সমাজ ও শহুরে সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। গ্রাম-সমাজ করভারে নুয়ে পড়ে, অথচ সম্পদশালীরা পায় নানা রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধে। এতে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আব্বাসী আমলের রাজনৈতিক সংকটে এটাই ছিল বড় কারণ। এই দৃষ্টিকোণ হতে বাবেক, জানজ ও কারামিতা বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল বিবেচ্য।

সাম্রাজ্যের নয়া আর্থ-সামাজিক বিকাশের ফলে বিভিন্ন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটায় অচিরে তাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়। তাদের সুবর্ণ যুগে

আন্তর্জাতিক প্রভাবে আঞ্চলিক স্বার্থ চেতনা এবং আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন দেখা দেয়। সাম্রাজ্যে এ এরূপ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন ছিল আব্বাসীরা তা করতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়। তারা সামরিক সমাধানের পথে অগ্রসর হয়। এতে দুটো কুফল দেখা দেয় ঃ প্রথমত কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায় এবং এ বাহিনীতে অনারব নেতৃত্বও প্রাধান্য পায়, দ্বিতীয়ত এ রূপ যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে করভার পড়ে উৎপাদকের উপর। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চল যদি তাদের আপন আপন নেতার নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতার পথ বেছে নেয় তবে সেটাই স্বাভাবিক। It is this development that explains the rise of the Tahirids, Samanids Saffarids, Ghaznavids, Tulunids Hamdamids.[১০] শাবানের এ মন্তব্যটি খুবই প্রণিধানযোগ্য।

উপরের আলোচনা হতে আব্বাসী রাষ্ট্রের নানা বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হয়েছে; তা হতে যদিও আরব রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয় করা অসম্ভব নয় তবুও সে সম্পর্কে দু একটি কথা আলোচনার দাবি রাখে। উল্লেখ্য সর্বযুগের সমাজ ও সভ্যতার মর্মবিস্তর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য ঐতিহাসিক কাল বিভাজন আবশ্যক। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের কাল বিভাজনে সকল নৃতত্ত্ববিদ মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক যুগে কাল বিভাজনের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হলো উৎপাদন প্রণালী। একথা সত্য যে, একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিককালে নানা ধরনের উৎপাদন প্রণালী সহঅবস্থান করতে পারে। তবুও যে উৎপাদন প্রণালী সমাজে প্রভাবশালী অবস্থান গ্রহণ করে সেটা দিয়েই ইতিহাসের বিশেষ কাল চিহ্নিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। ম্যাকসিম রডেস তার বিখ্যাত পুস্তক ইসলাম ও পুঁজিবাদ গ্রন্থে এই সত্যটি উপলব্ধি না করতে পারায় চিন্তার জগতে একটা বড় ধরনের জগাখিচুড়ি সৃষ্টি করেছেন। যা হোক উল্লিখিত প্রস্তাবনা গৃহীত হলে ইউরোপের ইতিহাসের কাল বিভাজন প্রশ্নটি সহজ হয়। গ্রিক সভ্যতার ভিত্তি ছিল ব্যাপক দাস প্রধান উৎপাদন প্রণালী। দাস ও মালিক এই ছিল তাদের উৎপাদন সম্পর্ক। বস্তুত গ্রিক জীবন আবর্তিত হয় দাস শ্রমের উপর। রোমক সভ্যতাও ছিল ঐ হেলেনী ব্যবস্থার বিকশিত রূপ। দাস ব্যবস্থার অবক্ষয়ে নতুন উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং দাস ব্যবস্থার পতনে সামন্ত উৎপাদন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থা সমাজ জীবনে আবর্তিত হয় ভূমি ব্যবস্থার উপর। এ সময় প্রধান উৎপাদন সম্পর্ক হয় ভৌমিক-কৃষক। এতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব হয়ে ওঠে শোষণের প্রধান হাতিয়ার। এ ব্যবস্থার পতনে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী গড়ে ওঠে। শিল্পপতি মালিক ও শ্রমিক এই উৎপাদন সম্পর্ক এ যুগের ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশ করে। এখানে পুঁজির শোষণই হয় প্রধান।

মার্ক ব্লক ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব-বিকাশ, এর রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়ে এত তথ্যের সমাবেশ ঘটানোর ফলে সমাজ বিকাশের মূল ধারাটি

চাপা পড়ে গেছে। উৎপাদন প্রণালীটা অবোধগম্য রয়ে গেছে, অথচ নির্দ্ধিধায় যে কথাটি বলা যায় তা হল রোমাক সভ্যতার পতনের পর লাতিন ইউরোপের সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ভূমি ও ভূমি রাজস্বের উপর। গোটা অর্থনীতি হয়ে ওঠে ভূমিনির্ভর। বস্তুত ইউরোপীয় সামন্তযুগে সংখ্যাগুরু কৃষক ও কারিগর সমাজের শোষণের মাধ্যম ছিল ঐ ভূমি ও ভূমি রাজস্ব। তাই যদি হয় তাহলে এশীয় সমাজের তথা ইসলামি সমাজের ভূমি ব্যবস্থা, ভূমি নীতি, ইকতা ব্যবস্থা ও তার রাজস্বনীতির মূল কথাও ছিল তাই। অতএব এশীয় সমাজে সামন্ততন্ত্রের অনুপস্থিতির কথা হয়ে পড়ে অলীক অবাস্তব। তবে এর সমাজসংগঠন ইউরোপের অনুরূপ নাও হতে পারে। কেন না এতদাঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। আর সামন্ততন্ত্র কোনো অনড় বিষয় নয়। সামন্ততন্ত্রের প্রথমাবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে তারও পরিবর্তন হয়, কুটির শিল্পের বিকাশ হয়; প্রচুর পণ্য সৃষ্টি হতে পারে; বাণিজ্য ও বণিক সমাজের বিকাশ ঘটতে পারে। যত দিন বণিক পুঁজি শিল্প পুঁজির উপর প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারে ততদিন সমাজ হয় মূলত সামন্ত প্রধান।[১১]

একটি যুগ এবং সে যুগের রাষ্ট্রীয় চরিত্র নির্ণয় সহজভাবে করা যায়। মার্কসীয় তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত জটিলতায় না গিয়ে সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে মার্কসের সংক্ষিপ্ত মতামত এবং বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের আলোকে সামন্ততন্ত্র বুঝার সহজ দিকনির্দেশিনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, মানুষের এনাটমি বা শরীর বিদ্যা বুঝতে পারলে বানরের এনাটমি বুঝতে কষ্টকর হওয়ার কথা নয়। সেভাবে সমাজ বিকাশের উচ্চতর ধারা পুঁজিতন্ত্রের প্রধান বিষয়টি অনুধাবন করলে সামন্ত ধারা অনুধাবন সহজসাধ্য। তিনি পুঁজিতন্ত্রের দুটি প্রধান উপাদানের কথা বলেন ঃ ক. পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের সবটাই হয় পণ্য অর্থাৎ উৎপাদনের লক্ষ্য সরাসরি ভোগ নয়, বরং বাজারজাতকরণ। খ. দ্বিতীয়ত উপাদান-অবিরতভাবে পুঁজির পুনঃবিনিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রাখা। এ তত্ত্ব এশীয় তথা আব্বাসী রাষ্ট্র সমাজে প্রয়োগ করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তার ভূমি ব্যবস্থাই ছিল শোষণের প্রধান উপায়, তাই নয়, বরং এখানে উৎপাদনের অতি অল্প পরিমাণই পণ্য এবং পুঁজির পুনঃবিনিয়োগ ছিল খুব সামান্য। তাই বলা যায় আব্বাসী রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এখানে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক বিধিবিধান (Low of Motion) কার্যকর ছিল। পরবর্তী খলিফা, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনায় এটাই প্রতিফলিত হবে।

খলিফা

উমাইয়া বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবে আব্বাসীবংশের সফল নেতৃত্ব থাকায় ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে কুফা মসজিদে আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ আস সাফফাহকে খলিফা নির্বাচন করা হলে আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। খেলাফতের রাষ্ট্র কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করেন খলিফা। তিনি কেবল পার্থিব রাষ্ট্র নায়কই ছিলেন না; তিনি ছিলেন মহানবীর প্রতিনিধি,

সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা, ইমাম এবং আমিরুল মোমেনিন। তত্ত্বগতভাবে তিনি ছিলেন সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস সার্বভৌম।[১২] সুচারুরূপে শাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি তার বেসামরিক প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একজন উজির; বিচার বিভাগের জন্য একজন প্রধান বিচারপতি এবং তার সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একজন সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করতে পারতেন। বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখার সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণ খলিফার পক্ষে ক্ষমতা প্রযোগ করতে পারতেন; তাঁদের প্রতিটি কাজের জন্য তারা খলিফার নিকট দায়ী ছিলেন-অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি নয়। বস্তুত তত্ত্বগতভাবে খলিফাই ছিলেন প্রশাসনিক বিষয়ে চূড়ান্ত নির্ণেতা। (Final arbiter) খলিফার ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন হাজিব বা প্রাসাধ্যক্ষ। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রদূত বা অন্যান্য উচ্চপদস্থ দর্শনার্থীকে খলিফার সমীপে উপস্থিত করা। স্বাভাবিকভাবে রাজদরবারে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হত। দরবারে সিংহাসনে খলিফার পাশে উন্মুক্ত তলোয়ার হস্তে দণ্ডায়মান থাকত জল্লাদ; তাৎক্ষণিক শাস্তিদানের জন্য প্রাসাদেই একটি প্রকোষ্ঠ থাকত। দরবারে রাজ-জ্যোতিষীও অবস্থান করতেন। শেষোক্ত পদদ্বয় পারস্য ঐতিহ্য হতে গ্রহণ করা হয়। সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা হিসেবে সুন্নি ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণের সকল দায়িত্ব বর্তায় খলিফার উপর। ধর্মীয় বিধান জারি, সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন অনইসলামি কার্যকলাপ, শেরক বেদায়াত তথা ইসলামবিরোধী প্রবণতার প্রকাশ ঘটলে তা প্রতিহত করার সকল দায়দায়িত্ব খলিফার। রাজধানীর প্রধান মসজিদে খলিফা স্বয়ং ইমামতি করতেন এবং শুক্রবারে প্রতিটি মসজিদে জুমার নামাজে তাঁর নামে খোতবা পঠিত হত। ইসলামের পবিত্র স্থানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তীর্থযাত্রীদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দান ছিল তাঁর অন্য আর একটি পবিত্র দায়িত্ব। এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে আমিরুল হাজ্জ নিয়োগ করতে পারতেন।

উমাইয়াদের বহু সমালোচনা করা হলেও আব্বাসীরা খলিফা নির্বাচনে উমাইয়াদের মত বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নীতি অনুসরণ করে এবং সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার বিধান প্রতিষ্ঠায় তাদের মতই ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার এজন্য আব্বাসী বংশকে যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়। উমাইয়া রীতি অনুসারে শাসনরত আব্বসী খলিফা তাঁর জীবদ্দশায় আপন পুত্র অথবা তাঁর স্বজনদের মধ্য হতে তাঁর পছন্দসই কাউকে উপযুক্ত মনে করলে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। মনোনয়ন পর্ব শেষ হলে ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেয়ার জন্য কাজি, সেনাপতি, সামরিক-বেসামরিক বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে দরবারে ডাকা হত। একে বলা হত বয়াত উৎসব। যুবরাজের হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণকারী ব্যক্তি তাঁর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার জ্ঞাপন করতেন। সাম্রাজ্যের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অভিজাত সম্প্রদায় ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত উত্তরাধিকারীর কাছে শপথ গ্রহণ করতেন। সাধারণ লোকেরা

প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ করতেন। রাজকীয় অধিকার সুদৃঢ় করতে ক্ষমতাসীন খলিফার মৃত্যুর পর নতুনভাবে উত্তরাধিকারীকে বয়াত অনুষ্ঠান পুনরায় করতে হত। সৈয়দ আমীর আলী খেলাফতের বয়াত প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, নির্বাচিত খলিফার প্রতি আনুগতের শপথ ধর্মীয় মর্যাদা পেত এবং খলিফার ব্যক্তিত্বকে পবিত্রতামণ্ডিত করত। মসজিদে খলিফার জন্য প্রার্থনা এই প্রক্রিয়াকে আরো সুদৃঢ় করত। তদুপরি দশজন যেখানে খোদা সেখানে বা ইজমাউল উম্মাহ্ বা জনসাধারণের ঐকমত্যের মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটে—মধ্যযুগের এ মূলবোধ অনুসারে যখন সর্বসম্মতভাবে একজন ধর্মীয় নেতা ও মুসলিম সমাজের নায়ক নির্বাচিত হয়, তখন তাঁর ধর্মীয় কর্তৃত্বের সাথে খোদায়ী অনুমোদন যুক্ত হয়। খলিফা নির্বাচনে এই ধর্মীয় ভারধারা জড়িত থাকায় আব্বাসী খেলাফতের এত স্থায়িত্ব দান করে। এজন্য দেখা যায়, বুওয়াইহী বা সেলজুক আমলে যখন খলিফার কোনো রকম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছিল না তখনো সুন্নি বিজয়ী নেতারা তাদের ক্ষমতা ধর্মীয় স্বীকৃতির জন্য খলিফার নিকট প্রার্থনা করত। খলিফার অনুমোদন যে কোনো বিজয়ী বীরদের শাসন আইনসম্মত বলে বিবেচিত হত। তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো গণ বিদ্রোহকে বেআইনী ও ধর্মদ্রোহী বলে নির্দেশ করা হত।[১৩] সুলতানগণ আল্লাহর ছায়া—এরূপ মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্বাসী বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আস-সাফফাহ্ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু জাফর আব্দুল্লাহকে আল মনসুর, আল মনসুর পুত্র আল মাহদীকে, আল মাহদী আলহাদী ও হারুনকে-একের পর এককে মনোনীত করেন।

হারুন তার জ্যেষ্ঠপুত্র আল আমীনকে প্রথম মনোনয়ন দান করেন; অপর পুত্র মামুন ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় মনোনয়ন। বস্তুত তিনি ইস্লামি সাম্রাজ্যকে দু ভাইয়ের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে দেন। বস্তুত উমাইয়া যুগ হতে ইসলামি সাম্রাজ্য যে রাজবংশেরই সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেছে এটা তারই ইঙ্গিত বহন করে। মৃত্যুর পূর্বে মামুন তদীয় ভ্রাতা মুতাসীমকে এবং মুতাসীমের পুত্র ওয়াসীককে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ওয়াসীক কাউকে মনোনীত করেন নি বরং সভাসদগণ মুতাওয়াক্কিলকে সিংহাসনে বসান। এ সময় হতে আব্বাসী বংশের অবক্ষয় দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট সত্ত্বেও বিশতম খলিফা রাজী পর্যন্ত তাদের ইহলৌকিক বা রাজনৈতিক মর্যাদা কোনোক্রমে বজায় থাকে। পরবর্তী বুওয়াইহী ও সেলজুক সুলতানদের আমলে খলিফাগণ কেবল সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে খেলাফতে সমাসীন থাকেন। বুওয়াইহী ও সেলজুক সুলতানদের সাথে খলিফাদের সম্পর্ক ইউরোপের ক্যাথেলিক পোপের সাথে ক্যাথেলিক বা লাতিন ইউরোপের রাজাদের মত ছিল। অর্থাৎ ইসলামি সাম্রাজ্যে খলিফার ভূমিকা ছিল রোমের পোপের মত এবং সুলতানদের ভূমিকা ছিল রাজাদের মত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আব্বাসী

বংশের প্রথম ২০ জন খলিফা যাঁরা প্রায় দুশ বছর রাজত্ব করেন তাদের মধ্যে মাত্র ছজন যুবরাজ সরাসরি পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

আব্বাসী খলিফাদের মোতাওয়াক্কিলসহ প্রথম দশজন (৭৫০-৮৬১ খ্রি.) খলিফার রাজত্বকালকে 'রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের' যুগ বলে চিহ্নিত; আব্বাসী বংশের প্রথম পাঁচজন খলিফার আমলে বিভাগীয় মন্ত্রীবর্গ এবং পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অনিয়মিত বেসামরিক মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করা হয়। খলিফা আল মামুন তাঁর রাজত্বকালে তাঁর অনুগত সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি নিয়মিত মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন।[১৪] যেহেতু মন্ত্রণা পরিষদ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় নি—তাই উক্ত মন্ত্রী পরিষদ খলিফার স্বৈরতন্ত্রের পথে কখনই বাধাস্বরূপ ছিল না। মধ্যযুগের প্রথমার্ধেও ইউরোপের ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের ইতিহাসে পার্লামেন্টের মত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যদেশে ছিল অজ্ঞাত।

খলিফা মুস্তাইন হতে মুক্তাদিরের ৯২৩ সাল পর্যন্ত খেলাফতকালকে রাজকীয়-আমলাতান্ত্রিক যুগ্ম স্বৈরতন্ত্রের যুগ বলে বিবেচিত হওয়াই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের রায়।[১৫] লক্ষ্য করার বিষয় উল্লিখিত সময়কালে সমরনেতাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশিদারিত্ব দেয়া হলেও বেসামরিক অভিজাত শ্রেণী ছিল প্রাধান্যে; মুক্তাদিরের রাজত্বে ৯২৩ সাল থেকে ৯৩৬ সাল পর্যন্ত সামরিক আমলারা প্রাধান্যে থাকলেও বেসামরিক আমলাদেরকে উৎখাত করতে পারে নি; তবে ৯৩৬ সাল হতে সময়টাকে খেলাফতের ইতিহাসে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের যুগ বলাই যুক্তিসঙ্গত।[১৬]

খলিফা আল মুতী হতে আন নাসির অর্থাৎ ৯৪৬-১১৯৪ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ প্রায় আড়াইশ বছর প্রাচ্য ইসলামি সাম্রাজ্যে ফারসি বুওয়াইহী ও তুর্কি সেলজুকী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ সময় আব্বাসী খলিফাগণ ইহলৌকিক কতৃত্ব বা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হতে বঞ্চিত ছিলেন। তারা এ সময় বিশ্ব সুন্নি মুসলিমদের মহান আধ্যাত্মিক নেতা-ইমাম বা আমিরুল মোমেনিন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মাত্র। এ সময় তাঁদের প্রধান দায়িত্ব ছিল শিয়া, মোতাজিলা ইত্যাদি মতবাদ বেদায়াতী চিন্তা বা নয়া চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ হতে বিশ্ব সুন্নি ইসলামকে রক্ষা করা। এ দায়িত্ব যথাযোগ্য পালন করার জন্য ধর্মবেত্তা, ধার্মিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি ধর্মীয় মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ সময়ে সুন্নি ইসলামকে একটি ছকে বেঁধে দেয়া হয়; এর আচার-আচরণ, আদত-প্রথা, আদব-কায়দা নতুনভাবে সজ্ঞায়িত করা হয়। ইজতেহাদের দরজা বন্ধ ঘোষণা করা হয়; সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায় হতে যুক্তিবাদকে নির্বাসিত করা হয়। মাদ্রাসা পাঠ্য সূচি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়—অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষার্ধের প্রথম হতে সমগ্র সামন্ত বা কৃষি অর্থনীতির স্থবির চিন্তাধারার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়। একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও মুসলিম সমাজ ঐ চিন্তার রুদ্ধদ্বার একেবারে খুলতে পারছে না।[১৭]

খলিফা আন নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রি.) মহান সেলজুকদের পতনের পর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পুনরুদ্ধারের প্রচষ্টা চালান তবে তার পর হতে ১২৫৮ সালে মঙ্গল হালাকুখান কর্তৃক বাগদাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ক্ষমতা বাগদাদ নগর ও তার উপকণ্ঠে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচ্য ইসলামি দেশে তাদের রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলেও সুন্নি মুসলিম জগতে তারাই ছিলেন শ্রদ্ধেয় ইমাম বা ধমীয় নেতা।

উজির

আব্বাসী রাষ্ট্র কাঠামোতে খলিফার পরই উজিরের অবস্থান। উজির পদটি মূলত পারস্যজাত।[১৮] আরবদের নিকট পদটি একেবারে অপরিচিত ছিল না, কিন্তু ক্ষমতায় আরোহণ করে আব্বাসীরা তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পদটি সম্পৃক্ত করে। তাদের রাষ্ট্র কাঠামোতে এ পদের সৃষ্টি এবং সম্পৃক্ত করার মধ্যে আব্বাসী শাসনে ইরানি ঐতিহ্যের প্রভাবই নির্দেশ করে।

উজির ছিলেন মূলত জনতা-সরকারি কর্মচারীবৃন্দ এবং খলিফার মধ্যবর্তী ব্যক্তিত্ব। শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা এবং খ্যাতিমান শক্তিশালী ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ধর্মবেত্তা বা কেবল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে এ পদের জন্য সাধারণত উপযুক্ত মনে করা হত না। আল মুনসুরই এ পদের প্রকৃত স্রষ্টা; খালেদ বারমেকি এ উচ্চ পদটি প্রথম অলঙ্কৃত করেন; তবে আসসাফফাহ-এর সময় আবু সালমা উজির উপাধি গ্রহণ করেন।

উজির ছিলেন খলিফার প্রতিনিধি; খলিফার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে উজির খলিফার নামেই তার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি কর্মচারী নিয়োগ করতেন, প্রয়োজনবোধে তাদেরকে বরখাস্ত করতে পারতেন; কর ধার্য, কর আদায় এবং রাজস্বের ব্যয় নির্বাহ অর্থাৎ রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সম্পাদন করতেন। উজির খলিফার সাথে সকল নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে পরামর্শ করতেন। বস্তুত সামরিক বেসামরিক সকল দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হত। খলিফার আজ্ঞাবাহক হিসেবে তিনি তাঁর আদেশ পালন করছেন বলে মনে করতেন। বিভিন্ন বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য খলিফা যে সব বিভাগীয় প্রধানদেরকে নিয়োগ দিতেন তাদেরকেও সাধারণত উজির বলা হত। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বোর্ড। স্বাভাবিকভাবে প্রধান উজির উক্ত বোর্ডে সভাপতিত্ব করতেন। তিনি অন্যের অভিযোগও শ্রবণ করতেন।

মুসলিম আইনজ্ঞ লেখকরা আব্বাসী আমলের উজিরের পদকে দু ভাগে বিভক্ত করেন: ক. অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন (ওয়াজিরাতুত তাফবীজ); খ. সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন, (ওয়াজিরাতুত তানফীজ)। প্রথম শ্রেণীর উজিরদেরকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া হত। তারা স্ব উদ্যোগে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে খলিফাকে সে সম্পর্কে অবহিত করলেই চলত। উল্লেখ্য সাফফাহ, মনসুর বা মাহদীর সময় এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন উজিরের সাক্ষাৎ পাওয়া

যায় না; হারুনের আমলে জাফর বারমেকী এবং মামুনের আমলে ফজল বিন সহল এ রকম ক্ষমতাধারী মন্ত্রী ছিলেন। বারমেকি উজিররা খুবই শক্তিশালী ছিলেন। খলিফার অনুমোদনক্রমে তারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বিচারকদের নিয়োগদান এবং বরখাস্ত করতে পারতেন; বরখাস্তকৃত শাসকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতেন—যেমন বরখাস্তকৃত উজিরদের সম্পত্তি খলিফা বাজেয়াপ্ত করতেন।[১৯] অনেক ক্ষেত্রে উজির পদটি বংশানুক্রমিক রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুত উজির পরিবার ও তাদের সহচর রাষ্ট্রের একটি উচ্চ অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের কর্মকর্তা মহলে তারাই ছিলেন সর্বোচ্চ। তারা খলিফাদের মত কালো পোশাক পরিধান করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও বারমেকি ও সহল উজির পরিবারদের ন্যাক্কারজনক পতন তৎকালীন রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রে শক্তিশালী উজিরদের বাস্তব অবস্থানের নির্দেশ করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর উজিরদের এত ব্যাপক ক্ষমতা ছিল না। তাঁরা সাধারণত রুটিন মাফিক কাজই সম্পাদন করতেন। তাঁরা স্বীয় উদ্যোগে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন না। তবে তারা খলিফার আদেশ পালনের ক্ষমতা লাভ করতেন। প্রশাসন, কর নির্ধারণ, প্রদেশসমূহের বাস্তব অবস্থা এবং তাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হত। আব্বাসী আমলে (সুবর্ণ যুগে) জিম্মিরা বেশ উল্লেখযোগ্য সুযোগ সুবিধে ভোগ করলেও উজির পদে অধিষ্ঠিত হতে দেখা যায় না। অথচ বুওয়াইহী সুলতান অজদুদ্দৌলার প্রভাবশালী উজির নসর বিন হারুন ছিলেন খ্রিষ্টান; মিশরের ফাতেমী সরকারে ইহুদী-খ্রিষ্টান মন্ত্রী নিয়োগ করা হত।[২০]

উজির নিয়োগ পদ্ধতি ছিল চমৎকার। খলিফা কাউকে উজির পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাকে একটি পত্র মারফত প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান হয়। দুজন আমির উক্ত আমন্ত্রণপত্র তাকে হস্তান্তর করতেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তি প্রাসাদে খলিফার মন্ত্রণাকক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলে উজির তাঁকে খলিফার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। খলিফার সাথে তাঁর আলাপচারিতা শেষ হলে সম্মানসূচক পোশাক পরিধান করার জন্য তাঁকে অন্য এক কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। পোশাক পরিধান শেষে তিনি খলিফার হস্ত চুম্বন করতেন। প্রাসাদ দ্বার-দেশে পৌঁছলে সুসজ্জিত একটি ঘোড়া তার নিকট আনা হয়। তিনি ঐ ঘোড়ায় চড়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, দরবারের আমির, খলিফার খেদমতগার এবং বিভিন্ন দেওয়ান প্রধানের পুরোভাগে নিয়ে তার নির্ধারিত দফতরে আনা হত। ঐ দফতরের সম্মুখে তাঁকে মহা সমারোহে অশ্ব হতে অবতরণ করানো হয়। তিনি আসন গ্রহণ করলে তাঁর নিয়োগপত্র পাঠ করা হয়।[২১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সমগ্র আব্বাসী যুগে উজির পরিষদ আদৌ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ না করায় শক্তিশালী খলিফা সহজেই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন; কিন্তু খলিফা দুর্বল হলে এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব উপেক্ষা করে হেরেমখানায় আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন থাকলে উজিররা ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যেত এবং উল্টো তারাই খলিফাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুযোগ পেত।

উজিররা বিভিন্ন সময় বহু প্রান্তিক সুবিধেসহ মোটা অঙ্কের বেতন পেতেন। খলিফা তাদেরকে ভূমি মঞ্জুরী দিতেন, তাদের সন্তানদের জন্য বৃত্তি দেয়া হত। মোতাজিদের মন্ত্রীরা মাসিক এক হাজার দিনার পেতেন। দীওয়ানুস সোয়াদ প্রধান ছিলেন সর্বোচ্চ বেতনভোগী। মোক্তাদিরের উজিরের মাসিক বেতন ছিল ৫০০ দিনার। এতদ্ব্যতীত উজিররা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিকট হতে উপঢৌকন পেতেন। মুতাওয়াক্কিলের উজির উবায়দুল্লাহ বিন খাকান মিশরের শাসনকর্তার নিকট হতে দু লক্ষ দিনার এবং ত্রিশ বাক্স কাপড় উপহার পেলেও তিনি মাত্র একটি কলসি নিজের জন্য রেখে অবশিষ্ট সব কিছু সরকারি খাজাঞ্চিখানায় জমা দেন। এটা অবশ্য ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা।

আব্বাসী খেলাফতের অবক্ষয়ের যুগে খলিফারা প্রকাশ্যে দেব প্রদত্ত অধিকারের কথা বলতেন এবং তারা তাদের উজিরদেরকে উক্ত ঐশী অধীকার দান করতেন— খলিফা আন নাসির (১০৮০-২২২৫ খ্রি.) তার উজিরকে এরূপ ক্ষমতা হস্তান্তর করে একটি দলিল প্রদান করেন। উক্ত দলিলের হিষ্ট্রির অনুবাদ নিম্নরূপ: Mahammad ibn Braz-al Qummi is our representativ throught the land and amongst our sabjects. Therefore he who obeys him obeys us; and he who obeys God, and God shall cause him who obeys Him to enter Paradise. As for the one who, on the other had, disobeys our Vizlr he disobeys us, and he who disobeys God, and God shall cause him who disobeys him to enter hell fire.[২২]

কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো

উমাইয়া খলিফাগণ ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর মূল ভিত্তি রচনা করলেও আব্বাসী খলিফাগণ তা আরো নিটোলভাবে বিস্তৃত সুবিন্যস্ত রূপ দান করেন। রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিভিন্ন দপ্তরে ভাগ করে একটি দক্ষ শাসন যন্ত্র গঠনে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন। সরকারি দপ্তরগুলি: ক. দীওয়ানুল খারাজ বা রাজস্ব বিভাগ; খ. দীওয়ানুজ জিয়া বা রাজ সম্পত্তি বিভাগ; গ. দীওয়ানুজ জিসাম বা হিসাব নিরীক্ষণ পরিদপ্তর; ঘ. দীওয়ানুল জুনদ বা সামরিক বিভাগ; ঙ. দীওয়ানুল মাওয়ালী ওয়াল গিলমান বা আশ্রিত ও দাস পরিদপ্তর; চ. দীওয়ানুল বারিদ বা ডাক বিভাগ; ছ. দীওয়ানুজ জিসাম ওয়ান নাফাকাত বা রাজপরিবারের ব্যয় নির্বাহী অধিদপ্তর; জ. দীওয়ানুর রাসাইল বা পত্র আদান প্রদান বিভাগ; ঝ. দীওয়ানুত তাওকিয়া বা আবেদন দপ্তর; ঞ. দীওয়ানুন নজর ফিল মাজালেম বা অভিযোগ দফতর; ট. দীওয়ানুল আহদাস ওয়াশ শুরতী বা স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা ও পুলিশ বিভাগ; ঠ. দীওয়ানুল আতা বা ত্রাণ দপ্তর; ড. দীওয়ানুল ক্বাজা বা বিচার বিভাগ; ঢ. দীওয়ানুল জিহবাজাহ বা অমুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণ পরিদপ্তর; এছাড়াও দীওয়ানুল মুকাতিয়াত বা মঞ্জুরী

দফতর এবং দীওয়ানুল আকরিহা বা খাল পয়ঃপ্রণালী-সেচকর্ম তত্ত্বাবধানকারী দপ্তর উল্লেখযোগ্য।[২৩] নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপর্ণ বিভাগ ও পরিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হল।

দীওয়ানুর রাসায়েল

দীওয়ানুর রাসাইল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এই বিভাগের পরিচালক হতেন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্বশীল কর্মাধ্যক্ষ। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল সকল রাজকীয ফরমান, নিযুক্তিপত্র, বিশেষ অধিকারপত্র এবং যাবতীয় রাষ্ট্রীয় পত্রাদি রচনা করা, প্রধান উজিরের অনুমোদন লাভ করা এবং এগুলিকে লাল গালায় খলিফার চিহ্নযুক্ত সিলমোহর দেয়া এবং নথিভুক্ত করা। যে সভায় খলিফা জনসাধারণের অভিযোগ বা দরখাস্তেব মীমাংসা করতেন রাসায়েল বিভাগের অধিকর্তাকে সে সভায় উপস্থিত থাকতে হত এবং উক্ত দরখাস্তে খলিফার রায় লিপিবদ্ধ করতে হত। রায়ের একটি প্রতিলিপি বাদিকে দেয়া হত, মূল কপিটি সরকারি সেবেস্তায় নথিভুক্ত করে রাখা হত। গুরুত্বের দিক দিয়ে এর পরে দফতরটি ছিল দিওয়ানুত তাউকিয়া বা আবেদন দপ্তর। এই অফিসে খলিফাকে প্রদত্ত স্মারকলিপির উত্তর বচনা করতে হত। খলিফার স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত করে সেগুলো নথিভুক্ত করা হত।

বারিদ

প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীতে একটি করে দীওয়ানুল বারিদ থাকত এর প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হত সাহেবুল বারিদ। তিনি কেবল রাষ্ট্রীয় ডাকের নিয়মিত চলাচলেরই তত্ত্বাবধান করতেন না, বরং প্রদেশের সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে খলিফাকে সর্বদা অবহিত রাখার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। বস্তুতপক্ষে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যাক্ষ গোয়েন্দা প্রতিনিধি। তার বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতার উপর সরকারের নিরাপত্তা, কর্মদক্ষতা ও পদক্ষেপ গ্রহণ নির্ভর করত। তিনি প্রদেশের অবস্থা, প্রশাসনের কার্যক্রম, কৃষি অবস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব, টাকশালের বাস্তব অবস্থা, স্বর্ণরৌপ্যে মুদ্রার পরিমাণ সম্পর্কে খলিফার নিকট গোপন বিবরণ প্রেরণ করতেন। সেনাবাহিনী পরিদর্শন এবং তাদের বেতন দেয়ার সময় তাঁর উপস্থিতি ছিল আবশ্যক।

এ বিভাগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যে বিভিন্ন স্থানের সাথে বাগদাদের সংযোগ স্থাপন করার জন্য সড়ক-জাল বিস্তৃতি করা হয়। ডাক পরিবহণের উদ্দেশ্যে পারস্যে ঘোড়া-খচ্চর বহর, আরব-সিরিয়ায় উষ্ট্রবহর ব্যবহৃত হত। গোটা সাম্রাজ্যে ৯৩০ টি সরাইখানা বা বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ডাক চৌকিতে প্রয়োজনীয় পশুশালা থাকত। উপযুক্ত ভাড়ার বিনিময়ে পশুশালার পশু ভাড়া করা

যেত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা তার অনুচরবর্গ নিয়ে কোনো স্থানে গমন করলে ঐ বিশ্রামাগার ব্যবহার করতে পারতেন। সেনাবাহিনীর জন্যও তা ব্যবহৃত হত। বিভাগীয় পশুপালন, ডাক পিয়ন এবং ডাক বিভাগের কর্মচারীদের বেতন বাবদ কেবল ইরাক প্রদেশের জন্য ব্যয় হত ১,৫৪,০০০ দিনার।[২৪] প্রাদেশিক শহরে ডাক বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ, তাদের তত্ত্বাবধান ও বেতন প্রদানের দায়িত্ব ছিল সাহেবুল বারিদের উপর। প্রতিটি বিশ্রামাগারের নাম একটি হতে অপরটির দূরত্ব সম্বলিত নির্ভুল ডাক বিভাগীয় নির্দেশিকা সরকারি সেরেস্তায় রাখা হত। ইবনে খুরদাবেহ তার আল-মাসালিক ওয়াল মাসালিক গ্রন্থ প্রণয়নে বারিদ বিভাগের তথ্য নির্দেশিকা ব্যবহার করেন। বস্তুত আরব সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক ভূগোল রচনায় ডাক বিভাগ ছিল তথ্য ভাণ্ডার।[২৫] আব্বাসীযুগে নিয়মিত ডাক পরিবহণ কাজে পায়রা ব্যবহার করা হত। ডাক বিভাগের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আব্বাসী রাজকীয় স্বৈরাচারের জন্য এটা ছিল একটি বড় হাতিয়ার।

সাহেবুশ শুরতা

সাম্রাজ্যের প্রতিটি নগর ও শহরের নিপাত্তার জন্য শুরতা বা পুলিশ নিয়োগ করা হত। পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে সাহেবুশ শুরতা বলা হত। শুরতা ছিল সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং উচ্চ বেতনভুক্ত। বাগদাদের সাহেবুশ শুরতার অফিস ছিল জাকজমকপূর্ণ।

মুহতাসিব

নগরের সাধারণ পুলিশের কর্মকর্তাকে বলা হত মুহতাসিব। পদটি আল মহাদী সৃষ্টি করেন। মুহতাসিব ছিলেন হাট-বাজার, ওজন, সাধারণের ন্যায় অন্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক। নগরে পুলিশী নিয়ম-কানুন প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, শস্য ভাণ্ডারের অবস্থা কি, বাজারে দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রয়ে কেউ প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে কিনা—এসব তদারকি করার যাবতীয় দায়িত্ব ছিল মুহতাসিবের উপর।

নগর-সভা

শহরের বাণিজ্যিক লেনদেন বিষয়ে তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি নগর কমিটি বা বণিক সমিতি গঠিত হয়। নগরের সম্মানিত ব্যক্তি ঐ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হতেন তাঁকে রইসত্তুজ্জার বলা হত। এ ছাড়াও নগরের কোথাও কোথাও নাগরিক কমিটি গঠিত হত, এতে নগরের স্বায়ত্তশাসন অনেকাংশে নিশ্চিত হত।

আমীরুল হজ্জ্ব

সাম্রাজ্যের সর্বত্র ডাক বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে বণিক, মুসাফির, সরকারি কর্মচারী বা সৈনিকদের স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ যাতায়াতের জন্য যেমন সরাইখানা, ডাক-চৌকি ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তেমনি হজের মৌসুমে বাগদাদ হতে মক্কা-মদিনার তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্ন ও স্বচ্ছন্দ্য করার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমিরুল হজ্জ্বের তত্ত্বাবধানে তীর্থযাত্রীদের তদারকি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাদের জন্য বিশেষ সরাইখানা, পানির কুপ খনন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিচার বিভাগ

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাবর্গের সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগে মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রের একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। তবে ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত সকল বিষয়ের নিস্পত্তি করার দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের ধর্মীয় নেতাদের উপর। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার দায়দায়িত্ব অর্পিত হত কাজির উপর। প্রত্যেক নগরে এক বা একাধিক কাজি নিয়োগ করা হত। বাগদাদের প্রধান কাজিকে বলা হত কাজিউল কুজ্জাত। বস্তুত কাজিউল কুজ্জাত ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি এবং সমগ্র রাজ্যে আদালত সংগঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। মাহদী-হাদী-হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে আবু হানিফার প্রধান শিষ্য আবু-ইউসুফ ছিলেন প্রধান কাজি। ফৌজদারি বিচারের দায়িত্ব ছিল সাহেবুল মাজালিমের উপর। সর্বোচ্চ আদালত ছিল অভিযোগ তদন্ত বিভাগ দীওয়ানুন নজর ফিল মাজালেম। এই মাজালেম আপিলকোর্টে খলিফা স্বয়ং সভাপতিত্ব করতেন এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর একজন প্রধান কর্মকর্তা। এই আপিল কোর্টের সদস্য ছিলেন প্রধান কাজি; হাজিব, রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাগণ এবং তাতে বিশেষভাবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হতেন কয়েকজন মুফতি বা আইন বিশারদ।[২৬]

দীওয়ানুল খেরাজ

আব্বাসী অর্থ-মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দীওয়ানুল খেরাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর। আব্বাসী শাসন আমলে অর্থ-মন্ত্রণালয়ের অধীনে আরো কয়েকটি অধিদপ্তর ক্রিয়াশীল ছিল। রাজপরিবারের সম্পত্তির আয়-ব্যায় তদারকীর কাজে নিয়োজিত থাকত দীওয়ানুজ জিয়া। রাজপ্রাসাদ, খলিফার দরবারের ব্যয় নির্বাহ, কর্মচারীদের বেতন, আস্তাবল রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল দীওয়ানুল নাফকাতের উপর। আল মাহদীর পর হতে সরকারের আয়-ব্যয় নিরীক্ষণের দায়িত্ব ছিল দীওয়ানুজ জিসামের উপর। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দীওয়ানুল খেরাজের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। দেশের রাজস্বনীতি প্রণয়ন, রাজস্ব ধার্য, রাজস্ব আদায়,

এর হিসাব সংরক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষণ, যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বহন, সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা বণ্টন এবং জন-কল্যাণমূলক কাজে অর্থায়ন-এসব গুরু দায়িত্ব অর্পিত ছিল দীওয়ানুল খেরাজের উপর। এই দফতরের প্রধানকে বলা হত সাহেবুল খেরাজ।

আব্বাসী রাষ্ট্রের রাজস্ব উৎসসমূহ

ক. ভূমি রাজস্ব; খ. উৎপন্ন ফসলের একদশমাংশ খাজনা বা আয়কর (উশর, মাতাক, সাদাকাত); গ. খনি ও চারণভূমির আয়ের এক পঞ্চমাংশ; ঘ. অমুসলিমদের নিকট হতে গৃহীত কর (সামরিক সেবার পরিবর্তে দেয় কর); ঙ. বাণিজ্যিক শুল্ক; চ. লবণ ও মৎস্যের উপর দেয় কর; ছ. দোকানদার কর্তৃক সাধারণের স্থান ব্যবহারের জন্য রাস্তা বা প্রাঙ্গণে দোকান নির্মাণ বা বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রদেয় কর; জ. কলকারখানার উপর আরোপিত কর; ঝ. যান-বাহন ও বিলাস দ্রব্যের উপর আরোপিত কর এবং ঞ. আমদানি শুল্ক।[২৭]

ব্যয়

মুসলিমদের নিকট হতে আদায়কৃত রাজস্ব কেন্দ্রীয় কোষাগার হতে মুসলিম জনতার হিতার্থে, অনাথ, দরিদ্র, মুসাফির, ধর্মযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী অথবা দাস মুক্তিপণের জন্য ব্যয় করা হত। যাকাত ব্যতীত অন্য সূত্র হতে আদায়কৃত রাজস্ব সাধারণ প্রশাসন, সামাজিক বা বেসামরিক জনহিতকর কাজ যথা সেচ ব্যবস্থা, সরাইখানা, সেতু, রাস্তাঘাট, গণ গোছলখানা নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হত।[২৮]

ভূমি খাজনা

ভূমি খুজনা ছিল রাষ্ট্রের রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস। আব্বাসী যুগে তিন প্রকার ভূমি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল; ক. জমিদার অধীন ভূমি; বিজয় প্রাক্কালে স্থানীয় ভূস্বামি-সামন্তদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে রাজস্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে নির্ধারিত ছিল। এতদ্ব্যতীত উত্তর পারস্য ও খোরাসানের গ্রাম সমাজগুলোর সাথে বাস্তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। তারা তাদের উপর আরোপিত কর সরকারি তোষাখানায় জমা দিত। খ. মুকাসিমা ভূমি; গ. বর্গাভূমি। এ দু প্রকারের ভুমি ব্যবস্থার সাথে কৃষক সম্প্রদায় জড়িত ছিল। মুকাসিম ভূমিতে কৃষক উৎপন্ন শস্যের আনুপাতিক হারে খাজনা দিত; দ্বিতীয় প্রকারের ভূমিতে সরকার ও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত অনুসারে খাজনা দিত। অধিকাংশ রাজভূমি (Crawn land) শেষোক্ত শ্রেণীভূক্ত ছিল।[২৯] বস্তুত জমির কর নির্ধারণের তিনটি পদ্ধতি ছিল : ক. জমির পরিমাণ ভিত্তিতে নগদ টাকা অথবা ফসলে কিংবা উভয় প্রকারে খাজনা আদায় করা; মুকাসিমা অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের অনুপাতে শস্য খাজনা দেয়া; গ. মুকাতিয়া। জমি

উর্বর হলে এবং তাতে কোনো শ্রম না লাগালে চাষী সরকারকে অর্ধেক ফসলে খাজনা পরিশোধ করত; জমিতে সেচ ব্যবস্থা কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ হলে ফসলের এক তৃতীয়াংশ খাজনা দিতে হত; অধিকতর কষ্ট সাধ্য হলে এক চতুর্থাংশ কখনো এক পঞ্চমাংশ ফসল দিতে হত। দ্রাক্ষাকুঞ্জ, খেজুর ক্ষেত, বা ফলের বাগান এবং অনুরূপ বস্তুর কর নির্ধারণ নগদ টাকায় শস্যের মূল্য নিরূপণ করা হত এবং তার অর্ধেক বা একতৃতীয়াংশ মুদ্রা খাজনা ধার্য করা হত।[৩০]

বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় যে, আব্বাসীদের সুবর্ণ যুগ—তাদের শাসনের প্রথম একশ বছর ছিল লক্ষণীয় সমৃদ্ধির শতক। এ সময় রাজা, রাজপরিবার এবং অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে যে আড়ম্বর জীবন যাপন সম্ভব হয়েছিল তা হাজার রজনী গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়। রাজস্ব সম্পর্কে তিন সময়ের তিনটি তথ্য পাওয়া যায়। ইবনে খলদুন পরিবেশিত তথ্য অনুসারে আল মামুনের সময় সাওয়াদ (নজব্যয়িক) হতে ফসলে খাজনা ছাড়াই নগদ অর্থে ২,৭৮,০০,০০০ দিরহাম খাজনা আদায় হয়; খোরাসান হতে ২,৮০,০০০০০; মিশর হতে ২,৩০,৪০০০০; সিরিয়া প্যালেস্টাইন হতে ১,৪৭,২৪,০০০; সাম্রাজ্যের অন্য সকল প্রদেশ হতে একত্রে ৩৩,১৯,২৯,০০৮ দিরহাম খাজনা আদায় হয়। কুদামার তথ্য বিবরণী হতে জানা যায় পরবর্তী সময় সম্ভবত মুতাসিমের সময় সোয়াদ হতে ফসলের ও মুদ্রায় সর্বমোট খাজনা আদায় হত ১৩,০২০০০০০ দিরহাম; খোরাসান হতে ৩,৭০,০০০০০ দিরহাম, আলেকজান্দ্রিয়াসহ মিশর হতে ৩৩,৭৫,০০০০০ দিরহাম; হিমসসহ সিরিয়া প্যালেস্টাইন হতে ১,৫৮,৬০,০০০ দিরহাম এবং অন্যান্য প্রদেশ হতে একত্রে ৩৮,৮২,৯১,৩৫০ দিরহাম। এ হিসাব হতে ফসলের খাজনা বাদ দেয়া হয়েছে। ইবনে খুরদাবহের তথ্য বিবরণী আরো পরবর্তীকালে সোয়াদ হতে নগদ ও ফসলে মিলিয়ে কর আদায় হয় মোট ৭,৮৩,১৯,৩৪০ দিরহাম: খোরাসান ও তদসংলগ্ন অঞ্চল হতে ৪,৪০,৪৬,০০০ দিরহাম; সিরিয়া প্যালেস্টাইন হতে ২,৯৮,৫০০০০০ দিরহাম; সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ হতে মোট ২৯,৯২,৬৫,৩৪০ দিরহাম। এরপর সম্ভবত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আয় সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা গেলেও ব্যয় সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা অনেক বেশি। মৃত্যুকালে মনসুর রেখে যান ৬০,০০,০০,০০০ দিরহাম এবং ১,৪০,০০,০০০ দিনার। হারুনুর রশীদ ৯০,০০,০০০ এবং মকতাফী (মৃত ৯০৮) ১০,০০,০০,০০০ দিনার।[৩১] এই তথ্যত্রয় হতে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ইতিহাস খুবই স্পষ্ট।

দীওয়ানুল জুন্দ

আব্বাসী প্রশাসনিক যন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল দিওয়ানুল জুন্দ। আব্বাসী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্বযং খলিফা। দীওয়ানুল জুন্দ পরিচালনার জন্য

খলিফা একজন সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করতেন। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনী গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা, বেতন প্রদান, যুদ্ধ কৌশল নির্ণয়, রসদ সরবরাহ, সেনা বিন্যাস এবং সৈনিকদেরকে সদাসতর্ক অবস্থায় প্রস্তুত রাখা। অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং যুদ্ধে নেতৃত্বদান তাঁর দায়িত্বে ছিল। তার সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পরিদপ্তর যথা মসলিসুল মুকারাহ সেনা সংগ্রহ, মসলিমুত্তাকরির সেনাদের মধ্যে বেতন বন্টন, আরিজ সামরিক অস্ত্রশস্ত্র পরিদর্শন, মুশারিফ আস সাওয়াত বিন মাখজান, অস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকতেন। মধ্যযুগে আরব খলিফাগণ বড় আয়তনের নিয়মিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন নি। এ প্রসঙ্গে হিট্টির মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : Arab Caliphate never maintained alarge standing army in the strict sence of the term, well orgenized, under strict disciline and subject to regular instruction and drill.[৩২] তবে আব্বাসী দেহরক্ষী বাহিনী হারাস ছিল একমাত্র নিয়মিত বাহিনী; হারাসকে কেন্দ্র করে ভাড়াটিয়া ও ভাগ্যান্বেষী এবং গোত্র প্রধানদের নেতৃত্বে বিভিন্ন বাহিনী গড়ে ওঠে। নিয়মিত সেনাবাহিনীর মধ্যে হারাস ব্যতীত অনেক সৈনিক ছিল যারা ছিল সরকারি বেতনভোগী এবং স্থায়ীভাবে সক্রিয়। তাদেরকে বলা হত মুরতাজিকাহ; প্রয়োজনের সময় বেদুইন, কৃষকের মধ্যে হতে সাময়িকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করা হত এরূপ বাহিনীকে সেচ্ছাসেবী বাহিনীও বলা হত। এরূপ অনিয়মিত সৈনিকের সংখ্য ছিল বেশি। খলিফা আল মামুনের সময় নিয়মিত সৈনিককের সংখ্যা ছিল ১,২৫,০০০। পদাতিক সৈনিকরা ২৪০ দিরহাম বেতন পেত; অশ্বারোহী পেত এর দ্বিগুণ; তদদ্ব্যতীত তারা পেত বিনামূল্যে রসদ ও ভাতা। একজন পদাতিক সৈন্য বার্ষিক গড় ৯৬০ দিরহাম আয় করত। সেদিনের তুলনায় এটা ছিল ভাল বেতন; মামুনের সময় একজন রাজমিস্ত্রীর দৈনিক আয় ছিল মাত্র ১ দিরহাম এবং একজন যোগালে পেত $\frac{১}{৬}$ দিরহাম।[৩৩]

রোমক বাইজানটাইন মডেলে দশজন সৈনিক নিয়ে একটি সেনা ইউনিট পরিচালিত হত। একজন আরিফের নেতৃত্বে প্রতি ৫০ জন সৈনিকের উচ্চতর ইউনিটের পরিচালক ছিল একজন খলিফা। প্রতি শতকের ইউনিটের পরিচালক 'কায়েদ', দশ ব্যাটালিয়নের দশ হাজার সৈনিকের কমান্ডার ছিলেন আমির, একশত সৈনিক নিয়ে কোম্পানি স্কোয়াড্রন নিয়ে গঠিত কোহাট বা কুরদুস।[৩৪] ফনক্রেমার আরব সামরিক সংগঠনের এক বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন।

নিয়মিত বাহিনী নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। পদাতিক সৈন্যরা (হারবিয়া) বর্ষা, বল্লম, রেবারী ও ঢাল দ্বারা সজ্জিত হত। তীরন্দাজরা (বামিরাহ্) বেবারী ও ঢালের সাথে ধনুক রাখত। পদাতিক সৈন্যরা শিরস্ত্রাণ ও বক্ষ আবরণী পরিধান করত। এবং তাদের বাহু ও পদযুগল রক্ষিত থাকত লোহার খাপে। মোতাওয়াক্কিলের আমলে সকল নিয়মিত সৈন্যকে দেয়া হত হালকা বাদামী রঙের ঢিলা কোর্ট এবং তাদেরকে পারসী কায়দায় কটিবন্ধের সাথে তরবারী ধারণ করতে হত।

প্রতিটি সৈন্যবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকত একদল ন্যাপথা নিক্ষেপকারী; আর থাকত একদল সুড়ঙ্গ খননকাবী। তাদেব ঢাল ও তরবারীর সাথে কোদাল থাকত। অবরোধক যন্ত্রপাতির দায়িত্বে নিযোজিত থাকত যন্ত্রকুশলী দল। দুর্গ অবরোধের সময় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং অববোধ কৌশল সম্পর্কে ইয়াকুব বিন সাবির আল মানজানিকী উমদাতুল মাসালিক নামক একখানি অসমাপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে ইবনে খাল্লিকান বলেন: যুদ্ধ সম্পর্কের প্রতিটি বিষয় যুদ্ধে সেনা বিন্যাস, দুর্গ নির্মাণ, অশ্বারোহণ কৌশল, যুদ্ধ কারিগরি বিদ্যা, দুর্গ ঘেরাও ও অবরোধ করা, সকল প্রকার যন্ত্রের ব্যবহাব, সামবিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকবণ ইত্যাদি সব কিছু উক্ত পুস্তকে আলোচিত হয়েছে।[৩৫]

আরব সেনাবাহিনীর মূল্যায়ন

আব্বাসী শাসনের প্রথম শতকে তাদের দক্ষ এবং অপরাজেয় সামরিক শক্তি ছিল তা সমসাময়িক বাইজানটাইন লেখকদের বিবরণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সম্রাট লিও (৮৮১-৯১২ খ্রি.) বলেন যে, সকল বর্বর জাতিসমূহের মধ্যে আরবরা ছিল সবচেয়ে ভাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সামরিক অভিযানে অসাধারণ রণকুশলী। বাইজানটাইনদের উপর আরব সৈনিক কিরূপ স্থায়ী দাগ কাটে তা সম্রাট কনস্টান্টিনাইনের (৯১০-৫৯ খ্রি.) এক মন্তব্য হতে অনুধাবন কবা যায়। তিনি বলেন যে, আরবরা শক্তিশালী ও যুদ্ধনিপুণ সৈনিক, তারা একশ জন কোনো শিবির দখল করে বসলে তাদেরকে হটান দুঃসাধ্য। একই সূত্র হতে জানা যায় যে, আরবরা বর্ষা ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া সহ্য করতে পারত না; যদি একবাব তারা লাইনচ্যুত হয় তবে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা কষ্টকর; তখন তারা লুটেরা বৈ কিছু নয়। তবুও তারা অপরাজেয় শক্তি। দশম শতাব্দী হতে আবর সেনাবাহিনী ক্রমান্বয়ে তাদের ভীতিপ্রদ চেহারা হারায়। বাইজানটাইনরা ক্রমবর্ধমান হারে আক্রমাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে।[৩৬] বস্তুত মুকতাদিরের (৯০৮-৩২ খ্রি.) শাসনকালেই আব্বাসী সামরিক শক্তি নিঃশেষিত হয়।

এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব আদৌ আকস্মিক নয়। এর পশ্চাতে আছে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি। আব্বাসী বিপ্লব এবং আব্বাসী বংশ প্রতিষ্ঠায় খোরাসানীদের অবদান প্রাপ্ত হওয়ায় অচিরেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন আরব প্রাধান্য দ্রুত বিলীয়মান হয়; তেমনি সামরিক ক্ষেত্রেও আরব প্রাধান্য ক্রমহ্রাস পেতে থাকে এবং তদস্থলে প্রথম পারসি এবং পরে তুর্কি জাতিসত্তার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। প্রথমে কয়েকজন খলিফার দেহরক্ষী বাহিনী গঠিত হয়েছিল খোরাসানী সৈনিক নিয়ে। এ সময়ও আরব সৈনিককের দুটি বাহিনী ছিল: ক. উত্তর আরবের মুজায়ী বাহিনী; খ) দক্ষিণ আরবের ইয়ামানী বাহিনী। এদের মধ্যে ছিল গোত্রীয় দ্বন্দ্ব। তাই তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকার কথা নয়। ইতিমধ্যে সামরিক পেশার প্রতি আরবদের আকর্ষণও হ্রাস পায়। প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য বিজিত জাতির লোকজনকে শাসক জাতির সাথে সংযুক্ত করার একটি ব্যবস্থা সমানভাবে কার্যকর ছিল। এটি ছিল ওয়ালি বা আশ্রিত প্রথা। এ প্রথা অনুসারে যে কোনো জাতিসত্তার কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সাথে সাথে তাকে যে কোনো এক আরব গোত্রের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে হত, অথবা আশ্রিতে পরিণত হতে হত কোনো এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বা শাসক পরিবারে। এরা সেনাবাহিনীতে যোগদানে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আব্বাসীদের সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।[৩৭] মোতাওয়াক্কিল বিভিন্ন জাতিসত্তা হতে সৈন্য সংগ্রহ করার নীতি গ্রহণ করার পর হতে স্বাভাবিকভাবে আব্বাসী সেনাবাহিনীতে পূর্বের নৈতিক মনোবল সংহতি চেতনা রক্ষা করার মত বাস্তব অবস্থা বিদ্যমান থাকে নি।[৩৮] তদুপরি মাসুদীর বর্ণনা অনুসারে খলিফা মুতাসিম ফারগণি ও মধ্য এশিয়া হতে তুর্কি সৈনিক নিয়ে একটি নতুন বাহিনী গঠন করেন। তারাই রাজকীয় দেহরক্ষীতে পরিণত হয় এবং রাজধানী বাগদাদে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ জন্য ৮৩৬ সালে নবগঠিত রাজধানী সামাররায় তাদেরকে স্থানান্তরিত করা হয়। মুস্তাসিরের মৃত্যুর পর তারা সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। তৎকালীন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থা ছিল তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস পূরণের অনুকূলে। এ কারণেই আব্বাসী সেনাবাহিনী হতে পেশাগত দক্ষতা দ্রুত বিনষ্ট হতে থাকে।

খলিফা ওয়াসিকের মৃত্যুর পর হতে বাগদাদ খলিফাদের রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের দ্রুত পতন ঘটে; রাজ্যের বেসামরিক অভিজাত আমলাতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলে; কিন্তু সমরনেতারা পিছিয়ে থাকতে চায় নি। তারা বাগদাদের রাজনীতিতে প্রবেশ করে এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। এরূপ রাজনীতির পশ্চাতে ছিল সাম্রাজ্যব্যাপী সামাজিক অস্থিরতা। নবম শতকে অভূতপুর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকাশে আরব সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দুধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়: ক. সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আঞ্চলিক স্বার্থ চেতনা বৃদ্ধি পায়; খ. গ্রাম ও শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। এ সমস্যা সম্পর্কে তৎকালীন শাসক চক্র কেবল উদাসীনই ছিল না; তাদের শুল্কনীতি ছিল ভ্রান্ত। এরূপ পরিস্থিতিতে আব্বাসী বিরোধী শক্তি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। সাফফারী কারামত এবং জানজ বিদ্রোহ সাম্রাজ্যে ভিত্তিমূল একেবারে নড়বড়ে করে দেয়। রাজ্যের ঐক্য সংহতি এবং শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী সেনাবাহিনী। আবার শক্তিশালী সেনাবাহিনীর জন্য চাই যথেষ্ট অর্থায়ন। অথচ ইতিপূর্বে রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে; বাণিজ্যে দেখা দেয় মন্দা; কৃষকরা কর বন্ধ করে; এমনকি তাদের অনেকে গ্রাম ত্যাগ করে যাযাবর দস্যু জীবন গ্রহণ করে। এই ছিল আব্বাসী রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থা সংকট-সংকট আর সংকট। এরূপ অভূতপূর্ব বাস্তব অবস্থায় সেনা গঠনের জন্য সামরিক প্রশাসনিক ইকতা প্রথার প্রবর্তন করতে হয়। বস্তুত উল্লিখিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় আব্বাসী সামরিক

শক্তির অবক্ষয়ের প্রশ্নটি বিবেচনার দাবি রাখে। নিঃসন্দেহে 'প্রশাসনিক সামরিক ইকতা প্রথা' শিল্প ও বাণিজ্যেব জন্য ছিল অমঙ্গল; নিশ্চয় শুভ নয়। যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ঐ ইকতা অবস্থা গৃহীত হয়-সেই বাস্তব অবস্থাটি আব্বাসী সামরিক শক্তির অবক্ষয়ের প্রধান ও মূল কারণ; ইকতা ছিল নিমিত্ত মাত্র। কেবল প্রশাসনিক সামরিক ইকতাকে আব্বাসী সামরিক শক্তি অধঃপতনের কাবণ হিসেবে চিহ্নিত করলে একটি ঐতিহাসিক ধারাকে অতি সরলীকরণ করা হয়।[৩৯]

১২.২ আব্বাসী সমাজ : অভিজাত শ্রেণী

বিশ্ব সভ্যতাব বিকাশধাবায যে কোনো এক ঐতিহাসিক পর্বে একটি অগ্রগামী সামাজিক শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, চীন বা গ্রিসের দাস-মালিকরা প্রাচীন সভ্যতা বিনির্মাণ করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অগ্রসরতা দান করে। আরো লক্ষ্য কবা যায় যে, বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূচনা এবং তার বিকাশকালে ঐ সামাজিক শ্রেণীব প্রগতিশীল ভূমিকা থাকে বটে, তবে তারা অচিরে তাদের গড়ে ওঠা কাযেমী স্বার্থ বক্ষা করতে প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান গ্রহণ করে। সে সমাজে তখন দেখা দেয অবক্ষয় এবং ক্রমান্বযে তা ধাবিত হয় পতনের দিকে। প্রাচীনকালেব দাস নির্ভর অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার স্থলে মধ্যযুগের ভূমিভিত্তিক আর এক নয়া সামন্তবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে ওঠে; নয়া সংস্কৃতি, নয়া মনোভঙ্গির জন্ম হয; বিশ্ব সভ্যতা আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। এই নবতর সমাজ গঠনে ভূস্বামী সামাজিক শ্রেণী অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। পুনশ্চ নবতর সমাজে নয়া কায়েমী স্বার্থ গড়ে ওঠায় তারাও তাদের পূর্বসূরিদের মতো তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সমাজ প্রগতির পথ রুদ্ধ করে। নানা ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহে এ সময় আর এক নয়া সামাজিক শক্তিব জন্ম হয়। এরা উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে; বাণিজ্য বিপ্লব ঘটায়। এই বাণিজ্য বিপ্লবই অবশেষে শিল্প বিপ্লবে পরিণত হয়। জন্ম হয় আধুনিক বিশ্ব সভ্যতার। বস্তুত প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় সামাজিক গতিবাদ (Social dynamisni)। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ধর্মে এ সাধারণ ঐতিহাসিক বিধানটি হল অমোঘ।

মধ্যযুগে ইসলামি বিশ্বে ভূমিভিত্তিক একটি সামাজিক শক্তি নয়া সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। বহু চড়াই উৎরাই এর মধ্য দিয়ে উমাইয়াদের পতনে সিরিয়ায় উমাইয়া প্রতিষ্ঠিত দাসতান্ত্রিক সামন্ত ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপে সমগ্র ইরাক-ইরান-মিশরে সামান্ততান্ত্রিক দাস ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে।[৪০] আরব-আব্বাসী এবং ইরানী অভিজাত শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বে প্রাচ্য ইসলামি বিশ্ব নয়া সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা মধ্যযুগের প্রথম দিকে এক নয়া জীবন সাধনায় ব্রতী হয়ে তৎকালে বিস্ময়কর সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। সমসাময়িক কালে ইউরোপে এরূপ সাংস্কৃতির মান ছিল অকল্পনীয়। চীন দেশের কথা ভিন্ন! প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ে;

ইসলামি বিশ্বে নয়া আর্থ-সামাজিক বিন্যাস দেখা দেয়; নতুন সামাজিক বিন্যাস ঘটে। অধ্যাপক হিট্টি আমাদের আলোচ্য স্থান কালে সৃষ্ট প্রধান তিনটি সামাজিক শ্রেণীর উল্লেখ করেন।[৪১] তাঁর সামাজিক বিভাজন এরূপ: ক. অভিজাত শ্রেণী (Nability class) খ. সুধী সমাজ: বিদ্যুৎ সমাজ-বণিক-চারুকলা ও শিল্পী সমাজ (Commnalty), গ. নিম্নশ্রেণী বা মেহনতি জনতা।

তাঁর উল্লিখিত অভজিাত শ্রেণীর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক জীবন প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে; এখন তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সমাজের বণিক, চারু-কারু শিল্পীদের অর্থনৈতিক ভূমিকার বর্ণনা করা হবে। তৃতীয় নিম্নশ্রেণী তথা মেহনতি জনতার জীবন সাধনা আলোচিত হবে।

বাগদাদে খলিফা, তাঁর পরিবারপরিজন, তার হাশেমী গোত্রের সদস্যবৃন্দ এবং উদীয়মান উচ্চপদস্থ ইরানী সামরিক ও বেসামরিক আমলা নিয়ে গঠিত হয় নয়া অভিজাত শ্রেণী। আব্বাসী আমলে এই নয়া অভিজাত শ্রেণী বৃহত্তর সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়। বাগদাদ অভিজাত সমাজের শীর্ষে অবস্থান করতেন স্বয়ং খলিফা। এদের সাথে সংশিষ্ট ছিল তাঁদের সহচর অনুচর, পাত্র-মিত্র ও আশ্রিত সেবাদাসরা। শেষোক্তদের মধ্যে ছিল পারসিক সৈনিক দেহরক্ষীদল এবং বিরাট দাস-দাসী। জাতিসত্তা হিসেবে আরবরা এই উদীয়মান অভিজাত সমাজের সামরিক ও প্রশাসনিক অবস্থান হতে বিদায় গ্রহণ করে এবং পুরনো ইরানি-সামন্ত ও দেহকানরা সমগ্র প্রশাসন যন্ত্র হস্তগত করে। খলিফার দেহরক্ষী বাহিনী খোরাসানী সৈনিক নিয়ে গঠিত হয়। আব্বাসীরা শাসকবংশ হলেও এই উদীয়মান অভিজাত শ্রেণী ছিল শাসক শ্রেণী। এই অভিজাত শ্রেণীর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল স্বয়ং খলিফার সহধর্মীনী নির্বাচনে আরব রক্তধারা কোনো উপাদন হিসেবে অবশিষ্ট থাকে নি। খলিফাদের মধ্যে কেবল আবুল আব্বাস, মাহদী এবং আমীন ছিলেন স্বাধীন আরব মাতার সন্তান। তাদের পূর্বসূরি উমাইয়া বংশের মাত্র একজন খলিফা তৃতীয় ইয়াজিদের মাতা ছিলেন সাসানীবংশের বাদশাহ ইয়াজগিরদের কন্যা। আল মনসুর ছিলেন বারমেকী দাসী সন্তান মামুনের মাতা পারসী দাসী; ওয়াসিক ও মোহতাদীর মাতা গ্রীক দাসী। হারুনের মাতা খায়জুরান ছিলেন দাসী।[৪১] আর উদারহণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বস্তুত আব্বাসী বিপ্লবের সাথে আরব রক্তধারার আভিজাত্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। দাস প্রতিষ্ঠানটি তখনো বেশ শক্তিশালী ছিল। তবে প্রাচ্য দেশে দাসপ্রথা উৎপাদনেব সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ায় সেটাও অভিজাত্যের কোনো উপাদান হিসাবে বিবেচ্য থাকে নি। রাজনৈতিক ক্ষমতাই এখন আভিজাত্যের প্রধান মানদণ্ড এবং সমগ্র মধ্যযুগে ভূসম্পত্তি ছিল ক্ষমতার প্রধান উৎস। এ সময় রাজ্যজয়ের অর্থই ছিল ভূমি, ভূমি রাজস্ব এবং কৃষক হস্তগত করা। এটাই ছিল মধ্যযুগের রাজনীতির মর্মকথা।

বাগদাদ নগরই ছিল মধ্যযুগে প্রাচ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক জীবন ধারার প্রধান উৎস মুখ। বাগদাদের নগর পরিকল্পনা, তার প্রাসাদ-হর্মরাজী, সুবিন্যস্ত রাস্তাঘাট, উদ্যান, নগর প্রাকার, তোরণ-দুর্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। এখন রাষ্ট্রপতি হিসেবে নয় বরং সমাজপতি হিসেবে খলিফা ও তার অভিজাত শ্রেণীর জীবন শৈলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

আব্বাসী রাষ্ট্র প্রধান উমাইয়াদের তুলনায় অনেক বেশি জাকজমকপূর্ণ ও বিলাস-বহুল জীবন যাপন করতেন। খলিফা প্রাসাদতোরণ পেরিয়ে বাইরে আসার সময় তোরণের সম্মুখে হাজির থাকত জমকাল উর্দিপরা দেহরক্ষী দল। তারা উন্মুক্ত তরবারী, বক্রধনুক ও বর্শা দ্বারা সজ্জিত থাকত। হারুনুর রশীদ এবং আল মামুন প্রায়শ অশ্বাহোরণে অথবা পদব্রজে অল্পসংখ্যক অনুচরসহ নগর পরিক্রমা করতেন। শুক্রবারে জুমার নামাজ অথবা কোনো উৎসব উপলক্ষে মসজিদে ইমামতি করতেন তখন তাঁর অনুচরবর্গ এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের অবতারণা করতেন। সৈন্যরা পতাকা উড়িয়ে ঢোলক ও ভেরী বাজিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হত। তাদের পশ্চাতে চমকপ্রদ সাজে সজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে শাহজাদারা গমন করতেন এবং তাদের পিছনে থাকতেন প্রধান অমাত্যবর্গ। খলিফা শ্বেতঅশ্বে আরোহণ করে গমন করতেন। অবশিষ্ট দেহরক্ষীরা আসত সকলের পিছনে। খলিফা আজানু লম্বা কালো বা বেগুনী রঙের কোবা পরিহিত হয়ে শালের তৈরি কটিবদ্ধ বা মণিমুক্তাখচিত ঘুনসি কোমরে বেঁধে কাঁধের উপর মূল্যবান কালো রংয়ের অঙ্গরাখা জড়িয়ে মাথায় কালানসুয়া পরিধান করতেন। কালানসুয়া সাধারণত মূল্যবান হীরক খণ্ডে শোভিত থাকত। গলায় পরিধান করতেন রত্ন খচিত স্বর্ণমালা, মণিমুক্তা খচিত বকলস তাঁর পাদুকার শোভা বর্ধন করত। ভিতরে বুটিদার খাফতানের উপর গলার দিকে খোলা কোবা পরিধান করতেন। আস্তিন বোতাম দ্বারা আটকানো থাকত। মুস্তাইন ঢিলা আস্তিনের প্রচলন করেন।[৪২] রাজকীয় অভ্যর্থনা সাড়ম্বরে সম্পাদিত হত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে তিনটি হলঘর সভাসদ ও সকলস্তরের প্রভাবশালী লোকে পরিপূর্ণ থাকত। দরজায় ঝুলত মোটা বুটিদার পর্দা, সভাসদদের প্রবেশকালে হাজিরের বালক ভৃত্য তা উত্তোলন করত। অভিবাদনের পর সভাসদ অন্যান্যদের সঙ্গে দণ্ডায়মান হতেন। খলিফা সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকায় একশ দেহরক্ষী উন্মুক্ত তরবারী হাতে তার চারদিকে দণ্ডায়মান থাকতো। সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শাহজাদারা সারিবদ্ধ থাকতেন রাজাসনের ডাইনে ও বামে। শাহজাদা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা খ্যাতনামা ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা ছিল মোটামুটিভাবে প্রথা বহির্ভূত। খলিফা সবার সাথে আলাপ করতেন, বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করতেন; কবিরা তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন; পর্যটকরা তাদের ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করতেন। রমজান মাসে কখনো খলিফার নিজ প্রসাদে এবং অনেক সময় উজিরের সরকারি বাসভবনে সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদেরকে ভোজসভায় আপ্যায়ন করা হত। ঈদুল ফেতর উপলক্ষে খলিফা গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে ভোজে আপ্যায়ন করতেন।[৪৩]

আব্বাসী আমলে প্রভাবশালী লোকেরা রাষ্ট্র প্রধানের অনুকরণে পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। ভদ্র লোকেরা মাথায় কালানসুয়া টুপির সাথে ঢিলা পায়জামা শার্ট ফতুয়া জাতীয় অন্তর্বাস, জ্যাকেট, খাফতান, কোবা, সর্বোপরি আবা বা জুববা পরিধান করতেন। সাধারণ লোকেরা কালানসুয়া পারতেন। মোটা কালো টুপির নিচে সাদা রেশমের তৈরি আর এক প্রকার টুপি পরিধান করত; কালোটুপি খুলে ফেললে ঐ মূল টুপি মাথায় থাকত। মোজার ব্যবহার অজানা ছিল না। বিভিন্ন পেশার লোকেদের পোশাকে পার্থক্য ছিল। ভদ্র লোকদের রাত্রিকালীন পোশাককে বলা হত কুমশুন নাউম, ইজার, শার্ট, ফতুয়া লম্বা জ্যাকেট ফিতা দ্বারা কোমরের সাথে বাঁধা থাকত। সেই সঙ্গে কাঁধের উপর থাকত বিদা। পুরুষেরা বুট ও জুতো উভয়ই ব্যবহার করত। ধর্মবেত্তাদের পোশাক ছিল ভিন্ন ধরনের। বিচারপতি আবু ইউসুফের নির্দেশক্রমে হারুনুর রশীদের সময় ধর্মবেত্তাগণ কাল রংয়ের পাগড়ি পরিধান করে তার উপর তায়লাসান রুমাল ফেলে দিতেন। কোনো কোনো সময় তায়লাসান পরা হত কাঁধের উপর।

উমাইয়া আমলেই অনারব আসন পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। তাই আব্বাসী যুগে চেয়ার ও উচ্চ আসনের ব্যবহারের রেওয়াজ অব্যাহত থাকে। দরবার হলের তিন দিক জুড়ে দিভান বা সোফা বসান হত। হাতে বোনা নানা ধরনের কাপড় দিয়ে মোড়া হত মেঝে। অভ্যাগতরা আহার করত দীভানের পাশে রাখা টেবিলে। কাষ্ঠ নির্মিত টেবিলগুলো ঝিনুক আবলুস দিয়ে সাজান থাকত। খলিফা ওয়াসিকের দরবার হলে শোভা পেত সোনার টেবিল, রূপো, তামার উপর রাংতা প্রলেপিত কিংবা পিতলের তৈরি একটি বড় গোলাকার বারকোস। রূপা বা চীনা মাটির থালাগুলি সদা কাপড়ে ঢেকে প্রতিটি টেবিলে রাখা হত। অভিজাত পরিবারে জানজাল নামক কাটা চামচের ব্যবহার ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি করে তোয়ালে থাকত এবং ভোজনের পর একজন পরিচারক একটি গামলা থেকে জগের সাহায্যে তার হাতের উপর পানি ঢেলে দিত।[৪৪] অবস্থাসম্পন্ন লোকের বাড়িতে আচ্ছাদিত কাঁচের পাত্রে চিনি জলে ভাইএ্যলিট, রোজ, মালবেরী বা চেরিফুলের সিরাপ দিয়ে সুগন্ধ করা সরবত পরিবেশন করা হত অতিথিদের। খেজুর কিসমিস থেকে তৈরি নেবিজ, মধুপানি মিশ্রিত পানীয়ের বেশ প্রচলন ছিল।[৪৫]

মদ্যপান অবৈধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সমাজের উচ্চকোটির লোকের মধ্যে ঐ নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। মদাসক্তির ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় আরব্য উপন্যাস বা কিতাবুল আগানীতে উদ্ধৃত গল্পে। আবু নওয়াস রচিত জনপ্রিয় মদিরা কাব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা মদাসক্ত ছিলেন। বেশ ঘটা করে মদ্যপান মজলিস বসত অথবা ব্যক্তিগৃহে মদকপান চলত। হারুন, হাদী, মামুন, মুতাসিম ওয়াসিক মোতাওয়াক্কিল-সবাই ছিলেন মাদসক্ত। সম্ভবত মনসুর মুহতাদী ছিলেন ব্যতিক্রম। খেজুর হতে তৈরি মদ ছিল খুবই জনপ্রিয়। ইবনে

খলদুনের ধারণা ছিল হারুন ও মামুন নাবিজ বেশি পছন্দ করতেন।[৪৬] প্রমোদ আসর বসত সুশোভিত সুগন্ধময় কক্ষে। এখানে চলত মধ্যপান, নাচ ও গান। এরূপ পার্টিতে নর্তকী ও গায়িকারা হত সাধারণত ঢিলা চরিত্রের, দাসীরা। তরুণ সমাজের নৈতিক চরিত্রের উপর এদের অশ্লীল প্রভাব ছিল লক্ষণীয়।

আলোচ্য সময়ে অভিজাত ও সুধী সমাজে বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হারুনুর রশীদ প্রচলন করার পর দাবা তাস-পাশার স্থান দখল করে। ধনুর্বিদ্যার, হাত বন্দুকের সাহায্যে লক্ষ্য ভেদ করা, পোলো হকি (সুলাজান) বর্ষা নিক্ষেপণ, ঘোড়দৌড়, কুস্তি, অশ্বারোহণে অসি সঞ্চালন ছিল রহিরানন্দন ক্রীড়া। ক্রিকেট ও টেনিস খেলাও তাদের অজানা ছিল না।[৪৭] রাজপরিবার এবং উচ্চকোটির লোকের মধ্যে পশু শিকার ছিল সাধারণ আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার। আল আমীন সিংহ শিকার খুব পছন্দ করতেন; মামুন শুকর শিকারে খুব আনন্দ পেতেন। আবু মুসলিম এবং মুতাসিম বাঘ শিকারে আগ্রহী ছিলেন। বাজপাখির সাহায্যে শিকার করা ছিল আর একটি আমোদের ব্যাপার।[৪৮]

সাহিত্য সভা

উচ্চকোটির লোকেদের গৃহে অনেক সময় সামাজিক পুনর্মিলন এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এ সময় সামাজিক সমাবেশে জ্ঞানী ব্যক্তিরা যোগদান করতেন। আল-মামুনের সময় হতে সাহিত্য সমিতি গড়ে ওঠে; পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঐ গুণী সমাবেশে নানা দার্শনিক বিষয় আলোচনা করতেন এবং বিতর্ক সভাও অনুষ্ঠিত হত। মোতাওয়াক্কিল এবং মোতাজিদের সময় যদিও মুক্ত আলোচনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল তবুও বাগদাদ মোঙ্গল কর্তৃক ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এ রকম আলোচনা ও বিতর্ক সভা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি।[৪৯] অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাগদাদের পুস্তক বিপণন কেন্দ্রে বিভিন্ন পুস্তক দোকানে সাহিত্যিকদের নিয়মিত সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হত।

নারী সমাজ

একটি বিশেষ সমাজে নারীদের বাস্তব অবস্থান দিয়ে সেই সমাজের পরিশীলন, পরিমার্জন তথা তার সমগ্র সাংস্কৃতিক মান নির্ণয় করা যায়। এ প্রসঙ্গে মার্কসের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলতেন, এক ব্যক্তি কতটুকু প্রগতিশীল তা পরিমাপ করা যায় নারীদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। বস্তুত আব্বাসীযুগের সাংস্কৃতিক বাস্তব অবস্থার উপলব্ধি করতে হলে নারী সামজের সামাজিক অবস্থান অনুধাবন করা দরকার। আব্বাসী সুবর্ণ যুগে নারীদের অবস্থান উমাইয়া যুগ হতে ভিন্ন ছিল না। হারুন মাতা,

মাহদী স্ত্রী খায়জুরান, মাহদী কন্যা উলাইয়া, রশীদ পত্নী জুবায়দা প্রমুখ অনেক বিদুষী মহিয়সি-মহিলা আব্বাসী সমাজ জীবনে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে সমাজের শোভাবর্ধন করেন। তাদের অনেকে জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন; ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে এমন কি সেনা পরিচালনাও করেন। মুক্তাদিরের মাতা উচ্চ আপিল আদালতে সভানেতৃত্ব করতেন; প্রজাদের অভিযোগ শ্রবণ করতেন; সভাসদ ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদেরকে সাক্ষাৎ দান করতেন।

পদমর্যাদাসম্পন্ন মহিলাদের গৃহে মিলনোৎসব সাহিত্য সভা বা আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। মোতাওয়াক্কিলের শাসন আমল পর্যন্ত কোনো দিন এসব অনুষ্ঠানের বন্ধ হওয়ায় কথা জানা যায় নি। নারীরাও পুরুষের সাথে কাব্য রচনা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অবতরণ করতেন। আবুল ফারাজ ইসপাহানি কিতাবুল আগানী গ্রন্থে খঞ্জনী বিশারদ উবাইদাকে অতীব সৌন্দর্যময়ী, গুণবতী এবং প্রতিভাময়ী রমণী বলে বর্ণনা করেছেন।[৫০] আব্বাসীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিনষ্ট হলে বুওয়াইহী শাসন আমল হতে মুসলিম নারী সমাজের অবস্থানে অবনতি ঘটে। বাগদাদের সুন্নিদের ধর্মীয় নেতা খলিফা আল ক্বাদিরের যুগ হতে পর্দা প্রথার প্রবর্তন করা হয়। উপপত্নী ব্যবস্থার বাহুল্যে অভিজাত শ্রেণীর পারিবারিক জীবনে অনেক অনাচার নেমে আসে। এর কু-প্রভাব সমগ্র সমাজ জীবনে পতিত হয়।

ইসলাম ধর্মে বিবাহ প্রথা একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান; পারিবারিক গৃহ একটি পবিত্র ধাম; সন্তানের জন্ম এবং বিশেষভাবে পুত্র সন্তানের জন্ম স্বর্গীয় আর্শিবাদ বলে বিবেচিত হত। পতিসেবা ছিল নারীধর্ম। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার পড়ত মায়ের উপর; সন্তান লালন পালন, গৃহাস্থলির ব্যবস্থাপনা, অবসর সময় সূতা কাটা, কাপড় বোনা -এসবই ছিল মধ্যযুগে আদর্শ মুসলিম নারীদের কাজ।

উমাইয়াদের সময় থেকে নারীদের পোশাকে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। উচ্চকোটির সমাজের মহিলাদের ফ্যাশান রাণী ছিলেন সম্রাজ্ঞী জুবাইদা। তিনি মহিলাদের আদব কায়দা, পোশাক পরিচ্ছদ অলঙ্করণ বিষয়ে নেতৃত্বদান করেন। উচ্চ শ্রেণীর মহিলারা শিরাবরণী হিসেবে পরিধান করতেন মণিমুক্তা খচিত গম্বুজাকার টুপি। এই টুপির নিম্নাংশে মনি বসান সোনার একটি ক্ষুদ্রবৃত্ত থাকত। রশীদ ভগ্নি উলাইয়া এটার প্রবর্তন করেন। সাধারণ ভদ্রমহিলারা সাধারণত মুক্তা ও পান্নাখচিত ফিতার মত চেপ্টা ঋণ দ্বারা মস্তক সজ্জিত করতো। পায়ে নুপুর এবং হাতে বালা ব্যবহৃত হত। নারীদের মধ্যে রূপ চর্চার ঝোঁক ছিল প্রবল। গণ্ডদেশ ওষ্ঠরঞ্জিত করার কৌশল তাদের আয়ত্বে ছিল। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম ফোটা দেয়ার পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সুন্দরী বলে বিবেচিত হতে হলে নারীদেরকে দীর্ঘ ক্ষীণকায়, সুঠাম, সুশ্রী—সেই সাথে বৃহৎ টানা, কালো চক্ষুবিশিষ্ট হতে হত।[৫১]

দাস-দাসী

আমাদের আলোচ্য সময়ের অভিজাত শ্রেণী এবং সুধী সমাজের পারিবারিক জীবনের কোনো পূর্ণাঙ্গ ধারণা স্পর্শ হবে না যদি তৎকালীন সময়ের দাস প্রথার উপর একটু আলোকপাত না করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইউরোপের মধ্যযুগে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে দাস প্রতিষ্ঠানের অবস্থান অনেকাংশে নমনীয় হলেও প্রাচ্যদেশের তুলনায় তাদের অবস্থা তখনও ছিল দুর্ভাগ্যজনক। বাস্তব অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় ইসলাম দাস প্রথা উচ্ছেদ করার গৌরব অর্জন করে নি সত্য, কিন্তু তাদের মুক্ত করাকে একটি বড় পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হত এবং তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সর্বদাই উৎসাহিত হত। যা হোক পূর্বে মন্তব্য করা হয়েছে যে, প্রাচ্য জগতের দাসদের আর্থ-সামাজিক কোনো ভূমিকা না থাকায় দাস প্রথা অভিজাত্যের কোনো উপাদান বিশেষ বিবেচিত হত না তথাপিও অভিজাত পরিবারের দাসদাসীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আব্বাসী রাজপ্রাসাদে দশ-বার হাজারের এক বিরাট দাস বাহিনীর কথা জানা যায়। একদিন মোতাওয়াক্কিলকে তাঁর এক সেনাধ্যক্ষ দু হাজার দাস দাসী উপঢৌকন দেন। সত্য বলতে এরূপ দাস-দাসী উপঢৌকন হিসেবে দেয়া অনেকাংশে রেওয়াজে পরিণত হয়।[৫২] বিভিন্ন নগর-শহর-গঞ্জে দাস বাজার বসত। রাজ প্রাসাদের জন্য হাজার হাজার দাসদাসী বিভিন্ন স্থান হতে ক্রয় করা হত। যেহেতু দাসদাসী সংগৃহীত হত নানা জাতিসত্তা হতে তাই তারা হত নানারঙের ও নানা বর্ণের। হেরেমে থাকত অসংখ্য দাস-দাসী। হেরেমের দাসেরা হত নপুংশক। আল্প বয়স্ক দাস নিয়ে গড়ে তোলাহত গিলমান। গিলমানরা ছিল যথেষ্ট অনুগ্রহপুষ্ট; পারস্য ঐতিহ্য অনুসারে আল-আমিন তাঁর দরবারে গিলমান প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত করেন। কবি আবু নওয়াস ঐ শশ্রুবিহীন তরুণ গিলমান সম্পর্কে অনেক কাব্য রচনা করেন।[৫৩] কুমারী দাসীদের একাংশ ছিল নর্তকী, বাইজী ও গায়িকা। তারা প্রমোদ জলসায় অভিজাতদের চিত্ত বিনোদন করত; তাদের অনেকে সমাজের উচ্চকোটির মানুষের উপপত্নী হত। এ ব্যবস্থাকে অনেক ঐতিহাসিক আব্বাসী খেলাফতের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন। দু একটি পছন্দসই দাসী অতি উচ্চমূল্যে খরিদ করা হত। হারুন ৭০ হাজার দিরহাম দিয়ে জাতুলখালকে ক্রয় করেন। সম্রাজ্ঞী জোবায়দা এক উপপত্নীর কবল হতে খলিফা হারুনকে মুক্ত করার জন্য তাকে ১০ জন কুমারী দাসী উপঢৌকন দেন। এই দশ জনের একজন ছিলেন খলিফা আল মামুনের মাতা; আর একজন ছিলেন আল মুতাসিমের মাতা।

দাসীদের অনেকের উচ্চ শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং মার্জিত রুচিশীলতার কেবল নামই ছিল না বরং তাদের কেউ কেউ তৎকালীন সমাজের ফ্যাসান রাণীও ছিল। আরব্য উপন্যাসে তাইয়াদ্দুদের কথা কে না জানে? খলিফা হারুন তাকে এক লাখ দিনার দিয়ে ক্রয় করেন। আইনশাস্ত্র, জ্যোর্তিবিদ্যা, দর্শন, সংগীত, ইতিহাস ও কাব্য ক্ষেত্রে ছিল

তার বুৎপত্তি।[৫৪] বস্তুত অভিজাত পারিবারিক জীবনে দাস-দাসীর প্রয়োজনীয় উপাদন বলে বিবেচ্য হলেও রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে এর কুপ্রভাব ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর।

দ্বিতীয় সামাজিক শক্তি

বণিক সমাজ

উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসী স্বৈর শাসন আমলে আরব সাম্রাজ্যে দ্রুত আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটে। রাজস্ব আদায়কারী, ইজারাদার, ইকতাদার, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, মহাজন, আড়তদার, কাফেলা বাণিজ্যের পথপ্রদর্শক, দালাল ইত্যাদি উদীয়মান সমাজের সবার হাতে প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চিত হওয়ায় অষ্টম-নবম শতাব্দী পরিণত হয় আরব বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বর্ণ যুগ। এ সময় আটলান্টিক মহাসাগর হতে চীন সাগর পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমগ্র জলপথে আরব বাণিজ্য নৌহরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে চীন-আলেকজান্দ্রিয়া-ত্রিবিজেন্দ পর্যন্ত বিস্তৃতি স্থল পথে কাফেলা ব্যবসায় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[৫৫] এরূপ শুভলগ্নে মনসুর কর্তৃক বাগদাদ প্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিপ্লব ত্বরান্বিত করে এবং মধ্যযুগের প্রথম দিকে বাগদাদ হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ্র। অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক কর্মযজ্ঞের ফলে ইসলামি বিশ্বে একটি নয়া সামাজিক শ্রেণী গড়ে ওঠে এটাই হিট্টি কথিত ভদ্র শ্রেণীর বিকাশের মূল রহস্য। প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় খ্রিষ্টান, ইহুদি ও জরস্ত্রীয়রা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সাগ্রহে অবতীর্ণ হয়। দেখতে দেখতে বাগদাদ ব্যতীত সিরাফ, বসরা, আলেকজান্দ্রিয়া ইত্যাদি অসংখ্য সমুদ্র-নদী-স্থল বন্দরের বিকাশ ঘটে। ইতমধ্যে আরব মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হতে দেশ জয়ের রঙিন স্বপ্ন কেটে গেছে এবং আরব লড়ুকেরা বেদুইন জীবনধারা হারিয়ে শান্ত নাগরিক জীবনের স্বাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের হাতে অগাধ সম্পত্তি থাকায় তারাও বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পূর্ব দিকে সুদূর চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ভারত-চীন বাণিজ্য অভিযানের বিবরণ জানা যায় সুলায়মান আত্তুজ্জারের লেখনিতে। এ সব অভিযানের মধ্যদিয়ে চৈনিক রেশম সড়ক ধরে চীনা সিংকিয়াঙ প্রদেশ পেরিয়ে সমরকন্দ হয়ে বাগদাদ এবং ইউরোপ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে চীনা রেশমের আমদানি হয়। এই সর্ব প্রথম বড়মাপের ঐ ব্যবসায়ের সূচনা হয়।

আরবের সাথে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্কে ফলশ্রুতিতে চীনে ইসলামের বিস্তার ঘটে এবং হুই-মুসলিম সমাজ চীনে গড়ে ওঠে। মার্কোপোলর বিবরণ হতে এসব তথ্য জানা যায়।[৫৬]

পশ্চিম দিকে মরক্ক ও স্পেন পর্যন্ত আরব বাণিজ্য বিস্তৃত হয়। একটি বিশাল মরুপথ দক্ষিণে আফ্রিকার অনেকগুলো দেশের উপর দিয়ে চলে যায়; ভূমধ্যসাগরের অসংখ্য বন্দর থেকে উত্তরাঞ্চলের বাণিজ্য পসরা স্পেন, সিসিলি, ইতালি ও ফ্রান্সে

পৌঁছে দেয়। পারস্য উপসাগর উপকূল হয়ে মালামাল হতে ক্যাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে মালামাল উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহে প্রবেশ করত। রাশিয়া হতে সুইডেন পর্যন্ত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। রোখারা, সমরখন্দে এবং পারস্যের অন্যান্য উদীয়মান বাণিজ্য কেন্দ্রের বিকাশে ক্যাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে মালামাল উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহে প্রবেশ করত। আরব সাম্রাজ্য হতে খেজুর, চিনি, সূতী-রেশমীবস্ত্র, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি, নানাবিধ গ্লাস সামগ্রী বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত, এবং এশিয়ার পূর্বাঞ্চল হতে সুগন্ধি পণ্য সামগ্রী কর্পুর, আফ্রিকা হতে হাতির দাঁত, নিগ্রোদাস ইত্যাদি আমদানি করা হত। নয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলশ্রুতিতে অষ্টম-নবম শতকে বাগদাদে অনেক রথচাইল্ড বা রকফেলারের জন্ম হয়। তাদের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন বিখ্যাত স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ী ইবনুল জাস্‌সাস। খলিফা মুক্তাদির তার ১,৬০,০০০০০ দিনারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরও তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। জনৈক বসরা ব্যবসায়ীর বার্ষিক আয় ছিল এক মিলিয়ন দিরহাম। বসরার আর একজন অশিক্ষিত আটা ব্যবসায়ী মুতাসিমের উজির পদে অভিষিক্ত হন। সিরাফে সাধারণ ব্যবসায়ীদের বাড়ি ভাড়া ছিল দশ হাজার দিনার; অনেকের বাড়ি ভাড়াছিল ত্রিশ হাজার দিনার। ৪ লাখ দিনার মূলধনের মালিক ব্যবসায়ী সংখ্যা ছিল বহু। বণিকদের অনেকে জীবন কাটান সমুদ্রে। ইস্তাখারী বলেন যে, তিনি একজন ব্যবসায়ীকে জানতেন যিনি ৪০ বছর ধরে সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ান।[৫৭]

ইসলামি বিশ্বের ঐ অভূতপূর্ব বাণিজ্য বিপ্লবের রেশ প্রায় দশম শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে বটে; তবে একাদশ শতাব্দীতে এর অবক্ষয় ও পতন ঘটে তাই নয়—বরং বাণিজ্যের প্রতি তাদের অবজ্ঞা বৃদ্ধি পায়; আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবল হয়; সর্বত্র প্রশাসনিক সামরিক ইকতা প্রথা সুদৃঢ় হয়; সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহে গ্রামীন কৃষি অর্থনীতি প্রবল হয়; গ্রামগুলো হয়ে ওঠে নিস্তরঙ্গ ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রজাতন্ত্র; স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ ব্যবস্থা পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রশ্ন হতে পারে ইউরোপ ইটালির নগরসমূহ ও তাদের বণিক বুদ্ধিজীবী আধুনিক ইউরোপের বিকাশে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে, ইসলামি বিশ্বের বন্দরনগরসমূহ এবং তাদের বণিক বুদ্ধিজীবী সমাজ সেরূপ কোনো ভূমিকা পালন করে নি কেন?

ইসলামি বিশ্বের এ ব্যার্থতার কারণ সম্ভবত নিহিত ছিল তার আর্থ-সামাজিক দুর্বলতার মধ্যে। আরব বাণিজ্য ছিল পণ্য বিনিময় চরিত্রের। রেনেসাঁস যুগ হতে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে ইউরোপীয় বণিক সামাজের যে স্বাধীন ভূমিকা ছিল আরব বণিকদের সেরূপ কোনো ভূমিকা ছিল না।

উৎপাদন সম্পর্ক বর্জিত আরব বণিকরা অভিজাতদের ভোগবিলাস দ্রব্যের সরবরাহকারী বৈ অন্য কিছু ছিল না। তাই তাদের প্রতি অভিজাতদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাচ্ছিল্যের। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইসলামের অভ্যুদয় প্রাক্কালে অবক্ষয়ী সুদি

কারবারে এবং ব্যবসায়ীদের প্রতারণামূলক আচরণের প্রতি ইসলামের যে বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয় সুবিধেভোগী উৎপাদন বিমুখী অভিজাত শ্রেণী তা সযত্নে লালন করে। সুদি বা অর্থলগ্নি করবার প্রতিষ্ঠানটি মুসলিম সমাজ সঠিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে বিচার করে নি। মধ্যযুগে তাই মুসলিম বণিক সমাজ বাণিজ্য পুঁজিতে ছিল দুর্বল। বণিক সমাজের বিপুলাংশ গঠিত ছিল অমুসলিমদের নিয়ে, তাই তাদের পক্ষে শেষোক্ত সমাজের উপর সামাজিক প্রভাব বিস্তার করা ছিল দুরূহ ব্যাপার।[৫৮]

ইসলামি সাম্রাজ্যের উত্তর বাণিজ্য যা ক্যাসপিয়ান উপকূল হতে চীন সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র মধ্য এশিয়াব্যাপী বিস্তৃত ছিল তা দশম শতাব্দীর পর হতে রুশ-বুলগার-বাইজানটিয়ামের ঐক্যবদ্ধ বাণিজ্যিক আগ্রাসনে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পারস্য উপকূলে জানজ বিদ্রোহ এবং কারামাতা বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে আব্বসী কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক সংকটের সুযোগে ইসমাইলী শিয়া সম্প্রদায় মিশর হতে আব্বাসীদের উৎখাত করে; কায়রো হয়ে ওঠে ইসলামের আর একটি স্নায়ু কেন্দ্র। ফাতেমীরা ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য কায়রোর দিকে আকৃষ্ট করতে সফল হওয়ায় আব্বাসীদের দক্ষিণ-বাণিজ্যও ধ্বংস হয়। ফাতেমীরাও বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। তবে তাদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপে ইতালি বণিকরা অনেক বেশি লাভবান হয়। বস্তুত ইসলামি সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক ধ্বংসস্তূপে ইউরোপ দাঁড়িয়ে যায়।

মিশরে ফাতেমীদের পতন এবং আইয়ুবীদের উত্থানে পশ্চিম এশিয়ায় এক নয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়। আইয়ুবীদের অনুসরণে মামলুক বা পশ্চিম এশিয়ার একত্রিকরণ নীতি বহুলাংশে সফল হয়; প্যালেস্টাইন হতে ক্রুসেড শক্তি বিতাড়িত হয়। এ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে ভূমধ্যসাগর উপকূলীয় বন্দরগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনার পর আরব নৌশক্তি নিঃশেসিত হয়। এই সাথে প্রাচ্য-প্রতিচ্যের বাণিজ্য মুসলিম বিশ্বের মধ্যস্থতার ভূমিকার পরিসমাপ্তি ঘটে। বৈদেশিক বাণিজ্য হতে মুসলিম বিশ্বের বিদায় গ্রহণ ছিল খুবই মারাত্মক; নয়া উৎপাদন শক্তির বিকাশের শেষ আশাটুকুও শেষ হয়ে যায়। অষ্টম হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মুসলিম বিশ্বের বণিক সমাজ স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। সাম্রাজ্যের সামন্ত শক্তির সাথে তাদের অঘোষিত দ্বন্দ্বে তারা সামন্ত শক্তিকে পরাজিত করে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় নি অথবা সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে পারে নি।[৫৯]

চারু ও কারুশিল্পী সমাজ

উল্লিখিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দু শতাব্দী ধরে ইসলামি বিশ্বে তার প্রাধান্য টিকিয়ে রাখতে পারার একটি বড় কারণ—আব্বাসী সুবর্ণ যুগে সাম্রাজ্যের সর্বত্রই কুটির শিল্পের বিকাশ ছিল অভূতপূর্ব। কুটির শিল্পের সাথে সর্বত্র কারু ও চারু শিল্পী সমাজের উত্থান হয়। পশ্চিম এশিয়ায় নানা রকম মনোরম কম্বল, যাবতীয় সূচিকর্ম, রেশম সূতি-বস্ত্র, সার্টিন, ব্রোকেড, সোফা কুশন কাভার, হরেক রকমের গৃহস্থালী-আসবাবপত্র ও

তৈজসপত্র, সিরিয়ার রকমারি টেবিল, সোফা, ল্যাম্প, ঝাড়বাতি, ফুলদানি, নানাবর্ণের ও নানা প্রকারের মৃৎপাত্র, টায়ার, সিডন নগরের স্বচ্ছ ও পাতলা গ্লাস ছিল মধ্যযুগের বিস্ময়। এসব পণ্য ক্রুসেডাররা ইউরোপে রপ্তানি করে। মিশরী দিমিয়াতি এবং তিউনিসী ছিল জগৎ বিখ্যাত। এ সময় ইরাক ও পারস্যের তাঁত শিল্প পণ্য কার্পেট ও বস্ত্রের চাহিদা ছিল প্রচুর। মনসুরের মাতা তের কোটি দিরহাম মূল্যের স্বর্ণ-রুবী খচিত পশু পক্ষীয় নকশাদার কম্বল খরিদ করেন। বাগদাদের ডোরাকাটা বস্ত্র আফতাবী ইটালি ও ফ্রান্সের তাবীবস্ত্র নামে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৬০] কুফার রেশমি উড়না ছিল বিখ্যাত। ফারেসের তাওয়াজ, ফাসা এবং বিভিন্ন নগরে সরকারি মর্যাদার পোশাক (Robes of honour) তৈরি হত। তুসতার এবং খুঁজিস্থানের সুস নগরে নকশাদার দিমিস্ক ও রেশমি পর্দা ছিল বিখ্যাত; সিরাজ নগরের তাফতা ইউরোপীয় বাজার ছেয়ে ফেলে; খোরাসান এবং আর্মেনিয়া বিছানার চাঁদর, পর্দার কাপড় এবং সোফা কভারের জন্য বিখ্যাত ছিল। মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্র বোখারা রকমারি জায়নামাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। শিল্প পণ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন মাকদেসী। এই তালিকায় সাবান, কার্পেট, তামার পাত, ধাতব পাত্র, ফল্টের চাদর, মধু, বাজপাখি, কাইচি, সুচ, চাকু, তলওয়ার, ধনুক ও তুর্কি দাসের উল্লেখ আছে। দালানকোঠার ভিতব ও বাইরে অলংকরণের জন্য দামাস্কাসে রঙবেরঙের কাশানী টাইল পাওয়া যেত। কাগজ শিল্পের কথা অবশ্য অন্যত্র বলা হয়েছে।[৬১] মনিমুক্তা, রুবী, ডায়মণ্ড, সোনা-রূপার অলংকার শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। খলিফা হারুন ৪০ হাজার দিনার দিয়ে এমন একখণ্ড রুবী সংগ্রহ করেন যে, রাতের অন্ধকার কক্ষে তা স্থাপন করলে গোটা কক্ষ আলোকিত হত। ইয়াইয়া বারমেকী ৭০ লাখ দিরহাম দিয়ে একটি জুয়েল-বাক্স খরিদ করেন।[৬২] মোতাওয়াক্কিলের রাজকীয় ভোজে এবং মামুনের বিবাহ উপলক্ষ্যে সংগ্রহ করা মুক্তাখচিত সোনার টেবিল এবং ট্রে ব্যবহার করা হয়।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতে যা স্পষ্ট বেরিয়ে আসে তা হল আব্বাসী সুবর্ণযুগে ক্ষুদে শিল্পপণ্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে; কিন্তু যা লক্ষ্য করার বিষয় তা হল এই যে, ইসলামি কুটির শিল্প তার উৎপাদনের পরবর্তী স্তর কারখানা শিল্পস্তরে (মার্কসের ভাষায় (Manufacturing stage) উত্তরণ ঘটে নি কেন? অথচ রেনেসাঁস উত্তর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের কমিউনে অথবা ইংল্যান্ডের টিউডর ও স্টুয়ার্ট আমলে তা সংঘটিত হয়েছিল এবং এ প্রক্রিয়াই বাণিজ্য বিপ্লবের বড় সহায়ক শক্তি বলেই বিবেচিত হয়।[৬৩]

বস্ত্র, রেশম, চামড়া, মৃৎ, কাঠ, ধাতব এবং নানাবিধ শিল্পে নিয়োজিত বিরাট কারিগর সমাজের লোকেরা গ্রাম এবং শহরে বসবাস করত। গ্রামাঞ্চলে এ সময় হস্তশিল্প কৃষি হতে অনেকাংশে পৃথক হয়ে পড়ে বিধায় শিল্পকর্মে স্বাধীন ক্ষুদে উৎপাদকের প্রমাণ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিশাল বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ দ্রব্য

বিনিময় প্রথার প্রাধান্য থাকায় গ্রাম্য ক্ষুদে উৎপাদকদের মধ্যে বাণিজ্য চেতনার উন্মেষ হয় নি; শহরাঞ্চলে কুটির শিল্পের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু এর বড় অংশ ছিল সরকারি অথবা শহুরে সামন্তদের নিয়ন্ত্রণে। এরূপ কুটির শিল্পে প্রচুর দাস শ্রমিক নিয়োগ করা হত। শহরে নগণ্য সংখ্যক স্বাধীন কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে যা খুবই লক্ষণীয় তা হল শহুরে ক্ষুদ্র শিল্প বাণিজ্য হতে পৃথক হয় নি এ কারণেই আব্বাসী যুগে কারিগর গিল্ডের কোনো অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। কৃষির মত এতে ও কৃৎকৌশলের ব্যবহার ছিল নগণ্য; কায়িক শ্রম, কারিগরের দক্ষতা, এবং ঘরোয়া হাতিয়ার ছিল তাদের অবলম্বন। কুটির শিল্প বিকাশে এদেশের বণিক সমাজের কোনো ভূমিকা ছিল না। কেননা বণিক সমাজও কোনো স্বাধীন শ্রেণীতে পরিণত হতে পারে নি। এরূপ দুর্বল অর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ইসলামি বিশ্বে বণিক উন্নত অর্থনৈতিক বিকাশে কোনো উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে পারে না। তারা নিজেরাই ছিল সামন্ত শোষণে আড়ষ্ট।[৬৪]

মেহনতি জনতা : কৃষি ও কৃষক সমাজ

আব্বাসী সুবর্ণ যুগে কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। উমাইয়াদের পতনের সাথে সিরীয় কৃষির কিছু অবনতি ঘটলেও ইরাক-ইরান-মিশর এবং মধ্য এশিয়ার সর্বত্র কৃষির উন্নতি হয়। তুলনামূলকভাবে আব্বাসী যুগের প্রথম প্রায় এক শতাব্দীকাল প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বের সামাজিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। আব্বাসী সরকার প্রথম হতে কৃষির প্রতি প্রচুর মনোযোগ দান করে। তাই কৃষির উন্নতির ঢেউ সাম্রাজ্যের সর্বত্র দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, আরবরা ইরাক-ইরান দখল করায় এতদাঞ্চল প্রাচীন সামন্ত শোষণ হতে অনেকখানি মুক্তি পায়; তাই পূর্বের তুলনায় এ আমলের কৃষক সমাজের আর্থিক-সামাজিক উন্নতি হয়। উমাইয়া যুগে গ্রাম সমাজ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হলেও আব্বাসী আমলে পুনরায় তারা স্বচ্ছন্দ হয়। পরিত্যক্ত গ্রাম-সমাজ পুনরায় পুনর্বাসিত হয়; তাদের অধীনস্ত খেত খামার পুনরায় সুজলা সুফলা হয়ে ওঠে। খলিফা আল মনসুর কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যাপক সেচ-কর্মসূচি গ্রহণ করেন। পরিকল্পিতভাবে অসংখ্য খাল খনন বা পুনর্খননের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা হয়। এই সব খালের মধ্যে নহরে ইসা, নহরে সারাহ, নহরে কুতা, বড় সারাহ, নহরে দুজায়েল, নহরে মালিক, নহরে সালেহ ছিল প্রসিদ্ধ। এই সব প্রধান খাল হতে অসংখ্য সেচনালাও খনন করা হয়। ইউফ্রেটিস এবং তাইগ্রীসকে বিভিন্ন স্থানে খাল দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। বাগদাদ সরকারের সুদিনে উত্তম সেচ ব্যবস্থা এবং পানির সর্বাধিক ব্যবহার করে। প্রাচীন ব্যাবিলন বা ইরাক ভূস্বর্গে পরিণত হয়। ইরাকের উৎপন্ন ফসল : বার্লি, গম, ধান, খেজুর, তিল, তুলা, শন ইত্যাদি। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সকল প্রকার ফল ও সবজি উৎপন্ন হত। বাদাম, কমলা, বেগুন, আখ সিম, কলাই, গোলাপ ও পদ্ম প্রচুর পরিমাণে

উৎপন্ন হত। আব্বাসী স্বৈরশাসনে দ্রুত নাগরিকতার বিকাশ ঘটে। ইতিমধ্যে আরব গোত্রীয় লড়াকুরা তাদের বেদুঈন জীবনধারা হারিয়ে ফেলে। এদের প্রচেষ্টায় বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে অসংখ্য বাগিচা শিল্পের বিকাশ সাধিত হয়। তাদের এরূপ বাগিচা রচনার পশ্চাতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য প্রাধান্য লাভ করে নি; এগুলো খুদে উৎপাদনের গণ্ডিও অতিক্রম করে নি। এ সব বাগিচা নয়া আভিজাত্যের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলো অবশ্য শহরের স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সাহায্য করে। এসব বাগিচায় বেগার শ্রম, দাস শ্রমের আধিক্য ছিল; মজুরী শ্রমের কথাও জানা যায়। এতে শহরের গ্রামিনিকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে; বাগদাদের রাজনৈতিক দূরাবস্থা অথচ অভিজাতদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে।[৬৫]

কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে খোরাসান ছিল ইরাক-মিশরের সমতুল্য। ইতিপূর্বে অন্যত্র খোরাসান হতে কত খাজনা আদায় হত-তা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত তথ্য হতে খোরাসানের কৃষির বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। সাসানী যুগে বোখারার অঞ্চলকে বলা হত বাগ-বাগিচার দেশ। সমরকন্দ-বোখারার মধ্যবর্তী এলাকা বা সোগদানিয়া অববাহিকাকে বলা হত চতুর্থ ভূস্বর্গ; অন্য তিনটি : শিবে বত্তিয়য়ান, উবুল্লা খালের বাগিচা এবং দামাস্কাস বাগিচা। এসব বাগিচায় উৎপন্ন হতো নানা জাতের ফল ও রকমারি সবজি ও পুষ্প—যেমন খেজুর, আপেল, এপ্রিকোট, পিস, লেবু, কমলা, ডুমুর, আঙ্গুর, ওলিভ, ডালিম, আনার, বেগুন, মুলা, শসা, কুমড়া, গোলাপ ও তুলসী।

পুষ্পোদ্যান রচনা ছিল এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ফুল চাষ কেবল সৌখিন ব্যাপার ছিল না; বরং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ সময় ফুল চাষ হয়। গোলাপ, পদ্ম, কমলা ইত্যাদি হত দামাস্কাস, সিরাজ এবং জুবে নগরীতে প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি দ্রব্য সামগ্রী তৈরি হত। জুবেলার গোলাপের আতর ছির খুবই বিখ্যাত। জুব হতে পূর্বে চীন ও পশ্চিমে মরক্কোতে সুগন্ধি দ্রব্য এবং গোলাপ জল রপ্তানি হত। খাজনা হিসেবে ত্রিশ হাজার বোতল গোলাপ জল আদায় করা হত। গবাদি পশু পালনের উন্নতি হয়; দুগ্ধ মাংস ব্যতীত কৃষি কাজ এবং স্থল পথে বাণিজ্যে ভারবাহী পশুদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।[৬৬]

নবম শতাব্দীতে দক্ষিণ ইরাকে কৃষিতে বাণিজ্য পুঁজি বিকাশোন্মুখ হয়। বসরাব বণিকরা বাণিজ্য ভিত্তিক তুলা, নীল এবং ইক্ষু চাষ আরম্ভ করে, জানজিবার হতে সংগৃহীত কৃতদাসদেরকে উক্ত বৃহদায়তনের কৃষি উৎপাদনে নিয়োগের প্রথম ও শেষ প্রচেষ্টা চলে। জানজ বিদ্রোহের ফলে জানজ বিদ্রোহের পরিণতিতে ঐ উদীয়মান প্রক্রিয়া অচিরে বিনষ্ট হয়। এই ঘটনার পর মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে বাণিজ্যভিত্তিক বৃহদায়তনের পণ্য উৎপাদনের আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি।[৬৭]

আব্বাসী সুবর্ণ যুগে কৃষির এরূপ উন্নতি হয় বটে; তবে এটা ছিল চিত্রের এক দিক। এ উন্নতি আদৌ স্থায়ীত্ব লাভ করে নি; কৃষি সমাজ-জীবনে মুক্তি আসে নি।

প্রথমত গ্রামাঞ্চলে কৃষি বা সেচ ব্যবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধন করা হয় নি। কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল একেবারে সরল ও আদিম স্তরের। উন্নত হাতিয়ারের ব্যবহার করে শ্রমজীবীদের কষ্ট লাঘব করা এবং উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করার চিন্তা সরকারি মহলে ছিল বলে মনে হয় না; সিস্তানে প্রাপ্ত সে যুগের উন্নত সেচ ব্যবস্থার যথোপযুক্ত ব্যবহার প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বে হয় নি; বরং ঐ প্রযুক্তি ইউরোপে স্থানান্তরিত হলে ইউরোপীয় সামন্ত শক্তিই উপকৃত হয়। তখন হতে ইউরোপীয় কৃষির উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।[৬৮]

দ্বিতীয়ত এটা বাস্তব সত্য যে, দশম শতাব্দী হতে গ্রামসমাজ তথা কৃষকরা নানাবিধ দুর্নীতি ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। শহুরে সম্পত্তি বা শহুরে শিল্প পণ্য এবং বড় ব্যবসা ছিল অনেকাংশে শুল্কমুক্ত। রাজস্বের সিংহভাগ ভার চাপান হয় গ্রাম্য কৃষির উপর। এ কারণে দশম শতাব্দী হতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র কৃষি বিদ্রোহ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট লেগে থাকে। জানজ বিদ্রোহ, কারামাতা বিদ্রোহ এবং সাফফারী বিচ্ছিন্নতাবাদ ঐ বাস্তব অবস্থার বহিঃপ্রকাশ। কৃষকদের অনেকে গ্রাম ত্যাগ করে যাযাবরী জীবন যাপন করে, কাফেলা বাণিজ্যের উপর লুটতরাজ চালায়। এভাবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হয়। এই সুযোগে তুর্কি সমরনেতারা বাগদাদের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে; তারা জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে; তাদের ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে; বুওয়াইহীদের ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করে। একই প্রক্রিয়ায় মিশরে ফাতেমী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃহত্তর জনজীবনের এরূপ অবনতিশীল অবস্থাই ছিল আব্বাসীদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবসানের ঐতিহাসিক কারণ।

জিম্মি সমাজ

ইতিপূর্বে আব্বাসী সমাজের সামাজিক বিভাজনটি সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আপামর জনতার জীবন ধারণের দৃষ্টিভঙ্গি হতে তথা শ্রেণী বিশ্লেষণের বিচার ধারায় বিবেচিত হয়েছে। সম্ভবত এরূপ সামাজিক বিভাজন অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক এবং কাম্যও বটে। প্রফেসর হিট্টি এরূপ বিভাজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৬৯] অনেকে এই আনুভৌমিক পদ্ধতির পরিবর্তে উল্লম্ব পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। মধ্যযুগের এরূপ উল্লম্ব সামাজিক বিভাজন ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিরই ফলশ্রুতি। এই দৃষ্টিকোণ হতে সমগ্র জনতাকে প্রধানত মুসলিম এবং অমুসলিম এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। মুসলিম শাসক বংশের অধীন অমুসলিম প্রজাদেরকে বলা হয় জিম্মি; তাদের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানই ছিল জিম্মি শব্দের মৌলভার। ধর্মীয় তথা বিবেকের স্বাধীনতা সম্ভবত অত্যন্ত আধুনিক গণতান্ত্রিক ভাবধারা। এইরূপ চিন্তাধারা মধ্যযুগের সমাজ বিচারে প্রযোজ্য নয়। আমাদের আলোচ্য সময়ে

মুসলিমদের দুটি প্রধান শাখা শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে থাকত। মুতাজিলারা কট্টর একত্ববাদী বিদগ্ধ মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের উপর চলত প্রচণ্ড সরকারি নির্যাতন। বস্তুত মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিন্ন মতাবলম্বী স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারত না। এটাই ছিল মধ্যযুগের একটি বাস্তব অবস্থা। এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামি সাম্রাজ্যে অমুসলিমরা বিশ্ব পরিসরে অনেক সামাজিক অধিকার ভোগ করে। যাহোক তথাকথিত জিম্মিদের সম্পর্কে আলোচনার সময় ইউরোপে প্রটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিক ধর্মযুদ্ধ ও সম্পর্কটি বিবেচনায় রাখা উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আব্বাসী স্বর্ণযুগেও কৃষিকর্মে এবং কুটির শিল্পে নিয়োজিত মানুষের ৯০ শতাংশ ছিল অমুসলিম। আব্বাসী কৃষক সমাজ তাদের পূর্বপুরুষের তুলনায় অনেক বেশি শোষণমুক্ত ছিল; তবে সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত শোষণ হতে তারা কিভাবে মুক্ত হতে পারে? বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এরুপ কোনো নজীর নেই। তারা অবশ্যই ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার ছিল না। ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও অমুসলিমদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং মহাজনী ও মুদ্রা ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল শতকরা প্রায় একশ ভাগ অমুসলিম—অথচ তারা অতিরিক্ত নির্যাতনের শিকার হয় নি। তারা বরং সরকার হতে অনেক বেশি শুল্ক সুবিধে ভোগ করত। ঐতিহাসিক বিচারে মুসলিম সামন্ত অমুসলিম দেহকান, উচ্চ মুসলিম-অমুসলিম আমলা ব্যবসায়ীরা ছিল দেশের শাসক শ্রেণীভূক্ত; দরিদ্র মুসলিম-অমুসলিম কৃষক কারিগর তথা মেহনতি জনতা ছিল শাসিত ও শোষিত শ্রেণীভূক্ত। এ বৈষম্যের ব্যত্যয় দেখা যায় না।

তথাকথিত জিম্মীদের প্রতি আব্বাসী শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল? অনেকে মনে করেন যে, আব্বাসী খলিফা হারুনুর রশীদ এবং মোতাওয়াক্কিল জিম্মীদের বিরুদ্ধে কিছু ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। ৮০৭ সালে বাইজানটাইন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সকল গির্জা এবং বিজিত এলাকায় গির্জাসমূহ ধ্বংস করার নির্দেশ জারি করেন; তাদেরকে নির্ধারিত পোশাক পরিধান করারও আদেশ জারি করেন। ৮৫০ ও ৮৫৪ সালে খলিফা মোতাওয়াক্কিল একই ধরনের বৈষম্যমূলক আইন জারি করেন। অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে যে, হারুনের উক্ত পদক্ষেপ মূলত নিরাপত্তামূলক রাজনৈতিক আচরণ। আরো বলা হয় যে, অনেক মুসলিম আইনবেত্তার মতে কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে কোন অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, আব্বাসী যুগের জিম্মিদের বহু শতক পূর্বের কোনো পূর্বপুরুষ তাদের পবিত্র গ্রন্থে তাদের পছন্দসই রদবদল করে বলেই তাদের বংশধরেরা সবাই চিরকালের জন্য বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে বসেছে। এ যুক্তির উপর টিপ্পনি নিষ্প্রোজন। মধ্যযুগে ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আরচণ ঘটতে পারে—সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। দু এক সময় জিম্মিদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকতে পারে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। জিম্মিদের অভিযোগগুলো সাধারণ নিয়ম হিসেবে চিহ্নিত

করার পূর্বে ঘটনাগুলোর প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেই ঐ সব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রকৃতি, প্রবণতা কার্যকারিতা ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার; নইলে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর সঠিক মূল্যায়ণ হতে পারে না।

মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে অমসলিম জিম্মি সমাজের প্রতি মুসলিম শাসকদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করার জন্য প্রথমত মনে রাখতে হবে যে, বিজিতদের প্রতি মুসলিম শাসকদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রচণ্ড সহনশীল, উদার এবং মানবিক। প্রতিটি বিজয়ে বিজিতদের সাথে তাদের প্রতিটি শান্তি চুক্তিতে এই সাধারণ নিয়ম প্রতিফলিত হয়। শান্তি চুক্তির অনুসরণই ছিল সাধারণ রাষ্ট্রীয় নিয়ম। বিজয়ীদের এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়।[৭০] ইসলামি বিপ্লব চলাকালে তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ, মক্কার পৌত্তলিক মুশরিক কাফের এমন কি ইহুদীদের সম্পর্কে যে অবস্থান গ্রহণ করা হয়—ইসলামি বিপ্লবের অগ্রগতির সাথে সাথে অমুসলিম প্রজা-ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আহলেকিতাব-এর মর্যাদা দেয়া হয়; তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের সাধারণ নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আরব বিজয়ের আরো অগ্রগতি হলে পারস্য ও ভারতের সকল প্রজাদেরকেও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৭১] এ প্রসঙ্গে সিন্ধু বিজয়ী বীর মোহাম্মদ বিন কাসিমের একটি চিঠিতে চমৎকার আলোকপাত করা হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য সময়ের দু একজন খলিফার জিম্মি সমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক আইনগুলো সঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অধ্যায়ন করলে সেগুলো মুসলিম শাসনের সাধারণ নীতির (General line) ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত হয়। হারুনুর রশীদ অথবা ফাতেমী খলিফা আল হাকিম এর সময়ে বাস্তবতা কি ছিল? তারা উভয় খলিফা বাইজানটাইনের সাথে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধরত ছিলেন। এরূপ যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় তাদের জ্যকবী প্রজাদেরকে বাইজানটাইন সমর্থক হিসেবেই তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। তাই এটা ছিল মূলত রাজনৈতিক ব্যবস্থা মাত্র–ধর্মীয় বৈষম্যমূলক নয়। মোতাওয়াক্কিলের ব্যাপারটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আর মামুনের সময় হতে মুসলিম বিশ্বের বিজয়ী ও বিজেতা জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়া সফল হওয়ার এক নবতর সংস্কৃতি বিকাশোন্মুখ হয়। মুক্তচিন্তা প্রবাহে মুসলিম অমুসলিম বুদ্ধিজীবীরা অবগাহন করেন। উদীয়মান নয়া চিন্তাধারা বা বেদায়াতী প্রবণতায় সুন্নি সম্প্রদায়ের সংহতি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় কায়েমী স্বার্থবাদী রক্ষণশীলরা আতঙ্কিত হয়। মোতাওয়াক্কিল ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল সুন্নিদের প্রতিভূ। তিনি আদৌ ধর্মভীরু ছিলেন না তবুও রাজনৈতিক কারণে প্রতিক্রিয়াশীলদের মনোরঞ্জনের জন্য মুক্তবুদ্ধির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন এবং জিম্মিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে। যাহক হারুন বা মুতাওয়াক্কিলের নীতি ইসলামি বিশ্বে সার্বজনীন হয় নি বলেই জিম্মিরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে যা মধ্যযুগের ইতিহাসে ছিল এক অনন্য ঘটনা।[৭২]

আব্বাসী স্বর্ণ যুগে আমরা যা দেখতে পাই তা হল: ক. আব্বাসী রাজদরবারে অত্যন্ত সম্মানিত রাজবৈদ্যরা প্রায় সবাই ছিলেন অমুসলিম। শুধু তাই নয়, অমুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা সর্বদাই রাজদরবারে সমাদৃত হতেন; খ. মামুনের বায়তুল হিকমার বড় বড় অনুবাদক পণ্ডিত প্রায় সবাই ছিলেন অমুসলিম; গ. বিজিতদের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি অনুসারে অমুসলিম দেহকানরা ছিলেন স্থানীয় প্রশাসনের অঙ্গ বিশেষ, এবং সাম্রাজ্যের রাজস্ব বিভাগে অনেক গুরু দায়িত্ব তারাই পালন করতেন। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে আবদুন ইবনে সাইদ ছিলেন একজন খ্রিষ্টান উজির। তার প্রতি সবাই যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করত। আল মুতাওয়াক্কিল (৯৪০-৪৪) ছিল একজন খ্রিষ্টান উজির। বুওয়াইহী সুলতান মুতাজিদের (৯৪০-৯০২ খ্রি.) এর ছিল খ্রিষ্টান উজির। এ সব ঐতিহাসিক তথ্য অস্বীকার করার উপায় নেই।[৭৩]

জিম্মি সমাজ বিবেকের স্বাধীনতা কি পরিমাণে ভোগ করতেন সে সম্পর্কে অসংখ্য তথ্যের মধ্য হতে দু একটির উল্লেখই যথেষ্ট। উমাইয়া খলিফা মোয়াবিয়া এবং আব্দুল মালেকের দরবারের মত আব্বাসীদের সময় ধর্মীয় বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হত। ৭৮১ সালে ধর্মযাজক টমোথী খলিফা আল মাহদির দরবারে ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে অনুষ্টিত বিতর্ক সভার সারসংকলন করেন। ৮১৯ সালে মামুনের দরবারে যে ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তার সারসংকলন করেন দার্শনিক আল কিন্দী। তৎকালীন বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শ ও বিতর্কমূলক বিষয়ের উপর লিখিত আত তাবারীর বিখ্যাত পুস্তক আল কিতাবুদ্দীন ওয়াদ্দাওলাহ ছিল খুবই বস্তুনিষ্ট, মার্জিত ও তথ্যবহুল। এতে কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক উত্তাপ বা পক্ষপাতিত্ব ছিল না। মজার ব্যাপর পুস্তকখানি মোতাওয়াক্কিলের সৌজন্যে লিখিত হয়। পুস্তকটিতে অসংখ্যবার বাইবেলের উল্লেখ আছে। বস্তুত ঐ সময় বাইবেল আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আন নাদিম তার ফিহিরিস্তে সংকলনের সময় (৯৮৮ খ্রি.) বাইবেলের অনুবাদ এবং তার কয়েকটি সংস্করণের উল্লেখ করেছেন। খলিফা হারুনের সময় আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বাইবেল আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন, আরো প্রমাণ আছে যে, সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে সুরিয়ানী ভাষা হতে বাইবেল আরবি ভাষার রূপান্তরিত হয়। তাবাবী বলেন যে, মিশর বিজয়ী পুত্র আব্দুল্লা বাইবেলের দানিয়েল অধ্যায়টি পাঠ করেন। মিশরের সাইদ আল ফাইয়ুম (৮৮২-৯৮২ খ্রি.) আরবি ভাষায় বাইবেলের যে অনুবাদ করেন মিশরী আরবি ভাষাভাষী ইহুদীদের এটিই মূল সংস্করণ হিসেবে বিবেচ্য।

খ্রিষ্টান সমাজ

ইসলামি বিশ্বের খ্রিষ্টানদের দু ধরনের গীর্জা ছিল: ক. নেষ্টোরীয়; খ. জ্যকবী। সিরিয়া ও ইরাকে নেষ্টোরীয়রা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের প্রধান যাজক বাগদাদে বসবাস করতেন। বাগদাদ নগরে দেয়ারে রোম নামক একটি বড় ধরনের পল্লি ছিল। এখানে

অবস্থিত ছিল তাদের কেন্দ্রীয় গির্জা এবং এখান হতে সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে অবস্থিত গির্জা এবং অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণ করা হত। খ্রিষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত প্রধান যাজককে খলিফা স্বীকৃতিদান করতেন এবং তিনিই সমগ্র খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হতেন। নেষ্টোরীয় যাজকেব অনুরোধে খলিফা ৯১২-১৩ সালে এন্টিয়কের প্রধান জ্যকবী যাজকের বাগদাদে বসবাসের অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁব এ অনুরোধ প্রত্যাখানের বড় কারণ–খলিফার ধারণা হয়েছিল যে, জ্যকবী যাজক বাইজানটাইন রাজার সমর্থক। মজার ব্যাপার বাগদাদের অনতি দূরে তাকৃতে তাদের প্রধান গির্জা ছিল এবং ইয়াকুতের হিসেবে পশ্চিম বাগদাদ ছাড়াও পূর্ব বাগদাদে তাদের প্রায় এক ডজন মঠ ছিল। উল্লেখ্য বাগদাদে যে কেবল ধর্মীয় বির্তক সভাই অনুষ্ঠিত হত তাই নয়, বরং নেষ্টোরীয় যাজকরা ধর্ম প্রচারের জন্য সুদূর চীন পর্যন্ত তাদের মিশনারীর জাল বিস্তার করে। অসংখ্য শিক্ষিত খ্রিষ্টান বিভিন্ন সরকারি চাকুরী করে রুটি রোজগার করত।[৭৪]

ইহুদি

ইহুদীদেব সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বিরূপ মন্তব্য থাকলেও এবং ইসলামি বিপ্লব চলাকালে তাদেব ভূমিকা যাই থেকে থাকুক না কেন, বাস্তবে ইসলামি বিশ্বে তারা ছিল সুবিধেভোগী; এবং নয়া সংস্কৃতি বিকাশে বা শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অবদান কিছু কম ছিল না। সম্ভবত তাবা ছিল সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়।[৭৫] তারা ছিল প্রধানত ব্যবসায়ী সমাজ; মুদ্রা বা ব্যাংক ব্যবসা ও মহাজনী কারবার ছিল তাদের একচেটিয়া। তাদের অনেকেই সবকাবেব অনেক গুরুত্বপুর্ণ পদে নিয়োজিত ছিল। বাগদাদে তাদের বেশ বড় আকারের বসতি এলাকা ছিল। বাগদাদ নগরে তাদের ২৩টি জমকালো ধর্ম মন্দির ছিল এবং স্কুল ছিল ১০টি। তাদের ধর্মযাজক তাদের ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। বাগদাদের ইহুদী সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় নেতাকে দাউদপুত্র বলে ধারণা করত। স্বসম্প্রদায়ের পক্ষে তাদের ধর্মীয় নেতাই খলিফাব প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। মূল্যবান পোশাক পরিধান করে তাদের ধর্মযাজক যখন খলিফা দর্শনে যেতেন তাঁর অনুসারীরা তাদের নেতা দাউদপুত্রের পথ করে দেয়াব জন্য জনতার নিকট আবেদন করতেন।[৭৬]

সাবী সম্প্রদায়

দক্ষিণ ইরাকের জলাভূমির নিকট প্রাচীন ইরাম ভাষাভাষী একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী বসবাস করত। তাদের মধ্যে জন্মের পর, বিবাহের পূর্বে এবং বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে দীক্ষা নেয়ার প্রথা বিদ্যমান ছিল। ফিহিরিস্ত লেখক আন-নাদিম তাদেরকে মুগতাসিসলা বা প্রক্ষলনকারী বলে অভিহিত করেন। সাধারণ লেখকরা তাদেরকে সাবী

বলে বর্ণনা করেন। এই প্রকার জিম্মি বা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিরাপত্তা প্রাপ্তদের সব অধিকার অর্জন করেন। প্রফেসর হিট্টি এদেরকে ব্যাবিলনীয় সাবী বলে আখ্যায়িত করেন।[৭৭] হাররানের সাবীরা ব্যাবিলোনীয় সাবী হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও আরব লেখকরা ঐ দুটি সম্প্রদায়কে এক বলে মনে করেন। মূলত তারকা পূজারী হলেও এরা আহলে কিতাব এর অন্তর্ভুক্তির জন্য সাবী পরিচিতি অর্জন করে। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এদের সুখ্যাতি থাকায় আব্বাসী খলিফাদের সুনজরে ছিল। বায়তুল হিকমতের শ্রেষ্ট অনুবাদক সাবিত বিন কোররাহ ঐ সম্প্রদায়ের সুসন্তান। সম্প্রদায়টি আমাদের আলোচ্য সময়ে অসংখ্য মনিষী সৃষ্টি করে। ঐ সব স্বনামধন্য পণ্ডিত মনিষীদের মধ্যে ছিলেন আবু ইসহাক বিন ইনাল আস সাবী, প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ আল বাত্তানী, ইবনে ওয়াহশিয়া, এবং জগৎ বিখ্যাত রাসায়নিক জাবের বিন হাইয়ান। শেষোক্ত তিনজনই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৭৮]

জোরোস্ত্রী বা মাজুসী সম্প্রদায়

এরা ছিলেন ইরানের অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়। এদের অনির্বান শিখা মন্দির ইরান এবং ইরাকে ছিল। এদেরকেও আহলে কিতাবের অনর্ভুক্ত করা হয়; তারা জিম্মিদের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। ইরানের মনিপন্থী বা আদিম সাম্যবাদী মাজদাকীরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়, তবে তৎকালীন উদীয়মান মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের উপর এদের প্রভাব ছিল গভীর। এ কারণে খলিফা মাহদী, হাদী ও হারুন এদের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন বটে; কিন্তু তাদরেকে ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি।[৭৯]

ইসলামিকরণ বা আরবিকরণ

আরব উপদ্বীপে ইসলামি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন জাতিসত্তার অভ্যুদয় ঘটে; প্রতিষ্ঠিত হয় আরব সাম্রাজ্য; বহুজাতিসত্তার সমন্বয়ে উত্থান হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের (ইসলামি উম্মাহ); গড়ে ওঠে বিশাল মুসলিম প্রভাববলয়। বিশাল মুসলিম প্রভাববলয়ে ইসলামিকরণ ও আরবিকরণের উপর কিছু আলোকপাত করা দরকার। প্রফেসর হিট্টি গোটা আলোচনাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন : ক. আরব জাতিসত্তার সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়কাল; খ. মুসলিম প্রভাববলয়ের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়াকাল; গ. আরবি ভাষার বিজয়কাল।[৮০] তাঁর বক্তব্যটি প্রণিধাণযোগ্য।

আরব জাতিসত্তার সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়কালে সূত্রপাত করেন হযরত আবু বকর এবং উমাইয়া যুগে তা একটি পরিণতি লাভ করে। এটা এক শতাব্দীর চেয়ে বেশি দিন স্থায়ী হয়। মধ্যযুগের এই বিশাল সাম্রজ্যকে ইসলামিকরণের চাইতে আরবিকরণের প্রচেষ্টা চালায় উমাইয়া বংশ। তাদের বিস্ময়কর বিজয়ের সাথে বিজিত জাতিসত্তার অল্প সংখ্যক ব্যক্তিত্ব অথবা কোনো কোনো গোত্র যদি রাজধর্মে দিক্ষিত

হয়ে থাকে মধ্যযুগে তা ছিল খুবই স্বাভাবিক এবং এরূপ ধর্মান্তর ঘটতে পারে নানা কারণে। এতে সরকারি নীতিরই প্রতিফলন ঘটে—তা বলা চলেনা। ঐতিহাসিক তথ্য হতে জানা যায় যে, সমগ্র প্রথম শতাব্দী ধরে সিরিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকা খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিসেবে বিদ্যমান থাকে; পারস্য ছিল জোরস্ত্রী অঞ্চল হিসেবে; বাহলকী এলাকা থাকে বৌদ্ধ এলাকা হিসেবে। দশম শতকে উত্তর ইরাক সম্পর্কে ইবনুল ফকিহ বলেন: "নামে মুসলিম চরিত্রে খ্রিষ্টান"। বস্তুত উমাইয়ারা নীতিগতভাবে ধর্মান্তরণকে নিরুৎসাহিত করে। বিশাল ইসলামি প্রভাববলয়ে ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া দশম ও একাদশ শতাব্দীর পুর্বে জোরদার হয় নি। তুলনামূলকভাবে মিশরে ইসলামিকরণ দ্রুত হয়, নুবিয়া দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল খ্রিষ্টান দেশ। ৬৭০ সালে উকবাহ উত্তর আফ্রিকায় কায়রোয়ান নগরে সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও বারবারী ও উত্তর আফ্রিকার ইসলামিকরণের গতি ছিল খুবই মন্থর। পরবর্তী শতাব্দীতে বারবারীদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করার পর ধর্মান্তর লাভজনক ভেবে ইসলাম গ্রহণ শুরু করে। বারবারী সেনাবাহিনী পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ে প্রবল ভূমিকা রাখে; অথচ দেখা যায় এ সব অঞ্চল আরব বিজয়ের তিন শতাব্দী পরেও অসংখ্যা গীর্জা বিদ্যমান ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আলজেরিয়ার মাত্র কয়েকটি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে এবং ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের পরই পশ্চিম আফ্রিকা মুসলিম গরিষ্ঠ দেশে পরিণত হয়।

আব্বাসী আমলে মুসলিম প্রভাববলয়ে ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচিত হয়। উল্লেখ্য আব্বাসী সুবর্ণ যুগে তাদের ধর্মীয় বিজয় আদৌ লক্ষণীয় ছিল না; বরং আব্বাসীদের রাজনৈতিক প্রভাব বিধস্ত হওয়ার পরই এ ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, আব্বাসী খলিফাদের বাহ্যিক লেবাস যতই ধর্মীয় হোকনা কেন—মূলত তারা উমাইয়াদের মতই ইহলৌকিকমুখী ছিল। ধর্মান্তরণ তাদের বিঘোষিত সরকারি নীতি হিসেবে গৃহীত হয়নি। তথাপিও এরূপ ঘটনা কেন ঘটল? প্রফেসর হিট্টি এ প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর দেন নি। ধর্মান্তরণে আব্বাসীদের শক্তি প্রয়োগতত্ত্বের প্রতিও তিনি সমর্থন দেন নি।

আব্বাসী বিপ্লবের পর হতে দেশ জয়ের নেশা কেটে যায়; শুরু হয় নয়া আর্থ-সামাজিক বিকাশ। শুরু হয় বিজয়ী ও বিজেতাদের পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমঝোতা এবং সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়া। নতুন পরিস্থিতিতে রাজধর্ম ইসলাম অনেকাংশে সমাজ জীবনের বাস্তব বিষয়ে পরিণত হয়। উদীয়মান নয়া উন্নত সংস্কৃতি সম্পর্কে বিজিতরা এতদিনে অনুধাবন করে যে, ইসলামকে তারা তাদের মত করে এবং তাদের প্রয়োজনে গ্রহণ করতে পারে। বাস্তবে ঘটেছিল তাই। দায়লামীরা দশম শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করায় সমগ্র পারস্যে ধীরে ধীরে শিয়া ইসলামের দীক্ষা নেয়। তুর্কি জাতিসত্তা বিশেষ করে সেলজুক গোত্রপতিরা সুন্নি ইসলাম গ্রহণ করায় দশম-একাদশ শতকে ক্রমান্বয়ে সমগ্র মধ্য এশিয়া আফগানিস্তান সুন্নি ইসলামে দীক্ষা নেয়।

বস্তুত আব্বাসী বিপ্লবের পর নয়া সংস্কৃতির বিকাশের সাথে মুসলিম প্রভাববলয়ে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং দীর্ঘ দিন ধরে তা বিলম্বিত লয়ে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে সমগ্র এলাকা মুসলিম অঞ্চলে পরিণত হয়। উদীয়মান জাতিসত্তাসমূহের বিকাশের স্বার্থের অনুকূলে ছিল নয়া ধর্ম। অনেকে মনে করেন যে, হারুনুর রশীদ এবং মোতাওয়াক্কিল জিম্মিদের প্রতি কিছু বৈষম্যমূলক আইন জারি করায় অনেকে তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করে; মাহ্দীর নির্দেশে খ্রিষ্টান বনু তানুখের পাঁচ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে।[৮১] মধ্যযুগে এরূপ বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটা আদৌ বিচিত্র নয়। তবে ঐ সব বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই বিবেচ্য। বিষয়টির প্রতি ইতিপূর্বে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। হিট্টি বলেন ঃ Process of conversion into moral working was more gradual and peaceful......self interests dictated it. To escape the payment of the humiliating tributes and other disabilitis, secure prestige or potitical influence, to enjoy a larger measures of freedom and securities, these were the strong moitives in operation.[৮২]

আরবদের সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় ছিল অভূতপূর্ব দ্রুত ও বিস্ময়কর। ধর্মীয় বিজয়টি ছিল বিলম্বিত লয়ে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং তা ঘটে রাজনৈতিক বিজয়ের অনেক পরে এবং যখন আরব জাতিসত্তা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হতে বঞ্চিত; অথচ ইসলামি সাম্রাজ্যে আর্থ সামজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এক নবতরস্তরে পৌঁছে যায়। এ বিজয় সম্পন্ন হয় স্থান কাল পাত্রের সাথে তাল মিলিয়ে বিজিতদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে।

আরবদের তৃতীয় অর্জন ছিল ভাষাগত বিজয়, এটি কারো নজর এড়াতে পারে নি। এ বিজয়টি ছিল সর্বশেষ এবং সবচেয়ে ধীরে।[৮৩] এটা কি ছিল বিজিতদের উপর বিজয়ীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলশ্রুতি? এরূপ ঘটনা যুগে যুগে অনেক ঘটে। বিজিতরা এরূপ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল কিন্তু সূক্ষ্ম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভাষার প্রশ্নে তারা ছাড় দিতে রাজি হয় না। আলবেরুনী, ফেরদৌসী বা দাকীকা সম্পর্কে সচেতন-ব্যক্তিমাত্র অবশ্যই তা জানেন। ফেরদৌসির শাহনামা দু কারণে সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথমত ইরানী মুসলিম তাদের নিজস্ব এরামী ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করতে তাঁর শাহনামা ছিল অদ্বিতীয় মহাকাব্য। দ্বিতীয়ত ফারসি ভাষাকে আরবি শৃঙ্খল হতে মুক্তি দেয় শাহনামা। মুসলিম বিশ্বে ফারসি ভাষা তার স্বকীয় স্থান করে নেয়। সামরিক বিজয়ের পর পারস্যে আরবি অনেকদিন ধরে জ্ঞান চর্চার মাধ্যম ছিল উচ্চতর সমাজের ভাষারূপে গৃহীত হলেও আরবি এরামী জনতার ভাষার স্থান দখল করতে পারে নি। সিরিয়া-ইরাকে স্থানীয় সুরিয়ানী বা এরামী ভাষার স্থান দখল করে নেয় : তবে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইরানী সুরিয়ানী এবং আরবি ভাষা একই মূল সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠী। রাজনৈতিক চাপে

যদি এরামী-সুরিয়ানী আরবিতে রূপান্তরিত হয় তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। এবং এরূপ রূপান্তর হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। লেবাননে খ্রিষ্টানরা টিকে আছে–তাদের ভাষাও অনেকদিন টিকে ছিল।

আরবদের ভাষাগত অর্জনকে আর একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। আব্বাসীদের প্রারম্ভ হতে প্রাচীন গ্রীক-এরামী ও ভারতীয় চিন্তাধারা তথা ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন সভ্যতা সংরক্ষণ ও সংগ্রহের কার্যক্রম প্রবলভাবে শুরু হয়। বায়তুল হিকমাতে এ কার্যক্রম চলতে থাকে। বাগদাদ, বসরা, কুফা দ্রুত হয়ে ওঠে নয়া সাংস্কৃতি কেন্দ্র এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তা বিচ্ছুরিত হয়—বোখারা, সমরকন্দ, নিশাপুর, মারভ, বায় কাবীরা ইত্যাদি নগর ও শহর হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এ যেন বিজয়ীদের বিজিতদের সংস্কৃতির নিকট আত্মসমর্পণ। এটা তার হীনমন্যতা নয়; এটা তার ঔদার্য, প্রজ্ঞা, গুণগ্রাহিতার বহিঃপ্রকাশ; প্রগতিশীল সমাজ মানসের লক্ষণ। আরবি হয়ে ওঠে নয়া সংস্কৃতিব বাহন। এ ভাষা ও সংস্কৃতি সকল জাতিসত্তার কাম্য হয়ে ওঠে। এ নয়া সংস্কৃতির মৌল উপাদান প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতা; একে লালন করে বিজিত জাতিসত্তার সুসন্তানবা। আরবি আর কেবল আরব চিন্তাধারাব বাহন নয়, বরং মধ্যযুগের বিশ্ব সভ্যতার মাধ্যম। প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার অধ্যয়ন, আত্মস্থকবণ, এবং অনুশীলন করে মধ্যযুগের নয়া সভ্যতার নেতৃত্ব দেয অনাবব মনিষীরা। বিশ্ব সভ্যতার সংরক্ষণ, অনুশীলন, এবং ইউরোপে প্রক্ষেপণেই নিহিত ছিল আব্বাসীদের ঐতিহাসিক অবদান।

তথ্যপুঞ্জি

১. মুসা আনসারী, 'ইসলামী বিশ্বেব উদ্ভব' আবু মহামেদ-হবিবুল্লা স্মবক গ্রন্থ (ঢাকা ১১৯১) পৃ. ১৩৭-৪৩)
২. বিস্তাবিত বিবরণের জন্য দেখুন M A Shaban The Abbasid Revolution (Cambridge

৩. Hitti, op cit pp 286-7
8 Well hausen, The Arabe Kingdom and its fall, and M S Weir (abede 1927)
৫. Hitti, op cit pp 197
৬. Ibid p 288
৭. Ibid p 289
৮. Shaban, op cit pp 137-152
৯. Ibid p 152
১০. Ibid pp 89
১১. মুসা আনসারী, ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা,
১২. Hitti, op cit p 317
১৩. সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন, ওসমান গণি,
৩৯৬-৭

১৪. ঐ পৃ. ৩৯৮
১৫. Shaban, op. cit pp. 137-154
১৬. Ibid pp. 154-158
১৭. Hitti, op. cit p.
১৮. ইবনুল আব্বাস, আসরারুল আউয়াল ফি তারাতিবুদ্দৌলাহ, (কায়রো ১২৯৫) পৃ. ৬২
১৯. ইবনুল আসির, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯-২০
২০. ঐ পৃ. ৪০৬-৭
২১. ঐ পৃ. ৪০৫
২২. Hitti, op. cit p. 318-19
২৩. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬-৭
২৪. ঐ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯
২৫. Hitti, op. cit p. 323
২৬. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪
২৭. ঐ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭
২৮. Hitti, op. cit p. 320
২৯. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮
৩০. ঐ পৃ. ৪১৮
৩১. Hitti, op cit p. 321
৩২. Ibid p. 326
৩৩. এস. এম. ইমামুদ্দীন, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ২৭৮
৩৪. Hitti, op. cit p. 324
৩৫. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩
৩৬. Hitti, op. cit p. 329
৩৭. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬-২৯
৩৮. Hitti, op. cit p. 329
৩৯. Ibid p. 329 আমীর আলী পৃ. ৪২৪-২৫
৪০. মুসা আনসারী, হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থে 'ইসলামী বিশ্ব সমাজ'
৪০. Hitti, op. cit p. 332-359
৪১. Ibid p. 332-33
৪২. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০-৪১
৪৩. ঐ পৃ. ৪৪২
৪৪. ঐ পৃ. ৪৪৭-৮
৪৫. ঐ পৃ. ৪৪৮
৪৬. Hitti, op. cit p. 337
৪৭. Ibid p. 339
৪৮. Ibid p. 340
৪৯. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯
৫০. Hitti, op. cit p. 334

৫১. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪-৪৫
৫২. Hitti, op. cit p. 343
৫৩. Ibid p. 343
৫৪. Ibid p. 342
৫৫. Ibid p 363
৫৬. Ibid p. 344
৫৭. Ibid p. 345
৫৮. মুসা আনসারী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪১-৪৭
৫৯. ঐ পৃ. ১৪৯
৬০. Hitti, op. cit p. 345
৬১. Ibid p. 347
৬২. Ibid p. 348
৬৩. মুসা আনসারী, ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা,
৬৪. ঐ পৃ. ১৪৪-৪৫
৬৫. ঐ পৃ. ১৪৫
৬৬. ঐ পৃ. ১৪৪
৬৭. ঐ পৃ. ১৪৬
৬৮. ঐ পৃ. ১৪৬
৬৯. Hitti, op. cit p. 343
৭০. M. N. Ray, Historial Role of Islam
৭১. Hitti, op. cit p. 353
৭২. Ibid p 354
৭৩. Ibid p 354
৭৪. Ibid p 356
৭৫. Ibid p 356
৭৬. Ibid p 357
৭৭. Ibid p 358
৭৮. Ibid p 358
৭৯. Ibid p 359
৮০. Ibid pp 359-62
৮১. Ibid p 360
৮২. Ibid p 360
৮৩ Ibid p 361

১২.৩ আব্বাসী আমলে সংস্কৃতি : প্রাসঙ্গিক কথা : মানসিক সংস্কৃতি

ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনায় আরব তথা প্রাচ্য মুসলিম শাসকবর্গের প্রধানত রাজনৈতিক জীবন সাধনা, তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সন্ধানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেও একই সাথে তার সমগ্র মানস পরিমণ্ডল খুব অস্পষ্ট থাকে নি। ঐ সময়কালে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির বিকাশক্রম তার গতি প্রকৃতির স্বরূপ সন্ধানও করা হয়েছে। এখন তার সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হবে। এই সাথে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রাক-কথন হিসেবে কিছু বলা হচ্ছে। এ গ্রন্থে মধ্যযুগের বিশেষ সময়ের মধ্যে ইসলামি সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুধাবনের প্রয়াস চলেছে। সংস্কৃতি প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে তাই এর মর্মকথা প্রসঙ্গে দু একটি কথা নিবেদন করা হল। মানুষ তার জীবন সাধনার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করে তাই তার কৃতি বা সংস্কৃতি। সে যত সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে চায় ততই সুন্দর হতে হয় তার সৃষ্টি ও সংস্কৃতি; পুনশ্চ তার উন্নত সংস্কৃতি তার জীবনমান ও চিন্তাশক্তিকে আর এক ধাপ উপরে উঠিয়ে দেয়; সে নব উদ্যমে আরো উন্নত সৃষ্টির সাধনা করে এবং সফল হয়। তাই মানব সভ্যতা এক বিকাশমান প্রক্রিয়া বৈ কিছু নয়। তার রাষ্ট্রীয় সাধনা, তার সমাজ জীবন তার সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সমাজ জীবন গড়ে ওঠে তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে। সে তার সঙ্ঘ শক্তি দিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এ সংগ্রামে সে যতটুকু সাফল্য অর্জন করে ততটুকু গড়ে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তাই তার সাংস্কৃতিক এলাকা ব্যাপক। যাহোক মানব জীবন ও তার সংস্কৃতি পারস্পরিক সহায়ক শক্তি। তার সংস্কৃতি বৈষয়িক হতে পারে; মানসিক হতে পারে। উল্লেখ্য তার বৈষয়িক কৃতি ও কর্মের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তার মানসিক বা আধ্যাত্মিক উপাদান। বস্তুত তার বৈষয়িক কর্মোদ্যমে প্রতিফলিত হয় তার মানসিক অবস্থা। তার মানসিক ক্রিয়াকর্ম যখন স্বতন্ত্র রূপ পায় তার মধ্যে তার বৈষয়িক জীবনের চিত্রও ফুটে ওঠে। বস্তুত মানব জীবন ও তার সংস্কৃতির এ দ্বান্দ্বিক রূপটি অনুধাবন করতে পারলে মানব জীবন ও মানব সভ্যতার ইতিহাসের বাস্তব উপলব্ধি সহজসাধ্য হয়।

মানুষের বৈষয়িক সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও তার স্বরূপ অনুধাবন করার জন্য তার উৎপাদন ব্যবস্থার উপর আলোচনার গুরুত্ব অসীম—তার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সৃষ্টি করা উচিত ছিল। এ পর্যায়ে নানা কারণে তার বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ আলোচনা সম্ভব হয় নি। বিষয়টি এসেছে বিক্ষিপ্তভাবে। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের আলোচনায় তা যতটুকু এতে প্রতিফলিত হয়েছে অবশ্য তাতে মধ্যযুগে ইসলামি বিশ্বের রাষ্ট্রীয় চরিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

যাহোক এ পর্যায়ে তার রাষ্ট্র ও সমাজ এবং তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হচ্ছে। প্রথমে ঐ সময় তাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা

উপস্থাপন করা হবে। সে যুগের অগ্রগামী সমাজ শাসক শ্রেণীর বৈষয়িক ও মানসিক জীবনধারার যে চিত্র পাওয়া যায় তারই একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। প্রথমে শাসক বর্গের বৈষয়িক সংস্কৃতি : ক. বাসস্থান, আসবাবপত্র, আহার-বিহার, পোশাক পরিচ্ছেদ; মানসিক সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সুকুমার শিল্প : ক. চিত্রকলা, খ. হস্ত লিপিশিল্প, গ. মৃৎ শিল্প, ঘ. সঙ্গীত শিল্প, ও তার সাহিত্য, নীতিশাস্ত্র-ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করা হল। বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় নিবেদন করা হবে।

শিক্ষা

মধ্যযুগে আমাদের আলোচ্য সময়কালে যে বিদ্যুৎ সমাজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়–তা যে কোনো দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য গৌরবের বিষয় বৈকি! আমাদের আলোচ্য সময়ে এত বড় আয়তনের বিদ্বান সুধী সমাজ সমসাময়িক ইউরোপ তো দূরের কথা বিজ্ঞান-প্রকৌশলী জ্ঞানের প্রসূতি কেন্দ্র চীনেও ছিল না; প্রাচীন ভারতের জ্ঞানরাজ্য তখন দেউলিয়া হয়ে পড়ে। বস্তুত এরূপ একটি বুদ্ধিজীবী সমাজের জন্ম হয় কেবল একটি শিক্ষিত পরিবেশে; অথচ মজার ব্যাপার মামুন কর্তৃক ৮৩০ সালে বায়তুল হিকমাত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সরকারি স্বতন্ত্র শিক্ষায়তন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে নি। মজার ব্যাপার ইসলামি সমাজের প্রারম্ভ হতে সর্বদাই শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত ছিল। অনানুষ্ঠানিকতাই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। বহুজাতিক ও বহু ভাষাভাষিক আরব সাম্রাজ্যের আরব-অনারব মুসলিম সম্প্রদায়ের সকল বয়ঃপ্রাপ্ত সদস্যের জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হত; কেননা ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তিই হয় তার নিজের যাজক নিজে। তদুপরি সুবিশাল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কেবল ব্যবহার শাস্ত্র বিশারদেরই প্রয়োজন ছিল তাই নয়, প্রয়োজন ছিল হিসাব বিজ্ঞান বিশারদ ও নানা ধরনের বিশেষজ্ঞের। উমাইয়া যুগে যে শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয় আব্বাসী যুগে তা বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়। বস্তুত উমাইয়া যুগে বসরা-কুফার যেখানে শেষ, আব্বাসী আমল সেখান হতে তার যাত্রা হয় শুরু।[১] Bagdad began where al Basra and al kufa ended. উমাইয়াদের মত আব্বাসী রাজ পরিবারের শিশু সন্তানদেরকে মরুভূমির গৃহ শিক্ষকের কুত্তাব এ প্রেরণ করার প্রয়োজন শেষ হয়; এখন বাস্তব অবস্থা বা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আসে আমূল পরিবর্তন।

আব্বাসী যুগের প্রারম্ভ হতে বাগদাদ এবং বিভিন্ন নগর ও শহরে গড়ে ওঠা মসজিদ অসংখ্য গুরুগৃহ কুত্তাব বা প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তী আব্বাসী অবক্ষয়কালে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তন গড়ে উঠলেও গুরুগৃহ বা মসজিদের পূর্বের ভূমিকা বিনষ্ট হয় নি। মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীকে মসজিদ বা গুরুগৃহে আরবি ভাষা, কোরআন পাঠ, ইসলামি শ্রুতি বা স্মৃতি শাস্ত্র, দৈনন্দিন ধর্মীয় ব্যবহারিক বিষয়

মৌখিক পাঠদান করা হত। একই সাথে আরবি হস্তলিপি, হিসাব বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ ও কবিতাও শেখানো হত। প্রাথমিক স্কুলের ভাল ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করা হত। মেয়েদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ গ্রহণে উৎসাহিত করা হত।[২] রাজপরিবার ও অভিজাতঘরের শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ করা হত নানা দেশের ময়াদ্দিব। তারা রাজপ্রাসাদে তাদেরকে ধর্ম শিক্ষা, সাধু সাহিত্য এবং কাব্যশিল্প শিক্ষাদান করতেন। আমিনের শিক্ষককে হারুনুর রশীদ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা হতে তৎকালীন শিক্ষা আদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারাণা করা যায়। হারুন উক্ত শিক্ষককে বলেছিলেন যে, তিনি তার ছাত্রের প্রতি এত শক্ত না হন যাতে তার সহজাত বৃত্তিগুলো বিকৃত হয়; আবার তিনি এত নম্র হবেন না যে, সে সুযোগে ছাত্রবা অলস হয়ে যাবে। তিনি প্রথমে দয়া ও সহানুভূতি দেখিয়ে ছাত্রকে সোজা কবার প্রয়াস চালাবেন, তবে তাঁর নমনীয় আচরণ যদি ব্যর্থ হয় তবে তাঁকে ছাত্রের প্রতি কঠোর হতে হবে।[৩] বস্তুত খলিফা তার যুবরাজের সুশিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষককে বেত ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিলেন। ইবনে সিনা তাঁর রিসালাতুস সিয়াসতে শিক্ষকের ছড়ি ব্যবহারের উল্লেখ করেন।[৪]

শিক্ষকের প্রতি তাঁর উপদেশের হিট্টির অনুবাদ এরূপ : Be not strict to the extent of stifling his facultis or lenient to the point of meking him enjoy idleness and accustom himself thereto. Straighten him as much as thou caust through kindness and gentleness, but fail not to resort to force and severity should he not respond [৫]

আব্বাসী যুগে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষককে সাধারণত মুয়াল্লিম বলা হত। ফিকাহশাস্ত্রে জ্ঞান থাকার জন্য তাকে ফকিহও বলা হত। সাধারণত মুয়াল্লিমদের সামাজিক মর্যাদা ছিল খুবই কম। মামুনের সময় জনৈক কাজি তার আদালতে প্রাথমিক শিক্ষকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি শিক্ষক, রাখাল এবং নারীঘেঁষা লোকদের নিকট উপদেশ চাইতে নিষেধ করেছিলেন। প্রথমিক শিক্ষকদের মূঢ়তা সম্পর্কে একটি আরবি প্রবাদ আছে : 'More foolish than a teacher of an elementary School' আব্বাসী সমাজে প্রাইমারি শিক্ষকদের যেভাবে মূল্যায়ন করা হোক না কেন, উচ্চতর বিদ্যায়তনের শিক্ষকরা তৎকালীন সামজের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচিত হতেন। আজজারনুযী শিক্ষক এবং শিক্ষকতা পেশা সম্পর্কে কিছু পুস্তক প্রণয়ন করেন। শিক্ষকতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একজন ছাত্রের শিক্ষকতা বৃত্তির উপর কিরূপ অনুরাগ থাকা দরকার সে সম্পর্কে হযরত আলীর একটি প্রবাদ বাক্য উদ্ধৃত করেন। হযরত আলী বলতেন যে, কোনো ব্যক্তি কারো নিকট হতে একটি অক্ষর জ্ঞান অর্জন করে সে হবে তার দাস বা অনুগত। শিক্ষকের প্রতি এরূপ ভক্তি থাকলেই মানুষ তার পেশাকে শ্রদ্ধা করতে পারে। উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্ভবত একটি গিল্ড ছিল;

এবং সম্ভবত তারা একটি পাঠ্যসূচি ও পাঠ্য অনুক্রম তৈরি করেছিলেন। যে সব ছাত্র পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করে শিক্ষককে সন্তুষ্ট করতে পারত তাদেরকে সনদপত্র বা ইজাজাহ দেয়া হত।

বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনো নিয়মিত বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এ কথা সত্য যে, প্রতিটি শহরের মসজিদগুলো শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার রেওয়াজ ছিল সার্বজনীন। কেউ কোনো শহরের মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য গেলে তিনি নিশ্চিত হতে পারতেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে হাদিস, কোরআনের ব্যাখ্যা, ফেকাহ এমন কি বালাগত (ভাষা অলঙ্কার শাস্ত্র) উপর বিনা বেতনে বক্তৃতা শুনতে পারবেন। ইমাম শাফি ৮২০ সালে মিশরের ফুসতাতে আমরের মসজিদে একটি শিক্ষা মজলিসের প্রধান ছিলেন এবং আমৃত্যু প্রতিদিন সকালে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। ইবনে হাওকাল সিজিস্তানে এরূপ অনেক সেমিনারীর উল্লেখ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, এ সময় সেমিনারীতে কেবল ধর্মতত্ত্বের পাঠদান করা হত না এবং ভাষাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব তথা মানবিক বিষয়ের উপরও শিক্ষাদান করা হত। এ সব সেমিনারি বিনা বেতনে সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। শিক্ষার এরূপ ব্যবস্থা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[৬]

শিক্ষা প্রসারে ঐ ব্যাপক বেসরকারি উদ্যোগ ছাড়া খলিফা আল মামুন উচ্চতর মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ৮৩০ সালে বাগদাদে বায়তুল হিকমাত প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে গৃহীত হয়। এটা ছিল একটা শিক্ষা কমপ্লেক্স এবং এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বললেই যথেষ্ট যে, এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিভাগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যাপনা, গবেষণা এবং অনুশীলন। আল মামুনের প্রদর্শিত শিক্ষা ব্যবস্থা সমগ্র মধ্যযুগে বিকশিত হয় নি; কেননা নবম শতাব্দীর শেষার্ধে আব্বাসী সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়; সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দুর্বল করে দেয়। সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়, সর্বত্র সামন্ত শক্তিগুলো সমগ্র সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। সামানী, গজনী, বুওয়াইহী রাজ্যগুলির ধ্বংসস্তূপে সেলজুকী তুর্কিরা বাগদাদ দখল করে পাশ্চিম এশিয়া, এশিয়া মাইনর, ইরাক, পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় তুর্কি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে এবং ইরানি রাষ্ট্র দর্শন প্রতিষ্ঠিত করে। সেলজুকী রাষ্ট্রের ইরানি উজির নিজামুল মুলক তুসী দরসে নিজামীয়া প্রতিষ্ঠা করেন ১০৬৫-৭ সালে। এটাই ছিল প্রথম বৃহদায়তনের শিক্ষা ব্যবস্থা যার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, মধ্যযুগীয় সমগ্র সামন্ত চিন্তাধারার বাস্তব রূপ পায় এর পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমে। আধুনিককাল অবধি মুসলিম চিন্তাধারার উপর এর প্রভাব ছিল

নির্ধারক। যা হোক, বাগদাদের দরসে নিজামিয়ার মডেলে নিশাপুর ও অন্যান্য শহরে তুসী আরো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত নিজামিয়া মডেলের মাদ্রাসা খোরাসান, ইরাক, সিরিয়ায় বিস্তার লাভ করে। অনেক পর্যটক এরূপ ইসলামি সেমিনারীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে জুবায়ের বাগদাদে ত্রিশটি, দামাস্কাসে ২০টি, মোসুলে ৬টি, এবং হিমসে একটি মাদ্রাসার উল্লেখ করেন।[৭] এসব শিক্ষায়তনে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণে মৌখিক পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। নিজামিয়ার বড় অধ্যাপক আল গাজ্জালী তিন লাখ, আহমদ বিন হাম্বল এক লাখ হাদিস মুখস্ত বলতে পারতেন। কথিত আছে কবি মুতানাব্বীকে একটি লাইব্রেরি একখানা পুস্তক ধার দেয়। তিনি আগাগোড়া পড়ে বইটি ফেরৎ দেন; পুস্তকটি তিনি খরিদ করেন নি কেননা বইটি তার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রকাশ্যত খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে না হলেও একটি বিশেষ দিকের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি। ঐতিহাসিকভাবে সত্য এবং প্রফেসর হিট্টিও স্বীকার করেন যে, ইসলামি বিশ্বের সেমিনারীর মডেলে একাদশ—ত্রয়োদশ শতকের লাতিন ইউরোপীয় সেমিনারগুলো গড়ে ওঠে। ঐসব সেমিনারীতে কূটতর্কের ধূম্রজাল বিস্তৃত হত তাও সত্য; কিন্তু একথাও সত্য যে, ইসলামি বিশ্বের বিজ্ঞান পুস্তক সেখানে নিয়মিত পাঠ্য হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বড় অংশের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার উন্মেষ হয়। ধর্মতত্ত্বের বিতর্কের কুখ্যাতির পাশে সুখ্যাতিও ছিল। সিনাবাদপন্থী ও সিনাবাদবিরোধী এবং রুশদবাদপন্থী এবং রুশদবাদ বিরোধীদের মধ্যকার বিতর্কে অনেক কুকাণ্ড ঘটে সত্য, কিন্তু এতে একটা বড় সুফল ধরে। তারা প্রকৃত এ্যারিস্টটলকে আবিষ্কার করে। এর মধ্যে দিয়ে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের রেনেসাঁস আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়। ইউরোপ বিজ্ঞানের জয়গানে উদ্ভাসিত হয়। এক যাত্রায় দু ফল? হ্যাঁ, তা ফলতে পারে যদি ক্ষেত্র ভিন্ন হয়। একাদশ শতক হতে লাতিন ইউরোপের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অব্যাহতভাবে ক্রমবিকাশমান। এরূপ অবস্থায় ইবনে রুশদবাদ গৃহীত হয় এবং অতিক্রান্তও হয়। এর বিপরীতে প্রাচ্য ইসলামি বিশ্ব ছিল অপ্রতিরোধ্যভাবে ক্ষয়িষ্ণু ও পতনশীল। এরূপ আর্থ-সামাজিক অবস্থায় রুশদবাদ হয় প্রত্যাখ্যাত; বিজ্ঞান অচ্ছুত। তাই অন্তিম ঐতিহাসিক বিচারে সেলজুকী যুগের ইসলামি সেমিনারিগুলো পশ্চাদপদ চিন্তাধারার ধারক বাহক বলেই বিবেচ্য।

গ্রন্থাগার

মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বের মসজিদগুলো কেবল শিক্ষা কেন্দ্র ছিল না, এগুলো গ্রন্থাগার হিসেবেও ব্যবহৃত হত। মসজিদ গ্রন্থাগারে প্রধানত ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক রক্ষা করা হত। দান হিসেবে পুস্তক সংগৃহীত হত। ঐতিহাসিক খতিব আল বাগদাদী (১০০২-৭০ খ্রি.) তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটি মসজিদ গ্রন্থাগারে দান করেন এবং তাঁর জনৈক বন্ধুগৃহে তা

রক্ষিত হয়। অভিজাত পরিবারের অনেকের আপন গৃহে গ্রন্থাগার সৃষ্টির সখ ছিল। এরূপ ব্যক্তিগত গৃহ লাইব্রেরিতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পুস্তক সংগৃহীত হত; এবং যে কোনো ব্যক্তি এরূপ ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারত। মোসুলে এ রকম একটি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীকে বিনামূল্যে কাগজ-কলম সরবরাহ করা হত। বুওয়াইহী সুলতান আজদুদ্দৌলা সিরাজনগরে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। বইগুলো ক্রমানুসারে সাজানো ছিল এবং একটি সুবিন্যস্ত ক্যাটালগ তৈরি করা হয়; একজন গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। ঐ সময় বসরাতেও একটি গ্রন্থাগার ছিল। ঐ গ্রন্থাগারে যে সব পণ্ডিত গবেষণায় নিয়োজিত থাকতেন তাদেরকে বৃত্তি প্রদান করা হত। রায়নগরে যে গ্রন্থাগার ছিল তাতে চারশ উটের বোঝা পরিমাণে পাণ্ডুলিপি গচ্ছিত ছিল এবং পুস্তকগুলো ১০ খণ্ড ক্যাটালগে নিবন্ধীকৃত ছিল। এ সব লাইব্রেরিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা এবং ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অনেক সময় বিতর্ক সভাও অনুষ্ঠিত হত। ইয়াকুত তাঁর ভৌগোলিক অভিধান সংকলনের জন্য মার্ভ ও খাওয়ারিজমে লাইব্রেরি হতে উপাত্ত সংগ্রহ করেন।[৮]

পুস্তক বিপণন কেন্দ্র

আব্বাসী যুগে বাণিজ্যভিত্তিক পুস্তক-বাজার গড়ে ওঠে। আল ইয়াকুবী লিখেছেন যে, তাঁর যুগে (৮৯১ খ্রি.) রাজধানী বাগদাদে একটি রাস্তায় প্রায় একশ পুস্তক বিক্রেতাদের একটি পুস্তক বিপণন কেন্দ্র ছিল। তার বর্ণনা সঠিক হলে পুস্তক-বাজারটি ছিল বেশ জমজমাট। পুস্তক বিক্রেতাদের অনেকেই ছিলেন লিপিকার, কবি এবং সাহিত্যসেবী। তাদের দোকান কেন্দ্রগুলো কেবল বিপণন কেন্দ্রই ছিল না বরং একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে ঐ দোকানগুলোর সামাজিক মর্যাদাও ছিল। বিখ্যাত ইয়াকুত জীবন শুরু করেন বই এর দোকানে কেরানি হিসেবে। বিখ্যাত আন-নাদিম যাকে বলা হয় আল ওয়াৱাকার, সম্ভবত স্বয়ং পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন, অথবা গ্রন্থাগারিক ছিলেন এবং আল ফিহিরিস্তের স্বনামধন্য লেখক। এই পুস্তক হতে ইরাকের এক লাইব্রেরি সম্পর্কে জানা যায় যে, এখানে পারচামেন্ট প্যাপিরাস, চীনাকাগজ এবং চামড়ার অনেক স্ক্রোল ছিল; যাতে একটি জ্ঞানী পরিবারের ৫/৬ পুরুষের নোট দ্বারা সত্যায়িত লেখকের নাম ছিল।[৯]

কাগজ শিল্প

আব্বাসী আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্ব চর্চার যে উদ্যোগ আয়োজন পরিলক্ষিত হয়, আরবি ভাষাকে বিশ্ব জ্ঞান-ভাণ্ডারের বাহনে রূপান্তরিত করার যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলে, এবং প্রচুর পুস্তক বিপণন কেন্দ্র ও গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়–এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্ব যদি লেখার উপকরণ হিসেবে কাগজ সম্পর্কে সচেতন হয়— তাহলে এটাই ছিল স্বাভাবিক। নবম শতাব্দীতেও মুসলিম সাম্রাজ্যে লেখার উপকরণ

হিসেবে পার্চামেন্ট, প্যাপিরাসের বেশি ব্যবহার ছিল। আমিন মামুনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সময় অসংখ্য সরকারি দলিল দস্তাবেজ লুণ্ঠিত হয়। তার অনেকগুলো জলে ধুয়ে পুনরায় বাজারে বিক্রি করা হয়। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইরাকে চীনা কাগজ আমদানি করা হলেও অচিরে ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র কাগজ শিল্পের বিকাশ ঘটে। প্রথম সমরকন্দে কাগজ-কল প্রতিষ্ঠিত হয়। জনৈক চীনা বন্দি কাগজ শিল্পের পরিচয় ঘটিয়ে দেয় এবং এর প্রকৌশলগত জ্ঞানও প্রকাশ করে। প্রাচীন আরবি শব্দ 'কাগজ' সম্ভবত চীনাজাত তবে পারস্যের মাধ্যমে আরবিতে এর প্রবেশ ঘটে। যা হোক কাগজ শিল্প সমরকন্দ হতে ইরাকে স্থানান্তরিত হয়। খোরাসানের গভর্নর থাকাকালে বারমেকী ফজল বিন ইয়াহইয়ার নির্দেশে ৭৯৪ সালে বাগদাদে একটি কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। হারুনর রশীদের উজির জাফর বারমেকী সরকারি অফিসে পার্চামেন্টের বদলে কাগজের প্রচলন করেন। এতে কাগজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন স্থানে কাগজ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিহামায় শাকসব্জির আস দিয়ে কাগজ তৈরির পদ্ধতি তারা রপ্ত করে। মাকদেসী সমরকন্দের কাগজ ভাল বলে মন্তব্য করেন। কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় দশম শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব হতে প্যাপিরাস বিদায় নেয়।[১০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইসলামি বিশ্ব হতে কাগজ শিল্প লাতিন ইউরোপে প্রবেশ করে। ইসলামি বিশ্বে এই চৈনিক প্রকৌশল কিয়ৎপরিমাণে বিকশিত করলেও ইউরোপই এই শিল্পে বিপ্লব ঘটায়।

স্থাপত্য শিল্পকলা

আব্বাসী শাসন আমলে যে উচ্চমানের সভ্যতা রচিত হয় সম্ভবত চীন ব্যতীত অন্য কোনো দেশ-জাতি তার সাজুয্যের দাবি করতে পারে না। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তার গৌরবগাঁথা হারিয়ে ফেলে। লাতিন ইউরোপে তখনও চলছে ভাঙ্গা-গড়ার পালা; তার নব সভ্যতার উষালগ্ন মাত্র। তাদের উন্নত জীবনমানের বাস্তব বিকাশ ঘটে তাদের নগরায়ণে; সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত রাজধানী বাগদাদ নগরীতে। এই নগর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে সুষম লৌকিক স্থাপত্য শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। বাগদাদ নগর প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে দু একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই নবনির্মিত রাজধানীর প্রধান আকর্ষণীয় স্থাপত্যকলার নিদর্শন ছিল 'খলিফা প্রাসাদ' যাকে স্বর্ণদ্বার বলা হত। ঐ প্রাসাদের উপরে গঠিত হয় সবুজবর্ণের একটি গুম্বুজ--যে কারণে একে কুব্বাতুল খাজরাও বলা হত। এই রাজপ্রাসাদটি বিশাল প্রমোদ্যোনের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। এ উদ্যানে ছিল পশুশালা, পক্ষিশালা এবং বন্য পশুর অভয় অরণ্য।[১১] প্রাসাদের সম্মুখে বর্গাকৃত এক বিরাট প্রাঙ্গন (প্লাজা) তৈরি করা হয়। এটা গনসমাবেশ, সামরিক প্রদর্শন, ক্রিড়া প্রতিযোগিতা এবং ঘোড়দৌড়ের জন্য ব্যবহার করা হত; রাতে প্রাঙ্গণটি আলোকসজ্জিত থাকত। মনসুর উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে অথবা সিংহাসনে উপবেশন করে সামরিক মোহড়া পরিদর্শন করতেন; হারুনুর রশীদ,

মামুন এবং মুতাসিম অশ্বারোহণ করতেন এবং অনেক সময় সামরিক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করতেন।[১২] উক্ত প্রাসাদ নির্মাণের অল্প কিছুদিন পর নির্মিত হয় কসরুল খুলদ (চিরন্তণ প্রাসাদ)। এটা ছিল হারুনুর রশীদের বাসভবন। মাহদীর জন্য নির্মিত হয় রুসাফা প্রাসাদ। সামাররা হতে বাগদাদে রাজধানী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে মুতাজিদ ৪ লাখ দিনার ব্যয় করে নির্মাণ করেন সুরাইয়া প্রাসাদ (Pleiades palace) এর সংলগ্নে তৈরি হয় মুকুট প্রাসাদ (আততাজ), মুকতাফী ভবনটি সম্পূর্ণ করেন। আল মুকাদির নির্মিত রাজ প্রাসাদকে বলা হত দারুশ শাজারা। এ প্রাসাদের সম্মুখে সরবরের পাশে শোভা পেত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত একটি বৃক্ষ।[১৩] দশ লাখ দিনার ব্যয় করে বাগদাদে নির্মিত হয় মুইজিয়া প্রাসাদ। অসংখ্য সরকারি অট্টলিকা ব্যতীত উদীয়মান অভিজাত শ্রেণীর মুখপাত্র বারমেকী পরিবারের শাম্মাদিয়ার হর্মরাজী, প্রাসাদতুল্য তাহেরী অট্টালিকা নগরের শোভা বর্ধনই করে নি বরং একটি নব উত্থিত অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক কলেবর বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নতুন ধরনের স্থাপত্য রীতির মধ্যে। উল্লেখ্য প্রাসাদ ও অট্টালিকাগুলো সোনা দিয়ে গিলটি ও সুসজ্জিত করা হয়েছিল। কক্ষগুলি বিলাসবহুল দীভান, মূল্যবান টেবিল, সোনা রূপা নানা ধরনের চমৎকার চীনাপাত্র, রুচিশীলভাবে সাজান হয়। তদুপরি শহরে গণগোসলখানা, পয়-প্রণালী, নদী তীরে পাকা ঘাট, কেল্লা নির্মাণ, সরাইখানা প্রাচীর তোরণ সবই ছিল লৌকিক স্থাপত্যের নিদর্শন এবং সেই সাথে প্রমোদোদ্যান, বাগ-বাগিচা রচনা, বাগান বাড়ি, বিহার ভূমি ছিল নগর পরিকল্পনার স্থাপত্যিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাইগ্রিস নদীর তীরে আজদুদ্দৌলার বিখ্যাত বিমারিস্তান ছিল প্রাসাদতুল্য।

আব্বাসী বংশ কেবল লৌকিক স্থাপত্য শিল্পের প্রতি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দেন তা নয়, বরং তারা যথেষ্ট আগ্রহের সাথে মসজিদ স্থাপত্যের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন। মধ্যযুগে মসজিদ ছিল মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেকখানি জুড়ে। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তাই এর প্রভাব ছিল বিলক্ষণ। বাগদাদ প্রতিষ্ঠাতা তাঁর বাসভবনের অনতিদূরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাছাড়া রাক্কা, সামাররা ও আবু দুলাফে মসজিদ নির্মিত হয়। জুমা মসজিদগুলো ছিল বৃহদায়তনের। জুমা মসজিদের পরিকল্পনার পরিপাট্যে, কল্পনার বিশালতায়, কারুকার্যের পরমোৎকর্ষে দামাসকাসে ওয়ালিদ কর্তৃক নির্মিত বিশাল মসজিদকে অতিক্রম না করলেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।[১৪] ৭ লাখ দিনার ব্যয় করে সামাররা মসজিদ নির্মিত হয়।

উপরে বর্ণিত বাগদাদের রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর বাসভবনের অসম্পূর্ণ তালিকা হতে তাদের উন্নতমানের জীবন যাত্রার একটি সাধারণ ধারণা করা সম্ভব হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত মনসুর নির্মিত বাগদাদের অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্র নেই। প্রফেসর হিট্টি যথার্থই বলেন যে, প্রথমত আমীন মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, দ্বিতীয়ত হালাকুখানের ধ্বংসযজ্ঞ এবং তৃতীয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাগদাদের জমকাল স্থাপত্যশিল্পের ধ্বংস

সাধিত হয়, তাই তাদের সম্পর্কে চাক্ষুস কোনো বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। All these and many others like them left no remain to give us a inkling of the plandour that was theirs. So complete was the destruction....that even the site of most of there places can not to day be identified.[১৫] এরূপ একটি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে ইয়াকুত, ইয়াকুব; আল খাতিব প্রমুখ মহান লেখকদের পুস্তকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা উপাত্ত দ্বারা আব্বাসী স্থাপত্য শিল্পের মোটামুটি ছবি পুনর্গঠন করা সম্ভব। তুলনামূলক পাঠে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উমাইয়া স্থাপত্য শিল্প হতে আব্বাসী স্থাপত্য শিল্প নানা দিক হতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। বস্তুত আব্বাসী আমলে স্থাপত্য শিল্পে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা হয়। উমাইয়াদের রাজধানী ছিল বাইজানটাইনদের পরিত্যক্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দামাসকাস নগরী। তাই এখানকার স্থাপত্য শিল্পে বাইজানটাইন প্রভাব লক্ষণীয় হওয়াই স্বাভাবিক, অথচ আব্বাসীদের রাজধানী বাগদাদ নগরী তাদের নিজস্ব সৃষ্ট; নির্মিত হয় প্রাচীন পারস্যের রাজধানীর নিকট। বাগদাদ নির্মাণে প্রাচীন রাজধানীর অনেক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় জনশক্তি ও স্থপতিদের নিয়োগ করায় ইরানি রীতিনীতি পদ্ধতির প্রভাব প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে মার্বেল পাথরের পরিবর্তে ইটের ব্যবহার প্রাধান্য পায়। তা ছাড়া পারস্যের খিলান, ভল্ট, অলঙ্করণ মেসোপটেমীয় প্রভাবের দ্যোতক। হিট্টির মতে সামাররা মসজিদে ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামাররা ও দুলাফ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ মিহরাবে সিরিয় খ্রিষ্টান গির্জার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[১৬] প্রাচীন ব্যাবিলনীয় জিগুরাতের অনুকরণেই সামাররাহ্ মসজিদের বহিঃপার্শ্বে একটি গোলাকৃতির মিনার শীর্ষে উঠার জন্য বাহির হতে ঘোরান সিঁড়ি তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য এই মিনারের অনুকরণে মিশরের ইবনে তুলুন মসজিদের মিনার তৈরি হয়। আব্বাসী স্থাপত্যকলার প্রধান উপকরণ গোলাকার গুম্বুজ, অর্ধবৃত্তাকার খিলান, বক্রাকার খিলান, ভল্ট, খাঁজকাটা কাঙ্গুরা (Bettlement Squiech) ইটের নকসা, মিনারকৃত উজ্জ্বল টালি ইত্যাদি ব্যবহারে পারস্য স্থাপত্যরীতির প্রভাবই প্রমাণ করে। হিট্টি বলেন : The wall mihrab seems to have been a Syrian invention, suggested in all likelihood by the apse in the christian. Outside, against the wall of the great mosque of Samarra, rose a tower which is analogous to the ancient Babylonian Zeggurat... Such Abbasid remains as have suvived at all Reffah of the late eighth Century, and at Samarra carry on the tradition of Asiatic more particularly Persian, archtecture in contrast to the Umayyad structurs which bear clear trace of Byzantine Syrian art. Under the Sasanian dynesty a distingtive type of Persian archetecture was developed, with ovoid or elliptical domes semi circullar, arches, spiral tower indented

battleme, glazed wall tiles and metal covered roofs. This type became one of the most powerful factor in the formation of Abbasid art.[১৭]

চিত্র শিল্প

ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্তি যেমন মানুষের সহজাত বৃত্তি; নান্দনিক রস উপভোগও তাই; সৌন্দর্যের প্রতি আছে তার সহজাত আকর্ষণ। এরূপ সহজাত বৃত্তি মানব মন হতে মুছে দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নিছক ঐতিহাসিক কারণে ইসলামি বিপ্লবের আদিযুগে চিত্রকলা প্রসঙ্গে বৈরী মনোভঙ্গি থাকাই ছিল স্বাভাবিক।[১৮] চিত্রকলার প্রতি মুসলিম ধর্মবেত্তাদের মধ্যে ইসলামের আদিযুগের মনোভঙ্গি বিদ্যমান থাকলেও সাধারণ মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে প্রাণীর চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্যের প্রতি নমনীয় মনোভঙ্গি গড়ে ওঠে। আদিম নিষেধাজ্ঞা আদৌ জনপ্রিয় হয় নি, বরং চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভ হতে বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মত চিত্রকলা ধর্মীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়। আরনল্ড তাঁর গবেষণার মধ্যে দেখিয়েছেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে য্যাকোবি বা নেস্টোরীয় খ্রিষ্টান চিত্রকরদেরকে ইসলামি ধর্মীয় চিত্রাঙ্কণ কর্মে নিয়োগ করা হয়ে থাকবে। মুসলিম পুঁথি পুস্তকের শোভন বৃদ্ধি এবং বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টায় অমুসলিম সমাজে এ শিল্পের বিকাশ হয়।[১৯] নবম শতাব্দীতে জনৈক আরব পর্যটক চীনা রাজদরবারে মহানবীর একটি ছবি দেখেছিলেন বলে মাসুদী উল্লেখ করেন; তবে সন্দেহাতিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে, এটি কোনো নেস্টোরীয় খ্রিষ্টান চিত্রশিল্পীর কাজ হয়ে থাকবে। মহানবীর মেরাজ যাত্রার কথিত বাহন বোরাকের চিত্রকল্পটি পারস্যজাত অথবা গ্রীক অর্ধঘোটকাকৃতি মানুষ অথবা এ্যাসারাইরীয় মনুষ্য মস্তক বিশিষ্ট ডানাওয়ালা পশু হতেই গৃহীত হয়। ইসলামি ভাবাদর্শ এভাবেই দৃশ্যমান করাই ঐ সব চিত্রকলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

আব্বাসী খলিফাদের প্রাসাদ অলঙ্করণের ঐতিহ্য হতেই মূলত মুসলিম সমাজে চিত্রকলার প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। মনসুর তাঁর রাজপ্রসাদের গম্বুজের উপর বায়ুশকুন বা আবহাওয়া নির্দেশক হিসেবে ঘোটকাকৃতির মানবমূর্তি প্রতিস্থাপন করেন। তাইগ্রিস নদীতে সিংহ, ইগল ইত্যাদি পশুপক্ষীর মডেলে তৈরি প্রমোদতরী ভাসানো থাকত; আল মুকতাদির প্রাসাদ সরোবরে আঠার শাখা বিশিষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তার উভয় তীরে কিংখার পরিহিত যেন যুদ্ধরত পনেরটি অশ্বারোহীর মূর্তি প্রতিস্থাপিত ছিল।

সামাররায় প্রতিষ্ঠিত খলিফা আল মুতাসিম তার প্রাসাদ দেয়ালে কুসায়রা আমরার মডেলে নগ্ন নারী চিত্র ও মৃগয়া দৃশ্য দিয়ে সজ্জিত করেন। এ দেয়ালের অঙ্কন কাজে খ্রিষ্টান শিল্পীরাই নিয়োজিত হয়েছিলেন। মুতাওয়াক্কিলের সময় সামাররা গৌরবের শীর্ষে ওঠে; তিনি তার প্রাসাদ দেয়ালের অলঙ্করণের জন্য বাইজানটাইন শিল্পীদিগকে নিয়োগ

করেন। অনেক ছবির মধ্যে ছিল এক যাজক ও একটি গির্জা। মুসলিম চিত্রকলা প্রধানত পাণ্ডুলিপি ভিত্তিক ছিল। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় রেখা ও রঙের প্রয়োগ করে চিত্র অঙ্কন করা হত। মাকরেজি মুসলিম চিত্রকলার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেন। ক্ষুদ্রাকায় চিত্রকলায় চিত্রিত যে সব আরবি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তা মূলত দ্বাদশ শতকের পূর্বের নয়। এ পাণ্ডুলিপিগুলো হল কালিলা ও দিমনা, মাকামাতে হারিরী এবং কিতাবুল আগানী। এদের চিত্রকর ছিল জ্যাকোবী অথবা নেস্টোরীয় খ্রিষ্টান; হয় তারা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে অথবা মুসলিমরা তাদেরকে নিয়োগ করেছিল।[২০]

বাণিজ্যিক শিল্পকলার জন্য পারস্যের খ্যাতি ছিল চিরকাল। ইরানি কার্পেটে জীবন্ত প্রাণীর নকশা বোনা হত; কম্বলে শিকারের দৃশ্য এবং উদ্যানের নকশা বোনা হত: কম্বলে শিকারের দৃশ্য এবং উদ্যানের নকশা খুবই জনপ্রিয় ছিল। সিরিয়া ও মিশরে তৈরি চিত্রিত সিল্ক ইউরোপে ক্রুসেডাররা আমদানি করার পর খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মৃৎশিল্প ও অন্যান্য

আমাদের আলোচ্যকালে আব্বাসী মৃৎশিল্প খ্যাতি অর্জন করে। মৃৎশিল্প ছিল প্রাচীন মিশর এবং সুমারের অন্যতম ঐতিহ্য। পুষ্পাঙ্কিত পারস্যের কাশানী টালির বহুল প্রচলন হয় দামাসকাসে। গৃহের অভ্যন্তরে ও বহিরাঙ্গনে অলংকরণে মোজাইক কাশামি টালির প্রচুর ব্যবহার ছিল। একই সাথে আরবি লিখন শিল্প মুসলিম প্রধান আর্ট মটিভে পরিণত হয়। পশ্চিম এশিয়ার গ্লাসের সিলাকরণ, সোনালিকরণ কাজ প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিট্টি যথার্থই বলেন যে, কায়রোর আরব যাদুঘরে, লুভার বা ব্রিটিশ যাদুঘরে সংরক্ষিত সামাররা, ফুসতাতের অসংখ্য মৃৎপত্রে রঙিন আলো, পাত্র, কলসি, ফুলদানি ইত্যাদি আব্বাসী শিল্পের খ্যাতির স্বাক্ষর বহন করে। Among the tresures of the Louvre, the British Museum and the Arab Museum of Cairo are example pieces from Samarra and Fustat including plates, cups, veses and lamps for home and Mosque use, painted with brilliant radiant lustrs and acquring through the ages melathic glazes of oharging rain bow hue.[২১]

হস্তলিপি শিল্প

আলোচ্য সময়ে কোনো প্রকার ধর্মীয় আপত্তি না থাকায় আব্বাসী সুবর্ণ যুগে হস্তলিপি শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। শিল্পীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ শিল্পের চর্চার মধ্য দিয়ে তাদের নান্দনিক রসবোধ পরিতৃপ্ত করে। তদুপরি পবিত্র গ্রন্থ প্রচারে এটা ছিল একটা শ্রেষ্ঠ উপায়—তাই মুসলিম জীবনে এর গুরুত্ব ও মাহত্ব সহজে অনুভূত হয়। তদুপরি হস্তলিপি ছিল একটি আরব ঐতিহ্য। এ সব কারণে সমাজে লিপিকাররা ছিলেন অত্যন্ত

সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। খলিফা মামুনের রাজত্বকালে আর রায়হান হস্তলিপির এক নতুন শিল্পরূপ দান করায় তার নামানুসারে রায়হানী হস্তলিপি শিল্পরীতির প্রচলন হয়। আব্বাসী মন্ত্রী ইবনে মুকাল্লাহ (৮৮০-৯৪০ খ্রি.) ছিলেন বিখ্যাত হস্তলিপি শিল্পী। তাঁর ডান হাত কর্তিত হলেও তিনি বাম হাত এমন কি কর্তিত হাতের মধ্যভাগে কলম ধরে দ্রুত লিখতে পারতেন। ইবনুল বাউয়ার মুহাক্কাকী পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। শেষ আব্বাসী খলিফার দরবারে লিপিকার আল মুস্তাসিমী নসখ লিপিকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। আরব শিল্পের মধ্যে সম্ভবত হস্তলিপি শিল্প ছিল সার্বজনীন, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মধ্যযুগে সবাই সৌন্দর্য রচনায় এ শিল্পে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম ছিল। হিট্টি বলেন ঃ Calligraphy is perhaps the only Arab art which to day has christian and moslem representative in Constantinople, Cairo, Boirut, Damascus, whose products excel in eleganec, beauty any master-pieces that the ancients ever produced.[২২] এই শিল্পের সাথে পুস্তক বাঁধাই শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

সঙ্গীত শিল্পকলা

চিত্রকলা সম্পর্কে ইসলামি শাস্ত্রজ্ঞদের যেরূপ কঠোর মনোভাব বিদ্যমান ছিল সঙ্গীতের প্রতিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তদ্রূপ। উমাইয়া যুগে দামাস্কাসে সঙ্গীতের উপর তাঁদের নিষেধাজ্ঞা অনেকাংশে কার্যকর থাকলেও আব্বাসীযুগে তা ছিল না। আব্বাসী যুগে বাস্তব অবস্থায় পরিবর্তন আসে। আব্বাসী যুগে শাস্ত্রজ্ঞদের নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর হয় ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত কারণে। রুক্ষ্ম পরিবেশে বেঁচে থাকার তাগিদে মরুবাসীদের মনোজগতে গভীর রসবোধ, তাদের ভাষার লালিত্য, কাব্যের ছন্দোময়তা, উষ্ট্রচালন গীতির সুরের মূর্ছনা এবং সঙ্গীত রসবোধ তাদের জীবনে যেমন ছিল গভীর, তেমনি তা ছিল সহজাতও বটে। কোরআন তেলাওয়াতের সুরের ঝঙ্কারে পাগল হয়ে উমর ইসলামে দীক্ষা নেন বলে একটি কাহিনী চালু আছে। জীবন্ত প্রাণীর ছবি অঙ্কন এবং মূর্তি গড়ার কথা ভিন্ন। বৃহত্তর সমাজ গঠনে তৎকালীন আরবের বড় বাঁধা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তৌহিদী আন্দোলনের সাথে মূর্তি ভাঙ্গার কার্যক্রম প্রায় একাকার হয়ে যায়। বস্তুত পৌত্তলিকতার সাথে সুরের জগতে কোনো মিল ছিল না। আব্বাসীদের বিশেষ পরিবেশে দেশ বিজয়ের নেশার পরিবর্তে জীবনবোধ হয়ে ওঠে গভীর। ইহলৌকিক জীবন উপভোগের উপযোগী অবস্থা ও বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য আরব জীবনে ছিল প্রবাহমান। এরূপ পরিস্থিতিতে আরব সঙ্গীতকলার বিকাশ ছিল স্বাভাবিক। সঙ্গীত কলার উদ্বোধন করেন আল মাহদী। তাঁর সম্পর্কে হিট্টির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। শেষ উমাইয়া খলিফা সঙ্গীত চর্চায় যেখানে সমাপ্তি টানেন আব্বাসী খলিফা মাহদী সেখান হতে শুরু করেন। The Abbasid al Mahdi began where the last Umayya ended.[২৩]

মক্কার সিয়াত (৭০৯-৮৫ খ্রি.) ছিলেন তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। মাহদী তাকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান এবং তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। কিতাবুল আগানীতে সিয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর সঙ্গীত নিস্তেজ প্রাণে সজিবতা বয়ে আনত। Whose song warmed the chilled more than a hot bath. সিয়াতের শিষ্য ছিলেন স্বনামধন্য ইব্রাহিম আল মৌসিলী (৭৪২-৮০৪ খ্রি.)। সিয়াত প্রয়াত হলে ইব্রাহিম ধ্রুপদী সঙ্গীতের আচার্য হয়ে ওঠেন। তাঁর সুরের তালবোধ এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, একদা ত্রিশজন সারেঙ্গবাদক মহিলাদের মধ্যে যার সারেঙ্গ হতে বেসুরো আওয়াজ বের হয়ে আসছিল তিনি সেটাকেই সনাক্ত করে ধরে ফেলেন। খলিফা হারুনুর রশীদ তাকে মাসিক দশ হাজার দিরহাম বেতন মঞ্জুর করেন এবং দেড় লাখ দিরহাম বখশিশ প্রদান করেন। একদা একটি গানের জন্য তিনি এক লাখ দিরহাম পেয়েছিলেন। খলিফা হারুনের দরবারে ইবনে জামী নামক আর একজন সুরশিল্পী ইব্রাহিম মোসিলীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইকদ এর বিচারে ইব্রাহিম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর সর্বশ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী, তবে ইবনে জামী ছিলেন শ্রেষ্ঠ মধুর স্বরের অধিকারী। Ibrahim was the greatest of the musician in verstility, but Ibn Jami had the swtest note.[২৪] তৎকালীন সভ্যবিশ্বের শ্রেষ্ঠ খলিফা হারুনুর রশীদের দরবার কেবল বিজ্ঞান-দর্শন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দানের জন্যই বিখ্যাত ছিল না, এটা সুর-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ চর্চা কেন্দ্র হিসেবেও খ্যাত ছিল। তার রাজদরবার ছিল অসংখ্য সঙ্গীত তারকাদের সর্ববৃহৎ আড্ডাখানা। আগানী, ইকদ, ফিহিরিস্ত, নিহায়া সর্বোপরি আরব্য উপন্যাসের ঐ তারকা ছিলেন উপজীব্য। খলিফার দরবারে এক সঙ্গীত উৎসবে প্রায় দু হাজার সুর শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। ইব্রাহিমের শিষ্য মুখারিকও ছিলেন খ্যাতনামা ওস্তাদ গায়ক; তিনিও হারুনের প্রিয় গায়ক ছিলেন; হারুন তাঁকে একলাখ দিনার দিয়ে পুরস্কৃত করেন।[২৫]

খলিফা মামুন এবং মোতাওয়াক্কিরের সঙ্গীত আসরের সর্বশ্রেষ্ঠ তারকা ছিলেন ইব্রাহিম মৌসিলির পুত্র ইসহাক। পিতার মৃত্যুর পর তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুর শিল্পী বলে তিনি স্বীকৃত হন।[২৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আব্বাসী সঙ্গীত জগতের তারকাদের অনেকেই ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাদের অনেকেই ছিলেন গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সেতারা-বেহালা-গিটার বাদক, কেউ কবি-পণ্ডিত-বিজ্ঞানী-লেখক।

খলিফারা কেবল সঙ্গীত শিল্পের সমঝদার ও উদার পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না ঐ বংশের অনেক খলিফাই সুরের জগতের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মাহদী পুত্র ইব্রাহীম সঙ্গীত বিশারদ ও গায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। আল ওয়াসিক (৮৪২-৭ খ্রি.) ছিলেন একজন নামী বীণাবাদক, সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি এক হাজার গানে সুরারোপ করেন। ওয়াসিকের ভ্রাতা খলিফা মুন্তাসির (৮৬১-২ খ্রি.) এবং খলিফা মুতাজ (৮৬৬-৯ খ্রি.) ছিলেন কাব্য ও সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী। মুতামিদ ছিলেন প্রকৃতই একজন সঙ্গীত বিশারদ। মুতামিদের সঙ্গীত জলসায় ভৌগোলিক ইবনে খুরদাবেহ সঙ্গীত ও নৃত্য তত্ত্বের উপর বক্তৃতা করেন।[২৭]

আব্বাসী খেলাফতের সোনালিযুগে গ্রীক বিজ্ঞান-দর্শনের অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনার সময় ইসহাক বিন হুনান (৮০৯-৭৩ খ্রি.) এ্যারিস্টটলের দুটি সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক কিতাবুল মাসায়েল (Problemata) এবং কিতাবুল ফিন নফস ওয়া এনিমা আরবিতে অনুবাদ করেন। তিনি গ্যালেনের একটি পুস্তক কিবাতুল নাগাম এবং কিতাবুল ক্বানুনও অনুবাদ করে। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক গ্রিক লেখকের পুস্তক আরবিতে অনূদিত হওয়ায় তৎকালীন মুসলিম বিশ্ব সঙ্গীত এবং ধনীতত্ত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ করে। এই সময় মুসিকি বা মুসিকা মূলত গ্রীক শব্দ হতে আরবি শব্দ ভাণ্ডারে সম্পৃক্ত করা হয়; শব্দটি সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক দিক বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এবং আরবি গানা শব্দটি দিয়ে কেবল বাণী ও সুর বুঝানো হয়। আরবিতে ব্যবহৃত অনেক বাদ্যযন্ত্র যথা গিটার বা অরগান গ্রিক শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়।[২৮] সঙ্গীত শিল্পের উপর গ্রিক পুস্তকের অনুবাদ ব্যতীত আরব দার্শনিক আল কিন্দী সর্ব প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। তার পুস্তকে গ্রিক সঙ্গীততত্ত্বের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। তিনি দুটি পুস্তক রচনা করেন। একটি পুস্তকে স্বরলিপির আলোচনা করেন। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আররাজী এবং দার্শনিক আল ফারাবী মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন। আল ফারাবী ইউক্লিডের গ্রন্থাবলীর উপর ভাষ্য-রচনা করেন। আল ফারাবীর মৌলিক গ্রন্থ কিতাবুল মুসিকিল কবীর ছিল প্রাচ্য জগতের সঙ্গীত বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তার ইহসাল উলুম গ্রন্থটি পাশ্চাত্য জগতে সাড়া জাগায় এবং লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উপর এ পুস্তকের প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী।[২৯] উল্লেখ্য ইবনে সিনা এবং ইবনে রুশদের সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক অনেকদিন ধরে পশ্চিম ইউরোপের প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইমাম গাজ্জালী সামা সঙ্গীতের পক্ষে লেখায় একদল সুফি দরবেশ সঙ্গীতপ্রিয় হয়ে ওঠেন, এবং আধ্যাত্মিক স্বার্থে সঙ্গীতের ব্যবহার করেন।

১২.৪ মানসিক সংস্কৃতি : ধর্মীয় মূল্যবোধ

ভূমিকা : আব্বাসী যুগে জ্ঞান চর্চার প্লাবন দু খাতে প্রবাহিত হয়। প্রথম খাতটি সম্পূর্ণ ধর্ম বিষয়ক। এখাতের ছিল বিভিন্ন শাখা, যথা : ক. স্মৃতি-শ্রুতি শাস্ত্রের চর্চা; খ. ব্যবহারিক বিদ্যার বিকাশ; গ. আনুষঙ্গিক আরবি ভাষা ও শব্দতত্ত্ব ও ভাষা অলঙ্কার শাস্ত্র; ঘ. নীতি শাস্ত্র, ঙ. ধর্মতত্ত্ব। ধর্ম জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন শাখায় যারা নাম ভূমিকায় ক্রিয়াশীল ছিলেন—তাদের শতকরা ৯০ জন ছিলেন আরব মুসলিম পণ্ডিত এবং তাদের বংশধর। দ্বিতীয় খাতটি ছিল বিজ্ঞান ও দর্শনের পল্লবিত বিভিন্ন শাখা এবং উচ্চতর মানববিদ্যা। এখাতে অনারব পণ্ডিতদের অবদান ছিল ৯৫%। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ প্রসঙ্গে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। আরব তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের মননশীল কর্মকাণ্ড

এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের উৎস কি এবং বাইরের প্রভাব কতটুকু-এ নিয়ে বেশ উত্তপ্ত আলোচনা হতে দেখা যায়। পাশ্চত্য দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের অনেকেই বহিরাগত প্রভাবের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। মুসলিম ভাষ্যকারদের কট্টরপন্থী মুসলিম চিন্তার উপর বহিস্থ প্রভাব আদৌ স্বীকার করেন না। এরূপ মতামত সম্ভবত চরমপন্থীদের, কারণ মানব জাতির মননশীল সম্পদের উপর দেশ বা জাতির কারো একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানব সভ্যতার বিকাশতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিকাশ ধর্মে বহির্বর্তী প্রভাব অনস্বীকার্য; তবে বহিস্থ কারণ কার্যকর হয় তখনই যদি বস্তুর অভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থা উক্ত প্রভাব গ্রহণের উপযোগী হয়। আমরা ডিম ফুটাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে বাহ্যিক তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখি; কিন্তু ডিমের অভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থা যদি বাচ্চা ফোটার অনুকূল না হয়, অথবা ফুটার কোনো অভ্যন্তরীণ চাহিদা না থাকে তাহলে বহির্বর্তী তাপ অকার্যকর হয়। এ কারণেই বিকাশতত্ত্বের সিদ্ধান্ত হল : অভ্যন্তরীণ উপাদান, শর্ত এবং বহিস্থ উপাদান কারণ। বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের ধারণা এই যে, মধ্যযুগে মুসলিম সম্প্রদায় দ্রুত বিলীয়মান প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সযত্ন সংরক্ষণ ও অনুশীলন করে এবং তাদের উত্তর প্রজন্মের নিকট তা হস্তান্তর করে তারা এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তাদের এরূপ ঐতিহাসিক ভূমিকার যথার্থ উপলব্ধির জন্য আব্বাসীযুগের অভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থার যুগের গতিময়তা–স্থবিরতা, তার গতি-প্রকৃতি প্রবণতা, তার অভ্যন্তরীণ চাহিদার সাথে বহিস্থ উপাদানের অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের স্বরূপের—বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি?

আব্বাসী ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি, তার চালিকাশক্তির স্বরূপ অনুধাবন করার জন্য আব্বাসী বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি পুনশ্চ স্মরণ করা দরকার। ঐ বিপ্লবের ফলে আব্বাসী সাম্রাজ্য নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। উমাইয়া সাম্রাজ্য ছিল প্রধানত আরব সাম্রাজ্য; কিন্তু আব্বাসী ছিল বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র। উমাইয়া শক্তি মুখ্যত দেশ জয়ের অভিযান পূরণে নিয়োজিত হয়; আব্বাসীরা নীতিগতভাবে সম্প্রসারণবাদী নীতি পরিত্যাগ করে; অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক বিকাশের উপযোগী সাম্রাজ্যের দৃঢ়ীকরণ ও স্থিতিশীল নীতি গ্রহণ করে। তাদের এ অবস্থা অনধিক একশ বছর স্থায়ী হয়। ইতিহাসে উমাইয়াদের অর্জন ছিল মূলত সামরিক। উমাইয়া শাসননীতি ছিল মূলত ধর্মনিরপেক্ষ; মুতাওয়াক্কিলের সময়টুকু বাদ দিলে আব্বাসী আমলে ধর্মীয় সহনশীলতার নীতির প্রাধান্য থাকলেও তাদের শাসন ব্যবস্থায় একটি পাতলা ধর্মীয় আবরণ ছিল। এর ফলে আব্বাসী শাসন একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হওয়ায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের প্রভাব সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশের গ্রাম সমাজেও প্রবেশ করে এবং দশম একাদশ শতকে প্রাচ্য ইসলামি সাম্রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এরূপ বাস্তব অবস্থায় প্রথমত সময়ের অগ্রগতির সাথে খোদ আরবে তাদের নয়া প্রজন্ম যেমন

জানতে চায় তার দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা পদ্ধতি, তেমনি অনারব যারা নানা কারণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য ধর্মীয় জ্ঞান এবং এর বাহন আরবি ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানার্জনের তাগিদ ছিল প্রচুর।

দ্বিতীয়ত সমাজ বিকাশের গতিছন্দ মূলত জীবনের বাস্তবতার ঘাতপ্রতিঘাতে নতুন নতুন রস-রূপ-গন্ধ লাভ করে। মানুষ বিচিত্র; বিচিত্র তার মন; প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত মানব জীবন দ্বন্দ-সমন্বয়ের তালে তালে চলে। কে জানত মহানবীর মহা প্রয়ানের পরপরই মহানবীর জীবনধারার সাথে সুপরিচিত সাহাবীদের মধ্যে দেখা দেবে পরস্পরবিরোধী চিন্তা; স্বার্থ-চেতনা, এমন কি হানাহানি। গড়ে ওঠে খারেজী শিয়াদল; অবদমিত গোত্রবাদ, হাশেমী উমাইয়া দ্বন্দ্ব পুনরায় মাথাচাড়া দেয়। উমাইয়া শাসন আমলে আরবদের আর্থ-সামাজিক জীবনে অনেকখানি অগ্রগতি সাধিত হয় এবং একই সাথে জীবনের জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। অনেক মৌলিক জীবন জিজ্ঞাসা উঁকি মারতে থাকে। উমাইয়াদের সমর্থন করা কি ধর্মবিরোধী? কে কাফের? কে মুসলিম? পাপপুণ্যের সংজ্ঞাই বা কি? এরূপ জীবন জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, প্রাথমিক স্তরের সরল সহজ ইসলামের যুগের যে পরিসমাপ্তি হয়েছে এবং বৌদ্ধিক ইসলামের সময় সমাগত। উমাইয়া যুগে মুরজিয়া, কাদরিয়া, জাবারিয়া মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটে। ইসলামি শিক্ষার ভাষাভাসী ব্যাখ্যা আর যথেষ্ট নয় বরং তার গভীরে প্রবেশের চেষ্টার মধ্য দিয়েই ঐসব মতবাদ গড়ে ওঠে।

ইলমুল হাদিস বা সুন্নাহ বিষয়ক জ্ঞান

মুসলিম জীবন শাসিত হয় মহানবী প্রদত্ত দুটি মাপকাঠি দ্বারা : ক. আল্লার বাণী (আল কোরআন) খ. মহানবীর জীবনাদর্শ (আস সুন্নাহ) এ কারণে প্রথমত মুসলিম মাত্রই আরব অনারব সাবইকে উক্ত দু সূত্র হতে ধর্মের অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করা ছিল একান্ত প্রযোজন। দ্বিতীয়ত মহানবীর মহাপ্রয়ানের পর গড়ে ওঠা বিভিন্ন দলমতের সকল পক্ষই ঐ দু সূত্রের মধ্যে স্ব স্ব পক্ষের সমর্থন খোঁজে। বস্তুত মুসলিম জীবনের যে কোনো প্রশ্নে-ধর্মীয় রাজনৈতিক সামাজিক প্রত্যেককে কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হওয়ার দরকার ছিল। এরূপ পটভূমিতে আব্বাসী সুবর্ণ যুগে ইলমুল হাদিস এবং ইলমুল ফিকাহর বিকাশ ঘটে।

পবিত্র কোরআন খোলাফায়ে রাশেদীন যুগে সংকলিত হয়; কিন্তু সুন্নাহ অনেক দিন ধরে সংকলিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুন্নাহ বলতে বুঝায় মহানবীর আদেশ-উপদেশ এবং নিষেধাজ্ঞামূলক সকল বাণী, তাঁর কার্যাবলী এবং তাঁর অনুমোদিত সকল বিষয়বস্তু। সুন্নাহ কোরআনের মতই মুসলিম কর্ম ও চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে। হাদিস নবীর বাণী; কোরআন আল্লার বাণী; হাদিসের বাণীও মূলত ঐশী, কোরআনের বাণী ও ভাষা উভয়ই ঐশী।[৩০]

হাদিসের এরূপ গুরুত্ব সত্ত্বেও তা সংকলিত হয় নি সত্য; কিন্তু অসংখ্য সাহাবা ছিলেন যারা অতি আগ্রহে সযত্নে এবং সতর্কতার সাথে অসংখ্য সুন্নাহ মনে ধারণ করে রেখে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট মৌখিকভাবে পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আয়শা ২২১০টি, আবু হুরায়রা ৫৩০০টি, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মালেক বিন আনাম ২২৮৬টি, আব্দুল্লাহ বিন উমর ১৬৩০টি হাদিস বিবৃত করেন। সত্য জ্ঞানের সন্ধানে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মহানবী। তৎকালীন মুসলিম জীবনে সুন্নাব প্রচণ্ড গুরুত্ব থাকায় ধর্মপরায়ণ মুসলিম পণ্ডিত ইলমুল হাদিস অর্জন করার জন্য নানা স্থানে পরিভ্রমণের কষ্ট বরণ করতেন। এটা ছিল পুণ্যের কাজ, ধর্মযুদ্ধের শামিল হওয়ার মতই পুণ্যের কাজ।[৩১]

মহানবীর মহা প্রয়ানের পর আড়াইশ বছরের মধ্যে হাজার হাজার হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয় বটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অসংখ্য হাদিস আদৌ নির্ভরযোগ্য ছিল না। হাদিসের গুরুত্বের জন্য অসংখ্য অসাধু ব্যক্তি নানা উদ্দেশ্যে বহু বানোয়াট হাদিস প্রচার করে। তাবারী বলেন যে, ৭৭২ সালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পূর্বে ইবনে আবি আওজায়ী স্বীকার করেন যে, তিনি ৪ হাজার মিথ্যা হাদিস প্রচার করেন।[৩২] যা হোক উমাইয়া যুগে মদিনা, বসরা ও কুফা নগরে প্রসিদ্ধ হাদিস চর্চা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বসরা এবং মদিনার কেন্দ্রগুলোর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। বসরায় বসবাসকারী সর্বজন শ্রদ্ধেয় হাসান আল বসরি এবং ইবনে শিহাব জুহরী ছিলেন বিখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞ। বদরযুদ্ধে যোগদানকারী ৭০ জন যোদ্ধা সাহাবীর সাথে হাসান বসরীর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল এবং তাদের নিকট হতে অনেক সুন্নাহ জ্ঞান অর্জন করেন। কুফায় বসবাসকারী আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (মৃ. ৬৫৩) ৮৪৮টি হাদিস রেওয়ায়েত বা বিবৃত করেন; আমির ইবনে শারাহবিল আশশায়াবীও ছিলেন হাদিস বিশারদ; তিনি ১৫জন সাহাবীর নিকট হতে হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। আশ শায়াবী ছিলেন বিখ্যাত আইনবেত্তা আবু হানিফার শিক্ষক। এ ভাবে হাদিস জ্ঞান প্রবাহ অব্যাহত থাকে।

অধিকতর আর্থ-সামাজিক বিকাশের ফলে আব্বাসী সোনালি যুগের শেষ প্রান্তে ইলমুল হাদিস একটি পরিণতি লাভ করে। হাদিস সংকলনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করেন পারস্যের বিখ্যাত হাদিস বিশারদ মোহাম্মদ ইসমাইল আল বোখারী (৮১০-৭০ খ্রি.)। দীর্ঘ ১৬ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে পারস্য, ইরাক, মিশর ও হেজাজ ভ্রমণ করেন এবং এক হাজার ব্যক্তির নিকট হতে ৬ লাখ কথিত হাদিস সংগ্রহ করেন এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে সেগুলো বাছাই করে মাত্র ৭২৭৫টি হাদিস তার সংকলনে স্থান পায়।[৩৩] সঠিক হাদিস নির্বাচনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সে সম্পর্কে মাওলানা আকরম খান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মোস্তফা চরিত্রের এবং শিবলী নোমানী *সিরাতুন্নবী গ্রন্থের ভূমিকায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার সংগৃহীত হাদিসগুলো* তিন ভাগে ভাগ করেন : ক. সহিহ বা সত্য হাদিস; খ. গ্রহণযোগ্য বা হাসান হাদিস;

গ. দুর্বল বা জইফ হাদিস। তার গৃহীত হাদিসগুলো তিনি বিষয়ভিত্তিক যথা: নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, অজু-গোসল, নিকাহ্, তালাক, বেচাকেনা, উত্তরাধিকার ইত্যাদি অধ্যায়ে সাজান। প্রতিটি হাদিসের দুটি অংশ থাকে : ক. ইসনাদ বা বর্ণনাকারীদের অনুক্রম অর্থাৎ বোখারী ক এর নিকট হতে এবং ক খএর নিকট এবং খ মহানবীর নিকট হতে জেনেছেন। একটি হাদিসের বর্ণনাকারীদের এরূপ ধারাক্রম হলো ইসনাদ; খ. মতন বা মূল পাঠ অর্থাৎ নবী যা বলেছেন বা অনুমোদন করেছেন। বোখারী তার হাদিস নির্বাচনের বর্ণনাকারীদের অনুক্রমের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থাৎ বর্ণনাকারীরা সরাসরি একে অপরের নিকট হতে শ্রবণ করেন-এরূপ হাদিসকে হাদিসে ইত্তিসাল বলা হয়।[৩৪] In all these fields criticism was usually external, being limited to a considerable of the reputation of the transmiters who are at the same time guarantors, and to the possibility of there forming an un interrept-ed chain leading back to the Prophet.

বোখারীর পর দ্বিতীয় সহিহ্ হাদিস গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনা করেন বোখারীর শিষ্য নিশাপুরের মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মৃ. ৮৭৫ খ্রি.)। বোখারী সাহিহ্ হাদিস নির্বাচনে যত শক্ত শর্ত ও মাপকাঠি নির্ধারণ করেছিলেন সে সম্পর্কে গুরুর সাথে তার বড় রকমের মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং উভয়ের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মুসলিম এসব কথা অকপটে তার সংকলনের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। মুসলিম অবশ্য তার সংগৃহীত হাদিসগুলো বোখারীর মত বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করে সাজিয়েছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট বোখারী ও মুসলিমকে একত্রে সহিহায়েন বলা হয়। কোরআনের পর এদের মর্যাদা। সাহিহায়েন ব্যতীত আরো ৪ খানা হাদিস গ্রন্থকে মুসলিম উম্মা সহিহ্ হাদিসের মর্যাদা দিয়েছেন। গ্রন্থগুলো : ক. সুনানে আবু দাউদ (মৃত. ৮৮৮ খ্রি.), খ. জামিউত্তিরমিজী (মৃত. ৮৯২ খ্রি.); গ. সুনানে ইবনে মাজা কাজভিনী (মৃ. ৮৮৬ খ্রি.); ঘ. সুনানে নাসায়ী (মৃত. ৯১৬ খ্রি.)।

ফেকাহ্ : ব্যবহারিক শাস্ত্র

তৎকালীন চলমান সমাজকে ঐতিহ্যের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার জন্য হাদিস বিশারদদের আন্তরিক প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয় নি। বাস্তবতার প্রচণ্ড আঘাতে ঐতিহ্যের শক্ত শৃঙ্খল ঢিলা হয়ে যায়। আব্বাসী সোনালি যুগের ধর্ম-জ্ঞান বিকাশে আর একটি বড় অবদান হল মুসলিম ব্যবহারিক শাস্ত্রে (Muslem Jurisprudence) এর উন্মেষ। আব্বাসী আমলে পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের প্রচণ্ড তাগিদে তাদের ধর্মজ্ঞানের আর একটি নতুন স্বতন্ত্র, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা আইন বিদ্যার উদ্ভব হয়। কোরআনের ঐশী বাণীতে আল্লার অনুজ্ঞাসমূহ বিধৃত হয়; সুন্নায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা

পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিস্তৃত ও সুসংহত রূপ লাভ করে এবং তার অন্তর্নিহিত যৌক্তিক সূত্রায়ণ ঘটে ইলমুল ফিকাহ বা ব্যবহারিক শাস্ত্রে। সনাতন ইসলামি জীবনে দুটি প্রাত্যহিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে হয় : ক. হক্কুলাহ; খ. হক্কুল ইবাদ। প্রথম দায়িত্ব আল্লার প্রতি তার বিশ্বাস, উপাসনা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির রীতিনীতি, আদত-প্রথা, আচাব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় ফিকাহ শাস্ত্রে। দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে যা করণীয় অর্থাৎ যাবতীয় পার্থিব বিধিবিধান যেমন বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, দৈনন্দিন কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পদের মালিকানা ও উত্তরাধিকার-হস্তান্তর, বৈষয়িক চুক্তি, সামাজিক ন্যায়-অন্যায়, তার বিচার পদ্ধতি, সাক্ষ্য প্রমাণ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধান-ইত্যাদি যা একটি সভ্য সুশৃঙ্খল, সমাজ জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন, সেগুলো এবং এদের পশ্চাতে নিহিত যৌক্তিকতার সূত্রায়ণ বা তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ ফিকাহ শাস্ত্রে বিধৃত হয়। ঐতিহাসিক বিচারে এ শাস্ত্রের বিকাশ গুরুত্ব বহন করে। প্রাচীনকালে বোমক সভ্যতা হাম্মুরাবী বিধিকে অতিক্রম করে প্রথম আইন শাস্ত্র প্রণয়ন করে; কিন্তু মধ্যযুগে মুসলিম সম্প্রদায়ই প্রথম যারা ব্যবহারিক শাস্ত্রের (Low of Jurisprudence) এর সাগ্রহে ও সযত্নে চর্চা করে।

নিঃসন্দেহে ইসলামি আইন শাস্ত্রের উৎসমূল ছিল : ক. আল কোরআন; খ. আস সুন্নাহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল কোরআনে 'ছ' হাজারের অধিক আয়াত সম্বলিত মহাগ্রন্থ; কিন্তু এতে মাত্র দুশ আয়াত এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সুরা অনেকাংশে বিধি-বিধানমূলক। মহানবীর আশঙ্কা হযেছিল যে, পরিবর্তনশীল বিশ্বে ক্রমবিকাশমান সমাজের নিত্য নতুন জটিল হতে জটিলতর সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। তাঁর অবর্তমানে তাঁর উত্তরসূরিরা কিরূপে তার সমাধান করবে? শাহরিস্তানী বলেন মহানবীর এরূপ আশঙ্কার কারণে মায়াজ বিন জাবালকে ইয়ামেনে প্রশাসক হিসেবে প্রেরণ করার সময় তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, মায়াজের সামনে নতুন সমস্যা দেখা দিলে তিনি কি করবেন? তদুত্তরে মায়াজ বলেন যে, তিনি কোরআনে এর সমাধান খুঁজবেন: কিন্তু তিনি যদি তার সমাধান কোরআনে না পান তাহলে সে ক্ষেত্রে তিনি কি করবেন? এবার মায়াজ উত্তর দেন যে, তিনি সুন্নাহ হতে তাঁর সমাধান খুঁজবেন। মহানবী পুনশ্চ জিজ্ঞেস করেন এতেও ব্যর্থ হলে তিনি কি করবেন? তদুত্তরে মায়াজ বলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর শুভবুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রযোগ করবেন। এবার মহানবী আশ্বস্ত ও খুশী হন।[৩৫] এ হাদিসটি মুসলিম আইন বিদ্যার বিকাশের অশেষ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। এতে মুসলিম আইনের মূল উৎসদ্বয়ের অজস্র ব্যাখ্যারই সুযোগ আসে নি বরং এর আরো উৎসের সন্ধান দেয়। বস্তুত কিয়াস ইসতিহসান, ইজমা অর্থাৎ ইজাতহাদের দ্বার খুলে যায়।

মহানবীর মহাপ্রয়ানের সাথে সাথে তাঁর আইন জারির দিনের পরিসমাপ্তি ঘটে; একই সাথে আরবদের দিগ্বিজয় শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে খলিফাদের অনুজ্ঞা দ্বারা

নানা আইনগত সমস্যা সমাধান হয়। কোনো অঞ্চলে আইনগত কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা স্থানীয় প্রথাসিদ্ধ আইন বা পূর্ব নজির বা দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে মীমাংসার রেওয়াজ গড়ে ওঠে। প্রাক-আব্বাসী যুগে এরূপ প্রথাসিদ্ধ আইনের অভাব ঘটে নি। হেজাজ প্রদেশে ছিল অখংখ্য প্রথাসিদ্ধ আইন; পারস্য ও ইরাকে ছিল প্রাচীন সভ্যতার আইনগত উত্তরাধিকার। তাই এসব অঞ্চলে নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে এবং কোরআন ও সুন্নায় এর সমাধানের কোনো নির্দেশনা না থাকলে আইনবেত্তারা স্থানীয় প্রথাসিদ্ধ আইন দ্বারা অথবা সাদৃশ্য অনুমানসিদ্ধ আইন দ্বারা সমাধান করেন।[৩৬]

সমগ্র উমাইয়া যুগে এ ব্যবস্থা কার্যকর থাকলেও আব্বাসী যুগের নতুন বাস্তবতায় তা অনেকাংশে অচল হয়ে পড়ে, তাই ব্যবহারিক শাস্ত্রের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংহত রূপ দানের প্রয়োজন হয়। আইন অধ্যয়নের জন্য কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে অবশ্য স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এরূপ দুটি বিশিষ্ট আইন স্কুল ছিল: ক. হেজাজী স্কুল; খ. ইরাকি স্কুল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এ দু স্কুলের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ইরাকি আইনবেত্তারা ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা বিবেচনা ও যুক্তি প্রয়োগে খ্যাতি অর্জন করেন। হেজাজী আইন বিশেষজ্ঞরা ঐতিহ্যবাদী হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেন।

আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত ছিলেন ইরাকি স্কুলের প্রাণ পুরুষ। কুফা এবং বাগদাদ ছিল তার কর্ম ক্ষেত্র। কাপড় ও সূতা ব্যবসা করে তিনি রুজিরোজগার করতেন এবং সেই সূত্রে তিনি প্রচণ্ড বাস্তব জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যার একজন বোদ্ধা বুদ্ধিজীবী ছিলেন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞের নিকট হতে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেন এবং একজন আইন বিশারদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তার ব্যবসায়ী ব্যস্ততার মধ্যেও কখনো তিনি আইন চর্চার সুযোগ উপক্ষো করেন নি। আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতির জন্য মনসুর তাকে প্রধান কাজির পদে নিযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন, স্বাধীনচেতা নোমান সে পদ গ্রহণ করেন নি। তিনি কতটুকু সংস্কারমুক্ত ছিলেন এই ঘটনা হতে বুঝা যায় যে, তিনি প্রথম যৌবনে নামাজে সুরা মাতৃভাষায় পড়তে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ কোনো মজহাব বা মীমাংসার বিশেষ ধারা সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না, এবং তিনি আইন সম্পর্কে কোনো পুস্তকও রচনা করেন নি তবে তার ছিল অসংখ্য বোদ্ধা প্রতিভাধর অনুগামী আইন বিশারদ শিষ্য। এঁদের একজন ছিলেন কাজি আবু ইউসুফ। তাঁর রচিত কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে তাঁর গুরুর স্পষ্ট মতামত প্রতিফলিত হয়। তাঁর চিন্তাধারা এত স্বকীয় ও স্পষ্ট এবং এতই যুগোপযোগী ছিল যে, স্বাভাবিকভাবে ইরাকি স্কুল বা হানাফি মজহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মজহাব প্রতিষ্ঠায় আবু ইউসুফের অবদান অনস্বীকার্য; তিনি অনেক দিন যাবৎ বাগদাদে প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

আবু হানিফা ব্যক্তিগত যুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় অনেকে তাকে আহলুররায় বলে অভিহিত করত। তিনি সাদৃশ্যানুমান সিদ্ধ মীমাংসা, ইসতিহসান ইকুইটি মীমাংসা বা সমাজের মঙ্গলজনক প্রথাসিদ্ধ মীমাংসার পক্ষপাতি ছিলেন। বস্তুত সাদৃশ্যানুমান মীমাংসা হতে বেশ দূরে চলে যান। আব্বাসী সোনালি যুগে তার বিধিবিধান সূত্রায়ণ ছিল খুবই গতিশীল , উদার এবং একমাত্র সম্ভাবনাময় মজহাব বা আইন পদ্ধতি।

হেজাজি বা মালেকী মীমাংসা পদ্ধতিব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মালেক বিন আনাস (৭১৪-৯৫ খ্রি.)। তিনি মদিনায় বসবাস কবতেন। এ সময় সমগ্র হেজাজ প্রদেশ অনেক দিন হতে রাজনৈতিক গুরুত্ব হারায়; কেবল হারামায়েনের জন্য এর আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ছিল। ইসলামি বিশ্বের উদীয়মান আর্থ-সামাজিক বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন মদিনায় বসবাস করায় মালিক বিন আনাসকে নতুন বাস্তবতার ও নয়া সমস্যার মুখোমুখী হতে হয় নি। মহানবী হেজাজে যে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন এখানকার বুদ্ধিজীবীগণ তার অধ্যয়ন, অনুশীলন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারেব প্রতি আত্মনিয়োগ করেন। মালেক বিন আনাস ছিলেন হেজাজের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাদী পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। তিনি আইন বিষয়ক ১৭০০ সুন্নাহ সম্বলিত বিখ্যাত গ্রন্থ আল মোয়াত্তা সংকলন করেন। এই মুয়াত্তাই মালেকী মীমাংসা পদ্ধতির মূল উৎস। এভাবে তাঁর প্রচেষ্টায় হেজাজী ঐতিহ্যবাদী আইন পদ্ধতি বা মজহাব গড়ে ওঠে। তিনি ইরাকি চিন্তাধারার একজন প্রধান সমালোচক ছিলেন এবং তিনি বলতেন সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল না হওয়ায় ইবাকিরা আইন বিষয়ে ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা ও সাদৃশ্যানুমান সিদ্ধান্তের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক লেখক আব্দুল মাজেদ খাদুরী মনে করেন যে, মালেকী মতাদর্শ ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তিনিও ব্যক্তিগত প্রজ্ঞাভিত্তিক যুক্তিকে আদৌ অস্বীকার করতে পারেন নি। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতকে সুন্নার উপর স্থান দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দু পক্ষ কোনো একটি চুক্তি সম্পাদন করে অর্থাৎ প্রস্তাবনা ও গ্রহণ পর্ব শেষ হলে উভয়পক্ষই চুক্তিটি মেনে চলতে বাধ্য; অথচ এক হাদিসে আছে চুক্তি সম্পাদনের পর কেউ ঐ বৈঠক ত্যাগ না করা পর্যন্ত যে কোনো পক্ষ সেটা নাচক করতে পারে।[৩৭] যাহোক হেজাজি পদ্ধতিতে ঐতিহ্য বা সুন্নাহ সর্বদাই প্রথা বা অনুমানসিদ্ধ আইনকে বাতিল করে; কিন্তু এর বিপরীত ঘটনা কমই ঘটতে পারে।

আব্বাসী শাসনের প্রারম্ভে যুক্তিবাদী উদারপন্থী ইরাকি মজহাব এবং রক্ষণশীল সুন্নাপন্থী হেজাজি মজহাবের মধ্যে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দু ছিল কোরআন ও আইনের অন্যান্য উৎসের তুল্যমানে সুন্নার অবস্থান কি? এই বিতর্কে ইমাম শাফেয়ী জড়িয়ে পড়েন। মক্কার কোরাইশ পরিবার সন্তান মুহম্মদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেয়ী ৭৬৭ সালে গাজায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদিনায় ইমাম মালেকের নিকট

অধ্যয়ন করেন। বাগদাদে অনেক দিন অবস্থান করলেও মিশর হয় তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। তিনি ৮২০ সালে কায়রোতে প্রয়াত হন। সুন্নাহ্ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী শাফেয়ী প্রথম জীবনে ঐতিহ্যবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং ইরাকি আহ্‌লুররায়দের প্রচণ্ড বিবোধিতা করেন। মিশরে আবাসন গ্রহণের সময় তার মতামতে অনেক পরিবর্তন হয়। ইতিমধ্যে তিনি হানাফী স্কুলের সুপণ্ডিত শায়বাণীর সংস্পর্শে আসেন এবং বেশ প্রভাবিত হন; মালেকী স্কুলের দুর্বলতা এবং প্রজ্ঞা সাদৃশ্যানুমান দ্বারা নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও আইনী যুক্তির বিচারধারার সারবত্তা সম্পর্কে সচেতন হন। মিশরে আসার পর তিনি আহ্‌লুর রায় এবং আহ্‌লুস সুন্নার মধ্যবর্তী একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করেন এবং শাফেয়ী মজহাবের প্রবর্তন করেন। তিনি ঐতিহ্যবাদী ও প্রগতিবাদীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে গতিশীল অবস্থান গ্রহণ না করে মধ্যবর্তী আর এক অবস্থান গ্রহণ করেন কেন? সম্ভবত বিক্ষুব্ধ অথচ সম্ভাবনাময় প্রাণ চঞ্চল বিশ্ব সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ ত্যাগ করে কায়রোর শান্ত পরিবেশে এসে চলমান জীবন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধিকতর শান্তি সন্ধানে ঐ মধ্যপন্থা সৃষ্টি করেন। বাগদাদে বসবাস করলে হয়ত অবস্থার চাপে আহ্‌লুর রায়দেরও অতিক্রম করে আরো গতিশীল আইনতত্ত্ব উপহার দিতে পারতেন–সেরূপ প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন।

ইমাম মালিক স্থানীয় পণ্ডিতদের ইজমা (ঐকমত্য)কে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন। শাফী প্রথমে এই ধারণার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন তবে পরবর্তীকালে তার ঐ মতের পরিবর্তন করে, ইজমা বলতে তিনি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐকমত্যের কথাই বলেন। He who holds the Muslim Community shall be regarded as following the community, and he who holds differently shall be regarded as opposing the community. he was ordrerd to follow.[৩৮] তার এ মত অনেকেই পছন্দ করতে পারেন নি। গাজ্জালী কেবল মৌল বিষয়ে সকলের ঐকমত্যের কথা বলেন, তবে খণ্ড, আনুষঙ্গিক বা শাখা বিষয়ে কেবল স্থানীয় পণ্ডিতদের ঐকমত্যের প্রয়োজনের পক্ষপাতি ছিলেন। সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিগত প্রশ্নটি ইমাম শাফেয়ী একেবারে এড়িয়ে গেছেন। আইন বিদ্যা এই মহৎ উৎসের প্রতি অনীহাই ছিল তাঁর চিন্তাধারার দুর্বলতম দিক।

ইমাম শাফেয়ী কেয়াস এবং ইজতিহাদকে প্রায় এক করে দেখেছেন। পুনশ্চ তিনি ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও যুক্তির প্রয়োগ কেবল সাদৃশ্যানুমান (Analogical deduction) ও কেয়াসের মধ্যে সীমিত করেছেন। যারা সাদৃশ্যানুমানকে আইনের উৎস হিসেবে লাগামহীনভাবে ব্যবহার করেছেন অথবা এটাকে একেবারে পরিত্যাগ করেন– তিনি উভয় মতাদর্শের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অবস্থান অবলম্বন করেন। একটি দৃষ্টান্তের পক্ষে অপর একটি নজিরকে বাতিল করার জন্য ইরাকি স্কুল ইসতিহসান বা ইকুইটির ব্যবহার করেছেন; কিন্তু শাফেয়ী ইসতিহসান প্রত্যাখ্যান করেছেন এজন্য যে, এতে ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও বিচারের ব্যবহারের ঢালাও অনুমতি দেয়ারই শামিল।

ইমাম সাফেয়ীর পূর্বসূরি আইন বিশারদরা এখতিলাফ বা ভিন্নমতের প্রতি অনেক উদার মনোভাব পোষণ করতেন; তিনি ভিন্ন মতকে সীমিত রেখেছেন। তিনি মনে করেন যে, যেখানে কোরআন ও সুন্নার স্পষ্ট নির্দেশ থাকে সেখানে ভিন্নমত অবৈধ; তবে যেখানে ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে সেখানে ভিন্নমত বৈধ।[৩৯]

খলিফা মামুন ও মোতাসিমের সময় ধর্মতত্ত্বে যুক্তিতর্কের প্রয়োগ প্রাধান্য লাভ করে বটে; কিন্তু যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে একদল সনাতন রক্ষণশীল পণ্ডিত দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইতোপূর্বে ইমাম শাফেয়ী মৌল ব্যাপারে ভিন্নমত অবৈধ বলে বিবেচনা করেন এবং এ সময় তাঁরই শিষ্য আহমদ বিন হাম্বল মোতাজেলী যুক্তি বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। মামুন এবং মোতাসিম যুক্তি বিচারের প্রতি সমর্থন দিতে এবং ভিন্নমতাবলম্বী হাম্বলীব বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ এবং সরকারি নির্যাতন চালাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাদের উপর সরকারি নির্যাতন যতই বৃদ্ধ পায় তাদের প্রতি জনতাব সমর্থন ততই বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার হয়। এমতাবস্থায় আহমদ বিন হাম্বল শাফেয়ী বা মালেকীদের নমনীয় মনোভাবের পরিবর্তে কঠোব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কবেন। তিনি কিয়াস, ইর্জতিহাদকে অস্বীকার করেন। তিনি প্রায় ২৮,০০০ হাদিস সম্বলিত মসনদে ইবনে হাম্বল নামক একটি হাদিস গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনা করেন। এরূপ অবস্থায় চতুর্থ হাম্বলী মজহাব গড়ে ওঠে। ইতিহাসের বিচারে হাম্বলী মজহাবের উত্থানকালটি ছিল আব্বাসী খেলাফতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটকালের সূচনা পর্ব। তিনি হয়ে ওঠেন সনাতনপন্থী সামাজিক শক্তির তাত্ত্বিক উৎস।

অবশেষে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। ইসলামি আইনতত্ত্বের উপর রোমক আইন ব্যবস্থার কি কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের পূর্বে স্মরণ করা দরকার যে, প্রাক-ইসলামি যুগে মক্কা ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান নায়ক ছিল বাইজানটাইন বণিক সমাজ। তৎকালীন বৃহত্তর সিরিয়া, মিশর ও ক্ষুদে এশিয়া ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যভুক্ত। এই প্রাচীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মক্কাবাসীদের ভূমিকা স্মরণ করা দরকার। তৎকালীন বাস্তব অবস্থায় মক্কাবাসীরা যদি তৎকালীন বাণিজ্য আইন কানুন সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন তবে সেটাই স্বাভাবিক। মহানবী স্বয়ং বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিরিয়া ভ্রমণ করেন; রোমক বাণিজ্য নিয়ম কানুন সম্পর্কে তাঁর আবশ্যই স্পষ্ট ধারণা থাকার কথা। এরূপ পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইসলামি আইন কানুনের উপর রোমক প্রভাব পড়লে তা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। এটাই সভ্যতার বিকাশ ধর্মের সাধারণ নিয়ম। অনেক প্রাচ্যবিদদের ধারণা আইনের মৌলনীতি এবং পদ্ধতিগত প্রশ্নে তাদের প্রভাব খুবই লক্ষণীয়। ইসলামি আইন বিদ্যায় যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা, বৈক্তিক চুক্তি, সাদৃশানুমান ইত্যাদি বিচারধারা প্রয়োগ করা হয়—এ সবগুলোই সিরীয় রোমক সংস্কৃতিতে বিদ্যমান ছিল।

বাইজানটাইনীয় আইনেও এগুলো ছিল স্বীকৃত ব্যাপার। ইসলামি আইনতত্ত্বে এগুলোর প্রয়োগ তাদের প্রভাবের স্পষ্ট প্রমাণ বৈকি? তাদের বেচা-কেনা, বিভিন্ন বাণিজ্যিক সম্পর্ক, অভিভাবক আইন, দানপত্র, ধারকর্জ আইন, ভাড়া আইন ইত্যাদি ইসলামি বিধিবদ্ধ আইনের উপর সম্ভবত রোমক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।[৪০] পুনশ্চ এই প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারা মুসলিম প্রতিভা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে এক নয়া বিশ্ব দৃষ্টি সৃষ্টি করে।

ধর্মতত্ত্ব : মুতাজিলা মতবাদ

মূল আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বেই মানব সভ্যতার ইতিহাসের গতিতত্ত্বের সাধারণ নিয়মের (Low of Motion in history) কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মানব সভ্যতার বিকাশক্রম পর্যালোচনা করলে একটা সত্য বেরিয়ে আসে যে, মানুষের পরিপার্শ্ব, তার ঘটনা প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাত মানব মস্তিষ্কে যে অভিঘাত সৃষ্টি করে তা হতে তার মধ্যে নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষ হয়। এই নবলব্ধচিন্তা-চেতনা দ্বারা সে বিদ্যমান বাস্তবতায় রূপান্তর ঘটাতে পারে; পুনশ্চ পরিবর্তিত বাস্তবতা নতুন ভাবনার জন্ম দেয়—এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই সভ্যতার বিকাশ ঘটে। প্রায় প্রতিটি সরল সহজ বিষয় হয়ে ওঠে জটিল হতে জটিলতর।

আরবে এক সরল সহজ পরিবেশে অনেকগুলো সরল বিশ্বাসের সমন্বয়ে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তার বাস্তব অবস্থায় রূপান্তর শুরু হয়; দ্রুত পারস্য-বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আরব সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে; এসব প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলো তাদের পদানত হয়; বেড়ে ওঠে এক অভিনব আর্থ-সামাজিক জটিল বাস্তবতা। এই ঐতিহাসিক প্রগতির প্রেক্ষিতে উমাইয়া যুগেই সমাজ জীবনে তার কার্যকলাপ প্রসঙ্গে : পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, শাস্তি, পুরস্কার, কর্ম স্বাতন্ত্র্য-পরতন্ত্রের ইত্যাকার সাধারণ ধারণাসমূহের নয়া উপলব্ধির প্রয়োজন দেখা দেয় বলে এ পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব এক জটিল স্তরে পৌছে যায়। শিয়া, খারেজি মতাদর্শ ছাড়াও মুরজিয়া, কাদরিয়া, জাবারিয়াদের ধর্মতাত্ত্বিক মত ও পথের সৃষ্টি হয়। বস্তুত উমাইয়া যুগেই আব্বাসী যুগের দ্রুত বিকাশমান সংস্কৃতির পটভূমি রচিত হয়।

আব্বাসী যুগের প্রারম্ভ হতে রাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণনীতি পরিত্যক্ত হওয়ায় আব্বাসী সমাজ হয়ে ওঠে অন্তর্মুখী। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের নবনির্মিত রাজধানী বাগদাদ হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র; বিশ্ব সভ্যতার সম্মেলন ক্ষেত্র। এ যেন ছিল দিগ্বিজয়ের আর একটি দৃশ্যপট। এরূপ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হয় আরো জটিল। বিভিন্ন জাতিসত্তা এবং বিভিন্ন ধর্ম হতে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে—তাই নয়, এখানে প্রাচীন চিন্তাধারার স্রোত নতুনভাবে প্রবাহিত হয় প্রবল বেগে। এই নবতর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেড়ে ওঠে এক নয়া বৌদ্ধিক পরিবেশ। পার্থিব ও

আধ্যাত্মিক নানা জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে একদিকে লক্ষ্য করা যায় যে, তৎকালীন যুগ-চ্যালেঞ্জে ধর্মীয় ও পার্থিব প্রশ্ন মীমাংসায় গড়ে ওঠে ইলমুল হাদিস ও ইলমুল ফিকাহ বা আইন শাস্ত্র। তারা তাদের নয়া সমস্যা সমাধানে কোরআন ও সুন্নার সাথে ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, ইসতিহসান ইত্যাদি নতুন নতুন চিন্তা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। তদুপরি বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার অবাধ প্রবাহ ও বিভিন্ন সংস্কৃতির আত্তীকরণ প্রক্রিয়া চলমান থাকায় ইসলামের মৌল মতাদর্শকে যৌক্তিক ভিত্তিতে অনুধাবনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ধর্ম গ্রন্থ নিয়েও বুদ্ধিগত, যুক্তিগত এমন কি শব্দগত নানা প্রশ্ন মাথাচাড়া দেয়। সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দেয়। এরূপ অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক ও বৌদ্ধিক পরিবেশে ইসলামি ধর্মতত্ত্বের নব দিগন্ত উন্মুক্ত হয়। সে যুগের সাংস্কৃতিক সংকট নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তথাকথিত মোতাজিলা ফিরকাহ।

পুনশ্চ স্মরণীয় যে, উমাইয়া যুগেই মোতাজিলা মতবাদের মর্মবস্তুর উন্মেষ ঘটে; যদিও তা আব্বাসীযুগের বাস্তবতায় বিশেষ করে মামুনের সময় মহীরুহে পরিণত হয়। কিছু মতাদর্শগত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য জনৈক ব্যক্তি বিখ্যাত পণ্ডিত হাসান বসরির মক্তব বা সেমিনারীতে উপস্থিত হন। উক্ত ব্যক্তির প্রশ্ন মীমাংসায় হাসান বসরি তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলে তারই প্রিয় শিষ্য ওয়াসিল বিন আতার মনপুত না হওয়ায় মজলিস ছেড়ে তিনি একটু দূরে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। হাসান বসরি আপন শিষ্যের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, এতাজালা আন্না (সে আমাদের থেকে দূরে গেছে) তিনি গুরুর নিকট প্রত্যাবর্তন না করে পণ্ডিতবর ওয়াসিল তার নিজস্ব স্বতন্ত্র মতামত প্রতিষ্ঠা করেন এবং উদীয়মান আব্বাসী বাস্তবতায় তা আরো পরিশীলিত হয়। অসংখ্য বোদ্ধা পাঠক ও বুদ্ধিজীবী এমন কি আল মামুন ঐ মতাদর্শের পাশে সমবেত হন। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তথাকথিত মোতাজিলা সম্প্রদায় এবং এক নতুন ধর্মতত্ত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যারা এই নয়া ধর্মতত্ত্ব গড়ে তোলেন তাদের নিকট 'মুতাজিলা' উপাধিটা আদৌ সুখপ্রদ ছিল না; এতে ছিল তাদের প্রতি তিরস্কারের ব্যাঞ্জনা। এ কারণেই তাদের মতামতের মর্মবস্তু দিয়েই তাঁরা আপনাদেরকে 'আহলুত্তৌহিদ ওয়াল আদল' বলে পরিচয় দিতেন; কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমে ঐ তিরস্কার সূচক শব্দ দ্বারাই তারা সর্বত্র পরিচিত হন। নতুন অনুষঙ্গ সম্পৃক্ত হওয়ায় কালক্রমে শব্দটি অন্তর্নিহিত নিন্দাবাদ প্রসংশাবাদে রূপান্তরিত হয়। বস্তুত বর্তমানে মুতাজিলাবাদ সে যুগের প্রগতিবাদের নামান্তর বলেই বিবেচিত হয়।

তাদের মতাদর্শের আলোচনার পুর্বে তাদের নিজেদের নামকরণের বিষয়টি সর্বদাই বিবেচনায় রাখা উচিত। আরো উল্লেখ্য যে, তাদের মত মুক্ত মনের মানুষ যদি তৎকালীন ইসলামি বিশ্বে নব্য প্লেটোবাদী প্লাবনে কিছু প্রভাবিত হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাই বলে তারা যুক্তিবাদের সাথে গ্রন্থবাদ (authority) বা ধর্মের

সাথে বিজ্ঞানের, অথবা এ্যারিস্টটলের দর্শনের সাথে ইসলামের সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন বলে সম্ভবত তাদের যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। তারা গ্রীক দর্শন হতে কিছু বিষয় সুনির্বাচিতভাবে গ্রহণ করলেও দার্শনিক সমস্যাবলী তাদের নিজস্ব সমস্যা ছিল না, তাই নয়, বরং প্রকারান্তরে তারা তার বিরোধিতাও করেন।[৪১] তাদের সমস্যা ছিল তাদের সমাজ, সংস্কৃতি-ধর্ম। তারা দুটি উপলব্ধি হতে নয়া ধর্মতত্ত্ব নির্মাণে অগ্রসর হন। ক. প্রথমত তারা অনুধাবন করেন যে, তৎকালীন আর্থ সামাজিক ও বৌদ্ধিক বাস্তবতায় প্রাচীন মতাদর্শ কিরূপে প্রবল বেগে ইসলামের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে; তাদের প্রতিপক্ষ কোন স্তরের; ইসলামের নির্ভেজাল অদ্বৈতবাদ (তৌহিদ) কিরূপে পারসি সূক্ষ্ম দ্বৈতবাদ (Dualism) অথবা খ্রিষ্টীয় নরত্বারোপনবাদ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে-তা প্রতিহত করে ইসলামের একত্ববাদ রক্ষা করা; দ্বিতীয়ত অধিকতর এবং দ্রুততর সমাজ প্রগতির জন্য গতিশীল আইনতত্ত্ব দরকার। এ কাজের জন্য ইসলামে প্রতিষ্ঠিত মৌল মতাদর্শগত প্রশ্নের মীমাংসার দরকার। একমাত্র প্রগতিশীল তত্ত্বই সমাজের নবতর বিকাশের তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাতে পারে। এই দ্বিবিধ উপলব্ধি হতে তারা ধর্মতত্ত্ব পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং তারাই নয়া ইলমুল কালামের প্রতিষ্ঠাতা।

তাদের ধর্মতত্ত্বের স্বরূপ অনুধাবন করার জন্য তাদের মতাদর্শের নিম্নলিখিত কয়েকটি মৌলিক দিকের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল :

ক. আল্লাহর একত্ববাদের স্বরূপ : তার গুণাবলী, দিব্যদর্শন

খ. আল্লাহ্ শুভস্রোত; তার সর্বশক্তিমানতার স্বরূপ

গ. কর্মে মানুষের স্বাধীনতা; তার পাপ পুণ্যের পুরস্কার ও তিরস্কার

ঘ. আল কোরআনের সৃষ্টি ও অনিত্যতা প্রসঙ্গ

ঙ. জগৎসৃষ্টি ও অনিত্যতা

একত্ববাদ : আল্লাহর গুণাবলী

ইসলাম নির্ভেজাল সরল অদ্বৈতবাদী ধর্ম। এ ধর্মের সারৎসার আল্লা এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার, তার না আছে সহযোগী না আছে অংশীদার, স্বয়ংসম্পূর্ণ অনাদি অনন্ত, তিনি জাত নন, কাউকে জন্ম দেন না। অথচ কোরআন বা সুন্নায় তার জাত বা অস্তিত্বের উপর অনেক গুণ বা সিফাৎ আরোপ করা হয়। আল্লাহর জাতে বা সত্তার সাথে গুণাবলী আছে মেনে নেয়ার অর্থ হল সেই গুণাবলী আল্লার জাতের সহনিত্য (Coeternal); অথবা তার সত্তায় পরিবর্তনের নির্দেশক। অথচ আল্লার সত্তার সাথে অতিরিক্ত আরো কিছু চিরন্তন বা সনাতন বস্তুর অস্তিত্ব আল্লার একত্বের ভিত ধ্বংস করে দেয়। তাই আল্লার একত্বে বিশ্বাসের সাথে তার গুণাবলীর ধারণা একেবারে অযৌক্তিক। আল্লার একত্বকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার জন্য তারা বলেন আল্লা নির্গুণ; তার কোনো সিফাত

নোই।[৪২] আল্লাব উপর কোনো চিরন্তণ গুণ আরোপ করার অর্থ হবে দুটি চিরন্তণ অস্তিত্বের স্বীকৃতি, এটাই পৌত্তলিকতা।

একত্ববাদী সকল মুসলিম মনে করে আল্লা নিরাকার; অথচ কোরআনে দৃশ্যত বলা হয়েছে যে, পরকালে পুণ্যাত্মারা আল্লাকে দেখতে পাবেন। প্রশ্ন হল পুণ্যাত্মারা কি আল্লাকে চাক্ষুস দেখতে পাবেন? যদি চাক্ষুস দেখেন তা হলে আল্লার নিরাকারত্ব থাকে কি? এতে বরং আল্লার উপর নরত্বারোপণ করা হয় না কি? তৌহিদী ধারণার সাথে এরূপ দেহত্ববাদ একেবারে অযৌক্তিক। এ কারণে তারা দিব্যদর্শন তত্ত্বকে (Befeatie Vission) অস্বীকার কবে, তাদের মতে নিরাকার সত্তা আল্লার দেহ নেই, তাই তাকে চাক্ষুস দেখার প্রশ্ন অবাস্তব। আল্লাকে যে দেখার কথা বলা হয়েছে তা চাক্ষুস নয় ববং আধ্যাত্মিক। পুণ্যাত্মাদেরকে আল্লার দর্শন দ্বারা পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি কোবআনে দেয়া হয়েছে তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে রূপক অর্থে; আক্ষবিক অর্থে নয়।

শুভাশুভের স্রোত : মানব জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা শুভ এবং অশুভের মঙ্গল ও অমঙ্গলের স্রোত প্রবাহমান দেখতে পাই। মোতাজিলাদের মতে মানব জীবনের ঐ প্রবাহমান শুভাশুভের স্রোতধারা আল্লার প্রজ্ঞার অনুপস্থিতিব নির্দেশ করে না বরং প্রকৃতিতে যা ঘটে সবই মানব কল্যাণে; আল্লাহ নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান। আল্লার যা ইচ্ছা তাই কবতে পারেন তবে তিনি প্রজ্ঞাবিরোধী কিছু করেন না। নাজ্জাম আরো বলেন যে, আল্লাহ যে অশুভ সংঘটন করেন না শুধু তাই নয়, তিনি তার সৃষ্টজীবদের অমঙ্গল করতে পারেন না। সুতবাং মানব জীবনে যা কিছু অশুভ ঘটে, সেগুলো আল্লাব ইচ্ছায় ঘটে না। মানুষের নিজের জীবনের অকল্যাণ ও দুঃখ কষ্টের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। তারা আল্লাহর ন্যায় বিচারের দৃঢ় সমর্থক ও প্রবক্তা বলে তারা নিজেদেরকে আহলুল আদল বলে অভিহিত করেন। প্রকৃতিতে স্বর্গীয় প্রজ্ঞার উপস্থিতির তত্ত্ব দ্বারা তারা মানব জীবনের জন্য এক আশাবাদী জীবন দর্শনেরই ভিত্তি রচনা করেন। বস্তুত আব্বাসী সুবর্ণ যুগে এরূপ জীবনবাদী মতাদর্শের জন্য ছিল খুবই উপযোগী সময়।

কর্মে মানুষের স্বাধীনতা

প্রাথমিক ইসলামের সরল বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ ইহলোকে তার কৃতকর্ম অনুসাবে পরলোকে হয় পুরস্কৃত হবে, নয় তিরস্কৃত হবে। এরূপ ধারণার সাথে সাথে এটাও বলা হয় যে, আল্লাহর বিনা হুকুমে গাছের পাতাও নড়ে না। এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন হতে পারে যে, কর্মের জন্য মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং কর্মের স্বাধীনতা আছে কি? ভাল-মন্দ যা খুশী তাই কি সে করতে পারে? যদি কর্মে তার স্বাধীনতা না থাকে বা কাজের উপর তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ না থাকে—তাহলে মন্দ কাজের জন্য পরম করুণাময় তাকে কিভাবে দণ্ডিত করবেন? স্বাধীনতাবিহীন দায়িত্বের ধারণা স্ববিরোধী নয় কি? এ প্রশ্নের

যৌক্তিক সংগতি সাধনে মোতাজিলরা মনে করেন যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, স্বেচ্ছায় ভাল বা মন্দ কাজ সে করে। এ জন্যই তার কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। যে কাজেব উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না-সে কাজের জন্য আল্লা তাকে দায়ী করতে পারেন না। তাদের এই মতাদর্শ দ্বারা তারা আল্লার ন্যায়পরায়ণতার ধারণার দৃঢ় ভিত্তি গঠন করায় তারা নিজদেরকে আহলুল আদল বলে অভিহিত করেন। বস্তুত মধ্যযুগের প্রথম দিকে মোতাজিলারা কর্মবাদী জীবনবাদী প্রগতিশীল ধর্মতত্ত্বের প্রবক্তা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

কোরআনের সৃষ্টি ও অনিত্যতা তত্ত্ব

আব্বাসী সুবর্ণ যুগে মানুষের ইহলৌলিক জীবনে নানা সমস্যা সমাধানের জন্য ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান তথা ইজতিহাদ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, সে প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর পরও খলিফা আল মামুন বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে অনুধাবন করেন যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ঐক্য-সংহতি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক প্গতির জন্য প্রযোজন অধিকতর মুক্ত বুদ্ধির। মুতাজিলাগণ তাদের বিখ্যাত কোরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করায় তাতে মামুনের উদীয়মান চিন্তা-ভাবনার তাত্ত্বিক সমর্থন মেলে। যে যুক্তির ভিত্তিতে তারা নির্গুণ আল্লাতত্ত্ব প্রকাশ করেন সেই একই কারণে আল্লার একত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোরআন সৃষ্ট অর্থাৎ নিত্য (eternal) নয় বলে তারা ঘোষণা করেন। আল্লাহ অনাদি; আল্লা ব্যতীত অন্য কিছুই অনাদি হতে পারে না; আল্লার সাথে অন্য কিছু সহনিত্য হতে পারে না; আল্লাহর একত্বেব পরিপন্থী যা' তাই পৌত্তলিকতার শামিল এবং পরিত্যাজ্য। এই যুক্তিতে কোরআন সৃষ্ট, নিত্য নয়—তারা এ তত্ত্ব প্রচার করেন। উল্লেখ্য মানুষের কর্ম-স্বাতন্ত্র্যের সিদ্ধান্তেব কারণে উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে; আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সাধারণভাবে আব্বাসী খলিফাগণ কর্মস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সহজে সমর্থন দেয় এবং আল মামুন 'কোরআন সাদিতত্ত্ব' লুফে নেন। কোরআন একটি অনিত্য গ্রন্থ এবং তার ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন—এ কথা বুঝানোই ছিল তাদের অভিপ্রায়। কেবল এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থবাদ (Authority) বনাম বুদ্ধিবাদের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব এবং বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য দেয়া সম্ভব হয়। তাদের মতে আল্লাহ যখন জগৎ, জীব, মানুষ সৃষ্টি করেন তখন একই সাথে মানুষকে ভালো-মন্দ সত্য-শিক্ষা যাচাই করা, আল্লাহকে অনুভব করার মত যথেষ্ট বুদ্ধি মেধা দিয়েছেন যা তারা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পাবে।[৪৩]

জগৎ সৃষ্টি তত্ত্ব

কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লা সমগ্র জগত সৃষ্টি করেন; তাই জগৎ অনাদি বা অনন্ত নয়। সকল মুসলিমদের এটাই ছিল ধর্ম বিশ্বাস। মোতাজিলারা জগত সৃষ্ট-কোরআনের

এ তথ্যই গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে তারা এ্যারিস্টটলের অনাদি জগত তত্ত্বের বিরোধিতা করেন।[৪৪]

ইলমুল কালাম : ধর্মতাত্ত্বিক তর্কশাস্ত্র

মোতাজিলাগণ কখনই কোরআনকে অপ্রমাণিক গ্রন্থ বলে চালাতে চান নি সত্য, তাই বলে তারা সাধারণ মুসলিমদের মত গ্রন্থবাদের প্রবক্তাও ছিলেন না। তারা অনুধাবন করেন যে, ইহজগতে কেবল তন্ময় ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে কাজ হয় না; বরং কোরআনেব সুন্দর ব্যাখ্যার প্রয়োজনও আছে, সুযোগও আছে। এ কাজ সম্পাদনের বড় উপকরণ বা উপাদান হল আল্লা প্রদত্ত মানুষের প্রজ্ঞা ও সাধারণ জ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগ। বস্তুত তারা গ্রন্থবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রজ্ঞার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালান। তারা এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার কঠোর বিরোধী ছিলেন। তবে গ্রন্থবাদ ও প্রজ্ঞাবাদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনে তারা এক ধরনের তর্ক শাস্ত্র গড়ে তোলেন। এটাই হল ইলমুল কালাম বা বাণী বিদ্যা। তারা ইলমুল কালামের বিকাশ ঘটাতে গিয়ে ইসলামি চিন্তাব মধ্য হতে অসংগতি দূরীভূত করতে তাদেরকে অনেক সবল বিশ্বাস পরিহার করতে হয়। আব্বাসী স্বর্ণযুগে এরূপ চিন্তাধারা নন্দিত হলেও একাদশ শতকে তা নিন্দিত হয়।[৪৫]

মোতাজিলা পণ্ডিত মণ্ডলী

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৭৬৮ সাল হতে ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হারুন-মামুনেব যুগ ছিল প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার আরবি ভাষায় অনুবাদের সোনালি যুগ। এই অনুবাদের ফলে ইসলামি বিশ্বে বৌদ্ধিক নবজাগরণ দেখা দেয়। জ্ঞান-বুদ্ধির এ পর্যায়ে ইসলামের প্রতি মানুষের সন্দেহ হতে থাকে এবং ধর্মের সরল চিন্তা ভাবনাগুলো বাস্তব জগতের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে বাধা বলেও প্রতিভাত হতে থাকে। ইসলামের প্রতি অহেতুক সন্দেহ এবং অগ্রগতির পথের বাধা অপসারণের তাগিদে যারা ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিতে এগিয়ে আসেন—তাদের সযত্ন প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।[৪৬] এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টি ছিল তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজ। তখন এই মতবাদের উন্মেষ ও বিকাশে যারা বড় অবদান রেখেছেন তাদের কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ওয়াসিল বিন আতা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনিই মোতাজিলা মতাদর্শের প্রথম প্রবক্তা। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন আল্লা নির্গুণ; তার পৃথক সিফাত বা গুণের অস্তিত্বের স্বীকৃতি আল্লাহর একত্বের পরিপন্থী। একই কারণে তিনি কোরআনের নিত্যতা বা অনাদিতত্ত্ব স্বীকার

করেন নি। আল্লার গুণাবলী মূলত তার জাতের বা অস্তিত্বের অন্তঃসার (essence); আল্লার বাস্তবতা এবং তার গুণাবলী এক ও অভিন্ন তাদের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি কর্মে মানুষের স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণ তিনি স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না।

আল্লাফ

আবুল হুযায়েল আল্লাফ ছিলেন একজন বড় মাপের বিশ্ব কৌষিক পণ্ডিত ব্যক্তি।[৪৭] গ্রীকদর্শন এবং বিশেষভাবে নব্যপ্লেটোবাদে তাঁর ছিল প্রচণ্ড অধিকার। তাঁর বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য তিনি দর্শনের আশ্রয় নিতেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী তার্কিক। তিনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি নির্গুণ আল্লাতত্ত্বের বড় প্রবক্তা ছিলেন। যে সব গুণাবলীর কথা বলা হয় সে সব গুণ আল্লার সত্তা থেকে অচ্ছেদ্য; এ সব গুণ শুধু আল্লার সত্তা বহির্ভূত বাহ্য গুণ নয়, বরং তার সত্তার বিভিন্ন অবস্থা বা ধরন মাত্র।[৪৮] গুণ দুভাবে থাকতে পারে, হয় গুণী থেকে বিচ্ছিন্ন, নয়ত গুণী স্বরূপ; গুণী বিচ্ছিন্ন গুণাবলী গ্রাহ্য করার অর্থ আল্লার অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করা; পুনশ্চ নির্গুণ আল্লা তথা গুণ স্বরূপ আল্লার মধ্যে শব্দগত পার্থক্য মাত্র।[৪৯]

কর্মে মানুষের স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন তিনি। তবে তিনি বলেন যে, মানুষের কর্ম দু প্রকারের। ক. প্রাকৃতিক কর্ম বা বাহ্যিক বা ঐন্দ্রিক; খ. আচার (পাপ-পুণ্য) সম্বন্ধকর্ম। যে কর্ম আমরা বিনা বাধায় সম্পন্ন করতে পারি তাই আচার সম্বন্ধী। আচার সম্বন্ধী কর্ম মানুষের অর্জিত সম্পদ, তার প্রযত্নের ফল। ঐশীবাণী এবং প্রকৃতি উভয় সূত্র হতে মানুষ জ্ঞানার্জন করতে পারে। বাস্তবে দেখা যায় আল্লার বাণী জানার পূর্বেও মানুষ প্রাকৃতিক চেতনা দ্বারাও তার নিজস্ব কর্তব্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। ভালো-মন্দ জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি থেকে জন্মায়, এবং সদাচারী, সৎ বা নিষ্কাম জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।[৫০] জগৎ সম্পর্কে আল্লাফের অভিমত হল এই যে, জগৎ অনন্তকাল ধরেই ছিল, তবে প্রথমে তা ছিল অবিকশিত অবস্থায়; এ আবস্থা থেকে গতি সঞ্চালনের ফলে তা বাস্তব জগতের রূপ পরিগ্রহ করে, গতি প্রবর্তনের পর সব কিছু দেশ-কালে অধিষ্ঠান লাভ করে।[৫১]

নাজ্জাম

সম্ভবত নাজ্জাম ছিলেন আল্লাফের সহচর। ৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন। অনেকের ধারণা ছিল তিনি উন্মাদ ছিলেন। কেউ কেউ বলেন তিনি নাস্তিক ছিলেন। আরব ইসলামে ইরানী দ্বৈতবাদী প্রবণতা দেখা দেয়, তিনি তা প্রতিরোধ করেন। শুভ অশুভ প্রসঙ্গে সাধারণ মোতাজিলা পণ্ডিতদের তুলনায় নাজ্জাম আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে

বলেন যে, আল্লাহ অশুভ কর্ম সম্পাদন করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ; মানুষের জন্য যা কিছু শুভ তিনি সেগুলো করতে সমর্থ, এই অর্থে তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, তাই তার কোনো সত্তার বোধ নেই। তাই মানুষের মত তিনি ইচ্ছা করেন না। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি একবারেই সব কিছু সৃষ্টি করেন; প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি সেই শক্তি নিহিত রাখেন যাব দ্বারা ভবিষ্যতে সৃজনকর্ম অব্যাহত থাকে। আল্লাহ সবকিছু একই সময় সৃষ্টি করে অবিকশিত অবস্থায় রাখেন। এ সব পর্যায়ক্রমে সচল ও সক্রিয় অস্তিত্ব লাভ করে।[৫২] তিনি পরমাণুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন পরমাণুর সমাহারে বরং আপতনের সমন্বয়ে দ্রব্য গঠিত হয়। দ্রব্য ও আপতনের সম্বদ্ধ অচ্ছেদ্য। এ কারণেই দ্রব্য বলতে আপতনের সমষ্টিকে বোঝায়। বস্তুত পিণ্ড পরমাণু থেকে নয়, ঘটনা থেকে সৃষ্ট—তাঁর এ ধারণার মধ্যে আধুনিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রূপ-রস-গন্ধের মতো গুণাবলীকেও নাজ্জাম পিণ্ড (পদার্থ) বলে মনে করতেন; কারণ গুণ কখনও গুণী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের আত্মা ও বুদ্ধিও একরকম পিণ্ড। সমস্ত দেহের মধ্যে ব্যাপ্ত আত্মা হল মানুষের অতি শ্রেষ্ঠ অংশ শরীর তার বাহন। কল্পনা ও চিন্তণ আত্মার গতিস্বরূপ। ঐশী জ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞান প্রজ্ঞার সাহায্যে পাওয়া যায়। তিনি বলতেন যে মুসলিমদের সব ধারণাই ঠিক —এমন ভাবার কোনো কাবণ নেই; অন্য সম্প্রদায়ের অনেক ধারণা সঠিক হতে পারে।[৫৩]

জাহিজ

জাহিজ (মৃ. ৮৬৯ খ্রি.) ছিলেন নাজ্জামের বিখ্যাত শিষ্য; তিনি মনে করতেন যে, সত্য নির্ণয়ের জন্য ধর্ম এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সমন্বয় সাধন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে, আর সেই কাজের মধ্যেই আল্লাহ্‌র প্রকাশ ঘটে। মানব বুদ্ধিই জ্ঞানের স্রষ্টা।[৫৪]

মুয়াম্মার

দশম শতাব্দীর প্রথম পাদে নাজ্জামের শিষ্য মুয়াম্মার আব্দুস সালামী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মোতাজিলা পণ্ডিত। তিনি তাঁর পূর্বসুরিদের তুলনায় অধিক নির্গুণবাদীতত্ত্বে বিশ্বাস কবতেন এবং বাস্তবে আল্লাহকে সম্পূর্ণ অনির্দিষ্টসত্তায় পরিণত করেন। আল্লাহ আপনাকে অথবা অন্য কোনো বস্তু বা গুণকে জানেন না। কারণ তাঁর এরূপ জ্ঞানের কথা স্বীকার করলে জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এক হয়ে যায়– যা সম্ভব নয়; পৃথক জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু ছাড়া জ্ঞান ক্রিয়া সম্ভব নয়। একই আল্লাহ বিষয় (Subject) ও বিষয়ী (Object) একাকার হয়ে যায়-এরূপ ক্ষেত্রে তার একত্ব ধ্বংস হন। নাজ্জামের সৃষ্টিতত্ত্বকে তিনি সম্প্রসারিত করেন।[৫৫]

মুয়াম্মার ছিলেন একজন সম্প্রত্যয়বাদী (conceptualist) তাঁর মতে বিশেষ (Particuler) কে বাদ দিয়ে সমগ্রের (universal) কোনো অস্তিত্ব নেই। বিশেষকে বাদ দিলে সমগ্র শুধু মানসিক ধারণা বৈ কিছু নয়। তাই গতি, স্থিতি, সাম্য-অসাম্য সমস্তই কাল্পনিক ধারণা—এদের কোনো বাস্তব সত্তা নেই। মানুষের ইচ্ছা বন্ধনহীন। আত্মা মানুষের সার ধর্ম, সেজন্য এর বাস্তবতা আধ্যাত্মিক। কর্তা হিসেবে আত্মা স্বাধীন, এবং স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করার মধ্যেই আত্মার স্বাধীনতা নিহিত। ইচ্ছাই মানুষের একমাত্র ক্রিয়া; অন্য সব ক্রিয়া কেবল শরীর সম্বন্ধী।[৫৬]

আবু হাশিম আল বসরি

বিখ্যাত মোতাজিলা পণ্ডিত আল জুবাইয়ের পুত্র আবু হাশিম বসরি পিতার মতের বিরোধিতা করেন।[৫৭] আল জুবাই সত্তা-অসত্তা, অবস্থা, সম্বন্ধ এই চার প্রকার সত্তার কথা বলেন। অবস্থা ও সম্বন্ধ সত্তা অসত্তার মতোই বাস্তব। কিন্তু আল জুবাই অবস্থা ও সম্বন্ধের বাস্তবতা অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে, তার মতে এগুলো জ্ঞাতার আত্মগত অবস্থা বৈ কিছু নয়।

মুতাজিলা মতাদর্শ বা যুক্তিবাদী ধর্মতত্ত্ব উন্নতির শিখরে আরোহণ করে আল মামুনের শাসন আমলে। মুতাজিলা মতাবলম্বী বিচারপতি ইবনে আবু দাউদের প্রভাবে আল মামুন ৮২৭ সালে এক রাজকীয় অনুজ্ঞা দ্বারা 'কোরআন সাদিতত্ত্ব' সরকারি দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। অথচ সাধারণের মধ্যে এটা ছিল প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিপরীত মতবাদ। সাধারণ লোক বিশ্বাস করত কোরআন চিরন্তন, অনাদী এবং আল্লার বাণী।[৫৮] যাহোক উক্ত সরকারি অনুজ্ঞা অনুসারে প্রত্যেক বিচারক এ মতবাদে আস্থাশীল কিনা সে মর্মে পরীক্ষা দিতে হত। ৮৩৩ সালে আর এক রাজানুজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। এই ফরমান অনুসারে কোনো বিচারক এই নয়া মতাদর্শে বিশ্বাস না করলে তাকে চাকরী হতে বরখাস্ত করা হয়। ভিন্ন মতবলম্বীদের নির্মূল করার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! যে মতাদর্শ মুক্ত বুদ্ধির বিকাশের স্বপক্ষে ছিল—সে মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি শক্তি প্রয়োগ নীতি অবলম্বন করা হয়। এর ফল হয় উল্টো। একথা সত্য যে, ইতোপূর্বে ভিন্নমতাবলম্বী জিনদিকদেরকে মাহদী এবং হাদী যথেষ্ট নির্যাতন করেন; কিন্তু প্রগতিবাদী মামুন অমুতাজেলী মুসলিমদের উপর যে দমননীতি চালান তা ছিল অভূতপূর্ব। এই দমননীতির ফলে সাধারণ সনাতনী আহলুস সুন্নাহ্ প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের উচ্চতর দর্শন সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। তাই তাদের ভাবধারার বিরুদ্ধে সেদিনের রক্ষণশীল মানুষ প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করে। মালিক বিন আনাস ঘোষণা করেন যে কোরআন হাদিস বিনা প্রশ্নে নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে। আহমদ বিন হাম্বল সরকারের

বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। তার উপর যতই সরকারি নির্যাতন হয় ততই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। স্বাধীন চিন্তার বদলে নির্বিচার বিশ্বাস সবাই গ্রহণ করে। পুনরায় সাধারণ মানুষ কোরআন ও হাদিস পাঠে সন্তুষ্ট হয়; দর্শন পাঠ হতে নিরাপদ দূরে সরে দাঁড়ায়। ঘোষণা করা হয় যে, ধর্মের অনুশাসনকে অন্ধভাবে অনুশীলন করতে হবে। স্বাধীন চিন্তাকে যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন অব্যাহত থাকে ৮৪৮ সাল পর্যন্ত। মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতাসীন হয়ে প্রথমে মামুনের অনুজ্ঞা বাতিল করেন। মোতাজেলীদের বিরুদ্ধে পাল্টা নির্যাতন চালান হয়। অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী সমাজের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাদের পতন কেবল সরকারি নির্যাতনের কারণে হয় তা নয়, ববং তাদের উত্থানের ভিত্তি ভূমি ছিল অনুকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের পতনের মূল ছিল প্রতিক্রিয়াশীল আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থা।

নীতিশাস্ত্র

ইতিপূর্বে শাস্ত্রীয় আইন কিরূপে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর অধিকতর বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নতুন ধর্মতত্ত্বের উত্থান ও পতনের উপরও আলোকপাত করা হয়। এখন ইসলামি সমাজ জীবনে প্রথম পর্যায়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের নৈতিক আচরণবিধি কোরআন ও সুন্নাহ হতে উৎসারিত হয় এবং পরিবর্তিত আব্বাসী যুগে তাদের নীতিশাত্র কি রূপ পরিগ্রহ করে সে সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে।

কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের নৈতিক কার্যাবলী পাঁচভাবে বিভক্ত করা হয়। ক. নিত্য আবশ্যকীয় বা ফরজ কাজ যা করলে পুণ্য হয়; কিন্তু না করলে পাপ হয়; খ. ধর্মের দ্বারা বিহিত নৈমিত্তিক কর্ম বা মুস্তাহাব, যা করলে পুণ্য হয়; কিন্তু না করলে পাপ হয় না; গ. অনুমোদিত কর্ম বা জায়েজ কাজ, যে কর্মের উপর ধর্মের বিধি-নিষেধ নেই; ঘ. অপছন্দসই কাজ বা মাকরুহ, যে কাজের প্রতি ধর্মের সম্মতি না থাকলেও তা দণ্ডনীয় কর্ম নয়, ঙ. নিষিদ্ধ কর্ম বা হারাম কাজ, যে কাজ নিষিদ্ধ এবং করলে দণ্ডনীয়। এভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ভাল-মন্দ, সদাচার-কদাচার অর্থাৎ তার সমগ্র মূল্যবোধ নির্দিষ্ট ছকে সরলভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে। কোরআন ও সুন্নার আলোকে এ বিষয়ের উপর অনেক পুস্তক রচিত হয়। ইমাম গাজ্জালী প্রণীত ইয়াহিয়াউল উলুম গ্রন্থটি মূলত সনাতন ইসলামি নীতি শাস্ত্রের উপর একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যা এখন পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয় নি।

আব্বাসী যুগের পরিবর্তিত অবস্থায় আরবি সাহিত্যে তিন ধরনের পুস্তকে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে—যার অনেকটা পূর্ববর্ণিত ছকে ফেলা যায়

না। প্রাথমিক পর্যায়ের মূল্যবোধ ছিল সরল ও সহজ; কিন্তু আব্বাসী যুগে অধিকতর আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটায় সামাজ জীবন অনেকাংশে জটিল হয়ে ওঠে; নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। প্রথমত এমন কিছু সাহিত্য রচিত হয়, যাতে ইন্দো-ইরানী রূপ কথা ও প্রবাদ বাক্য বা বাণী চিরন্তনের মধ্য দিয়ে মানব জীবনে সুনীতি (good morals). সুরুচিতা, (Refinement) বা সদাচারণের (আদব) প্রতিফলন দেখান হয়। ইবনুল মুকাফফাহ-যাকে ৭৫৭ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, আব্দুররুল ইয়াতিমা গ্রন্থে সংযম, মিতাচার, সৎসাহস, ঔদার্য এবং কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলীব উচ্ছসিত প্রসংশা করেন। এই পুস্তকে মানব জীবন সাধনার অভিনব দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে। এ ছাড়াও রূপকথাব নায়ক লোকমানের বচন অথবা আল মাওয়ার্দি কর্তৃক সংকলিত মহানবী ও তাঁর সহচরদের বাণী-এর মধ্য দিয়ে ইসলামি নৈতিক দর্শনই চিত্রিত হয়। দ্বিতীয় ধরনের পুস্তক রচিত হয় যা নৈতিক মূল্যবোধের দার্শনিক তত্ত্বের উপব প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চলে। এই স্তরে তাদের নীতিশাস্ত্রে নব্য প্লেটোনিক চিন্তাধাবার অনুপ্রবেশ ঘটে। এ্যারিস্টটলের নিকোম্যাচেন ইথিক্স (Niolcomachean ethics) পুস্তকটি হুনায়েন বিন সাবিত কিতাবুল আখলাক নামে অনুবাদ করার পর ঐ পুস্তকটি আরব নৈতিক দর্শন (ইলমুল আখলাক) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। ইবনে মাসকাওয়াই তার তাহজিবুল আখলাক নামক গ্রন্থে নয়া নীতিশাস্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এইটুকু বললে চলে যে, ইবনে মাসকাওয়াই ইসলামের ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে নীতি শাস্ত্রের দার্শনিক আলোচনার সূচনা করেন। প্রায় একই সময় পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ নয়া নীতি শাস্ত্রের উপর আলোকপাত করে। সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট আদর্শ চরিত্র হলেন মহানবী; কিন্তু শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের নৈতিক আদর্শ ছিলেন হযরত আলী। প্রসঙ্গটি পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ অধ্যায়ে পুনরায় আলোচিত হবে।

সেলজুকী সামরিক স্বৈরতন্ত্রের যুগে তৃতীয় প্রকারের নীতি শাস্ত্র গড়ে ওঠে—এটাকে প্রফেসর হিট্টির ভাষায় রহস্যবাদী মরমি মনস্তাত্ত্বিক নীতি শাস্ত্র (Mystic Psychological Ethics) বলা চলে। মূলত এই নৈতিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন এক ধরনের প্রতিবাদী সুফিরা, তবে এর মননশীল রূপদান করেন তৎকালের শ্রষ্ঠ পণ্ডিত আল গাজ্জালী।

মানব সমাজ জীবনে আইন শাস্ত্রের অপরিসীম গুরুত্ব থাকে। পূর্বের আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে, আব্বাসীদের সামাজিক প্রগতির যুগে ইজতিহাদ, রায় ইসতিসানের মত প্রগতিশীল নীতিমালা গড়ে উঠলেও তার সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনায় প্রথম ইমাম শাফেয়ী পশ্চাদপসরণের পথ প্রদর্শন করেন; কিন্তু তখনো সমাজ প্রগতি স্তব্ধ হয় নি। ইসলামি বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করলে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করা হয় এবং প্রগতিবিরোধী শিবিরে হাম্বলী মজহাব প্রাধান্য পায় এবং সমগ্র মধ্যযুগে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থবিরতা স্থায়ী রূপ নেয়। পুনশ্চ

উল্লেখ্য যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে আরবের সরল সহজ জীবনের জন্য নৈতিক নীতিমালা বিশেষ ছকে বেঁধে দেয়া হয়, কিন্তু সমাজের অধিকতর বিকাশে নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বেশ বৈচিত্র্য দেখা দেয়; এমন কি নীতি শাস্ত্রকে দার্শনিক তত্ত্বের উপরও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চলে; মুসলিম সম্প্রদায় তার মৌল আর্থ-সামাজিক বৃত্ত ভাঙ্গতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে অবশেষে তার নৈতিক দর্শন রহস্যবাদের চোরাগলিতে আটকে যায়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মহিমান্বিত না হয়ে বরং আত্মসমর্পণবাদ, আত্মসন্তুষ্টবাদ, দীন হীন জীবন এবং ধৈর্যশীলতা হয় প্রশংসিত। মানবাত্মা অসুস্থ হওয়ায় বিশ্ব পাপপঙ্কিলতায় পূর্ণ হয়ে গেছে–তাই অবিরত খোদাই গজব; এ দুর্দিনের পৃথিবীতে শান্তি হলো মায়া মরিচিকা, কৃচ্ছ্রতা সাধন ও আত্মশুদ্ধির মধ্যে মানুষের মুক্তি নিহিত।[৫৯] এই ছিল দশম একাদশ শতাব্দী হতে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে মুসলিম নীতিশাস্ত্রের প্রধান ও প্রবল দিক। বস্তুত এটাই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের সর্বোচ্চস্তরও মূল সুর। চতুর্দশ শতক হতে ইউরোপ এরূপ মূল্যবোধ ভাঙ্গতে লড়াই শুরু করে; মুসলিম জগত ঐ মূলবোধকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে।

১২.৫ মানসিক সংস্কৃতি : মানবিক মূল্যবোধ

ক. সাহিত্য

আরবি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। আমাদের আলোচ্য সময়কালে যে বিশাল আরবি সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ভাষাগত বিচারে অবশ্যই তা আরবি সাহিত্য; কিন্তু ঐ বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার কেবল আরব জাতিসত্তার একক সৃষ্টি নয়– বরং তৎকালীন বহু ভাষাভাষিক ও বহু জাতিগোষ্ঠীর অধ্যুষিত ইসলামি বিশ্বের আরব অনারব সকলের সম্মিলিত মেধা ও মননের প্রকাশ ঘটে আরবি ভাষায়। বিজিত অনারব নৃগোষ্ঠী ইতিমধ্যে আরবি ভাষার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুত এ সাহিত্য কোনো এক নরগোষ্ঠীর মানস পরিমণ্ডলের প্রতিফলন নয়; সমগ্র মধ্যযুগীয় সভ্যতার অক্ষয় সৌধমালা। আরবি ভাষাতত্ত্বে, শব্দ বিজ্ঞানে, তার অলঙ্কার শাস্ত্রে বা ব্যাকরণে নিঃসন্দেহে আরবদের ছিল মৌলিক অবদান। এ কথাও সত্য যে, ফারাব নগরের জনৈক তুর্কী আল জওহারী (মৃত. ১০০৮ খ্রি.) অভিধান রচনার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করেন তাই পরবর্তীকালে আভিধানিক আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হয়। জনৈক গ্রীক বংশোদ্ভূত ইবনে জিন্নীর মত ভাষাবিদদের তুলনা আরবদের মধ্যে পাওয়া যায় না। ইবনে খলদুন তাঁর মুকাদ্দামায় যথার্থই বলেন যে, ইসলামি জগতের বিদ্বৎ সমাজ গড়ে ওঠে সাধারণত অনারব নিয়ে।[৬০]

আব্বাসী সুবর্ণযুগে বিজিত জাতি সত্তাসমূহের মধ্য হতে এক নতুন ধরনের সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। আব্বাসী বিপ্লবের মূল কথা ছিল বিভিন্ন সংস্কৃতির যা

কিছু মঙ্গলজনক তার আত্তীকরণ। আব্বাসী বিপ্লবের পর আরব জাতিসত্তার রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বিনষ্ট হয়; তাদের অনেকেই এ পরিবর্তনটি মনে প্রাণে গ্রহণ করেন নি; তাদের মধ্যে বরং অহংশ্রেষ্ঠত্ববোধ কাজ করে। এরূপ বাস্তব পরিস্থিতিতে 'শুয়ুবিয়া' আন্দোলন দানা বাধে। এর প্রাথমিক বা তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল আরব বংশোদ্ভূতদের মধ্য হতে ঔদ্ধত্য মনোভঙ্গি দুরীভূত করে বর্ণ-জন্ম-বংশ-দেশ নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে একই ভ্রাতৃসঙ্ঘের কাতারে দাঁড় করান। কেননা মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম ব্যাপক অঞ্চলে বৃহত্তর মানব সমাজ গঠনে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই এ ধর্মের সবচেয়ে বড় অবদান, অথচ আর জাত্যাভিমান মধ্যযুগের ঐ মহৎ আদর্শ ধুলায় ধুসরিত হচ্ছিল। ইতিপূর্বে খারেজীরা আরব জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ করে; পারস্যের সাম্যবাদী জিন্দিক সম্প্রদায় এর ধর্মীয় প্রতিবাদ করে। শুয়ুবিয়া পন্থীরা কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতাদর্শ সামনে না এনে সাহিত্যিক বিতর্কের উপস্থাপনা করে। আরবদের বৌদ্ধিক ঔদ্ধত্যকে উপহাস করা হয়। আরবি কাব্য সাহিত্য বা জ্ঞান চর্চায় অনারবদের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। উচ্চতর মানবিক বিতর্কে অনারবদের পক্ষ অবলম্বন করেন আলবেরুনী, হামজা ইসপাহানী, ফেরদৌসী প্রমুখ। আরব পক্ষ অবলম্বন করেন জাহিজ, বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদ ইবনে দুরাইদ, ইবনুল কুতাইবা এবং ঐতিহাসিক বালাজুরি। এ বিতর্কিত বিষয়ের উপর অনেক পুস্তকও প্রণীত হয়।[৬১]

দশম শতাব্দীর শেষে এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবি সাহিত্যে এক নয়া অধ্যায় সংযোজিত হয়। এ সময়টি আরবি সুকুমার সাহিত্যের (Belles lelleir) যুগ বলাই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য এরূপ সাহিত্য শিল্প কর্মের সূচনা করেন বসরার সাহিত্যসেবীদের প্রধান জাহিজ (মৃ. ৮৬৮ খ্রি.); এর চূড়ান্ত শিল্পরূপ পায় বদিউজ্জামান হামদানী (৯৬৯-১০৩৮ খ্রি.), নিশাপুরের সায়ালবী (৯৬১-১০৩৮ খ্রি.) এবং বসরার হারিরি (১০৫৪-১১২২ খ্রি.) এর সাহিত্য কর্মে।

আরবি সাহিত্যের নতুন ধারা গড়ে ওঠার সময় কালটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে আব্বাসী খলিফাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হতে অপসারিত করা হয়। কেবল বাগদাদ নগরীতে তাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব সীমিত থাকে; প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বের সমগ্র সালতানাত বা জাহানদারী নীতি বলবত থাকে; এমতাবস্থায় আঞ্চলিক শহরগুলো সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাই সর্বত্র অনেকাংশে সাংস্কৃতিক স্বাধীন হাওয়া ছিল প্রধান দিক। দ্বিতীয়ত সমগ্র কালটি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। মৌলিক চিন্তন যখন একেবারে শেষ পর্যায়ে—এ সময় লৌকিক সাহিত্য চর্চার অনুকূল হাওয়া প্রবাহিত ছিল। বিভিন্ন রাজরাজরার দরবারে চিত্তবিনোদনের জন্য সাহিত্য মজলিম বসত। তৃতীয়ত শিক্ষিত বেকার সমাজ এ সময় বেড়ে ওঠে; তাদের অনেকের রুজিরোজগারের কোনো স্বাধীন পথ না থাকায়

তারা বিভিন্ন সামন্তদের সাহিত্য মজলিসে ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যার বিতর্কে যোগদান করত; অতি সাধারণ ব্যাপারে কবিয়ালদের মত বাহ্যিক ঝড় তুলত এবং এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের বাগ্মিতা ও বাহ্যিক দক্ষতা প্রমাণ করে ধনী সামন্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। চতুর্থত যেহেতু প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বে ইরানী ও তুর্কী জাতিসত্তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরানী ঐতিহ্য সমাজ জীবনে প্রধান্য পাওয়ায় তাই আরবি গদ্য সাহিত্যে ফারসি ভাষার প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ফারসি প্রভাবের ফলে আগেকার আরবি সাহিত্যে যে পরিচ্ছন্ন সরল-সহজ নিরাভরণ তীর্যক অথচ সাবলীল প্রকাশভঙ্গি ছিল তা হারিয়ে যায় এবং তদস্থলে সাহিত্যে বিষয়বস্তুর ভাবের স্থান দখল করে পুষ্পিত ভাষার অলঙ্কার অত্যন্ত মার্জিত, সুচারু রচনাশৈলী চমৎকার শব্দচয়ন। নব রচনাশৈলীতে ছন্দবদ্ধতা, মিত্রাক্ষর, উপমা, বিশেষণের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। হিট্টি বলেন : ... In response to Persian influence to be affected and ornate. The Terse, incisive and simple expression of early days had gone for ever. It was supplanted by polished and elegant style, rich in elabnate similes and replete with rhymes.[৬২] এরূপ বাস্তব পরিস্থিতিতে আরবি সাহিত্যে এক নতুন আঙ্গিক, নতুন রচনাশৈলীর সৃষ্টি হয়-এর প্রকাশ ঘটে মাকামা সাহিত্যে। অনেক ভাষাতাত্ত্বিকের ধারণা যে, নয়া মাকামা রচনাশৈলী কোনো এক ব্যক্তির সৃষ্টি নয় বলেই মনে হয়, রবং অলঙ্কৃত শব্দচয়ন ও ছন্দায়িত গদ্যের এটাই ছিল স্বাভাবকি বিকাশ এবং সম্ভবত ইবনে দুরাইদ ইতিপূর্বে এরূপ রচনাশৈলীর পথিকৃত ছিলেন।[৬৩] বসরার হারিরী বদিউজ্জামান হামদানীর মডেলে তার মাকামা সৃষ্টি করেন; এবং তার মাকামা আরবি সাহিত্যে স্থায়ী আসন অর্জন করেছে। বস্তুত হামদানী এবং হারিরীর হাতে মাকামা সাহিত্য চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে এবং এর নাটকীয় উপস্থাপনা পূর্ণতা লাভ করে। মাকামার উপাখ্যানে কি কোনো বাণী ছিল? নব্য রচনাশৈলীতে কি আঁধেয় নয়, বরং শাব্দিক অলঙ্করণ এবং ছন্দের ঝঙ্কার একমাত্র উপভোগ্য? বিষয়টি সম্ভবত কেবল তাই নয় তার থেকেও অন্য কিছু তার মধ্যে নিহিত ছিল। তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সামনে রেখে মাকামাগুলো পড়লে এর প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্দি করা যায়। এতে সমসাময়িক জীবনের প্রতি তীব্র সমালোচনা ছিল; এর মর্মার্থে নিহিত ছিল গভীর নীতিমালা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মাকামা সাহিত্যে বেশ কিছু নাটকীয় উপাদান ছিল; কিন্তু সমগ্র মধ্যযুগে আরবি সাহিত্যে নাট্যশিল্পের বিকাশ ঘটে নি কেন? গ্রীক নাটকের তারা সন্ধান পেয়েছিল তবুও এই চমৎকার সাহিত্য শিল্পের প্রতি কোনো আগ্রহ সৃষ্টি হয় নি কেন? আরো আশ্চার্য্যের কথা এ বিষয়ের উপর কোনো গবেষণাও হয় নি। এখানে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করার বড় একটা সুযোগ নেই, কেবল একটা দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যে ও নাট্য শিল্পের বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে মন্ময়তাই প্রধান, জীবন ধর্মীতার প্রকাশ ছিল কম। কিন্তু গ্রীসে নাট্যকলার প্রচণ্ড

বিকাশ হয় এবং গ্রীক ট্রাজেডী এখনও মানুষের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। গ্রীক ট্রাজেডীগুলোতে অদৃষ্টবাদের প্রধান্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু নাটকের নায়ক নায়িকারা যে বাঁচার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে তাতে মানবিকতাও মহিমান্বিত হয়।

স্বাধীন গ্রীক নরগোষ্ঠী অদৃশ্য শক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করলেও সে তার অস্তিত্বের সংগ্রামে তার সকল শক্তি নিয়োগ করেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম ও তার পরাজয় সম্পর্কে তাদের সচেতনতারই প্রতিফলন ঘটে তাদের নাট্যশিল্পে। প্রাক রেনেসাঁস মধ্যযুগীয় ইউরোপেও নাট্য শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না; কিন্তু মধ্যযুগের ক্রান্তিলগ্নে রেনেসাঁস আন্দোলন যার মূল সুর ছিল মানব জীবনই মানুষের শ্রেষ্ঠ পাঠ্য। তখন পুনরায় ইউরোপে নাট্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। এ সময়ের ট্রাজেডীগুলোতে অদৃষ্ট শক্তির তুলনায় মানুষের নিজস্ব দোষগুণই তার জয় পরাজয়ের কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। পুনশ্চ মানুষের অস্তিত্বে নয়া সংগ্রাম শুরু হয় এবং তার নিজস্ব গুণাগুণই তার পরিণতির জন্য দায়ী—এরূপ সমাজ চেতনাই ছিল এ সময়ের নাট্য শিল্পের বিকাশের পটভূমি।

এ আলোচনা হতে একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে তা হল নাট্যশিল্পের জন্য চাই গভীর জীবনবোধ, ইহলৌকিক জীবনের আস্তিত্বের সংগ্রাম চেতনা। সমগ্র মধ্যযুগে সামন্ত জীবন ব্যবস্থায় এরূপ জীবন সংগ্রামের অস্তিত্ব দেখা যায় না বলেই তাদের মধ্যে এরূপ গভীরে জীবনবোধ জাগ্রত হয় না। মধ্যযুগে ইসলামি বিশ্বে মানুষের সংগ্রামের চরিত্র একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়ায় তাদের মধ্যে এ ধরণের জীবনবোধ গভীর হতে পারে নি বলেই কি তাদের মধ্য নাট্যশিল্পের বিকাশ হয় নি?

মাকামা সাহিত্য বিকাশের পূর্বে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য ঐতিহাসিক ছিলেন আবুল ফারাজ ইস্পাহানী (৮৯৭-৯৬৭ খ্রি.) তিনি উমাইয়া মারওয়ানের বংশধর; তিনি আলেপ্পো নগরে বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল আগানী রচনা করে আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। কিতাবুল আগানী ছিল তৎকালীন আরবি সাহিত্যের বিশ্বকোষ। তৎকালীন আরব সংস্কৃতির স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে পুস্তকখানি হবে অবশ্য পাঠ্য। ইবনে খালদুনের মতে পুস্তকখানি ছিল আরব রেজিস্ট্রার, আরবি সুকুমার সাহিত্যমোদীদের শেষ উৎস। আবুল ফারাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আলেপ্পোর শাসক সাইফুদ্দীন হামদানী। তিনি লেখককে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করেন। ইবনে খালিকান বলেন যে, আন্দলোসিয়ার অধিপতি তাকে সম্মাননা ও প্রচুর অর্থ দান করেন; বুওয়াইহী উজির আস সাহিব এবনুল আব্বাস (৯৯৫ খ্রি.) উক্ত গ্রন্থের একটি কপি সংগ্রহ করার জন্য ত্রিশটি উটের বোঝা পুস্তক তাকে উপঢৌকন দান করেন।[৬৪] দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হল এক হাজার এক রজনী নামক বিশ্ববিখ্যাত আরব্য উপন্যাসের প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন। জাহশিয়ারী

(৯৪২ খ্রি.) প্রাচীন পারস্যের হাজার আফসানা গল্প গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে আরব্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'হাজাব আফসানা' গল্প গ্রন্থে অনেকগুলো ভাবতীয় উপন্যাসও ছিল। লেখক জাহশিয়ারী স্থানীয় গল্পকারদের নিকট হতে অনেক কাহিনী সংগ্রহ করেন। আরব্য উপন্যাসের ভূমি নকশা, মূল কাহিনী কাঠামোর শাহারজাদসহ প্রধান প্রধান কুশীলদের নামকরণ, হাজার আফসানা হতেই গৃহীত হয়। সময়ের অগ্রগতিব সাথে সাথে এতে ভারতীয়, হিব্রু, গ্রীক, মিশরীয় বাগদাদ সভ্যতার উৎস হতে সংযোজন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, চলতে থাকে। আরব্য উপন্যাসের নির্মল হাস্যবস, রোমান্টিকতা, প্রেমমত্ততা, এর ঝলসান জৌলুস উপাদান খলিফা হারুনুর রশীদের দরবার হতে আহরণ করা হয়। মিশরে মামলুক শাসন আমলে আরব্য উপাখ্যান চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। আরব উপন্যাসের জনপ্রিযতা সর্বজনবিদিত। গ্যাল্লান্ড প্রথমে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন, এবপর ইউবোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ কবা হয়। পাশ্চাত্য জগতে এর জনপ্রিয়তা ছিল প্রচণ্ড। এডওয়ার্ড উইলিয়ম প্রথম ইংবেজি অনুবাদ করেন, অনেক টীকা টিপ্পনিসহ এর অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয। জন পেনির ইংরেজি অনুবাদ ছিল পূর্ণাঙ্গ. সর্বোত্তম, তবে তার উপর কোনো টীকা লেখা হয় নি। স্যার বিচার্ড এফ বাটনের অনুবাদের অনুসরণ করে পিনি (Payne) মূল প্রাচ্য রূপ-রসের পুনরুৎপাদনেব প্রচেষ্টা চালান।[৬৫] আবব্য উপন্যাস মধ্যযুগের জীবন আলেখ্য বললে অতিরঞ্জন হয় না, মধ্যযুগেব মানুষের সমগ্র জীবন।

কাব্য

উমাইয়া যুগের কবিরা জাহেলিয়া যুগের সনাতনী কাব্যধারার অনুসরণ করেন। আব্বাসী কবিরা এটাকে ধ্রুপদী ধারা বলে মনে করত। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে আব্বাসী যুগে ধর্মীয় অনুভূতি উৎসাহিত হয়; খলিফারা প্রকাশ্যত তা সযত্নে লালন করতেন; তবে এ সময় ফারসি সাংস্কৃতিক ধারা ও ধর্মীয় প্রভাবের ফল্গুধারা আব্বাসী উচ্চকোটি সমাজদেহে প্রবাহমান ছিল। এটাই ছিল আব্বসী সোনালি যুগের বাস্তবতা। আব্বাসী খলিফাদের ইহলৌকিক জীবন ছিল খুবই আড়ম্বরপূর্ণ; তারা কবি-সাহিত্যিকদের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন এবং খলিফারা আশা করতেন যে তাদের আশির্বাদপুষ্ট কবিরা তাদের স্তুতিবাদ গাইবেন। এরূপ পরিস্থিতিতে উমাইয়া ক্রুপদী কাব্যধারা হতে আব্বাসী কাব্যধারা একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় এবং বাস্তবে তা নবতর রূপ পরিগ্রহ করে। এতদসত্ত্বেও আব্বাসী কাব্যধারায় রক্ষণশীলতার প্রভাব ছিল। আব্বাসীযুগে নাগরিক জীবন বেশ বিকশিত হলেও তৎকালীন আরবি কাব্যেও পূর্বের মত মরুভূমি চেতনার প্রতিফলন ঘটে।[৬৬] আব্বাসী যুগের নব কাব্যধারার পথিকৃৎ ছিলেন পারস্যের অন্ধকবি বাশশার বিন বুরদ। খলিফা আল মাহদী ৭৮৩ সালে

তার হত্যার আদেশ দেন। অনেকে মনে করেন খলিফার উজিরকে কবি বিদ্রূপ করেন; কেউ কেউ মনে করেন কবি সাম্যবাদী জিনদিক বা জরস্ত্রীয় বা মনিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ভেবে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়। যাহোক তিনি ছিলেন মধ্যযুগীয় মনোভঙ্গি প্রকাশের চমৎকার উদাহরণ। তিনি ঐ সব মতবাদে বিশ্বাস করতেন কি না তা বিতর্কের বিষয় হতে পারে, তবে তিনি প্রাচীন কাব্যধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাব্য শিল্প চর্চায় তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ। তিনি কোনো এক সময় বলেছিলেন যে, আল্লা তাকে অন্ধ করে তার প্রতি দয়াই করেছেন। তিনি অন্ধ না হলে অনেক ঘৃণ্যবস্তু স্বচক্ষে দেখতে হত।[৬৭] আব্বাসী আমলের প্রাথমিক পর্যায়ে নয়া কাব্যধারার বড় প্রতিনিধি ছিলেন আধা পারসী আবু নুয়াস (মৃ. ৮১০ খ্রি.)। তিনি ছিলেন খলিফা হারুন ও আমিনের সাথী। রাজদরবারে হাস্য-রসিক ভাঁড় হিসেবে অবু নোয়াস সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। শৃঙ্গার রস সৃষ্টিতে ও প্রণয়গীতি কাব্য রচনায় মনোহর শব্দ ঝঙ্কার তুলতে তার কোনো জুড়ি ছিল না। তিনি গীতিকাব্য ও মদিরাকাব্য সৃষ্টিতে ছিলেন অদ্বিতীয়, সিদ্ধহস্ত। বালক মুখ-মণ্ডলের সৌন্দর্য নিয়ে কাব্য রচনা ছিল তার আর এক বৈশিষ্ট্য। ইরানী মডেলে গজল, ক্ষুদ্রাকায় প্রণয়কাব্য বচনা ধারা তিনিই প্রবর্তন করেন। বস্তুত তার সমগ্র কাব্যে তৎকালীন রাজদরবারের ইহলৌকিক লঘু জীবনের চিত্রই চমৎকার রূপে ফুটে ওঠে।

আবু নোয়াসের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতেন আবুল আতাহিয়া (৭৫৮-৮২৮ খ্রি.)। আবুল আতাহিয়া বৃত্তিতে ছিলেন পটুয়া (potter)। তার কাব্যে আধ্যাত্মিক মানসিকতা, নৈরাশ্যবাদ এবং মৃত্যু চেতনা প্রকটভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি ছিলেন বেদুঈন স্বভাবের কবি। তিনি বাগদাদের সমাজ জীবনের লঘুচিত্ততার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। খলিফা হারুন তাকে বার্ষিক ৫০ হাজার দিরহাম বৃত্তি মঞ্জুর করেন। তবুও তিনি দরবেশী পোশাক পরিধান করতেন, মরমি ও সাধু জীবন যাপন করতেন। তার কাব্যে সংযমী জীবনাদর্শই প্রতিফলিত হত।[৬৮] প্রাদেশিক প্রশাসক সামন্ত রাজন্যবর্গ মাত্র প্রথম শ্রেণীর কবিদের উদার পৃষ্টপোষকতা দিতেন। দরবারী কবিদের অন্যতম বিখ্যাত কবি ছিলেন আবু তাম্মাম (মৃ. ৮৪৫ খ্রি.) এবং আবুল আলা আল মায়ারি। আবু তাম্মামের বাবা ছিলেন খ্রিষ্টান এবং বাগদাদের একজন মদ্য ব্যবসায়ী। আবু তাম্মাম দিওয়ানে হামাসা রচনা করে কাব্য জগতে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। তার দিওয়ানাটি যুদ্ধবীর গাঁথা। আল বুহতাবী ও (৮২০-৯২ খ্রি.) একটি দেওয়ান রচনা করেন, তবে হামাসার তুলনায় তা ছিল নিম্নমানের। আব্বাসী খলিফা, উজিরদের পৃষ্টপোষকতাপ্রাপ্ত কবিরা মূলত স্তুতিকার হিসেবে রাজদরবারে নিযুক্ত পায়। এ কারণে সকল কবিই ছিলেন তাদের নিযুক্ত দাতাদের স্তাবক। এভাবে আব্বাসীযুগে স্তুতিবাদী কাব্যধারা বেশ প্রাধান্য পায়। এর ফলে আব্বাসী কাব্যধারার শৈল্পিক বিকাশ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয় এবং তা কালোত্তীর্ণ হয় নি।[৬৯]

তথ্যপুঞ্জি (ক)

১. Hitti, op. cit. p. 245
২. Ibid p. 408
৩. মাসুদী, ষষ্ট খণ্ড, পৃ: ৩২১-২; ইবনে খলদুন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৪৫৫-৬১
৪. Hitti, op cit. p 409
৫. Ibid p. 409
৬. Ibid p. 409
৭. Ibid p. 412
৮. Ibid p. 413
৯. Ibid p. 414
১০. Ibid p. 415
১১. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫
১২. ঐ পৃ. ৪৩৬
১৩. Hitti, op cit. p. 416
১৪. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২
১৫. Hitti, op cit. p. 417
১৬. Ibid p. 414
১৭. Ibid p. 417-19
১৮. Ibid p. 271
১৯. Ibid p. 420
২০. Ibid p. 420-21
২১. Ibid p. 423
২২. Ibid p. 424
২৩. Ibid p. 424
২৪. Ibid p. 425
২৫. Ibid p. 425
২৬. Ibid p. 420
২৭. Ibid p. 426-7
২৮. Ibid p. 427
২৯. Ibid p. 428
৩০. Ibid p. 493
৩১. Ibid p. 494
৩২. Ibid p. 494
৩৩. Ibid p. 495
৩৪. Ibid p. 494

৩৫. *Ibid p. 497*
৩৬. Abdul Mazid Khaduri, Islamic Jurisprudence, Beirut, 1958 p. 20
৩৭. Ibid p. 9
৩৮. Ibid p. 38
৩৯. Ibid pp. 39-40
৪০. Hitti, op cit. p. 400
৪১. রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন, দর্শন দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড
৪২. ঐ পৃ. ৪১
৪৩. ঐ পৃ. ৪২
৪৪. ঐ পৃ. ৪২
৪৫. ঐ পৃ. ৪২-৪৩
৪৬. ঐ পৃ. ৪৩
৪৭. O'leary, op. cit. p.104
৪৮. Ibid pp 124-25
৪৯. রহুল, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩
৫০. ঐ পৃ. ৪৩
৫১. O' leary, op. cit p. 125
৫২. O' leary, op. cit p. 126
৫৩. রহুল, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪
৫৪. ঐ ৪৪
৫৫. ঐ পৃ. ৪৪
৫৬. ঐ পৃ. ৪৪
৫৭. O' leary, op. cit p 131
৫৮. Hitti, op cit. p. 429
৫৯. Ibid p. 401
৬০. Ibid p. 402
৬১. Ibid p. 402
৬২. Ibid p. 403
৬৩. Ibid p. 403
৬৪. Ibid p. 404
৬৫. Ibid p. 405
৬৬. Ibid p. 405
৬৭. Ibid p. 406
৬৮. Ibid p .406
৬৯. Ibid p .407

খ. আরবি ভাষায় ইতিহাস রচনা ও ঐতিহাসিক চিন্তন বিকাশক্রম

প্রাচীনকালে গ্রিকরা ইতিহাস চর্চায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হেরোডোটাস প্রথম ইতিহাস বচনাব পথ প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের সময় তিনি নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। ইতিহাস বচনাকালে তিনি কেবল দেশের বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনীই পবিবেশন কবেন নি ববং মানুষের কার্যাবলীব বিবরণীতে তাঁর সংগৃহীত নানা তথ্য লিপিবদ্ধ কবেন। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের সময় যত্ন সহকাবে তথ্যের যথার্থতার বিচাব করেন। তবুও তাব বিবরণীতে এমন কিছু কিংবদন্তী বিবৃত হয়, যে কারণে তাকে মিথ্যাবাদীও বলা হয। যাহোক থুকিডাইডিস ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহেব পশ্চাতে নিহিত কার্য-কাবণ পদ্ধতির অনুসন্ধান করেন। এ কারণে তিনি বিচারমূলক ইতিহাস বচনার আদি পুরুষ বলে বিবেচিত হন।

রোমক ঐতিহাসিক জেনোফেন, জুলিয়াস সিজার, লিভি, টেসিটাস প্রমুখদের মধ্যে একমাত্র টেসিটাস থুকিডাইডিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন; বাস্তবে গ্রীক ঐতিহাসিকবা ইতিহাস লেখনের যে মান নির্ধারণ করেন তিনি তা অর্জন করতে ব্যর্থ হন। রোমক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সত্যের চেয়ে জাত্যাভিমান ছিল প্রবল।

মধ্যযুগে আরবি ভাষায় ইতিহাস চর্চা মানব বিদ্যায় এক নবতর দিগন্ত উন্মোচন করে। এ সময় ইতিহাস রচনাশৈলী, উপাত্ত অনুসন্ধান পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক চিন্তন নয়া রূপে বিকাশ লাভ করে। উমাইয়া যুগে ইতিহাস চর্চার সূচনা হলেও আব্বাসী যুগেই ইতিহাস অনুশীলনেব জোয়ার উত্থিত হয়। আব্বাসী বিপ্লবের সাফল্যের সাথে ইসলামি উম্মার বিস্তৃতির ফলে ইতিহাস চেতনা ও ইতিহাস চর্চার জন্য ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক ও বৌদ্ধিক তাগিদ দেখা দেয়।[১] মহানবী প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য বা সুন্নাহ, তাঁর জীবন কাহিনীর তাঁর যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে মানুষের জানার যে প্রবল কৌতূহল বৃদ্ধি পায় তাতে লোকমুখে স্মৃতিচারণ তার পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারে না বলে ঐ বিষয় লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় আব্বাসী স্বর্ণ যুগে। ইসলামি বিপ্লবকালে প্রাক-ইসলাম যুগের লোক পরম্পরাগত রূপকথা ঐতিহাসিক উপাখ্যান, কিংবদন্তী, প্রবচন ও প্রবাদ সম্পর্কে জানার আগ্রহে কিছু দিনের জন্য ভাটা পড়ে সত্য, কিন্তু উমাইয়া যুগে তা পুনরুজ্জিবীত হয়। এভাবে আরবি ভাষার ইতিহাস চর্চার মানসিক প্রস্তুতি হয়।

প্রাক ইসলাম বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা এবং তা লিপিবদ্ধকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কুফা নগরের অধিবাসী হিশাম আল কালবী (মৃ. ৮১৯ খ্রি.)। আন নাদীম তাঁর ফিহিরিস্ত গ্রন্থে হিশাম আল কালবী লিখিত ১২০ খানি পুস্তকের নাম তালিকাভুক্ত করেন। উল্লিখিত তালিকাভুক্ত পুস্তকের মধ্যে বাস্তবে মাত্র তিনটি পুস্তক টিকেছিল;

তবে তাবারী ও ইয়াকুতের লেখনিতে কালবীর অন্যান্য পুস্তকের নাম এবং অসংখ্য উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।[২] মহানবীর জীবন ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ বা নয়া ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাধারণ তাগিদ মিটানোর জন্য মদিনাবাসী মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রথম নবী চরিত রচনা করেন। তাঁর পিতাকে ৬৩৩ সালে খালেদ বিন ওয়ালিদ ইরাকের আইনুত্তামার রণক্ষেত্র হতে বন্দি করেন। ইবনে ইসহাক বাগদাদে ৭৬৭ সালে প্রয়াত হন। ইবনে ইসহাকের গ্রন্থের কোনো অনুলিপি বিদ্যমান নেই সত্য, তবে মিশরের একজন শ্রেষ্ঠ চরিতকার ইবনে হিশামের গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের গ্রন্থের প্রচুর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ইবনে হিশাম কায়রোতে ৮৩৪ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি চরিতগ্রন্থ জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনিই মূলত নবী, সাহাবী এবং পরবর্তী ব্যক্তিদের জীবন চরিত প্রণয়নের রেওয়াজ সৃষ্টি করেন। ওয়াকেদীর সচিব ইবনে সায়াদ রচনা করেন বিখ্যাত তাবাকাতে ইবনে সাদ গ্রন্থটি। এটাকে হিট্টি বলেন বিশেষ ধরনের চরিতমালা।[৩] তাবাকাত রচনাশৈলী মূলত তিনি ওয়াকেদী হতে গ্রহণ করেন। তাবাকাত ছিল মানুষের বিভিন্ন প্রজন্মের জীবন ইতিবৃত্ত : But it upon a plan which lists dintinguished compamions and sueecssor in order of seniority in Islam.[৪] তাবাকাতে ইসলামি ইতিহাস রচনাশৈলীতে স্থান-কাল বিভাজনের প্রাথমিক নমুনা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন শহরভিত্তিক জীবনী একই জ্যেষ্ঠতা ও ইতিবৃত্ত পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত হয়। মহানবীর ছিল সংগ্রামী জীবন; অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহে তিনি নেতৃত্ব দেন। তাঁর যুদ্ধ বিষয়ক বিবরণ লেখেন মদিনার মুসা বিন উকবাহ (মৃ. ৭৫৮ খ্রি.) এবং আল ওয়াকেদী (মৃ. ৮২২ খ্রি.)।[৫] যুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থকে বলা হয় কিতাবুল মাগাজী। তাঁর মাগাজীতে মহানবী একজন বিধায়কের তুলনায় রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রস্ফুটিত হয়েছেন। এর ফলে তার ইতিহাস হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বিবরণ। হাদিস হতে খবরের পৃথকীকরণের সূচনাও তার মাগাজী গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়।[৬] আরবদের গৌরবময় বিজয় অভিযানও এ সময় অনেক ঐতিহাসিকের উপজীব্যে পরিণত হয়। মিশরের ঐতিহাসিক আব্দুল হাকাম (মৃ. ৮৭০ খ্রি.) ফুতুহুল মেসর ওয়া আখবারুহা প্রণয়ন করেন।[৭] ইরানী আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আল বালাজুরী (মৃ. ৮৯ খ্রি.) রচনা করেন ফুতুহুল বুলদান এবং আনসাবুল আশরাফ। প্রথম পুস্তকে তিনি বিভিন্ন নগর শহর জয়ের অসংখ্য কাহিনী গ্রন্থিত করেন।[৮] দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি বংশ লতিকার ইতিহাস রচনা করেন। বস্তুত বালাজুরী একক বিষয় ভিত্তিক ইতিবৃত্ত রচনার পরিসমাপ্তি টানেন। End of monograph a Typical form of historical compositon.[৯]

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আব্বাসী স্বর্ণযুগের প্রথমার্ধেই প্রাক ইসলাম যুগের পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসির উপাখ্যান, নবী চরিত, চরিতমালা, তাবাকাত, মাগাজী, বিভিন্ন দেশের বিজয় কাহিনী শাসক শ্রেণীর বংশ

লতিকা ইত্যাকার ঐতিহাসিক উপাদান আহরিত ও গ্রন্থিত হয় এবং ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পটভূমি রচিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নবী চরিত অথবা মাগাজী প্রণয়নের প্রধান আকর ছিল সুন্নাহ বা হাদিস; তাই ঐ পর্যায়ে খবর বা ইতিহাস রচনায় হাদিসের ইসনাদ পদ্ধতি ছিল অপরিহার্য। খবর বা বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি ছিল অবিচ্ছেদ্য আনুক্রমিক বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খল অর্থাৎ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে শেষ বর্ণনাকারী বা লেখক পর্যন্ত অন্তবর্তী অবিচ্ছেদ্য আনুক্রমিক বর্ণনাকারীর শৃঙ্খলই ইসনাদ পদ্ধতি। ইসনাদ এবং সংঘটনের সময়-বছর, মাস ও বার এর উপর গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্য ছিল বর্ণনার যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। তাই মূলত এই পদ্ধতিতে বর্ণনাকারীর সাধুতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরতা; ঘটনার ব্যাখ্যা বা বিচার বিশ্লেষণের উপর নয়। বস্তুত বিভিন্ন ইসনাদের মধ্য হতে এটিকে নির্বাচন করা এবং উপাত্তসমূহের বিন্যাস সাধনে লেখকের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের প্রয়োগের মধ্যে স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ সমালোচনা, তুল্যমান নির্ণয় এবং সিদ্ধান্ত টানার অধিকার লেখকের ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। হিট্টি বিষয়টি এভাবেই দেখেছেন : Each event is *related in* the words of eye witnesses or contempories and transmitted to the final narator, the author, through a chain of intermediary reporters. This lechninque served to develop exactitude as did also the insistence on dating occurances even to the month and day But the authenticity of the reported fact generally depended upon continuit of the chain (isnad) and the confidence in the intigrity of each reporter than upon a critical examination of the fact itself. Apart from the use of personal judgment in the choice of the series of authorities and in arrangement of the data the historian exereised very little of analysis, criticism, conparion or inference.[১০]

আরবি ভাষায় ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার মানসিক প্রস্তুতিকালে ইবনুল মোকাফফা (মৃ. ৭৫৭ খ্রি.) পাহলবী ইতিহাস পুস্তক খোদাইনামা আরবিতে মুলুকুল আজম নামে প্রকাশ করেন। অচিরেই পুস্তকখানি ইতিহাস রচনার মডেল হিসেবে গৃহীত হয়।[১১]

নবম শতাব্দীর শেষার্ধেই আরবি ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস রচনার সূচনা হয়। এ কাজ আরম্ভ করেন ইবনে কুতাইবা, সঠিকভাবে মোহাম্মদ ইবনে মুসলিম আদ দিনাওয়ারী। তিনি তার কিতাবুল মায়ারিফ রচনার পর ৮৮৯ সালে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তার সমসাময়িক প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী আবু হানিফা আহমদ ইবনে দাউদ দিনাওয়ারী প্রণয়ন করেন আল আখবারুওত্তেওয়াল। এ পুস্তকটি ইরানী মানদণ্ডে লিখিত

তৎকালীন বিশ্ব ইতিহাস। তিনি সেপাহা এবং দিনাওয়ারে বসবাস করতেন এবং ৮৯৬ সালে প্রয়াত হন। তারা দুজনই ছিলেন ইরানী। ঐ একই সময় ভূতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক ইবনুওয়াজিউল ইয়াকুবী ইতিহাসের সারসংকলন করেন। তৎকালীন জ্ঞানানুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে ৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তৃত ছিল। দশম শতাব্দীতে হামজা ইস্পাহানী তার পুস্তক তারিখ সিনি মুলুকুল আরজ ওয়াল আমারিয়া রচনা করেন। পুস্তকটি ইউরোপে পরিচিতি লাভ করে। তিনি ৯৬১ সালে প্রয়াত হন।[১২]

তাবারী

মধ্যযুগে নবম শতাব্দীর শেষে এবং দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ধারাবাহিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতি এক পরিণতি লাভ করে আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে জরীর আত্তাবারীর সময় (৮৩৮-৯২৩ খ্রি.) হতে। তার সময়কালটি ছিল আব্বাসী খেলাফতের প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংকটকাল; অথচ ইরানী জাতিসত্তার বিকাশকাল। তিনি পারস্যের পাহাড়ি অঞ্চল তাবারিস্তান প্রদেশের ক্ষুদ্র আমুল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর রায়নগরে মোহাম্মদ বিন হুমাইদ রাজীর নিকট পাঠ গ্রহণ করেন এবং এখানে প্রায় এক লাখ হাদিস রপ্ত করেন। রায় হতে তিনি বাগদাদ গমন করেন। বাগদাদে পৌছানোর পূর্বেই তার কাঙ্ক্ষিত শিক্ষক প্রয়াত হন, তবুও কিছু দিন এখানে অবস্থান করেন। এর পর বসরা ও ওয়াসিত ভ্রমণ করে কুফায় আগমন করেন। কুফায় অবস্থানকালে তিনি প্রায় এক লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন। কুফা ত্যাগ করে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আইনবিদ্যা অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। পুনরায় বাগদাদ ত্যাগ করে সিরিয়ায় বিভিন্ন শহর ভ্রমণ শেষে মিশরের ফুসতাত নগরে উপস্থিত হন। এখানে তিনি একজন আইনবেত্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং আইনশাস্ত্রে তার নিজস্ব বিচারধারা (মজহাব) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন; অবশ্য পরবর্তীকালে তা স্বীকৃত হয় নি।[১৩] ফুসতাত ত্যাগ করে পুনশ্চ বাগদাদ হয়ে তিনি তাবারিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন; কিন্তু অচিরেই তিনি বাগদাদে আবাসন গ্রহণ করেন। তাঁর বাগদাদের দিনগুলো খুব সুখকর হয় নি। এ সময় বাগদাদে সামাজিক অস্থিরতা ছিল। আহমদ ইবনে হাম্বলকে একজন আইন বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার না করায় হাম্বলীরা তাকে অপমান করে। তাঁর বাসা আক্রান্ত হলে পুলিশী হস্তক্ষেপে তিনি রক্ষা পান।[১৪] হাম্বলী সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত প্রত্যাহার করলেও সম্ভবত আমৃত্যু তাদের সাথে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় নি বলেই বাগদাদে তাঁকে সমাধিস্থ করতে তার অনুসারীদের বেগ পেতে হয়। হাম্বলীদের সাথে তার সম্পর্ক যাই থাক না কেন, তার সমাধিতে হাজার হাজার শোকাহত ব্যক্তির মিছিল এবং তার আত্মার শান্তির জন্য অগণিত লোকের কামনা তার জনপ্রিয়তারই প্রমাণ মেলে।[১৫]

ফিহিরিস্তে বলা হয় যে, জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ইসলামি বিশ্বের প্রায় সকল সংস্কৃতি কেন্দ্র ভ্রমণ করে হাজার হাজার হাদিস ও ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন।[১৬] এ জন্য তাকে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, তাই নয়, বরং একদিন তার রুটি জোগাড় করতে তার জামার আস্তিন পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠার সাথে তিনি এত উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করেন যে, সেগুলো বিভিন্ন পুস্তকে সুসংহত রূপ দান করতে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এবং প্রতিদিন ৪০ পৃষ্ঠা করে লিখতে হয়। বর্তমানে তাবারীর যে ইতিহাস গ্রন্থটি পাওয়া যায় তা হল তার নির্বাচিত সংকলন। মূল সংস্করণ ছিল এর চাইতে প্রায় দশ গুণ বৃহদায়তনের।[১৭] তিনি ছিলেন প্রতিভাধর পণ্ডিত, কোরআনের প্রথম শ্রেণীর ভাষ্যকার, বড় মাপের আইনবেত্তা, বৈয়াকরণ এবং অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তার পক্ষে এত লেখা কিরূপে সম্ভব হয়—তাঁর শিষ্য ইবনে কামিলের বরাত দিয়ে মারগলিউথ বলেন যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত অধ্যাবসায়ী এবং সুশৃঙ্খল ব্যক্তিত্ব। তিনি নিষ্ঠার সাথে দৈনন্দিন কর্মে রুটিন মেনে চলতেন। প্রতিদিন দুপুর হতে বিকাল পর্যন্ত কেবল লেখার কাজে আত্ম-নিয়োগ করতেন; বিকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোরআনের উপর বক্তৃতা করতেন; সন্ধ্যা প্রার্থনার পর আইন শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা করতেন। অনেক রাতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন।[১৮]

মৌলিক ঐতিহাসিক চিন্তনে এবং ইতিহাস রচনাশৈলিতে মধ্যযুগের ইতিহাসে তাবারী এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছেন। তার রচিত তারিখুর রসুল ওয়াল মুলুক তাকে অমরত্ব দান করেছে। দ্যা গ্যোজির সম্পাদনায় গ্রন্থটি ১৫ খণ্ডে প্রথম লেইডেন হতে প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগের বিশ্ব ইতিহাসের আদলে রচিত উক্ত গ্রন্থটি ছিল এক মহৎ কর্ম। আরবি ভাষায় এরূপ গ্রন্থ এটাই প্রথম এবং পরবর্তী গবেষক লেখকদের জন্য ছিল বড় ধরনের আকর গ্রন্থ।[১৯] অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক তাবারীর মত এত বড় মাপের একজন ধর্মতত্ত্ব বিশারদ অতীতের বিভিন্ন প্রজন্মের মানবীয় ইহলৌকিক কর্মকাণ্ডের উপর এরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করেন বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাবারীর অনুবাদক এ্যালডেন উইলিয়মস মনে করেন তার এরূপ কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে ছিল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা : It seems rather curious that he should have produced the master work of the ealy muslim Histriography and it is certain that he would not have done so had he not conceived it an oct of faith. মজার ব্যাপার লেখক স্বয়ং লক্ষ্য করেছেন যে, অতীতের মানবীয় কৃতি ও কর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময় তিনি ছিলেন ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত, নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ। It seems remarkablly frank vivid and free of overt religious treatment.[২০]

উল্লিখিত গ্রন্থে, তাঁর জ্ঞানানুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভ তথা প্রথম সভ্যমানব আদম হতে তাঁর সমসাময়িককালের ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, তার হিসেব মতে, প্রায় চৌদ্দ হাজার

বছরের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ সন্নিবেশিত হয়েছে।[২১] উক্ত পুস্তকে নবীদের ইতিহাস, প্রাচীন জাতিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করেন। আরব ইসলামের অভ্যুদয়ে বিশ্ব ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাই তিনি তার সাথে যোগ করেন সিরাতুন্নবী, তার মাগাজী, আরব বিজয়সমূহ এবং তাঁর সময়কাল পর্যন্ত উদীয়মান উম্মার ইতিহাস।

উক্ত গ্রন্থ রচনায় কি পদ্ধতি তত্ত্ব (methodology) অবলম্বন করেন তা অনুসরণ করা কঠিন নয়; তার পুস্তকে ইবনে ইসহাকের বিশ্বজনীনতা, ওয়াকেদীর ঐক্যমত্য এবং ইবনে আব্দুল হাকামের ঐতিহাসিক নীতিবাদ পরিলক্ষিত হয়; তার ইতিহাস রচনাশৈলীতে তিনি ইসনাদ পদ্ধতির ব্যবহার করেন। বর্ষভিত্তিক রোজনামচার মত ইতিবৃত্তমূলক ঘটনা প্রবাহ সাজানোর যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেন প্রাক-আধুনিককাল পর্যন্ত তা চলতে থাকে।[২২]

একজন ঐতিহাসিক কি উপায় অবলম্বন করলে মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতা এবং সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে—সে সম্পর্কে তাবারী ঐ পুস্তকের প্রথমেই তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, একজন ঐতিহাসিককে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়, তাতে ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা তার নিজস্ব মনোভঙ্গির স্পর্শ থাকা উচিত নয়। বর্ণনার ভ্রান্তি বা ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য লেখকের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, সে দায়িত্ব বর্ণনাকারীর Let him know that this is not to be attritbuted to us but to those who transmitted it to us and we have merely passed this one as it had been passed to us.[২৩]

কোরআনের ব্যাখ্যাতা হিসেবে কোরআনে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তাবারী প্রাক-ইসলাম বিশ্ব ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রয়োজনবোধ করেন। প্রাক ইসলামযুগে তাবারীর সামনে দুটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল: বাইবেলীয় ও পারসিক। প্রথমোক্ত বাইবেলীয় ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ইতিপূর্বে ইসলামের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। তাবারী পারসিক ঐতিহ্যকে ইসলামের ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে আগ্রহী ছিলেন। কেননা তার মতে পারস্যের মত অব্যাহত ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাচীনকালে আর কোনো জাতির ছিল না। তাই তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব।[২৪] তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, বাইবেলীয় ইস্রাইলী নবী বংশ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে পারসিকদের দ্বারা এবং ইরানী ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে ইসলামি উম্মার দ্বারা। সুতরাং প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইসলামের সমন্বিত খাতেই প্রবাহমান বলে তিনি ভাবেন। তিনি হিব্রু আদম এবং উত্তর নবীবংশের সাথে পারসি-আদম কায়ুমারসের রাজকীয় বংশের সম্মিলন ঘটান। আদম, নুহ, ইব্রাহিম, মুসা-ঈসা প্রমুখ নবী কাহিনী কোরআন ও সুন্নার আলোকে সংশোধিতরূপে ইবনে ইসহাকের প্রচেষ্টায় ইসলামি ঐতিহ্যে সম্পৃক্ত হয় এবং তাবারী সমসাময়িক পারস্য রাজন্যবর্গের সাথে তা গ্রন্থিত

করেন। এভাবে প্রাক ইসলাম বিশ্বের এক ধারাবাহিক তুলনামূলক ইতিহাস পুনর্গঠিত হয়। এরূপে তিনি ইসলামি উম্মার শিকড় বিশ্ব ইতিহাসের গভীরে প্রথিত করেন।

যাহোক প্রাক-ইসলাম বিশ্ব ইতিহাস পুনর্গঠনের মধ্যে তার একটি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। মানব সভ্যতার প্রারম্ভে ছিল আদম-শয়তানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তীকালে ঐ দ্বন্দ্ব বিশ্ব ইতিহাসে নবী ও রাজেন্যবর্গের মধ্যকার দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। এই দ্বন্দ্বই ছিল বিশ্ব ইতিহাসের উৎস, কাঠামো এবং পরিণতি। বিশ্ব ইতিহাসের ঐ দ্বন্দ্ব ও পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করাই ছিল তার একটি উদ্দেশ্য। প্রাচীন বিশ্ব ইতিহাস হতে এরূপ জ্ঞান পাওয়া যায় যে, আদমজাতের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা থাকলেও তার মধ্যে নিহিত আছে অনুশোচনাবোধ এবং অবশেষে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেরও ক্ষমতা; কিন্তু শয়তানরা সর্বদাই খোদাদ্রোহী এবং এর পরিণতি তাদের পতন। এটাই হল নীতিবাদী ইতিহাস। প্রাচীনকালের ইতিহাসের এটাই প্রধান দিক।[২৫]

উপরের আলোচনা হতে মনে হতে পারে যে, প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস হতে প্রাপ্ত নৈতিক তত্ত্বই কি ইসলামি উম্মার ইতিহাসের পটভূমি করতে চেয়েছিলেন তাবারী? বাস্তবে ব্যাপারটি তা ছিল না। বরং উক্ত গ্রন্থে ইসলামি উম্মার অংশ ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। এই অংশে আছে সিরাতুন্নবী যা তিনি ইবনে ইসহাক এবং ওয়াকেদী সরবরাহকৃত উপাত্ত দিয়ে পুনর্গঠিত করেন; আর একটি অংশে আছে ইসলামের বিজয় অভিযানের কাহিনী তা ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উম্মার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইতিবৃত্তমূলক ইতিহাস। ঐ তিনশ বছরের ইতিহাস রচনাশৈলী ছিল ভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন বছরের এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দিয়ে শিরোনাম করা হয়েছে এবং ঐ শিরোনামের অধীন যত ধরনের তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন তার সবগুলো বিশ্বস্ততার সাথে লিপিবদ্ধ করেন। মজার ব্যাপার কোনো ঘটনার উপর তার নিজস্ব মতামত বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায় না। প্রশ্ন হতে পারে এই অংশে হঠাৎ তাঁর ইতিহাস রচনাশৈলী অথবা তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন হল কেন? অবশ্য হিজরী পঞ্জিকা প্রচলনের সাথে সাথে ইতিহাস রচনাশৈলী ইতিবৃত্তমূলক হওয়াই ছিল স্বাভাবিক এবং নবম শতাব্দীতে অনেকে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। ইসলামি উম্মা অংশের ঘটনা প্রবাহের কোনো বিষয়ের উপর তাঁর মতামত ব্যাক্ত করা হতে বিরত থাকেন কেন? এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকু বলা যায় যে, তিনি মনে করতেন যে, ঐতিহাসিকরা মূলত বর্ণনাকারী; নিরপেক্ষ থেকে সকল তথ্য পরিবেশন করাই তার প্রধান দায়িত্ব। তিনি তার ঐ মনোভঙ্গিতে ছিলেন অটল। তিনি কোনো বিষয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেন নি; অথচ ঐ ঘটনা প্রবাহে অনেক প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যবহ বিষয় ছিল। ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গে অনেকে লিখেছেন এবং তাদের বক্তব্য পরীক্ষা করলে তাদের বিশেষ ঘটনার প্রতি পক্ষপাতিত্বও লক্ষ্য করা যায়। তাবারী ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গৃহযুদ্ধ—হযরত উসমানের হত্যার ঘটনার পুনর্গঠনে ইবনে ইসহাক, সাইফ এবং ওয়াকিদীর তথ্যের

উপর নির্ভর করেন—তাদের মধ্যেও কারো প্রতি বা কোনো ঘটনার প্রতি দুর্বলতা থাকলেও তাবারী আপনাকে নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখতে পেরেছেন। তিনি সকলের তথ্য বা বর্ণনা বিশ্বস্ততার সাথে লিপিবদ্ধ করেন–তিনি স্বয়ং ঘটনার সম্পাদনা অথবা যুক্তিসঙ্গত করার কোনো প্রয়াস না চালিয়ে এবং ঘটনার বিচার বিশ্লেষণের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এ কথাও সত্য যে he did attempt to minimise the damage by avoiding any reference to reports he considered morally repugnant.[২৬]

প্রাথমিক পর্যায়ে হাদিসের ইসনাদ—ইতিহাস রচনাশৈলী, এর কাঠামো এবং লেখন পদ্ধতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে; কিন্তু সময়ের অগ্রগতির তালে তালে ইতিহাসের স্থান-কাল-পাত্র বদলে যাওয়ায় ইসনাদ পদ্ধতি অকেজো বলে মনে হওয়ায় তাবারী তার নিজের সময়ের ইতিহাস রচনায় ইসনাদ পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে লেখেন 'কথিত আছে', 'আমার নিকট পৌঁছেছে'–ইত্যাদি। পরবর্তীকালে তার রচনাশৈলীর পরিবর্তন, তার স্থান-কালের সচেতনতা, তার মনের প্রচণ্ড গতিশীলতার স্বাক্ষর বহন করে। অজান্তে হলেও তাবারীর হাতেই খবর হাদিস ও ধর্মতত্ত্ব হতে মুক্ত স্বাধীন বিকাশের পথের সন্ধান পায়; এবং ইতিহাস বিদ্যার বিকাশ পথ উন্মোচিত হয়।

মাসুদী

আবুল হাসান আলী আল মাসুদী ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভিন্নধর্মী বিদগ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে আরবদের হেরোডোটাস বলা হয়।[২৭] সম্ভবত তাঁকে আরব থকিডাইডিসও বলা চলে, কেননা তিনি ইতিহাস রচনায় অনেকাংশে বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি মাগরিবের অধিবাসী ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন বাগদাদের বাসিন্দা এবং নবী সাহাবী আব্দুল্লা ইবনে মাসুদের বংশধর।[২৮] পাশ্চাত্য জগতে আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনে খলদুনের পরই মাসুদী সম্পর্কে অনেক বেশি গবেষণা হয়েছে। সাম্প্রতিকালে চার্লস পেল্লাই মাসুদীর উপর একটি মূল্যবান গবেষণা প্রবন্ধ লেখেন।[২৯] তরুণ মাসুদী একজন মোতাজেলী হিসেবে সত্যের সন্ধানে বাগদাদ ত্যাগ করে শিক্ষা সফর করেন। ৯১৫ সালে পারস্য ভ্রমণের সময় ইসতাখারে অবস্থান করেন। পরবর্তী বছরে ভারতে গমন এবং মুলতান ও মানসুরা হতে ক্যাম্বে, পরে সিংহল হয়ে চীন সাগর হতে প্রত্যাবর্তন করে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিভ্রমণ শেষ করে আফ্রিকার সুদূর জানজিবার পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। জানজিবার হতে ওমানে ফিরে এসে ক্যাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূল, পরে প্যালেস্টাইন, এ্যান্টিয়ক, সিরিয়া ভ্রমণ করেন এবং নানা উপাত্ত সংগ্রহ করেন। তার জীবনের শেষ দশকে সিরিয়া ও মিশরে অবস্থান করেন এবং তাঁর সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ছত্রিশটি শিরনামে বিশাল আয়তনের পুস্তক প্রণয়ন করেন।

তার সংক্ষিপ্ত সার মুরুজুজাহাব ওয়া মাদায়েনুল জওহার শীর্ষক একটি ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক বিশ্বকোষ গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান। তাহজিবুল আশরাফ তার অন্যতম গ্রন্থ।

গ্রন্থদ্বয়ের প্রারম্ভে বিভিন্ন শিরনামে অসংখ্য অধ্যায়ে বিভক্ত একটি সূচিপত্র আছে। সূচিপত্রের পর আছে গ্রন্থ বিবরণী এবং বিভিন্ন পুস্তকের মূল্যায়ন। মুরুজুজাহাব খুললে দেখতে পাওয়া যায় আধুনিক যুগের পাদটীকার মত লেখক পুস্তকের অভ্যন্তরে নির্দেশ করেন যে, অতিরিক্ত তথ্যের জন্য তার বিশেষ বিশেষ পুস্তক দ্রষ্টব্য। উক্ত পুস্তকের সপ্তম অংশে একটি অনুচ্ছেদের শেষে তিনি লিখেছেন যে, ইতিহাস রচনার পশ্চাতে তাঁর মধ্যে একটি অভিপ্রায় কাজ করেছে এবং তা হল তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য তিনি একটি সুশৃঙ্খল বিজ্ঞান (ইলমুল মনজুমুন) উপঢৌকন রেখে যেতে চান।[৩০] মাসুদী ছিলেন একজন উঁচুদরের বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিত্ব; তৎকালীন বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচুর লেখেন। তার এ সকল উদ্যোগ আয়োজন ছিল তাঁর ইতিহাস রচনার ভূমিকা মাত্র। তিনি মনে করতেন যে, ইতিহাস সকল মানব বিদ্যার (সাহিত্য-কলা-বিজ্ঞান) উৎস। তিনি মুরুজের একস্থানে ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ধারণার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। তারিফ উক্ত অনুচ্ছেদটি তার পুস্তকে উদ্ধৃত করেছেন। The supiriority of history over all other scienees is obvious, The loftiness of its status is recognized by any person of intelligence. None can master it nor gain certainly as to what it includes nor receive and transmit it except one who has devoted his life to knowledge grasped its true meaning, tasted its fruits, felt its true dignity and experienced the pleasure it bestows.[৩১] মজার ব্যাপার তিনি এ্যারিস্টটলীয় ঐতিহ্যধারায় লালিত হয়েও ইতিহাস সম্পর্কে তার এরূপ উঁচু ধারণা তার স্বাধীন মতামতেরই প্রকাশ। এ্যারিস্টটলীয় ঐতিহ্যে কাব্যের স্থান ইতিহাসের অনেক ঊর্ধ্বে। ইতিহাস সম্পর্কে এরূপ মতামত তাঁর পূর্বসূরিদের মধ্যে দেখা যায় না; উত্তরসূরিদের মধ্যেও বিরল। তারিফ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন : The elevated status of history encountered here has no paralel in any work of history before auther's time and scarcely any since.[৩২] বস্তুত প্রকৃতি জগৎ ও মানব জগৎ অধ্যায়নের মধ্য দিয়ে যে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার গড়ে উঠছে, মাসুদী তারই একটি সুবিন্যস্ত বিবরণ তার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি মনে করতেন যে প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে কার্য-কারণ বিধি দ্বারা শাসিত এবং তা সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞার নির্দেশক।[৩৩] বস্তুত মাসুদীর ইতিহাস হচ্ছে প্রকৃতির ইতিহাস যা সম্পৃক্ত হয়েছে প্রাচীন ও সমসাময়িক জাতিসমূহের মানব সংস্কৃতির সাথে।[৩৪] এ হতে মাসুদীর ইতিহাসের পরিসীমার আভাস পাওয়া যায়। এ কারণে তার ইতিহাস রচনাশৈলীতে নবতর পদ্ধতি গড়ে ওঠে। তাবারীর বর্ষভিত্তিক রোজনামচা ও ইসনাদ পদ্ধতির পরিবর্তে তিনি এক ধরনের বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস লিখন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন; তিনি

রাজবংশ, রাজা বা নরগোষ্ঠীকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধ করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ঐতিহাসিক উপাখ্যানও ব্যবহার করেন। সমাজ ও ঐতিহ্য সচেতন উদার বিজ্ঞান মনস্ক মাসুদী তার ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান কেবল ইসলামি উম্মার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি ভারতীয়, ইরানী, গ্রীক, রোমক, ইহুদী-সবই ছিল তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। তার মুরুজ গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের সুবিস্তৃত পরিসীমা. উপাত্তসমূহের বিন্যাস এবং বিষয় হতে বিষয়ান্তরে উপস্থাপন পদ্ধতি হতে সাধারণ পাঠকের মনে হতে পারে যে, সম্ভবত মাসুদী প্রকৃত ইতিহাসের বহির্ভূত বিষয়াদি উত্থাপন করেন। বাস্তবে ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। তিনি পাঠকের নিকট হতে প্রকৃতি ও ইতিহাসের প্রতি অনুসন্ধিৎসামূলক দৃষ্টিভঙ্গির চাইতে ইতিহাসে পরম বিজ্ঞানের প্রকাশ প্রত্যাক্ষণ করার আগ্রহের দাবি করতেন। এ কারণে তার ইতিহাস তার আগেকার প্রকৃতি বিষয়ক গ্রন্থসমূহের সাথে গ্রন্থিত করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবে তাঁর এরূপ প্রকৃতির মানব সভ্যতার ইতিহাসে সম্পৃক্ত করণের উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান প্রজ্ঞাময় ব্যবস্থা—মহান সৃষ্টিকর্তার মহা প্রজ্ঞার নিদর্শনের উপলব্ধিকরণ। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ধরিত্রির চারদিক; বছরের চার ঋতু, দেহের চার উপাদান, মানব জীবনের চার স্তর যেন একে অপরের সাথে বিস্ময়কর ভাবে ছন্দায়িত! পুনশ্চ ধরিত্রির শত অঞ্চল আবার প্রাচীনকালের সাতটি জাতিসত্তা যেন প্রমাণ করছে ইতিহাস ও মানব সংস্কৃতির উপর ভূপ্রকৃতির কি অদ্ভুত প্রভাব বিদ্যমান! প্রকৃতির মধ্যে যে বিধি ব্যবস্থা বিরাজমান এবং আল্লাহর পরিকল্পনানুসারে প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানব সমাজ কাঠামো এবং তাদের প্রবর্তিত যৌক্তিক বিধিবিধানের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিফলিত হয়। যে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় সে সমাজে আসে সমৃদ্ধি, যে সমাজে ন্যায় বিচার উপেক্ষিত হয়, সে সমাজের পতন ঘটে।[৩৫] তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের যৌক্তিক বিশ্লেষণের প্রয়োগ করেন। তাঁর দীর্ঘ গবেষণার মধ্য দিয়ে ভূপ্রকৃতির সাথে মানব সভ্যতার বিকাশের সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তার বিখ্যাত আবর্তনমূলক বিশ্বতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। মুরুজে তাই বলা হয় যে, আজকের সমুদ্র ছিল কালকের মরুভূমি। গতকালের আবাদী ভূমি, আজকের মরুভূমি। মুরুজে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। এতে কেবল নৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হয় নি বরং তিনি বিভিন্ন জাতিসত্তা, সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্থান ও পতন আলোচনায় বলেন যে মানুষ যদি গবেষণা ও অনুসন্ধানের পথ পরিত্যাগ করে অন্ধ অনুকরণ বা তাকলিদের পথ বেছে নেয় তাহলে তার ভ্রান্তি ও অসত্যে পতিত হয়–তাদের পতন হয় অনিবার্য।[৩৬] তিনি তার সমসাময়িক দু ধরনের পণ্ডিত সমাজের সমালোচনা করেন; তথাকথিত ধর্মতাত্ত্বিক যারা হাদিস ও সুন্নার আক্ষরিক ব্যাখ্যা দেন এবং যারা জ্যোতির্বিদ্যা ত্যাগ করে জোতিষী বা গণৎকারের খপ্পরে পড়েন। তাদেরকে তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তাঁর সমসাময়িক বিদ্বৎ সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা

করে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, প্রাচীন জাতিসমূহের মত ইসলামি উম্মাকে রহস্যময়তা ও বিচ্ছিন্নতা গ্রাস করতে পারে। তাঁর ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক আশঙ্কায় তাঁর লেখনির মধ্যে গ্রীক প্রাকৃতিক দর্শন, শিয়া ও মোতাজিলা মতাদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুক্তমনের অধিকারী মাসুদীই মধ্যযুগের প্রধান ঐতিহাসিক যিনি ইতিহাস অধ্যয়ন ও অনুশীলনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং দার্শনিক যুক্তি বিচার প্রয়োগ করেন। তারিফ তার মূল্যায়নে বলেন : As a result of these wide renging interests, he was the first Arab Muslim historian to apply the principls of scientific method and philosophical reasoning to the study of history, which he regarded as the goal towards which all his earlier endeavours had been a preparation.[৩৭]

মিসকাওয়াইয়া (মৃ. ১০৩০ খ্রি.)

দর্শন অধ্যায় আহমদ ইবনে মোহাম্মদ মিসকাওয়াইয়ার আবির্ভাবকালের বাস্তব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং দর্শনে বিশেষভাবে নীতিশাস্ত্রে তার অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য সময়ে তাবারী, মাসুদী এবং মিসকাওয়াইয়া মধ্যযুগের ইতিহাস রচনাশৈলী এবং ঐতিহাসিক চিন্তনে তিনটি বিকাশমান স্তরের প্রতিনিধি ছিলেন। মিসকাওয়াইয়ার মৃত্যুর পর ইতিহাস রচনা পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক চিন্তনে উভয় ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অবক্ষয় দেখা দেয়। দীর্ঘ অবক্ষয়ী যুগে ইবনে খলদুন অবশ্য ছিলেন ব্যতিক্রম ধর্মী।

তাঁর নৈতিক দর্শন প্রসঙ্গে তাহজিবুল আখলাক গ্রন্থটি আলোচিত হয়েছে। ইতিহাস প্রসঙ্গে তার দ্বিতীয় গ্রন্থ তাজারিবুল উমাম আমাদের আলোচ্য। রাজেন্যবর্গ এবং অভিজাত শ্রেণীর উপর লিখিত গ্রন্থটি ব্যতিক্রমধর্মী ইতিহাস। Long parable on the art of government বা প্রশাসনিক নীতিমালা অনেকাংশে সামরিক নীতি বিধানের মত।[৩৮] অনেকে মনে করেন প্রথমোক্ত গ্রন্থটি বৈক্তিক বা ব্যাষ্টিক নীতিমালা (microethics) নীতিমালা এবং তাজারিবাট সামষ্টিক (macroethics) নীতিমালা। এরূপ বক্তব্য যদি স্বীকৃত হয় তাহলে বলতে হবে যে, তিনি গ্রীকো-মুসলিম দর্শনধারা হতে কক্ষচ্যুত হয়েছিলেন। ব্যক্তিক বা সামষ্টিক নৈতিকতার মধ্যে ভেদ চিহ্ন টেনে তিনি ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৩৯]

ছটি অধ্যায় সম্বলিত তাহজিবুল আখলাখ রচনার কি উদ্দেশ্য ছিল তা তিনি একস্থানে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এমন এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে যা হতে কোনো সৎকর্ম নির্গত হবে এবং তা হবে সহজসাধ্য; প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আত্মার পরিচয় জানতে হবে এবং কি পন্থায় তার আত্মার পরিচয় জানতে

হবে এবং কি পন্থায় তার আত্মা নির্মল রাখা যায় তাই জানতে হবে।[৪০] তিনি আরো মনে করেন যে প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হলেও তার প্রজ্ঞা সর্বদা তাকে সৎপথে চালিত করে; তিনি আরো বলেন যে, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ মহৎগুণের বিকাশ ঘটাতে পারে সমাজেই অবস্থান করে; তিনি আরো মনে করেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত আদর্শ ব্যক্তিদের অনুসরণ করা। তিনি তার অভিজ্ঞতা হতে বুঝেছিলেন যে, প্রজ্ঞাবানরাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তবে এটাও সত্য যে, তাদের জীবন সুখের নয় এবং এ প্রসঙ্গে তিনি আবু বকরের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেন।[৪১] এরূপ পরিস্থিতিতে রাজন্যবর্গ ও অভিজাতদেরকে সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য তিনি তাজারিবুল উম্মা গ্রন্থটি রচনা করেন। বইটির নামের অর্থ জাতিসমূহের অভিজ্ঞতা এবং প্রচেষ্টার সাফল্য Experience of Nations and success of Endeavous। তত্ত্বগতভাবে পুস্তকটি বিশ্ব ইতিহাসের আদলে লিখিত মুসলিম বর্ষপুঞ্জিভিত্তিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ। কাঠামোগতভাবে পুস্তকটির বিচার করলে সাধারণ ইতিহাস রচনাশৈলী হতে এটা ভিন্ন ধরনের। এ পুস্তকের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন যে, রাজন্যবর্গ অথবা দায়িত্বশীল অভিজাতরা বাস্তবে রুগ্ন; তাদের সৎকর্মের জ্ঞানদান করার কোনো প্রয়াস এ পুস্তকে নেই বরং সরকার পরিচালনার জন্য অনেকগুলো আদর্শ উদাহরণ পুস্তকে বিবৃত করেন। পুস্তকটি তাই অতীতের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার।

গ্রন্থটি সুপরিকল্পিতভাবে লেখা। পরিকল্পনাটি এত কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে যে, এটাকে সাধারণ অর্থে ইতিহাস বলাই দায়। প্রথমত ঘটনা প্রবাহের কোনো সূত্রের উল্লেখ নেই; সর্বগ্রাহী না করার সযত্ন প্রয়াস আছে; বর্ষভিত্তিক ইতিবৃত্ত হলেও দিন তারিখ নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই। সমগ্র পুস্তকে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট, তা হল, যে সব ঘটনার মধ্যে তাঁর কাঙ্ক্ষিত বাস্তব শিক্ষা নেই সেগুলো তিনি গ্রহণ করেন নি। বস্তুত তাঁর পরিবেশিত ঘটনা প্রবাহ ছিল সুনির্বাচিত। মাগাজী অথবা আরব বিজয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যে সব ঘটনায় মানুষের কোনো ভূমিকা ছিল না বরং প্রাকৃতিক শক্তির হস্তক্ষেপের প্রধান্য ছিল সেগুলো তিনি গ্রহণ করেন নি। বস্তুত সুনির্বাচিত গল্প এবং ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ তিনি ইতিবৃত্তমূলক পরস্পরায় বিন্যাস করেন। এ হতে বেরিয়ে আসে পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতার আলো। বস্তুত পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি তাজাবিরের জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করেন। পুস্তকের নামকরণ তাই স্বার্থক।[৪২] তাজাবির অধ্যায়নে এই পুস্তকের পরিকল্পনা এবং ব্যবহৃত লিখন পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়। পুস্তকে পরিবেশিত ঘটনা প্রবাহ কেবল বর্ষভিত্তিক নয় বরং অনেকগুলো অংশ বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক অংশে একটি শিরনাম দেয়া হয়েছে এবং সে মর্মে একটি উদাহরণমূলক গল্পও পরিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন অংশগুলির শিরনাম এ ধরনের যেমন ক. একটি প্রচারণামূলক কর্ম (Khul'a); একটি চাতুর্যপূর্ণ কর্ম (Daha); একটি

সদুপদেশ (rajsadid), একটি বিচক্ষণতার কাজ (hazm), একটি ফন্দি-ফিকির (hela), একটি সৌভাগ্যমূলক ঘটনা (ittifaq hasan). একটি ছলনা (maker), একটি ষড়যন্ত্র (mekida) ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বিভিন্ন শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে সিয়াসাত (কূটকৌশল) অবলম্বন অভিজ্ঞতামূলক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এরূপ কূটকৌশলের মূলে তদবীর সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তদবীর বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সরকারি কার্যাবলীর সুব্যবস্থা এবং সঠিক দিক নির্দেশনা; ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস অনুধাবন করার যোগ্যতা, ঘটনা প্রভাবের গতি নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা এবং সকল প্রকার সম্ভাবনার মোকাবিলা করার মত প্রয়োজনীয় উপায় উদ্ভাবন ও সমাবেশ করার দক্ষতা।

তার তদবীর ধারণার মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য তিনি খলিফা মুক্তাদিরের রাজত্বকালের অর্থনৈতিক অপব্যবহারের চিত্র ফুটিয়ে মন্তব্য করেছেন যে এরূপ অবস্থার জন্য খেলাফতের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।[৪৩]

তদবীরের আর একটি বড় দিক হচ্ছে-সামরিক কৌশলের যথাযথ প্রয়োগ। তাজারিবে সামরিক দক্ষতা বা অদক্ষতা, রণক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য কৌশল, সামরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব, ভাল গোয়েন্দা ব্যবস্থার মূল্য ইত্যাকার বিষয়ের উপর অসংখ্য উদাহরণ টেনেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন যে, রণক্ষেত্রে শত্রুকে বুদ্ধিতে পরাভূত করতে পারাই চাতুর্য। যুদ্ধ চাতুর্য তখনই কার্যকর হয় যদি সেই সাথে প্রয়োজন কূটনৈতিক কৌশল; ধৈর্য ও প্রয়োজন। তা না হলে চাতুর্য কোনো কাজে আসে না। সামরিক পরিকল্পনা কার্যকর হয় না। এ সম্পর্কে তিনি বুওয়াইহী সুলতান বখতিয়ারের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সুলতান বখতিয়ার তার প্রতিপক্ষ ইমরানকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করবেন বলে শিকারে যাওয়ার ঘোষণা দেন। বাস্তবে তার আর কোনো প্রয়োজনীয় তদবির ছিল না। ইমরান এটা অনুধাবন করে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাকে শান্তি ভিক্ষা করতে বাধ্য করেন।[৪৪]

বিগত দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে তিনি অসংখ্য ঘটনা ও কাহিনীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন; তা হতে একথাই বেরিয়ে আসে যে যুদ্ধ ও কূটনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন সমৃদ্ধ খাজাঞ্চি। মিসকাওয়াই মনে করেন একটি দক্ষ সরকারের জন্য প্রতি মুহূর্ত তদারকি এবং পরিচর্যার দরকার এবং যথা সময় সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ হতে হয় যে, এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় নিরর্থক নয়, তদুপরি সরকারি আমলা কর্ম বা অভিজাত সদস্যদের সাথে বৈরীতা এড়াতে হয়। যদি তা সম্ভব না হয় তবে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করাই সফল সরকারের অভিজ্ঞতা।

তাজাবির হতে হয়তো একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। মিসকাওয়াই এর তাজাবিরে কি কোনো নৈতিক বিধিমালা জড়িত? তাজাবিরে প্রথমে তিনি বলেন যে

বাজত্বেব স্বার্থে ধর্ম নিবিড়ভাবে জড়িত। পুস্তকেব শেষে তিনি অদৃষ্টেব উল্লেখ কবেন, তা হতে মনে হতে পাবে যে মানুষেব সফলতা ও বিফলতায অদৃষ্টেব হস্তক্ষেপ থাকে। বাস্তবে যদি আমবা মধ্যযুগেব মূল্যবোধেব কথা ভাবি তা হলে সম্ভবত এরূপ প্রশ্ন অনেকাংশে অবাস্তব হযে পড়ে। সেদিনেব সমগ্র মূল্যবোধেব উৎস ছিল ধর্ম। একে এড়িযে কোনো চিন্তন সম্ভব ছিল না, তবুও সে যুগেব যেসব প্রতিভাবান ব্যক্তি যতটুকু মুক্ত মনেব পবিচয দিয়েছেন তাদেব অন্যতম ছিলেন মিসকাওযাই। এ জন্য তাবিফ মন্তব্য কবেন যে Goverment is not an activity that takes place on the moral plane and that history can only be of value if it is abridged into a manual on the use and abuse of power [৪৫]

তথ্যপুঞ্জি (খ)

১ Tarif Khalidi Arabic historical thought in the classical period pp 39 40
২ Ibid pp 49 50 52 53
৩ Hitti op cit p 4 ও 88
৪ Tarif op cit p 46
৫ D S Margoliouth Lectures on Arabic Historian
৬ Tarif op cit p 48
৭ Margoliouth op cit pp 65 66
৮ Tarif op cit p 67
৯ Hitti op cit p 388
১০ Ibid p 389
১১ Ibid p 388 89
১২ Ibid p 389
১৩ Margoliouth op cit pp 105 75
১৪ Ibid p 207
১৫ Ibid p 202
১৬ Hitti op cit p 390
১৭ Ibid p 390
১৮ Margoliouth op cit pp 109 10
১৯ Hitti op cit p 390
২০ John Alden Welliams tra Tabari VI Introduction p XVI
২১ Tarif op cit p 75
২২ Tarif op cit p 73

২৩. Quoted in Tarif. op. cit p. 74
২৪. Ibid p. 78
২৫. Ibid p. 79
২৬. Ibid p. 81
২৭. Hitti. op. cit p. 391
২৮. Ibid p. 391
২৯. Tarif op. cit p. 132, F. N. 1
৩০. Ibid p. 132
৩১. Ibid p. 133
৩২. Ibid p. 133
৩৩. Ibid p. 134
৩৪. Ibid p. 135
৩৫. Tarif, Islamic History ..... p. 116
৩৬. Ibid p. 66
৩৭. Ibid p. 137
৩৮. Ibid p. 171
৩৯. Ibid p. 171
৪০. Miskawayh, Tahjibul Akhlaq p-1 quoted in Tarif p. 171
৪১. Ibid p. 173
৪২. Ibid p. 174
৪৩. Ibid p. 175
৪৪. Ibid p. 175
৪৫. Ibid p. 176

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সর্বোচ্চ মানসিক সংস্কৃতি : বিজ্ঞান-দর্শন

১৩.১ প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাগদাদ পরিভ্রমণ

মানব সভ্যতার মানস সম্পদ কখনো দেশকালের গণ্ডীতে বন্দি করে রাখা যায় না। যুগ যুগ ধরে দেশ ও কালের মানব মনিষা ও তার কৃতি গ্রহণ-বর্জন-উৎকর্ষ-সাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিলে তিলে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারকে করছে সমৃদ্ধ। তার দৈশিক বা কালিকরূপের নয়, বরং তার মর্মবস্তুর আবেদন সার্বজনীন ও সর্বকালীন। মানব সংস্কৃতির বিশ্ব পরিক্রমার ইতিহাস তাই এত চিত্তাকর্ষক। গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান কিরূপে আরব বিশ্ব পরিভ্রমণ করে পুনরায় আরবি পোশাকে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করে এবং এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান

মধ্যযুগে মুসলিম দার্শনিকগণ গ্রীক দর্শন বিজ্ঞানের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মুসলিম দার্শনিকরা এ্যারিস্টটলের দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলকে তারা প্রথম শিক্ষকের মর্যাদা দান করেন। গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের পশ্চিম এশিয়ায় আগমনের একটি ইতিবৃত্ত আছে। এ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পর (৩২২ খ্রি. পূর্ব) তার দার্শনিক শিষ্য ও শ্যালক থিওফ্রেস্টাস এ্যারিস্টটলের যাবতীয় রচিত এবং সংগৃহীত দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো হিফাজত করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৭ সালে তার মৃত্যুর পর ঐ জ্ঞানভাণ্ডারটি তদীয় শিষ্য নেলিয়াসের হস্তগত হয়। নেলিয়াস পরিবার গ্রীস ত্যাগ করে খুদে এশিয়ায় আবাসন গ্রহণ করেন। এবং জ্ঞানভাণ্ডারটি একটি গোপন কক্ষে লুকিয়ে রাখেন। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৩ সালে রোমকরা খুদে এশিয়া (Asia minor) সহ গ্রীক শাষিত দেশগুলো অধিকার করলে নেলিয়াস পরিবার ঐ মনন সম্পদ রক্ষা করতে পারবেন না ভেবে বিক্রির জন্য বাজারে ছেড়ে দেন। এথেন্সের একজন বিদ্যুৎশাহী শাসনকর্তা এপ্লিকনাস তা ক্রয় করে রক্ষা করেন। রোমক সেনাপতি সালরাসেল এথেন্স জয় করে এ্যারিস্টটলের পুস্তকসহ গ্রীসের অসংখ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তক রোমে স্থানান্তিত করে জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করেন। এই গ্রন্থাগার বোদ্ধা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১] এখানে পুনরায় গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে মিশর সেনাপতি টলেমীর অধিকারভুক্ত হয় এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭ সাল পর্যন্ত তা টলেমী বংশের অধীনে থাকে এবং ক্রমশ মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া বিদ্যাকেন্দ্র হিসেবে দ্বিতীয় এথেন্সে পরিণত হয়। রোমে খিষ্টধর্মের প্রচার যখন প্রবল হয় তখন গ্রীক দর্শনের পঠন পাঠনের শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল

আলেকজান্দ্রিয়া। তবে এ সময় আলেকজান্দ্রিয়ায় নব্য প্লেটোবাদী দর্শনেব পঠন-পাঠন ব্যাপকতব হয়। প্লেটো অনেক যত্নে যে কল্প জগৎ গড়ে তুলেছিলেন নব্য প্লেটোবাদী-দেব দ্বাবা তা আবো সমাদৃত হয। প্লেটো প্রয়োগবাদের চেয়ে বুদ্ধিব উপব জোব দিয়েছিলেন কিন্তু নব্য প্লেটোবাদীগণ সমাধিপ্রাপ্তি ও আত্মা নুভূতিকে বুদ্ধিব চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেন। বস্তুত ভাবতীয় বহস্যবাদ ও নৈরাশ্যবাদকে প্লেটোব দর্শনেব সঙ্গে মিশ্রিত করে নব্য প্লেটোবাদ প্রতিষ্ঠিত হয।[২] এ দর্শনেব মর্মবাণী ছিল: ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জগৎ মায়া, ভ্রম ও ইন্দ্রজাল। ভাব জগতই যথার্থ সত্য। জীবন বিচ্ছিন্ন মানুষই সত্যের ও মানসিক শান্তিব সন্ধান পায। আলেকজান্দ্রিয়ায় নব্য প্লেটোবাদীদেব মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন ফিলোজুডিযাস (২৫ খ্রি. পূর্ব-৫০ খ্রি.)। তিনি প্লেটো ও ভাবতীয় দর্শনের সঙ্গে ইহুদি শিক্ষাব সমন্বয় সাধন কবতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁব কাজে বেশি সাফল্য লাভ করতে পাবেন নি, তবে প্লুটিনাস (২০৫-২৭১ খ্রি.) নব্য প্লেটোবাদেব একটি রূপদান কবেন।[৩] তিনি নব্য প্লেটোবাদী হলেও এ্যারিস্টটলেব গ্রন্থ পঠন পাঠন উপেক্ষা কবেন নি। প্লুটিনাসেব ছাত্র এবং আলেকজান্দ্রিযাব বিখ্যাত অধ্যাপক টায়ার নগরের পাবফিরিয়াস এ্যাবিস্টটলেব গ্রন্থেব বিববণ ও ভাষ্য লেখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনেক দিন আরব বিশ্বে তার লিখিত তর্ক শাস্ত্রেব পুস্তক ইসাগোজী এ্যাবিস্টটলেব বচনা বলে একটি ভ্রান্তি ছিল।

খ্রিষ্টান ধর্মেব উপব নব্য প্লেটোবাদের প্রভাব নিশ্চিত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণ দর্শনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। তারা জোব দিতেন জ্ঞান ও ব্যক্তিগত প্রযত্নের উপব নয় বরং বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের উপর। তারা দর্শনকে ভযঙ্কর মনে করতেন বলে ৩৯০ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ থিওফিলাস আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগাব ভস্মিভূত করেন। ৪১৫ সালে আলেকজান্দ্রিয়ার জোতির্বিজ্ঞানী থিওন এবং গণিতজ্ঞা কন্যা হাইপেসিযাকে ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানগণ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। ৫২৯ সালে বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান দর্শন শাস্ত্র পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করেন। ঐ বছর এথেন্স হতে ৭ জন দার্শনিক পালিয়ে ইরানে চলে আসেন। এ সময় ইরানের শাহান শাহ ছিলেন নৌশেরোয়া। যদিও তিনি দেশের সাম্যবাদী সংস্কারপন্থী মাজদাকীদেরকে হত্যা করেন, তথাপি তিনি তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় দান করেন। শাহান শাহ এসব গ্রীক পণ্ডিতদের সহযোগিতায় জুন্দে শাহপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে গ্রীকদর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হত। ইরানে-গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুবাদ কাজ শুরু হয়। যাহোক ৫৪৯ সালে ইরান-বাইজানটাইনের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলে ৫ জন দার্শনিক এথেন্সে প্রত্যাবর্তন করেন; কিন্তু ডুমাসিয়াস, সিম্প লিসিয়াম ইরানে অবস্থান করেন।[৪] এভাবে ইরানে গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হতে সিরিয়া তৎকালীন বিশ্ব বাণিজ্যে একটি স্থান করে নেয়। বাণিজ্য সূত্র ধরে সিরিয়ার বণিক সমাজ গ্রীকো-রোমক সভ্যতার ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করে।

সিরিয়ার পণ্ডিতরা কেবল জুন্দে শাহপুরে নয় রবং ইরান অধিকৃত সিরিয়ার নিসিবিস শহরেও দর্শন চর্চা চালু করেন। এখানে নেস্টোরীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম শিক্ষার সাথে গ্রীক দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত। বস্তুত চতুর্থ শতাব্দী হতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সুরিয়ানী ভাষায় মেসোপটেমিয়া ও নিসিবিস বিদ্যালয়ে প্রচুর গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের পুস্তক অনূদিত হয়। এ সময় সার্জিয়াসের অনুবাদ কর্ম ছিল সর্বাধিক। উল্লেখ্য সিরিয়ায় দর্শন শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে যাজকরা ৫৯০ সালে একটি আইন প্রবর্তন করে। ধর্ম শিক্ষায়তনে দর্শন শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। যাহোক ইসলামের উত্থানের পূর্বেই ইরান এবং তৎকালীন বৃহত্তর সিরিয়ায় গ্রীক দর্শন বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং সুরিয়ানী ভাষা দর্শন বিজ্ঞানের ভাষায় পরিণত হয়।[৫]

প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার উত্তরাধিকার : আব্বাসী মেধার বিকাশ

উমাইয়া যুগে আরব বিশ্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেশ জয়, সাম্রাজ্য স্থাপন এবং তাদের বেদুইন জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধন। তাদের তৈরি আর্থ-সামাজিক অনুকূল পরিবেশে আব্বাসী স্বর্ণযুগের বৈশিষ্ট্য কেবল রুচিশীল আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা গঠনই নয়, বরং মেধার বিকাশ সাধনই ছিল তার মাহত্ব ও গৌরব। হিট্টির ভাষায় : The luxurious scale of living made this period popular in histony and fiction, but what has rendered this age especially illustrious in world annals is the fact that it witnessed the most momentous intellectual awakening in the history of Islam and one of the most significant in the whole history of thought and culture.[৬]

আব্বাসী সুবর্ণযুগে আরব নেতৃত্ব যে উদার মানসিকতার পরিচয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন মধ্যযুগে তার দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাদের বিজিত দেশসমূহের উন্নত সংস্কৃতির গুরুত্ব অনুধাবনে তাদের গুণগ্রাহিতার নির্দেশ করে। আরব মরুভূমি হতে কাব্যিক ঐতিহ্য ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতটুকু তারা তাদের সাথে নিয়ে এসেছিল? তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের ছিল প্রচণ্ড বৌদ্ধিক ঔৎসক্য। এতক্ষণে দেশ জয়ের নেশা কেটে গিয়ে বৃদ্ধি পায় তাদের জ্ঞান তৃষ্ণা। এ কারণেই বাগদাদ নগর প্রতিষ্ঠার কয়েক দশকের মধ্যে আরব বিশ্বে হেলেনীয় জ্ঞানভাণ্ডারসহ ইরানী ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য পুস্তক তাদের দখলে আসে।[৭] বস্তুত তারা বিলীয়মান বিশ্ব সভ্যতার রক্ষণাবেক্ষণের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এ সময় বিশ্বসভ্যতা হেলেনীরূপ পরিগ্রহ করে। হিট্টি যথার্থ বলেন: This culture, it should be remembered was fed by a single stream, a stream with sources in ancient Egypt, Babylonia, Phoenecia and India, all flowing of Greece and now returning to the east in the form of Hellenism.[৮] বস্তুত এটাই বিশ্ব সভ্যতার বিকাশধারা। আব্বাসী স্বর্ণ যুগে এই ঐতিহাসিক চেতনা লক্ষণীয়।

তাদের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহের দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায় আব্বাসীদের রাজত্বের প্রথম হতে মামুনের ক্ষমতারোহণ পর্যন্ত। এটি অসংগঠিত যুগ। এ সময় দেশের ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং ইসলামে নব দীক্ষিত পণ্ডিতরা স্বাধীনভাবে অনেক পুস্তক অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল মামুন ও পরবর্তী কয়েক বছর—এটি সংগঠিত যুগ; মামুন এ সময় বায়তুল হিকমাত নামক একটি সেমিনারি প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠিতভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের আরবি অনুবাদের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।[৯]

আব্বাসী বিপ্লব উত্তর প্রশাসনে ইরানী প্রভাব অনস্বীকার্য। উদীয়মান আরব বিজ্ঞান মনস্কতার ক্ষেত্রে পারস্যের অবদান না থাকলেই নান্দনিক ক্ষেত্রে ইরানী অবদান ছিল প্রচণ্ড। আব্বাসী শাসনের শুরুতে ফারেসের অধিবাসী ইসলামে নবদীক্ষিত জোরস্ত্রীয় আব্দুল্লা ইবনে মুকাফফা কালিলা ওয়া দিমনা বা বিদপাই গল্পগুচ্ছ পাহলবী হতে আরবিতে অনুবাদ করে আরব শিল্পকলা ও সুকুমার সাহিত্যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।[১০] মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি দাবাখেলাসহ শাহান শাহ নওশেরোয়ার রাজত্বকালে (৫৩১-৭৮ খ্রি.) ভারত হতে আমদানি করে পাহলবী ভাষায় অনুবাদ করা হয় This book intended to instruct Princes in the laws of polity by means of animal fables তাঁর এ অনুবাদ কর্মটি ছিল উঁচুমানের কর্ম এবং আরবি ভাষা ও গদ্য সাহিত্যের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। Such literary works as al Aghani, Iqdul Farid... teem with referenes to earier Indo persian sources, especialy when dealing with etiqette wisdom, polity and history.[১১] বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এই আরবি অনুবাদের আরো গুরুত্ব এ জন্য যে, পাহলবী এবং সংস্কৃতি ভাষায় মূল পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, যদিও এর বিষয়বস্তুর অংশবিশেষ পাঞ্চতন্ত্র এবং মহা ভারতে পাওয়া যায়। যাহোক আধুনিককালে প্রায় ৪০টি ভাষায় আরবি গ্রন্থ হতে অনুবাদ করা হয়েছে।[১২]

জনৈক ভারতীয় পর্যটক ৭৭১ সালে ভারতের ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত (সিন্দ-হিন্দ) নামক একটি জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তক বাগদাদে আনেন; খলিফা আল মনসুরের নির্দেশে পুস্তকখানি অনুবাদ করেন মোহাম্মদ বিন আল ফাজারী (৭৯৬-৮০৬ খ্রি.)। এই অনুবাদককে আরবদের প্রথম জ্যোতির্বিদ বলা হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আল খাওয়ারিজম তার জ্যেতিষী সারণী নির্মাণে ঐ পুস্তকটি সাহায্য করে। মরু জীবন হতে আরব মনে তারকামণ্ডলী ঔৎসক্য জাগ্রত রাখলেও এ পুস্তক দ্বারাই জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পাঠের সূচনা হয়। পবিত্র কাবাগৃহের দিক নির্ণয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কোনো বিকল্প ছিল না। একই সময় ফজল বিন নওবাত জ্যোতির্বিদায় ফারসি গ্রন্থের আরবি অনুবাদ করেন। একই পর্যটক ভারতীয় গণিত শাস্ত্রেরও একটি পুস্তক বাগদাদে আনেন। আরবরা ভারতীয় অঙ্ক পাতন পদ্ধতি রপ্ত করে এবং ভারতীয় সংখ্যার ব্যবহার শেখেন যা পরবর্তীকালে ইউরোপে আরব সংখ্যা বলে পরিচিত হয়। তারা ভারতীয় গণিতের বিন্দু দশমিক পদ্ধতি ও শূন্য (০) জ্ঞান অর্জন করে। এভাবে আরবদের সামনে

ভারতীয় উপমহাদেশের বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ সাহিত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়।[১৩] তারা তার সদ্ব্যবহার করেন। ৭৬৫ সালে খলিফা আল মনসুর পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হন। অনেক বৈদ্য তাকে নিরাময় করতে ব্যর্থ হলে খলিফা জুন্দে শাহপুর হাসপাতালের নেস্টোরীয় খ্রিষ্টান চিকিৎসক জুরজিস বিন বখতিশুকে ডাকেন এবং তাঁর চিকিৎসায় তিনি রোগমুক্ত হন। উল্লেখ্য ৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানী শাহান শাহ্ নওশেরোয়ার আদেশে জুন্দে শাহপুর হাসপাতালটি নির্মিত হয়। এখানে ইরানী ও সুরিয়ানী ভাষায় গ্রিক দর্শন বিজ্ঞানও শিক্ষা দেয়া হত। যাহোক খলিফা সন্তুষ্ট হয়ে জুরজিসকে রাজবৈদ্য পদে নিয়োগ করেন। একদা তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আহবান করা হলে তিনি তদুত্তরে বলেন যে, তিনি পিতৃপুরুষের ধর্ম-ত্যাগ করতে পারবেন না। তিনি ছিলেন বাগদাদ নগরের বিখ্যাত বৈদ্য পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। এই পরিবারটি ৬/৭ পুরুষ প্রায় দু'শ বছর ধরে সগৌরবে টিকে ছিল।

উর্বর অর্ধচন্দ্রের দেশ বিজয় সূত্রে আরবরা গ্রিসের মূল্যবান মানস সম্পদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন এবং এ সম্পদ আরব জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। বাইজানটাইন শাসনাধীন এই বিশাল অঞ্চলে এডেসা (রূহা) ছিল সিরীয় খ্রিষ্টানদের প্রাণ কেন্দ্র, হাররান ছিল পৌত্তলিক সিরীয়দের আবাসভূমি; তারা নবম শতাব্দীতে নিজদেরকে সিবীয় বলে ঘোষণা করে। এরা ছিল জ্ঞান তাপস সমাজ। এন্টিয়ক ছিল এতদাঞ্চলে অসংখ্য গ্রিক উপনিবেশের অন্যতম; আলেকজান্দ্রিয়া ছিল প্রাচ্য-পাশ্চত্য বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সেমিনারি। সিরিয়া মেসোপোটামীয়ায় খ্রিষ্টান মঠগুলোতে কেবল ধর্ম শিক্ষাই দেয়া হত তাই না, সেখানে গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হত। আরবদের বিজয়ের পরও সকল প্রতিষ্ঠানই পূর্বের মত টিকেছিল এবং গ্রিক জ্ঞান রশ্মী বিকিরণ করত। আব্বাসী খলিফাগণ এসবের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এজন্য ঐতিহ্যের সংরক্ষণে যত্নবান হন। মনসুর বাইজানটাইন সরকারের নিকট হতে ইউক্লিডসহ বহু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। বাইজানটাইনের সাথে যুদ্ধে খলিফা হারুনের আঙ্কারা ও এ্যামোরিয়ামে লুণ্ঠিত সম্পদের মধ্যে ছিল গ্রিক পাণ্ডুলিপি। খলিফা আল মামুন একবার গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার জন্য কন্সট্যান্টিনোপলে রাজদূত প্রেরণ করেন। আরবরা গ্রিক ভাষা জানতেন না বিধায় তাদেরকে অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হয়। ইহুদী, পৌত্তলিক এবং নেস্টোরীয় খ্রিষ্টান প্রজা পণ্ডিতগণ গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুবাদের কাজে সাহায্য করেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, সিরীয় নেস্টোরীয় খ্রিষ্টানরা তাদের প্রয়োজনে অনেক পুস্তক সুরিয়ানী ও এরামী ভাষায় অনুবাদ করেন। এবার তাঁরা সুরিয়ানী অথবা গ্রিক ভাষা হতে আরবি ভাষায় অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[১৪] মামুনের সময় উক্ত অনুবাদ কর্ম এবং গ্রিক প্রভাব চরমে ওঠে। ফিহিরিস্তের বর্ণনা অনুসারে একদা রাত্রে স্বপ্নে এ্যারিস্টটল চিন্তিত আল মামুনকে বলেন যে, ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। উভয়ই সত্যের অনুসারী। বিজ্ঞান মনস্ক মামুন ছিলেন মোতাজিলা-

বাদের প্রবক্তা, তাই তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম অবশ্যই যুক্তিবাদের সাথে সমাঞ্জস্য-পূর্ণ হতে হবে। এ জন্য তার মতাদর্শের স্বপক্ষে তিনি গ্রিক দর্শন বিজ্ঞানের সন্ধান করেন। আরব সাম্রাজ্যে গ্রিক দর্শন বিজ্ঞানে ব্যাপক প্রসার ঘটানোর জন্য ৮৩০ সালে বাগদাদের বিখ্যাত বায়তুল হিকমাত প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল হেকমাতে ছিল তিনটি শাখা : ক. গ্রন্থাগার, খ. পাঠদান: গ. অনুবাদ ব্যুরো। প্রাচীনকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় লাইব্রেরির মত এটা ছিল বিশ্ববিখ্যাত সেমিনারি। অনুবাদ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের অনুবাদ ব্যুরো সংগঠিতভাবে পরিচালিত করা হয়। বস্তুত আব্বাসী যুগের প্রথম এক শতক ৭৫০-৮৫০ সাল পর্যন্ত চলে। উল্লেখ্য এ অনুবাদ কাজ এরামী-সুরিয়ানী এবং সরাসরি গ্রিক ভাষা হতে চলতে থাকে। যে সকল অনুচ্ছেদের সঠিক অনুবাদ অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল সেগুলোর আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়। সে সব গ্রিক শব্দের আরবি প্রতি শব্দের অভাব ছিল সেগুলোকে ভাষান্তরিত না করে বরং আরবি উচ্চারণের সাথে সমন্বয় করে অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখা হয় : যেমন এ্যারিতম্যাতিকী, জুমাত্রিয়া, জিগ্রাফিয়া, মুসিকী, ফালসাফা, আস্তারলাব ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুবাদের সুবর্ণ যুগে গ্রিক সাহিত্য নাটক বা কাব্যের অনুবাদ কদাচিত হয়। জহার থাওয়াফিল (থিওফিলিস)বিন তুমা হোমারের ইলিয়ডের আংশিক অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সে যুগে আরব মনে তার কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এ অনুবাদটি পরে টিকে থাকে নি। অথচ অনুবাদক খলিফা আল মাহদীর রাজজ্যোতিষী ছিলেন। যাহোক বায়তুল হিকমাতে গ্রিক দর্শন বিজ্ঞানের প্রায় সকল গ্রন্থের অনুবাদ হয়।[১৫]

গ্রীকদর্শন বিজ্ঞানের অগ্রণী অনুবাদকদের অন্যতম ছিলেন আবু এহিয়া ইবনুল বাতরিকা। খলিফা মনসুরের নির্দেশে তিনি গ্যালেন এবং হিপোক্রাটিসের পুস্তক ছাড়াও টলেমীর কুয়াড্রিপারটিটাইম (Quadripar titime) এর অনুবাদ করেন। মাসুদীর বর্ণনা অনুসারে টলেমীর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তক আলম্যাজেস্ট এবং ইউক্লিডের এলিমেন্টের অনুবাদ করা হয়। বাস্তবে প্রাথমিক পর্যায়ের এ অনুবাদগুলো যথাযথ বিবেচিত না হওয়ায় খলিফা হারুনুর রশিদ ও মামুনের সময় পুনরায় অনুবাদ করা হয়। প্রথম পর্যায়ের অগ্রণী অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন সিরীয় খ্রিষ্টান ইউহান্না বিন মাসাওয়াহ। তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক জিব্রিলের ছাত্র এবং হুনাইন বিন ইসহাকের শিক্ষক ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তকের অনুবাদ করেন। পুস্তকগুলো খলিফা হারুন আঙ্কারা এবং এ্যামোরিয়াস যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সংগ্রহ করেন। ইউহান্না রশীদের উত্তরাধিকারীদের অধীনে রাজ কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

অনুবাদের যুগে হুনাইন বিন ইসহাককে বলা হয় (৮০৯-৭৩) অনুবাদকদের শেখ বা প্রধান। তিনি ছিলেন আলহিরার নিষ্টোরীয় খ্রিষ্টান এবং তার সমসাময়িককালের সর্বশ্রেষ্ট পণ্ডিত ও মহৎ চরিত্র। তিনি মুসা বিন শাকিরের তিন পণ্ডিত পুত্রের সাথে গ্রিক

ভাষাভাষী অঞ্চলে গ্রিক পাণ্ডুলিপির সন্ধানে গিয়েছিলেন। পরে তিনি মনসুরের রাজবৈদ্য জিব্রিল বিন বখতিসুর অধীনে চাকুরী করেন। মামুন তাকে বায়তুল হিকমাতের প্রন্থাগারের অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন এবং এই সূত্রে তিনি বিজ্ঞানের বই পুস্তকের অনুবাদের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। তদীয় পুত্র ইসহাক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হুবাইশ বিন আল হাসান তার সঙ্গে কাজ করেন। তিনি এদের দুজনকে অনুবাদ কর্মের প্রশিক্ষণ দান করেন। যে অসংখ্য পুস্তকের তিনি অনুবাদক হিসেবে পরিচিত সে পুস্তকের অনুবাদের কিছু অংশ ঐ দু ব্যক্তি ব্যতীত ইসা বিন ইয়াহইয়া এবং মুসা বিন খালেক করেছিলেন বলে মনে হয়। বস্তুত প্রায় ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে গ্রিক হতে সুরিয়ানী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং অন্যরা সুরিয়ানী হতে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। যেমন তিনি এ্যারিস্টটলের হারমেনিউটিকা (Hermeneutica) গ্রিক হতে সুরিয়ানীতে অনুবাদ করে দিলে তদপুত্র ইসহাক সেটা আরবিতে অনুবাদ করেন। বস্তুত ইসহাক এ্যারিস্টটলের পুস্তকের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক ছিলেন। হুনাইন গ্যালেন, হিপোক্রাটিস, ডাইওকোরিডিস (Dicoscorides) ব্যতীত প্লেটোর প্রজাতন্ত্রের অনুবাদ করেন। তিনি এ্যারিস্টটলের ক্যাটিগরি (মাকুলাত), পদার্থ বিদ্যা, ম্যাগনা মোবালিয়া (কুলিয়াত) এরও অনুবাদ করেন। উল্লেখ্য যে গ্যালেনের শরীরবিদ্যা (এনাটমি) উপর লেখা পুস্তকের মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু সবগুলোর আরবি অনুবাদ ছিল। তাই সেগুলোর উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

হাররানের সাবিয়ান সম্প্রদায় নেতা সাবিত বিন কুররা ছিলেন একজন বিখ্যাত অনুবাদক। এরা ছিলেন তারকা পূজারী। এ কারণে তারা যুগযুগ ধরে জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। মুতাওয়াক্কিলের সময় হাররান দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এরূপ অনুকূল পরিবেশে সাবিত ও তার শিষ্যদের উত্থান হয়। তাঁরা গ্রীক গণিত শাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যার অসংখ্য পুস্তক অনুবাদ করেন। তাদের অনুবাদকৃত গ্রন্থের মধ্যে ছিল আর্কিমেডিস (২১২ খ্রি. পূ.) ও পেরাগা এর এ্যাপোলোনিয়াসের (২২৬ বি সি) গ্রন্থ। সাবিতের পৃষ্টপোষক ছিলেন মোতাজিদ (৮৯২-৯০২ খ্রি.)। তার পুত্র সিনান, দু পৌত্র সাবিত (৯৭৪) ইব্রাহিম এবং মহা পৌত্র আবুল ফারাজ; সবাই ছিলেন বিখ্যাত অনুবাদক ও বৈজ্ঞানিক। তারা তাদের পূর্বের অনুবাদ গ্রন্থগুলো পরিমার্জন করেন। সাবিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাবিত বিন কোরবার পর আল বাত্তানী ছিলেন খুবই খ্যাতিমান অনুবাদক এবং বৈজ্ঞানিক। ল্যাটিন জগতে তিনি আলবাতেনিয়ান বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার প্রথম নাম আবু আব্দুল্লা মুহাম্মদ হওয়ায় মনে হয় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হাররান স্কুলের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আল হাজ্জাজ বিন ইবনে ইউসুফ বিন মাতাব (৭৭৬-৮৩৩ খ্রি.) তিনি ইউক্লিডের এলিমেন্ট এবং টলেমীর আল ম্যাজেস্টা অনুবাদ করেন। পরবর্তী বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন বালাবাকুর খ্রিষ্টান পরিবারের কস্তা বিন লুক (৯২২)।

ফিহিরিস্তের মতে তিনি ৩৪ খানি পুস্তকের রচয়িতা।[১৬] দশম শতাব্দীর শেষে জ্যাকবী খ্রিষ্টান অনুবাদকদের প্রধান ইয়াহইয়া বিন আলী এবং আবু আলী ইসা ইবনে জুরা এ্যারিস্টটলের সকল অনুবাদকৃত পুস্তকের পরিমার্জনার কাজ সম্পাদন করেন। এরাই মূলত আরব বিশ্বে নব প্লেটোবাদের প্রসার ঘটান।

বস্তুত বাগদাদে গ্রিক দর্শন বিজ্ঞানের অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই আরব পাঠকদের নিকট এ্যারিস্টটলের যাবতীয় পুস্তক সহজলভ্য হয়। ইবনে আবি উসাইবা এবং কিফাত বলেন যে, এ সময় এ্যারিস্টটলের প্রায় একশখানা পুস্তক পাওয়া যেত। দশম শতাব্দী আরব জগতের বৌদ্ধিক অর্জন প্রসঙ্গে হিট্টির মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেন: All this took place while Europe was almost totally ignorant of Greek thought and science for a while al Rashid and al Mamun were delvng in to Greek and persian philosophy their contemporaries in the west, Charlemagne and his lords, were reportedly dabbling in the art of writing their names.[১৭]

১৩.২ ইসলামি বিশ্বের বিজ্ঞান সাধনার গতি-প্রকৃতি

আব্বাসী সুবর্ণ যুগের এক শতাব্দীকাল কেবল শৈর্য-বীর্য, ধন-ঐশ্চর্য এবং যথাসম্ভব উন্নত জীবনমান এবং একটি সুধী সমাজের জন্য সমগ্র মধ্যযুগে বিখ্যাত ছিল তাই নয়, ঐ সময় তার আর্থ-সামাজিক বিকাশের সাথে চলে বিশ্ব সভ্যতার রক্ষণাবেক্ষণের ঐতিহাসিক কর্মযোগ। একদিকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা : পদার্থ বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে চলে গবেষণা, অন্যদিকে চলে জীবন জিজ্ঞাসা ও সৃষ্টি রহস্য উৎঘাটনের প্রয়াস। ঐ সোনালি শতকে ব্যাপক মননশীল কর্মোদ্যোগের পটভূমি রচিত হয়। ঐ দীর্ঘ সময়ে জ্ঞানার্জনের যে গতিবেগ সৃষ্টি হয় তা দ্বাদশ শতকের পূর্বে স্তব্ধ হয় নি বটে; কিন্তু তা আশানুরূপ ফুলে ফলে সুশোভিত হয় নি। উল্লেখ্য যে, নবম শতাব্দীর শেষার্ধে আব্বাসী খেলাফত গভীর রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত হয় এবং দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে খলিফা রাজনৈতিক ক্ষমতা-মঞ্চ হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তবে মধ্যযুগে ইউরোপের পোপের মত তাঁরা সমগ্র সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন; ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণের একচ্ছত্র অধিকার অর্জন করেন। এই সুযোগে বাগদাদের খলিফার দরবার হয়ে ওঠে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের আস্তানা। যেহেতু খলিফার বাস্তব ক্ষমতা (তাও মূলত ধর্মীয়) বাগদাদ দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখনো শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার সর্বগ্রাসী করাল ছায়া নিপতিত হয় নি—সে জন্য দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ঐ সোনালি যুগের প্রস্তুতি পর্বের গতিছন্দ একেবারে স্তিমিত হয় নি বরং

কিয়দপরিমাণে বিকশিত হয়। ঐ দু শতাব্দীর মননশীল কর্মকাণ্ডের ফলাফলের মূল্যায়নে এটাকে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়েব যুগ বলা সম্ভবত যথার্থ নয়; বরং বিশ্ব পরিসরে এটা মধ্যযুগে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলাই যুক্তিসঙ্গত। এ যুগের চিন্তনে মৌলিকত্বেব ঝলক থাকলেও অবক্ষয়ী রাজনৈতিক পরিবেশে তা আদৌ বিকশিত হতে পাবে নি বলেই তারা আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের স্রষ্টার আসনে বসতে পারে নি। তারা মধ্যযুগে চমক সৃষ্টি করে তাতে সন্দেহ নেই; তারা একটি অন্তর্বর্তীকালের সৃষ্টি কবে।[১৮] তারাই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বৌদ্ধিক পটভূমি বচনায় সহায়তা দেয়।[১৯] ঐ বেনেসাঁস ছিল আধুনিক সভ্যতাব পটভূমি। ঐতিহাসিক বিচারে মধ্যযুগে তাদের অর্জনকে খাঁট করে দেখার কোনো উপায় নেই।

তাবা তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এমন এক বাস্তব অবস্থায় শুরু করে যে, তাদের মৌলিক চিন্তন কালাতীর্ণ হতে পারা তো দূরের কথা বরং তাদেব চিন্তাধারায় যুগেব ছাপ পড়েছে প্রকটভাবে। তাবা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রগতি বিরোধী প্রবণতা প্রতিহত করতে পারে নি। এ কারণেই একাদশ শতকের শেষ প্রান্ত হতে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়েব মধ্যে স্থবির চিন্তা জগদ্দল পাথবের মত চেপে বসে যা আজকের আধুনিককালেও অপসারণ কষ্টসাধ্য বলে মনে হচ্ছে।

In fact in no branch of pure or physical science was any appreciable advance made after Abbasid days The Moslim of to day, if dependent on their own books, would have less than there distant ancestors in eleventh century In modern philosophy mathemhtics, Botany and other disciplines a certain point was reached, and then followed a stand still[২০]

যাহোক প্রথমে আমরা তাদেব বিজ্ঞান সাধনার গতি-প্রকৃতি ও অর্জন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

ক. চিকিৎসা শাস্ত্র : মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন হতে প্রত্যেককে আহার -বাসস্থানের সাথে স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখী হতে হয় বলে সভ্যতার উষালগ্নেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এ কারণেই প্রাচীনকালে চীনা, ভারতীয় এবং গ্রীক সভ্যতায় চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতি ছিল লক্ষণীয়। মধ্যযুগে প্রাচীন গ্রীক-ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করে আব্বাসী খেলাফত। আব্বাসী খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আল মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় বাস্তব জীবনের তাগিদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের রাজপথ উন্মুক্ত হয়। ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা রোগাক্রান্ত হন; রাজবৈদ্যরা তাঁকে নিরাময় করতে ব্যর্থ হয়; বখতিশু পুত্র জরজিস (জর্জ)কে রাজ দরবারে ডেকে পাঠান হয়। তিনি ছিলেন সাসানী সম্রাট নওশেরোয়াঁ কর্তৃক ৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জুন্দেশাহপুর হাসপাতালের ডীন,

এবং নেষ্টোরীয় খ্রিষ্টান সদস্য। খলিফা আরোগ্য লাভ করলে জরজিস তাঁর আস্থা অর্জন করেন। ধর্মান্তরণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেও খলিফা তাঁকে রাজদরবারের প্রধান চিকিৎসকের পদে নিয়োগ করেন। জরজিস বিন বখতিশু বাগদাদে স্থায়ী আবাসন গ্রহণ করে প্রথিতযশা চিকিৎসক পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পরিবারের ৬-৭ পুরুষ পরম্পরায় বাগদাদ নগরীতে প্রায় আড়াই শ বছর ধরে চিকিৎসা বৃত্তিতে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখেন। জরজিস পুত্র বখতিশু ছিলেন খলিফা হারুনুর রশীদ প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ হাসপাতালের অধ্যক্ষ। খলিফার স্নেহধন্য জনৈক দাসীকে রোগমুক্ত করতে সফল হলে বখতিশু পুত্র জিব্রিলকে খলিফা তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে নিয়োগ করেন। বছরে দু'বার রক্তক্ষরণ কাজের বিনিময়ে তাকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার দেয়া হত।[২১]

বাগদাদ নগরে চিকিৎসা বৃত্তির প্রতি ঐ পরিবারের একনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলশ্রুতিতে চিকিৎসাশাস্ত্রের কেবল উৎকর্ষ সাধিত হয় তাই নয়, এটা একটি লাভজনক সম্মানিত শিক্ষিত বৃত্তিতে পরিণত হয়। পরিবারটি খলিফা হারুনুর রশিদ, মামুন এবং বারমেকী উজির পরিবারের চিকিৎসক হিসেবে ৮,৮৮.০০,০০০ দিরহাম সঞ্চয় করেন। চিকিৎসা বৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা হতেন দার্শনিক পণ্ডিত, এ কারণে তৎকালীন সমাজে তাঁদেরকে বলা হত হাকিম।[২২]

চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি সাধন এবং বাগদাদ নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে খলিফা হারুনুর রশীদ প্রাচীন পারস্যের বিমারিস্তান মডেলে বাগদাদে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই মডেল হাসপাতালের অনুকরণে প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বে প্রায় ৩৪টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮৭২ সালে ইবনে তুলুন কায়রো হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তদুপরি একাদশ শতকে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। উল্লেখিত হাসপাতালে নারীদের জন্য মহিলা-ওয়ার্ড এবং মহিলা ডিস্পেন্সারি ছিল। এ সব হাসপাতালে থাকত গ্রন্থাগার এবং চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন, অনুশীলন ও অধ্যাপনার বিশেষ ব্যবস্থা।[২৩]

বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন অনুশীলনের সুযোগ থাকলেও সমাজে চিকিৎসার চাহিদা পূরণ হয় না দেখে অনেকে অবৈধ চিকিৎসা ব্যবসা ফাঁদে। এরূপ অবৈধ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য খলিফা মুকতাদির ৯৩১ সালে সিনান বিন সাবিত বিন কোররাকে চিকিৎসা পেশায়-রত সকলকে পরীক্ষা নিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা অনুমতি সনদ (ইজাজাহ) দান করার নির্দেশ দান করেন। এ ব্যবস্থায় বাগদাদ নগরের ৮৬০ জন চিকিৎসক সনদ লাভ করেন; বাগদাদ নগরীকে হাতুড়ে ডাক্তারমুক্ত করা হয়। খলিফা মুক্তাদিরের উজির আলী বিন ইসার নির্দেশে সিনান অনেকগুলো ডাক্তার নিয়ে একটি পরিদর্শক টিম তৈরি করেন। ঐ টিম বিভিন্ন স্থানে ঔষধ বিতরণ করত।

জেলখানাও পবিদর্শন কবত। সুবর্ণ যুগে আব্বাসী খলিফাদের উৎসাহে চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা বৃত্তিব উন্নতি হওয়ায় ঔষধ শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। ফার্মেসি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়: ঔষধেব দোকান গড়ে ওঠে, ভেষজ বিদ্যার উপব নানা পুস্তক প্রণীত হয়। বসায়ন বিদ্যাব প্রতিষ্ঠাতা জাবির বিন হাইয়ান ৭৭০ সালে ঔষধ বিজ্ঞানের উপর একটি গ্রন্থ বচনা কবেন। আল মামুন এবং মোতাসিমেব সময ঔষধ প্রস্তুতকাবীদেবকে সবকাবি অনুমতি লাভেব জন্য পবীক্ষা দিতে হতো। তদুপরি সরকাবি ফার্মাকোপীয়া বা ঔষধ বিধান প্রকাশ কবা হয। ঔষধ শিল্পেব বিকাশ সহজতব করাব জন্য উদ্ভিদ বাগান গডে ওঠে। উদ্ভিদ বিদ্যা ও লতাপাতাব ভেষজ গুণ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা কবতে বিদ্যার্থীদেব এসব উদ্ভিদ বাগিচা ব্যবহার কবতে হত।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বৃত্তিকে মধ্যযুগে সাম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক মানে উন্নীতকরণ, জনস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত কবাব জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে হাসপাতাল সংগঠন, চিকিৎসা বৃত্তি ও ঔষধ শিল্পেব উপব নিযন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক ক্রিযাকলাপ আব্বাসী স্বর্ণ যুগে জনহিতৈষণাব আদর্শ প্রতিষ্ঠা কবে। মধ্যযুগের ইউবোপ এতদ্বাবা প্রেবণা লাভ করে। হিট্টি বলেন Such facts show an intelligent interests in public hygine Unknown to the rest of the world at that time [২৪]

প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানেব উত্তবাধিকাব সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণেব যে দায়িত্ব মনসুর আপন স্কন্ধে উঠিযে নেন তাব একটি পবিণতি লাভ কবে খলিফা আল মামুনের সময। তাব প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাতের অনুবাদ কেন্দ্রে গ্রীক চিকিৎসাবিদ গ্যালেন, (জালিনস) হিপোক্রাইটিসেব এবং অন্যান্যদের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থেব আরবি অনুবাদ করা হয। হুনাইন বিন ইসহাক গ্যালেন, হিপোক্রাইটিস, ডাওসকোরাডেস এর মেটিরিয়া মেডিকা অনুবাদ কবেন। শরীব বিদ্যার (Anatomy) উপর লিখিত গ্যালেনের ৭টি পুস্তকের অনুবাদ করেন তদপুত্র ইসহাক। এ অনুবাদ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। গ্যালেনেব মূল গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যায়; একমাত্র আরবি সূত্র হতে গ্যালেনেব চিকিৎসা বিজ্ঞান ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করে।

অনুবাদ যুগে ইউহান্না বিন মুসওয়াই এবং হুনাইন বিন ইসহাক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রাখেন। ইউহান্না ছিলেন খ্রিষ্টান চিকিৎসাবিদ এবং জিব্রিল বিন বখতিশুর শিষ্য। সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আরবিতে চক্ষু বিষযক আল আশনব মাকালাত ফিল আযেন গ্রন্থটি রচনা করেন। হুনাইন বিন ইসহাকও চোখের উপর পুস্তক রচনা করেন। অনুবাদ যুগে লেখকদ্বয় চোখের উপর এ কারণে গুরুত্ব দেন যে, তৎকালীন ইরাক ও ইরানে চোখের অসুখ ছিল প্রচুর, তবে ইউহান্না মানুষের চোখ নিয়ে গবেষণার সুযোগ পান নি। ৮৩৬ সালে খলিফা মুতাসিম নুবিয়া হতে একটি বানর উপহার হিসেবে পেলে সেটার চোখের উপর গবেষণা চালান ইউহান্না।[২৫] এ ধরনের সামাজিক রক্ষণশীলতা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় সে

সম্পর্কে অনুবাদোত্তর মাত্র কয়েকজন চিকিৎসাবিদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা হতে সহজে অনুমান করা যায়। তাই অতি সংক্ষেপে আলী আত তাবারী, আররাজী, আলী ইবনে আব্বাস, আল মার্জুসী এবং ইবনে সিনার অবদান আলোচিত হল।

আলী আত-তাবারী

তাবারী রচিত কিতাবুদ্দীন এ তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুসারে তিনি ছিলেন খ্রিষ্টান পরিবারের সদস্য। মুতাওয়াক্কিলের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খলিফার ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে নিয়োগ লাভ করেন। ৮৫০ সালে ফিরদৌসুল হিকমাত শীর্ষক চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি সারসংকলন করেন। গ্রীক ও হিন্দু উৎস অবলম্বন করে তিনি ঐ পুস্তকে দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর আলোকপাত করেন।[২৬]

আররাজী

তাবারীর পর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া আররাজি (৮৬৫-৯২৫ খ্রি.) চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবির্ভূত হন। তিনি যে একজন বড় মাপের স্বতন্ত্রধর্মী বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন সে সম্পর্কে অন্যত্র আলোকপাত করা হবে। আধুনিক যুগেও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকল্টিতে রাজি ও ইবনে সিনার প্রতিকৃতি শোভা পায়। এটা ইউরোপে তাঁদের দর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদানের স্বীকৃতির প্রমাণ। ব্রাউনের মতে : He was the greatest and most orginal of all the muslim physician and one of the most profile as an author.[২৭] বুওয়াইহী সুলতান আজদুদ্দৌলার বাগদাদ হাসপাতালের স্থান নির্বাচনে তিনি এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। রাজি স্বয়ং এই হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন ছিলেন।[২৮] অস্ত্রপচারের জন্য তিনি সেটন আবিষ্কার করেন। ফিহিরিস্তে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি ১১৩টি বড় এবং ২৮টি ছোট আকারের পুস্তক রচনা করেন। এর মধ্যে ১২টি ছিল রসায়ন শাস্ত্রের উপর। রসায়ন শাস্ত্রের উপর লিখিত কিতাবুল আসরার পুস্তকটি ক্রেমনারের জিরারড ১১৮৭ সালে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন এবং চৌদ্দ শতকে জাবেরের পুস্তক প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত পুস্তকখানি ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্রের প্রামাণিক উৎস গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। পারস্যে অবস্থান কালে রাজী চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর কিতাবুল মনসুরী প্রণয়ন করেন। পুস্তকখানি সামানী প্রশাসক মনসুর বিন ইসহাককে ইৎসর্গ করেন। পনের শতকের আশির দশকে প্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়, পরে ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়। গুটি বসন্ত ও হামের উপর লিখিত আলজুদারি উল হাসরাহ ছিল সে দিনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ। হিট্টির ভাষায় : First Clinical account of small Pox পুস্তকখানি ভেনিসে ১৫৬৫ সালে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পর ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পুস্তকখানি তাঁকে ইসলাম ও মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ এবং চিকিৎসাবিদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। This treatise served

to establish Razi s reputation as one of the keenest original thinker and greatest clinician not only of Islam but of middle ages.[২৯] কিন্তু এটা তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটির নাম হাভী। আঞ্জুরাজা প্রথম চার্লসের সৌজন্যে পুস্তকটি ১২৭৯ সালে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ কবেন ইহুদী পণ্ডিত ফারহু বিন সলিম। পুস্তকটিব কনটিনেন্স শীর্ষক ল্যাটিন সংস্কবণ ১৪৮৬ সাল হতে বারবার মুদ্রিত হয। ১৫৪২ সালে পুস্তকটিব পঞ্চম সংস্কবণ মুদ্রিত হয় ভেনিসে। পুস্তকখানি ছিল সে যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ। এ পুস্তকে তাঁর মৌলিক অবদান ব্যতীত প্রাচীন গ্রীক, ইরানী এবং ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে সারসংক্ষেপণ ছিল। পুস্তকখানি যখন বারবার মুদ্রিত হয তখন ছাপাখানা ছিল একেবাবে প্রথম পর্যায়ে। তাব চিন্তাধারা মধ্যযুগে ইউরোপীয মনিষাব উপর লক্ষণীযভাবে প্রভাব বিস্তাব করেন। These medical works of Razi exercised for centuries of remarkable influence over the minds of Latin west[৩০]

আলী ইবনে আব্বাস আল মাজুসী (মৃ. ৯৯৪ খ্রি.) : বুওযাইহী সুলতান ফানা খসরু (আজদুদ্দৌলা) (৯৪৯-৮৩ খ্রি.) এব বাজত্বকালে আল মার্জুসী তার বিখ্যাত পুস্তক আল কিতাবুল মালিক প্রকাশ কবেন। সম্ভবত তিনি একজন জরস্ত্রীয় ছিলেন। পুস্তকখানি বাজীব হাভীর তুলনায় ছিল সংক্ষিপ্ত। ইবনে সিনাব ক্বানুন প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুস্তকটি ইউরোপে প্রামাণিক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হত। পুস্তকে রুগীর পথ্য, সাধাবণ মানুষেব খাদ্য খাদক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ছিল এবং পুস্তকের ঔষধ সংক্রান্ত আলোচনা সমৃদ্ধ। Among its original contributions are a rudimentary conception of the capilary system and proof that the parturition that child does not come out by itself but is pushed out by the muscular contraction of the womb.[৩১]

ইবনে সিনা

আর রাজীর পব মধ্যযুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইবনে সিনা ছিলেন সর্বাধিক বিখ্যাত। তাঁকে বলা হত শায়খুর রইস। চিকিৎসাবিদ হিসেবে নিঃসন্দেহে আর রাজী ছিলেন ইবনে সিনা অপেক্ষা বড়; ইবনে সিনা একজন চিকিৎসাবিদ অপেক্ষা বড় মাপের একজন দার্শনিক লেখক এবং একজন কবি। হিট্টি বলেন : In this Physician, Philosopher, Philologist and a poet, Arab science culminated and is, one might see, say incarnated.[৩২]

জনৈক ইসমাইলি আব্দুল্লার পুত্র আবু আলী আল হুসাইন ৯৮০ সালে বোখারার নিকটবর্তী আফসানে জন্মগ্রহণ করেন। ১০৩৭ সালে হামদানে সমাধিস্ত হন। তিনি ছিলেন আল মাসকাওয়াই, আলবেরুনী এবং ফেরদৌসির সমসাময়িক। যৌবনে

বোখাবার সামানী শাসক নুহ বিন মনসুর (৯৭৬-৯৭) কে আরোগ্য কবার কারণে উক্ত শাসনকর্তাব ব্যক্তিগত গ্রন্থাগাব ব্যবহাব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর সর্বোত্তম ব্যবহার করে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি লেখনি ধারণ করেন। আল কিফতী তাঁর ২১টি বড় এবং ২৪ টি ছোট গ্রন্থ তাঁব লেখনি তালিকাভুক্ত কবেছিলেন। তাঁর দুটি গ্রন্থ ছিল বিশ্ববিখ্যাত: ক কিতাবুশ শিফা ছিল বিশ্বকৌষিক ধরনেব দর্শন গ্রন্থ। এ্যারিস্টটলীয ঐতিহ্যভিত্তিক, তবে নব্য প্লেটো চিন্তাধারা দ্বারা সংশোধিত এবং ইসলামি ধর্মতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। খ. আল কানুনুত্তিব ছিল গ্রিসীয আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ সংকলন এবং মধ্যযুগে চিকিৎসা শাস্ত্রেব বিশ্বকোষ। বিষয়বস্তুর সমাহাব, তাদের সুসংবদ্ধ বিন্যাস এবং সুপরিকল্পিত উপস্থাপনা তৎকালীন চিকিৎসাশাস্ত্র সাহিত্যে পুস্তকটি এতই জনপ্রিয হয যে, ইউবোপেব মেডিকেল স্কুলসমূহের প্রামাণিক পাঠ্যপুস্তক হিসবে গ্যালেন, রাজী এবং মার্জুসীব গ্রন্থসমূহেব স্থান দখল করে।[৩৩] পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষ ত্রিশ বছরে পুস্তকটি ল্যাটিন ভাষায় ১৫টি এবং হিব্রু ভাষায় একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকের মেটিরিয়া মেডিকা অধ্যায়ে ৭৬০ প্রকারের ঔষধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। বস্তুত দ্বাদশ হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ সময ধরে পুস্তকটি ইউবোপেব চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান আকরগ্রন্থ ছিল। এ কারণে একে বলা হত চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইবেল।

যে যুগ ও সমাজে রাজি এবং ইবনে সিনার মত মনীষীর উত্থান হয় সে যুগ ও সমাজে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির একটি পর্যায়ে এসে থেমে গেল কেন? তারা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পথিকৃতের মর্যাদা অর্জন করতে ব্যর্থ হলেন কেন? কেন শৈল্য চিকিৎসায় অগ্রগতি হল না? বিভিন্ন উপাত্ত ও তথ্যের সমাবেশে আরোহ পদ্ধতিতে সামান্যিকরণ ও সূত্রায়ন প্রক্রিয়া বেশি দূর অগ্রসর হল না কেন? এব উত্তর প্রসঙ্গে বিষয়টি অন্যভাবে প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। মধ্যযুগে মানুষ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার পরিবেশ কি ছিল? মনুষ্য শবব্যবচ্ছেদের কি সামাজিক স্বীকৃতি ছিল? ইসলামি উদারতা কি এতদূর অগ্রসব হতে পেরেছিল? এর উত্তর 'না'। শব-ব্যবচ্ছেদ না করতে পারলে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে তাবা কিভাবে প্রামাণিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করবে। বস্তুত স্নায়ুতন্ত্র বা রক্ত সঞ্চালন ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে সে যুগে সম্যক জ্ঞান অর্জন ছিল অসম্ভব। এরূপ পরিস্থিতিতে অধিকতর অগ্রগতি কি সম্ভব? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের আলোচ্য সময়ে বিজ্ঞান চর্চা অব্যাহত ছিল প্রতিকূল অবস্থায়। এ সময় প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের গতি ছিল ভয়াবহ: প্রচণ্ড হতাশা সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে কুসংস্কার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে; বিজ্ঞান শিক্ষা নির্বাসিত হয়; সে স্থান দখল করে রহস্যবাদ, মায়াবাদ ও সুফিবাদ।

খ. জ্যোতির্বিদ্যা : মানুষের জ্ঞানোদয়ের উষালগ্ন হতে চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র সর্বদা মানব মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। মানুষের জীবনযাত্রায় এদের সহায়তার প্রয়োজনবোধ

হতে অনেকে এদেরকে তাদের উপাস্য বলেও কল্পনা করে। মানব মনের স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহল এবং প্রয়োজনের তাগিদ তাকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত প্রাচীন ভারত, চীন, ব্যাবিলন, মিশর সর্বশেষে গ্রীসে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়।

মধ্যযুগে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী আব্বাসী খেলাফতের সুবর্ণযুগে ৭৭১ সালে আল ফাজারী ভারতীয় ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্তের অনুবাদ করার পর হতে প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বে নিষ্ঠার সাথে জ্যোতির্বিদ্যার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ও অনুশীলন আরম্ভ হয়। এ শাস্ত্রে তাদের অগ্রগতি ছিল লক্ষণীয়। তারা পৃথিবীর আকার, চাঁদের উচ্চতার হ্রাসবৃদ্ধি এবং বিষুবের অগ্রগমন নির্ণয় করে। গ্রহপুঞ্জের গতি চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ এবং আবহাওয়া বিষয়ে নানা তথ্য আবিষ্কার করে। তারা টেলিস্কোপ, কম্পাস এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আবিষ্কার করে।

ভারতীয় ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত দিয়ে মুসলিম বিশ্বে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার সূচনা হলেও অচিরে পাহলবী জ্যোতিষ্ক সারণির অনুবাদ এবং টলেমীর আল ম্যাজিস্টা এর অনুবাদ এ বিদ্যা অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করে। হাজ্জাজ বিন মাতাব এবং হুসাইন বিন ইসহাক আল ম্যাজিস্টার প্রথম অনুবাদ করেন; কিন্তু সাবিত বিন কোররা সংশোধিত আকারে তার অনুবাদ করেন।[৩৪] জ্যোতির্বিদ্যার সঠিক অনুশীলনের জন্য জুন্দেশাহপুরে একটি বিজ্ঞান মানমন্দির নির্মাণ করা হয়। বাগদাদের শামসিয়া তোরণের নিকট মামুন আরো একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। এই মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন ইহুদী পণ্ডিত সিন্দ বিন আলী এবং ইয়াহইয়া বিন মনসুর। এই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে মামুনের জ্যোতির্বিদরা কেবল জ্যোতিষ্কমণ্ডলির গতিবিধিই পর্যবেক্ষণ করতেন তাই নয়, বরং তারা আল ম্যাজিস্টার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা, বিষুবের সঠিক সময়কাল নির্ধারণে সৌরবর্ষের দীর্ঘ্যতা সঠিক ফলাফলের সাথে পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা করেন।[৩৫]

এতদ্ব্যতীত মামুন দামাস্কাসের সন্নিকটে বাসিউন পর্বতশৃঙ্গে একটি পরীক্ষাগার নির্মাণ করেন। এটি কোয়াডান্ট, এ্যাস্ট্রল্যাব ডায়াল এবং মানচিত্র ইত্যাদি প্রকৌশলী যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। ইব্রাহিম ফাজারী ৭৭৭ সালে গ্রীক মডেলে প্রথম এ্যাস্ট্রল্যাব নির্মাণ করেন। ৮৩০ সালে আলী বিন ইসা এ্যাস্ট্রল্যাবী ঐ যন্ত্রের উপর একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন।[৩৬]

মামুনের জ্যোতির্বিদগণ গোলাকার ধরিত্রী তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভূমণ্ডলের পরিমাণ নির্ণয়ের মত জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজ পরিচালনা করে। পর্যবেক্ষণের কাজটি পরিচালিত হয় পালমীরার নিকট ইউফ্রেটিসের উত্তরে সিঞ্জার সমতল ভূমিতে। এই পরীক্ষার ফলে ধরিত্রীর পরিধি দাঁড়ায় ২০,৪০০ মাইল এবং ব্যাস ৬,৫০০ মাইল। এ কাজে অংশ নেন মুসা বিন শাকিরের পুত্রদ্বয় এবং সম্ভবত আল খাওয়ারিজমীও।

খাওয়ারিজম একটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীয় সারণী নির্মাণ করেন। এটি বাথের এ্যাডেলার্ড ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করলে ইউরোপে তা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় সারণী অকেজো হয়ে পড়ে।[৩৭]

এ সময় আবুল আব্বাস আহমদ আল ফারাগানী ছিলেন একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। খলিফা মোতাওয়াক্কিলের সময় ফুসতাতে নিলোমিটার (পানির পরিমাপ যন্ত্র) প্রতিষ্ঠার তদারকীর পূর্ণ দায়িত্ব তিনি পালন কবেন। তাঁর পুস্তক আল মুদাখিল ইলা ইলমি হায়াতুল আফলাক ১১৩৫ সালে সেভিলের জন এবং ক্রেমনারের জেরারড ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। তিনি পৃথিবীর ব্যাস নতুন করে পরিমাপ করেন এবং গ্রহসমূহের আপেক্ষিক দূরত্ব নির্ধারণ করেন। আল খাওয়ারিজম এবং ফারগানীর সমসাময়িক জ্যোতির্বিদ ছিলেন বানু মুসা। তিনি সূর্যের ক্রান্তিবৃত্ত নির্ধারণ করেন এবং প্রথমবারের মতো সূর্যের উচ্চতার হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য কবেন; বিষুবেব অগ্রগমন ও বহির্গমন এবং গ্রহসমূহের গতি নির্ধারণ করেন। প্রাচীন যুগ হতে এগুলো ছিল অনেক অগ্রগামী কাজ।

৮৭৭-৯১৮ এর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে জাবীর আল বাত্তানী (ইউরোপে আলবেতিনিয়াস নামে খ্যাত) ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। তিনি ছিলেন হাররানের সেবীয় সম্প্রদাযের শেষ অথচ শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং ইসলামেব ইতিহাসের খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ। তার নির্মিত জ্যোতির্বিদ্যাব ছক খাওয়াবিজমের সারণি হতে উন্নত। তিনি রাক্কার জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা পবিচালনা করেন। তিনি টলেমী সূত্রের সংশোধন করেন; চাঁদ ও বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথ গণনায় সংশোধন করেন; বার্ষিক সূর্য গ্রহণের সাম্ভাব্যতা প্রমাণ করেন; ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা, বছর ও ঋতুর দীর্ঘতা এবং সূর্যের কক্ষপথ সম্পর্কে গবেষণা করেন।[৩৮]

বুওয়াইহী সালতানাত আমলে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণা উৎসাহিত করা হয়। বুওয়াইহী সুলতান শারফুদ্দৌলাহ (৯৮২-৮৯) বাগদাদ প্রাসাদে একটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী গবেষণাগার স্থাপন করেন। এই মানমন্দিরে কর্মরত ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আব্দুর রহমান সুফি, আহমদ আস সাঘানী এবং আবুল ওয়াফা। আব্দুর রহমান আস সুফির কাওকাবুস সাবিতা ছিল তার সময়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রায়নগরে বুওয়াইহী সুলতান রুকনুদ্দৌলা (৯৩২-৭৬) এর দরবারে ছিলেন খুরাসানের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আবু কাফর আল খাজিম। তিনি ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা নিশ্চিত করেন এবং আর্কিমিডিসের সূত্রে একটি সমস্যা সমাধান করে ঘন সমীকরণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।[৩৯]

আবুল রায়হান মোহাম্মদ বিন আহমদ আল বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রি.) ছিলেন ইমাম আররাজীর মত একজন স্বতন্ত্রধর্মী প্রতিভাধর মৌলিক চিন্তাবিদ এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের একজন পণ্ডিত। তিনি ছিলেন শিয়া পরিবার সদস্য; খাওয়ারিজম (খিভা)

নগরের উপকণ্ঠ বেরুন ছিল তার জন্মস্থান। অংক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ইতিহাসে ছিল তার প্রচণ্ড দখল। তিনি ইবনে সিনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মাতৃভাষা তুর্কী ছাড়াও আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত, হিব্রু এবং সুরিয়ানী ভাষায় ছিলেন দক্ষ। সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভারত অভিযানকালে তিনি ভারত ভ্রমণ করেন এবং ভারতে অনেক দিন বসবাস করে ভারতীয় পণ্ডিতদেরকে গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকট হতে ভারতীয় দর্শন সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। ভারতীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তিনি বিখ্যাত পুস্তক তারিখুল হিন্দ রচনা করেন।[৪০] ১০৩০ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর লিখিত পুস্তক আল ক্বানুনুল মাসুদী ফিল হাইয়াতুন নুজুম তার পৃষ্ঠপোষক গজনী সুলতান মাসুদের নামে উৎসর্গ করেন। একই বছরে তিনি আততাহফিমুল আওয়াইল সিনাতুন তানজিম গ্রন্থটি প্রণয়ন করে। তাঁর প্রথম গ্রন্থটি ছিল আল আসারুল বাক্বিয়া আনেল কুরুনেল খালিয়াহ। এ পুস্তকে প্রাচীন যুগের পঞ্জিকা ও বছরসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এ পুস্তকে তৎকালীন বিতর্কিত বিষয় : ধরিত্রীর স্বীয় কক্ষে আবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা করে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা নির্ণয় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[৪১]

একাদশ শতকে আরো একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হয়। তিনি হলেন আবুল ফাতাহ উমর বিন ইব্রাহিম আল খাইয়াম। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের ইসলামের সর্বশেষ বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্ব। তিনি ১০৩৮-৪৮ এর মধ্যে নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই ১১২৩-৪ সালে প্রয়াত হন। একজন শ্রেষ্ঠ ফারসি কবি হিসেবে বিশ্বে অধিক পরিচিত হলেও তিনি ছিলেন মধ্যযুগে ইসলামের সর্বশেষ বড় মাপের জ্যোতির্বিদ। সেলজুক সুলতান মালিক শাহ কর্তৃক রায় বা নিশাপুরে বিজ্ঞান মানমন্দির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। তার নেতৃত্বে জালালী পঞ্জিকা রচিত হয়। এই পঞ্জিকাটি ছিল গ্রেগরী ক্যালেন্ডার হতে অধিক উন্নত এবং অধিকতর সঠিক।[৪২] এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

গণিত

আমাদের আলোচ্য সময়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের গণিত চর্চা জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়। জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সাথে বাগদাদে গণিতের অনুশীলন শুরু হয়। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভারতীয় গ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধান্তের আরবি অনুবাদের পরপরই আরব মনীষী ভারতীয় গণিতশাস্ত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মসিদ্ধান্তে আল ফাজারীর আরবি অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় গণনায় সংখ্যা পদ্ধতি, অঙ্কপাতন, দশমিক পদ্ধতি ও শূন্য-এর সাথে তাদের প্রথম পরিচয় ঘটে।[৪৩] ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত ব্যতীত সাবিত বিন কোররা গ্রীক গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং তিনি স্বয়ং

পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর কিছু পুস্তক রচনা করেন। হুসাইন বিন সাবিত ইউক্লিডের জ্যামিতি গ্রন্থের অনুবাদ করলে সাবিত তার পবিমার্জনা কবেন। কুস্তা বিন লুকা আর একটি গ্রীক গণিত পুস্তক অনুবাদ করেন। এরূপ ব্যাপক অনুবাদ কার্যক্রমের ফলে জ্যোতির্বিদ্যার পাশাপাশি পাটিগণিত ও জ্যামিতির অধ্যয়ন ও অনুশীলন শুরু হয়। মধ্যযুগে মুসলিম গণিতবিদদের মধ্যে খাওয়ারিজম হলেন প্রথম পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি গণিত বিষয়ে প্রথম মৌলিক গবেষণায় আপনাকে নিয়োজিত কবেন। তার নাম ছিল মোহাম্মদ বিন মুসা। তিনি ৭৮০ সালে মধ্য এশিয়ার আমুদরিয়ার ভাটিতে অবস্থিত খাওয়াবিজম নগর বা আধুনিক খিভায় জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৮৫০ সালে প্রয়াত হন। একাধারে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভুগোল শাস্ত্রে তাঁর অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যযুগে তিনি গাণিতিক চিন্তাধারার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা সারণি প্রস্তুত করেন। তার রচিত হিসাবুল জবব ওয়াল মুকাবিলা (Calculation of integration and equator) গ্রন্থটি বীজগণিতেব উপর প্রামাণ্য আঁকর গ্রন্থ হিসেবে মধ্যযুগে স্বীকৃতি লাভ করে। সম্ভবত তাঁব ঐ পুস্তকের (জবব) হতে এ্যালজাববা বা বীজগণিতের নামকরণ হয় বলে অনেকে মনে করেন। দ্বাদশ শতকে ক্রেমোনার জেরারড পুস্তকটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ কবার পর হতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণিক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সমাদৃত হয়। এই পুস্তকটি মূলত ইউরোপে বীজগণিত চর্চার প্রবর্তন করে।[৪৪] বস্তুত আল খাওয়ারিজমের পুস্তকসমূহের মাধ্যমে ইউরোপে আলগোরিজম বা আরব সংখ্যারীতির প্রচলন হওয়ায় খাওয়ারিজমের নাম ইউরোপীয় গণিত শাস্ত্রের ইতিহাসে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বীজ গণিতের দ্বিঘাত সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান করেছিলেন।[৪৫]

ভারতীয় গণিত শাস্ত্রের ঐতিহ্য তার সংখ্যারীতি এবং শূন্য আধুনিককালে যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য দিবালোকের মত স্পষ্ট; তৎকালীন আরব বিশ্বে তার ব্যবহার ও প্রসার ঘটে খাওয়ারিজমের পুস্তক হাবাগুল হাসিব (৮৬৭-৮৭৪ এর মধ্যে) এবং তাঁর তৈরি গাণিতিক সারণির মাধ্যমে। এই ভারতীয় মনীষার মহান আবিষ্কার আরব গণিতবিদরা সহজে গ্রহণ করেন বলে মনে হয় না। যদিও খাওয়ারিজমের সমসাময়িককালে আব্বাসী স্বর্ণযুগ শেষ হয় নি এবং প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভাটা পড়ে নি। তথাপিও ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব আদৌ সার্বজনীন হয় নি। তাই দেখা যায় একাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবু বকর মোহাম্মদ আর ফারাজী (১০১৯-১০২৯ খ্রি.)। তার পুস্তক আল কাফি ফিল হিসাব এবং অন্যান্য গণিতবিদরাও পুরনো সেমিটীয় ও গ্রীক পদ্ধতি অনুসারে বর্ণ বা অক্ষর দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করার রীতি অনুসরণ করেন। অবশ্য ১০৪০ সালে খোরাসানের গণিতবিদ আহম্মদ আন নাসাভী তাঁর আল মুকনি ফিল হিসাবিল হিন্দি গ্রন্থের কেবল ভারতীয় সংখ্যারীতিই অনুসরণ করেন নি এবং

গাণিতিক সমস্যাবলী তার ভাগ্নাংশ, বর্গমূল ইত্যাদির প্রায় আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

পরবর্তীকালে যে সব গণিতবিদ খাওয়ারিজম দ্বারা প্রভাবিত হন তাঁদের অন্যতম ছিলেন উমর খাইয়াম, ইটালির পিসানগরের লিওনার্দো ফিরোনাচ্চি (১২৪০ খ্রি.) এবং ফ্লোরেন্সের মাষ্টার জ্যাকব। এদের পুস্তক মুসলিম গাণিতিকদের প্রদত্ত ছয় প্রকারের দ্বিঘাত সমীকরণের উল্লেখ ছিল।[৪৬] উমর খাইয়াম বীজগণিতের প্রচুর উৎকর্ষ সাধন করেন। তার বীজগণিতের পুস্তকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণের জ্যামিতিক ও বীজ গাণিতিক যে সমাধান ছিল এতে সমীকরণের প্রসংশনীয় শ্রেণী বিন্যাস ছিল।[৪৭]

ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস। ইতালির ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকের বিকাশমান আর্থ সামাজিক পরিবেশে খাওয়ারিজমের গাণিতিক তত্ত্ব ইতালিয় রেনেসাঁসের মূল ভিত্তি রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং ধীরে ধীরে তা আধুনিক ইউরোপ নির্মাণের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়; অথচ ইসলামি বিশ্বের অবক্ষয়ী পরিবেশে তার বিকাশ হয় কল্পনাতীত।

ভূগোল

আমাদের আলোচ্য সময়ে প্রাণী বিদ্যা, খনিজ বিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যায় আব্বাসী সুবর্ণ যুগের অবদান লক্ষণীয় না হলেও ভূগোলের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। পবিত্র তীর্থস্থানের অবস্থান, প্রতিদিন নামাজে কেবলামুখী হওয়া—এই ধর্মীয় প্রেরণা ভূবিদ্যা পঠন পাঠনে উৎসাহ জোগান ছিল খুব স্বাভাবিক। যুদ্ধ অথবা শান্তিকালীন সময় সর্বদাই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য ভৌগোলিক জ্ঞানের চাহিদা ছিল সর্বোচ্চ; তদুপরি গতিশীল সমাজ বিশ্বের সবত্র ছড়িয়ে পড়ে। অজানা বিশ্বকে তাই জানার আকাঙ্ক্ষা হয় প্রবল। এরূপ একটি আত্ম সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভৌগোলিক জ্ঞানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক।

ইসলামি বিশ্বের বণিক সমাজ সপ্তম-নবম শতাব্দীর মধ্যে তৎকালীন সভ্য বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পুর্বে জল ও স্থল পথে তারা চীনে পৌছে যায়; দক্ষিণে জানজিবর দ্বীপ এবং সুদূর দক্ষিণে আফ্রিকা উপকূল, উত্তরে রাশিয়ায় তৃণভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।[৪৮] সাহসী ব্যবসায়ী নাবিকরা দূরদেশ হতে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে না করতে ছড়িয়ে পড়ে তাদের রোমাঞ্চকর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, এবং অনেকের মধ্যে অজানা স্থানের সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। সিরাফের বণিক সুলাইমানের সুদৃশ পূর্বদেশ ভ্রমণ কাহিনী ৮৫১ সালে প্রকাশিত হলে চীন ও ভারতীয় উপকূলের প্রথম আরব বিবরণ বিশ্ব জানতে পারে। এরূপ অসংখ্য কাহিনী হতে গড়ে ওঠে আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদের সাহসিকতার মনরঞ্জক অমর রূপকথা। এ সকল ভ্রমণ কাহিনীই ছিল আরব ভূগোল বিদ্যার প্রারম্ভিকা।

টলেমীর ভুগোল মূল গ্রীক অথবা সুরিয়ানী হতে কয়েকদফা আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ৮৭৪ সালের পূর্বেই ইয়াকুব বিন ইসহাক আল কিন্দী অনুবাদ কাজে হাত দেন। সাবেত বিন কুররা আরবি অনুবাদ করেন। টলেমীর ভুগোল গ্রন্থের মডেলে আল খাওয়ারিজমী তার সুরাতুল আরজ নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।[৪৯] খাওয়ারিজমের উক্ত গ্রন্থটি পরবর্তীকালের আরবি ভূগোল সাহিত্যের মডেলে পরিণত হয়; ইসলামি বিশ্বে ভূগোল শাস্ত্র অধ্যায়ন ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে অনেককে উদ্বুদ্ধ করে। খলিফা আল মামুনের আগ্রহে ৬৯ জন পণ্ডিতদের সহযোগিতায় আল খাওয়ারিজম একটি বিশ্ব মানচিত্র উক্ত পুস্তকে সংযোজন করেন। এটাই ইসলামি বিশ্বে রচিত প্রথম মানচিত্র। ঐতিহাসিক এবং ভূগোলবিদ মাসুদী এই মানচিত্রের অনুসরণ করেন। বস্তুত চতুর্দশ শতক পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে ভূগোল শাস্ত্রের উপর খাওয়ারিজমের একক প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়।

মুসলিম ভুগোলবিদরা প্রাচীন ভারত হতে একটি 'বিশ্বকেন্দ্র' এর ধারণা অর্জন করে। একে তারা বলতেন এ্যারিন। সম্ভবত শব্দটি টলেমীর ভূগোল ভারতীয় শহর উজ্জয়নী এর অপভ্রংশ। প্রাচীনকালে এখানে একটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এরই চূড়ায় তথাকথিত বিশ্বকেন্দ্র (World Cupola or Summit) অবস্থিত বলে ধরে নেয়া হয়। This arin they Located on the equator between the extremes of east and west. The western prime meridian was thought by them to be 90° from this mythical place. টলেমী ব্যবহৃত তথাকথিত প্রধান মধ্যরেখা হতে মুসলিম ভূগোলবিদরা দ্রাঘিমার মাপ করেন।[৫০] ফলাফল যাই হোক অজানাকে জানার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার মধ্যে তাদের বিজ্ঞান মনস্কতাই প্রতিফলিত হয়।

আরবি ভাষায় প্রথম স্বতন্ত্র ভূগোল গ্রন্থ অনেকাংশে পর্যটক ও বণিকদের প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাটের বর্ণনামূলক ছিল। জাবাল প্রদেশের ডাক ও তথ্য বিভাগের পরিচালক ইবনে খুরদাবেহ (মৃ. ৯০২ খ্রি.) ৮৪৬ সালে তাঁর আল মাসালিকুল মামালিক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ইবনুল ফাকিহ, ইবনে হাওকাল এবং মাকদেসী এ পুস্তকটি ব্যবহার করেন। এ পুস্তকটি ছিল ঐতিহাসিক ভূপ্রকৃতির বিবরণ। ৮৯১-৯২ সালে ইবনুল ওয়াজিহ আল ইয়াকুবী তার কিতাবুল বুলদান প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং একজন পর্যটক ছিলেন। তার গ্রন্থে কেবল বিভিন্ন দেশের ভূপ্রকৃতির বর্ণনাই ছিল না, বরং এতে নতুন ব্যাঞ্জনা ছিল; দেশের অর্থনৈতিক বিষয় ঐ পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত হয়। ৯২৮ সালের পর কুদামাহ আল খারাজ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বিভাগে হিসাব রক্ষকের পদে নিয়োজিত ছিলেন। এ পুস্তকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগোলিক বর্ণনা, ডাক বিভাগ এবং রাজস্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ গ্রন্থের পূর্বে ৯০৩ সালে ইবনে রুস্তাহ তার

আলাকুন নাফিসাহ প্রণয়ন করেন। একই বছরে ইবনুল ফকিহ আল মাদানী তার কিতাবুল বুলদান রচনা করেন। এটা ছিল পূর্ণাঙ্গ ভূগোল গ্রন্থ। মাকদেসী এবং ইয়াকুত এ পুস্তক হতে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৫১] এভাবে বিভিন্ন আঁকা-বাঁকা পথ পরিক্রম করে ধীরে ধীরে আব্বাসী স্বর্ণযুগেই ভূগোল সাহিত্য আত্ম প্রকাশ করে।

ধারাবাহিক ভূগোল সাহিত্য চর্চার রূপকার ছিলেন আল ইসতাখরি, ইবনে হাওকাল এবং মাকদেসী। দশম শতাব্দীতে তাদের কর্ম জীবন শেষ হয়। ইসতাখারি পুরনো পারসিপোলিসে জন্মগ্রহণ করে। তিনি তাঁর মাসালিকুল মামালিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ পুস্তকে রঙিন মানচিত্র প্রদত্ত হয়। বইটি সামানী রাজদরবারের ভৌগোলিক আবু জায়েদ আল বলখীর মডেলে লেখা হয়। বলখী বা ইসতিখারীর পুস্তকে ইসলামি রাজ্য বহির্ভূত দেশসমূহ তাদের পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ইস্তাখারি সিজিস্তানে বায়ু চালিত সেচ ব্যবস্থার উল্লেখ করেন।[৫২] ইসতাখারির অনুরোধে ইবনে হাওকাল (৯৪৩-৭৭ খ্রি.) তার পুস্তকের জন্য একটি মানচিত্র তৈরি করেছেন। ইবনে হাওকাল পরবর্তীতে ঐ পুস্তকটির পুনর্লিখনে হাত দেন এবং নামকরণ করেন আল মাসালিকুল মামালিক। একই রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করেন আল মাকদেসী। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর পর্যটক। তার দীর্ঘ বিশ বছরের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আহ্সানুত্তাকাসিম ফি মারিফা তিল আকালিম গ্রন্থ রচনা করেন। এতে অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হয়। আল হাসান ইবনে আহমদ আল হামদানী রচনা করেন আল ইকলিল এবং সিফাতু জাজিরাতুল আরব। প্রাক ইসলাম ও ইসলামি আরবের পূর্ণ বিবরণ এ পুস্তকে পাওয়া যায়।[৫৩] এ সময় ঐতিহাসিক এবং পর্যটক মাসুদী ইতিহাস ও ভূগোল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এটা ছিল ইখওয়ানুস সাফাদেরও অভ্যুদয়কাল। তারা তাদের ভৌগোলিক রচনার মধ্য দিয়ে একটি ভৌগোলিক সৃষ্টিবৃত্তিতত্ত্ব প্রকাশ করেন। এ তত্ত্বের সারমর্ম ছিল: আবাদী ভূমি মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়।[৫৪] মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী চিন্তনের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তাদের ঐ তত্ত্বে।

আমাদের আলোচ্য যুগের সর্বশেষ ভূগোল গ্রন্থ ছিল মাজমাউল বলদান। এটি প্রণয়ন করেন ইয়াকুত বিন আব্দুল্লাহ হামাভী (১১৭৯-১২২৯ খ্রি.)। এটা ছিল ভৌগোলিক অভিধান তবে একে ভৌগোলিক বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হয় না।

আরব মানসিক সংস্কৃতির বহু উপাদান বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র ও দর্শন মধ্যযুগে উদীয়মান ইউরোপীয় মননের উপর নিশ্চিত প্রভাব ফেলেছিল, অথচ তাদের উপর ভূগোল বিদ্যার এরূপ কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এর কারণ প্রথমত তাদের রচিত কোনো ভূগোল গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয় নি। দ্বিতীয়ত ভূগোলের খুব প্রয়োজনীয় সমস্যা বিশেষভাবে জ্যোতির্বিদ্যা ভূগোল এর প্রয়োজন মিটে যায় আবু মাশার পুস্তক দিয়ে অথবা ফারাগানীর লেখনিতে। এ্যারিস্টটল ও টলেমীর লেখার সাথে পরিচিত হয় আরবি গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে।

তৃতীয়ত তাদের প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল পঞ্জিকা নির্মাণ, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর সম্পর্কে সারণি বা ঠিকুজী নির্মাণ কৌশল। এগুলো তারা টলেডো ও সিসিলির মাধ্যমে পায়। চতুর্থত সম্ভবত উচ্চতর ভৌগোলিক জ্ঞান গ্রহণ করার মত পরিবেশ ইউরোপে তখন তৈরি হয় নি।[৫৫]

রসায়ন

আলকেমী শব্দ হতে কি কেমিস্ট্রি শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে যার বাংলা প্রতিশব্দ রসায়ন? এ রকম হলেও হতে পারে তবে এটা মূলত ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্ন। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, আমাদের আলোচ্য মধ্যযুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞান শাখায় মুসলিম বিশ্বের অবদান অসামান্য নয়, বরং তা ছিল ব্যাপক, গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ। সে তুলনায় রসায়ন বিজ্ঞানে তাদের অবদান ততটা লক্ষণীয় নয়। তার একটা পরোক্ষ অবদান আছে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার গুরুত্ব আদৌ তুচ্ছ নয়। মধ্যযুগে বিজ্ঞান মান মন্দিরে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলনে যে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষণ পদ্ধতি তা যত ক্রটিপূর্ণ বা তুচ্ছ হোক না কেন, প্রাচীন গ্রীকদের অনুমানসিদ্ধ পদ্ধতি হতে অবশ্যই একধাপ অগ্রগতি।[৫৬]

মধ্যযুগে জাবের বিন হাইয়ান ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৭৭৬ সালে ইরাকের কুফা শহরে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রসায়ন শাস্ত্রে অবদানের জন্য মধ্যযুগে বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর রাজীর পরই তার স্থান নির্ধারিত হয়েছে। গ্রীক-মিশরীদের মতই তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, নিকৃষ্ট ধাতব পদার্থ যেমন টিন, শীষা, পারদ, লোহা, তামা ইত্যাদি কোনো এক অজ্ঞাত পদার্থের সাথে সংমিশ্রিত হলে সোনা-রুপাতে পরিণত হতে পারে। জাবির আপনাকে সেই অজ্ঞাত বস্তুর অনুসন্ধানে নিয়োজিত করেন। অবশ্য তিনি সেরূপ পদার্থের সন্ধান পান নি। তিনি ঐ পরশ মণির অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাচীন পথ পরিহার করে এক অভিনব পথে বিচরণ করেন। তাঁর যে কোনো পূর্বসূরির তুলনায় তিনি পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং রসায়ন শাস্ত্রকে আতিভৌতিক অবস্থান হতে মুক্ত করে তত্ত্ব অনুশীলনের বাস্তব পথ প্রশস্ত করেন। হিট্টির ভাষায়: He more clearly recognized and stated the importance of experimente than any other early al chemist and made notewarthy advance in both the theory and practice of chemistry.[৫৭] সম্ভবত এখানেই তার সাফল্য ও গুরুত্ব নিহিত। তাঁর মৃত্যুর দু শতাব্দী পর কুফার একটি রাস্তা পুনর্নির্মাণের সময় ভূগর্ভ হতে তাঁর পরীক্ষাগার আবিষ্কৃত হয়। এবং ধ্বংসস্তূপ হতে হামন দিস্তা (mortar) এবং বড় এক খণ্ড স্বর্ণপাত পাওয়া যায়। এই উপাত্ত বিশ্লেষণে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। পাশ্চত্যের অনেক গবেষক মনে করেন যে, সম্ভবত তিনি কতগুলো রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করতে সফল

হয়েছিলেন-যা নিয়ে তিনি তাঁর পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করতেন। উক্ত, সোনার পাত হয়তো সে রকম পরীক্ষার ফসল। যাহোক এ বিষয় নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন। অন্তত বিশটি পুস্তকে তার নাম লেখা আছে, কোথাও তিনি এ সম্পর্কে কোনো রকম আলোকপাত করেন নি। যা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হল তিনি পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতিতে আস্থাবান ছিলেন। রাসায়নিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তিনি দুটো মৌল নীতির বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন। মৌলনীতিদ্বয়: ক. পদার্থের উষ্মিকরণ ভস্মীকরণ (Calcination); খ. লঘুকরণ (Reduction)। তদুপরি বস্তুর বাষ্পিকরণ (evaporatior), ঊর্ধ্বপাতন (suldimation) দ্রবিকরণ (melting), কেলাসন বা স্ফটিকিকরণ (Crystallization) এর পরীক্ষামূলক পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।[৫৮] অনেকে মনে করেন যে, তিনি সালফোরিক ও নাইট্রিক এসিড তৈরি করে তাদের সংমিশ্রণে এ্যাকুয়ারেজিয়া উৎপাদন প্রক্রিয়া জানতেন-এটারও কোনো প্রমাণ নেই।[৫৯] তবে একথাও সত্য যে, তিনি "এ্যারিস্টটলীয় ধাতব উপাদান তত্ত্ব এমনভাবে সংশোধন করেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক রসায়নশাস্ত্র গড়ে না ওঠা পর্যন্ত সামান্য রদবদলসহ তাঁর সংশোধিত তত্ত্বই বহাল ছিল।[৬০] অনেকে বলেন তিনি ৫০০ পুস্তক প্রণেতা: কিন্তু মাত্র ২২ খানি পুস্তকে তার নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে কিতাবুর রহমান, কিতাবুততাজমী এবং আজ-জিবাকুশ-শারকী ইউরোপে প্রকাশিত হয়।

জাবির ব্যতীত ইমাম আররাজী রসায়ন শাস্ত্রের উপর একটি পুস্তক রচনা করেন। রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি তার ব্যক্তিগত আকর্ষণ ছিল প্রচুর; কিন্তু যেহেতু এ বিদ্যাটি পুরাপুরি পরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল তাই এদিকে মনোনিবেশ করা সম্ভব ছিল না। ইবনে সিনার যুগে রসায়ন শাস্ত্রটি গাল-গল্পে ও কুসংস্কারে আচ্ছাদিত হয় এবং এর সামাজিক মূল্য শূন্যের কোঠায় নামে বিধায় তাঁর পক্ষে এর অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয় নি- তিনি এ শাস্ত্রের কড়া সমালোচনা করেন।

পরবর্তীকালে যারা জাবিরকে রসায়ন বিদ্যার পথিকৃৎ বলে গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে আত তুঘরাই (মৃত. ১১২১ খ্রি.) এবং আবুল কাশেম আল ইসপাহানী উল্লেখযোগ্য। এঁদের কেউ জাবের প্রদর্শিত পদ্ধতির উন্নতি সাধন তো দূরের কথা তাঁকে আদৌ অনুসরণ করেন নি। তারাও আর সাধারণ দশজনের মত রসায়ন শাস্ত্র বলতে দুটো প্রচলিত মায়া মরীচিকাই বুঝতেন : ক. দার্শনিকের পরশ পাথর; খ. অমৃত সুধা। যুগযুগ ধরে অনেকে তাদের সন্ধানে সর্বশক্তির অপচয় করেন। অথচ চোখ মেলে দেখলে দেখা যায় ইউরোপে ঘটে অন্য ঘটনা। চতুর্দশ শতকের ইউরোপে জাবেরের নামে প্রচারিত পুস্তক দ্বারা তাদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা বৃদ্ধি পায়। এ যেন এক যাত্রায় ভিন্নমুখী দুটি ফল।

কেন এমন অবস্থা হল? একাদশ শতক হতে ইসলামি বিশ্বে দেখা দেয় ক্রমাগত দ্রুত পশ্চাদপসরণ; বিজ্ঞান-দর্শনের কোনো শাখায় কোনো উন্নতি হয় নি বরং

রহস্যবাদ, মরমিবাদ, সুফিবাদ, শাস্ত্রীয় গোড়ামীবাদ এবং ধর্মের নামে কুসংস্কার দ্রুত মুসলিম সমাজকে গ্রাস করে। ইসলামি বিশ্বে তার আপন দার্শনিক বৈজ্ঞানিকরা বিস্মৃতের অতল তলে ডুবে গেলেন; অথচ দ্বাদশ শতক হতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে মুসলিম বিশ্বের বিস্মৃত মনিষীরা হলেন তাদের শিক্ষাগুরু। ইউরোপে দেখা দেয় নতুন সৃজনশীলতা; শুরু হয় নয়া জাগরণ; রেনেসাঁস। ইসলামি বিশ্বের স্থবির অবস্থার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন প্রফেসর হিট্টি : In fact in no branch of pure or physical science was any apprecable advance made... The Moslem of today if dependent on their own books, would have even less than their dist-sant ancestors in the eleventh Century. In medecine, Philosophy, math-ametics, Botany and other disipline a certain point was reached and then followed a standstill Reverence for the past with its tradition both religion and scientific, has found the Arab inlellect with fetters which it is only now beging to shakeoff[৬১] প্রফেসর হিট্টি প্রাচ্য মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থাটি চমৎকারভাবে সংক্ষেপে চিত্রিত করেছেন বটে; তবে এরূপ অবস্থার পশ্চাতে কোনো কারণ ছিল কিনা, থাকলেও তার প্রকৃতি কি-সে সম্পর্কে তিনি কোনো প্রকার আলোকপাত করেন নি।

ইতিপূর্বে দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আব্বাসী খেলাফতের তীব্র রাজনৈতিক সংকটের গতি প্রকৃতির উপর আলোচনা করা হয়েছে এবং একই শতাব্দীর শেষার্ধে কিরূপে ইরানি-তুরানি-তুর্কী জাতিসত্তাসমূহের অভ্যুদয়ে ইসলামি বিশ্বে এক নয়া বাস্তবতার উদ্ভব হয় তাও বিবেচিত হয়েছে। এসব ঘটনা প্রবাহের ফলশ্রুতি হিসেবে দশম শতাব্দীর শেষার্ধ হতে প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বে যে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় শুরু হয় তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বে নয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রথমত বাগদাদের বুওয়াইহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠার সাথে আব্বাসী খলিফা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চিরতরে হারায়, তবে তারা সুন্নি মুসলিমদের ধর্মীয় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। খলিফার প্রাসাদ সুন্নি-মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীলদের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়। সুন্নি ইসলাম অনড়-স্থবির রূপ ধারণ করে। তাদের সৃষ্ট বৃত্তের বাইরে কেউ গেলে তাকে দায়রায় ইসলাম হতে খারিজ হওয়ার ফতোয়াবাজী হয়ে ওঠে সুন্নি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা (ইউরোপীয় পোপের মত) বাগদাদের খলিফা ও তার পার্শ্বচর উলামার একমাত্র মহান দায়িত্ব! দ্বিতীয়ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় প্রক্রিয়া জোরদার হওয়ায় প্রথমে উত্তর বাণিজ্য— অর্থাৎ বাগদাদ—রায়-সমরখন্দ-রাশিয়া বাণিজ্যের পতন ঘটে। পরে ফাতেমীদের নেতৃত্বে দক্ষিণ-বাণিজ্য অর্থাৎ পারস্য উপসাগরীয় বাণিজ্যের পতন ঘটে। এর ফলে প্রাচ্য মুসলিম সাম্রাজ্য সমগ্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হতে বিদায় গ্রহণ করে। এর ফলে

তার আর্থ-সামাজিক উন্নতির সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। প্রাচ্য ইসলামি সাম্রাজ্যে দ্রুত স্থবির কৃষি অর্থনীতি সুদৃঢ় হয় এবং সামন্ত ব্যবস্থায় এক নয়ারূপ পরিগ্রহ করে। কৃষক সমাজের উপর চলে নিষ্ঠুর সামন্ত নিপীড়ন; গ্রাম ও শহরের মধ্যকার বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। বাগদাদে মুসলিম ধর্মীয় নেতা খলিফার সহযোগিতায় সামন্ত শ্রেণী মুক্তবুদ্ধি ইজতিহাদ স্তব্ধ করে দেয়। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা দরসে নিজামিয়ার মাধ্যমে নয়া অপশিক্ষা ও অপসংস্কৃতি জনতার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আব্বাসী স্বর্ণযুগের প্রগতিশীল ঐতিহ্য তিরোহিত হতে বাধ্য।

১৩.৩ ইসলামি বিশ্বে দর্শন চিন্তাধারা

মধ্যযুগে আরবি ভাষায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখন তাদের দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। আরবি ভাষায় আলোচ্য দার্শনিক চিন্তাধারা মোটামুটি তিনটি খাতে প্রবাহিত হয়। উল্লেখ্য যে খাত তিনটি কালক্রমে গড়ে ওঠে নি বরং অনেকাংশে সমসাময়িক অর্থাৎ প্রায় একই সময়ে ভিন্নমুখী চিন্তাধারা প্রবাহমান ছিল; সকল চিন্তাধারার আর্থ-সামাজিক পটভূমি ছিল মোটামুটি একই; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে পার্থক্য দেখা যায় তা ছিল পরিমাণগত; গুণগত নয়। খাত তিনটি নিম্নরূপ : ক. শারীরিক ব্রহ্মবাদ বা পিথাগোরাসীয় সৃষ্টি তত্ত্ব। এ ধারার প্রবর্তন করেন আবুবকর মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া আররাজী; (ইউরোপীয় বিদ্বৎ সমাজে তিনি আররাজেস নামে খ্যাত) এবং পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ এরূপ মতাদর্শের অনুগমন করেন। খ. দ্বিতীয় এবং সর্ববৃহৎ খাতটি ছিল রহস্যবাদী বস্তুবাদ। এ খাতের প্রধান দার্শনিক ছিলেন আল কিন্দী, আল ফারাবী, আল মিসকাওয়াই এবং ইবনে সিনা গ. তৃতীয় খাতটি ছিল ধর্মবাদী দর্শন। এর প্রথম ও শেষ প্রবক্তা ছিলেন আল গাজ্জালী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মধ্যযুগে ইসলামি বিশ্বে লালিত দার্শনিক চিন্তাধারার এরূপ খাত নির্ণয়ের প্রয়াস চালান ভারতীয় প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক দার্শনিক ইতিহাসবিদ রাহুল সংকৃত্যায়ণ।[৬২] তবে তিনি এ বিষয়ে বেশিদূর অগ্রসর হন নি। বিষয়টি ভেবে দেখার মত বলে মনে হওয়ায় এখানে সেই আলোকেই আলোচনার সূত্রপাত করা হল।

১. শারীরিক ব্রহ্মবাদ : আররাজী

আররাজী আধুনিক ইরানের রাজধানী তেহরানের অদূরবর্তী রায়নগরে ৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই ৯২৫ সালে প্রয়াত হন।[৬৩] রায়নগর ছিল আব্বাসী স্বর্ণযুগে আরব সাম্রাজ্যের উত্তর বিশ্ব বাণিজ্য পথের বিখ্যাত বন্দর নগর। এ সময় সমগ্র তাবারিস্তান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয় নি, তবে এখানে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। নগরটি বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ায় এখানে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল লক্ষণীয়। তাঁর কর্মকালটি ছিল আব্বাসী খেলাফতের রাজনৈতিক সংকটকাল এবং

৯২২ সালকে বলা হয় ধ্বংসের বছর (year of ruination)।[৬৪] মাতৃভূমির সাথে তাঁর নাম সম্পৃক্ত করে প্রাচ্যে আররাজী পাশ্চাত্য রাজেস নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৬৫] যাহোক তিনি তার মাতৃভূমি রায়নগরেই ধর্ম, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, আলকেমী ও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি সম্ভবত আলী ইবনে রাব্বানি আত তাবারীর নিকট চিকিৎসা ও দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। তাবারীর বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত।[৬৬] যুক্তিবিদ্যার প্রতি তাঁর বেশি শ্রদ্ধা ছিল না, এ্যারিস্টটল রচিত তর্কশাস্ত্রের একখানা বই ব্যতীত এ বিষয়ে আর কিছু পড়েন নি।[৬৭] তিনি রায়নগরে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদের খ্যাতি অর্জন করেন এবং রায়নগরের হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। এ সময় তারাবিস্তানের গভর্নর ছিলেন সামানী মনসুর বিন ইসহাক। রাজি তাঁর রচিত বিখ্যাত তিব্বুল মনসুরী গ্রন্থ তাঁর নামে উৎসর্গ করেন।[৬৮] খলিফা মুক্তাফীর আমলে (৯০২-৯০৭ খ্রি.) তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং বাগদাদ হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি তার প্রতিটি রোগীর প্রতি ছিলেন সদয় এবং তিনি কোনো রোগীর নিকট হতে কখনো কোনো ফি গ্রহণ করতেন না। বস্তুত তিনি ছিলেন হিপোক্রিটাসের চিকিৎসা নীতির একজন দৃঢ় সমর্থক ও অনুসারী।[৬৯] চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কেননা এ শাস্ত্রটি সহস্র বর্ষের মানব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। তিনি বলতেন : ক্ষুদ্র এ জীবনের কতিপয় ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অপেক্ষা সহস্র বর্ষের অভিজ্ঞতা দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞানই অনেক বেশি মূল্যবান।[৭০] মধ্যযুগে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশ্ব সভ্যতায় তার অবদানের কথা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। খলিফা মুক্তাফী প্রয়াত হলে তিনি রায়নগরে প্রত্যাবর্তন করে অধ্যাপকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যার্থীরা দলে দলে এসে তাকে ঘিরে বসে যেতেন। কেউ কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলে প্রথম দলকে তার উত্তর দিতে বলা হত; প্রথম দল উত্তর দিতে অক্ষম হলে দ্বিতীয় দলকে বলা হত, এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল দল ব্যর্থ হলে স্বয়ং রাজী তার মীমাংসা দিতেন। নাদিম তাঁর ফিহিরিস্তে বলেন, এ সময় তিনি শিক্ষাগুরু শেখ হিসেবে পরিচিত হন। অধ্যাপনার সাথে তিনি চিকিৎসার কাজ চালাতেন। অধ্যাপনা এবং চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে তিনি লেখনি চালাতেন। তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেন। নাদিম ফিহিরিস্তে রাজীর রচিত ১৪৮টি গ্রন্থ তালিকাভুক্ত করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর যথা চিকিৎসা শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, তর্ক শাস্ত্র, গণিত, দর্শন, অধিবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করেন।[৭১] রসায়ন শাস্ত্রের উপর ছিল তার অগাধ আস্থা।

তাঁর বিচার ধারা

তাঁর অনুসন্ধান পদ্ধতি ছিল আপাদ মস্তক যুক্তিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী। সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য অসংখ্য উপাত্তের পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরিচালিত

অসুন্ধান পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁর কিতাবুল হাভী গ্রন্থে চিকিৎসা বিজ্ঞান আলোচনায় এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। বস্তুত তিনি ছিলেন প্রয়োগবাদী-অভিজ্ঞতাবাদী। তাই তাঁর চিন্তাধারায় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান অবরোহ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত জ্ঞানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ক. তার অধিবদ্যা

তিনি আত্মা ও শরীরের দ্বৈতবাদে বিশ্বাস করতেন এবং আত্মা ও শরীরের মধ্যকার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতার কথা বলেন। তবে আত্মার প্রাধান্যই অধিক। দৈহিক স্বাস্থ্য যেমন সুখ নির্ধারণ করে তেমনি অসুস্থ আত্মা শরীরের উপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। তাই তিনি আত্মার চিকিৎসার কথা বলেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ইসলামি বিশ্বে চলছিল প্রচণ্ড আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতা; সর্বত্র শুভের চেয়ে অশুভের পাল্লা ভারী দেখে তিনি নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েন। মানসিক বিকাশ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ অগ্রগতি অর্জন করতে পারেন নি, তবে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের উপর আস্থাবান হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বস্তু জগতের বিভিন্ন মৌল উপাদানের মিশ্রণে ধাতুর পরিবর্তন হতে পারে। রসায়নের বিভিন্ন মিশ্রণ থেকে বিচিত্র গুণের উদ্ভাবন দেখে তিনি ধারণা করেন যে, দেহের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত গতি সৃষ্ট করার মত শক্তি আছে। তার এ বিশ্লেষণটি ছিল মূল্যবান: কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ মাধ্যমে একে বিকশিত করতে পারেন নি।[৭২]

রাজীর অধিবিদ্যা সমসাময়িক অধিবিদ্যা হতে ছিল স্বতন্ত্র। তিনি জগতের মূলে পাঁচটি নিত্য উপাদানের কথা বলেছেন। উপাদানগুলি : ১. পরমব্রহ্ম, ২. বিশ্বাত্মা, ৩. মূল ভৌতিক উপাদান, ৪. পরমার্থ দেশ, ৫. পরমার্থ কাল। বাজী এই পঞ্চ উপাদানকে নিত্য এবং সদাসহ অবস্থিত বলে গ্রহণ করেন। এ অত্যাবশ্যক উপাদান ব্যতীত বিশ্ব সৃষ্টি হতে পারত না। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা বাহ্যিক পদার্থ ভৌতিক উপাদানকে জানা যায়। বিভিন্ন বস্তুর স্থিতি তার স্থান বা দেশের নির্দেশ করে। বস্তুর সদা পরিবর্তনশীলতা কালের অস্তিত্ব ঘোষণা করে।[৭৩] প্রাণীর অস্তিত্বের সাথে জড় পদার্থের বৈসাদৃশ্য প্রমাণ করে যে, আত্মাও এক পদার্থ ও বুদ্ধি সম্পন্ন; কিন্তু অবশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা জাগতিক শিল্প-কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উন্নতির উচ্চশিখরে পৌছে দিতে পারে। বস্তুত ঘটনার মধ্যে যে সঙ্গতিপূর্ণ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায় তা জগতের পশ্চাতে বিরাজমান একজন প্রজ্ঞাবান পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বের নির্দেশ করে। এই পরিকল্পনাকারী সত্তাই জগতের প্রাকৃতিক নৈতিক শৃঙ্খলার মূলে।[৭৪]

রাজী উক্ত পঞ্চ উপাদান নিত্য এবং সদা একত্রিত বলেও এর মধ্যে বিশেষ একটিকে প্রধান বলেছেন। সৃষ্টির বিষয়টি রাজী এরূপে উত্থাপন করেন: প্রথমে একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্যোতি আবির্ভূত হয়; এই জ্যোতিই জীবাত্মার উপাদান কারণ। তাই আত্মা এক সাধারণ, প্রকাশোন্মুখ আধ্যাত্মিক উপাদান যে জ্যোতিলোক হতে আত্মার

আগমন, সেই স্থানকেই ব্রহ্ম বা খোদাই জ্যোতির প্রকাশ বলা যেতে পারে। যেমন দিবসের অনুগামী রজনী, তেমনি প্রকাশের অনুগম তমঃ। এই তমঃ থেকেই পঞ্চ জাতীয় জীবাত্মার জন্ম যাদের কাজ হলো বুদ্ধিমান আত্মার (মানব) প্রয়োজন পূরণ করা। আধ্যাত্মিক জ্যোতি যখন অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয় তখন তাব সাথে একটি মিশ্রিত বস্তু থাকে, সেটাই অশরীরী অবয়ব। এরই ছায়া থেকে উষ্ণতা, শৈত্য, শুষ্কতা, আর্দ্রতা-এই চারটি স্বভাব উৎপন্ন হয়। এই চারটি স্বভাব থেকে আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই সৃষ্ট হয়। সৃজন অনন্ত প্রক্রিয়া-আল্লাহব সদা সক্রিয় সত্তা। এভাবে বাজী যে নিত্য জগৎতত্ত্বে উপনীত হন তা মূলত ইসলামের সাদি জগৎতত্ত্বের বিপরীত।[৭৫]

উল্লেখ্য বাজীর পূর্ব হতে দু ধরনের দার্শনিক চিন্তাধাবা প্রবাহমান ছিল। ক. জড়বাদী দার্শনকি তত্ত্ব; এ তত্ত্বে জগতে স্রষ্টাব অস্তিত্ব অস্বীকার কবা হত। তাদেব ধারণা ছিল যে, বস্তু মাত্রেই স্বয়ং সৃষ্টি হওয়ার ক্ষমতা আছে। অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই। খ. এদেব বিপবীতে ছিলেন অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায। তাঁরা কোনো অনাদি আত্মা জড় উপাদান, দেশ কাল এর অস্তিত্ব স্বীকার কবতেন না। বাজী উক্ত মতামত দুটিকে গ্রহণ করেন নি। তিনি এ দুয়েব মধ্যবর্তী পথকে বেছে নিযেছিলেন। তাব ধারণাকে যুক্তিসম্মত কবাব জন্য আল্লাহব, অতিরিক্ত আত্মা, প্রকৃতি, দেশকালের প্রয়োজন এবং বুদ্ধিমান মানবাত্মাকে প্রকাশ করার জন্য একজন মহান স্রষ্টাব প্রয়োজনেব কথা বলেছেন।[৭৬]

ধর্মতত্ত্ব

তিনি যুক্তিবাদের সাহায্যে আস্তিকতাবাদে উপনীত হয়েছিলেন। দুটি কাবণে তিনি ঐশিবাণী বা রেসালাতের কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি। ক. প্রথমত মানুষেব ভাল মন্দ, উপকারিতা অপকারিতা বুঝার জন্য যুক্তিবাদই যথেষ্ট; আমবা আমাদেব প্রজ্ঞা দিয়ে কার্যকারণ পদ্ধতি দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারি; এবং আমরা আমাদেব জীবনকে সুসংগঠিত করতে পারি। খ. দ্বিতীয়ত মানব গোষ্ঠীকে পথ প্রদর্শনের জন্য কিছু লোককে একচ্ছত্র অধিকার দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না; কেননা সকল মানুষই সমজ্ঞান নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; তাদের মধ্যকার পার্থক্য কোনো প্রকৃতিগত নয় বরং পরিবেশ, শিক্ষা ও উন্নয়নের কারণেই ঘটে। তৃতীয়ত তথাকথিত প্রেরিত পুরুষরা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী কথাবার্তা বলেন কেন? ধর্মে ধর্মে পার্থক্যের দেয়াল তোলেন কেন? ধর্মগ্রন্থ কোরআন সম্পর্কে তিনি বলেলন যে, এর রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর বিচারে এর অলৌকিকতার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। তিনি আরো মনে করতেন যে, মানুষের জ্ঞানের প্রধান তিনটি সূত্র যথা মানব প্রজ্ঞা, অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র অনুযায়ী যৌক্তিকতার ব্যবহার, দ্বিতীয়ত ঐতিহ্য হতেও মানুষ পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতা দ্বারা, তৃতীয়ত স্বজ্ঞা যা মানুষকে যুক্তির আশ্রয় ছাড়াই বেঁচে

থাকার প্রবৃত্তি। এ কারণে তিনি মনে করতেন ধর্ম গ্রন্থ পাঠের তুলনায় বিজ্ঞান ও দর্শনের পুস্তক অধ্যয়ন করার প্রয়োজন অধিক পরিমাণে। অন্য কোনো মুসলিম চিন্তাবিদকে এরূপ বিপ্লবী মতামত ব্যক্ত করতে দেখা যায় না।[৭৭]

তিনি ব্যক্তি জীবনে ছিলেন সহজ সরল। যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনো দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। তিনি মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা এবং অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত থাকতেন; তিনি লোভী ছিলেন না। সবার সাথে বিবাদ বিসম্বাদ এড়িয়ে চলতেন, তার আপন অধিকার সম্পর্কেও ছিলেন ধৈর্যশীল, তার আহার বিহার-পরিধান ছিল অতি সাধারণ। তাঁর এরূপ সরল ব্যক্তি জীবন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তার নৈতিক দর্শন বিনির্মাণ করেন। মনে হয় তিনি তার নীতিদর্শনে গ্রীক দার্শনিক গ্যালেনের দ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গ্যালেনের দুটি বই ক. On Knowing one's own Deects এবং How good people benefits from their Enemies এর প্রভাব তার নীতিশাস্ত্রের উপর লক্ষ্য করা যায়। তিনি তার তিবিব রুহানী এবং সিরাতুল ফালসাফিয়া গ্রন্থে তার নীতিশাস্ত্রের উপর প্রচুর আলোকপাত করেন। তিনি মনে করেন একজন দার্শনিকের জীবন হবে মধ্যপন্থী। তিনি যেমন কেবল কৃচ্ছতা সাধন করে বৈরাগ্য জীবনযাপন করবেন না তেমনি ভোগ বিলাসে আদৌ গা ঢেলে দেবেন না। কারো আহার, বিহার, পরিধান প্রয়োজন অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। তিনি আরো বলেন মানুষকে আপন ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ মাৎসর্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিবিব রুহানী গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে মৃত্যু চেতনা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। মধ্যযুগে মৃত্যুভয় একটি বহুল আলোচিত বিষয় ছিল। তিনি বলেন যাদের পরকালে বিশ্বাস নেই তাদের কাছে মৃত্যু একেবারে নিরর্থক; আর যারা বিশ্বাস করে এবং ভাবতে পারে যে, মৃত্যুর পর তারা ভাল স্থানেই যাবে, সে ক্ষেত্রে মৃত্যুভয়ের কোনো যৌক্তিকতা নেই। যেহেতু মৃত্যুভয়ের পশ্চাতে কোনো যৌক্তিকতা নেই সে জন্য কারো পক্ষে তা নিয়ে ভাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। বরং মৃত্যু চেতনা মানুষকে নিষ্কর্ম হতাশাগ্রস্ত করে দেয়; জীবনের সজিবতা নষ্ট হয়।

দর্শন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু সম্ভবত তিনি কোনো দার্শনিক system সংগঠিত করতে পারেন নি।

He had no organised system of philosophy, but compared to his lime he must be reckoned as the most vigorous and liberal thinker in Islam and perheps in the whole history of human though.

বস্তুত তিনি ছিলেন নিটোল যুক্তিবাদী, জ্ঞানই শক্তিতত্ত্বে আত্মপ্রত্যয়ী, কুসংস্কার মুক্ত এবং নিঃসংকোচে আপন স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে প্রচণ্ড সৎসাহসের অধিকারী।

তিনি মানুষে, প্রগতিতে এবং সর্বজ্ঞানী আল্লায় বিশ্বাসী ছিলেন। কোনো রকম আনুষ্ঠানিক ধর্মে তার আস্থা ছিল না।[৭৮]

খ. ইখওয়ানুস সাফা : পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ

প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে আব্বাসী খেলাফত কি অবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারায় তা স্ববিস্তারে অন্যত্র বলা হয়েছে। এ সময় বাগদাদ নগরের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে শিয়া-সুন্নি সংঘাত প্রবল আকার ধারণ করে। ইসলামি বিশ্বের সর্বত্রই ইরানী ও তুর্কী জাতিসত্তাসমূহের দ্রুত বিকাশ ও আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকাশ ঘটেছিল; সর্বত্র সামন্তশাসন ও বৃহত্তর কৃষক সমাজ করভারে জর্জরিত; সামাজিক অস্থিরতা ও অশান্তিতে জনজীবন হয় বিপন্ন।

এরূপ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ইসমাইলি শিয়া-সম্প্রদায় তাদের গোপন সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলে। মিশরে ফাতেমী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় বটে; কিন্তু তারা বিশ্ব মুসলিম নেতৃত্ব গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। শিয়াদের অন্য একটি অংশ কারামাতিয়ারা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করে আব্বাসী কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ত্বরান্বিত করতে সমর্থ হলেও তারা বাগদাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে আব্বাসী বিকল্প নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয় নি। এমন কি তাদের প্রভাব বলয়েও তাদের আর্থ-সামাজিক আদর্শ বাস্তবায়িত করতে পারে নি। এরূপ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতে দশম শতাব্দীর শেষার্ধে বুওয়াইহী সালতানাতের অবক্ষয়কালে বসরা নগরে এক ঝাঁক বুদ্ধিজীবী জ্ঞান চর্চার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। এটাই হল ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ। ইতিপূর্বে আব্বাসী সুবর্ণযুগের শেষ প্রান্তে মোতাজিলা ও আশায়েরাদের বৌদ্ধিক আন্দোলনের কথা আমরা আলোচনা করেছি। মোতাজিলা পণ্ডিতগণ গ্রীক ও ইরানী দর্শনের আক্রমণ হতে একত্ববাদ এবং খোদার ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার শক্ত ভিত রচনা এবং বিকাশমান ইসলামি বিশ্বের ক্রমবর্ধমান সমস্যার নতুন সমাধানে আইনগত সমর্থনের উপযোগী, যৌক্তিক ধর্মতত্ত্ব বিনির্মাণ করেন। এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে গিয়ে ইসলামের মৌলনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভেবে আশায়েরা পণ্ডিতরা একটি পাল্টা ধর্মতত্ত্ব নির্মাণ করেন। এরা ঘোরতর দর্শনবিরোধী শক্তি ছিলেন; এদেরকে বলা হত মোতাকাল্লেমুন। বস্তুত তারা মধ্যযুগে ইউরোপে স্কলাস্টিক পণ্ডিতদের মতই ভূমিকা পালন করেন। ইখওয়ানুস সাফা ছিলেন পুরোপুরি দর্শন অনুরাগী। তারা পিতাগোরাস দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অনুসারী এবং ইসলামকে দার্শনিকতার রঙে রঞ্জিত করতে চেয়েছিলেন।[৭৯] রাহুল তাদেরকে কারামাতিয়াদের উত্তরসূরি বলে বিবেচনা করেন। একথা সত্য যে, কারামিতাদের অবশিষ্টাংশ ভ্রাতৃসংঘের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। হিট্টি বলেন যে, মতাদর্শগত বিচার করলে মনে হয় সংঘবাদীরা ইসমাইলিয়দেরই অন্য আর একটি শাখা। বস্তুত এঁদের মতাদর্শের মধ্যে আব্দুল্লা ইবনে ময়মুনের চিন্তা ভাবনার বিকশিত রূপের প্রতিফলন ঘটে। যাহোক

এঁরা ইসমাইলীদের মত কেবল ধর্মীয় ও দার্শনিক চক্র ছিলেন না। এঁদের ছিল একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য; তাঁরা পোষণ করতেন নয়া ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গতিশীল সমাজ গঠনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। তারা তৎকালীন প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই তাদের রণনীতি ও রণকৌশল ছিল ভিন্ন ধরনের। যেহেতু মধ্যযুগে ধর্মই ছিল সমগ্র মূল্যবোধের বাহন, তাই এঁরা প্রচলিত ধর্মীয় চিন্তা ভাবনায় আমূল রূপান্তরের মাধ্যমে নয়া সমন্বয়বাদী ধর্মীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।[৮০] হিট্টি আরো অনুমান করেন যে, তাঁদের সংঘের এরূপ নামকরণের মধ্যে কালিলা ওয়া দিমনার শ্বেতঘুঘু কাহিনীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বন্যের আক্রান্ত পশুদের মত জনতা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বাঁচার সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে নয়া ব্যবস্থা প্রবর্তনই প্রকৃষ্ট উপায় বলেই তারা মনে করতেন। হিট্টি বলেন : The Ikhwan...formed not only philosophic but also a religio political association with ultra shiite probably Ismailiah and were opposed to existing political order, which they evidently aimed to overthrow by undermining the popular intellectual system and religous belifs.[৮১]

পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ ছিল মূলত গোপন সংগঠন। অবশ্য এরূপ সংগঠন গড়ার ঐতিহ্য মুসলিম বিশ্বে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের গোপন তৎপরতা সন্তর্পণে পরিচালিত হয় বলে তাদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানাও কষ্টসাধ্য। তবুও যেহেতু ইখওয়ানের প্রকাশ্য চরিত্র ছিল জ্ঞান চর্চার মুক্তাঙ্গন—তাই এদের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করার মত কিছু উপাত্ত পাওয়া যায়। পরিচয়টি প্রধানত বৌদ্ধিক প্রকৃতির। তাদের রাজনৈতিক প্রচারাভিযান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবত তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা জোরদার ছিল না। যেহেতু তাদের আন্দোলন কারামিতাদের মত গণমুখী ছিল না বরং শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সম্ভবত তারা প্রথমে আদর্শগত সমস্যার প্রতি বেশি জোর দেয় বলেই তাদের আন্দোলনের বৌদ্ধিক দিকটাই সবার দৃষ্টিতে পড়ে।

সংঘটি নিয়ম নিগড়ে বাঁধা ছিল। ক্যাডারভিত্তিক সংঘ সদস্যদের চারটি স্তরে সংগঠিত করা হয়। প্রথম বা সর্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ প্রথমধাপে থাকত ১৫-৩০ বছর বয়স্ক তরুণরা। এই স্তরের সদস্যগণ হতেন শিক্ষার্থী ও দীক্ষার্থী। এই শিক্ষানবিসদের প্রধান দায়িত্ব ছিল নির্দ্বিধায় তাদের গুরুর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। গুরুর আদেশ-নিষেধ অলঙ্ঘনীয়। বিনা প্রশ্নে তা মেনে চলা। দ্বিতীয় স্তর প্রথম স্তর হতে সফলভাবে উত্তীর্ণদের নিয়েই দ্বিতীয় স্তর গঠিত হয়; এই স্তরের সদস্যগণ ৩০-৪০ বছর বয়স্ক হতেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষার সাথে সাথে তাদেরকে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞান

অর্জন করতে হত। তৃতীয় স্তরটি ছিল উচ্চতর এবং এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত হতেন ৪০-৫০ বছর বয়স্ক ভ্রাতৃসংঘের পাকাপোক্ত সদস্যগণ। এঁদের মধ্যে জগতের দিব্য-নীতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা থাকত। চতুর্থ স্তর অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরে থাকতেন ৫০ উর্ধ্ব বয়স্ক ভ্রাতৃসংঘের সদস্যগণ। তারা ছিলেন সত্যস্রষ্টা। প্রকৃতি, সিদ্ধান্ত, ধর্ম সব কিছুরই উর্ধ্বে ছিল তাদের অবস্থান। নিম্নস্তরের ক্যাডারদের মত তাদেরকে প্রচলিত ধর্মের আচার অনুষ্ঠান মেনে চলার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

ক্যাডারদেরকে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তিতা শেখান হত। তাদেরকে আরো শিক্ষা দেয়া হত যে, কর্তব্যের কাছে শরীর বা ঐশ্বর্য সব কিছুই তুচ্ছ। সংঘের ভ্রাতৃগণের কল্যাণের প্রতি সর্বদা মনোযোগী হতে হত। সংঘের জন্য আত্মসমর্পণ, নেতার প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও অন্ধ অনুসরণ ছিল সকল ক্যাডারদের একান্ত করণীয়।[৮২]

পবিত্র সংঘ একটি আদর্শ সমাজ দ্বারা একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। তাদের এরূপ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা ভাবনায় আব্দুল্লাহ ইবনে ময়মুন এবং প্লেটোর 'প্রজাতন্ত্র' গ্রন্থের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাদের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ সমাজ গড়তে হলে সমাজকে জ্ঞানোদ্দীপ্ত হতে হয়। এরূপ একটি সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃসংঘ সমকালীন জ্ঞানকে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করেন। তাদের রচিত বিশ্বকোষকে বলা হয় রাসায়েলুল ইখওয়ানুস সফা বা ইখওয়ান গ্রন্থাবলী। এই গ্রন্থবলীতে ছিল দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত পুস্তক। এটি ছিল ৫১ টি গ্রন্থের সংকলন। তৎকালীন সকল জ্ঞানের এটি ভাণ্ডারবিশেষ- embodying the sum total of Knowledge that a cultured man of that age was supposed to acquire. উল্লেখ্য ৫২তম পুস্তকটি কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল না, বরং সেটা ছিল গ্রন্থাবলীর সার-সংকলন। হিট্টি বলেন: The first fifty one epistles lead up to the last, which is of summation to all sciences.[৮৩] গ্রন্থের রচনাশৈলী হতে মনে হয়, এতে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অংশ রচনা করেন এবং সম্পাদনাতে কোনো সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয় নি। গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়।

১. আবু সুলায়মান মুহাম্মদ ইবনে মুশীর আলবস্তী;
২. আবুল হাসান আলী ইবনে হারুন আল জানজানী
৩. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল মাহরাজানী
৪. আল আওফ
৫. জায়েদ ইবনে রিফায়া।[৮৪]

প্রশ্ন হতে পারে যে, তাদের পক্ষে সনাতন মতামতের বিপরীতে তারা তাদের মুক্ত চিন্তা কিরূপে প্রকাশ করতে পেরেছিল? উল্লেখ্য যে, এ সময় বুওয়াইহী ক্ষমতাসীন

হওয়ায় বাগদাদ নগরীতে সুন্নি মুসলিমদের উপর খলিফার ধর্মীয় প্রভাব কার্যকর থাকলেও বাগাদদের অসুন্নি মুসলিম এবং বাগদাদের বাইরে তাঁর কোনো প্রভাব বিদ্যামান ছিল না বিধায় তৎকালীন অবস্থাটি উদার চিন্তার প্রতিকূল ছিল না। তৎকালীন অনেক বুদ্ধিজীবী তাদের গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সিরিয়ার দার্শনিক কবি আবুল আলা আল মায়ারবী বাগদাদ অবস্থানকালে ভ্রাতৃসংঘের এক শুক্রবারের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত মোতাজিলা পণ্ডিত আবুল হায়ান তৌহিদী বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। সিরিয়ার এ্যাসাসিন দলনেতা রশীদুদ্দীন সিনান ইবনে সুলাইমান তাদের রাসয়েলের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তাদের কিছু লেখা গাজ্জালীকে প্রভাবিত করে।[৮৫] ভ্রাতৃসংঘের রাসায়েলের আলোকে তাঁদের সৃষ্টিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব এবং নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল।

সৃষ্টি তত্ত্ব

উল্লেখ যে, সংঘ পণ্ডিতগণ মনে করতেন যে, জগতের উৎপত্তি বা নিত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর। তাঁরা আরো মনে করতেন যে, "আমি কি, বা কে— এরূপ প্রশ্ন প্রয়োজনীয় এবং লাভজনক। মানুষ যদি এরূপ প্রশ্নের উর্ধ্বে উঠতে চায় তখনই সে নিজের সীমাকে অতিক্রম করতে পারে। আপনাকে উন্নত করতে করতে ক্রমশ মহান জ্ঞানময়ে উন্নীত হয়—এবং এটাই তার চরম লক্ষ্য। যাহোক তারা বলেন যে, জড়জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ সব কিছুই পরমসত্তা আল্লাহ হতে ক্রমবিবর্তন বা বিকিরণের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। বস্তুত জগৎ ক্রমবিকাশস্বরূপ। জ্যোতির্ময় পরমাত্মা হতে নিম্নলিখিত আটটি উপাদান পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করে।

১. সৃষ্টিশীল চিদাত্মা (Creative spirit) বা নফ্‌সে ফায়াল। Active intellect;
২. নিষ্ক্রিয় চিদাত্মা বা বিশ্ব আত্মা-অধিকরণ-নফসেইনফায়াল Agent intellect;
৩. মূল প্রকৃতি বা আদি জড় উপাদান বা হাবল;
৪. সমূহ মানবাত্মা বা জগৎ জীবন বা নফসে আলম;
৫. মহৎ শরীর বা আকৃতি জিসমে মুতলক;
৬. নভোমণ্ডল দেবলোক আলমে আফলাক;
৭. চার উপাদান : মাটি, পানি, বায়ু অগ্নি; আনাসেরে আর বায়া;
৮. বস্তজগত তিন পদার্থ ধাতু, বনস্পতি, প্রাণী মাতলাদে সালসা।[৮৬]

উল্লিখিত প্রথম চারটি উপাদান অমিশ্র বা সরল সারসত্তা (Essence) পরম শরীর এই সরল সারসত্তার সাথে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে জটিল জগৎ। সেখানে সব কিছু গঠিত হয় জড় ও আকার নিয়ে। আদিজড় ও আকার পরম বস্তু (substance) স্বরূপ। দেশ, কাল এবং গতি আদি আপতিক বস্তু। (accident) জড় এক; কিন্তু আকার জড়ের

বহুত্ব বা বৈচিত্র্যের কারণ। বস্তুকে বলা হয় জড়ীয় আকার; আপতিক বস্তু বা গুণ হল পূর্ণতাদায়ক আধ্যাত্মিক আকার। বস্তু নিহিত থাকে সার্বিকে, বিশেষে নয়। জড় ও আকৃতির মধ্যে কোনো অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ নেই; চিন্তা ও বাস্তবতায় জড় পৃথক বটে; কিন্তু পৃথক অভিজ্ঞতায় এরা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এ আলোচনা হতে সংঘের উপর পিথাগোরাসের প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাদেরকে ভাববাদী বিবর্তনবাদী বলা চলে। সংঘ পণ্ডিতদের মতে মূল বস্তু তত্ত্বেরও ঊর্ধ্বে সৃজনী চিদাত্মাই হল সকল চেতন-অচেতন তত্ত্বের মূল উপাদান।[৮৭] সৃষ্টিময় ভাবই পরম ব্রহ্ম। পরমাত্মা-অষ্ট উপাদানের ঊর্ধ্বে। সব কিছুর মধ্যেই সৃষ্টিময় ভাবের উপাদান আছে এবং এই উপাদানই সব কিছু। বস্তুত তাদের সৃষ্টিতত্ত্বে মরমি ভাব বিদ্যামান এবং সর্বেশ্বরবাদের উৎস। তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব তাদের উদারবাদের উৎস।

মানবাত্মা

মানব ক্ষুদ্র অনুজগৎ (mirocosm) এবং বিশ্ব ব্রহ্মণ্ডকে বলা চলে অতিকায় মানব, মানবাত্মা বিকশিত হয় বিশ্বাত্মা হতে। সকল মানবাত্মার সমষ্টিকে এক পৃথক বস্তু বলে মানা হয়-একে বলে পরম মানব বা মানবতার আত্মা। প্রতিটি ব্যক্তি আত্মা জড় বন্ধনের আবদ্ধতাকে যার প্রভাব থেকে সে মুক্ত হতে চায় এ মুক্তি অর্জনের জন্য আত্মাকে অনুধ্যানিক বৃত্তিকে (speculation faculty) কাজে লাগাতে হয়। অনুধ্যানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানই আত্মার প্রাণস্বরূপ। জন্মকালে শিশু আত্মা থাকে সাদা কাগজের মত পরিষ্কার। সে তার পঞ্চেন্দ্রীয়ের মাধ্যমে বাহ্যিক জগৎ থেকে যা সংগ্রহ করে তা প্রথমে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের মধ্যভাগেই ঐ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ শুরু হয় এবং অবধারণ, (Judgment) স্মৃতি ও যুক্তির সহায়তায় জ্ঞানরূপে মস্তিষ্কের শেষ ভাগে সঞ্চিত হয়। উল্লেখ্য মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণীও ইন্দ্রিয়ের অধিকারী তবে মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো তার বিচার ক্ষমতা, বাকশক্তি এবং ক্রিয়া ক্ষমতা আছে। অনুশীলনের মাধ্যমে সে বিচার করে, কথা বলে এবং কাজ করে।[৮৮]

ধর্মতত্ত্ব

তাঁরা তাদের সমসাময়িককালে মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন ধর্মের নামে অসহনশীলতা, গোড়ামী ও কুসংস্কার। তাঁরা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, মানুষ কিভাবে প্রথা-রীতি নীতি, আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মের অনুসরণ করে। তারা পরম ব্রহ্ম প্রেমময় জ্যোতির্ময় পরমাত্মার উপলব্ধি না করে তাঁর ভয়ভীতিতে আড়ষ্ট হয়ে অথবা সুখ সম্ভোগের মোহে ঐ সব প্রথা-রীতি পালন করে মাত্র। সংঘ পণ্ডিতগণ জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে অর্জন করে এক অপূর্ব জীবনবোধ, গড়ে তোলে এক যুক্তিবাদী ধর্মতত্ত্ব; সকল বিজ্ঞান, দর্শন বিশ্বাসের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এক সমন্বয়বাদী

ধর্মমত। তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, অসহিষ্ণুতা আসে প্রেমহীনতা ও প্রচণ্ড অজ্ঞতা হতে। এর প্রতিষেধক হিসেবে তারা চাইতেন যে, সকলে ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা, জারোয়াস্ত্র, মুহাম্মদ, আলী সবাইকে পয়গম্বর বলে গ্রহণ করুক; সেই সাথে তারা পিথাগোরাস, সক্রেটিস ও প্লেটো এর মত দার্শনিক জ্ঞানীদেরকে নবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। সত্যের জন্য আত্মদানকারী ঈসা সক্রেটিসকে হুসাইনের মত শহীদভুক্ত করেন।[৮৯] তারা ধর্মকে দেখেছেন উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে। তারা মনে করতেন কোরআন তৎকালীন জনতার বোধগম্য ভাষায় অবতীর্ণ হয়, অথচ এর মধ্যে নিহিত আছে গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক অর্থ। সাধারণ মানুষ স্বর্গ-নরক-প্রলয়কে মূঢ় বিশ্বাস বলে ভাবেন। প্রলয় সম্পর্কে তারা বলেন যে, দেহ হতে আত্মার চ্যুতি একটি ক্ষুদ্র প্রলয়; মহা প্রলয়ের মাধ্যমে সমস্ত আত্মারই পরম আত্মায় বিলীন হয়।[৯০] জ্ঞানী মানুষের উচিত সেই গুহ্যরূপক অর্থ গ্রহণ করা। সাধারণ মানুষের আত্মার ক্ষমতা জীবাত্মার ক্ষমতার চেয়ে বেশি এবং তাদের অপরিশীলিত আত্মার চেয়ে দার্শনিক ও পয়গম্বরদের আত্মার ক্ষমতা অনেক অনেক গুণ বেশি এবং উঁচুস্তরের; তাদের আত্মা ঐন্দ্রিক বস্তুর পর্যায় অতিক্রম করে সম্প্রত্যায়ের (concept) পর্যায়ে উত্তরণ লাভ করে। প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সাধারণ মানুষের জন্য, যারা এ জগতের সৌন্দর্য কিংবা অতীন্দ্রিয় জগতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না। ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেন শুধু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অগ্রসর ব্যক্তি।

সংঘ পণ্ডিতরা ত্যাগ, তপস্যা এবং আত্মসংযমের উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। তবে তারা বলেন যে, কোনো প্রকার ভয়ভীতি লোভ লালসা ব্যতীত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বুদ্ধি দ্বারা যা করা উচিত বলে মনে হয় সেই কর্মসম্পাদন করাই প্রশংসনীয়। দিব্য বিশ্ব নিয়মের অনুসরণই সর্বোচ্চ ধর্মাচরণ। মানব জীবনের প্রেমের স্থান সর্বোচ্চে। পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনের জন্য এই প্রেমই সদা সক্রিয় এবং একমাত্র উপায়। ইহ জীবনে প্রতিনিয়ত পরার্থপরতা, স্নেহ, ভালোবাসা, ক্ষমতা সহানুভূতি মূলত ঐ প্রেমেরই নিকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত প্রেম ইহলোকে দেয় মানসিক সান্ত্বনা, হৃদয়ে দেয় স্বাতন্ত্র্য, সর্ব শেণীর প্রাণীর সাথে শান্তি স্থাপন করে এবং পরলোকে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে সকল আত্মার মিলন ঘটায়।[৯১]

নীতিশাস্ত্র

তাদের ধর্ম চেতনার মধ্যেই তাদের নৈতিক দর্শন নিহিত আছে। রেসেলার নবম খণ্ডে তাদের নীতি শাস্ত্র প্রসঙ্গে সবিস্তার বর্ণনা আছে। সাধারণ সুন্নি মুসলিমদের নিকট আদর্শ নৈতিক মানব হলেন নবী মোহাম্মদ এবং শিয়াদের নিকট আলী; কিন্তু সত্যের জন্য জীবন বিসর্জনকারী ঈসা অথবা প্লেটো কেন অন্যতম আদর্শ নৈতিক মানুষ বলে গণ্য হবেন না?[৯২] তাদের মতে মানুষের আচরণ যথার্থ বলে বিবেচিত হয় তখন যখন

সে তার স্বরূপ বা প্রজ্ঞার বিধান অনুসরণ করে। প্রত্যেকের উচিত জাগতিক নিয়মের অনুগত থেকে প্রাজ্ঞিক জীবন যাপন করা। বস্তুত প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী চলাই তাদের নৈতিক আদর্শ।

ভ্রাতৃসংঘ ত্যাগ ও আত্ম সংযমের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু একই সাথে তারা দৈহিক জীবনকে অবহেলা না করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য শারীরিক সুস্থতার একান্ত প্রয়োজন। সুস্থ শরীরে সুস্থ আত্মিক সাধনা সম্ভব। তাঁরা বলেন ঠিকমত দেহের যত্ন নেয়া উচিত যাতে আত্মা নিজেদের পূর্ণরূপে বিকশিত করার সময় ও সুযোগ পায়।

মধ্যযুগের সমন্বয়ধর্মী মানবতাবাদী দার্শনিক ভ্রাতৃসংঘ একজন আদর্শ ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিয়েছেন এরূপ : তিনি হবেন প্রাচ্য ইরানীদের মত উচ্চ বংশোদ্ভব, আরবদের মত শ্রদ্ধাশীল, ইরাক জাতির তুল্য শিক্ষিত, ইহুদীদের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যীশুর শিষ্যদের মত সদাচারী ও মার্জিত, সিরিয়ানী সাধুদের মত পবিত্র ভাব বিশিষ্ট, গ্রীকদের মত বিভিন্ন বিজ্ঞান নিপুণ, হিন্দুদের মত রহস্যের ব্যাখ্যাকারী, সুফিদের মত ঋষি।[৯৩]

তারা মধ্যযুগে এমন এক আদর্শ অভিজাত নেতার চিত্র এঁকেছেন তাতে প্লেটোর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন স্পষ্ট। বস্তুত তাদের মতে মধ্যযুগে একজন অভিজাত দার্শনিক নেতাই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের রূপান্তরে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে সমাজ পরিবর্তনকারী নতুন শ্রেণী বিকাশের পথ পরিষ্কার করেন।

মধ্যযুগের মূল বিচ্যুতি তাদের মধ্যে অক্ষত থাকলেও ইখওয়ান সে যুগের প্রগতিশীল মানবতার চিন্তা ভাবনার প্রবক্তা ছিলেন। প্লেটোর মত তাঁরাও তাঁদের সময়ের সমাজের অবকক্ষয় ও পতন ঠেকাতে চেয়েছিলেন।

২. রহস্যবাদী বস্তুবাদ

ক. আল কিন্দি

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল কিন্দি জন্মসূত্রে দক্ষিণ আরবের গোত্র কিন্দা বংশভূত বলে একমাত্র আরব দার্শনিক হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে সমধিক পরিচিত।[৯৪] সম্ভবত তিনি কুফা নগরে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকাল খুব নিশ্চিত না হলেও নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মেছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে এক পুস্তক হতে জানা যায় যে, তিনি ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তার মৃত্যুর বছরটি বিতর্কিত হলেও ধরে নেয়া যায় যে ৮৭০-৮৭৩ এর মধ্যে তা ঘটে থাকবে। তাঁর জন্মের সময় তাঁর পিতা ছিলেন কুফা নগরের প্রশাসক। তার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয় বসরায় এবং শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন বাগদাদে।[৯৫]

তার প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী হওয়ায় তৎকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতির-ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান সকল বিষয়ের উপর ছিল তার দখল।

কিন্দির মত ধীমন পণ্ডিতের চিন্তাধারার স্বরূপ অনুধাবন করার জন্য প্রথমে তাঁর অভ্যুদয় ও প্রসিদ্ধিকালে বাগদাদের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক বাস্তব অবস্থাটি অনুধাবন করার প্রয়োজন সর্বাধিক। আব্বাসী বিপ্লবের সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার জন্মভূমি বাগদাদ হয়ে ওঠে মহামানবের সাগর তীর; প্রাচীন সকল সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র। বাগদাদে আরব, সুরয়ানী, ইহুদী, খ্রিষ্টান, ইরানী, গ্রিক প্রভৃতি রক্তের এতই সংমিশ্রণ ঘটে যে, সেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণের নামে কোনো অসহিষ্ণুতার লেশমাত্র ছিল না।[৯৬] মামুনের জ্ঞানোদীপ্তকাল এবং মুতাওয়াক্কিলের প্রতিক্রিয়ার যুগে কিন্দি ছিলেন একজন জীবন্ত সাক্ষী। মোতাওয়াক্কিল ও তদোত্তর যুগ ৮৪৫—৮৭০ সময়কালটি ছিল বাগদাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটকাল; খেলাফতের অবক্ষয়কালের সূচনা পর্বও বটে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা জীবন শেষ হতে না হতেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একাধারে জ্যোতিষী এবং চিকিৎসক হওয়ার ফলে খলিফার দরবারে আপনাকে সহজে প্রতিষ্ঠিত করেন। কতদিন তিনি রাজদরবারে অবস্থান করেছিলেন তা সঠিক বলা যায় না। বায়তুল হিকমতের গ্রিক গ্রন্থ অনুবাদকদের তালিকায় তাঁর নাম পাওয়া যায়। বস্তুত তিনি কেবল একজন দক্ষ অনুবাদকই ছিলেন না তিনি অন্যের অনুবাদ সংশোধন এবং সম্পাদনার কাজও করতেন বলে জানা যায়। মোতাওয়াক্কিলের প্রতিক্রিয়া যুগের অবশ্যই তিনি শিকারে পরিণত হন; তাঁর অনেক পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হয়। রাজ দরবারে তার অবস্থান বেশি দিন স্থায়ী হয় নি।

তৎকালীন বাগদাদ সমাজে মেধাবী পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত আল কিন্দি প্রথম জীবনে মোতাজিলা মতাদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং ধর্ম চর্চার প্রতি আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু অচিরেই বিজ্ঞান দর্শনের প্রতি মনোবিবেশ করেন এবং গ্রিক চিন্তাধারা দ্বারা এতই প্রভাবিত হন যে, তিনি একদা বলেছিলেন যে, দক্ষিণ আরবের রাজ বংশের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন গ্রীকদের ভ্রাতা।[৯৭] গ্রিক ভাষা জানতেন বলে তিনি এ্যারিস্টটলের Meta physics, টলেমীর ভূগোল এবং ইউক্লিডের আরবি সংস্করণের সংশোধন করেন; এ্যারিস্টটলের Poetica এবং Hermeneutica এবং পারফেরীর ইসাগোজীর সংক্ষিপ্ত সার আরবিতে রচনা করেন। তদুপরি এ্যারিস্টটলের Analytica posteriora, Sophistica Elenchi the calegories এর ব্যাখ্যা লেখেন।[৯৮] অনুবাদের কাজ ছাড়াও তিনি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, ভূগোল, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং দর্শনের উপর পুস্তক রচনা করেন। বলা হয় তিনি ২৬৫ খানা পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন।[৯৯] প্লেটোর মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দর্শন চর্চা করতে গেলে গণিত অধ্যয়ন খুবই জরুরি, এমনকি, চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি গণিতের প্রয়োগ করেন। বিজ্ঞানমনষ্ক পণ্ডিত কিন্দি রসায়ন শাস্ত্রকে ভ্রান্ত এবং তাতে বিশ্বাসীদেরকে নির্বোধ বলতেন; অথচ গ্রহের হাতে মানুষের ভাগ্যকে সমর্পণ করা ছিল তাঁর কাছে বিজ্ঞান![১০০]

ধর্মীয় বিচার

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মামুনের মৃত্যুর পর ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার এত প্রবল হয় যে, ধর্ম সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করা ছিল বিপজ্জনক। এ কারণে কিন্দী প্রতিক্রিয়ার যুগে যে ধর্মীয় মতামত ব্যক্ত করেন সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তিনি যে মোতা-জিলাদের ধর্মীয় সিদ্ধান্তের সাথে সহমত পোষণ করতেন তা বুঝা যায়, তবে অদ্বৈতবাদে তার সর্বাধিক বিশ্বাস ছিল।[১০১] প্রজ্ঞাকে জ্ঞানের উপযুক্ত উৎস বলে মনে করেও আল কিন্দী প্রত্যাদেশের অকাট্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের মধ্যে সমন্বয় বিধানে চেষ্টা করেন। তিনি মনে করতেন প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ পরস্পরবিরোধী নয়; বরং তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। প্রজ্ঞার কাজ হল আদি কারণকে জানা, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিজনিত জ্ঞান ঐ মূল কারণকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ নয়। তাই আল্লার নবীদের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। শিক্ষা অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ আল্লার আশীর্বাদ লাভ করে এবং যে এ শিক্ষা অমান্য করবে সে আল্লার বিরাগ ভাজন হয়।

দার্শনিক বিচার

আল কিন্দীর উপর নব্য পিথাগোরাসীয় প্রাকৃতিক দর্শন (প্রকৃতি ব্রহ্মের কায়া-প্রকৃতির কার্য মূলত ব্রহ্মেরই কার্য-এরূপ চিন্তন) এ্যারিস্টটলীয় এবং নব্য প্লেটোবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে স্কলাস্টিক আচার্যগণ মনে করতেন কিন্দী এ্যারিস্টটলপন্থী তাই খ্রিষ্টান ধর্মের জন্য বিপজ্জনক। যাহোক কিন্দী যুক্তিবাদকে অবশ্যই সমর্থন করতেন তবে তা আপ্তবাক্যের সুবিধার দিকে নজর রেখে।

তত্ত্ববিচার

আল্লাকে বিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে তিনি মেনেছেন এবং কার্য-কারণ নিয়ম এবং হেতুবাদকে সমর্থন করছেন। তিনি আরো বলেন যে, কার্য-কারণ নিয়ম বিশ্বব্যাপী বলেই গ্রহ-নক্ষত্রের ভবিষ্যৎ অবস্থিতি এবং তাদের ভালো মন্দ ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। আল্লা 'মূল কারণ' হলেও জগতে কৃতকর্মের সঙ্গে তিনি সরাসরি সম্বন্ধ না রেখে মধ্যবর্তী কারণের দ্বারা কার্য সিদ্ধি করেন। পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা পরবর্তী কার্য হয়, আবার এই কার্য-কারণে রূপান্তরিত হয়ে তারও পরবর্তী কর্ম সৃষ্টি করে; কিন্তু কর্ম কখনো তার পূর্ববর্তী কারণ রূপ ধারণ করতে পারে না, তার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেমন মাটি পিণ্ড প্রস্তুত করে; পিণ্ড কর্ম, মাটি তার কারণ; আবার পিণ্ড কলস তৈরি করে; পিণ্ড কারণ, কলস কর্ম, কলস দ্বারা পিণ্ডের কোনো রূপদান সম্ভব নয়—পিণ্ডও মাটির কিছু করতে পারে না।

মূল কারণ আল্লা এবং জগতের মধ্যবর্তী হলো বিশ্বাত্মা বা নফসে আলম এখান থেকে দেবলোক এবং পরে মানবাত্মাসমূহের উৎপন্ন হয়। মানবাত্মা এবং তার আরাধ্য: বিশ্বাত্মা হতে নির্গত মানবাত্মা তার বাসনা-কামনা চরিতার্থ করার জন্য কায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়; কিন্তু স্বীয় স্বরূপে সে দেহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আর তা যে পর্যন্ত আত্মার স্বরূপে থাকে সে পর্যন্ত গ্রহের কোনো প্রভাব তার উপর পড়ে না; অবিনশ্বর পদার্থ। যদি মানবাত্মা ভাবলোক হতে ইন্দ্রিয়লোক অবতীর্ণ হয় তবুও তার মধ্যে পূর্বের সংস্কার থেকেই যায়। ইহলোকে তার শান্তি মেলে না, কেননা তার বেশির ভাগ আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থেকে যায়। জগতের সব কিছু অস্থির: ভাবলোকই স্থির। যদি আমরা বাসনা পূরণ করতে এবং প্রিয়জন হতে বিচ্ছেদ হতে না চাই তবে সুকর্মের প্রতি কায়মনবাক্যে নিবিষ্ট হতে হবে।

নউস (Nous)

নউস একটি গ্রীক শব্দ; এর অর্থ আত্মা বা নিত্য ভাব; ইংরেজি ভাষায় Intellect বলা হয়েছে। এটি গ্রীক দর্শনের একটি প্রধান বিচার্য বিষয়। মধ্যযুগে নউস সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন আল কিন্দি। এর পর হতে এটা আরব দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। ওলিয়াবী যথার্থই বলেন - Here lies the great importance of al kindi, for it was he who selected and indicated the starting point which all the later Arabic philosphers began from, and selected the material which they develeped. The particuler basis thus selected by al Kindi was the psychology of Aristatle, is de Anima as expounded by Alexander of Aphrodesias.[১০২]

আল কিন্দি নউস এর চারটি বৃত্তির (faculty) বা স্তরভেদ করেছেন। রাহুল সেগুলো এভাবে পরিবেশন করেন।

ক. প্রথম ভাব (বিশ্ব আত্মা Agent Intellct আকলে ফায়াল) : জগতের যা কিছু সনাতন, সত্য, আধ্যাত্মিক (অভৌতিক) তার মূল কারণ বিশ্বআত্মা পরমাত্মা; যা বিকিরণ প্রক্রিয়ায় স্বয়ং আল্লা থেকে মানব দেহে প্রবেশ করে।[১০২ক] এটা অমর, এর জ্ঞান ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। The extemel faculty is the Agent Intellcd (Aqle faal) which proceds from God by way of emanation and which, thourgh acting on the faculties in the body, is indepandet of this body, as its Knowledge is not based upon perception obtained through the senses.

খ. দ্বিতীয় মানবাত্মার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (Latent faculty of Soul Intelligenec) মানবাত্মার কোনো কিছু বুঝার যোগ্যতা অর্থাৎ বুদ্ধি যার সাহায্যে আত্মা বিকশিত হতে পারে।

গ. তৃতীয় আত্মার কার্যক্ষমতা (Active Inlelligence) : এ হলো সেই গুণ যা আত্মা ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। জ্ঞানটিকে বাস্তবে আনার ক্ষমতা যেমন লেখকের লিখন।

ঘ. চতুর্থ আত্মার ক্রিয়া : যার দ্বারা আত্মায় অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে বাহ্য জগতে প্রকাশ করা যায়–নিরাকার বিষয়কে আকার রূপদান। এ ক্রিয়া শারীরিক ও মানসিক উভয় হতে পারে।[১০৩] কাল গতির সদৃশ্য, তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে তা গতি থেকে ভিন্নতর—গতির যেখানে একাধিক চলার পথ থাকে, সেখানে কাল শুধু একদিকেই অগ্রসর হয়। দেশ বলতে সেই উপরিভাগকে বুঝায়, যা পদার্থকে বেষ্টিত করে রাখে। কিন্তু পদার্থকে উঠিয়ে নিলেও দেশ থেকে যায়, কারণ অন্যদেশ সব সময় বায়ু পানি প্রভৃতি অন্য যে কোনো পদার্থ দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়।[১০৪] ওলিয়ারী তার এসব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার পর মন্তব্য করেন। Admittedly al kindı shows a crude treatment of these ıdeas, but he was the fırst to Arabıc throught ın this direction, and from these arose a new attıtude towand the revealed doctrıne of creatıon on the part of those who came after hım.[১০৫]

কিন্দির নউস সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এ্যারিস্টটলের থিওলজীর ভাষ্যকার আলেকজান্ডার আফ্রেদিমিয়াসের নিকট হতে নেয়া হয়েছে; কিন্তু তার 'আত্ম প্রসঙ্গে' গ্রন্থে বলেন যে, এ্যারিস্টটল নউসের তিনটি স্তরভেদ করেন। কিন্দি প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল উভয়ের মতবাদে সমন্বয় ঘটিয়ে তার নিজস্ব চিন্তাধারা দাঁড় করিয়েছেন। বস্তুত নব্য পিথাগোরাসীয় ও নব্য প্লেটোবাদী রহস্যবাদী দর্শনের ভিত্তিতে তাঁর মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, কিন্দি ভাববাদের গোলকধাঁধায় পতিত হয়েও খোলাখুলিভাবে অজ্ঞাত যোগাচারের ভাববাদকে স্বীকার করেন নি। ঐ ভাববাদ ক্ষণিক না নিত্য, সে তর্কেও অবতীর্ণ হন নি বটে, কিন্তু ভাবের (Nous) যে চারটি ভেদ তিনি করেছেন এবং একের মধ্যে অন্যের রূপান্তরের কথা বলেছেন, তাতে বুঝা যায় যে, তিনি নিত্যতাকে মানতেন না।[১০৬]

জ্ঞানের উৎস প্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করতে হয় যে কিন্দি নউসের উল্লিখিত চারটি বৃত্তিই আত্মার নিজস্ব কাজ বলে মেনেছেন। আত্মার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং ক্ষমতাকে কার্যক্ষমতায় পরিণত করাও আল্লার দান—অর্থ হল আল্লাই সকল জ্ঞানস্রোত অথচ অন্যত্র বলা হয় আল্লা জগতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন না।

কিন্দির দর্শন ছিল নব্য প্লেটোবাদী এবং এ্যারিস্টটলের দর্শনের সংমিশ্রণ। কিন্দি তাঁর পাঁচটি সার ধর্ম প্রসঙ্গে নামক প্রবন্ধে জড়, আকার, গতি, দেশ ও কাল এর মত আধিবিদ্যক সমস্যা আলোচনা করেন।

এতে জড়কে সংজ্ঞায়িত করা হয় এমন একটি জিনিস হিসেবে যা অন্যান্য সার ধর্মকে গ্রহণ করলেও তা নিজে অন্য কোনো সারধর্মের গুণ হিসেবে গৃহীত হয় না। এ

জন্য অন্যান্য সারধর্মগুলো অস্তিত্বশীল থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ জড় নিজে অস্তিত্বশীল থাকে।

আকার দু প্রকারের। এদের প্রথমটি জড়ের সারধর্ম এবং অবিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়টি গঠিত সেই সব গুণের সমবায়ে, যাদের সাহায্যে জড়কে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। গুণগুলো এ্যারিস্টটলের ১০টি ক্যাটাগরি : দ্রব্য, পরিমাণ, গুণ, সম্বন্ধ, দেশ, কাল, অবস্থান, অবস্থা, ক্রিয়া এবং নিক্রিয়তা। এসব আকার প্রথম আকারটিতে অস্তিত্ব দিয়ে থাকে। দ্বিতীয় আকারটি ব্যতীত প্রথমটি অমূর্ত কিন্তু বাস্তব।

গতি ছয় প্রকারের–এদের দুটি দ্রব্যের অবস্থা ভেদ-সৃষ্টি ধ্বংস; দুটি পরিমাণ ভেদ হ্রাস-বৃদ্ধি; একটি গুণভেদ এবং একটি অবস্থান ভেদ।

আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রি.)

খ. আবু নসর মুহম্মদ ইবনে তর্খন ইবনে উজলগ আল ফারাবীর জন্ম হয় ট্রান্সওয়াক-সিয়ানার ফারাব জেলার বাসিজ নামক স্থানে। তাঁর পিতা মুহম্মদ বাসিজ একটা কেল্লার সেনাপতি ছিলেন। তার বংশলতিকা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পিতাই বংশের প্রথম দীক্ষিত মুসলিম। তাঁর পিতামহ বা প্রপিতামহের নাম অমুসলিম ও বিশুদ্ধ তুর্কী। তাই আবু নরস ফারাবী ছিলেন তুর্কী মুসলিম। তার বংশ লতিকা হতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, যদিও মধ্য এশিয়া উমাইয়াদের সময় অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য সময়ের দেড়শ বছর পূর্বে অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জয় হয়, তথাপিও এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সমগ্র এলাকায় ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নি এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তুর্কী জাতিসত্তা তখনো ইসলাম গ্রহণ করে নি।[১০৭] বৃহত্তর ইসলামি সমাজে প্রবেশের মাধ্যমে তাদের সমগ্র জাতিসত্তার রক্ষণ ও বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিলেই কেবল স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতদঞ্চলের ইসলামিকরণ সম্পূর্ণ হয়।

রাহুলের আর একটি মন্তব্য স্মরণে রাখা দরকার। ফারাবীর প্রতিভা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করার জন্য আমাদের আলোচ্য সময়ে ঐ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অবস্থাটা মনে রাখা দরকার। ফারাবীর আড়াইশ বছর পূর্বে চৈনিক ভিক্ষু পর্যটক পণ্ডিত হিউ-এন-সাঙ এর বিবরণ হতে এতদঞ্চলে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কথা জানা যায়। বস্তুত বারমেকী বা সামানীরা ছিলেন ঐ ঐতিহ্যের উত্তরসূরি। ফারাবীদের নব্য মুসলিম হওয়ার অর্থই ছিল ফারাবীর জন্মভূমিতে তখনো বৌদ্ধ দর্শন চর্চার ঐতিহ্য অবশিষ্ট ছিল এবং আমুদরিয়া তটের তুর্কীরা জ্ঞান ও কৃষ্টিতে উন্নত ছিল।[১০৮]

ফারাবীর প্রাথমিক শিক্ষা পিতৃগৃহে সম্পন্ন হয়। তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র বোখারা বা সমরখন্দে গিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না, এবং কখন ও কত বছর

বয়সে তিনি বাগদাদ গমন করেন-তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। এ সময় কিন্দি প্রয়াত হলেও রাজী তখনো বেঁচে ছিলেন। মাতৃভূমিতে অবস্থানকালে বুদ্ধি স্বাতন্ত্র্যের হাওয়া তাঁকে স্পর্শ করে বলেই বাগদাদে এসে তিনি খ্রিষ্টান পণ্ডিত মাত্তাবিন ইউনুসের নিকট চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং হাররানে গিয়ে খ্রিষ্টান দার্শনিক যোহান্না বিন খাইতানের নিকট দর্শন ও তর্ক বিদ্যা অধ্যয়ন করেন।[১০৯] চিকিৎসা ও দর্শন শাস্ত্র ছাড়াও সাহিত্য, গণিত এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন; ৭০টি ভাষা তিনি জানতেন বলে জানা যায়। তবে মাতৃভাষা তুর্কী ছাড়াও আরবি, পারসি, সিরিয়ানি ও গ্রীক ভাষার উপর তার প্রচুর দখল ছিল।[১১০]

হাররানে শিক্ষা সমাপ্তিব পর ফারাবী বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে এ্যারিস্টটলের দর্শনে মনোনিবেশ করেন। de anima দুশ বার এবং পদার্থ বিদ্যা ৪০ বার পাঠ করেন।[১১১] বাগদাদের রাজনৈতিক সংকট এবং সামাজিক অস্থিরতার কারণে তিনি প্রথমে আলোপ্পো পরে মিশর হয়ে আলেপ্পোতে পুনরায় আগমন করেন। এখানে হামদানের সামন্ত শাসক সাইফুদ্দৌলার মত একজন বিদ্যানুরাগীর সুনজরে পড়েন। ৯৫০ সালে তিনি দামাস্কাসে গমন করেন এবং সেখানে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাব বয়স ছিল ৮০ বছর। তার জীবনযাত্রায় গ্রীক সোফিস্ট, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং মুসলিম সুফিদের সাথে বেশি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হত। তিনি শান্তিপূর্ণ ও একান্ত জীবন যাপন পছন্দ করতেন ও সুফি দরবেশী খিরকা পরিধান করতেন। দামাস্কাসে তার কবর সুফি পরিচ্ছেদে আচ্ছাদিত করা হয়। তাঁর ব্যক্তি জীবন প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তৎকালীন প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর সামান্য আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে। ফারাবীর জীবদ্দশায় প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা; জানজ কারামিতা-সাফফারী বিদ্রোহ, বিপ্লব; বিচ্ছিন্নতাবাদের নবতর প্রকাশ; পূর্বাঞ্চলে তাহেরীদের পতন এবং সামানী নেতৃত্বে ইরানী জাতিসত্তার দ্রুত বিকাশ, গজনী সালতানাতের উত্থান; বুওয়াইহী নেতৃত্বে ইরানের নবতর বিকাশ এবং তাদের দ্বারা বাগদাদ দখল; আব্বাসী খেলাফতের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান; এরূপ পটভূমিতে সুন্নি মুসলিমদের উপর বাগাদাদ খলিফার আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা; বাগদাদে শিয়া-সুন্নি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খলিফা কায়েম ও কাহিরের নেতৃত্বে বাগদাদ নগরে খলিফার দরবারে ধর্মীয় সিণ্ডিকেট প্রতিষ্ঠা ও মুক্তবুদ্ধির বিরুদ্ধে অভিযান তথা সুন্নি ইসলামের সংকীর্ণ বৃত্তাবদ্ধতা এবং ফতুয়াবাজী হয়ে ওঠে প্রধান বৈশিষ্ট্য। আব্বাসী খেলাফতের ধ্বংসস্তূপে ইসলামি বিশ্ব বিভিন্ন সালতানাতে বিভক্ত হয় এবং সমরতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র এক নয়া রূপ পরিগ্রহ করে। প্রাচ্য ইসলামি বিশ্ব হতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহ তার খাত পরিবর্তন করে। এ সময় বাগদাদ ছাড়াও কায়রো, আলেপ্পো, সিরাজ, ইসপাহান, রায়, মার্ভ, নিশাপুর, বোখারা, সমরখন্দ ইত্যাদি শহর নগর সংস্কৃতি কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে। মামুন সৃষ্ট সাংস্কৃতিক প্রবাহ নয়া খাতে প্রবাহিত হয়।

এরূপ উদীয়মান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে আল রাজীর পথ-মতের বিকাশ সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, তবে এক নতুন খাতের দিক নির্দেশনা দেন আল কিন্দি, তার রূপ দেন ফারাবী; তার পূর্ণতা দেন ইবনে সিনা।

ফারাবী তরুণ বয়সে লিখিত অনেক ছোট ছোট গ্রন্থে তর্কশাস্ত্র, নব্য পিথাগোবাসীয় শারীবিক ব্রহ্মতত্ত্ব এবং প্রাকৃতিক দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাব পরিণত বয়সে এ্যারিস্টটলের অধ্যয়ন ও তার দর্শনের ভাষ্যের গভীরতার জন্য আল ফারাবীকে সানী হাকিম বা মুয়াল্লিম (দ্বিতীয় আচার্য) বলা হয়। এ্যারিস্টটলের পুনর্মূল্যায়নে তার অবদান ছিল অসাধারণ। তিনি এ্যারিস্টটলের যে গ্রন্থ সূচি প্রণয়ন করেন তা এখনো অনেকাংশে সঠিক। নব প্লেটোবাদীদের লেখা এ্যারিস্টটলের ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থটি তিনি এ্যারিস্টটলের গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেন। এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার ৮ খানা, বিজ্ঞানের ৮খানা, অধিবিদ্যার, নীতি শাস্ত্র ও বাজনীতিব ১ খানা করে বই এর উপর ভাষ্য রচনা কবেন।[১১২]

দার্শনিক বিচারধারা

গ্রীক দর্শনের বোদ্ধা পাঠক হিসেবে তিনি প্লেটো এবং এ্যাবিস্টটলের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্লেটো ছিলেন অবস্তুবাদী ভাববাদী এবং এ্যাবিস্টটল ছিলেন ভাববাদী বস্তুবাদী। তিনি নউস পুরোপুরি গ্রহণ করলেও তাঁর মধ্যে বস্তুবাদী প্রবণতা ছিল লক্ষণীয়। ফারাবী উভয় দিকপালেব মধ্যে সমন্বয় সেতু রচনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানের প্রতি তার মনোযোগ গভীব না হওয়ায় তিনি তৎকালীন যুগ মনের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। বাস্তব অবস্থার কারণে নব্য প্লেটোবাদ তাঁর উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তাব করে। অথচ তিনি এ্যারিস্টটলকেও ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর প্রতি আগ্রহী হন। পুনশ্চ তিনি ইসলাম হতে সরে যেতে চান নি। বস্তুত তিনি নব প্লেটোবাদ-এ্যারিস্টটলবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন। তার ধারণা ছিল তাঁদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল বর্ণনাশৈলীতে, পদ্ধতি ও শব্দ প্রয়োগে।[১১৩] মূলত উভয়ের ভাবধারা তুল্যমূল্য, উভয়ই উচ্চ দর্শন বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক।[১১৪] বস্তুত উভয়ের প্রতি তিনি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে কাউকে ছাড়তে পারেন নি।

যুক্তিবিদ্যা

ফারাবীর মতে যুক্তিবিদ্যা কেবল প্রয়োগসিদ্ধ চিন্তার বিশ্লেষণ নয়; জ্ঞানতত্ত্বের প্রামাণিকতা তথা ব্যাকরণগত বিষয়ও যুক্তিবিদ্যার অন্তর্গত। অবশ্য যুক্তিবিদ্যার সাথে ব্যাকরণের পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যাকরণ একটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভাষাগত ধ্যান-ধারণার বিষয়ে আগ্রহী অথচ যুক্তিবিদ্যা সমগ্র মানবজাতির চিন্তার ভাষাই এর সমস্যা।

যুক্তিবিদ্যার সূত্রপাত ঘটে বাগধারা দিয়ে, এবং ক্রমশ তা অগ্রসর হয় জটিলতর ধারণার দিকে। সহজভাবে বলতে গেলে এর আলোচ্য বিষয় শব্দ হতে বাক্য, বাক্য হতে যুক্তিসঙ্গত ধারণা সৃষ্টি। তাই যুক্তিবিদ্যার প্রধান কাজ হচ্ছে জ্ঞান ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণাসমূহ হতে এমন কিছু সম্প্রত্যয় সৃষ্টি করা যা আগে ছিল অজ্ঞাত।

সামান্য ও বিশেষ

গ্রীক দর্শনে সামান্যকে একটি স্বতন্ত্র বস্তুসৎ পদার্থ বলে সিদ্ধ করার অনেক চেষ্টা করা হয়। ফারাবী ইসাগোজীর উপর ভাষ্য রচনা করার সময় এক স্থানে সামান্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, শুধুমাত্র বস্তু বা ইন্দ্রীয় প্রত্যক্ষণ দ্বারাই নয়, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বিশেষকে পাই। এভাবে সামান্য বস্তু ব্যক্তির মধ্যে কেবল ঘটনা নির্ভর হয়েই থাকে না, অন্তরের মধ্যেও একটি দ্রব্যরূপে তা অবস্থিত। এ কথা ঠিক যে, মন বস্তু দ্বারাই সামান্যকে কল্পনা করে। তবু এতে সন্দেহ নেই যে, সেই বস্তুপিণ্ডের অস্তিত্ব প্রাপ্তির আগে থেকেই সামান্য সত্তারূপে অবস্থান করে। মানুষের মন বিশেষ বস্তু থেকে সার্বিককে পৃথক করতে পারে, তবে এ ধরনের পৃথকীকরণের আগেও সার্বিকসমূহের অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং সার্বিকসমূহ নিছক মানসজাত প্রতীতি নয়, বরং বিশেষ বস্তুর মাধ্যমে তাদের বাস্তব সত্তাও রয়েছে।[১১৫]

অদ্বৈত তত্ত্ব

আল ফারাবী আল্লার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বস্তুসত্তার ব্যবহার করেন। তাঁর মতে সত্তা দু প্রকারের। ক. আবশ্যিক সত্তা, খ. সম্ভব সত্তা। কোনো বস্তুর সত্তা তখনই বিদ্যমান হয় যখন তার কোনো কারণ থাকে—যার থেকে তার উদ্ভব। ঐ কারণ স্বয়ং অন্য একটি পূর্ববর্তী কারণের ফল। এভাবে সত্তা ও কারণের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত এমন একটি আদি কারণে উপনীত হই যার নিজের কোনো কারণ থাকে না। কেননা শৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নিয়ম অনন্ত নয় সান্ত। অতএব আমাদের এমন এক সত্তাকে স্বীকার করে নিতে হয় যিনি স্বয়ং কারণ রহিত হয়েও সব সত্তার আদি কারণ, যিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়, পরম শুভ, পরম চেতন , পরম সত্তা, তিনি প্রকৃতির সব কল্যাণে সুন্দর রূপের প্রেমিক। তার অস্তিত্ব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না–কারণ তিনি স্বয়ং প্রমাণ ও সত্য। এরূপ সত্তার আবির্ভাব যেমন আবশ্যিক তেমনি তার একটি অদ্বিতীয় হওয়ার প্রয়োজন। দ্বৈত হলে তার মধ্যে সমানতা এবং অসমানতা উভয়ের প্রকাশ হবে যার সংঘাতে প্রত্যেকের সারল্য বিঘ্নিত হবে। তাই পরিপূর্ণ সত্তার অদ্বৈত হতে হয়। সেই এক সত্তায় সকল বস্তুই লীন হয়ে যায়। ভেদাভেদ সেখানে থাকে না। মানুষ তার কল্যাণরূপের সুন্দর নামকরণ করে।[১১৬]

সৃষ্টি তত্ত্ব

পরম অদ্বৈত সত্তা হতে বিকিরণ প্রক্রিয়ায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশকে ফারাবী ছয়-ছয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

১. প্রথম সত্তা সর্বশক্তিমান জ্যোর্তিময় সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ যার মধ্যে সকল প্রকারের বস্তুর আকৃতি (পিতাগোরাসীয়) অনন্তকাল অবস্থান করে।
২. দ্বিতীয় সত্তা আল্লাহর প্রতিকৃতি সৃষ্টিশীল আত্মা (Agent Intellect/creative sprit) এই বিশ্বাত্মা হতে সৃষ্টি হয় নভোমণ্ডল।
৩. তৃতীয় সত্তা হচ্ছে প্রজ্ঞা, তাকে পবিত্র আত্মাও বলা হয়; এটা স্বর্গলোক ও মর্ত-লোকের মধ্যকার সেতুবন্ধনস্বরূপ।
৪. চতুর্থ সত্তা আত্মা; প্রজ্ঞা ও আত্মা সত্তাদ্বয় অদ্বৈতের স্বরূপে না থেকে মানুষের সংখ্যা অনুসারে অসংখ্যক হয়।
৫. পঞ্চম সত্তা আকৃতি; (Form) পিথাগোরাসের আকৃতি, যা বস্তু সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের বস্তু সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
৬. ভৌতিক উপাদান বা আদিজড় বস্তু যথা মাটি, জল, বায়ু ও আগুন রূপের মধ্যে। এই সত্তাসমূহের প্রথম তিনটি পরমাত্মা, বিশ্ব আত্মা (Agant Intillegent) প্রজ্ঞা সদাভাব (নউস) স্বরূপ নিরাকার। পরবর্তী তিনটি যথা আত্মা আকৃতি ও আদিজড়-মূলত নিরাকার হলেও শর্তসাপেক্ষে দেখার সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

ছয় শ্রেণীর সাকার সত্তাগুলো নিম্নরূপ :

১. দেবলোকে দেহধারী ফেরেস্তা;
২. দেহধারী মানব;
৩. দেহধারী পশু ও পক্ষী;
৪. বনস্পতিকার বৃক্ষাদি সাকার পদার্থ;
৫. ধাতুকায়—স্বর্ণ-রৌপ্যকার সকার বস্তু;
৬. ভৌতকায়—মাটি, জল, অগ্নি বস্তু।[১১৭]

জ্ঞান তত্ত্ব

আল কিন্দির মত ফারাবীও মনে করতেন যে, জ্ঞান মানুষের সাধনার বস্তু নয়; খোদা প্রদত্ত বিষয়। আত্মার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে ফারাবী বলেন যে, শরীরের পূর্ণতা দান করে আত্মা; কিন্তু আত্মার পূর্ণতা দান করে পরমাত্মা। এ পরমভাব শিশু আত্মায় সুপ্তরূপে থাকে অর্থাৎ তার ক্ষমতা অন্তর্নিহিত থাকে। ঐ সুপ্ত ভাবকে জাগরিত অবস্থায় নিয়ে আসা মানব সাধনার ফল নয়, দেবাত্মা দ্বারা তা প্রকাশিত হয়। পুনশ্চ দেবাত্মা সম্ভব নয় এবং তার আপন সত্তার প্রকাশের জন্য মূল ভাব বা আল্লার উপরই

নির্ভরশীল। তার জ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা হল অনেকাংশে অদৃষ্টবাদে আত্মসমর্পণই বুঝায়। পরম সত্তার বিনা আদেশে গাছের পাতা নড়ে না— এটাই সামন্ত ভাবাদর্শের চূড়ান্ত রূপ।

আল ফারাবী কিন্দির মত আত্মাস্থিত বুদ্ধিকে সুপ্তবুদ্ধি, সক্রিয়বুদ্ধি, চালক বুদ্ধি এবং অর্জিতবুদ্ধি এই চার ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলোর সমবায়ে এক ঊর্ধ্বগামী অনুক্রম গঠিত হয়। অনুক্রমে নিম্নতম বৃত্তি (faculty) তার উচ্চতর বৃত্তির উপাদনস্বরূপ। এই নিম্নতম বৃত্তিকে বলা হয় সুপ্তবুদ্ধি। এ দ্বারা মানুষের সেই ক্ষমতাকে বুঝায় যার সাহায্যে সে জড় বস্তুর যার সাহায্যে বিভিন্ন আপতিক গুণ থেকে তার অন্তঃসারকে মানসিকভাবে পৃথক করে বুঝে থাকে। দ্বিতীয় বৃত্তিটির নাম সক্রিয় বুদ্ধি (আকলে বিল ফেল) এটি প্রথম বৃত্তিটিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং মানসিক চিন্তা ভাবনাকে সম্ভব করে তোলে। তৃতীয় বৃত্তিটিকে বলা হয় চালিকা বুদ্ধি (আকলে ফাল)। এটি এমন একটি বাহ্য শক্তি, যা বিকিরণের মাধ্যমে আল্লাহ থেকে নিঃসৃত হয়। মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে তা মানুষকে সক্রিয় করে তোলে। এটি সক্রিয় বুদ্ধি বটে; কিন্তু দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার ফলে এর ক্রিয়া তৎপরতা সীমিত হয়। চুতর্থ বৃত্তিকে বলা হয় অর্জিত বুদ্ধি (আকলে মুস্তাফাদ)। এটি এমন একটি বৃত্তি, যাকে আত্মার তৃতীয় বৃত্তি চালক বুদ্ধির প্রেরণা মানুষ অর্জন করে।

মানবাত্মার প্রধান লক্ষ্য হল পরমাত্মার মধ্যে মিলিত হওয়া। এটা কি করে সম্ভব সে সম্পর্কে ফারাবী বলেন মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন হল তার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিসম্মত জ্ঞান। মানুষের মৃত্যুর পর তার জ্ঞানী আত্মা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। মানবাত্মা তার উচ্চতর দেবাত্মার সাথে সামঞ্জস্য থাকায় তার মধ্যে বিলীন হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে তা পরমাত্মায় বিলীন হতে পারে।[১১৮]

উপরের আলোচনা হতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় তা হল ফারাবী মূলত এ্যারিস্টটলের বিচারধারা গভীরভাবে অনুভব করতে এবং ব্যাখ্যা করতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি তার নিজস্ব স্বতন্ত্র বিচারধারা গড়ে তুলতে বেশি দূর অগ্রসর হন নি। এ কথাও সত্য যে, তার উপর ভাববাদ তথা রহস্যবাদ এবং মরমিবাদের প্রচণ্ড প্রভাব থাকা সত্ত্বেও যুক্তি ও স্বতন্ত্র চিন্তন তার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেই তৎকালীন ফলিত জ্যোতিষ এবং রসায়ন শাস্ত্রের উপর তাঁর কোনো আস্থা ছিল না।[১১৯]

বস্তুত তার সমসাময়িককালে বিজ্ঞান মনস্কতা দৃঢ়মূল হওয়ার আদৌ উপযোগী পরিবেশ ছিল না। বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগতি দূরের কথা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিদ্যার উদ্ভব হয় নি বললে বেশি বলা হয় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বদাই একটি সামাজিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক অগ্রগতি হলেও তার প্রকৃত

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি; গবেষণারও অগ্রগতি হয় নি। রসায়নের ক্ষেত্রে সে যুগে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ বা তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন না করে বরং তৎকালীন মননকে মায়া মরীচিকার দিকে ধাওয়া করে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী সামন্ততান্ত্রিক স্থবির কৃষি অর্থনীতির মধ্যে উৎপাদন শক্তি এতই নিম্নমানের ছিল যে, সেখানে উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তন ও প্রযুক্তির বিকাশের অবকাশ থাকে না। এ কারণে ভাববাদী রহস্যবাদী চিন্তা বস্তুবাদী চিন্তাকে চেপে রাখে। ফারাবী প্রতিভা ঐ বৃত্ত ভাঙ্গতে পারে নি।

নীতিশাস্ত্র বিচারধারা

ইতিপূর্বে ফারাবীর জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে যে, পরমভাব বা আল্লাহই হচ্ছেন জ্ঞানের উৎস। এ চিন্তাধারার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে নির্ভেজাল অদৃষ্টবাদ। ভাল মন্দ, পাপপুণ্য, বিবেক সবই আল্লাহর দান। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বে অন্য একটি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। ফারাবী সাধারণ পণ্ডিতদের মত "হও হয়ে গেল" তত্ত্বের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন নি। বা অভাব হতে ভাবের উৎপত্তি-এ মতবাদের মতো করেও ভাবেন নি। পরমভাব ব্যতীত সকল বস্তুর বিকাশতত্ত্বের কার্য-কারণসমূহকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেন। বস্তুত এ্যারিস্টটলের বস্তুবাদ তার উপরও প্রভাব ফেলে—এ কারণে তার নীতিশাস্ত্র সমসাময়িক চিন্তাধারা হতে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। তিনি জ্ঞানস্রোতকে অপৌরুষ বলে ভেবেও নৈতিক নীতি নিয়মকে মানব সৃষ্টি বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলতেন শুভাশুভ জ্ঞান মানুষের বুদ্ধির ঊর্ধ্বে নয়। শুদ্ধ জ্ঞানকে তিনি কর্মের বা আচারের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন বলেই বিশুদ্ধজ্ঞানের উৎসকে মানুষের ঊর্ধ্বে রাখতে চান।

রাজনৈতিক বিচারধারা

ফারাবী প্লেটোর 'প্রজাতন্ত্র' এবং এ্যারিস্টটলের 'রাজনীতি' গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করে থাকবেন এবং প্লেটোর 'প্রজাতন্ত্র' দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। যাহোক তিনি অনেকখানি সমাজসচেতন ছিলেন বলেই রিসালাতু ফিল আরায়ে আহলে মদিনাতুল ফাজিলাহ এবং সিয়াসাতুল মাদানিয়াহ গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তাঁর সমসাময়িক বাস্তবতার কারণেই সম্ভবত প্লেটোর জগৎ-এথেন্স নগরীর প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে তার কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল না বলেই কোথাও সে সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন নি। এ্যারিস্টটলের গ্রীক জাতির বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত লেখনি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন বলেও মনে হয় না। মধ্যযুগের প্রচলিত রাজতন্ত্রের কোনো বিকল্প থাকতে পারে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কোনো লক্ষণও তাঁর লেখনিতে পাওয়া

যায় না। তিনি তাঁর যুগ মানসের গণ্ডির বাইরে যেতে পারেন নি; তাঁর মত একজন অদ্বৈতবাদীর পক্ষে রাজতন্ত্রীর ধারণাটাই বড় হওয়া স্বাভাবিক।

প্লেটোর প্রজাতন্ত্র দ্বারা সম্ভবত প্রভাবিত হয়ে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র বহু দার্শনিক দ্বারা পরিচালিত প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে ফারাবী একজন আদর্শবাদী দার্শনিক রাজার শাসনাধীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন। ফারাবী তার সিয়াসাতুল মাদানিয়া গ্রন্থে তার আদর্শ রাজতন্ত্রী সম্পর্কে হিট্টির ভাষায় বলেন। He represents his conception of a model city which he conceived as hiererchical organism analogous to the human body. The sovereign, Who coresponds to the heart, is served by functionaies and who are themselves served by other still lower. In his Ideal city the object is assocation in the happiness of its citizen and the sovereign is perfect morality and intellectually.[১২০]

গ্রীক দার্শনিকদের মত তিনি স্বীকার করেন যে, মানুষ মূলত সামাজিক প্রাণী; জীবন সাধনায় তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে তার আলোচনায় তার যুগের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। তিনি কতকগুলো হেতুবাক্য (premies) বা সহানুমান (Syllogism) খাড়া করে, এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ভূপ্রকৃতি বা আবহাওয়া মানব চরিত্র গঠনের উপর প্রভাব লক্ষ্য করে তদুপরি প্রকৃতিগতভাবে কেউ অধিক শক্তিশালী হয়, কেউ অধিক কষ্টসহিষ্ণু হয়, কেউ দুর্বল হয়। অতএব বিভিন্ন ধরনের মানুষের জন্য একজন অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজার অধীনতা স্বীকার করা আবশ্যক। রাজ্যের ভালো মন্দের সব দায়িত্ব তিনি রাজার উপর ন্যস্ত করেন। তিনি মনে করেন একজন রাজা যদি কল্যাণ, শুভ সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, দুরাচারী বা অত্যাচারী হন, তবে তার জন্য কোনো মঙ্গল নেই। এ কারণে তার আকাঙ্ক্ষিত রাজা হবেন প্লেটোর দার্শনিক নেতার মত। এরূপ দার্শনিক রাজা দেশের শাসন কাজে গুণী ব্যক্তিদের সহযোগিতা নেবেন। বস্তুত ফারাবী নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন, তবে তার জন্য কতকগুলো কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, মূর্খ রাজা শাসিত রাজ্যের বাসিন্দাগণ নির্বোধ ও পশুতুল্য। যেহেতু দেশ বা প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য রাজাই দায়ী; কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে পরলোকে তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এরূপ অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকার আছে কিনা—এ প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। তাঁর লেখনিতে বিভিন্ন জাতিসত্তার বিকাশের প্রতি যে সমর্থন ছিল তা বস্তুত তৎকালীন বাস্তব অবস্থারই প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু তাঁর যুগের প্রচণ্ড সামাজিক অস্থিরতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, শোষণ প্রকৃতি, কৃষক জনতা দুরাবস্থা—তার প্রতিকার কোনো প্রসঙ্গই আলোচিত হয় নি।

তার রাজনৈতিক দর্শন প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রাহুল বলেন যে, তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল ব্যবহার বুদ্ধি শূন্য। এরূপ অবস্থার কারণ বিশ্লেষণে তিনি

বলেন যে, ফারাবী একজন চিকিৎসকও বটে; একজন চিকিৎসক ব্যবহারিক গুণ সম্পর্কে অজ্ঞ হবেন তা তো হতে পারে না। শুধু এটুকু বলা যায় যে, তিনি ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা দার্শনিকের কল্পনা জগতে বাস করতে পছন্দ করতেন।[১২১] বাস্তবতার মুখোমুখী না হয়ে কেন তিনি পলায়নবাদ গ্রহণ করেন? তার সময়কালটি ছিল মুসলিম বিশ্বে চরম রাজনৈতিক সংকটকাল; দ্রুত আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের দিন। এমতাবস্থায় বাস্তবের মুখোমুখী হওয়া ছিল খুবই কঠিন। তিনি এ অবস্থার অবসানের জন্য বিকল্প জ্ঞানোদীপ্ত দার্শনিক নিরঙ্কুশ রাজার অধীনে রাজত্বের প্রস্তাবনা রাখেন।[১২২]

ব্যক্তি জীবনে আল ফারাবী একজন উচ্চমানের সুফি বা বৌদ্ধ ভিক্ষুকের ন্যায় সরল সহজ জীবনযাপন করতেন। তাঁর পার্থিব সম্পদ ছিল না, তবে তার হৃদয়ের ঐশ্চর্য ছিল প্রচুর। তিনি দর্শনের পুস্তক অধ্যয়নে গভীর তৃপ্তি লাভ করতেন; আর অবসর সময়টি কাটাতেন পুষ্পদ্যানের শোভা অবলোকন করে, পাখির কলকাকুলি শুনে। সনাতন পন্থীরা তাকে আদৌ পছন্দ করতেন না, তবে তাতে তিনি আদৌ বিচলিত হতেন না। তাদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে তাদের মতামতে তার কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়া হতো না। সে যুগে অনেকের নিকট তিনি ছিলেন মহান তত্ত্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞেয় জ্ঞান তাপস-উন্নত মানুষ। এটাই ছিল তার পক্ষে যথেষ্ট সন্তুষ্টির কারণ।[১২৩]

ফারাবীর মত নির্জনতাপ্রিয় প্রকৃতি প্রেমিক উঁচুদরের দার্শনিকের নিকট জন সমাগম ছিল কম–তাই তার শিষ্য সংখ্যা ছিল অল্প সংখ্যক। তার দু জন বিখ্যাত শিষ্যের একজন ছিলেন এ্যারিস্টটলের অনুবাদক য্যাকব খ্রিষ্টান আবু জাকারিয়া ইয়াইহীয়া ইবনে সালী; অন্যজন আবু সুলাইমান মুহাম্মদ বিন তাহির সিজিস্তানী। তিনি ফারাবীর তর্কশাস্ত্রের উপর টীকা লেখেন। তার শিষ্যদের মধ্যে দুটো ধারা গড়ে ওঠে। তার একদল শিষ্য যারা তর্কশাস্ত্রকে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করে কেবল বুদ্ধির মার পেঁচ ও বাকচাতুর্য হিসেবে গ্রহণ করেন। আনেকে আবার তাঁর সুফি প্রবণতা বা রহস্যবাদের জালে আটকে পড়েন। কেউ তাঁর বস্তুবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিকশিত করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। তার শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে একটি মহৎ মানবিক গুণ ছিল লক্ষণীয়। তাদেরকে দেশ-জাতি, ধর্মের সংকীর্ণতা স্পর্শ করে নি। তাদের বিশ্বাস ছিল ঐ সমস্ত পার্থক্য বাহ্যিক; সকলের মধ্যে আছে এক অভিন্ন সত্য।[১২৪]

গ. আবু আলী আল মিসকাওয়াই

আবু আলী আল মিসকাওয়াই ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ নিশ্চিত করে বলা না গেলেও তিনি প্রয়াত হন ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি অবশ্য বৃদ্ধ বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তার ব্যক্তি জীবন সম্বন্ধে

বিস্তারিত জানার উপায় নেই। তিনি বুওয়াইহী সুলতান আজদুদ্দৌলার খাজাঞ্জির প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক, বড় মাপের ঐতিহাসিক, এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। দর্শনশাস্ত্রে ছিল তাঁর মৌলিক অবদান। নীতিশাস্ত্র পুনর্গঠনের জন্য ইতিহাসে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

এই বিখ্যাত রাজনীতিবিদ দার্শনিকের চিন্তনের মূল্যায়নের পূর্বে তার সময়ে প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন আছে। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে পূর্বাঞ্চলে তাহেরী বংশ (৮২০-৯৭২ খ্রি.), সাফফারী (৮৬৭-৯০৮ খ্রি.), সামানী (৮৭৪-৯৯৯ খ্রি.) এবং গাজনী (৯৬২-১১৮৬ খ্রি.) নেতৃত্বে বিভিন্ন জাতিসত্তার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। তাহেরী ও সাফফারী ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী সামন্ত শক্তি। সামানীরাও তাদের পথ বেশ কিছু দিন অনুসরণ করার পর এক পর্যায়ে খোতবাহ হতে খলিফার নাম পাঠ বন্ধ করে প্রকৃতপক্ষে বাগদাদের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করেন। বুওয়াইহীরাই প্রথম ঘোষণা দ্বারা খেলাফতের স্থলে বাগদাদে সালতানাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বস্তুত বাগদাদসহ সমগ্র পারস্যে বুওয়াইহী ইরানী বংশের সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয় ৯৪৬ সালে। বুওয়াইহীরা ছিল উদার পন্থী শিয়া; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে। তথাপি এ ঘটনার পর গজনী বংশ পৃথক সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে; খলিফাকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। এই উদীয়মান শক্তি বুওয়াইহীদের বিরুদ্ধে সুন্নি ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করায় মুসলিম বিশ্বে এক নতুন রাজনীতির সূচনা হয়; এক নতুন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে।

সংক্ষেপে উল্লেখিত পর্যায়ক্রমিক ঘটনা প্রবাহের পশ্চাতে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল ছিল তাও স্ববিস্তারে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং এর ফলাফলও আলোচিত হয়েছে। এই ঘটনা প্রবাহে খেলাফতের পতন এবং নতুন জাহানদারী বা সালতানাতের প্রতিষ্ঠা ইসলামি রাষ্ট্র চেতনায় নয়া শাসনতান্ত্রিক প্রবর্তন এক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ফসল। এই রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রশ্চাতে ছিল একটি সামাজিক বিপ্লবের কাহিনী। সর্বজনবিদিত যে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সাম্যনীতি ছিল ইসলামের একটি মৌল আদর্শ। অথচ আরবদের বিজয় অভিযানের সাথে সাথে ঐ মহান আদর্শ বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যায়; কার্যত আরব অনারব বা আরব আজম পার্থক্য গড়ে ওঠে। উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের উক্ত মৌল নীতিরই বিজয় হয়। যদিও পরবর্তীকালে ঐ মৌলনীতির সুষ্ঠু বিকাশ সাধিত হয় নি।[১২৫] এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামি উম্মার নেতৃত্ব হতে কোরাইশ বা আরবের একচেটিয়া অধিকার চিরতরে বিনষ্ট হয়; জাতি বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো যোগ্য ব্যক্তিত্বে নেতৃত্ব সম্প্রসারিত করার মৌলনীতি মধ্যযুগেই স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়। সমাজ সংগঠনে এটাই একটা বড় পদক্ষেপ। এরূপ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিপুলভাবে প্রভাবিত করে নয়া সংস্কৃতি বিকাশে ইতিপূর্বে শোয়োবীয়া আন্দোলনের কথা বলা

হয়েছে। তদুপরি এ সময় উদীয়মান ইরানী সাংস্কৃতিক আন্দোলন পায় নতুন এক গতিবেগ এবং লাভ করে এক পরিণতি। মহা কবি ফেরদোসী (৯৪০-১০২০ খ্রি.) রচনা করেন তাঁর অমর মহাকাব্য শাহনামা। এতে প্রাচীন গৌরবময় ইরানী ইতিহাস ও ঐতিহ্য উদীয়মান ইরানী জাতিসত্তার সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে পারস্য প্রতিভা তার সাহিত্য শিল্পকলা বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পায়। এ প্রক্রিয়ায় বড় অবদান রাখেন আবু রায়হান আল বেরুনী (৯৭৩-১৪৪৮ খ্রি.)। তিনিই ভারত রত্নের সন্ধান দেন উদীয়মান তুর্কী-জাতিসত্তাকে। এতে তুর্কী জাতিসত্তা মধ্যযুগে গৌরবময় ভাগ্য রচনার দিক- নির্দেশনা পায়।

মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলের এরূপ রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে মিসকাওয়াই তাঁর দর্শন চিন্তন নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করেন মানবাত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস দিয়ে। তিনি মানবাত্মা এবং পশু আত্মার মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। পরমাত্মা ও মানুষের বৌদ্ধিক চিন্তনকে তিনি এতই প্রধান্য দিয়েছেন যে, তার ফলে পশু আত্মাকে মানবাত্মার শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। মানবাত্মা এমনই একটা অমিশ্র নিরাকার সত্তা যে, সে নিজের সত্তা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া তৎপরতা অনুভব করতে পারে। আত্মা ঐন্দ্রিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার ধারণাবলীকে জড়িয়ে আকৃতিবিহীন হিসেবে জানতে পারে। এ জন্য আত্মার জ্ঞান ইন্দ্রিয় জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এমন সব বস্তুর ও যৌক্তিক জ্ঞান লাভে সক্ষম যা ইন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। তার স্বভাব বস্তুগত নয়, আধ্যাত্মিক—তার প্রমাণ হল এই যে, যেখানে বাস্তব দেহ বিভিন্ন রকম আকৃতির মধ্যে মাত্র এক রকম আকৃতি গ্রহণ করতে পারে, সেখানে আত্মা কিন্তু একই সময়ে বেশ কয়েকটি আকার ধারণ করতে সক্ষম। এমন নয় যে, আত্মা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উভয় প্রকার আকৃতিকে অবাস্তব স্বরূপে গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কলমকে লম্বা দেখি, কিন্তু স্মৃতিতে যে আকৃতির ধারণা সুরক্ষিত হয়, তা বাস্তবের মতো লম্বা নয়। অতএব আত্মা বাস্তব সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, আত্মার জ্ঞান তার দৈহিক সীমা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়গোচর জগতের সীমান্ত অতিক্রম করে। সত্য মিথ্যার জ্ঞান আত্মার সহজাত, ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত নয়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিচার আত্মা করে ঐ সহজাত ক্ষমতার সাহয্যে। আমি জানি এ রূপ অনুভব করা আত্মা চেতনাই হলো সব বড় প্রমাণ যে, আত্মা হল একটি অজড় সত্তা।[১২৬]

মিসকাওয়াই দর্শন জগতে তাঁর নীতি শাস্ত্রের জন্যই সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। বস্তুত তাঁর রচিত গ্রন্থ তাহজিবুল আখলাক এর জন্য তিনি ইসলামের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেন। এ পুস্তক প্রণয়নের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন ...is to acquire for ourselves such a character that all our actions issuing there from may be good, at the sametime, may be performed by us easily.[১২৭] এই পুস্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি প্লেটো এ্যারিস্টটল এবং গ্যালেন এর নৈতিক মতাদর্শের সাথে

ইসলামের নৈতিক আদর্শের সমন্বয় ঘটাতে সাফল্য অর্জন করেন। তাহজিবুল আখলাকের উপর এ্যারিস্টটলের ইতিহাস বা নীতিশাস্ত্রের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এ পুস্তকের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই পুস্তকের আদলে আল গাজ্জালী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ইয়াহইয়া উল উলুম গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি মানুষের মধ্যে লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি আট প্রকারের দুরাচারের বিস্তারিত বিবরণ নিখুঁতভাবে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, এসব দুরাচার মূলত নৈতিক ব্যাধি। এসব ব্যাধি নিরাময়ের জন্য তিনি দু প্রকারের উপায়ের কথাও বলেছেন, গ্রন্থটি দুটি সেকশনে বিভক্ত। ক. রোগের বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ-যেমন কার্পণ্য রোগ দূর করার জন্য অধিক ব্যয় করা; খ. সমস্ত নৈতিক ব্যাধিমূল ক্রোধ এবং মোহকে মন হতে উচ্ছেদ করা।

পাপ-পুণ্য

মিসকাওয়াই তাঁর নীতি শাস্ত্রের আলোচনার সূচনা করেন-শুভ-অশুভ স্রোত দিয়ে। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন–শুভ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, যার দ্বারা একজন উদ্যোগী ব্যক্তি আপন উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন। তিনি সামাজিক মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করেন। ক. অল্প সংখ্যক এতই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক যে তাদের পক্ষে অন্যায়ের দিকে ঝুঁকা সম্ভব নয়; খ. আবার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছে যারা তাদের সহজাত কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে ভাল হওয়ার কোনো সম্ভবনা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন এদের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। এ দু শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত বাকি অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা তৃতীয় প্রকারের। এরা কেউই জন্মসূত্রে ভাল বা মন্দ নয়। সৎ বা অসৎ পথে অগ্রসর হওয়ার স্বাধীনতা তার আছে; সে ইচ্ছা করলে উচ্চতর মূল্যবোধ বা নীতিবোধ অর্জন করতে পারে অথবা আপনাকে পশু পর্যায়ে অধঃপতিত করতে পারে। এ অবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে তার সামাজিক পরিবেশ এবং শিক্ষা-দীক্ষার উপর। মানুষ মূলত সামাজিক জীব। তার উপর সামাজিক প্রভাব একটি বড় উপাদান। বস্তুত সমাজ তাকে নীতিবান অথবা দুর্নীতিপরায়ণ করে।[১২৮]

ইহলোকে শুভ দু প্রকার ক. সাধারণ শুভ; খ. বিশেষ শুভ। স্বর্গলোকে আছেন পরম শুভ। পরম জ্ঞানময় আল্লাহ। ইহলৌকিক শুভ ঐ পরম শুভের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে; আপনার কৃতকর্মের বিশেষ কোনো শুভ কর্মের মধ্যে শুভ সম্পন্ন ব্যক্তির আনন্দ ও প্রসন্নতা প্রকাশিত হয়। এ আনন্দই তার নিজের মুখ্য স্বভাবের সজীবতা ও পূর্ণতার প্রকাশ; আপনার অন্তস্তম অস্তিত্বের পূর্ণ উপলব্ধি।

সমাজতত্ত্ব

মিসকাওয়াই তার সমাজতত্ত্ব নির্মাণ করেন গ্রীক চিন্তাধারার আদলে। গ্রীক সমাজতত্ত্বের প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন যে, মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ তখনই সুখী এবং

কল্যাণময় হয়, যখন তার আচরণ হয় মানবিক। তার আচরণ নির্ধারিত হবে সামাজের সকলের মঙ্গল অমঙ্গলের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। শুভাচারণই হল মানুষের মহৎ গুণ। সমাজের সব মানুষ এক রকম নয়; কাজেই শুভ ও আনন্দের অনুভূতিও এক একজনের এক এক রকম। নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানুষকে সমাজে থাকতে হয়। যে ব্যক্তি সমাজ ও সমাজের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে তার পক্ষে তাঁর নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনের কোনো অবকাশ নেই। অতএব মানুষকে সামষ্টিক সমাজ গঠন করে বাস করা কর্তব্য।

এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমস্ত রকম শুভাচরণ তথা মানব জাতির প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা। এরূপ শুভাচরণ ব্যতীত কোনো সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত মানুষের সঙ্গে থেকেই মানুষ সেই সাহচর্য দ্বারা নিজের অন্তরের অভাব পূর্ণ করতে পারে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, সামাজিক শুভ আচরণই হলো মানুষের আসল আচার। স্বার্থপরতা প্রেমের সীমাকে সঙ্কুচিত করে; প্রেম প্রীতির গণ্ডি বিকৃত করতে হয় বাইরের প্রতিবেশীদের মধ্যে। এরূপ প্রেম ও বন্ধুত্ব সংসার ত্যাগী, নির্জনে বসবাসকারী সন্ন্যাসী বা দরবেশের পক্ষে সম্ভব নয়; এ কেবল সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। যে নিভৃত গুহাবাসী সাধু ব্যক্তি মনে করেন যে, তিনি সমস্ত কল্যাণ ও শুভ বিতরণ করেছেন; বস্তুত আসলে তিনি যে আপনাকে প্রতারিত করেছেন-তা তিনি অনুভব করছেন না। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক হতে পারেন; কিন্তু তিনি নীতি ধর্মী নন, তা নিশ্চিত। কেননা নীতিধর্মী হতে হলে সামাজিক জীবন যাপন করতে হয়।[১২৯]

মধ্যযুগে সম্ভবত প্রথম বড় মাপের সমাজতাত্ত্বিক দার্শনিক যিনি সেই অবক্ষয়ের যুগে ধর্মকে ইহ জীবনে রাষ্ট্রীয় বা সমাজ জীবনের একজন সমাজ তাত্ত্বিকের দৃষ্টি ভঙ্গিতে অধ্যয়ন করেন এবং এর একটি সামাজিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করতে ধর্ম একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এভাবে তিনি নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদির মধ্যে লোক-প্রেম, মানব প্রেম এবং বিশ্ব প্রেম প্রতিষ্ঠা করার বড় উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ব্যক্তি জীবনে এবং চিন্তা জগতে তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্ধ্বে। মানুষের সমাজ জীবনকে বহু উঁচু স্থানে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে সহজে অনুমান করা যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কত গভীর, ব্যাপক এবং মধ্যযুগের জন্য অভিনব। এদিক হতে তার পূর্বসূরি রাজীর সাথে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর সমাজতত্ত্বের বিকাশ সাধনের সম্ভাবনা প্রচুর।

ঘ. আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.)

মধ্যযুগে প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট এবং সর্বশেষ দার্শনিক ইবনে সিনা পাশ্চাত্য জগতে আভিসীনা বলে পরিচিত। মধ্য এশিয়ার বর্তমান উজবেকিস্তানে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বোখারার উপকণ্ঠে আফসানে এক শিক্ষিত চাকুরীজীবী

পরিবারে ৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে সিনার শিষ্য আবু উবাইদ আজ জুরজানী হতে জানা যায় যে, তার পিতা খারমায়তাব প্রশাসক ছিলেন এবং তিনি ইসমাইলি মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই সূত্রে গ্রীক দর্শনেব একজন পণ্ডিতও ছিলেন।[১৩০] ইবনে সিনা স্বগৃহে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর পিতৃগৃহে ছিল অনুকূল শিক্ষা পরিবেশ। তিনি নিজেই লেখেন যে, তাঁর বাল্যকালে তার পিতা এবং পিতৃব্যকে উচ্চ তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর গভীর আলোচনা করতে দেখেন এবং তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। যাহোক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বোখারায গমন করেন।[১৩১] তিনি লেখেন যে, এক জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন বোখাবা শহবে বাস্তার পাশে এক খ্রিষ্টান ফল বিক্রেতার নিকট। এটাই ছিল তৎকালীন বোখাবার সাংস্কৃতিক স্তর। পিতার মেহমান দার্শনিক আননাতালের নিকট তিনি তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এ সময় দর্শন অধ্যয়নের মানসিক প্রস্তুতি হয; দ্রুত আলম্যাজেষ্ট এবং চিকিৎসা শাস্ত্রও অধ্যযন করেন, কিন্তু এ্যারিস্টটলেব ম্যাটাফিজিকম পড়তে গিয়ে হিমশিম খান। যাহোক অচিরে গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান এবং বিশেষভাবে এ্যাবিস্টটল বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান অর্জন কবেন আল ফাবাবীর বচনা পাঠে।[১৩২] বোখারায অবস্থানকালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে স্থানীয সামানী প্রশাসক নুহ ইবনে মনসুরকে রোগমুক্ত কবেন। এতে তাঁর চিকিৎসক খ্যাতি বৃদ্ধি পায তাই নয়, তাঁর বড় লাভ হয় যে, বাজ-গ্রন্থাগারেব দ্বার সর্বদাই তাঁর জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। তখন হতে ইবনে সিনা দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যে অধ্যয়ন এবং চিকিৎসা বিদ্যা অনুশীলন এবং প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করেন তার নিজস্ব পদ্ধতিতে। এভাবে তৎকালীন বিদ্যার্জনেব প্রচলিত রীতি থেকে তিনি আপনাকে মুক্ত করেন। তিনি দর্শনেব গতানুগতিক টীকাকার বা ভাষ্যকাব না হয়ে স্বতন্ত্রভাবেই গ্রীক দর্শনেব তুলনামূলক অধ্যয়ন দ্বারা তাঁর নিজস্ব চিন্তা পদ্ধতি এবং আপন রচনাশৈলী বিকশিত করতে সক্ষম হন। তাঁর মতাদর্শের স্বকীয়তার জন্য মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহু দিন যাবত আভিসীনাবাদ নামক স্বতন্ত্র দর্শন পঠন পাঠনের রেওয়াজ হয়। মধ্যযুগে প্রাচ্যদেশের এ এক গৌরবময় ঐতিহ্য।

মধ্যযুগে তৎকালীন বাস্তব অবস্থায় বিদ্বৎ সমাজের স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাসকদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হত। ইবনে সিনাকেও তাই করতে হয়। তবে তিনি তাঁর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখাব জন্য ছোট সামন্তদের দরবারে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানেও যদি শাসকদের সাথে তার সামান্যতম মতবিরোধ দেখা দিত তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান পরিত্যাগ কবতেন। বিভিন্ন দরবারে বিভিন্ন ধরনের কাজ তিনি করতেন।[১৩৩] কোথাও শাসনকার্যে অংশগ্রহণ, কোথাও অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। নানা স্থান ভ্রমণ করে অবশেষে হামদানে সামন্ত দরবারে হাজির হন। শামসুদ্দৌলা তাঁকে উজির পদে নিয়োগ করে। শামসুদ্দৌলা প্রয়াত হলে তদপুত্র ইবনে সিনাকে

কয়েক মাস ধরে কাবারুদ্ধ করে রাখেন। কাবণ তিনি নয়া শাসককে তোষামোদ করতে পারেন নি। মুক্তি লাভেব পর তিনি ইস্পাহানের শাসক আলাউদ্দৌলার দরবারে আসেন। আলাউদ্দৌলা হামদান অধিকার করলে ইবনে সিনা হামদানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১০৩৭ সালে ৫৭ বছব বয়সে প্রয়াত হন।[১৩৪]

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি গ্রীক দার্শনিকদের রচনার উপর কোনো ভাষা না লিখে বরং তাদের মূল বচনাসমূহ বিচার করে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৌলিক গ্রন্থ রচনা কবেন। তার রচিত দর্শন গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি ছিল প্রধান ক. বিশ্বকোষ ধবনের আশশিফা; খ. ইশারাত; গ. নাজাত।[১৩৫] আশশিফা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এ গ্রন্থে তিনি এ্যারিস্টটলের মতামত তালিকাভুক্ত করলেও এ পুস্তকে তার নিজস্ব বক্তব্য ছিল। এ পুস্তকে 'পয়গম্বরী', সন্ন্যাসত্ব, ইত্যাদির আলোচনা স্থান পেয়েছে; স্বাভাবিকভাবে এগুলো গ্রীক দর্শনভুক্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যা হোক এ পুস্তকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের বিরোধিতাও করা হয়েছে, কোথাও তার মতকে ক্রটিপূর্ণ বচনা বলেও মন্তব্য করেন। এ সব তথ্য হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে. তিনি ছিলেন মুক্ত বুদ্ধির মানুষ।[১৩৬]

তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। দিনের বেলায় সকল সময় হয় সরকারি কাজে নইলে অধ্যাপনায় সময় কাটাতেন। সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বিবিধ সম্পর্কে আলোচনা করতেন; রাতে লিখতেন; ভ্রমণকালে ছোট ছোট পুস্তক রচনা করতেন; জেলে বসে কবিতা এবং তপজপ বিষয়ে লিখতেন। তিনি কবিতা রচনা করতেন। তুর্কী ভাষা ছাড়াও পারসী, আরবি ভাষার উপর তার দখল ছিল।[১৩৭]

রসায়ন ও ফলিত জ্যোতিষ

ইবনে সিনা তার সময়ে প্রচলিত ফলিত জ্যোতিষ এবং তথাকথিত রসায়ন শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। এ বিষয়দ্বয়ের চর্চাকে তিনি মূর্খতা বলে মনে করতেন। তিনি কেবল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদ এবং প্রয়োগসিদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। সে দিনের রসায়ন শাস্ত্র কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করে বরং আল কেমীর নামে কেবল মায়ামরিচিকার পশ্চাতধাবন করা হত। জ্যোতিষী বিদ্যায় কোনো প্রায়োগিক দিক ছিল অবর্তমান।

তর্ক শাস্ত্র

তিনি যুক্তিবিদ্যার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। কেননা যুক্তিবিদ্যা বৌদ্ধিক অস্তিত্বের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে। তার যুক্তি বিদ্যা ফারাবীর যুক্তিবিদ্যা হতে খুব বেশি পৃথক নয়। তাঁর মতে মানববুদ্ধি প্রায়শ ভুল করে; কিন্তু যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে

ভ্রান্তি সংশোধন এবং বুদ্ধির উন্নয়ন ঘটান যায়। এ জন্য ওলিয়াবী বলেন যে, ইবনে সিনা যুক্তিবিদ্যার ইতিবাচক ভূমিকার তুলনায় নেতিবাচক কাজই বেশি।[১৩৭(ক)] যথার্থ জ্ঞান কেবল মানুষের প্রাজ্ঞিক বৃত্তির যৌক্তিক বিকাশের মাধ্যমে সম্ভব। শুধুমাত্র প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পক্ষে যুক্তিবিদ্যা ছাড়া চলা সম্ভব, কারণ তাদের জ্ঞান স্বজ্ঞা সঞ্জাত

খোদা তত্ত্ব

ফারাবীর মত ইবনে সিনা অধিবিদ্যক যুক্তি দ্বারা এক ধরনের খোদাতত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল: আল্লাহ অনাদি অনন্ত নিরাকার এবং অনিবার্য পরম-সত্তা; এক; অদ্বিতীয়। এরূপ পরমসত্তা মূল ভৌতিক উপাদানের উৎস হতে পারেন না। তাই এরূপ অবস্থায় জগৎ তথা তার সাকার বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বস্তুত পরমসত্তা ও জড়ীয় সত্তার মাঝে থাকে আত্মার অবস্থান। ইবনে সিনা আত্মাকে পরম সত্তার নিচে: কিন্তু প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক সত্তা বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন অস্তিত্ব দু প্রকারের ক. অনিবার্য; খ. সম্ভাব্য। সম্ভাব্য অস্তিত্ব বলতে বুঝায় সেই সব সসীম সত্তা যা তাদের অস্তিত্বের জন্য অন্য সত্তার উপর নির্ভরশীল। অনিবার্য অস্তিত্ব সব সম্ভাব্য সত্তার ঊর্ধ্বে; একই কারণে তা বহুত্ব ও বৈচিত্র্যেবও ঊর্ধ্বে। পার্থিব জগতের কোনো বস্তু গুণকে আল্লার উপর আরোপ করা যায় না তা বলে এ বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের জগৎ কি করে বহুত্ব বর্জিত ঐ একক সত্তা থেকে উৎপন্ন হয়? ইবনে সিনা বলেন: বিশ্ব আত্মায় নিহিত রয়েছে বহুত্বের বীজ এবং বিশ্ব আত্মা থেকেই উৎপন্ন যাবতীয় বহুত্ব। এখানেই সূচনা হয় বৈচিত্র্যের প্রক্রিয়া। নিজের কারণ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে বিশ্ব আত্মা সৃষ্টি করে এক তৃতীয় চিদাত্মা যা পুনশ্চ জ্যোতিষমণ্ডলীর উদ্ভবের কারণ। এই তৃতীয় চিদাত্মা যখন তার নিজের কারণ সম্পর্কে চিন্তা করে তখন সৃষ্টি হয় আত্মা। এভাবে একের পর এক সত্তা সৃষ্টি মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় জড় বা পিণ্ড সৃষ্টির পালা চলে। বিশুদ্ধ চিদাত্মাসমূহের মধ্যে সক্রিয় চিদাত্মা সর্বশেষ; যা সৃষ্টি ও পরিচালনা করে পার্থিব বস্তু ও মানবাত্মার উপাদান ও আকার। এভাবে সৃষ্টির কয়েক পর্যায়ে জড় জগৎ কার্যকারণ নিয়ম নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে অস্তিত্ব পেয়েছে। ইবনে সিনার মতে আল্লা কর্তৃক সৃষ্টির অর্থ হলো পরমসত্তা অনাদি প্রকৃতিকে সাকার রূপদান করেন। এ ক্ষেত্রে ইবনে সিনা এ্যারিস্টটল হতে সামান্য ভিন্নমত পোষণ করেন। এ্যারিস্টটল মনে করেন যে, প্রকৃতি ও আকৃতি উভয় সত্তাই অনাদি এবং আল্লা কেবল প্রকৃতি ও আকৃতিকে মিলিয়ে সাকার জগৎ বা জড়জগৎ সৃষ্টি করেন। পুনশ্চ ইবনে সিনা কেবল প্রকৃতিকেই অনাদি বলে জানেন-আকৃতিকে নয়। ইবনে সিনার এরূপ মতামতের জন্য তৎকালীন সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায় তাকে পছন্দ করত না। ১১৫০ সালে বাগদাদে খলিফা মুস্তানজিদ ইবনে সিনার পুস্তক অগ্নিদগ্ধ করেন।[১৩৮]

আত্মা

উপরে সৃষ্টি তত্ত্ব প্রসঙ্গে ইবনে সিনা বলেছেন যে, পরম সত্তা হতে বিকিরণের মাধ্যমে প্রথম চিদাত্মা এবং তা থেকে দ্বিতীয় চিদাত্মা, এবং তা থেকে তৃতীয় আত্মা বা মানবাত্মা বিকশিত হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইবনে সিনা আত্মাকে প্রকৃতির উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন এবং আরো স্পষ্ট হয় যে, তিনি তাঁর দর্শনে আত্মার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ কারণেই তার শ্রেষ্ঠ দর্শন পুস্তকের নামকরণ করেছেন আশ-শিফা বা আত্মার চিকিৎসা।

ইবনে সিনা আত্মা এবং দেহকে সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন পদার্থ বলে মনে করেন। সমস্ত বস্তুপিণ্ড এমন কি মানব দেহ বস্তু হতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানবাত্মা বস্তু হতে উদ্ভূত নয়; বরং ভাবলোক হতে শরীরের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে।[১৩৯] প্রত্যেক শরীরের নিজ নিজ আত্মা উপর থেকে আসে এবং প্রথম থেকেই প্রত্যেক আত্মা পৃথক বস্তুরূপে থাকে এবং শরীরে অবস্থান করে সারা জীবন। আত্মা নিজের বৈক্তিক বিকাশকে বজায় রাখে। আত্মার বড় ক্ষমতা হলো তার মননশীলতা। আত্মা বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু জগতকে জানে।[১৪০] দৈহিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাশাপাশি আত্মার আরো পাঁচটি অন্তরিন্দ্রিয় আছে। ১. কল্পনার গঠনমূলক বৃত্তি (কুওত আল মুসাওয়েরা) ২. বিমূর্তিকরণের জ্ঞানীয় বৃত্তি (কুওয়াতুল মুফাক্কারা), ৩. অভিমত বা অনুমানবৃত্তি (কুওয়াতুল ওয়াহাম), ৪. স্মৃতি বা অতীত প্রত্যক্ষণ ধারণের বৃত্তি (কুওয়াতুল হাফিজা), ৫. সংপ্রত্যক্ষণের বৃত্তি।[১৪১] বোধ শক্তি (আক্কল) তথা বুদ্ধি আত্মার ক্ষমতার চরম সীমা। প্রথমে বুদ্ধির মধ্যে চিন্তন ক্ষমতা নিহিত থাকে; কিন্তু বাহ্যিক ও আন্তরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রস্তুত জ্ঞান সামগ্রী উক্ত সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগ্রত করে কার্যক্ষমতায় রূপায়িত করে। অবশ্য এ পর্যায়ে দ্বিতীয় চিদাত্মারও প্রেরণা থাকে, সেই বুদ্ধিকে বিচারক্ষমতা দেয়। মানবাত্মার স্মৃতি কখনই নিরাকার নয়; স্মৃতিযুক্ত হওয়ায় জন্য সাকার আধারের প্রয়োজন।[১৪২]

মানবাত্মা তার নিম্নে অবস্থিত বস্তুর প্রভু হতে পারে, কিন্তু উচ্চতর জ্ঞানলাভ বিশ্বাত্মা দ্বারাই সম্ভব। এই ভাবে উচ্চ ও নিম্ন জ্ঞান দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানুষ নামের যোগ্য হয়। পদার্থরূপী ঐ মানবাত্মা এক অমিশ্রিত ও অমর বস্তু। যত দিন পর্যন্ত মানবাত্মা শরীরে বর্তমান থাকে ততদিন সে অধিক শিক্ষিত, অধিক বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। দেহের মৃত্যু ঘটলে আত্মা বিলীন হয়ে যায়। এটা শুভ জ্ঞানসম্পন্ন আত্মার পরম সম্পদ। অন্যান্য আত্মা ঐ অবস্থা পায় না। তাদের অনন্ত জীবন দুঃখময়। শরীরের বিকার যেমন বিভিন্ন রোগের কারণ তেমনি আত্মার বিকারও দণ্ডনীয়। মানবাত্মা স্বর্গলাভ করে সেই পরিমাণে যে পরিমাণে আত্মা শরীরের মধ্যে অবস্থানকালে শুভবুদ্ধি সৃষ্টি করতে পারে।[১৪৩]

যুক্তি বিদ্যার উপর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মধ্যযুগের একটি স্পর্শকাতর বিষয়ের উপর তার নিজস্ব মতামত দিয়েছিলেন। তিনি সমগ্র বনাম বিশেষ বা জাতি : সামান্য

বনাম ব্যক্তি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে গ্রীক দার্শনিকদের মত যারা সম্প্রত্যায়সমূহ বা সাধারণ ধারণাবলী বিশেষ বস্তুর আগে থেকেই অস্তিত্বশীল বলে ভাবত তাদেরকে বাস্তববাদী বলা হয়। ইবনে সিনা এঁদের বিরোধিতা করেছেন। সাধারণ ধারণাগুলি মূলত মানসজাত; এদের অস্তিত্ব কেবল মনে, বাস্তবে নেই। এরূপ সাধারণ ধারণাগুলো মনের মধ্যে গঠন করা হয় বিশেষসমূহের আপতিক গুণাবলী (accidents) থেকে অভিন্ন গুণাবলীকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে। সার্বিক বিশেষের অগ্রবর্তী এ কথার অর্থ এই যে, কোনো শিল্প সৃষ্টির আগে শিল্পীর মনে তার শিল্পকর্ম সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকে বৈকি? স্রষ্টার মনের ধারণাটি বাস্তবায়িত হয় তখনই যখন সেটিকে বস্তুর ও গুণাবলীর সাথে যুক্ত করে। কাজেই বিশিষ্ট বস্তুসমূহ বাদ দিয়ে সার্বিকসমূহ থাকে নিছক মানসিক উপাত্ত হিসেবে। সাধারণ ধারণাটি জড়ে রূপায়িত হওয়ার পরে মানব বুদ্ধি মানসিক ধারণা গঠন করতে এবং সেই ধারণাকে অন্য বিশিষ্ট বস্তুর সাথে তুলনা করার মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অতএব সার্বিক শুধু চিন্তায় এবং বিশিষ্ট বস্তুর পরে থাকে পূর্বে নয়।[১৪৪]

সত্য পথ প্রদর্শক দার্শনিক

ইবনে সিনা ভারতীয় উপাখ্যানের আদলে হাই বিন ইয়াকজান নামক একটি রূপক গল্প রচনা করেন। কাহিনী শীর্ষের অর্থ হল প্রবুদ্ধপুত্র জাগ্রত। এক ব্যক্তি তার সমগ্র বাহ্যিক ও আন্তরিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় উন্মুক্ত রেখে সত্যের সন্ধানে স্বর্গ মর্ত্যের সব রহস্য উদঘাটন করার জন্য বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। তার ভ্রমণকালে একজন বৃদ্ধের নিকটে পৌঁছলে তিনি দেখেন যে উক্ত বৃদ্ধ তরুণদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন। ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তিটি হলেন একজন আচার্য-দার্শনিক। তিনি একজন পথ প্রদর্শকের মত তাদের সঠিক পথ নির্ণয় করে দিচ্ছেন। ঐ বৃদ্ধের নাম জাগ্রত তার পিতার নাম প্রবুদ্ধ। তিনি দিকভ্রান্ত যাত্রীদের দুটি পথ সম্পর্কে জ্ঞানদান করছেন। পথভ্রান্তদের সামনে দুটো পথ ছিল উন্মুক্ত। ১. একটি পথ ছিল পশ্চিমের দিকে। এ পথ সাংসারিক পাপ পঙ্কিল পথ; ২. দ্বিতীয় পথটি মানুষকে উদীয়মান সূর্যের দিকে নিয়ে যায়, এটাই হল শুদ্ধ আত্মার পথ। তাই পথিকদেরকে সেই উদীয়মান সূর্যের পথে চলতে নির্দেশ দিচ্ছেন, উজ্জীবিত করছেন। এ পথ দিব্যজ্ঞানের শিখরে নিয়ে যাবে, যেখানে চির তারুণ্য বিরাজমান–যেখানে সৌন্দর্যের যবনিকা ও সৌন্দর্য, জ্যোতির ঘোমটাও জ্যোতি, সেখানেই অনাদি অনন্তর রহস্যের নিবাস।[১৪৫]

জ্ঞান বিতরণে সতর্কতা

তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীলদের কর্মকাণ্ড ইবনে সিনা স্বচক্ষে দেখে অভিজ্ঞান সঞ্চয় করেন। তিনি দেখেছিলেন গজনী সুলতান মাহমুদের দরবারে ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতরা

কিরূপে নিগৃহীত হন এবং তোষামোদকারীরা কিরূপ উপকৃত হন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনিও একদা কারাগারে বন্দি জীবন যাপন করেন। এরূপ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে তিনি মনে করতেন শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে জ্ঞানদান করা উচিত। নির্বিচারে সকলকে সব রকম জ্ঞানদান অনুচিত। মহানবী আরববাসীদেরকে সভ্যতার উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন এবং তাদের সহজবোধ্য ভাষায় কোবআনে এমন এমন বিষয়ের অবতাবণা করা হয়েছে যা ছিল প্রচণ্ড কিন্তু স্থূল আবেদন অথবা যা ছিল ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ। অথচ জ্ঞানী দার্শনিকের নিকট ঐ সব বিষযেব আক্ষরিকভাবের কোনো আবেদন থাকার কথা নয়—অথচ এ সবের পশ্চাতে নিহিত আছে গূঢ় রহস্য। এ কারণে ইবনে সিনা এর নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান করেন।[১৪৬]

ইবনে সিনা ছিলেন প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বেব বড়মাপের দার্শনিকদের সর্ব শেষ ব্যক্তিত্ব।[১৪৭] অবশ্যই তিনি প্রাচ্য মুসলিম সমাজের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। কেননা তাঁর পরবর্তীকালে সমগ্র মধ্যযুগে প্রাচ্যদেশে আর কোনো দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন নি। তার জীবদ্দশায় অথবা পরবর্তীকালে প্রাচ্যদেশে দর্শন চিন্তাব জগতে কোনো ঝড় উত্থিত হয় নি। ইতিপূর্বে বলা হযেছে যে, তার প্রয়াত হওয়ার অনেক পবে তাঁর পুস্তক ভস্মীভূত করা হয়। এই পর্যন্ত সমগ্র সমাজে সে সময় তাঁর অস্তিত্ব অনুভূত হয় নি। অথচ ল্যাতিন ইউরোপে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে তার দর্শন চিন্তা প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি করে। তাঁর দার্শনিক চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের জন্য ল্যাতিন ইউরোপে অভিসীনাবাদ ঐ বিতর্ক সৃষ্টি করে। ইউরোপে উদীয়মান বিদ্বৎ সমাজে যেমন তাঁর ভক্ত অনুরক্তের অভাব ছিল না; তাব দর্শনের হাজার রকমের ব্যাখ্যা দিয়ে আভিসিনাবাদ প্রতিষ্ঠা করার ব্রত গ্রহণ করে। অপরপক্ষে সেখানকার রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীরা তাঁর দর্শনের মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মের জন্য মহা বিপদসঙ্কেত দেখে তার পুস্তকের নানা ধরনের সমালোচনা এবং অপব্যাখ্যা দিতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে তৎকালীন ইউরোপের স্কুল কলেজে কেবল তার চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য নয়, তার দর্শনের জন্য তিনি ছিলেন প্রিয়। তার পুস্তক ছিল অপরিহার্য পাঠ্য। এবং তার দর্শন এ্যারিস্টটলকে আবিষ্কার করার জন্য ছিল প্রথম ধাপ। মজার ব্যাপার প্রাচ্য মুসলিম দার্শনিকরা প্রকৃত এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হন।

প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বে ইবনে সিনার মৃত্যুর পর প্রকৃত দর্শন চর্চার দ্বার কেন বন্ধ হল সে সম্পর্কে ওলিয়ারী দুটি কারণ দর্শিয়েছেন। প্রথমত চরমপন্থী ইসমাইলী (গুলু) সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা; তারাই দর্শন চর্চায় ছিলেন নিবেদিত প্রাণ এবং তারা এমন মতাদর্শ প্রচার করত যা বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পরিপন্থী, *As a result the shiits tended towards mystic and often fantastic theories, Which were discouraging to the study of Aristotelian doctrine* শিক্ষার এরূপ অবস্থায় সুন্নি সম্প্রদায় দর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ত এ সময়টি শিয়া

বিরোধী সুন্নি সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ধর্মান্ধ তুর্কী জাতি, তারা সনাতন চিন্তা বিরোধী কোনো কিছু সহ্য করতে পারত না। তাই যুক্তিবাদ ও মুক্ত চিন্তার ছিল ঘোর বিরোধী।[১৪৮] ওলিয়াবী তৎকালীন প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বের সমগ্র চিত্রের একটি ফলাফলের কারণ হিসেবে চমৎকারভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। কেন শিয়া সম্প্রদায়ের এরূপ প্রভাব বৃদ্ধি পেল, তৎকালীন এ অঞ্চলের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বাস্তব অবস্থা কিরূপ ছিল সে দিকের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। দর্শন চর্চার পতনের অর্থই হল প্রচণ্ড সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রতিফলন। এ জন্য বিষয়টি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এ সম্পর্কে সবিস্তারে বিভিন্ন স্থানে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রাচ্য মুসলিম বিশ্বে একাদশ শতক হতে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটের ফলে সমরবাদী সামন্ততন্ত্র নবরূপে ফুটে ওঠে; তাতে সামাজিক অবক্ষয় স্থায়ীরূপ নেয় এবং তৎকালীন সামন্ত মূল্যবোধ-সুফিবাদ ও সনাতনী পণ্ডিতিবাদ (orthodox seholasticism) পল্লবিত হয়; এবং এর স্থায়ীত্বদানের জন্য আল গাজ্জালী তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এখন এই তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে।

১৩.৪ অবক্ষয়কালের চিন্তাধারা

ক. আশায়েরা চিন্তাধারা

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে ৮৪৫-৯৪৬ খ্রি.) সময়কালকে বলতে হয় আব্বাসী খেলাফতের প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংকটকাল। সংকট নিরসনের জন্য ৯৩৬ সালে আমিরুল উমারা নামক একটি সর্বোচ্চ সামরিক পদ সৃষ্টি করে তার নিকট রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র হস্তান্তর করা হয়। খলিফা যবনিকার অন্তরালে চলে গেলেও নামকাওয়াস্তে তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব তখনো বিদ্যমান ছিল। ৯৪৫ সালে ইরানী জাতিসত্তার বুওয়াইহী বংশের অভ্যুত্থানে খেলাফত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর টিকে থাকে নি। খেলাফত আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। আব্বাসী খলিফাগণ সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং এই অবস্থায় ১২৫৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয। এ অবস্থার মধ্যে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে মাত্র। রাজনৈতিক সংকটকালে প্রতিক্রিয়াশীল বৌদ্ধিক পরিবেশে মোতাজিলা মতাদর্শের তথা যুক্তিবাদী ধর্মতত্ত্বের পতন হয়: তাদের কোরআনের ব্যাখ্যাকে শ্রদ্ধাশীল ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে ভাবত এবং মোতাজিলাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়; কারামী সম্প্রদায় ও তাদের ঘোরতর বিরোধিতা করে এবং নিরাকার খোদাতত্ত্বের বিপরীতে সাকার খোদাতত্ত্ব উপস্থাপিত করে। অবশ্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মোতাজিলাদের পতন ত্বরান্বিত করে। তাদের যুক্তিবাদী বিশ্বাসের স্থলে প্রতিষ্ঠিত তথা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সরল সহজ প্রশ্নাতীত (বিলা কাফেফ) বা নির্বিচার বিশ্বাস ও সংস্কার। এর একটি অভাবনীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশে যুক্তিবাদী

দর্শনভিত্তিক ধর্মতত্ত্বে যেমন অবিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, তেমনি নির্বিচার সনাতনী সংস্কার ও বিশ্বাস উদীয়মান শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে অসমর্থ ছিল। এরূপ উভয় সংকটকালে আশায়েরা চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। আশায়েরা মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাগদাদের আবুল হাসান আলী আল আশয়ারী (৮৭৩-৯৩৫ খ্রি.) তিনি ছিলেন আবু মুসা আল আশায়ারীর অধস্তন বিখ্যাত মোতাজিলা পরিবার সন্তান এবং বিখ্যাত মোতাজিলা পণ্ডিত আল-জুবাই (মৃ. ৯১৫ খ্রি.) এর শিষ্য। আল আশায়ারী অনুধাবন করেন যে, মুতাজিলাগণ ইসলামকে যে ধরনের গ্রীকো-ইরানী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হতে রক্ষা করার মহান ব্রত পালন করেছিলেন তা আদৌ উপেক্ষা করা চলে না। তিনি আরো মনে করেন যে, এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মোতাজিলারা মৌল ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করছিল; তাই তিনি তাদের মতাদর্শের ঘোর বিরোধিতাও করেন। কথিত আছে একদিন শিষ্য তাঁর মহান গুরুর সাথে বিতর্কে এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে জুবাই হতবাক হয়ে পড়েন। এরপর শুক্রবারে বসরার মসজিদে তিনি মোতাজিলা মতবাদের নিন্দা করেন এবং সনাতন মতবাদের পক্ষে সাফাই দেন। এর পর তিনি মোতাজিলা বিরোধী বিতর্কমূলক কিতাবুশ শারাহ ওয়াততাফসিল রচনা করেন। তিনি লুমা, মুজায়, ইজাহুল বুরহান এবং তারিয়াহ নামক পুস্তকসমূহ রচনা করেন।[১৪৯] আল আশায়ারী অনুধাবন করেন যে, দার্শনিকের বা বুদ্ধিমূলক বিচারের সাথে পরিচয় থাকা দরকার। তবে তাদের যুক্তিবাদের বিপজ্জনক দিকটা সম্পর্কে অতি সতর্কতা অবলম্বনেরও দরকার; পুনশ্চ বিনা বিচারে বা বিনা বাক্যে গতানুগতিক ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করাও ঠিক নয়, সে উপলব্ধিও তাঁর ছিল। এ কারণে তিনি মোতাজিলাদের দ্বান্দ্বিক যৌক্তিক বিচারধারার বিপরীতে নতুন এক যৌক্তিক বিচারধারার প্রবর্তন করেন। এই ছিল নবরূপে ইলমুল কালাম। তাঁর অনুসারীরা নয়া কালাম বা তর্কপদ্ধতি প্রয়োগ করতেন বলে তাদেরকে বলা হত মুতাকাল্লেমুন।) : This use of philosohy in the explantion and defence of religion came to be Known as kalam, and those who employed it were called mutakallemun.[১৫০] ইসলামের মৌল বিশ্বাসের স্বপক্ষে তাঁর নিজস্ব যৌক্তিক বিচারধারা প্রয়োগ করেন। তার যুক্তিধারা মুতাজিলা চিন্তাধারা হতে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি তার যৌক্তিক বিচারধারার মাধ্যমে সনাতন ধর্ম-সংস্কার দৃঢ়ভাবে ধারণ করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। এভাবে একদিকে তিনি ধীরে ধীরে মুতাজিলাদিগকে পরাহত করতে অন্যদিকে বিনা বাক্যে সবকিছু গ্রহণ করার ধারণা প্রতিহত করতে প্রয়াস চালান। হিট্টি বলেন :

...used in his polemies against his former masters the same weapons of logical philosophical argamentation which they had introduced and developed. Thus he became in addition to his other aehieve ments, the founder of seholastie theology in Islam. (Kalam) After him the scholastic attempt to reconcile religious doctrine with Greek throught became the supreme fea-

ture of Moslem intellectual life. To al Ashari is also attributed the introdection of the formula bila Kayf (without modality), according to which one is expected to accept the anthropomorphic expression in the Koran without any explanation demanded or given. This new priciple served as a damper on free throught and research. It was with a view to propageting the Ashari system of theology that the famaus Nezamiah seminany was established by the Saljick vizir.[১৫১]

আশায়ারীর সমসাময়িক সমরখন্দের মাতারাদী এবং মিশরের তাহাভী ও নয়া কালামের প্রয়োগ করেন। তাহাভী বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেলেও মাতারাদী ছিলেন আশায়ারীর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁদের উভয়ের মধ্যে বেশ মত পার্থক্য ছিল।[১৫২] তবুও আশায়েরী মতাদর্শ সুন্নি মহলে ছিল জনপ্রিয়। তাঁকে এবং এ চিন্তা পদ্ধতির জনপ্রিয়তায় অবদান রাখেন আল বাকিল্লানী এবং বিশেষভাবে আল গাজ্জালী।[১৫৩] আশায়েরাগণ রক্ষণশীল ধর্মমতের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে কোরআনের নিত্যতা, আল্লার গুণাবলী, ইচ্ছার স্বাধীনতা, দিব্যদর্শন ইত্যাদি পুরনো সমস্যা তাদের সমকালীন দর্শনের আলোকে আলোচনা করেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুক্তি দ্বারা রক্ষণশীল ধর্মমত অক্ষুণ্ন রাখা। তারা মনে করতেন শুধু যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা জগত জীবনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তৎকালীন ঐতিহাসিক বাস্তবতা তাদের মতাদর্শের জন্য ছিল খুবই উপযোগী।

কার্যকারণ প্রসঙ্গ

মোতাজিলারা ছিলেন সর্বত্র কার্যকারণ নিয়ম বা হেতুবাদে বিশ্বাসী। আরো বিশ্বাস করতেন প্রাকৃতিক গুণ অপরিবর্তনীয়। তাই তারা প্রাকৃতিক অলৌকিকতায় বিশ্বাস করত না। আল্লাই কর্তা এ কথা মানার পরও উপাদান কারণের প্রয়োজন আছে; নইলে আল্লা এক অদ্বিতীয় এবং জগৎসাদি এ দুটি ইসলামি সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। এ সঙ্কট হতে বাঁচার জন্য আশায়ারীরা কার্যকারণ নিয়মকেই অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে কোনো বস্তু কারণজাত নয়; খোদা কার্যকে সেইভাবে সম্পর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করেছেন যেভাবে তিনি কার্যের সাথে বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেন—একেই আমরা ভুলবশত কারণ বলি। সমস্ত পদার্থই পরমাণুময় এবং প্রতিটি পরমাণু মুহূর্তনির্ভর। বিভিন্ন ক্ষণের পরমাণুর মধ্যে কোনো চুক্তিবদ্ধ সম্বন্ধ নেই। সকল পরমাণুকে আল্লা সৃষ্টি করেন কারণ ব্যতীত। অর্থাৎ আশায়েরাদের মতে বাষ্প সূর্যকিরণ হতে সৃষ্টি হয় না, বাষ্প থেকে মেঘ জন্মে না, বর্ষার বারিপাত বাষ্প হতে মেঘ জন্মে না, বর্ষার বারিপাত মেঘের ফলে হয় না। আল্লা এক একটি বিন্দুকে অভাব থেকে ভাবরূপ দান করেন। এর পশ্চাতে কোনো কার্য-কারণ পদ্ধতি ক্রিয়াশীল থাকে না। তারা একটা উদাহরণ দিয়েছেন : আল্লা মানুষকে সৃষ্টি করেন, তারপর তার ইচ্ছাকে, শেষে তার রচনা প্রতিভার উন্মেষ ঘটান ও

এরপর তার হাতে গতিদান করে কলমের মধ্যে তা সঞ্চারিত করেন। এ সব ক্রিয়াকে আল্লা পৃথকভাবে কোনো কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছাড়াই সরাসরি করেন। কার্য-করণ নিয়ম ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়-এরূপ ধারণায় তারা বিশ্বাসী নন। তারা বলেন আল্লা কেবল জগতই সৃষ্টি করেন নি- মনুষ্য চিত্তে জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানদানও করেন। এরূপ চিন্তা অর্থাৎ হেতুবাদকে অস্বীকার করলে কি বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব হয়? এ ছাড়াও অনেক কূটতর্ক ওঠে। যার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া কঠিন।

কোরআন অনিত্য

মোতাজিলাবা কোরআন সৃষ্ট বলেন, কিন্তু আশাযেবা বলেন কোরআন অনাদি তবে তা প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তীকালে, আব এব প্রকাশ ঘটে মহানবীর কারণে নয়, বরং আল্লার ইচ্ছায়। সুতরাং কোরআনের ভাষা আল্লাহর ভাষা।[১৫৪] এ কারণে কোরআন হল একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। একমাত্র কোরআনের সহায়তায় স্বর্গ-নরক, জিন, ফিরিস্তা ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারি; ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান হযত ভ্রান্ত হয় না; কিন্তু বুদ্ধি আমাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত কবতে পাবে। কোরআনেব ভাষা আল্লার-আশায়েরাবাদের—এ মতের অনেক সমালোচনা হয়েছে পাশ্চাত্য জগতে। তাদের মতে মহানবীর আমলে আরবের সাথে যেসব দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল কোরআনের ভাষায় তাদের প্রভাব লক্ষণীয়; কোরআন যদি আল্লার বিজ্ঞতা হয়ে থাকে তাহলে আল্লার সহনিত্য হয়। এমতাবস্থায় মোতাজিলাদের বক্তব্য কি বাতিল করা সম্ভব?[১৫৫]

আল্লার গুণাবলী

আল্লার সত্তায় অনাদি গুণাবলীব উপস্থিতি আল্লার একত্বে এবং অনেক ক্ষেত্রে আল্লার ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী হয় বলে মোতাজিলাবা আল্লার গুণের সংখ্যা নির্দিষ্ট করেন অথবা আল্লা নির্গুণ বলে থাকেন। এভাবে আল্লা দুর্বোধ্য অসংজ্ঞায়নযোগ্য সত্তায় পরিণত হয়।

আশায়েরা তাদের ধাবণার বিরোধিতা করে সনাতনী মত সমর্থন করে। তাদের মতে এ্যারিস্টটলের দশটি প্রত্যয়ের মধ্যে অস্তিত্ব ও বাস্তবতা ব্যতীত অন্য কোনটি আল্লার উপর আরোপ করা যায় না। তাদের ধারণা অন্যগুলো কেবল আত্মগত—এদের কোনো বাস্তবতা নেই। আল্লার গুণাবলী মানুষে আরোপ করা যায় না-যদি আরোপ করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লা ও তার সৃষ্ট জীবদের গুণাবলীর পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয় গুণগত বটে। It is noted also that God is qiyam bin-nafs or subsisting in Himself that is to say independent of ay other than Him and so God's knowledge does not depend on the existence or the nature of the thing known.[১৫৬]

কর্মে মানুষের স্বাধীনতা

মোতাজিলারা ছিলেন প্রতিটি কর্মকাণ্ডে মানুষের ইচ্ছাব স্বাধীনতার প্রধান প্রবক্তা-সে সম্পর্কে অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। তাদের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন আশায়েরা। তার মতে আল্লাহ্ প্রথমেই ব্যক্তির মধ্যে কর্মশক্তি তারপর তার মধ্যে ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টি করেন, এবং সেই ব্যক্তির মাধ্যমে কাজটি আল্লাই সম্পাদন করেন। এভাবে ব্যক্তিটি কাজটি কসব বা অর্জন করে।[১৫৭] সব ব্যাপারে আল্লাই হচ্ছেন চূড়ান্ত কারণ, অন্য কোনো গৌণ কারণ ও কার্যকর নয়।

আমরা প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তনশীল দ্রব্য দেখি সেগুলো মূলত অসংখ্য অণুর সমন্বয়ে গঠিত এবং অনুগুলো শূন্য হতে জন্মাচ্ছে এবং শূন্যে বিলীন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের কারণ আল্লা স্থায়ী নিবঙ্কুশ সত্তা। There is no secondary cause, as there are no laws of nature, in every case God acts directly upon each dow ধরে নিতে হবে আগুনে দাহিকা শক্তি নেই।[১৫৮] মোতাজিলাদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তকর—এতে আছে যৌক্তিক ও নৈতিক অসঙ্গতি। মানুষের কাজে কোনো স্বাধীনতা থাকবে না তবে যে দায়িত্ব বহন কবাবে কিরূপে?[১৫৯]

দেশ-কাল-গতির মধ্যে বিচ্ছিন্ন বিন্দুবাদ

আশায়েরা মতাদর্শের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে রাহুল ভেবেছেন যে তাদের একটি বড় সিদ্ধান্ত হল দেশ, কাল, গতির মধ্যে আছে বিচ্ছিন্ন বিন্দুবাদ। তাদেব দার্শনিক চিন্তাধারায় হেতুবাদ বা বস্তুজগতে কার্যকারণ নিয়মেব কোনো স্থান নেই। তাবা বস্তুসমূহকে দেশ, কাল গতির মধ্যে কোনো রকম অবিচ্ছিন্ন পটভূমিতেও দেখেন না। গণিতে এক, দুই, তিন এর মধ্যে কোনো প্রকার অবিচ্ছিন্নক্রম তারা মানেন না। এক সংখ্যাটি সমাপ্ত হলে তবেই দুই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল এক হতে দু এর সংখ্যাজ্ঞান সর্পেব ন্যায পিচ্ছিল গতিতে হয়? না, ভেকের মত লম্ফ দিয়ে? এর উত্তর হবে লম্ফ দিয়ে। দেশ বা দিশায় বস্তুর গতি। একটি ট্রেন একস্থান হতে অন্যস্থানে যেতে দেখা যায়। প্রশ্ন ওঠে যদি ট্রেনটি সব সময় কোনো স্থানে স্থিত থাকে-তবে তা গতি শূন্য। একে গতি বলা ভুল হবে। এখন যদি দৃষ্টিগতিকে সিদ্ধ করতে হয় তবে তার একমাত্র বাস্তা হলো সর্পের ন্যায় পিচ্ছিল নয়, সংখ্যার মতো গতিকে এক একটি লম্ফ বলে মেনে নেয়া। অন্তর্নিহিত কারণ ব্যতীত পবমাণু প্রতি মুহূর্তেব জন্য সৃষ্টি হয়ে লয় হয়। আর একটি 'অকারণ' পরমাণু তার দেশ ও কালের জন্য জন্মে ও বিনষ্ট হয়। এই প্রথম ও দ্বিতীয় পরমাণুর মধ্যে আছে শূন্যতা, গতি শূন্যতা; দেশ শূন্যতা। প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় মুহূর্তের (এখনই) মধ্যে সম্বন্ধ না থাকায় তাকে কালিক শূন্যতা বলা যায় না–যা কাল তাইই এখন; যা এখন নয় তা কাল নয়। আবার যেখানে দুটি এখনেই আমরা কিছুই পাইনে তাকেই বলে কালিক শূন্যতা। এ সবের সরল অর্থ এই দাঁড়ায়

যে, আশায়েরা মতে বস্তু জগৎ এমন একটি বিচ্ছিন্ন পিণ্ড যার অংশসমূহের মধ্যে কোনো আন্তক্রিয়ার অবকাশ নেই। দেহধারী জগতের ন্যায় দেশ, কাল, গতি প্রভৃতি সবই বিস্তৃতিহীন পরমাণু ও স্থিতিবিহীন গতিতে পর্যবসিত হয়। কাল বলতে অনেকগুলো পৃথক 'এখন' এর পরমপরাকে বুঝায়, এবং কালের যে কোনো দুটি মুহূর্তের মাঝখানে একটি শূন্যস্থান বিদ্যমান। গতির বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। যে কোনো দুটি গতির মধ্যে একটি স্থিতি বিদ্যমান। আশায়েরা শূন্য দেশকে একটি স্বাধীন বাস্তব সত্তা বলে স্বীকার করেছে। তা শূন্য দেশের সাথে যুক্ত অসুবিধে এড়ানোর জন্য ভেকলমফ ধারণাটি গ্রহণ করছে। এরূপ অবস্থান গ্রহণ করেই তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর দ্বারা তারা দিব্যদর্শন, অলৌকিকতা, আল্লার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সিদ্ধ করেছে। এতে মোতাজিলাদের প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক হয় কি?

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে. আশায়েরীরা 'ভেকলস্ফন' বিচ্ছিন্ন প্রবাহ, 'বিন্দু ঘটনা', বিচ্ছিন্ন পরমাণু কে বস্তু-স্থিতি থেকে উৎপন্ন কোনো সম্ভাব্য জটিলতা এড়ানব জন্য স্বীকার করেন নি; যা আমরা আধুনিক আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ানটামবাদ অথবা মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে পাই।

প্রসঙ্গক্রমে রাহুল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বাদশ ও একাদশ শতক হতে যে সমরতান্ত্রিক সামন্তবাদী স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এরূপ পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে মুসলিম রাজাগণ তাঁদের নিবঙ্কুশতাকে আচ্ছাদিত করে রাখার চমৎকার সুযোগ ও তাত্ত্বিক সমর্থন পেতে চেয়েছিল। বস্তুত আশায়েরা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তির সমর্থক।[১৬০]

খ. নতুন চিন্তনধারা : সুফিবাদ

আব্বাসী সুবর্ণযুগে বিকাশমান মুসলিম সম্প্রদায়ের নানাবিধ ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক এবং নৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে হাদিস শাস্ত্র, আইন ও নীতিশাস্ত্র বিকশিত হয়, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। ঐ শতাধিক বছরের সমৃদ্ধ বৈষয়িক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ প্রবাহমান হয় তার আধ্যাত্মিক জীবনেও। মধ্যযুগের জটিল সমাজ জীবন প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে সুফিবাদ এবং সুফি সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে।

সমাজ মানসের অন্তরালে যতই বিচ্ছিন্নভাবে সুফিবাদেব উন্মেষ হোক না কেন মূলত এক দীর্ঘ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তা একদিন একটি সুসংহত আর্থ-সমাজিক রূপ লাভ করে। প্রারম্ভে যে অবস্থাই থাকনা কেন, একাদশ শতক হতে সুফিবাদ প্রাক আধুনিককালে একটি শক্তিশালী বিশেষ মরমি ভাবধারা ছিল। এ ভাবধারা অবশ্য ইসলামি সমাজের একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য নয়, বরং প্রাক-আধুনিককালে প্রায় সকল ধর্ম ও সমাজে একটি বিশেষ সময়ে এরূপ ভাবধারার উন্মেষ

ও বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। বস্তুত এরূপ মরমি ভাবধারা মানুষের বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই মানসিক পরিণতি। মরমি ভাবধারাও এক ধরনের জ্ঞান, কিন্তু এ জ্ঞান যৌক্তিক বিশ্লেষণে ও সংশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রত্যয়গত জ্ঞান নয়, বরং মানব হৃদয়ানুভূতি ও অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞান। জ্ঞানার্জনের প্রশ্নে সুফিবাদে প্রজ্ঞা ঐতিহ্য এবং বৈষয়িক অভিজ্ঞতার সকল উপাদান উপেক্ষা করে কেবল স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করতে হয়। যেহেতু একজন ব্যক্তি মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে কেবল অনুভূতি ও গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অপৌরুষভাবে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে–তাই ঐ ব্যক্তিগত মানসিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা অসম্ভব। বস্তুত সুফিবাদ বিশেষ এক বিশ্বদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে রহস্যবাদ বা গুহ্যতত্ত্ব ইসলামে যে রূপ পরিগ্রহ করে তাই সুফিবাদ। তাই এটা এক গুচ্ছ মননশীল মতাদর্শের সমষ্টি নয়; বিশেষ ভাবাবেগ ও মানসিক অনুভূতির সৃষ্টি। হিট্টি যথার্থ বলেন : It is not so much a set of doctrines as it is a mode of thinking and feeling in the religious domairn.[১৬১]

অনেকে মনে করেন সুফি শব্দটি গ্রিক সোফী শব্দের অপভ্রাংশ। প্রাচীন গ্রিসের সোফীরা ছিলেন ভ্রাম্যমান পণ্ডিত। তাঁরা জ্ঞান আহরণ এবং জ্ঞান বিতরণের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। গ্রিকদর্শনের আরবিতে অনুবাদকালে শব্দটি আরবিতে প্রবেশ করে।[১৬২] আবার অনেকে বলেন যে, সুফি শব্দটি সউফ শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে; এর অর্থ পশম। সুফিরা আড়ম্বরহীন জীবন যাপনের প্রতীক হিসেবে পশমের পোশাক পরিধান করতেন বলে তাঁদের সুফি বলা হত।[১৬৩]

অনেকে মনে করেন যে, মহানবীর জীবদ্দশায় মদিনা মসজিদে একদল লোক জেহাদে যোগদানের জন্য-সদা প্রস্তুত থাকতেন, পার্থিব জীবনের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ ছিল না; তারা তাদের স্বউপার্জিত সামান্য আয় দিয়ে জীবন যাপন করতেন। এদেরকে আহলুস সোফফা বলা হত। পরবর্তীকালে তাদের অনুকরণে কৃচ্ছ সাধনায় ব্রতী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে সুফি বলা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহানবীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ধর্মাত্মা পুরুষদেরকে সাহাবা, পরবর্তীদেরকে তাবেইন এবং এঁদের অনুগামীদেরকে তাবে তাবেয়ীন বলা হত। আরো পরে ধর্মপরায়ণদেরকে আবিদ-জাহিদ ইত্যাদি বলা হত। আরো পরে যারা পার্থিব আড়ম্বর জীবন পরিত্যাগ করে কেবল আল্লার পথে বিচরণ করতেন তাদেরকেই সুফি বলে অভিহিত করা হত। জুন্নুন আল মিসরী বলতেন সুফি তারাই যারা সবকিছু ত্যাগ করে কেবল আল্লাকে আপন করে নিয়েছিল। জোনাইদ বাগদাদী বলতেন সুফি তাঁরাই যাঁদের জীবন-মৃত্যু শুধু আল্লা নির্ভর।[১৬৪] কুফার আবু হাশিমকে সুফি বলা হয়।

ইসলামে সুফিবাদের উৎপত্তি এবং তার উৎস নিয়ে নানা ঐতিহাসিক নানা কথার অবতারণা করেছেন। ক. কেউ বলেন এর উৎস ছিল ভারতীয় বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন;

খ. কেউ বলেন নব্য প্লেটোবাদী নেষ্টোরীয় খ্রিষ্টান মতাবাদের প্রভাবে সুফিবাদের উন্মেষ ঘটে; গ. কেউ সুফিবাদের মূল খুঁজেছেন প্রাচীন পারস্যের মতাদর্শে; অনেকে ইসলামের সুফিবাদের বিকাশে বাইরের কোনো প্রভাব কেউ স্বীকার করেন নি, বরং তারা স্বতন্ত্রভাবে কোরআনকে এর উন্মেষ ও বিকাশের একমাত্র উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৬৫] যারা সুফিবাদে বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবের কথা বলেন, তারা প্রথমত জগত ও জীবন সম্পর্কে সুফি-সাধু সন্ন্যাসী-ভিক্ষু সকলের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, চিন্তা-চেতনা মানসিক প্রবণতার মধ্যে অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। সকলেই জগতকে প্রতিভাসিক অবাস্তব, ক্ষণস্থায়ী ও অধ্যাসমূলক বলে মনে করেন। বৌদ্ধ নির্বাণবাদের সাথে সুফি ফানাবাদের মধ্যে কেউ পার্থক্য আবিষ্কার করতে পারে, তবে মূল মনোভঙ্গির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা যায়? দ্বিতীয়ত তাদের জীবন ধারণ পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যকার সাদৃশ্যটাই মৌলিক ও মুখ্য বলে প্রতীয়মান হয়; বৈষাদৃশ্যটি বাহ্যিক ও গৌণ। তাদের উপরি রূপ যাই হোক, তাদের বৈরাগ্যবাদী জীবনের মূল সুর এক এবং এর উৎস মূল গ্রথিত সর্বগ্রাসী নৈরাশ্যবাদে। সকলের নিকট এই দুদিনের দুনিয়ায় স্বচ্ছন্দ জীবনের চাইতে পরলোকের অনন্তজীবনের শান্তি লাভে সব কিছুই তুচ্ছ। তৃতীয়ত তাদের পোশাক পরিচ্ছদের চাইতে উভয়ের রীতিনীতি, তপ-জপ পদ্ধতির মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল খুবই নগণ্য।

ইসলামি বিশ্বের সাথে ভারতীয় চিন্তাধারার যোগ সূত্র স্থাপিত হয় বিভিন্নভাবে। প্রথমত আরবদের সিন্ধু বিজয় কেবল রূপ কথা নয়; এর সাংস্কৃতিক অবদান অনস্বীকার্য।[১৬৬] দ্বিতীয়ত আরব কর্তৃক মধ্য এশিয়ার বহলকী অঞ্চল বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ অঞ্চল ছিল বৌদ্ধদের শিক্ষা সংস্কৃতির একটি স্নায়ুকেন্দ্র। এখান হতে অসংখ্য আলোকিত অভিজাত বৌদ্ধ পরিবার যেমন বারমেকী বা সামানীরা ইসলাম গ্রহণ করে প্রাচ্য ইসলামি বিশ্বের স্তম্ভে পরিণত হয়। এরা ধর্ম হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য কখনো বিস্মৃত হয় নি। তৃতীয় খলিফা মনসুর হতে অনেক দিন সরকারিভাবে ভারতীয় দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য বাগদাদে আমদানি করা হয়। চতুর্থত আব্বাসী স্বর্ণযুগে ইসলামি বিশ্ব তৎকালীন বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্র হওয়ায় ভারতীয় বণিক এবং সাধু সন্ন্যাসি ও ভিক্ষুদের ইরান-ইরাক-আলেকজান্দ্রিয়ায় গোলযোগ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সংস্কৃতিক লেনদেনও বাড়ে। তদুপরি আল বেরুনী ভারতীয় সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় ঘটান ইসলামি বিশ্বে।

নিকলসন প্রমুখ অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, নব্য প্লেটোবাদী নোষ্টরীয় খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের প্রভাবেই ইসলামে মরমিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।[১৬৭] অন্যত্র আলোচিত হয়েছে যে, গ্রীকদর্শন বিজ্ঞানের আরবিকরণে সিরীয় খ্রিষ্টান বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল প্রধান। আরব বিজয়ের পর বৃহত্তর সিরিয়া পূর্বের মতই শিক্ষা-সংস্কৃতি

ক্ষেত্রে তাদের পূর্বের অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখে। তারা মুসলিম শাসনের সহযোগী রূপে কাজ করে। ধর্ম প্রচারণা কেবল অব্যাহতই থাকে নি বরং খলিফার দরবারে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বিতর্ক সভায় তারাই ছিল প্রবল প্রতিপক্ষ। সিরিয়ার খ্রিষ্টান চিন্তাবিদরা ছিলেন নব্য প্লেটোবাদী এবং মরমি ভাবাপন্ন। তাদের অনেকের জীবনধারা ছিল আদর্শস্থানীয়। উভয় ধর্মের এরূপ গভীর যোগাযোগের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়া চলাই স্বাভাবিক।

আরব কর্তৃক বিজিত হওয়ায় পারস্য তার রাজনৈতিক প্রাধান্য হারায়; কিন্তু তারা তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য হারায় নি। ধীরে ধীরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে সত্য; কিন্তু তা গ্রহণ করে তাদের নিজেদের মত করে; ইসলামি চিন্তায় রহস্যবাদ-গুহ্যতত্ত্ব আমদানিতে যদি তাদের ভূমিকা থাকে তবে সেটাই স্বাভাবিক।

মুসলিম পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন যে, সুফিবাদ কালক্রমে ইসলামে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়। কোরআনই হল এর মূল উৎস; বহিরাগত প্রভাব নয়। কোরআন সর্বজ্ঞানের আঁকর। আল্লা স্রষ্টা প্রতিপালক এবং ক্ষমাশীল–এ মর্মে অজস্র আয়াত থাকলেও ইসলামে আদিযুগে তার কঠোরতা, ভয়ভীতি প্রদর্শনের দিকটিই প্রাধ্যান্য পায়। মনে হয়েছিল তিনি কেবল অন্ধ আনুগত্য চেয়েছেন? মানুষের অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন? ইহকাল পরকালের শস্য ক্ষেত্র-পৌরহিত্যবাদ বা বৈরাগ্যবাদ উৎসাহিত না হলেও ন্যায় ও সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মহান আদর্শের কথাও বলা হয়; তদুপরি কোরআনে এমন কিছু বাণী আছে যার সুস্পষ্ট মরমি তাৎপর্য রয়েছে। আল্লাই প্রথম, আল্লাই শেষ, তিনিই প্রতীয়মান তিনিই গুহ্য, তিনিই নিরাকার অথচ তিনি মানুষের ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটবর্তী। যারা এ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন–তারা কোরআন হতে বৈরাগ্যবাদ, ভক্তিবাদ, রহস্যবাদ ইত্যাদি আবিষ্কার করেন এবং এগুলো সুফিবাদের প্রধান হিসেবে গৃহীত হয়–সুফিবাদ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন রূপ পরিগ্রহ করে।

উল্লেখিত সুফিবাদের উৎস সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা এবং এর প্রকৃত উৎস অনুসন্ধান করার পূর্বে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক মৌলনীতির আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। সূত্রাকারে বলতে গেলে, সংস্কৃতি হল মানুষের কৃতি; মানসিক ও বৈষয়িক; বিশেষ জনগোষ্ঠীর তার আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনের তাগিদে তা অর্জিত হয়। বাস্তবে সমাজ বা সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল বা গীতিশীল;- কোনোটাই স্থবীর নয়। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পাঠে আমরা লক্ষ্য করি যে, মানুষ জ্ঞান অর্জন করে তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা থেকে;আবার তার এরূপ অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে তার বিদ্যমান বাস্তবতাকে পরিবর্তিত করে দেয়। পুনশ্চ উন্নত বাস্তবতা হতে সে উন্নততর জ্ঞান-অর্জন করে এবং পুনরায় তার উন্নতর জ্ঞান দিয়ে তার বাস্তবতাকে পুনরায় পরিবর্তন ঘটায়। এভাবে একটি সমাজের মানসিক রূপান্তর ও তার

বৈষয়িক রূপান্তর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে এগিয়ে চলে। বস্তুত যে কোনো মানব সমাজে বিশেষ মানসিক অবস্থা বিশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থারই প্রতিফল। আরো উল্লেখ্য যে, আধুনিক বিকাশতত্ত্বে বহিরাগত কারণকে অস্বীকার করে না, তবে প্রাথমিক গুরুত্বারোপ করা হয় অভ্যন্তরীণ কারণের উপর। মুসলিম বিশ্বে সুফিবাদের মত একটি বিশেষ ভাবধারার যদি অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুকূল না হত তা হলে বহিরাগত কারণ আদৌ কার্যকর হতে পারত না। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি বিবেচ্য।

সুফিবাদের বিকাশক্রমের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এর প্রথম পর্যায় ছিল বৈরাগ্যবাদ; দ্বিতীয় পর্যায় ছিল রহস্যবাদ ও ভক্তিবাদ; তৃতীয় পর্যায় ছিল তন্ময়বাদ এবং চতুর্থ বা শেষ পর্যায় ছিল সর্ব ব্রহ্মবাদ। উল্লিখিত ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক নিরিখে আর্থ-সামাজিক পেক্ষাপটে প্রতিটি পর্যায়ের উপর আলোকপাত করা হবে।

বৈরাগ্যবাদ পর্যায়

আরব ভূমিতে প্রাথমিক ইসলামি জীবন ছিল অনাড়ম্বর সরল-সহজ। গোত্রীয় জীবনের ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল সবল। বিভিন্ন দেশ বিজয়ের সাথে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবন শুরু হলে নতুন নাগরিক জীবন এবং নতুন ধরনের জাতীয়তার জীবনের উত্থান ঘটে। পার্থিব ইহলৌকিক জীবন হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়; সমাজ জীবন হয়ে ওঠে জটিল। ক্রমবর্ধমান জটিল বৈষয়িক জীবনের ক্রমশ মানসিক শান্তি দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়। অবদমিত গোত্রবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দেয়; উমাইয়া-হাশেমী, হোমারীয়-মোজারীয় দ্বন্দ্ব, বেদুইন জীবন-নাগরিক জীবন, আরব-আজম সংঘাত, শিয়া-খারেজী বিদ্রোহ দেশের সামাজিক শান্তি কেড়ে নেয়। এরূপ বেসামাল অবস্থায় সরকারি অবিচার-অত্যাচার প্রকট হয়। ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিভিন্নতায় অখণ্ড মুসলিম সমাজ ফেরকায় ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। সকল দলই আপন আপন দলীয় স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে। ধর্মের মর্মবস্তু তিরোহিত হয়; ধর্ম কতকগুলো আচার-আচরণ-প্রথা সর্বস্ব বস্তুতে পরিণত হয়। বস্তুত উদীয়মান মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ সামাজিক রূপান্তরজনিত ফলাফলকে অনেকে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি। এরূপ বাস্তব পরিস্থিতিতে কিছু সংখ্যক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ক্রমবর্ধমান ইহলৌকিক জীবনেব প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ পরিহার করে নিরাভরণ জীবন শুরু করে। এঁদের মাধ্যমে ইসলামে বৈরাগ্যবাদ প্রবেশ করে। এ পর্যায় ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের নিকট তৎকালীন চিরকুমার খ্রিষ্টান যাজকদের ধর্ম পথে নিবেদিত জীবন আর্দশ বলে প্রতিভাত হয়।[১৬৮] উল্লেখ্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই তারা বৃহত্তর সিরিয়ায় একই রকম জীবনযাপন করে আসলেও ইতিপূর্বে তাদের জীবনাদর্শ উদীয়মান মুসলিমদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে নি। তাপসী রাবেয়া বসরী ও জাবের বিন হাইয়ান বৈরাগ্যবাদী জীবনযাপন শুরু করেন। এমন কি বলখের প্রশাসক ইব্রাহিম বিন আধাম রাজকীয় বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করে পশমি পোশাক পরিধান করেন এবং বিভিন্ন

দেশ পরিক্রমার পর সিরিয়ায় আগমন করেন; স্ব উপার্জিত সামান্য আয় দ্বারা দীনহীন জীবন যাপন করার আদর্শ গ্রহণ করেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি প্রয়াত হন।[১৬৯] কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির বৈরাগ্যবাদী জীবন গ্রহণের মধ্যে তৎকালীন বাস্তব অবস্থার বিরুদ্ধে এক ধরনের মৌন প্রতিবাদের আভাস পাওয়া যায়; এর পশ্চাতে একটি নেতিবাচক মনোভঙ্গি কাজ করে। যাহোক অচিরে উক্ত মনোভঙ্গির সাথে সংযোজিত হয় একটি ইতিবাচক উপাদান। ঐ উপাদানটি হল ভক্তিবাদ। বৈরাগ্যবাদের সাথে ভক্তিবাদের সংমিশ্রণে সুফিবাদ দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় স্তর

প্রথমত ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহকে পরম করণাময় প্রেমময় ও মহাক্ষমাশীল প্রতিপালক বলা হলেও বাস্তবে পরিবর্তনশীল সমাজের পূর্বে স্থিতাবস্থা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সমাজের সামনে আল্লা সম্পর্কে অতিমাত্রায় ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং পরজীবনে পুরস্কারের প্রলোভনের আধিক্যে আল্লার ক্ষমতাশীলতা ও প্রেময়তা অনেকাংশে হারিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত সকল ধর্মই মূলত ভক্তি প্রধান, জ্ঞাননির্ভর নয়। আব্বাসী সুবর্ণযুগে গ্রীক দর্শনের প্রাধান্য দেখা দেয়; ধর্মকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করার প্রবণতা লক্ষণীয় হয়; কেননা গ্রীক দর্শন মূলত যুক্তিপ্রধান। বাস্তবে ভক্তির প্রাধান্য যেমন বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, তেমনি যুক্তির প্রাধান্য শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরকে তৃপ্ত করতে পারে না। এ কারণেই প্রাচীন গ্রীকরা ভারতীয় রহস্যবাদের সংমিশ্রণে নব্য প্লেটোবাদী দর্শনের ভিত্তি রচনা করে। আল্লা এবং ধর্ম সম্পর্কে অযথা কূটতর্কের ফলে সমাজ মানসে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর—এ ধরনের মনোভঙ্গি দেখা দেয়। এভাবে আব্বাসী যুগে যুক্তিবাদের বিপরীতে ধর্মকে ভক্তিবাদে আবদ্ধ করার প্রবণতা তৈরি হয়। ভয়-ভিতি, তিরস্কার পুরস্কার এবং রীতি প্রথার নিগূঢ় হতে মানুষ অব্যাহতি চায়। মুক্তি হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের একান্ত কাম্য। প্রেম ও ভক্তিবাদ হয়ে ওঠে গণ-মানুষের ভরসা। সুফিবাদের দ্বিতীয় স্তরে এ কাজটি সম্পাদন করা হয়। আল্লা মানুষের অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে অতিবর্তী কোনো সত্তা নন, বরং প্রেমময় অন্তর্বর্তী অনুসৃত সত্তা। তিনি কেবল কঠোর শাস্তিদাতা নন; পরম করুণাময় ও প্রেমময়; তিনি সৃষ্টি জীবের লালন-পালনকারী সত্তা। তাঁকে জানতে হবে ঘনিষ্ঠভাবে—এ জন্য চাই স্বর্গীয় আলোক। পার্থিব ভোগ-বিলাসিতা বর্জন বা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ স্বত মূল্য নয়; এবং এগুলো আল্লার প্রতি মানুষের নিঃস্বার্থ প্রেম ও ভক্তির অভিব্যক্তি। ভক্তি আপ্লুত আত্মাই পেতে পারে নিগূঢ় জ্ঞানের সন্ধান; এ জ্ঞান হবে স্বজ্ঞা সঞ্জাত; প্রজ্ঞাজাত নয়। এরূপ মারেফাত বা খোদাতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন সুলাইমান আদ দারামী (মৃ. ৮৪৯-৫০ খ্রি.) তবে প্রথম মরমি সুফি ছিলেন মারুফ কারখী। তিনি ৮১৫ সালে বাগদাদে প্রয়াত হন। তিনি প্রথম জীবনে খ্রিষ্টান অথবা মাগী ছিলেন। তাঁকে আল্লার প্রেমে উন্মত্ত সাধক পুরুষ বলা হত।[১৭০]

গুহ্যবাদের মূল মর্মই হচ্ছে প্রেম। According to the mystic principle nothing really exists but God. God is eternal beuty and the path leading to how is God Love.[১৭১] মুসলিম বিশ্বের অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্যন্ত—এ সময়ে তার আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্রমশ সুফিবাদ এবং সুফি সম্প্রদায়ের উন্মেষ ও বিকাশক্রম লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত সুফিবাদের দুটি স্তরে নিম্নলিখিত সোপানগুলি রূপ পরিগ্রহ করে।

১. **বৈরাগ্য বা মায়ার বন্ধন ত্যাগ :** বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, কামিনী-কাঞ্চন, ধন-দৌলত থেকে আপনাকে মুক্ত করা হল সুফিবাদের প্রথম ধাপ;

২. **একান্ত চিন্তা :** যেখানে চিত্তচাঞ্চল্যকর বস্তু নেই সে রকম নির্জন স্থানে নিবিষ্ট চিত্তে আল্লার ধ্যান বা জিকির করা;

৩. **তপ-জপ :** ধ্যানকালে এমনভাবে আল্লা নাম স্মরণ করা যাতে জিহ্বা জড়িত না হয়-এবং মনে হবে যে, আল্লার নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। এটাই সুফিদের কল্বজারি;

৪. **মনোজপ :** ধ্যানের সময় শুধু মুখে নয়-অন্তরের মধ্যেও আল্লা নাম উচ্চারিত হবে।[১৭২]

তৃতীয় স্তর-আল্লায় তন্ময়তা

সুফিবাদের দ্বিতীয় স্তরের আনুধ্যানিক মরমিবাদ হতে উক্ত তৃতীয় স্তরে সুফিবাদ উন্নীত হয়। জুন্নুন আল মিসরী তাঁর সাধনা অভিজ্ঞতা দ্বারা সুফিবাদ ঐ স্তরে উন্নীত করেন। তিনি ৮৬০ সালে গাজায় প্রয়াত হন। তাঁকে বিশ্বের প্রথম কুতুব বলে অভিহিত করা হয়। তিনি সুফিবাদের স্থায়ীরূপ দান করেন। তৃতীয় সোপানে মনোজপ বর্ধিত হয়ে চিত্তের একাগ্রতা এত গভীর হয় যে, এ সময় বর্ণ, শব্দ বা উচ্চারণের কোনো খেয়ালই থাকে না। আল্লার ধ্যানে অন্তর এত গভীরভাবে নিমগ্ন হয় যে, তার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না, আল্লাতে নিমজ্জিত হয়—এটাই সামাধিপ্রাপ্তি। এরূপ তন্ময়তার মধ্য দিয়ে মানব আত্মা আল্লার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে ও তার সম্যক পরিচিতি বা মায়ারেফত লাভ করতে পারে। এ জ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা প্রজ্ঞা দ্বারা লাভ করা যায় না।[১৭৩] এরূপ তন্ময়তার স্তরেই কেবল দিব্যদর্শন (মুশাহাদা ও মুকাশাফা) হয়। এই স্তরে ইমান বিল গায়ের নয় সকল আধ্যাত্মিক সত্যতা স্পষ্ট দেখা যায়।

চতুর্থ সোপান : সর্ব ব্রহ্মবাদ

ইরানী বংশোদ্ভূত রায়জীদ বোস্তামী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হতে সুফিবাদ উক্ত সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেন। তিনি ৮৭৫ সালে প্রয়াত হন। তাঁর পিতামহ ছিলেন

ম্যাগ। তিনি সর্বপ্রথম ফানাফিল্লাহ বা সমাধিতত্ত্ব প্রচার করেন। এরূপ সমাধি যোগেই কেবল দিব্যদর্শন বা মোশাহাদা হতে পারে। আল্লাতে নিমজ্জিত ব্যক্তিসত্তা সব কিছুর মধ্যে আল্লার অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই দেখতে পান না। এটাই সর্ব ব্রহ্মবাদ। জুনাইদ বাগদাদী (মৃ. ৯১০ খ্রি.) এবং ইবনুল আরাবি (১১২৫-১২৪০ খ্রি.) উক্ত সর্বব্রহ্মবাদের স্বপক্ষে তাত্ত্বিক সমর্থন দান করেন। তাঁদের ধারণা ছিল সৃষ্টির সর্বত্র আল্লার মহিমাই কেবল প্রতিবিম্বিত হয় না এবং সর্বত্রই আল্লার অস্তিত্বই প্রতিফলিত হয়; হামা উস্ত এই মতাদর্শই তারা প্রচার করেন।[১৭৪] প্রচণ্ড এক ভাবোচ্ছাসে মনসুর হাল্লাজের মুখ হতে নির্গত হয় "আনাল হক" বা আমিই সত্য–এ জন্য হাম্বলীদের আন্দোলনের চাপে তাকে ৯২২ সালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার মতাদর্শ নিম্নে কাব্য চরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

I am He whom I love, and He whom I love is I
We are two souls dwelling in one body.
When thou seest me thou Seet Him
And when thou seest Him, thou seest us both.[১৭৫]

উল্লিখিত বিবরণ হতে প্রথমত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সুফিবাদ এক সময় বা একক অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠে নি; বরং তা দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। এর প্রতিটি স্তরের পশ্চাতে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন এতে ঘটে। অভ্যন্তরীণ কারণটাই মুখ্য তবে বাহ্যিক উপাদান তার বিকাশের শর্ত হিসেবে কাজ করেছে। সমগ্র বিষয়ে দেখার এটাই প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয়ত আরো প্রতীয়মান হয় যে, সুফিবাদের স্পষ্টত নব্য প্লেটোবাদী দর্শন, ইরানী ভাবধারা ভারতীয় যোগ সাধনা বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বের সৃজনশীল সংশ্লেষণে ঘটেছে। এ ধরনের পন্থা ইসলামের পূর্ব হতেই ইরাক, ইরান সিরিয়া, মিশর প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতির অবশ্য দৈশিক ও কালিক রূপ অবশ্যই থাকে-এতদসত্ত্বেও তার একটি আন্তর্জাতিক রূপও থাকে। বস্তুত অসংখ্য স্থানীয় সংস্কৃতির যোগ বিয়োগের সমন্বয়ে বিশ্ব সভ্যতা গড়ে ওঠে। স্থানীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব ফেলে। গ্রহণ বর্জন বিকাশমানতাই এর সাধারণ ধর্ম। ইসলামি বিশ্বে পরিবর্তনশীল বাস্তব অবস্থায় ঐ সব বাহ্যিক উপাদানসমূহ সুনির্বাচিতভাবে আত্তীকরণ করার ফলে সুফিবাদ অন্য সব হতে বাহ্যত স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে।

উপরে ইসলামের সুফিবাদের বিকাশধারাটি তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধ্যাপক হিট্টি যথার্থ অর্থে তা ব্যাখ্যা করেন নি। ওলিয়ারীও সেদিকে পা মাড়ান নি। প্রফেসর হিট্টি সুফিবাদের যে সামাজিক ফলাফলের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দ্বিমত পোষণ করার কোনো কারণ নেই। তিনি বলেন **Moslim mysticism represents a reactcon against the intellectualism of Islam and the Quran and the formalism which developed as a consequences,**

Psychologically its basis should be sought in human aspiration to a personal direct approach to and a more intense experience of, the deity and relegious truth.[১৭৬]

প্রাথমিক পর্যায়ে শরিয়ত তথা রক্ষণশীল সনাতনী বিশ্বাস ও আচরণের সাথে সুফিবাদের বড় ধরনের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি। কতিপয় সুনিদিষ্ট রীতি প্রথা, আচার-আচরণ অনুষ্ঠান ও তাদের অনুশীলন নিয়ে শরিয়ত গঠিত হয়। মধ্যযুগে আরবে ইসলামি বিপ্লবকালে বিচ্ছিন্ন আরব গোত্রগুলোকে সুশৃঙ্খল ও আরব জাতীয়তার বৃত্তের জীবনে অভ্যস্ত করার জন্য শরিয়তের বিধানের কোনো বিকল্প ছিল না। তবে ইসলামের আদর্শ অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে নি। সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থায় শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়ে কেবল পার্থিব সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা রক্ষার উপায়ে পরিণত হয়। আরবের সহজ সরল ইসলাম ছিল মূলত জীবনবাদী, কিন্তু ক্রমশ তা হয় ভোগবাদী। এর আধ্যাত্মিক মাহত্ম বাকি থাকে নি। এরূপ অবস্থায় অনেকের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটে নি বলেই ভিন্ন পথ ও মতের সন্ধান করে; জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবে; ধর্মের নতুন ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করে। তারা কোরানের বিশেষ বিশেষ আয়াতের নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করলে রক্ষণশীলদের সাথে তাদের মতপার্থক্য বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ক্রমে তাদের জীবন পদ্ধতি হয়ে ওঠে ভিন্নধর্মী। সুফিরা ছিলেন পরলোকবাদী; বৈরাগী ও নিস্ক্রিয় জীবনের ধারক বাহক। পরবর্তী পর্যায় সুফিবাদ অনারব প্রভাবে একটি অনুধ্যানিক দার্শনিক মতবাদে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে তাঁরা রক্ষণশীল ইসলাম হতে দূরে সরে যান। শরিয়ত ও মারফত এ দু মত দুপথের বিকাশে সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন আর এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। শোষণমূলক সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় সুফিবাদের নৈতিক বিজয় হয়।[১৭৭]

শরিয়ত বনাম মারফত—এ দ্বন্দ্বের পাশ্চাতে তৎকালীন প্রাচ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রূপান্তরের ঐতিহাসিক পটভূমিটি সংক্ষেপে অবশ্যই বিবেচ্য। বাগদাদের তুর্কী ইরান নয়া আভিজাত্যের কোন্দলে নবম শতাব্দীর শেষার্ধে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং ৯৩৬ সালে আমিরুল উমারার নিকট খলিফা সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে পর্দার অন্তরালে চলে যান; কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয় নি। ৯৪৬ সালে শিয়া মতাবলম্বী ইরানী জাতিসত্তার বুওয়াইহী বংশ বাগদাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করায় আব্বাসী খলিফাগণ চিরতরে রাজনৈতিক ক্ষমতা হতে অপসারিত হন। তবে সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতা রূপে স্বীকৃতি পান। রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হলেও যেহেতু বাগদাদ খলিফা ছিলেন সুন্নি আধ্যাত্মিক ইমাম এবং বাগদাদের সর্ববৃহৎ সামন্ত, দান-উপঢৌকন দেয়ার মত সোনা-দানার তাঁর কোনো কমতি ছিল না; অসংখ্য আলেম, ফকিহ ও মোসাহেব তাকে ঘেরাও করে রাখে। তাদের দিয়ে তাঁদের অসহায় খলিফা সুনির্দিষ্ট সুন্নি বৃত্ত অংকন করেন। তাদের সৃষ্ট নতুন সুন্নি বিধি-বিধান

বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হয়; শিয়া সুন্নি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাগদাদে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়; তথাকথিত বেদায়াতী মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান তাঁদের হাতে রেহাই পায় নি; ইবনে সিনা-এমন কি গাজ্জালীর পুস্তক জ্বালানোর উৎসব হয় বাগদাদে; মোতাজেলী পণ্ডিত ঘরের বাইরে প্রকাশ্য চলাফেরা করতে পারতেন না। হাল্লাজকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়; ঐতিহাসিক তাবারীকে যথাস্থানে কবরস্থ করা যায় নি, উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এরূপ সামাজিক অস্থির অবস্থায় উদীয়মান তুর্কী জাতিসত্তা নিজেদের প্রতিষ্ঠায় সুন্নি ইসলাম গ্রহণ করে; ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত গজনবী বংশ এবং সেলজুক তুর্কীরা সুন্নি ইসলামের রক্ষক তথাকথিত খলিফার প্রতি ধর্মীয় আনুগত্য প্রকাশ করে। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে সেলজুক তুর্কী শিয়া বুওয়াইহীদের নিকট হতে ক্ষমতা দখল করে বটে; কিন্তু খলিফার বাস্তব অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি; তখনো তাকে সুন্নি ইসলামের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এভাবে সমগ্র প্রাচ্য ইসলামি সমাজে নয়া শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সালতানাত গঠনের তুর্কী জাতিসত্তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সুন্নি ইসলামে তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরূপ সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মারেফাত পন্থীদের কি অবস্থা হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। তবে নৈরাশ্য মূল বাস্তব অবস্থা ছিল তাদের অনুকূলে উদীয়মান তুর্কী জাতিসত্তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে মরমিবাদ রহস্যবাদ ছিল সম্পৃক্ত। সুফিবাদ লালন পালনে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

একাদশ শতকের শেষার্ধে ইমাম গাজ্জালী সেলজুকী সুলতান দরবার অলঙ্কৃত করেন বটে; কিন্তু অচিরেই রাজদরবার ও দরবারি আলেমদের জীবন ধারণ পদ্ধতিতে বিরক্ত হয়ে স্বয়ং সুফিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি সাহসের সাথে ঘোষণা করেন যে, যারা সুফিদের অপার আনন্দের আস্বাদ পায় নি তারা মহানবীর মাহত্ম ও স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম। যেহেতু তিনি শরিয়ত ও মারেফাতের সাথে সুপরিচিত, তাই তিনি তাদের চরম পন্থার দিকে না ঝুঁকে উভয়ের মধ্যে একটি মধ্যপন্থা আবিষ্কার করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এর পূর্বেই সুফি মতাদর্শ যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে; গাজ্জালী তার একটি সুসংহত সুব্যবস্থিত শাস্ত্রসম্মত রূপ দান করেন। তাঁর লেখনির ফলে মারেফত পন্থীরা তাদের পায়ের তলে মাটি খুঁজে পায়। সুফিদের মধ্যে একদল কর্মযোগের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করত; আবার অনেকে সমাধি যোগের উপর অত্যধিক জোর দিত। গাজ্জালী কর্মবাদ ও সমাধিবাদের মধ্যে এক সমঝোতা গড়ে তোলেন। তাঁর মহাগ্রন্থ ইয়াহইয়াউল উলুমের ঝোঁক এই সমন্বয়ের দিকে ছিল।[১৭৮] গাজ্জালী সুফিবাদকে সনাতনী শাস্ত্রের ভিত্তির উপর দাঁড় করতে প্রয়াস চালান বটে; কিন্তু সুফিবাদটি মূলত মরমিবাদী রহস্যবাদী; যার মূল ধর্ম প্রেমবাদ ও ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে প্রথমত এবং প্রধানত তৎকালীন

সর্বগ্রাসী আর্থ-সামাজিক অন্যায় অবিচার হতে উদ্ভব নৈরাশ্যবাদে জর্জরিত মানব সমাজের নিকট ভক্তিবাদী আধ্যাত্মিক গীতিধর্মী প্রেম কাব্যের মূর্ছনার আবেদন ছিল প্রচণ্ড; সুফিতত্ত্বে ছোট-বড়, রাজা-প্রজা, শাসক শোষিত সবাই যেন মুক্তির আশার আলোক দেখতে পায়। ইহজনমে না হোক, পরজনমে অনন্তকালের জন্য মুক্তি যদি পাওয়া যায় তবে এ দুদিন কি দুনিয়ায় সুখ সম্ভোগের পরিবর্তে দুঃখ ভোগ আপত্তি করবে কেন? আত্মার মুক্তি বড় মুক্তি। দ্বিতীয়ত সুফিমতবাদে উদীয়মান ইরানী ও তুর্কী জাতিসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ছিল লক্ষণীয়। সুফি বাদের মধ্যে নয়া ধর্ম ইসলামকে তাদের ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত করার সুযোগ লক্ষ্য করে; তদুপরি কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এরূপ মতাদর্শকে তাদের উদীয়মান সমরতান্ত্রিক সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ব্যবহার করা সহজসাধ্য বলে ভেবেছিল। বস্তুত প্রাচ্য মুসলিম রাজ্যসমূহে দ্বাদশ শতক হতে সুফিবাদের বিকাশ হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। লক্ষ্য করার বিষয় আরবি ভাষাভাষী অঞ্চলে মিশরের ইবনুল ফরিদ (১১৮১-১২৩৫ খ্রি.) ব্যতীত অন্য কোনো মরমি কাব্য রচনায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি।[১৭৯] ফারসি ও তুর্কী ভাষাভাষী অঞ্চলে ফারসি ভাষায় মরমি কাব্যের প্রবল প্লাবন আসে। অসংখ্য অতি বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক এ সময় আবির্ভূত হন; ধ্রুপদী স্বর্গীয় ও লৌকিক প্রেমকাব্য রচিত হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন ওমর খাইয়াম, হাফেজ, সাদী, রুমী, জামী, নিজামী আরো কত জন। এঁদের কাব্য ঝঙ্কার সকলের হৃদয় স্পর্শ করায় সুফিবাদ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। উনিশ শতকে ওয়াহাবী সংস্কারবাদী আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত সুফিবাদের জনপ্রিয়তা ছিল গগনচুম্বী।

একাদশ শতকের প্রথমার্ধে সুফি মত ও পথ যথেষ্ট বিকশিত হলেও সুফিদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার রূপ ছিল ব্যক্তিগত। একজন সুফি বা মুর্শিদ (গুরু) যেমন মনসুর হাল্লাজকে কেন্দ্র করে তার আশ-পাশে ভক্তরা আল্লার নামে জপ করার জন্য সমবেশ হতেন-এর সাংগঠনিক রূপটি ছিল স্থানীয় এবং অস্থায়ী। ঐ শতকের শেষার্ধে অবস্থার পরিবর্তন হয়। একাদশ শতকের শেষার্ধ হতে দ্বাদশ শতাব্দী পেরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুরু-শিষ্য-বৃত্ত সর্বত্র স্থায়ী ও ব্যাপক সুসংগঠিত সিলসিলা বা তারিকার রূপ পরিগ্রহ করে। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্যাপক ভ্রাতৃসংঘ-পির-মুরিদী সিলসিলা ছিল কাদেরীয়া তরিকা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আব্দুল কাদের জিলানী বা জিল্লী (১০৭৭-১১৬৬ খ্রি.)। তিনি বাগদাদ নগরে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এখনো বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট তিনি সম্মানিত বড় পির সাধু পুরুষ। বাগদাদে তার মাজার তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তার তরিকা ছিল খুবই সহনশীল, উদার ও দরিদ্র বৎসল। তৎকালের দ্বিতীয় বড় সংগঠন ছিল আররিফাইয়ী। এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমদ আর রিফাই (মৃত ১১৭৫ খ্রি.) এই তরিকার মুর্শিদদের নানা ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা বা কেরামতির কথা লোক মুখে চালু ছিল।[১৮০] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মৌলভী

তরিকা খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিখ্যাত ফারসি মসনবী কবি জালালুদ্দীন রুমী। তার মসনবীকে বলা হয় ফারসি ভাষায় কোরআন। তিনি এশিয়া মাইনরে কেনীয়া বা ইকেনিয়ামে ১২৭৩ সালে প্রয়াত হন। রুমী শিষ্যদেরকে আবর্তনকারী দরবেশ বলা হত। এ তরিকায় সমাধিযোগ সম্পাদন করার জন্য নৃত্যগীতির প্রচলন করা হয়। এই সিলসিলাটির নেতৃত্বে ছিল বংশনুক্রমিক; তরিকা প্রধান বসবাস করতেন কেনিয়ায়। সিলসিলা প্রধান তাঁর নিজস্ব তলওয়ারসহ উসমানী সুলতানদের পাশে আসন গ্রহণ করার অধিকার অর্জন করেন।[১৮১]

আমাদের আলোচ্য সময়ের পর ত্রয়োদশ শতকের আদলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রভাবশালী সুফি তরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজদরবারের চাইতে জনতার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল গভীর। সাধারণ মানুষ এঁদেরকে তাদের শান্তি ও সান্ত্বনার উৎস বলে বিবেচনা করত। বিপদে-আপদে জনতা তাঁদের আশির্বাদ বা দোওয়া, পানিপড়া বা তাবিজ কবজের জন্য তাদের নিকট প্রার্থনা করত। তাই তাঁরা ছিলেন জনতার সুখ-দুঃখের সাথী, বন্ধু এবং মুর্শিদ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই তাদের জনপ্রিয়তার বড় কারণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র লোকশক্তির মধ্যে ইসলামের প্রসার ঘটার মূলে ছিলেন সুফি দরবেশরা। তাঁদের সহিষ্ণু ধর্মমতের সাথে লোকজ সংস্কৃতির কোনো বৈরী সম্পর্ক না থাকায় এঁদের প্রতি জনতা আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের অনুসারী হয়েছে। এ জলন্ত উদাহরণ ইরান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

আদি ইসলামে পৌরহিত্যবাদ, যাজকতন্ত্র অথবা বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান ছিল না। সুফিবাদের সৌজন্যে কালক্রমে ইসলামে তা প্রবেশ করে; একই সাথে তপ-জপ ধ্যান পদ্ধতিও প্রবর্তিত হয়। তসবিহ্ বা জপমালার ব্যবহার ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে না থাকলেও পরবর্তীকালে তসবিহ পাঠ আল্লার জিকিরের একটি অঙ্গ হিসেবে বিবেচ্য। এটা মূলত ভারতীয় ঐতিহ্যের অংশবিশেষ এবং সিরিয়া খ্রিষ্টান ধর্মযাজকের মধ্যে এর ব্যবহার ছিল প্রচুর। মুসলিম দরবেশগণ এটা সম্ভবত তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেন। ক্রুসেডের সময় এটা ল্যাটিন ইউরোপে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়। জোনাইদ বাগদাদী সমাধিযোগ বা আত্মতন্ময় দশা প্রাপ্তির জন্য এটা ব্যবহার করেন। জপমালা বেদায়াতী বলে সে সময় সমালোচনা করা হলে তিনি বলেছিলেন যে, যে পথ তাঁকে আল্লা পর্যন্ত পৌছে দেয়, সে পথ তিনি ত্যাগ করতে পারেন না।[১৮২] সংস্কারবাদী ওয়াহাবীরা এটাকে কোনো দিন অনুমোদন করেন না।

সুফি সম্প্রদায় বৈরাগ্যবাদ বা সাধু-সন্ন্যাসতন্ত্রই কেবল প্রতিষ্ঠা করেন নি বরং সমগ্র মধ্যযুগে তা অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলেন। কোরআনে পীরপূজার কোনো স্থান নেই। সুফিবাদের মাধ্যমে যে রীতিনীতি প্রথা গড়ে ওঠে তা মূলত পিরপূজারই সামিল। আল্লা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধু পুরুষরাই সেতুবন্ধ রচনা করতে পারেন বলে

ভাবা হয়। এ যোগ্যতা তারা অর্জন করেন তাদের কেরামতি দ্বারা। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শিয়া-সুন্নিরা মনে করতেন যে, সাধু পুরুষের নিকট প্রার্থনা করা চরম মূর্তি পূজার সামিল; কিন্তু ধীরে ধীরে সুফিদের প্রভাবে মুসলিম সমাজে অনেকাংশে তা সহনীয় হয়ে ওঠে; পিরবাদ-সনাতন শরিয়তের মধ্যে এক রকম সমঝোতা হয়ে যায়। উনিশ শতক পর্যন্ত তা বিনা প্রতিবাদে অব্যাহত থাকে। সুফিবাদের নেতিবাচক দিকটি আজকাল সমাজ-সচেতন ঐতিহাসিকের নিকট ধরা পড়ছে।[১৮৩] এ কথা সত্য যে প্রাচ্য মুসলিম নবম-দশম শতাব্দীর রাজনৈতিক সংকট এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয় সত্ত্বেও মুসলিম বিদ্বৎসমাজে যতটুকু বিজ্ঞান-মনস্কতা বিকাশোন্মুখ হয়েছিল-সুফিবাদের প্রভাবে তা নির্মূলিত হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবে সুফিদের তুলনায় তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রই তার জন্য অনেক বেশি দায়ী। তারা তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যুদ্ধাস্ত্র তৈরি, সুখ আয়েশের জন্য বৈজ্ঞানিক হাম্মামখানা, তাদের পারিবারিক বাগিচা, শিল্প রক্ষার জন্য সীমিতভাবে হলেও বিজ্ঞানে ব্যবহার করে; কিন্তু উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি বা সাধারণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ব্যবহার আদৌ উৎসাহিত হয় নি। একারণেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত জরুরি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানেও একাদশ শতকের পর হতে উৎকর্ষ সাধিত হয় নি। এমন কি অসুস্থ জনতা হাকিমের নিকট না গিয়ে পিরের দরবারে দোয়া-কবজ-তেল পড়া নেওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিল। অথবা পিরের কবরে হাজাত, মান্নাত, মোনাজাত দিয়ে তারা তাদের নিরাময়তা, জীবনের নিশ্চায়তা বা শান্তি কামনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এটাই হল সামন্ত মূল্যবোধের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

যাহোক জনতার উপর সুফিবাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের একটাই বড় কারণ যে, তারাই নৈরাশ্যের যুগে জন মানুষের বৈষয়িক মুক্তির কোনো সন্ধান না দিলেও আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা তাঁরা বলেন। এর মধ্য তাঁরা জনতাকে নৈরাশ্যে সর্বগ্রাসী সর্বনাশ হতে রক্ষা করেছেন। শাসক-শোষক চক্র ও আল্লার রহমত পাওয়ার জন্য সুফিদের দ্বারস্থ হতেন।

গ. আল গাজ্জালী (১০৫৯-১১১১ খ্রি.) :

আবু হামিদ মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আল গাজ্জালী তৎকালীন খোরাসান প্রদেশের তুস নগরীতে ১০৫৮ সালে এক নিরক্ষর, কিন্তু বিদ্যোৎশাহী দরিদ্র তন্তুজীবী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে জুর্জানে গিয়ে আবু নাসের ইসমাইলী নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন শুরু করেন। শিক্ষকের সকল বক্তৃতা কাগজে লিখে রাখতেন। একদিন গাজ্জালী বাড়ি ফেরার সময় দস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত হলে তিনি দস্যু সরদারকে তাঁর কাগজগুলো ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। সরদার তার অনুরোধ রক্ষা করেন। এ সময় তিনি যথেষ্ট বিদ্যার্জন করলেও উচ্চতর শিক্ষার জন্য নিশাপুর নিজামিয়া কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক আব্দুল মালিক হারামাইনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করে ১০৮৬-৮৭ সাল হারামাইনের আমৃত্যু তার নিকট

অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর পাণ্ডিত্য যশ ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষকের মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর।[১৮৪]

তার সময়ের বাস্তব অবস্থা

ইমাম গাজ্জালীর চিন্তাধারা এবং ইসলামের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁর অবদানের বস্তুনিষ্ট মূল্যায়ন এবং তার গতি প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য তার কর্ম জীবন (১০৫৮-১১ খ্রি.) এবং তৎকালীন সমাজের বাস্তব অবস্থার উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

প্রথমত তার জন্মের শতাধিক বছর পূর্ব হতে বুওয়াইহী বংশ কর্তৃক ৯৪৬ সালে বাগদাদ দখলের পর হতে বাগদাদের খলিফার রাজ্য শাসন ক্ষমতা বা জাহানদারী শেষ হলে খলিফা কেবল বিশ্ব সুন্নি মুসলিম ধর্মাচার্য হিসেবে টিকে থাকেন। প্রাচ্যের বিশাল ইসলামি রাজ্য তখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সালতানাতে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে। তাঁর জন্মের মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ১০৫৫ সালে ইরানি জাতিসত্তার বুওয়াইহীদের ধ্বংসস্তূপে উদীয়মান তুর্কি জাতিসত্তার তুগ্রিল বেগের নেতৃত্বে (১০৩৭-১০৬২ খ্রি.) বাগদাদে সেলজুক সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের মালিক শাহের রাজত্বকাল (১০৭২-১০৯২ খ্রি.) গৌরবময় মধ্যাহ্নকাল। এই বংশ ইসলামি সাম্রাজ্যের ঐক্য সংহতি ও সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করে; কিন্তু তাদের সাফল্য ছিল সীমিত। এই সালতানাতের রাজ্যসীমা পূর্বে চীন সীমান্ত কাসগড় পর্যন্ত এবং পশ্চিমে জেরুজালেম থেকে কনস্ট্যান্টিনোপাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত এ সময় বিভিন্ন জাতিসত্তার অভ্যুদয়ের সাথে কিছু আদর্শগত প্রশ্ন জড়ানোর প্রবণতা দেখা দেয়। বুওয়াইহী রাজপরিবার শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও তাদের প্রশাসন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ এবং উদার। সুন্নিদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনো সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করে বলে কোনো প্রমাণ নেই। তথাকথিত খলিফার আচার-আচরণ হতে সুন্নি মহলে শিয়া-বিরোধী একটা মনোভাব গড়ে ওঠে। সুন্নিদের শিয়া-বিরোধী মনোভাবই শিয়া বাতেনী ইসমাইলী সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে উদীয়মান তুর্কি জাতিসত্তা সুন্নি ইসলামের রাস্তা নিয়ে সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ইমাম খলিফাকে বুওয়াইহীদের কবল হতে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এ কাজে তারা সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু মজার ব্যাপার তারাও খলিফাকে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করে নি। তারা বাতেনী এ্যাসাসিনদের দমন করতে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত সেলজুকরা উদীয়মান সমরতন্ত্রী সামন্ত ব্যবস্থায় এক নয়া রূপ দান করে এবং দ্রুত বিকাশমান পুরোহিততন্ত্রকে উৎসাহিত করে। প্রাচ্য ইসলামি বিশ্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হতে বিদায় গ্রহণ করে; ইসলামি বিশ্বের দেশে দেশে স্থবীর কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্য বিস্তার করে। কৃষক মেহনতী জনতার উপর সামন্ত শোষণ তীব্র

আকার ধারণ করে; সামাজিক অস্থিরতা হয়ে ওঠে তৎকালীন সময়ের বৈশিষ্ট্য।[১৮৫] এ সময়ের সামন্ত মোহন্তদের (উলামা) সম্পর্কে গাজ্জালীর মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য।

সেলজুক সুলতান সাঞ্জার তার এক দাসীর প্রেমে পাগল হয়ে যে জায়গীর ও উপঢৌকন প্রদান করেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গাজ্জালী বলেন : শ্রমজীবী জনতার ঘাড় যেমন কঠোর পরিশ্রমে যত ঝুঁকে পড়ছে, আপনার অশ্বের ঘাড়ও তেমনি ভাবেই ঐশ্বর্যের বোঝায় নুয়ে পড়ছে। মোহন্তদের সম্পর্কে বলেন এই মনুষ্যরূপী শয়তান, এই পথ ভ্রষ্টগণ অন্যদের ভ্রান্ত পথে চালনা করে। অবশ্য এর বিপরীত চরিত্রের লোক নেই তা নয়, তবে সে রকম ব্যক্তি এখনো আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। তারা সুলতান ও আমীরদের বেতনভোগী; তাঁদের মুখবন্ধ; তারা সত্য বাক্য উচ্চারণ করতে অক্ষম।[১৮৬]

এরূপ আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে তরুণ আল গাজ্জালী তার কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। তার কর্মময় জীবনের উপর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতেই তাঁর আধ্যাত্মিক বা মানসিক পরিক্রমার বিভিন্ন পর্যায়ের গতি প্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। প্রথম জীবনে তরুণ বয়সে তার মত তেজস্বী ও যশস্বী পণ্ডিতের যদি যশাকাঙক্ষা থাকে তবে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তৎকালীন সামন্ত ব্যবস্থায় রাজদরবারে অনুগ্রহ ব্যতীত কারো আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি রাজদরবারে প্রবেশ করেন। সেলজুক প্রধানমন্ত্রী নিজামুলমূলক তুসি তাঁর নিজ নগরের মানুষ হলেও গাজ্জালীর যোগ্যতা প্রমাণিত করার জন্য একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করেন। ঐ বিতর্ক সভায় গাজ্জালী সফল হওয়ায় মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তৎকালীন বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত নিজামীয়া মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক পদে নিয়োগ পান। সম্ভবত তিনি ১০৯১ সালে বাগদাদে পদার্পণ করলে তাঁকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। এটা ছিল তার জীবনের প্রথম, কিন্তু বড় প্রাপ্তি।[১৮৭]

বাগদাদে প্রবেশ করেই তিনি মর্যাদার আসন অলঙ্কৃত করেন। ১০৯২ সালে মালিক শাহ্ প্রয়াত হলে তাঁর বেগম তুখান খাতুন সেলজুকি দরবারের অভিজাতবর্গকে এই মর্মে রাজি করান যে, তাঁর শিশু পুত্র মাহমুদ তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হবেন। এ ব্যাপারে খলিফার বলার কিছু ছিল না; তবে বেগমের আর একটি আবেদন ছিল যে, খোতবায় ঐ বালকের নাম পঠিত হোক। এ ব্যাপারে খলিফা মুক্তাদির একটু বেকায়দায় পতিত হলে গাজ্জালীকে বেগমের দরবারে প্রেরণ করা হয়। গাজ্জালী তাঁর বাগ্মিতা দ্বারা বেগমকে তাঁর দ্বিতীয় শর্তটি প্রত্যাহার করতে রাজি করান।

১০৯৪ সালে মুস্তাজহির খলিফা হন। এ সময় সমাজের উচ্চকোটিতে এ্যাসাসিনদের প্রভাব পড়তে থাকে। গাজ্জালী তাদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করেন এবং মুস্তাজহেরী শীর্ষক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন।[১৮৮] এ সময় রক্ষণশীলদের চাপে মুস্তাজহির ইবনে সিনা এবং হাশিমের পুস্তকাদি পুড়িয়ে দেন, তথাপিও বাগদাদে

তখনো মুক্ত চিন্তার আবহাওয়া বিদ্যামান ছিল। এ সম্পর্কে গাজ্জালী বলেন : 'আমি একে একে বাতেনী, জাহিরী, দার্শনিক, মুতাকাল্লেমুন, জিন্দীক-সকলের সঙ্গে মিশেছি এবং তাদের বিচারধারাকে জানতে চেয়েছি। আমার প্রবৃত্তি হল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্যের অনুসন্ধান করা। এর প্রভাবে বাল্যকাল থেকে যে ধর্মীয় বিশ্বাস অন্তরে গেঁথে ছিল তাতে ফাটল ধরে;...শেষ অবধি কোনো কিছুর উপরে আর বিশ্বাস থাকল না তবে এ অবস্থাও বেশি দিন টেকে নি। খোদার দয়ায় পুনরায় সব ঠিক হয়; তবে সুফি মতাদর্শ আমাকে প্রবল বেগে আকৃষ্ট করে।[১৮৯] এ সময় তিনি মানসিক সংকটে পড়েন। বাগদাদের সুখৈশ্বর্য বিসর্জন দিতে তাঁর কোন অসুবিধে হয় নি তবে তিনি ভক্তিবাদ ও যুক্তিবাদের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যান। অবশেষে যুক্তিবাদের পথ পরিহার করে সুফিবাদের পথকে নির্বাচন করেন।[১৯০]

বাগদাদ জীবন পরিত্যাগ করে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে আধ্যাত্মিক পরিক্রমায় বের হয়ে পড়েন। প্রথমে দামাস্কাসে দু বছর কাটিয়ে জেরুজালেমসহ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের পর মক্কা মদিনায় গমন করেন এবং হজব্রত পালন শেষে বেশ কিছু দিন আরব ভূমিতে অবস্থান করেন। এই ভবঘুরে জীবনের বড় কীর্তি হল তার বিখ্যাত পুস্তক ইয়াহইয়া উল উলুম।

ভবঘুরে জীবনের সমাপ্তি টেনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করেন এবং ১১০৬ সালে নিশাপুর নিজামিয়া কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। নিশাপুরে এ্যাসাসিনদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ তীব্র আকার ধারণ করলে তাঁর পক্ষে নিশাপুরে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ সময় তিনি একান্ত জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন, তার প্রতি ঈর্ষাকাতর লোকের অভাব ছিল না। তারা তাঁর পুস্তকের অপব্যাখ্যা করতে শুরু করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অপবাদ এমনভাবে দেয় যে, স্বয়ং সুলতান সঞ্জার গাজ্জালীকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান।[১৯১] সুলতানের পত্র পেয়ে তিনি মাসহাদ পর্যন্ত এসে রাজদরবারে উপস্থিত হতে পারছেন না বলে এক অনুরোধ পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে তিনি সুলতানকে জানান যে, তিনটি কারণে তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হতে অক্ষম। কারণ তিনি নবী ইব্রাহিমের কবরে তিনটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন : ক. আর কখনো তিনি কোনো সুলতানের সম্মুখীন হবেন না; খ. কখনো তিনি সুলতানের উপহার গ্রহণ করবেন না; গ. কারো সাথে কোনো শাস্ত্রীয় বিতর্কে যাবেন না। এতদসত্ত্বে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সঞ্জারের দরবারে উপস্থিত হতে হয়। গাজ্জালীর প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা দেখে সঞ্জার তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন। উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি এত জনপ্রিয় হন যে, সবাই তাকে পুনরায় বাগদাদের নিজামীয়া কলেজের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। গাজ্জালী তিনটি কারণ দর্শিয়ে তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং অনুরোধ রক্ষা না করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কারণগুলো : ক. তুস নগরের দেড়শ ছাত্রকে ত্যাগ করে যাওয়া সম্ভব নয়; খ. পরিবার পরিজন তুস নগরে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়; গ.

শাস্ত্রীয় আলোচনায় পুনরায় নামতে চান না। তার শেষ পুস্তকের নাম মুস্তাসফী-তিনি ১১১১ সালে রচনা করেন এবং একই সাথে প্রয়াত হন।[১৯২]

গাজ্জালী গ্রন্থাবলী

গাজ্জালী কুড়ি বছর বয়স হতে লেখার কাজে আপনাকে নিয়োজিত করেন। ১১০৭ সালে সুলতান সাঞ্জারকে লেখা পত্রে সে সময় তিনি ৭০ খানা গ্রন্থ রচনা করেন বলে উল্লেখ করেন। এর পর তিনি প্রায় ৪ বছর জীবিত ছিলেন এবং নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করেন। এই সময় তিনি আরো কিছু পুস্তক লিখেছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর আল গাজ্জালী নামক গ্রন্থে তাঁর লিখিত ৭৮ খানা পুস্তকের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। তার রচিত পুস্তকগুলো ৬ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১. ফেকাহ্ বা আইন শাস্ত্র; ২. তর্ক শাস্ত্র বা মান্তেক; ৩. দর্শন বা ফালসাফা; ৪. গবেষণা গ্রন্থ; ৫. সুফিবাদ; ৬. নীতি শাস্ত্র। তার অসংখ্য পুস্তকের মধ্যে ৬টি ছিল ক্রুপদী পর্যায়ের কালোত্তীর্ণ পুস্তক। এ পুস্তকগুলি হল : ১. ইয়াহয়াউল উলুমদ্দিন; ২. জারুল কুরআন; ৩. মাকাসিদুল ফালাসিফা; ৪. মইয়ারুল ইলম; ৫. তাহফাতুল ফালাসিফাওহা; ৬. মুস্তাফসী (আইন শাস্ত্র)। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে ইয়াহয়াউল উলুম এবং তাহফাতুল ফালাসিফা তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং প্রথমটির জন্য তিনি ইসলামের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। পুস্তকখানির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিউইসের মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে দেকার্তের সময় (১৫৯৬-১১৫০ খ্রি.) এই গ্রন্থটি যদি ফরাসি ভাষায় অনূদিত হত তা হলে লোকে বলত যে, দেকার্তে ইয়াহয়া থেকে চুরি করেছেন।[১৯৩]

নীতি শাস্ত্র

গাজ্জালীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ইয়াহয়া উল উলুমে দর্শন, সুফিবাদ খোদাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু পুস্তকটি মুখ্যত নীতিশাস্ত্র গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকটি রচনাকালে তাঁর উপর সুফিবাদের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। কেন তিনি এরূপ একটি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হলেন সে সম্পর্কে তার ভূমিকায় স্পষ্ট করে বলেছেন : "আমি দেখেছি সমগ্র বিশ্ব ব্যাধিতে আক্রান্ত, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক সদাচারের পথ রুদ্ধ। জ্ঞানালোক প্রদর্শনকারী বিদ্বানদের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। তারা নিজেদের স্বার্থের বাইরে কিছুই বুঝতে চান না। তাদের নিকট বিদ্যার অর্থ শাস্ত্রীয় বাকবিতণ্ডা, মৌখিক উপদেশ এবং ফতোয়াবাজী। পরকাল চর্চা প্রায় শেষ। এসব কারণে তিনি পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গাজ্জালীর সময় এ্যারিস্টটল এবং গ্যালেন (জালিনুম) এর নীতিশাস্ত্রের পুস্তকের আরবি অনুবাদ ছিল সহজলভ্য; তাদের প্রভাব তৎকালে লিখিত

পাঁচটি গ্রন্থের উপর পরিলক্ষিত হয়। ১. ফারাবির আরাউল মদিনাতুল ফাজিলা; ২. মিসকাওয়াই এর তাহজীবুল আখলাক; ৩. ইবনে সিনার আকবারুল ইসমা; ৪. আবু তালিব মক্কীর কুবতুলকুলুব; ৫. জারিয়া ইলা মাকারিনুশ শারিয়া। শেষোক্তি পুস্তকদ্বয়ের লেখনি ভঙ্গি ছিল ধর্মীয়। শিবলী নোয়ামী তার আল গাজ্জালী পুস্তকে বলেন যে, গাজ্জালীর ঐ বিখ্যাত পুস্তকে তাহজীবুল আখলাখ এবং কুবতুল কুলুবের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। তার লেখার ভাষা অনেকাংশে মক্কীর মত। শিবলী নোমানী তার পুস্তকের নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন :

১. গ্রন্থটি সকলের বোধগম্য ভাষায় লেখা হলেও তার দার্শনিক মাহাত্ম্য খর্বিত হয় নি।;

২. সংসারী এবং সংসার বিরাগি প্রত্যেকের প্রতি পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রেখে যথাযোগ্য নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে;

৩. প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সাধারণ আচার-ব্যবহারের বিষয়েও ব্যাপক দৃষ্টি দেয়া হয়েছে;

৪. বিভিন্ন রিপুর তাড়নায় মানুষের শক্তি খর্ব হয়ে যে হতাশা, অক্ষমতা গড়ে ওঠে তা দূর করার জন্য যথেষ্ট উপদেশ দেয়া হয়েছে।

সাধারণ সদাচার প্রসঙ্গে

তৎকালীন সনাতনপন্থী মুসলিম পণ্ডিতরা টেবিলের উপর খাদ্য রেখে খাওয়া, আটা ছেনে রুটি করা, অস্নান (এক রকমের ঘাস বা সাবানের কাজ করে) দিয়ে হাত ধোয়া এবং পেট ভরে খাওয়ার রেওয়াজ মহানবী উত্তরকালে উদ্ভূত বিধায়—বেদয়াত-তাই ত্যাজ্য বলে ভাবতেন। গাজ্জালী এগুলোকে উত্তম বলে মনে করতেন এবং এগুলোকে বেদায়াত বলার কোনো কারণ নেই বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন যে, খাদ্যবস্তু পরপর আনা ভাল এবং ঝোল জাতীয় প্রথমে এবং মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য শেষে ভক্ষণ করা উত্তম ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দু একজন যদি সময়মত উপস্থিত না হতে পারে তবে যথাসময় খাওয়া শুরু করা উচিত। মেহমানদের সামনে খাদ্য তালিকা দেয়া উচিত।

কর্মোদ্যোগ বৃদ্ধি

তিনি মানুষের কর্মোদ্যোগ এবং কর্ম ক্ষমতার উপর প্রচুর জোর দিয়েছেন। একজন উদ্যোগী পুরুষ গঠনের জন্য প্রথম হতে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাসূচিতে কবিতা, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনের কথা বলেছেন; একই সাথে সঙ্গীতকেও উৎসাহিত করেন; কাজের পর বিশ্রামের উপদেশ দিয়েছেন।[১৯৪]

এভাবে শরীরকে কর্মঠ রাখতে মানসিক শক্তিকে ব্যবহার করার জন্য তিনি বলেন: শুধু ক্রোধকে দমন করাই নীতি শিক্ষা নয়। আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করাই নীতি শিক্ষা; ভীরুতা দূরীভূত করা উচিত এবং অতি সাহস অন্যের উপর অত্যাচারকেও প্রশ্রয় দেয়া যায় না। "সন্তুষ্টিই পরম সুখ" এরূপ চিন্তার উপর আঘাত হেনে তিনি বলেন। জানা দরকার জ্ঞান একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যা থেকে কার্য উদ্ধার হয় জীবিকা উপার্জনের জন্য পরিশ্রম না করা অথবা তার কোনো উপায় চিন্তা না করার নাম সন্তুষ্টি হতে পারে না—এমন ভাবার অর্থই হল আল্লার চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। বস্তুত যিনি একজন সুফি হওয়া সত্ত্বেও অকর্মন্যতাকে সমর্থন করেন নি।[১৯৫]

তাঁর নীতি দর্শন

তার নীতির ব্যাখ্যা করতে প্রথমেই গাজ্জালী বলেন যে, দেহ ও আত্মা নিয়েই মানুষ গঠিত। শরীরের মতই আত্মার একটা বিশেষ আকৃতি আছে। মানবাত্মা সদাচারী বা দূরাচারী হতে পারে। গাজ্জালী নীতিকে শুধু দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তার জন্য মানুষের স্থায়ী ক্ষমতার শর্তও প্রয়োগ করেন। তিনি নৈতিকতার চারটি প্রধান স্তম্ভের কথা বলেন : জ্ঞান, ক্রোধ, রিরংসা এবং সংযম। এই চারটি স্তম্ভকে যদি সঙ্গত ভাবে, অন্তরে পোষণ করা যায় তবেই মানুষ সম্পূর্ণ সদাচারী হতে পারে। দু একটি পালন করলে অপূর্ণতা থেকে যায়।

মানুষ সদাচারী না দূরাচারী—এরূপ প্রশ্নে তিনি গ্যালেনের মতামত গ্রহণ না করে এ্যারিস্টটলের মতামত সমর্থন করে বলেন যে, যেহেতু মানুষ মূলত সমাজজীবী—তার পরিবেশ ও শিক্ষাই নির্ধারণ করে সে সদাচারী অথবা দূরাচারী হবে। এ কারণে শিশু শিক্ষার উপর তিনি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৯৬]

দর্শনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি

তিনি দর্শনের উপর বহু পুস্তক প্রণয়ন করেন, তবে তাহফাতুল ফালাসাফা লেখার জন্য তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত গড়ে ওঠে। অনেকের মধ্যে ধারণা জন্মায় যে, দর্শন শাস্ত্র ধ্বংস করার জন্যই তিনি ঐ পুস্তক রচনা করেন। বাস্তবে কি তাই? তার নিজস্ব বিচারধারাও তো ছিল দার্শনিক। সম্ভবত এর কারণ তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান ব্যক্তি মাত্রই গ্রীক দর্শনের প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। পবিত্র সংঘ অথবা বাতেনীদের অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, প্লেটো এ্যারিস্টটল পয়গম্বরদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বস্তুত তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের এরূপ নির্বিচার চিন্তা ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য উক্ত পুস্তকখানি রচনা করেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, গ্রীক আচার্যগণ আধ্যাত্মিক সম্পর্কে যা বলেছেন বা লিখেছেন তা অনেকাংশে ভ্রান্ত; তিনি তাদের মতামতের অসারতা ও

অসত্যতা প্রমাণ করার জন্য মূলত তাহফা গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি দর্শনের সত্যতা মানতেন বলেই দর্শনের সব তত্ত্বকে ভুল বলে মনে করতেন না। তিনি দর্শনের মধ্যে তিন ধরনের সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করেন। ক. এক ধরনের সিদ্ধান্ত কেবল শব্দগত ও পরিভাষামূলক। মৌলিক ভাবে ধর্ম, গ্রীক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নেই; যেমন দার্শনিক পরিভাষায় আল্লাকে বস্তুসত্তা বলে অভিহিত করা হয়; তবে এ বস্তুসত্তা অন্য কিছুর আশ্রয় ছাড়াই নিজের অস্তিত্ব রাখে–এ অর্থে ইসলামি ধারণার বিপরীত নয়; তবে ইসলাম এরূপ পরিভাষা ব্যবহার করে না। খ. দর্শনের আর এক প্রকারের সিদ্ধান্ত আদৌ ইসলামবিরোধী নয়–যেমন দর্শনের চন্দ্র গ্রহণের কারণ ইত্যাদি যেভাবে ব্যাখ্যা করে-তা খণ্ডনের কোনো প্রয়োজন নেই। যারা এরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তারা মূলত ইসলামের প্রতি অবিচার করেন। তাদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত গণিতের বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এর বিরোধিতা করার অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে ইসলামের প্রতি সন্দেহ জাগ্রত করা হয়। গ. তৃতীয় প্রকারের সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে ইসলামবিরোধী যেমন জগতের অনাদিত্ব বা প্রলয়ের দিনকে অস্বীকার ইত্যাদি। দর্শনের এরূপ ধরনের সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই তিনি তাহফা রচনা করেন।[১৯৭]

গ্রীক আচার্যদের যে বিশটি সিদ্ধান্ত গাজ্জালী-নাকচ করেছেন শিবলী নোমানী নিম্নলিখিতভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন।

গ্রীক আচার্যদের সিদ্ধান্ত	সে সম্পর্কে গাজ্জালীর মন্তব্য
১. জগৎ অনাদি	ভুল
২. জগৎ নিত্য	ভুল
৩. আল্লা জগতের কর্তা-এ ধারণা ভ্রান্ত	ভুল
৪. আল্লার অস্তিত্ব	সিদ্ধ করা অসম্ভব
৫. আল্লা অদ্বিতীয়	সিদ্ধ করা অসম্ভব
৬. আল্লাহ নির্গুণ	ভুল
৭. আল্লার আছে সমগ্র-বিশেষ নয়	ভুল
৮. আল্লাহ লক্ষণ রহিত সর্বব্যাপী	সিদ্ধ করা অসম্ভব
৯. আল্লাহ নিরাকার	সিদ্ধ করা অসম্ভব
১০. দার্শনিকরা আস্তিক হতে পারেন	তারা নাস্তিক হন
১১. আল্লা আপনাকে ছাড়া সৃষ্টিকে জানেন	প্রমাণ করা যায় না
১২. আল্লা আপনাকে জানেন	প্রমাণ করা যায় না
১৩. আল্লা ব্যক্তিকে জানেন না	ভুল
১৪. ফেরেস্তা ও প্রাণী ইচ্ছামত চলতে পারে	ভুল
১৫. ফেরেস্তা গতির জন্য প্রদত্ত কারণ	ভুল
১৬. ফেরেস্তা সমগ্র জগৎ সম্পর্কে জানেন	ভুল

১৭. অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে না	ভুল
১৮. আত্মা নিরাকার ও নির্গুণ	প্রমাণ করা যায় না
১৯. আত্মা নিত্য	প্রমাণ করা যায় না
২০. প্রলয় অনাবশ্যক	ভুল [১৯৮]

উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রীক আচার্যদের সব মতামত তিনি উড়িয়ে দেন নি। তবে কয়েকটি ব্যাপারে গ্রীক দার্শনিকদের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য বিদ্যামান ছিল। প্রথমত গাজ্জালী মনে করতেন গ্রীক দার্শনিকদের জগৎ নিত্যতত্ত্ব কেবল ইসলামের একত্ববাদের পরিপন্থীই নয় বরং দার্শনিকদের প্রবণতা হল নাস্তিকতার দিকে। তদুপরি তাদের তত্ত্ব স্ববিরোধী বলে গাজ্জালী তা প্রত্যাখ্যান করেন। গাজ্জালী প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, জগৎ যুগপথ সান্ত এবং অনন্ত। অর্থাৎ জগৎ দৈশিক দিক হতে সান্ত এবং কালিক দিক হতে অনন্ত কিভাবে হতে পারে? কাল যদি অনন্ত হয় তবে দেশ ও অনন্ত হবে। দেশ ও কাল নিজেরা বস্তু নয় বরং বস্তুর সম্বন্ধ স্বরূপ। বস্তু আল্লার সৃষ্টিকার্য, জগতের অনাদিত্ব-আদিত্বের প্রশ্ন অবাস্তব। আল্লা সৃষ্টিকর্মে সর্বত্র-স্বতন্ত্র-এরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করলে কার্য-কারণ পদ্ধতি থাকে কি? এরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের অর্থ হল কোনো কারণ ছাড়াই আল্লা প্রতিটি দ্রব্যই সৃষ্ট করেন। আগুন সৃষ্টি করেন, তার দাহিকাশক্তিও সৃষ্টি করেন পৃথকভাবে। দহনক্রিয়ার কারণ আগুন নয়? এভাবে মূলত তিনি আশায়েরা পরমাণুবাদেরই প্রতিধ্বনী করেছেন মাত্র। সম্ভবত তিনি তাঁর বক্তব্যে দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে বলেন যে, কারণের ও কারণ আল্লা তার কৌশল প্রদর্শনের জন্য কার্যকে কারণের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। কারণের পরে কার্য অবশ্যই অস্তিত্বপ্রাপ্ত হবে যদি কারণের সমস্ত শর্ত পূর্ণ হয়। এই এক প্রকার কারণ, যার দ্বারা কার্যের অস্তিত্ব আবদ্ধ করা হয়েছে-তা কখনই অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।[১৯৯]

গ্রীক দার্শনিকদের আল্লা তত্ত্ব বা তাঁর সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে গাজ্জালীর মতাদর্শে বড় রকমের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গাজ্জালী অবশ্য গ্রীক দার্শনিকদের সাথে সহমত পোষণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনিও বলেন আল্লা সব কারণের আদিকারণ। গ্রীক দার্শনিকরা বলেন যে, সব কিছুর অস্তিত্বের আদি কারণ আল্লা। কেননা তিনি জ্ঞানময়; যা তার জ্ঞানের অন্তর্গত তাই তার মধ্য থেকে নির্গত হয়ে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়। আল্লা কিছুই ইচ্ছা করেন না; কারণ ইচ্ছা তখনই হয় যখনই কোনো সম্পূর্ণতা থাকে। মূলত ইচ্ছা ভৌতিক বস্তুর অভ্যন্তরীণ গতি—যা পূর্ণতার দিকে অগ্রসরমান। আল্লা পূর্ণ সত্য, পরম আত্মা, তার মধ্যে ইচ্ছার কোনো প্রশ্নই ওঠে না; সব কিছুই আল্লার ধারণা বা ধ্যান দ্বারা অস্তিত্ব প্রাপ্ত। সৃষ্টিতে ইচ্ছার কোনো স্থান নেই। তার চিন্তন ইচ্ছা দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। গাজ্জালী আল্লাকে ইচ্ছাবিহীন বলে মানতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে বরং ইচ্ছা ও আল্লার সহনিত্য। সেই ইচ্ছা দ্বারাই আল্লা কোনো রকম নিয়ম প্রকৃতি ও

আত্মার পূর্ব উপস্থিতি ব্যতীতই সব কিছু সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ গ্রীক আচার্যদের মতে আল্লা জ্ঞানই সৃষ্টির কারণ; গাজ্জালী মতে আল্লার ইচ্ছাই সৃষ্টির কারণ।[২০০]

জগতের অনাদিতত্ত্ব এবং আল্লার বিনা ইচ্ছায় গাছের পাতা নড়ে না-এরূপ মতবাদ গাজ্জালীকে অদৃষ্টবাদের ফাঁদে নিক্ষেপ করেছে। অদৃষ্টবাদ খোদাতত্ত্বের উপর যে আঘাত করে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে মজমুন বে আলা গায়রে আহলিহি গ্রন্থে বলেন : স্থূল জগতে দৃষ্ট কার্য-কারণের ক্রমকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ব্যবহারেই বুঝা যায় বিষ ঘাতক, গোলাপ সুগন্ধিদায়ক। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিষপান করে আত্মবিসর্জন দেয় তবে তার জন্য আল্লাকে দায়ী করা যাবে না। কর্মফল অবশ্যই প্রাপ্ত আত্মিক জগতের অবস্থাও একই রূপ।[২০১]

আত্মা

আত্মা একটি জটিল বিষয়; গ্রীক দার্শনিকরা বলেন মানবাত্মা তৃতীয় পর্যায়ে পরমাত্মা হতে বিকশিত হয়, তাই এটা অবিনশ্বর, যদিও দেহ নশ্বর। ইসলামে আত্মার কোনো সংজ্ঞা দেয়া হয় নি। কোরআনে মাত্র বলা আছে আল্লার নির্দেশে এর উদ্ভব। গাজ্জালী তাই আত্মা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারেন নি। যেহেতু তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে এ প্রসঙ্গে বস্তু, শরীরের সাথে তার সংযোগ নেই বিয়োগও নেই, তা বাহ্যও নয় অন্তরও নয়, আঁধারও নয় আধেয় নয়। আত্মা বস্তু, কারণ আত্মা বস্তুকে চেনে; চেনা ওচিনিয়ে দেয়া গুণ, আত্মার এ গুণ থাকায় তা বস্তু। আত্মা শরীর নয়, হলে আকার থাকত। প্রশ্ন হতে পারে যে, যুক্ত নয়-বিযুক্ত না, অভ্যন্তরীণ না, বাহ্যিক না-এমন অবস্থা শরীরের হয়। আত্মা যখন শরীর নয়, তখন তার এমন অবস্থা কেমন করে সম্ভব? বস্তুত আত্মাকি তা বুঝা সাধারণ এবং অসাধারণ সকলেরই বুদ্ধির সীমার বাইরে।[২০২]

গাজ্জালীর চিন্তাধারা

প্রথম বাগদাদে আগমনের পর গাজ্জালীর মনে কিভাবে যুক্তিবাদ ও ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং তিনি তার মনন দ্বারা উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালান তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ কাজে তিনি সাফল্য অর্জন করেও দেখেছিলেন যে, স্পেনে তার ইয়াহয়াউল উলুম গ্রন্থটি ভস্মীভূত করা হয়। এ অবস্থা দেখে তিনি অনুভব করেন যে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছেন যারা বৌদ্ধিক জ্ঞান ও ধর্ম জ্ঞানের মধ্যে কেবল বিরোধই দেখেন; তাদের নিকট এ দুয়ের মধ্যে মিলন অসম্ভব। তাই তিনি বলেন যে, যারা বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অনুকরণ ও অনুসরণে উৎসাহ দেয় তারা মূর্খ : আবার যারা শুধু বুদ্ধিতে আস্থাশীল হয়ে কোরান ও পয়গম্বর বাণীকে অগ্রাহ্য করে তারা অহংকারী। তাই কোনো এক পক্ষের প্রতি অন্ধ অনুসরণ অনুচিত; উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনই কাম্য। বৌদ্ধিক জ্ঞান খাদ্যতুল্য; ধর্মীয় জ্ঞান ঔষধতুল্য। সমসাময়িক

বুদ্ধিজীবীদের আলোচনায় তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দর্শনের চরম শত্রু ইসলামেরও পরম শত্রু।[২০৩] দর্শনের সকল সিদ্ধান্তই ধর্ম বিরুদ্ধ নয় অথচ দর্শনের বহু সিদ্ধান্ত দৃঢ় প্রমাণ সিদ্ধ। অতএব প্রমাণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বোঝেন যে এগুলো সঠিক। যখন দর্শনের দৃঢ় প্রমান সিদ্ধ সিদ্ধান্ত ইসলামবিরোধী বলে বলা হয় তখন ঐ সিদ্ধান্তে সন্দেহ জাগার পরিবর্তে ইসলামের প্রতিই সন্দেহ জাগবে। এ কারণেই ইসলামের অন্ধ স্তাবকের দ্বারা ইসলামের চরম ক্ষতি হতে পারে।[২০৪]

সমাজ দর্শন

গাজ্জালীর মত মেধাবী বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি শুধু ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে তার বিচার বিশ্লেষণ সীমিত রাখবেন তা ভাবা যায় না। অনাথ গাজ্জালী বহু দিন অত্যন্ত কষ্টে দিন যাপন করেন; তিনি হয়েছিলেন বহু লাঞ্ছিত। যদিও ৩৪ বছর বয়সের পর তার নিকট সকল বস্তু সহজলভ্য হয়েছিল ইচ্ছা করলে তিনি আমীর বাদশার মতো বিলাস-বহুল জীবন যাপন করতে পারতেন; কিন্তু এরূপ জীবন যাপনের জন্য তার মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তিনি আপনাকে জড়িয়ে ফেলেন বৃহত্তর মানব জীবন সমস্যার সাথে। তার মনে হয়েছিল সে যুগের ধর্মও যুক্তিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ব্যতীত সমাজ ও জীবন সঠিক পথে বিকশিত হতে পারবে না। তার উন্নতি-সমৃদ্ধি. শান্তি প্রগতি সব কিছুই স্তব্ধ হয়ে থাকবে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে সেলজুকী রাজদবার তার হাতের মুঠোয় ছিল; কিন্তু রাজদরবারী জীবনের সুখ-ভোগ বিলাস এবং সেই সাথে তাদের অন্যায় অবিচার ও পাপাচার জীবন তার জন্যে হয়ে ওঠে জাহান্নাম। তদুপরি রাজদরবার ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধেবাদীদের আড্ডা। তিনি দেখেন ধর্মের নামে কি ভয়াবহ ব্যাভিচার! তাদের চিন্তা পদ্ধতি আর জীবনধারা খাঁটি ধর্মের ক্ষতির আশঙ্কায় আঁতকে ওঠেন। ছাত্রাবস্থা হতে তাঁর মনে এক আদর্শ জীবন মডেল হিসেবে এসেছিল। এটা ছিল মহানবী ও তার সাহাবীদের সরল সহজ ন্যায়নিষ্টা জীবন পদ্ধতি। সে যুগের সারল্য ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সহধর্মিতার সাথে সমকালীন রাজন্যবর্গের চরিত্রের তুলনামূলক বিচার যতই করেছেন ততই তার অন্তরে অসন্তোষের আগুণ জ্বলে ওঠে তীব্রভাবে। তিনি রাজদরবার ত্যাগ করেন। এমন কি কখনো দরবারে না আসারও প্রতিজ্ঞা করেন। রাজ দরবারের আচার আচরণ তিনি ঘৃণা করতেন।[২০৫] বস্তুত তিনি রাজতন্ত্রের বিকল্প এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা কল্পনা করতেন যেখানে গোত্রীয় সারল্য ও ভ্রাতৃত্ব থাকবে। তার নেতা হবেন প্লেটোর প্রজাতন্ত্রের নেতা দার্শনিক অথবা সুফিগুন সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তার রাষ্ট্র ধারণা বিশ্লেষণ করলে বুঝতে বাকি থাকে না যে, প্রাচীন গোত্রবাদী সারল্য, সাম্য ও ন্যায় বিচারভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাই ছিল তার কাম্য। তাঁর চিন্তা চেতনায় ছিল একটি আদর্শ রাষ্ট্র; কিন্তু প্রথমত ইহজীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তীব্র না হওয়ায় তার কাঙ্ক্ষিত আদর্শ রাষ্ট্র কিরূপে বাস্তবায়িত হবে সে রূপ উপযোগী

কোনো রণকৌশলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার মোদ্দা কথা হল বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তিগত নিষ্ক্রিয় অসহযোগিতার নীতি অবলম্বন করা। এরূপ নেতিবাচক আচরণ দ্বারা কোনো বাস্তব অবস্থায় পরিবর্তন সংঘটিত করা যায়? তিনি আরো বলেন যে, সুলতানের বিরোধিতা করায় যদি দেশে অরাজকতার আশঙ্কা থাকে এখানে তা পরিহার করাই শ্রেয়: অবশ্য ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্ন আদৌ বিবেচ্য বিষয় নয়।[২০৬]

দ্বিতীয়ত রাহুল যথার্থই বলেন যে, গাজ্জালী ব্যবহার কুশলী বিচারক ছিলেন না; এমন কি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার মত সাহসীও ছিলেন না। অথচ রাজ্যের অনিয়ম ও অত্যাচার সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। এ সব বাস্তবতাকে পরিহার করেই তিনি সুফি জীবন গ্রহণ করেন।[২০৭] তৃতীয়ত তিনি তাঁর রাষ্ট্র দর্শনের একটি বিষয়ের উপর আদৌ আলোকপাত করেন নি। তাঁর সময় গোত্রতন্ত্র অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়; ঘড়ির কাটা কি পিছনের দিকে ফেরান যায়? বর্তমান সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে সচেষ্ট হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। আর এরূপ সম্বন্ধযুক্ত শাসন ব্যবস্থার কি রূপ পরিগ্রহ করবে তা বলা কঠিন। তবে এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, বাস্তব অবস্থায় যদি মৌলিক রূপান্তর না হয় তাহলে সম্ভবত ইতিহাসের গতিধারা হয় আবর্তনমূলক; অগ্রগামীমূলক নয়। গাজ্জালী একদিকে দার্শনিকের কাল্পনিক জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, অন্যদিকে চেয়েছিলেন পূরণ কবিলা শাহীর সরল ও সাম্য জীবন, কিন্তু বাস্তবে তা ছিল অতীতের বস্তু; কল্পনার স্বাধীনতা ছিল মায়ামরীচিকা।

ইসলামি সমাজের ঐক্যকামী গাজ্জালী

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে তিনি সুফি পথ নির্বাচন করেন। এখানেও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল লক্ষণীয়। সেকালের অসংখ্য মরমি সাধকদের মত তিনি সমাজ হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হন নি বরং সমাজ সচেতনই ছিলেন। মূলত তাঁর ঐ চেতনাই তাঁকে মাহত্ম দিয়েছে। গাজ্জালীর সময় ভারতে, সিন্দুতে, চীনের কাশগড় এবং আফ্রিকার মরক্কো হতে স্পেন পর্যন্ত এ সুবিশাল ভূখণ্ডে ইসলাম ধর্ম এতই প্রাধান্য বিস্তার করে যে, অন্য কোন ধর্মই স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম ছিল না। ইসলামের এরূপ একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে ইসলামি সমাজে কোনো ঐক্য বা সংহতি ছিল না। তাদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল প্রাধান্য পায়। তাদের কেবল রাজনৈতিক অনৈক্যই ছিল না-গোটা মুসলিম সমাজ বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে আশায়েরী, হাম্বলী এবং ইসমাইলী এই তিনটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদল হিসেবে গড়ে ওঠে। স্পেনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় হাম্বলী সম্প্রদায়ের হাতে; মিশরে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল ইসমাইলী ফাতেমী শিয়াদের হাতে এবং সমগ্র অঞ্চলে আশায়েরাই ছিল প্রধান ধর্মীয়

দল। শিয়া-সুন্নি; হাম্বলী ও অহাম্বলী সুন্নিদের মধ্যে ছিল প্রবল প্রতিযোগিতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। প্রচণ্ড শিয়া-সুন্নি বিরোধের সুযোগে উদীয়মান তুর্কী জাতিসত্তা সুন্নি পতাকা হাতে নিয়ে সমরতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী সামন্তবাদী জাহানদারী বা সালতানাত প্রতিষ্ঠায় পবিত্র ধর্মকে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় নি। ইসলামের বিভিন্ন ফেরকা একে অপরকে কাফের বলতেও দ্বিধা করত না। মুতাজিলা পণ্ডিত ইবনে আমির (মৃ. ১০৮৫) বিরোধীদের ভয়ে দীর্ঘ ৫০ বছর ঘরের বাইরে যেতে সাহস করেন নি। ঐতিহাসিক তাবারীর জানাজা পড়তে দেয়া হয় নি; মনসুর হাল্লাজকে হত্যা না করা পর্যন্ত হাম্বলীরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। মসজিদের মিম্বার হতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হত। গাজ্জালী তার যুগের এরূপ সংকীর্ণ দলাদলির উর্ধ্বে উঠে এরূপ দ্বন্দ্ব হত্যা, অরাজকতা ও ফতোয়াবাজীর নিন্দা করে বলেন যে, ধার্মীক ও বিদ্বানগণ হটকারিতার আশ্রয় নিয়েছেন; অথচ তারা আন্তরিকভাবে ঐক্যের চেষ্টা চালালে সফল হতেন। ইয়াহ ইয়া উল উলুমে তিনি বলেছেন যে, তাদের এরূপ আচরণ সাধারণের সর্বনাশ সাধন করে। গাজ্জালী ফেরকাবাজীর ঘোরবিরোধী ছিলেন। তিনি তার গ্রন্থ তাফারুক বায়নাল ইসলাম ওয়া জানাদিক গ্রন্থে বলেন যে, যারা মুসলমান নয় তারাই কাফের—যারা কলমা পড়ে তারাই মুসলিম এবং তারা সকলেই ভ্রাতৃপ্রতীম। এদের মধ্যকার মতভেদ গৌণ ও বাহ্যিক, ইসলামের সাথে তা আদৌ সম্বন্ধযুক্ত নয়। It was al Ghazzali who fixed the ultimate form of the Asharryah and eslablished its dicta as the universal cread of Islam. This father of the church in Islam has since became the final authroity for sunnite orthodox.[২০৮]

১৩.৫ মধ্যযুগের সর্বোচ্চ দর্শন : রুশদবাদ, আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ (আভেরোজ) ১১২৬-১১৯৮ খ্রি.)

ইবনে রুশদ মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ট এবং সর্বশেষ মুসলিম দার্শনিক ছিলেন। বার্টান্ড রাসেল যথার্থ বলেন যে, ইবনে রুশদ প্রাচ্য মুসলিম সমাজে মৃত বলে বিবেচ্য হলেও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূণ। Averroes is more important in christion than in Mohamedan philosophy. In the later he was dead in the former, a begining.[২০৯] পাশ্চত্য জগতে তার প্রভাবের কথা হিট্টিও বলেন। The greatest moslem Philosoper judged by his influence especeally over the west.[২১০] বস্তুত ইবনে রুশদ মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় দর্শনে গতি দান করে; আধুনিক দর্শনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।[২১১] মধ্যযুগীয় স্পেনের দশ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত কর্ডোভা নগরীর একটি খ্যাতিমান শিক্ষিত পরিবারে ১১২৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতৃগৃহ ছিল সেদিনের একটি বড় শিক্ষা নিকেতন। শৈশবে পিতৃগৃহেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। আরবি সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র তিনি আয়ত্ত করেন; ফেকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থ মোয়াত্তায় ইবনে মালিক তিনি কণ্ঠস্থ করেন। বাল্যকালে কাব্যের প্রতি তাঁর

ঝোঁক থাকলে ও জীবনে কখনো কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন নি। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইবনে বাজার নিকট দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; বাজা প্রয়াত হলে বিখ্যাত পণ্ডিতদের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। তিনি দার্শনিক ইবনে তুফায়েলের সুনজরে পড়েন। শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্ডোভায় চিকিৎসা ও অধ্যাপনা পেশা গ্রহণ করেন।

প্রবীণ গুরু ইবনে তুফায়েল তাঁকে সুলতান ইউসুফেব সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর সাথে প্রাথমিক পরিচয়ের পর সুলতান তাঁকে আত্মা এবং দার্শনিকদের সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চান। এরূপ প্রশ্নে আতঙ্কিত হয়ে বলেন যে, দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব গভীর নয়। ইবনে রুশদের দ্বিধাগ্রস্থতা অনুভব করে সুলতান ইবনে তুফায়েলের সঙ্গে এ্যারিস্টটল ও প্লেটো সম্পর্কে আলোচনা করেন। উভয়ের মধ্যে আলাপচারিতা শেষে সুলতান পুনরায় ইবনে রুশদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ইতিমধ্যে তাঁদের মুক্ত আলোচনায় নির্ভয় চিত্ত হয়ে ইবনে রুশদ তাঁর মতামত প্রকাশ করেন।[২১২] ১১৬৯ সালে তাঁকে সেভিলের কাজি পদে নিয়োগ কবা হয়। ঐ বছরেই তিনি এ্যারিস্টটলের প্রাণী শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লেখেন। ১১৮৪ সালে সুলতান ইউসুফ প্রয়াত হলে তদপুত্র ইয়াকুব মনসুর সুলতান হন। রাজবংশ মোওয়াইহীদরা সনাতন পন্থী হলেও আব্দুল মোমেনের প্রচেষ্টায় পরিবারটি প্রচণ্ড শিক্ষানুরাগী হয়ে ওঠে। এ কারণে মনসুর রুশদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন; দুজন একত্রে প্রায়ই দর্শন চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। এরূপ সম্পর্কের ফলে অনেকে ইবনে রুশদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে রটায় যে, ইবনে রুশদ ঘোরতর নাস্তিক। তাঁর নাস্তিকতা প্রমাণ করার জন্য তারা সাক্ষীও জোগাড় কবে সুলতানের নিকট রুশদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। সুলতান প্রকাশ্যত রুশদের পক্ষ নিতে পারেন নি, বরং জনসমক্ষে তাঁকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষণা করেন। যে পুস্তকগুলো তথাকথিত নাস্তিকতাপূর্ণ বলে ধরা হয় সেগুলোর রচয়িতা সম্পর্কে রুশদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, তিনি সেগুলোর রচয়িতা বলে স্বীকার করেন নি। কেন তিনি সক্রেটিসের মত শহীদ হতে চান নি? সম্ভবত তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব বিচার ধারা নিয়ে। শিষ্যদের নিরাপত্তার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। কে জানত তিনি বেঁচে থাকলেই উদীয়মান ইউরোপ এত উপকৃত হবে? তিনি বেঁচে না থাকলে হয়তো এত সত্তর ইউরোপ প্রকৃত এ্যারিস্টটলকে আবিষ্কার করতে পারত না। মনসুর ঐ তথাকথিত অজ্ঞাত লেখকের প্রতি তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করে সভা কক্ষ ত্যাগ করেন।[২১৩] সুলতানের আদেশে দর্শনের ঐ পুস্তক ভস্মীভূত করা হয়, রুশদকে নির্বাসনে প্রেরণ করা হয় এবং নানাভাবে কষ্ট দেয়া হয়।[২১৪] এটা ছিল চিত্রের এক দুঃখজনক দিক। এর আর একটি দিক ছিল। বন্ধুর ঐ দীর্ঘ দুবছর ধরে অসহনীয় যন্ত্রণা দেখে সুলতান তার প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য সম্ভবত একটু চালাকির আশ্রয় নেন। সময়টিও তখন অনুকূল ছিল; এত দিনে কাঠ মোল্লাদের অপপ্রচার অনেকাংশে নিষ্প্রভ

হয়। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন যে, রুশদেব উপর ভিত্তিহীন কলঙ্ক লেপন কবা হয়েছে। মনসুর সব কুল বক্ষার জন্য একটি শর্তসাপেক্ষে ক্ষমা করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁকে জামে মসজিদে অনুশোচনা প্রকাশ কবতে হবে। এব পর ইবনে রুশদ কর্ডোভায় দরিদ্র জীবন যাপন কবেন। অবশেষে মনসুর তাঁকে মবক্কোব কাজি পদে নিয়োগ করেন। সেখানে ১১৯৮ সালে প্রযাত হন, তবে তাঁকে কর্ডোভাব সম্ভ্রান্তদের গোরস্তানে সমাধিস্থ করা হয।

ইবনে তুফায়েল তাঁকে দর্শন পুস্তক বচনায প্রলুব্ধ করেন, তিনি দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইন শাস্ত্র, কালাম বা তর্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও আরবি ব্যাকবণেব উপর সর্বমোট ৬৮ খানা গ্রন্থ বচনা করেন।[২১৫]

ইবনে রুশদ বচিত দর্শন গ্রন্থগুলো তিন ভাগে ভাগ কবা যায।

১. এ্যাবিস্টটল এবং কতিপয় দার্শনিক গ্রন্থেব ব্যাখ্যা টীকা, বিবরণ,
২. এ্যাবিস্টটলেব পক্ষে ফাবাবী ও সিনার যুক্তি খণ্ডন;
৩. দর্শন শাস্ত্রেব পক্ষে গাজ্জালী এবং কালাম শাস্ত্রেব যুক্তি খণ্ডন;

ইবনে রুশদ এ্যাবিস্টটলেব গ্রন্থেব তিন প্রকাব টীকা লেখেন

১. তাঁব দর্শন পুস্তকেব বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও টীকা;
২. মাঝারি আয়তনেব ব্যাখ্যা-এতে শুধু বাক্যেব প্রথম শব্দ উদ্ধৃত করে ব্যাখা কবা;
৩. এ্যাবিস্টটলেব দর্শনেব সংক্ষিপ্ত সাবসংকলন-এটাকে ভাবানুবাদ বলা হয।

ইবনে রুশদ কর্তৃক এ্যারিস্টটলের কয়েকটি গ্রন্থ অনূদিত হয।

১. De coelo et mundo (দেবাত্মা ও জগৎ)
২. অলঙ্কর শাস্ত্র
৩. আধিবিদ্যক শাস্ত্র
৪. নীতি শাস্ত্র
৫. পদার্থ বিদ্যা। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেকগুলো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন।[২১৬]

মধ্যযুগে ফারাবীকে দ্বিতীয় এ্যারিস্টটল (মুয়াল্লিমুস-সানী) বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ইবনে রুশদ এ্যারিস্টটলের দর্শন সম্পর্কে ফারাবী বা সিনা হতে অনেক গভীরভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই তাঁদের মতামতের সমালোচনা ও তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করতে সফল হয়েছিলেন। ইউরোপে তিনি বস্তুবাদী এ্যারিস্টটলের পরিচয় উপস্থাপন করে তাঁর বড় ব্যাখ্যাতা হিসেবে গণ্য হন। বস্তুত তাঁর লেখনি মারফৎ মধ্যযুগের ইউরোপ বস্তুবাদী এ্যারিস্টটলকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে।

রুশদের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ অবুধাবন করতে হলে তার দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ তখলিস, ফাবারী-সিনার উদ্দেশ্যে অক্ষেপ এবং 'খণ্ডন-খণ্ডন' বা তাহফাতুত তাহফাহ আলোচনা করা দরকার।

ইতিপূর্বে খণ্ডন খণ্ডন প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। পুনশ্চ উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা শিবলী নোমানীর মন্তব্যটি উল্লেখ করতে হয়। তিনি বলেন যে, গাজ্জালী দার্শনিকদের সকল সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রমাণ করতে সমর্থ হন নি, বরং সতের নশ্বর সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ঐ পুস্তকের শেষে তিনি বলেছেন যে, অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে না বলে কেউ বিশ্বাস করেন এ কারণে তাকে কাফের বা নাস্তিক বলা চলে না।

গাজ্জালী অসংখ্য পুস্তক প্রণয়ন করে জ্ঞানের রাজ্যে এক জগাখিচুড়ি পাকিয়েছিলেন ইবনে রুদশ তা আদৌ পছন্দ করতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে ইবনে রুশদ তার কাশফুল আলা গ্রন্থে বলেন যে, গাজ্জালীর প্রাথমিক রচনা মাকাসিদুল ফালাসাফা গ্রন্থে ছিল গ্রীক দার্শনিকদের অনুকরণমাত্র। এরপর তিনি তাহাফাতুল ফালাসাফা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে প্রধান তিনটি সিদ্ধান্তের জন্য গ্রীক আচার্যদের কাফের বলে অভিহিত করেন: অথচ জওহারুল ফালাসিফায় স্বয়ং স্বীকার করেন যে, উক্ত পুস্তকে অযথা তর্কাতর্কির অবতারণা করা হয়েছিল। এরপর তিনি বলেন যে, তার প্রকৃত বিচারধারা পাওয়া যায় তাঁর মজনুন বেআলা গায়রে আহলিহী গ্রন্থে। এরপর তিনি মিশকাতুল আনওয়ার গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও সত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই। চিন্তন ও মনন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব বলে প্রমাণ করার জন্য তিনি মুনাক্কাজ মিনাল জালাল গ্রন্থে এ্যারিস্টটল এর প্রতি কটাক্ষ করেন। বস্তুত গাজ্জালীর মতামত এতই বিভিন্ন এবং অস্থিত যে, তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত কোনোটি তা জানার উপায় নেই।[২১৭] তিনি তার খণ্ডন-খণ্ডন গ্রন্থে ইবনে রুশদ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, দার্শনিকদের সমালোচনার অধিকার কি গাজ্জালী অর্জন করেছিলেন? তিনি কি ইবনে সিনার মত দর্শন চর্চায় আপনাকে নিয়োজিত করেছিলেন? তিনি গাজ্জালীর দর্শন খণ্ডন পুস্তকে প্রকৃতির মধ্যে কার্যকারণ নিয়ম পদ্ধতিকে অস্বীকার করেছেন এই যুক্তিতে যে কার্য-কারণ গ্রহণ করলে অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে ভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে অথচ ধর্মের বুনিয়াদ ঐ কারামাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুক্তি কি ন্যাক্কারজনক নয়? রুশদ আরো বলেন যে, যিনি কার্য-কারণ নিয়মকে অস্বীকার করেন, তার এটাও স্বীকার করার প্রয়োজন নেই যে, প্রতিটি সৃষ্ট ও কার্যের পিছনে একজন কর্তার হাত আছে। এ কথা ঠিক যে, সরাসরি যে কারণ আমাদের চোখে পড়ে তার প্রতি আমাদের মনোযোগের অভাব থাকতে পারে; কিন্তু এতে কার্য-কারণ নিয়মকে অস্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিকট কার্যকরণ অজানার থাকতে পারে, তাই বলে তাকে অস্বীকার করা যায় কি? মানুষের প্রধান কাজ জানার মধ্যে দিয়ে অজানাকে জানা। জ্ঞানের প্রকৃত প্রয়োজন নিহিত থাকে এখানেই। অস্তিত্বশীল পদার্থের

কার্য-কারণের হদিস পাওয়ার জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। কার্য-কারণকে যদি বিদায় দেয়া হয় তা হলে জ্ঞানার্জনের কি কোনো পথ থাকে? বস্তুত কার্যকারণ পদ্ধতিকে অস্বীকার করার অর্থ হল বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। তিনি আরো বলেন যে, যদি বর্তমানে প্রাকৃতিক নিয়মে উলট-পালট হয় আগুনের গতি উর্ধ্বমুখী না হয়ে অধঃমুখী হয়; ফল মাটির দিকে না এসে উপরের দিকে যায় তাহলে কি আল্লার কারিগরি ও শিল্প মিথ্যা হয়ে যায় না?[২১৮]

ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়?

ধর্মের সাথে দর্শনের সমন্বয় সাধনের কথা বললেও মূলত গাজ্জালী দর্শনকে ধর্মের অধীন করেছেন। রুশদও উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেন তবে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মকে দর্শনের বাধা বলে মনে করেছেন। গাজ্জালীর মতে জ্ঞান ধর্মের অন্তরায়; রুশদ মনে করেন যে, যখন কিছু প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় অথচ তা প্রকাশ্যত ধর্মবিরোধী বলে মনে হয়—সে ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়টির জন্য নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন–যাকে এমত পরিস্থিতে ধর্মকে বিজ্ঞানে অধীন রাখতে হবে।[২১৯]

অনাদি জগৎতত্ত্ব

গাজ্জালী আদি অন্তহীন জগৎতত্ত্বের ঘোরবিরোধিতা করেছেন। ইবনে রুশদ এ প্রসঙ্গের উপর তাঁর তালখিস গ্রন্থের মাবায়াদুত্তবিয়া অধ্যায়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন যে, জগতের উৎপত্তি বিষয়ে গ্রীক দার্শনিকদের পরস্পরবিরোধী দুটি মত আছে : ক. একদল জগৎ উৎপত্তির প্রসঙ্গ এড়িয়ে বিকাশতত্ত্ব উপস্থিত করেছেন; খ. অন্যদল বিকাশতত্ত্বকে উপেক্ষা করে কেবল উৎপত্তিতত্ত্বের কথা বলেন। প্রথমোক্ত দল বলেন যে, বিক্ষিপ্ত পরমাণুসমূহের একত্রিত রূপ গ্রহনের মধ্য দিয়ে জগতের উৎপত্তি হয়। এ ক্ষেত্রে পরম স্রষ্টার কাজ হলো শুধু বস্তুগত পরমাণুর অভ্যন্তরে পারস্পরিক ভেদ সৃষ্টি করা–এ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা কেবল চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় দলের দার্শনিকগণ মনে করেন যে, প্রকৃতি ব্যতীতই উৎপাদক জগৎ সৃষ্টি করেছেন। গাজ্জালী এ মতেরই সমর্থক। এ দুটি মত ব্যতীত কিছু মতামত আছে যাতে কমবেশি এই বিচার ধারারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবনে সিনা বিকাশবাদীদের সাথে সহমত ছিলেন-এই হিসেবে যে, জগৎ উৎপত্তি কেবল প্রকৃতির আকৃতি অবলম্বনের নাম; কিন্তু আকৃতির উৎপত্তির প্রশ্নে তিনি এ্যারিস্টটলের থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। এ্যারিস্টটলের বক্তব্য হলো : প্রকৃতি ও আকৃতি উভয়ই নিত্য; ইবনে সিনা প্রকৃতিকে নিত্য এবং আকৃতিকে অনিত্য বলে মেনেছেন। তাই তিনি জগৎ স্রষ্টার নাম রেখেছেন আকৃতিকারক শক্তি। সিনার মতে প্রকৃতি কেবল (কার্যের) অধিকরণ, উৎপাদন কাজে তার সামর্থ্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল ফারাবীর মত হলো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি

স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ্যারিস্টটল বিষয়টি এভাবে দেখেছেন: স্রষ্টা (উৎপাদক) শুধু আকৃতি বা প্রকৃতিরই নন; দুটির মিলনে নতুন যে বস্তু সৃষ্টি হয় তারও উৎপাদক। অর্থাৎ প্রকৃতির (বস্তুবাদী অর্থে) মধ্যে গতি দান করে তার আকৃতি, এতে প্রকৃতির চেহারা এতদূর পরিবর্তিত হয় যে, তার অন্তর্হিত শক্তির অবস্থা থেকে কর্মাবস্থায় পরিণত করে। স্রষ্টার কাজ শুধু এতটুকুই। অর্থাৎ সৃষ্টি গতি ক্রিয়া বৈ আর কিছু নয়। গতির একটি অনিবার্য উপাদন-উষ্ণতা। ভূমণ্ডলে যে উষ্ণতা নিহিত আছে তার দ্বারাই জল-মাটি ক্রমশ বৃক্ষাদি, উদ্ভিদ ও প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। সব কিছু কার্যকারণ নিয়ন্ত্রিত, যা দেখে ধারণা হয় কোনো এক পূর্ণবুদ্ধি এর পথ প্রদর্শক। বস্তুত এ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী জগৎ স্রষ্টা আকৃতির স্রষ্টা নয়। যদি তা মানা যায় তবে এও স্বীকার করতে হবে যে, বস্তুর উদ্ভব হয় অ-বস্তু থেকে, অর্থাৎ অ-ভাব থেকে ভাবের উৎপত্তি। তা কি হয়? ইবনে সিনা আকৃতিকে উৎপন্ন বলে ভুল করেছেন। এ ভুল সিদ্ধান্তের ফলে এরা জগৎ স্রষ্টাকে এমন এক পূর্ণ স্বতন্ত্র কর্তা বলে মনে করেছেন যিনি একই সময়ে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী বস্তু সৃষ্টি করেন। অতএব তাদের মতে অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকবে না। জগতের সকল বস্তু তাদের ক্রিয়ার জন্য স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল; মানুষ স্বেচ্ছায় তার নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালাতে পারবে না—আল্লার হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়বে না। এভাবে তারা মানুষের কর্ম শক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করেছিল।[২২০]

প্রকৃতি

ইবনে সিনা তাঁর তখলিসুত্তাবায়া গ্রন্থে 'প্রকৃতি' (Nature) সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। (জগৎ) উৎপত্তির নামই গতি; কিন্তু গতির জন্য একজন গতি স্রষ্টার প্রয়োজন। এই গতি কর্তা যখন কেবল মাত্র উপযুক্ত ক্ষমতা বা যোগ্যতার অবস্থায় যাকে তখন এর নাম প্রকৃতি; যার উপর সব রকম আকৃতি আরোপ করা যায়। একে যোগ্যতা বা ক্ষমতা ব্যতীত তর্কশাস্ত্রে আর কি নামকরণ করা যায়? এ কারণে জগৎ অনাদি, কেননা বিশ্বের সমস্ত বস্তুই অস্তিত্বে আসার আগে ক্ষমতা বা যোগ্যতার স্তরে থাকে-অবস্তু বা অ-ভাব হতে বস্তু বা ভাবের উদ্ভব অসম্ভব। প্রকৃতি অনাদি; জগতে জ্ঞাত বস্তুব জগতে জাত বস্তুর অনন্তক্রমে কার্যকর। যে বস্তুর ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে তা নিশ্চয় সক্রিয় অবস্থায় আসে। নইলে জগতে বস্তু বিশেষকে কর্তা ব্যতীত থাকতে হয়। গতির আগে স্থিতি; স্থিতির আগে গতি হয় না। কারণ গতি স্বয়ং আদি এবং স্থিতির কারণ। বস্তুত জগতের অস্তিত্ব গতিময়। আমাদের দেহের মধ্যে সর্বদা পরিবর্তন হয়—তার দ্বারাই জগতে অনুভব করি; এই পরিবর্তন মূলত গতিরই ভিন্নরূপ। বিশ্ব যদি স্থির পদার্থ হয় তবে আমাদের চিন্তা থেকেও জগৎ সম্পর্কিত ধারণা দূরীভূত হয়ে যাবে। গতি যদি অস্তিত্বহীন হতো তবে সৃষ্টির নিরন্তর প্রবাহের কোনো অস্তিত্ব থাকত না।[২২১]

আত্মা

আত্মা সম্পর্কে রুশদের চিন্তা ভাবনা গতানুগতিক ছিল না। তিনি মনে করতেন জগৎকে অনুভব করার জন্য প্রকৃতি-গতিস্রোত ও আল্লাকে জানার প্রয়োজন তেমনি আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য প্রকৃতি ও পরমাত্মার মধ্যকার সংযোগ সত্তা আত্মাকে জানার দরকার। বস্তুত আত্মার উপর তিনি এক আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে আত্মা সম্পর্কে দুটি মত লক্ষ্য করা যায় : ১. এম্পিডকলেস, ইপিকিউরিয়াসসহ অনেকে আত্মাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন নি; ২. এ্যানিক্সিগোরাস, প্লেটো ইত্যাদি দার্শনিকগণ আত্মাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেছেন। আত্মার মধ্যে জ্ঞান ও স্বতঃগতি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে সকলেই অভিন্ন মত পোষণ করতেন।

প্লেটো মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ তিন প্রকার আত্মার কথা বলেছেন। ক. ভাববাদী আত্মা, যা মনুষ্যের মস্তিষ্কের মধ্যে সদা গতিশীল; খ. পাশবিক আত্মা যা হৃদয়ে অবস্থিত যা দ্বারা মানুষ ক্রোধ ও বীরত্বপ্রাপ্ত হয়; গ. প্রাকৃতিক আত্মা যার অবস্থান নিম্নস্তরে যদ্বারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনার উদগম হয়। প্রাকৃতিক এবং পাশবিক আত্মা ভাববাদী আত্মার অধীন, যদিও দাসত্বকে অস্বীকার করতে চায়। ভাববাদী আত্মা তাদের অবদমিত করতে না পারলে মানুষ হয়ে পড়ে বুদ্ধিহীন। এ্যারিস্টটল প্লেটোর প্রকৃতি ও আত্মার বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব গ্রহণ করেন নি বরং তিনি অভিন্নতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন প্রকৃতি হল ক্রিয়াব আধার এবং আত্মা হল কেবল ক্রিয়া বা আকৃতি। বস্তু-আত্মা অথবা আকৃতি প্রকৃতির সংযোগকেই বস্তুপিণ্ড বলা চলে–তারা পরস্পরের পরিপূরক। বস্তুকে আত্মা প্রকাশিত করে; পুনশ্চ আত্মা বস্তুর মাধ্যমে। এ্যারিস্টটলও তিন প্রকার আত্মার কথা বলেন: ক. বনস্পতিক আত্মা, যার কাজ প্রসব-বৃদ্ধি যা উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায়; খ. পাশবিক আত্মা যার মধ্যে প্রসব বৃদ্ধি ছাড়াও স্মৃতিশক্তি আছে। পশুজাতির মধ্যে এ গুণ পাওয়া যায় গ. মানবিক আত্মা-এতে উল্লিখিত গুণ ত্রয়ের অতিরিক্ত আছে বৃদ্ধি ও চিন্তন। এ গুণটি কেবল মানব জাতির মধ্যে থাকে। তাই এ্যারিস্টটল বিবর্তনবাদী হলেও বিকাশবাদী অবশ্যই ছিলেন। এটাই এ্যারিস্টটলের প্রজ্ঞাবান আত্মা (Nautic nous) এই আত্মা বিশেষ উদ্দেশ্যে উপর হতে (পারমাত্মা) নিচে প্রেরিত হয়। এর সাথে ইহলোকে কারো সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধ নেই; সে সার্বিক বিশেষ, জ্ঞানে জ্ঞানী। এর দ্বারাই মানুষ ইন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান গম্য জগৎকে জানতে সমর্থ হয়। শরীব হতে বিচ্ছিন্ন তাই দেহের বিনাশ হলেও তার বিনাশ নেই-সেই নিত্য।

এ্যারিস্টটল ঐ প্রজ্ঞাবান আত্মাকে দুভাগে ভাগ করেছেন : ক. সক্রিয় হেতু (Active Intellect); অধিকরণ-কারণ (Passive Intellect)। সক্রিয় আত্মা বস্তুকে জ্ঞাত হওয়ায় যোগ্যতা দান করে; তাই হল পরমাধ্যাত্মিক ভাব; মানুষ যার অংশীদার। অধিকরণ

আত্মা জ্ঞাত বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার প্রতি বিশ্ব নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। এ হল মানব-ব্যক্তি-আত্মা।

এ্যারিস্টটলের আত্মা (Nous) সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

ক. সক্রিয় আত্মা ও অধিকরণ আত্মা এক নয়- ভিন্ন; খ. সক্রিয় আত্মা নিত্য-অধিকরণ আত্মা নশ্বর; গ. সক্রিয় আত্মা মানব ব্যক্তি হতে বিচ্ছিন্ন; ঘ. সক্রিয় আত্মা মানুষের মধ্যে আছে। এ্যারিস্টটলের টীকাকার আলেকজান্ডার আফ্রদিসিয়াস এবং দেমাসিয়াম উভয়েই তাঁর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে সক্রিয় বিজ্ঞান মানব হতে একেবারে বিছিন্ন, দেমাসিয়াস এর নাম দিয়েছেন ভেদেক আত্মা; আলেকজান্ডার নাম দিয়েছেন কারণ কারণ।[২২২]

আত্মা প্রসঙ্গে এ্যারিস্টটলও তার টীকাকার আলেকজান্ডার আফিদিসিয়াস, দেমার্ফিসিয়াস, ফারাবী ও ইবনে সিনা যা বলেছেন ইবনে রুশদ মোটামুটি তা বললেও একটা গুরুতর সংশোধনী একেছেন।[২২৩] উভয়ই ভেবেছেন যে, মানুষের মধ্যে একটি সক্রিয় ও একটি নিস্ক্রিয় আত্মা (Creative Intellett and Passive Intellect) অবস্থান করে। মানব দেহে সক্রিয় আত্মা চালক বুদ্ধি (Agent Intellect) হতে বিকিরণের মাধ্যমে বিকশিত হয়। চালক বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষের মধ্যে নিস্ক্রিয় বুদ্ধি কর্মতৎপর হয় এবং সে সূত্রেই তা পরিণতি লাভ করে অর্জিত বুদ্ধিতে। ব্যক্তি বুদ্ধি সংখ্যায় বহু, কিন্তু চালকবুদ্ধি শুধু একটি। এই একটি চালক বুদ্ধি হতে উদ্ভূত হয় ব্যক্তি বুদ্ধির সব কর্মক্ষমতা ও তৎপরতা। এ অবধি ইবনে সিনা তাঁর পূর্বসূরিদের সাথে সহমত ছিলেন। নিস্ক্রিয় আত্মা (Passine intellect আকলে হাইওয়ানী) সম্পর্কে রুশদ তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে বড় ধরনের মতপার্থক্য পোষণ করতেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে নিস্ক্রিয় বুদ্ধি অবস্থিত, তা দেহ হতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অবিনশ্বর; এটি বিশ্ব আত্মার অংশ বিশেষ সক্রিয় আত্মার মতই চিরন্তন। Rushd regarded the passive intellect as but a portion of a universal soul and as individual in so for as temparorily accupying an individud body. Fven the passive powers are part of a universal force animating the wrole of nature একেই বলা হয় সর্ব প্রাণবাদ (Pan psyehisn)[২২৪] প্রকৃতির সর্বত্র একটি মানসিক বা আধ্যাত্মিক উপাদান আছে; সব সত্তাই ঐ সার্বিক চেতনার অংশীদার। এটি মানবাত্মার নিছক একটি ব্যক্তিগত দক্ষতা বা ক্ষমতা নয়, বরং তা ব্যক্তি আত্মার উর্ধ্বে অবস্থিত অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িত। প্রসঙ্গত রাহুল চমৎকারভাবে একটি বিষয় পরিষ্কার করেছেন-তা হল এই যে, সক্রিয় ও নিস্ক্রিয় আত্মার সম্মিলনেই জ্ঞান অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু সম্মিলনের অর্থ এ নয় যে, ব্যক্তির সংখ্যা প্রচুর বলে সক্রিয় আত্মাও হবে প্রচুর; অথবা ব্যক্তির প্রাচুর্য হ্রাস পেলে তা বিশ্ব আত্মায় বিলীন হয়ে যায়। এর আসল অর্থ হলো সক্রিয় আত্মার অংশ মানবতা বণ্টিত হয়।

মানব মস্তিকের যোগ্যতা অনুসারে মানুষ সক্রিয় আত্মার অংশভাগী হয়। এই অংশ, নিজের স্বরূপে অবিনশ্বর। এর অস্তিত্ব ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং যদি কখনো মানব ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় তখনো কিন্তু এর কার্য অব্যাহত থাকে। সমস্ত বিশ্বই পরমাত্মার রশ্মিতে বিকশিত। প্রাণী, উদ্ভিদ, ধাতু, মাটি সব কিছুই। মানুষের মধ্যে ও পরমাত্মা এইভাবে প্রকাশমান, কারণ মানুষ সেই প্রকাশমান বিশ্বের একটা অংশ। মানবতার মতো আত্মাও সকল মানুষের মধ্যে বর্তমান। বিশ্বাআত্মা যখন ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তা তখন নানারূপে-কখনো প্রাণী, কখনো মনুষ্যরূপে উদ্ভাসিত হয়। অতএব সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় আত্মা একত্রে অনাদি হলে মানবতা কখনো নষ্ট হয় না। মানুষের জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনে। এর শেষ নেই।[২২৫] মধ্যযুগে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছিল ভ্রূণ আকারে এবং মানুষের শক্তির মাত্রা অনুধাবন করার উপায় ছিল না-সে সময় শুধু এ্যারিস্টটলের বস্তুবাদী চিন্তনের উন্মোচনের একমাত্র কৃতিত্ব ইবনে রুশদের। তথাপিও গুরু শিষ্য কেউই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বৃত্ত ভাঙ্গতে পারেন নি। ওলিয়ারি গোটা বিষয়টি এভাবে না দেখেও যথার্থ বলেছেন যে, This doctrine is the very opposite to what is commonly described as materialism. which represents the mind as merely form of energy produce by the activity of the neural function, The activity of brain and nerves, according to Ibn Rushd, are due to the presence of an external force.[২২৬] আধুনিক বস্তুবাদীদের মত মনকে দৈহিক ক্রিয়ার বা জটিল মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি স্বরূপ না ভেবে ইবনে রুশদ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ক্রিয়াশীলতাকে ভাববাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইবনে রুশদ মনে করতেন জ্ঞান প্রকৃতির থেকে উন্নত এবং মঙ্গলের উৎস। কেবল ইহলৌকিক ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দিলে জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে পৌঁছনো সম্ভব নয়, তবে কেউ পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করলে তার মধ্যে যে দৈব জ্যোতি থাকে তা জাগরিত হয়। এ জন্য পরমাত্মার সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর এরূপ বক্তব্য হতে মনে হতে পারে যে, রুশদও সুফিবাদের যোগধ্যানকে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের উপায় বলে ভেবেছেন। আজ তাঁর দর্শন গভীরভাবে অনুশীলন করলে বুঝা যায় যে, তিনি মূলত প্রচণ্ড সুফিবাদবিরোধী ছিলেন; তিনি কেবল পরম জ্ঞানের মধ্য দিয়েই পরমাত্মার সান্নিধ্য পাওয়ার উপায় বলে ভেবেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষ যে জ্ঞানের যোগ্যতা নিয়ে জন্মায় তাকে বিকশিত করাই কল্যাণ কর্ম। মানুষ তখনই শুভপ্রাপ্ত হয় যখন সে তার যোগ্যতাকে উন্নত করে বাস্তবতার দ্বারে উপনীত হয়। ইন্দ্রিয় জগতের উপর বিজ্ঞান জগতের প্রভাব বিস্তারের জন্যই মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন। দার্শনিকদের আসল ধর্ম হলো বিশ্বের অস্তিত্বকে অধ্যয়ন করা; আল্লার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সর্ব ক্ষেত্রে উপাসনা।[২২৭] এখানেই নিহিত ছিল মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন রুশদবাদের ভিত্তি। যা ইউরোপীয় মনিষীরা উপলব্ধি করলেও প্রাচ্য মুসলিম মনিষীরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়।

ইবনে রুশদের সামাজিক বিচারধারা

ইবনে রুশদের গবেষণা ও লেখার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে মানুষের কর্মের স্বাধীনতাতত্ত্বের উপর। এ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন মানুষ কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাইলে তার আগে তাকে বিশেষ কাজের জন্য সংকল্প করতে হয়। এটাই তার মানস কর্ম বা এক প্রকারের মানসিক অবস্থা। এর উদ্দেশ্য হলো কোনো কার্য সম্পাদন করার চিন্তা। সংকল্প কেবল আত্মিক প্রেরণাই নয়; বাহ্যিক কারণের উপরও নির্ভরশীল। বাহ্যিক কারণ মানুষের সংকল্পকে দৃঢ় করে; সীমা ও স্থায়িত্ব দান করে। অনুরাগ ও বিরাগ এ দুটি মানসিক অবস্থা থেকে সংকল্পের উদ্ভব হয়। অনুরাগ বা বিরাগ লাভদায়ক বা ক্ষতিকারক বস্তুর অস্তিত্বের ধারণা থেকে জন্মায়। সুন্দর বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ; বিভৎস দৃশ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা বা বিরাগ জন্মে। মনের এই অনুরাগ, বিরাগ, আকর্ষণ বিকর্ষণ অবস্থার নামই সংকল্প। অতএব মনকে নাড়া দেয়ার মতো কোনো বাস্তবতা না থাকলে সংকল্প জন্মায় না।

সংকল্পোৎপাদক বাহ্যিক কারণ কিন্তু নিয়ম নাস্তি নয়, বরং সেগুলো অন্য কারণের অধীন : ক. মানব চিত্তে সংকল্প উদ্ভব যে কোন সময় হয় না; খ. কারণসমূহের পরম্পরার ন্যায় সংকল্প এক প্রকাশ ক্রমবদ্ধ শৃঙ্খলা, যার প্রতিটি ধাপ বাইরের ধাপের সাথে যুক্ত; গ. আমাদের দৈহিক গঠন যার উপর আমাদের সংকল্প অনেকাংশে নির্ভরশীল-তাও এক বিশেষ অবস্থার অধীন। এ তিনটি কারণ কার্য-কারণ শৃঙ্খলা পরস্পরের সাথে দৃঢ় নিবদ্ধ। তাদের প্রতিটি অংশ মানুষের বুদ্ধির সীমার বাইরে। আরো বিষয় বিবেচনা করলে মনে হয় মানুষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাস।[২২৮]

উল্লেখ করা দরকার যে, ইবনে রুশদের সামাজিক চিন্তনের উপর প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। সম্ভবত এ্যারিস্টটলের লিখিত রাজনীতি শাস্ত্রের পুস্তক তার নিকট সহজলভ্য ছিল না অথবা তার বাস্তবতাই তাকে এ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক চিন্তা ধারা অনুধাবনে প্রচণ্ড বাধা ছিল। প্লেটো ছিলেন তার যুগের ক্ষয়িষ্ণু দাস শ্রেণীর প্রতিনিধি; ইবনে রুশদ ছিলেন তার যুগের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর মুখপাত্র। উভয়ই পতনোন্মুখ সমাজকে বাচানোর চিন্তা করেছেন। এ বৃত্ত তারা ভাঙ্গতে পারেন নি। যা হক সমাজ ও ব্যক্তির প্রশ্নে সমাজের তুলনায় ব্যক্তিকে অনেক তুচ্ছ ভাবে দেখেছেন দুই মহান গুরু শিষ্য। শিষ্য ইবনে রুশদ মানব সমাজকে বনস্পতির সাথে তুলনা করেছেন। কৃষক যেমন তার কৃষিকর্ম প্রক্রিয়ায় তার কাম্য ফসলের জন্য সব আগাছা উৎপাটন করে কেবল প্রয়োজনীয় বৃক্ষগুলির যত্ন করে সেভাবে বড় বড় নগরে জনগণের মধ্য হতে যারা বেকার জীবন যাপন করে বা অসুস্থ ব্যক্তি সমাজের বোঝা *স্বরূপ তাদেরকে হত্যা করে নির্মূল করার কথা তিনি বলেছেন। যিনি সামাজিক*

পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর এত সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন–তার মত তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী উচ্চ শ্রেণী বৃত্তের উপরে উঠবেন কি করে? শ্রেণী বৃত্তের উর্ধ্বে ওঠার মত পরিবশে তখনো জন্ম নেয় নি। পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মানুসারে নগরায়ন সরকারের কর্তব্য; এ জন্য যতদিন শহর হতে বিকলাঙ্গ অক্ষম এবং বেকার লোকদেরকে বহিষ্কার করা না হয়, তত দিন সুন্দর, সুখী নগর তৈরি সম্ভব নয়! তিনি স্বয়ং একজন চিকিৎসক, কেন মানুষ অসুস্থ হয়, বিকলঙ্গ হয়, এর জন্য পরিবেশ কতখানি দায়ী সে সম্পর্কে তাঁর কোনোই বক্তব্য ছিল না! কতিপয় মানুষ কেন বেকার থাকতে অথবা অসুস্থ পরিবেশ রচনা করতে আগ্রহী, সে সম্পর্কেও তিনি কোনো আলোকপাত না করে তাদেরকে নির্মূল করে সমাজকে সুন্দর করতে বললেন।! নিষ্টুর কর্মকাণ্ডের যে সুন্দর কল্যাণধর্মী বিকল্প থাকতে পারে গুরু শিষ্য কেউত উপলব্ধি করতে পারেন নি। বস্তুত মহান ইবনে রুশদ তার যুগ সমাজ বৃত্ত ভাঙ্গতে পারেন নি বলেই উচ্চ কোটির মানুষের স্বচ্ছন্দের জন্য নিম্নশ্রেণীর মানুষের নির্মূলীকরণকে অনুমোদন করেন। এটা ছবির একটি নিষ্ঠুর দিক।

ইবনে রুশদ মূর্খ শাসক এবং ধর্মান্ধদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। ধর্মান্ধ পণ্ডিত যারা মানুষের কর্ম স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি তাদেরকে মানবতার শত্রু বলে মনে করতেন। তিনি কখনই ভুলতে পারেন নি কিভাবে চার লক্ষ হস্তলিখিত পুস্তক সমৃদ্ধ লাইব্রেরি স্পেনে ভস্মীভূত করা হয়। তার চারপাশে এমন কি তাঁর নিজের জীবনের যে অন্ধকার দেখেন-তার পরও তিনি ফারাবী বা রাজীর মত একান্ত জীবন যাপনের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমাজ জীবনে বিশ্বাসী; তিনি যথার্থই বুঝে ছিলেন যে, একান্ত ব্যক্তিগত জীবন কোনো শিল্পকলা বা বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে না। তারা বড় জোর সমাজের পূর্বার্জিত ধনসম্পদে পুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে এবং মাঝেমাঝে কিছু সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হয়। বৈরাগ্য সাধনে নয়, বরং সমাজের মধ্যে বসবাস করেই সমাজের কল্যাণ সাধন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। যেহেতু— তারা নিজেরাই সমাজের দান। সদাচারকে তেমনি শুভবুদ্ধিজাত মনে করতেন; ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত আচরণ শুভ বুদ্ধিজাত নয়; অথবা ধর্মান্ধদের মতানুযায়ী তা কখনই শূন্য থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তুও নয়। তাঁর মতে সদাচারের অর্থ হল রাষ্ট্র ও সমাজের হিত সাধন। ধর্মের মাহত্মকে তিনি সামাজিক উপযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; শুভ ও মঙ্গলের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করতে তার আপত্তি ছিল না। এ ব্যাপারে সামাজিক মঙ্গলই হওয়া উচিত সবার কাম্য।[২২৯]

নারীমুক্তি

মধ্যযুগে ইবনে রুশদ ছিলেন নারী সমাজের অধিকার ও স্বাধীনতার বড় মাপের প্রবক্তা। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, নারী স্বাধীনতা সমাজের জন্য

কল্যাণকর। উল্লেখ্য নারী মর্যাদা সম্পর্কে গুরু প্লেটোর থেকে তিনি অনেক উদার দৃষ্টি ভঙ্গির অধিকারী। ইবনে রুশদের মতে নারী-পুরুষের মধ্যে দৈহিক মানসিক ক্ষমতায় কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তার মতে পার্থক্য কেবল পরিমাণগত; গুণগত নয়। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গিত, রণ কৌশল ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের মত সমান দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে–যদি তারা সমান সুযোগ পায়। তারা পুরুষের সাথে সমাজের মঙ্গল সাধনায় ব্রতী হতে পারে। তিনি মনে করেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে-বিদ্যা ও চারুকলায় শুধু নারীদের জন্য প্রকৃতির মধ্যে সু সংরক্ষিত থাকে। সঙ্গীতের চরম বিকাশ নারীদের মধ্যেই হয়। রাষ্ট্র পরিচালনা অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তারা তাদের দক্ষতা দেখাতে পারে। তাঁর যুগে সমাজে স্ত্রী জাতির জন্য যে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও হীন। ফলে নারীগণ তাদের যোগ্যতা প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শুধু সন্তান-ধারণ ও পালন ছাড়া তারা আর অন্য কোনো কাজের অবসর পায় না। কাজেই তাদের প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগ নেই। নারীজীবন বৃক্ষের মতো, ফসলি জমির মতো, স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি আরো বলেন যে, স্পেনের ক্রমাগত দারিদ্র্যের পশ্চাতে কারণ হল নারীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। অথচ স্পেনে পুরুষের তুলনায় নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মহিলাগণ সংসারে বাড়তি আয় করে স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির পরিবর্তে স্বামীর গলগ্রহ হয়ে বোঝাস্বরূপ জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। মার্কস বলেছিলেন কোনো ব্যক্তি প্রগতিশীল কিনা তার বাহ্যিক লক্ষণ হল নারীদের সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি? নারীদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে সহজে অনুমান করা যায় তিনি কোনো ধরনের মানুষ। ইবনে রুশদ প্রাক রেনেসাঁস কালে ইউরোপীয় সমাজে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং নবযুগের সূত্রপাতে সাফল্য অর্জন করেন। কত ব্যক্তি রুশদবাদের পিছনে জীবন উৎসর্গ করে রেনেসাঁসের পথ উন্মুক্ত করে![৩৩০]

১৩.৬ আরবি পোশাকে প্রাচীন বিজ্ঞান দর্শনের লাতিন ইউরোপ পরিক্রমা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ইতিপূর্বে প্রাচীন বিশ্ব মানস সম্পদের বাগদাদ (প্রতিকী অর্থে) পরিক্রমার বিষয় আলোচিত হয়েছে। আরব সাম্রাজ্যের এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিবেশে খলিফা আল মনসুর বিশ্ব বৌদ্ধিক সম্পদ (Intellectual property) বাগদাদে স্বাগত জানালে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেবল সংরক্ষণই নিশ্চিত হয় নি, বরং তার অনুশীলন, পরিচর্যা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাগ্রহ পরিচর্যার মধ্যেই ছিল মধ্যযুগে আরব সাম্রাজ্যের অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক ভূমিকা।[৩২১] মধ্যযুগের প্রথমার্ধে আরব সাম্রাজ্যে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত রূপে মধ্যযুগের শেষার্ধে বিশ্ব জ্ঞান ভাণ্ডারের লাতিন ইউরোপে অনুপ্রবেশ ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ ঘটনাটি রীতিমত কৌতূহলুদ্দীপক। ইউরোপে এমন সময় আরব

জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন সাদরে গ্রহণ করা হয় যখন তারা আরব বিশ্বে ক্রুসেড চাপিয়ে দিয়েছিল।

এক সময় ভাবা হত যে, সম্ভবত ক্রুসেডের প্রভাবেই আরব জ্ঞান ভাণ্ডার ইউরোপে প্রবেশ করে। আধুনিক গবেষণায় এরূপ মনে করার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।[২৩২] একাদশ শতকে এর অনুপ্রবেশের সূচনা হলেও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় কয়েকশো বছর ধরে ইউরোপের ক্রমবিকাশমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে তার মানস পরিমণ্ডলে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ঐ দীর্ঘ সময় -কালকে আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক সভ্যতা রচনার প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব বলেই আখ্যায়িত করা যায়।

একাদশ শতক হতে পশ্চিম ইউরোপ নয়া রূপান্তরের দিকে মোড় নেয়। এ পর্যায়ে লাতিন ইউরোপে গ্রীক-বিজ্ঞান এবং এ্যারিস্টটলের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তার সন্ধান পায় আরর সাম্রাজ্যে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের (৪৭৬ খ্রি.) পর প্রাচীন গ্রীকোরোমীয় দাস ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর ভূমিভিত্তিক সামন্ত তান্ত্রিক নয়া সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন হয়। নয়া ভিত্তিতে ইউরোপীয় পুনর্গঠনে খ্রিষ্ট ধর্ম ছিল তাদের তাত্ত্বিক স্তম্ভ এবং বড় সহায়ক শক্তি। খ্রিষ্টান ধর্মের আদর্শগত রূপকার ছিলেন সন্ত অগাস্টাইন। উদীয়মান নব আর্থ-সামাজিক পরিবেশে ইউরোপে প্রথম হতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে হিব্রুবাদ হেলেনবাদ এই দ্বিবিধ ঐতিহ্যের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব সমন্বয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে। রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপে জর্মন জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা হলেও উভয়বিধ সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এড়ানো সম্ভব হয় নি। To see things as they are" প্রকৃতি সত্য, প্রজ্ঞা ও কর্ম সত্য এই ছিল হেলেনবাদের মর্মবস্তু; দৈব সত্য, আনুগত্য, বিশুদ্ধ নৈতিকতা, তপ-জপ-ধ্যান-অনুধ্যান ছিল হিব্রুবাদের মূল সুর। পারলৌকিক জীবন সাধনাই হিব্রুবাদে মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য; কারণ ইহ জীবন ক্ষণস্থায়ী। হেলেনবাদে লৌকিক জীবনেই মানুষের পরম স্বার্থকতা; এবং এ জন্যই পারলৌকিক ভাবনা।[২৩৩] এভাবে যুক্তিবাদ বনাম শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যকার সংঘাত চলতে থাকে। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বেই সন্ত আগাস্টাইন খ্রিষ্টধর্মে নব প্লেটোবাদের আংশিক উপাদন সম্পৃক্তকরণের পথ প্রদর্শন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, গ্রীক দার্শনিকদের প্রজ্ঞা প্রসংশনীয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের প্রজ্ঞা আয়ত্ব করে পরম সত্যে উপনীত হতে পারে। যাহোক এই পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব সমন্বয় প্রক্রিয়ায় কখন দ্বন্দ্ব কখন সমন্বয় প্রাধান্য পায়। এই মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ধারা মধ্যযুগের লাতিন ইউরোপের ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

ইউরোপীয় পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সমাজে সামন্ত ও মোহন্ত এই দুটি পরস্পর স্বার্থবিরোধী সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটে, এবং মধ্যযুগে যাজকতন্ত্র বনাম রাজতন্ত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সমন্বয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

ইউরোপীয় উচ্চকৌটীর মানুষের দ্বন্দ্বের মধ্যে নিহিত ছিল সেদিনের সামাজিক গতিবাদ। যাজকদের ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি; সামন্তদের ছিল সামরিক শক্তি। বিদ্যমান বাস্তব পরিবেশে যাজক তন্ত্রের মধ্যে ও মতাদর্শগত বিভেদও মাথাচাড়া দেয়। খ্রিষ্টান সাধুদের একাংশ মানুষকে তাদের উপদেশ মেনে চলতে, মঠ-গির্জায় দান খয়রাত করতে উপদেশ দিত; কিন্তু তারা নিজেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত থাকত। আবার অনেকে পার্থিব ভোগ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে একান্তবাসী হয়ে ধ্যান তপ-জপে আত্মানিয়োগ করতেন।

পুনশ্চ তারা মানুষকে ধর্ম জ্ঞান দান করা ধর্ম প্রচার প্রসারের একচেটিয়া দায়িত্ব পালনের জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠা করে তাদের কোঠার নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পণ্ডিতদের প্রধান দায়িত্ব ছিল ধর্ম বিশ্বাস ও বিধিনিষেধকে যুক্তির সাহায্যে সত্য প্রমাণিত করা। এই পণ্ডিতরা ধর্মযাজক হতেন তাও না, তবে ধর্মকে দর্শনের মারফত রক্ষার দায়িত্ব আপন স্কন্ধে উঠিয়ে নেন। তাদের অনেকের বিদ্যা-বুদ্ধি যথেষ্ট না থাকলেও প্লেটো-এ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতকে নিজেদের সুবিধামত ব্যাখ্যা খাড়া করে তারা ধর্মের একটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রচনার প্রয়াস চালাত। এরা ইহলৌকিক ও বৈষয়িক জীবন সম্পর্কে ছিল উদাসীন। সম্রাট শার্লিম্যান এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি নতুন মঠ ও গির্জা প্রতিষ্ঠা করে নতুন পাঠশালা নির্মাণ করেন। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শার্লিম্যানের বিদ্যাপীঠকে বলা হত স্কুল এবং শিক্ষকদেরকে বলা হত স্কলাস্টিক (আচার্য)। এখানে পণ্ডিতগণ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়ের পটভূমিতে যে মিশ্র দর্শন শিক্ষা দিতেন সেটাকে বলা হত স্কলাস্টিক দর্শন। শার্লিম্যানের মৃত্যুর পর তাঁর জটিল শিক্ষা ব্যবস্থা বিকশিত না হলেও জার্মানীর সম্রাট মহান ওটো, ইংল্যোন্ডের রাজা মহান আলফ্রেড এবং ফ্রান্সের রাজন্যবর্গরা তা ভেঙ্গে পড়তে দেন নি। বস্তুত তাদের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সংস্কারের একটি সামাজিক তাগিদ নিয়েই লাতিন ইউরোপ একাদশ শতকে পদার্পণ করে।

একাদশ শতক হতে পশ্চিম ইউরোপে সামগ্রিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হতে থাকে। এ শতাব্দীতে শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয় তা আর কখনো হারিয়ে যায় নি, বরং পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে বলে বার্ট্রান্ড রাসেল মন্তব্য করেন।[২৩৪] বস্তুত একাদশ শতক ছিল দ্বাদশ এবং দ্বাদশ শতক ছিল ত্রয়োদশ শতকের প্রস্তুতি পর্ব।[২৩৫] বার্ট্রান্ড রাসেল দ্বাদশ শতকের ইউরোপীয় ঘটনা প্রবাহের মধ্যে চারটি বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ক. গির্জা বনাম রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আরো বিকশিত হয় পূর্ণ মাত্রায়; তবে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি হতে যাজকতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকট হয়। খ. দ্বাদশ শতকের আরো

গুরুতর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে; এ সময় ইতালীর স্বাধীন নগরগুলির অধিকতর বিকাশ হয়; একাদশ শতকে এদের প্রাথমিক উত্থান প্রমাণ করে যে, ইউরোপের একাংশে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সূচনা হচ্ছে এবং বণিক সমাজেরও বিকাশ হচ্ছে–কাজেই বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয়।[২৩৬] গ. একাদশ শতকের শেষে ক্রুসেড আরম্ভ হলে দ্বাদশ শতকে এর বিস্তার ঘটে এবং সমগ্র ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরে তার জের চলে। ক্রুসেডের উত্তাল তরঙ্গে সারা ইউরোপ অভূতপূর্ব উন্মাদনায় উদ্বেলিত হয়, অদ্ভুত মনোভঙ্গি দেখা দেয়, যাজকতন্ত্রেয় প্রভাব বৃদ্ধি পায়; ইহুদি নিধনযোগ্য সংঘটিত হয়; তাদের ব্যবসা চলে যায় খ্রিষ্টানদের হাতে[২৩৭] ঘ. দ্বাদশ শতকে পণ্ডিতবাদের (সংকীর্ণ অর্থে Schlolasticism) পূর্ণ বিকাশ হয়। এ সময় এ্যারিস্টটলের সাথে ধীরে ধীরে তাদের পরিচয় ঘটে। ফলে তাদের চিন্তাধাবায় প্লেটো তার প্রাধান্য হারায়। এ সময় তর্কশাস্ত্র নতুন গুরুত্ব পায়; ঐ কূটতর্ক পদ্ধতিতে অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতি থাকালেও এতে রহস্যবাদের অস্তিত্ব ছিল না; ররং বহু মৌল দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তখনকার পণ্ডিতবাদ পর্যালোচনা করে বার্ট্রান্ড রাসেল যথার্থই বলেন : The whole early Schlolasticism may be viewed, politically, as an off shoot of the church's struggle for powoı[২৩৮] বস্তুত একাদশ শতক হতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের বিকাশমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে সকলের জন্য ব্যাপক শিক্ষার একটি সামাজিক তাগিদ ছিল বলেই রেইমস, লিওন, প্যারিস, ছাত্রেরা তুরস, কোলোঙ, লেইজ, উট্রেক্ট ইত্যাদি স্থানে ক্যাথেড্রাল স্কুল দ্রুতগতিতে গঠিত হয়; ছাত্র শিক্ষকের মিলন ঘটে।

একাদশ শতকে ইউরোপীয় বাস্তব অবস্থায় রূপান্তরের লক্ষণ দেখা দিলে বৈষয়িক শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তিনিই ছিলেন ফরাসি পণ্ডিত গেরবার্ট (৯৪৬-১০০৩ খ্রি.)। ইনি পোপ দ্বিতীয় সিলভেষ্টর (৯৯৯-১০০৩ খ্রি.) রূপে প্রয়াত হন। তৎকালীন ইউরোপে প্রচলিত হিসাব পদ্ধতি আবাকাস বিশেষজ্ঞ গেরবার্ট জার্মান সম্রাট মহান ওটোর পুত্রের শিক্ষকতার লোভনীয় পদ গ্রহণ না করে রেইমস স্কুলে আধ্যাপনার পেশা (৯৭২-৯৮৯ খ্রি.) গ্রহণ করেন। তিনি ইতিপূর্বে বার্সেলোনা ভ্রমণ কালে আরব বিজ্ঞান অংক শাস্ত্রের সাথে পরিচিত হন। তিনি সর্ব প্রথম ৯টি আরব সংখ্যা ইউরোপে আমদানি করেন। যদিও এক শতাব্দী ধরে আরবরা শূন্য (০) ব্যবহার করছিল তবুও তিনি শূন্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নি।[২৩৯] তিনি লাতিন ইউরোপে এ্যাস্ত্রল্যাব প্রবর্তন করেন কিনা-তা বিতর্কিত বিষয় হলেও যা নির্দ্ধিধায় বলা যায়, তাহল এই যে, ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তার ক্যাটালোনিয়ার এক বন্ধুকে ঐ বিষয়ের উপর লিখিত আরবি পুস্তকের অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেন। Before 1050, his name had been attached to a so colled Geometry which told how the instrument could be used for measurig the depth of a well calculating the

height of a mountain. তিনি তার ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন একজন জর্মান সম্রাট, একজন ফরাসী রাজা ও অসংখ্য প্রশাসক ও যাজক সদস্য।[২৪০]

ইতিপূর্বে গেরবার্টের আরবি-বিজ্ঞান ইউরোপে আমদানি করার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কার্থেজের অধিবাসী কনস্ট্যানটাইন একাদশ শতকের শেষে বিভিন্ন আরব সেমিনারী পরিদর্শন করেন এবং হিপোক্রাটিস ও গালেনের পুস্তক আরবি ভাষা হতে লাতিনে অনুবাদ করেন; এ্যাডেলহার্ড বেশ কিছু আরবি বিজ্ঞান পুস্তক অনুবাদ করেন। ইতালী, স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্স হতে কিছু বিদ্যোৎসাহী প্রাচ্য সেমিনারীতে পাঠ গ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিভিন্ন স্কুলে অধ্যাপনার পেশায় নিয়োজিত হন। এভাবে ক্রমবিকাশমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক চাহিদা মিটান হয়।[২৪১]

লাতিন ইউরোপে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন পুস্তক সহজ লভ্য করার জন্য দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবি পুস্তকের নিয়মিত অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।[২৪২] এই অনুবাদ কার্যক্রমে সিসিলি এবং টলেডোর অবদান অবিস্মরণীয়। প্রধানত ঐ দুস্থান হতে আরব বিজ্ঞান-দর্শন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছায়। স্থান দুটি এক সময় আরব শাসন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল।

নর্মন কাউন্ট রোজার কর্তৃক ১০৬০ সালে মেসিনা বিজয় সিসিলি দ্বীপের ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক সিসিলি বিজিত হলেও মুসলিম সম্প্রদায় বিতাড়িত হয় নি, বরং খ্রিষ্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান এবং উভয়ের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার এক আদর্শ ক্ষেত্রে পরিণত হয়।[২৪৩] প্রথম রোজার, দ্বিতীয় রোজার এবং দ্বিতীয় ফেডারিক ছিলেন আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী। ফ্রেডারিক সিসিলিতে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এবং ইবনেরুশদ, টলেমী ও এ্যারিস্টটলের গ্রন্থ অনুবাদের জন্য ইহুদী পণ্ডিত নিয়োগ করেন। তিনি নেপলসে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্যালের্নো বিদ্যাপীঠ রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বস্তুত সিসিলি দ্বীপের ঐ সব আলোকিত রাজন্যবর্গের উদার দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ক্রুসেডের ডামাডোলের মধ্যেও ইউরোপের অভ্যন্তরে আরব লালিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের পথ সুগম হয়। সিসিলির রাজধানী পালের্মোতে আরবি, লাতিন এবং গ্রীক ভাষার সমান প্রধান্য ছিল। সিসিলি হতে দক্ষিণ ইটালী হয়ে আল্পসের উত্তরে আরব জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে।[২৪৪] সিসিলিতে ১১৬০ সালে আমীর ইউজেন আলম্যাজেস্টের লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন; তিনি দ্বিতীয় রোজার প্রথম ইউলিয়ামের সময় সালের্নোর সবচেয়ে বড় আরবি বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত ছিলেন। সিসিলিতে আমন্ত্রিত ইহুদী পণ্ডিতরা আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক লাতিন ভাষায় অনুবাদে বিশেষ অবদান রাখেন। ইহুদী চিকিৎসক

ফারাজ বিন সেলিম ১২৭৯ সালে আঞ্জুর রাজা প্রথম চার্লসের সৌজন্যে আর-রাজীর চিকিৎসা শাস্ত্রের তৎকালীন বিশ্বকৌষিক চারিত্রের গ্রন্থ হাভী ২৫ খণ্ডে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সিসিলিতে জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতের অনুবাদের কাজই ছিল প্রধান।[২৪৫]

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড় কেন্দ্র টলেডো বহুদিন ধরে আরব জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে টিকে থাকে। আর্চবিশপ র‍্যায়মণ্ডের উদ্যোগে (১১২৬-৫১ খ্রি.) এখানে একটি অনুবাদ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রটি ১১৩৫-১২৪৮ সাল পর্যন্ত উদীয়মান ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের জন্য জ্ঞান-তীর্থ ক্ষেত্র ছিল। এখানে স্বনাম ধন্য মাইকেল স্কট, চেষ্টারের বরার্ট, বাথের এ্যাডেলার্ড, ক্রেমনারের জেরার্ড, ব্রাসেলসের রুডলফ, কোরেনথিয়ার হারম্যান প্রমুখ পণ্ডিত এই অনুবাদ কেন্দ্রে আত্মনিয়োগ করেন। বস্তুত বলা চলে টলেডো ছিল প্রাচ্যবিদ্যা পীঠ; First school of oriental studies in Europe.[২৪৬] ১১৪৫ সালে বরার্ট খাওয়ারিজামের এ্যালজাবরার লাতিন অনুবাদ করেন। রোজার বেকনের পূর্বে সর্বশ্রেষ্ট ইংরেজ বিজ্ঞানী বাথের জিরারড এ সময় স্পেন ভ্রমণ করেন; সিসিলি ও সিরিয়ায় স্বল্পকাল অবস্থানের পর ১১২৬ সালে খাওয়ারিজমের গবেষণার ভিত্তিতে প্রস্তুত আল মাজারিতির জ্যোতিষিক টেবিলের লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত অনেক অনুবাদ পুস্তকের সম্পাদনার কাজ করেন। বস্তুত তিনি পরবর্তীকালে আরবি বিশেযজ্ঞের পূর্ব পুরুষ হওয়ায় গৌরব অর্জন করেন।[২৪৭]

মাইকেঠ স্কট (মৃ: ১২৩৬ খ্রি.) ছিলেন ইউরোপে রুশদবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সিসিলির দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের রাজজ্যোতিষিক পদ গ্রহণ করার পূর্বে টলেডা সোমিনারীতে বিদ্যা অর্জন করেন এবং সেখানে অসংখ্য অনুবাদের কাজ করেন; আলবিত্র্যাজির জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক আল হায়াহ এবং ইবনে রুশদের ব্যাখ্যা সম্বলিত এ্যারিস্টটলের দ্যা কোয়েলো আতমুন্ডো গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সিসিলিতে তিনি অসংখ্য আরবি পুস্তক লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন; ইবনে সিনা অনূদিত এ্যারিস্টটলের প্রাণীবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকখানি লাতিনে অনুবাদ করেন।

টলোডোর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক ছিলেন ক্রিমনারের জেরারড। তিনি ১১৮৭ সালে প্রয়াত হওয়ার পূর্বে টলেমীর আলম্যাজেস্টের ফ্যারাগানীর ভাষা, এ্যারিস্টটলের ফারাবীর ভাষ্য, ইউক্লিডের এলিমেন্ট ব্যতীত এ্যারিস্টটল, গ্যালেন এবং হিপোক্র্যাটিসের সর্বমোট ৭১ খানা আরবি পুস্তক অনুবাদ করেন।[২৪৮]

মধ্যযুগে ইউরোপে আরব বিজ্ঞান-দর্শনে প্রসারের পশ্চাতে ইহুদী পণ্ডিতদের অবদান সবিশেষ স্মরণীয়। টলেডোর ইব্রাহীম বিন এজার ছিলেন বিখ্যাত অনুবাদক। তার সসসাময়িক ইহুদী খ্রিষ্টান সেভিলের জন আর্চবিশপ রায়মণ্ডের অনুপ্রেরণায় আলফারাবী, আবু মাশার, আলকিন্দি, বিন গ্যাবিরোল এবং গাজ্জালীর পুস্তক অনুবাদ

করেন। তার ফারাগানীর জ্যোতির্বিদ্যা অনুবাদ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য তিনি ক্যাস্টিলিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তার এক সাথী তার লাতিন অনুবাদ করেন। বস্তুত ত্রয়োদশ শতকের শেষে আরব বিজ্ঞান দর্শন ইউরোপে প্রবেশ করে প্রধানত স্পেনের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে হিট্টির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। The intellectual avenue leading from the portals of Tolado throuth the Pyrenese mound wound its way through provence and the Alpine passes into Lorraine Germany and Central Europe as well as the across the channel into England.[২৪৯] একই সাথে দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সাই, তুলুজ এবং নরবনের নাম উল্লেখযোগ্য। নরবনে আহরাম বিন ইজারা ১১৬০ সালে খাওয়ারিজমের সারণীর উপর ভিত্তি করে লিখিত আলবেরুনীর গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মন্ট্রেপেলিয়ের আরব চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্যোতিবিদ্যার অধ্যয়নের বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়; তিনি আরো বলেন যে Leige, Gorze, and Colongne..........Provided the most fertile soil for the germination of Arab learing.[২৫০]

ইতিপূর্বে আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আররাজীর (৮৬৫-৯২৫ খি.) লিখিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের তৎকালীন একমাত্র বিশ্বকোষ আলহাবীর অনুবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪৮৬ সালে উক্ত গ্রন্থটি কনটিনেনস শীর্ষক কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়; এবং পঞ্চম সংস্করণটি ১৫৪২ সালে ভেনিসে মুদ্রিত হয়।[২৫১] কয়েকজন সম্পাদকের হাত বদল হওয়ার পর রসায়ন শাস্ত্রের উপর লিখিত রাজীর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল আসরার অবশেষে ক্রিমিনারের জেরারড লাতিন বাষায় অনুবাদ করেন। জাবির বিন হাইয়ানের পুস্তক লাতিন ভাষায় অনুবাদ না হওয়ায় পর্যন্ত পুস্তকটি ইউরোপের কলেজসমূহে রসায়ন শাস্ত্রের উপর একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেব বিবেচিত হয়। রোজার বেকন এই পুস্তক হতে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২৫২] আররাজীর কিতাবুল ইলা গ্রন্থের অনুবাদ করেন কন্সট্যান্টাইন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল মনসুরীর লাতিন অনুবাদ পঞ্চদশ শতকের মিলানে প্রকাশ করা হয়।

এই পুস্তকের অংশবিশেষ জার্মানী ও ফারাসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সে যুগের গুটি বসন্ত এবং হামের উপর গবেষণামূলক প্রথম গ্রন্থ আলজুদারী ওয়াল হাসবাহ ১৫৬৫ সালে ভেনিসে লাতিনে অনুবাদ হওয়ার পর বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। হিট্টি এ পুস্তকের উপর মন্তব্য করেন: This treatise served to establish Ar-Razirs reputation as one of kneenest orignial thinker and the greatest clinician not only of Islam but of middleage.[২৫৩] ইবনে সিনার আল কানুন ফিত্তিব ছিল গ্রীকো-আরব চিকিৎসা বিদ্যা সবশেষ সংহিতা (Codification) এবং এর আরবি সংস্করণ ১৫৯৩ সালে রোম হতে মুদ্রিত হয়। দ্বাদশ শতকে ক্রিমিনার জিরারড এ পুস্তকের লাতিন অনুবাদ করেন। এ পুস্তক প্রসঙ্গে হিট্টি বলেন : This Canon, with its

encyelopedic contents, its systematic arrangement and philosophic plan, soon worked its way into a position of preeminence in the medieval letarature to the age, displacing the works of Galen, Razi and Majusi becoming the textbook for medieaval education in the school of Europe. বস্তুত পুস্তকটি দ্বাদশ হতে সতের শতক পর্যন্ত, Served as the Chief guide to medical science in the west.[২৫৪]

দ্বাদশ শতকে ক্রিমিনারের জিরারড মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ আল খাওয়ারিজমের মৌলিক গ্রন্থ হিসাবুলজবর ওয়াল মুকাবিলা অনুবাদ করার পর হতে পুস্তকখানি গণিত শাস্ত্রের একমাত্র প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ইউরোপের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়, এবং ইউরোপে সর্বপ্রথম এ্যালজাবরা পাঠের সূচনা হয়; তাঁর পুস্তকই ইউরোপে আরবি সংখ্যা এবং হিসাবের ক্ষেত্রে শূন্যের (০) প্রচলন করে।[২৫৫]

সিসিলি এবং টলেডো হতে আরব বিজ্ঞান দর্শনের যে অসংখ্য অনুবাদের কাজ হয়েছিল তার কিয়দাংশের কথা উপরে উল্লেখিত হল। ঐ সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতে মধ্যযুগে ইউরোপে প্রাচীন বিজ্ঞান দর্শনের প্রসারে মুসলিম বিশ্বের অবদান সহজে অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ইউরোপের উদীয়মান বুদ্ধিজীবীরা আরব বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সেমিনারী, একাডেমী বা কলেজে এগুলো একটি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করায় অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস, সারবোন, বোলোঙ, সালের্নো প্রভৃতি বিখ্যাত বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে কেবল আরব বিজ্ঞান দর্শন পঠন-পাঠনই হত না বরং অনুবাদের কাজো পরিচলিত হত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম হতে তাদের স্বায়ত্তশাসন এবং চিন্তার স্বাধীনতার ঐতিহ্য সৃষ্টি করে।[২৫৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইউরোপের ঐ সেমিনারীগুলোর মূল মডেলটি ছিল আরব বিশ্বে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একাদশ শতক হতে আরব বিশ্বে তুসির নিজামীয়া শিক্ষাব্যবস্থা হতে এ দুটি আদর্শের অপমৃত্যু ঘটে।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, প্রাচ্যে সামন্তবাদের গতিশীল অবস্থায় আরব বিশ্বের বা প্রাচ্য ইসলামি জগতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বীজ বপণ করা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে এর প্রচুর ক্রটি বিচুতি থাকলেও এর ইতিবাচক দিকটি ছিল প্রধান।[২৫৭] কিন্তু বিজ্ঞান দর্শন ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়ার প্রাক্কালে এতদঅঞ্চলের সামন্ত ব্যবস্থায় আসে দ্রুত অবক্ষয়; এর সামাজিক আগাছা এর বিকাশের পথে হয় প্রচণ্ড বাধা। এর ইতিবাচক দিকটি আর বিকশিত হয় নি। একাদশ শতক হতে ইউরোপের দৃশ্যটি ছিল ভিন্নরূপ; একাদশ শতক হতে ল্যাটিন ইউরোপের বাস্তব অবস্থার রূপ বদলাতে শুরু করে; আর্থ-সামাজিক প্রগতিশীলতার দিক বিকাশ উন্মুখ হয়। এ সময় ইউরোপীয় সেমিনারীতে স্কলাসটিক দর্শনের প্রভাবে ডায়ালেকটিক বাক্য সর্বস্ব কূটতর্কের প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও যেহেতু এতে রহস্যবাদ জড়িত ছিল না, তাই আরব বিজ্ঞান দর্শনের বহুল চর্চার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার উন্মোষ ঘটে। রোজার বেকনের প্রয়োদবাদ এবং

পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচার ধারার উপর ইবনে হায়সামসহ অন্যান্য আরব বিজ্ঞানীদের প্রভাব ছিল খুবই লক্ষণীয়।[২৫৮] বস্তুত একাধশ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রয়োগবাদ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নীরিক্ষার ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে; ফলে ইতালীয় রেনেসাঁস এবং সতের শতকে নয়া বিজ্ঞানের পটভূমি রচিত হয়।

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে নবম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবি ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের যে মহিরুহ সৃষ্টি হয়, এবং কি রূপে একাদশ শতক হতে ইউরোপে তার অনুপ্রবেশ ঘটে, দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপ উদীয়মান বিদ্বৎসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে, এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া কি হয়, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার সূত্রপাত করা হল।

ইউরোপে একাদশ শতক হতে যে নয়া রূপান্তরের মোড় নিচ্ছিল তার প্রকাশ ঘটে তাদের উদীয়মান বিদ্যালয় গুলিতে। এখানে নতুন চিন্তার উন্মোষ ঘটে। এ সময় পারফিরির পুস্তক ইসাগোজীর এক নতুন ব্যঞ্জনা বিদ্বৎ সমাজের উপলব্ধিতে আসে; এবং স্কলাসটিক আচার্যদের মধ্যে তা আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। বইটিতে একটি দার্শনিক মৌলিক বিষয়ে "বিশেষ ও সর্বিক" (Universal ও Particular) এর উল্লেখ ছিল; অথচ এ সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত আলোচনা ছিল না। লাতিন বিশ্বে এ্যারিস্টটল এ সময় একেবারে অজ্ঞাত না থাকলেও তার মতাদর্শ সম্পর্কে জানার কোনো উপযোগী সূত্র ছিল না। এ কারণে লাতিন জগতে তার সম্পর্কে মতামত ছিল অস্বচ্ছ তবে তিনি প্লেটোবিরোধী তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এতটুকু তাদের নিকট ছিল স্পষ্ট। ইউরোপে একাদশ শতকের উদীয়মান মানব চেতনায় 'বিশেষ ও সার্বিক' নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে সার্বিকতারবোধ প্রথমে উদ্ভব হয় এক বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর গুণের সাদৃশ্য থেকে, এবং একই গুণের পৌন:পৌনিক অস্তিত্বের প্রকাশ থেকে। বস্তুর সাথে বস্তুর সাদৃশ্য গুণের ক্ষেত্রে দেখা যায় সে গুণের মূল্য কি? গুণটির নিজস্ব কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি? না, এটি কি মানুষের মনের কল্পনা বা বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ গুণের মানসিক বিশ্লেষণ? উদাহরণস্বরূপ মানুষ একটি 'সার্বিক পদ' বিশেষ ব্যক্তি করিম-রহিম-এর মধ্যে মানুষ হওয়ার গুণ আছে বলেই তারা সকলেই মানুষ শ্রেণীভুক্ত। প্রশ্ন হল মানুষ্যত্ব গুণটি কি করিম-রহিম এর বাইরের কোনো অস্তিত্বশীল? না, মনুষ্যত্বটা মানুষের মনের একটি কল্পনা যার সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কোনো জীবকে মানুষ বলা যায়? বিদ্যানিকেতনে যেহেতু এ্যারিস্টটলীয় ডায়ালেকটিক তর্কশাস্ত্রের প্রাধান্য ছিল; অথচ তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অগাস্তানিয় তথা নব্য প্লেটোবাদী, তাই সনাতনী মত ছিল 'সার্বিক' বাস্তব বা অস্তিত্বশিল। এমতাবস্থা বিকাশোন্মুখ বিদ্বৎ সমাজ ঐ জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। বিখ্যাত স্কলাসটিক আচার্য রোসেলিন (১০৫০-১১২৫ খ্রি.) সনাতন চিন্তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেন যে, 'সর্বিক' অস্তিত্ব নয়; নামমাত্র, শব্দ বৈ কিছু নয়। এভাবেই ইউরোপীয় চিন্তার জগতে নামবাদ

(Nominalism) এক নয়া তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। সে সময় এই নয়া মতাদর্শের একটি গুরুতর ধর্মীয় তাৎপর্য ধরা পড়ে। এতে খ্রিষ্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদী একত্ববাদ বা God the Father, God the son, God the Holy Ghost এ তিনের সম্মিলনে এক পরম ব্রহ্মবাদ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়। যদি সার্বিক-অস্তিত্ববাদ স্বীকৃত না হয় তা হলে উক্ত তিনটি সত্তা পৃথক তিন পরম ব্রহ্মে পরিণত হয়। অতএব বিষয়াটি ছিল গুরুতর। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের জন্য এটা ছিল ঘোরতর বিরোধী মতাদর্শ; হেরেসি। এ কারণে এানসেলম (১০৩৩-১১০৯ খ্রি.) রোসালিনের নামবাদ ধর্মবিরোধী বলে নিন্দা করেন।[২৫৯] এভাবে অগাস্তনী প্লেটোবাদী মতাদর্শ নিয়ে অভূতপূর্ব বিতর্কের সূচনা হয়। এ রূপ ইউরোপীয় উদীয়মান মননশীল অবস্থায় গ্রীক দশনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু তাদের এ চাহিদা গ্রিকো-বাইজানটাইন সূত্র হতে মেটান সম্ভব ছিল না। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ক্যাথলিক গির্জা ও গ্রীক গির্জার বা লাতিন ইউরোপ এবং বাইজানটাইন ইউরোপের মধ্যকার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য হয়ে উঠে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মত।

গ্রীক দর্শন ভাণ্ডার রক্ষিত ছিল আরবিতে। আরব জ্ঞানভাণ্ডার হতে লাতিন ইউরোপ কিভাবে গোগ্রাসে ভক্ষণ করে তা উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণই যথেষ্ট। বিজ্ঞান বিষয় হতে তাদের মধ্যে বিজ্ঞান মনষ্কতার বিকাশের সাথে দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসে। আমাদের আলোচ্য স্থান কালের বিবেচনায় আলকিন্দি আল ফারাবী ইবনে সিনা প্রমুখদের দর্শনের সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, কিন্তু ইবনে রুশদ ব্যতীত আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য উপস্থাপন সম্ভব নয়। বস্তুত ইবনে রুশদই আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে।

সকল বিবেচনায় আলকিন্দি দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে হয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রীক দর্শন বিজ্ঞানের আরবিতে অনুবাদের কার্যক্রমে আলকিন্দির ছিল বিশেষ ভূমিকা। এ্যারিস্টটলের ম্যাটাফিজিকস এর আরবি অনুবাদের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন। এ্যারিস্টটলের অরগাননের উপর তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। প্লেটো, এ্যারিস্টটলে ও পিথাগোরাসের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। প্লেটো এ্যারিস্টটলের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক এবং মৌলিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাদের উভয়কে তাঁর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন।

আলকিন্দির বিখ্যাত পুস্তক কিতাবুল আক্বল লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন সেভিলের জন। ক্রিমনারের জেরারড ও তার দর্শন পুস্তকের অনুবাদ করেন। লাতিন ভাষায় অনূদিত তাঁর সকল গ্রন্থ হতে ধারণা করা হয় যে, তাঁর মানসিক প্রবণাতা ছিল নব্য প্লেটোবাদের দিকে। এতদসত্ত্বেও বাস্তবে প্রথমে বহুদিন ধরে প্রশ্চাত্যজগতে তাঁকে একজন কট্টর এ্যারিস্টটলবাদী বলে গণ্য করা হত; তাই তাঁকে সনাতন ধর্মবিরোধী হেরেটিক বা ভিন্নমতাবলম্বী বলে ভাবা হয়।

ইউরোপে পণ্ডিত মহলে যে বিতর্ক চলছিল তাতে তাঁর প্রভাব লক্ষণীয় না হলেও ইউরোপে বিজ্ঞান মনস্কতার উন্মোষে তাঁর অবাদন ছিল প্রচণ্ড। তাঁর গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। টিভোলীর প্লেটো তার জ্যামিতিক সমস্যাবলী, ইংরেজ বরার্ট তাঁর লিখিত জ্যোতির্বিদ্যা ড্যাত্রাজোগন্ট র্তার পদার্থ বিদ্যাও আবহাওয়া বিদ্যার উপর লিখিত পুস্তকের অনুবাদ করেন। আবাহওয়া বিদ্যার উপর লিখিত পুস্তকটি ভেনিসে ১৫০৭ সালে এবং প্যারিসে ১৫৪০ সালে মুদ্রিত হয়। তাঁর বিজ্ঞান পুস্তকসমূহ ইউরোপীয় চিন্তাধারায় প্রয়োগবাদের সূচনা করে।[২৬০] আলকিন্দি ছিলেন প্রথম দার্শিনক যিনি বিশ্বজগতের রহস্য উদঘাটনের জন্য কার্যকারণ বিধানের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে বিশ্ব চরাচরে কার্যকারণ বিধান ছিল অমোঘ; কার্যকারণের মাধ্যমেই বিশ্বজগৎ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই কার্যকারণের সামগ্রিক উপলব্ধির মধ্যে বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিহিত। ইউরোপীয় সনাতন চিন্তাধারায় তিনি হেরেটিক বলে বিবেচিত হলেও ইউরোপীয় উদীয়মান প্রগতিশীল চিন্তার উপর তার উক্ত কার্যকারণ তত্ত্ব প্রভাব ফেলে। কার্যকারণের উপর এত গুরুত্ব দেয়ার পরও তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে মনে করতেন যে, বুদ্ধিগত জ্ঞানের চেয়ে ঐশীগত জ্ঞান শ্রেয়। আরব বিশ্বে তাঁর চিন্তার এই অংশটি বেশি প্রভাব ফেলে। রাহুল যথার্থই বলেন যে, তিনি প্লেটো এ্যারিস্টটলের পরস্পরবিরোধী চিন্তায় দোল খান এবং ভারতীয় ধর্মকির্তীর মত অবশেষে ভাববাদে আত্মসমার্পণ করেন।[২৬১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি প্লুটিনাসের ঈনিডস্ এর অংশবিশেষ অনুবাদ করে তার শিরোনাম দেন এ্যারিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব। এই পুস্তকের কারণে মুসলিম বিশ্বের এ্যারিস্টটলের চিন্তন সম্পর্কে বহুদিন ভ্রান্তি বিদ্যমান ছিল।[২৬২] এ সব কারণে অনেকে মনে করেন চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কিন্দির দর্শন নব্য প্লেটোবাদ ও এ্যারিস্টটলবাদের সংমিশ্রণ।

একাদশ শতকে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় উত্থাপিত প্রশ্নে এতদিনের হেলেনবাদ, হিব্রুবাদ, যুক্তিবাদ ও ধর্মীয় কতৃত্ববাদের মধ্যে যে ঐক্য সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়—তা অনেকাংশে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। তবে রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় শাসন কতৃত্ব ও যাজকতন্ত্রের মধ্যে একটা আপোষরফা হওয়ায় উল্লেখিত চিন্তাদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনে এ্যানসেলম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এরূপ মনোনশীল ও মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে যারা অগাস্তানবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাচ্ছিলেন তারা ফারাবী এবং ইবনে সিনার যুক্তিধারার আশ্রয় নেন। ক্রেমনারের জেরারড, জার্মানির হারম্যান এবং সেভিলের জন দ্রুত ফারবীর মনস্তত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রের পুস্তক লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। গুন্ডিসিলভাসা (মৃ. ১১৫১) ছিলেন আর একজন বিখ্যাত অনুবাদক যিনি ফারাবীর কতিপয় গ্রন্থ অনুবাদ ব্যাতীত ফারাবীর অনুকরণে দ্যাডিভিসেনা-ফিলোসোপিক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি স্কলাসটিক দর্শনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। টমান এ্যাকুইনা এবং মহান আলবার্টের উপর তার প্রভাব ছিল লক্ষণীয়।

ফারাবীর তর্কশাস্ত্র স্ক্রালটিক আচার্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর একটা বড় কারণ আল ফারাবী কোনো চরম মত পোষণ করেন নি। চিন্তার ক্ষেত্রে প্রায়স তিনি পরস্পরবিরোধী ধারণাকে এক সাথে মিলানোর চেষ্টা করেন। যদিও তিনি প্লেটো এবং এ্যারিস্টটরের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেন তবুও তার মানসিক প্রবণতা ছিল নব্য প্লেটোবাদের দিকে। এ কারণে আগস্তনীবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহীরা ফারাবীর যুক্তিধারাকে গ্রহণ করেন।[২৬৩]

ইউরোপে দার্শনিক সংঘর্ষে ইবনে সিনার গুরুত্ব অনেক বেশি। একাদশ শতকে তার বিখ্যাত পুস্তক আশাশিফা অনূদিত হলে তিনি ইউরোপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। তদুপরি বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত সোলেমান বিন গাব্রাইল রচিত দর্শনিক পুস্তক ইয়াম্বুল হায়াত ইবনে সিনাকে জনপ্রিয়তা দান করে। ইবনে সিনার দার্শনিক চিন্তাধারায় গতিবেগ আসে দ্বাদশ শতকে। এ সময় ময়মনিডেস দ্বারা অনূদিত ইবনে সিনার গ্রন্থ দালালতুল হায়ারিন এব মাধ্যমে। সেভিলের ইহুদী পণ্ডিত দয়ুদের পুত্র জন ইবনে সিনার ম্যাটাফিজিক্স এর অনেকগুলো পুস্তকের অনুবাদ করেন। 'সংকলন'; শীর্ষক পুস্তকটি ভেনিসে ১৪৯৫ সালে এবং ১৫০০ সালে মুদ্রিত হয়। উক্ত সংকলনের গ্রন্থগুলো ১. লজিকা; ২. সাফিসিয়েন্তা; ৩. ড্যাকোয়েটো আত মুণ্ড; ৪. দ্যা এমিয়িয়া, ৫. দ্যা এ্যানিমালিয়া; ৬. ইনটেলিজেনাটিয়া; ৭. ফিলোসোফিক প্লেমি।[২৬৪] বস্তুত ইবনে সিনার অসংখ্য পুস্তক লাতিনে অনূদিত হওয়ার পর ইউরোপে স্বতন্ত্র একটি দার্শনিক চিন্তাধরা গড়ে ওঠে। এটাকেই মধ্যযুগে ইবনে সিনাবাদ বলা হয়। ইবনে সিনাবাদ অগাস্তানবাদের ব্যাখ্যায় বিশেষ সহায়তা দেয়।[২৬৫]

এয়োদশ শতকে অগাসষ্টিন মতাদর্শের সাথে এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চলে। এ প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমি ছিল ইবনে সীনাবাদ। এর ফলশ্রুতিতে এ সময় অগাস্তনীয় সীনাবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে, কিন্তু সনাতন পন্থীরা ইউরোপীয় চিন্তাধারার উপর ইবনে সিনার ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করে ওয়োভেঞ্জের উইলিয়ামের মত ইবনে সিনাপন্থীও ইবনে সিনার অনাদি বিশ্বতত্ত্বের সমালোচনা করেন এবং তার মতাদর্শ খ্রিষ্টান ধর্মবিরোধী বলে প্রচার করেন। এ কারণে গির্জা ১২১৩ ও ১২১৫ সালে ইবনে সিনাবাদ এবং এ্যারিস্টটলবাদের উপর লিখিত পুস্তকাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। গীর্জার এরূপ কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও এত অপপ্রচার সত্ত্বেও ইউরোপীয় প্রগতিশীল বৃদ্ধিজীবী মহল ইবনে সিনাবাদের অনুসারী ছিলেন। দ্যাভকস উইলিয়ামকে সীনাবাদী বলে স্বীকার করেন নি। তার মতে যারা ইবনে সিনার সকল মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল তারাই কেবল সিনাপন্থী। তারা ইবনে সিনার জ্ঞান তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। দ্যাভকস মনে করতেন রোজার বেকন ছিলেন একজন যথার্থ ইবনে সিনাপন্থী।[২৬৬] বস্তুত ধীরে ধীরে ইউরোপ অগাস্তীনবাদ অতিক্রম করে ইবনেসিনাবাদে উপনীত হয়। ইবনে সিনাবাদ দ্বারা মহান আলবার্ট এবং তার শিষ্য টমাস এ্যকুইনা বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়েন। ইবনে

সিনার পুস্তক অধ্যয়নকালে মহান আলবার্ট ইবনে সিনা ও গাজ্জালীর মতাদর্শের সন্ধান পান; ইবনে সিনার আত্মার শ্রেণী বিভাজনকে গ্রহণ করেন। অনেকে টমাস এ্যাকুইনার উপর ইবনে সিনার প্রভাব লক্ষ্য করেন। টমাস এ্যাকুইনা ইবনে রুশদ অধ্যয়ন করে উভয়ের সমালোচনা করেন এবং তিনি তার নিজস্ব দর্শন প্রস্তুত করেন। এ সময় হতে ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদের প্রভাবেই লাতিন ইউরোপে এ্যারিস্টটলের আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত হয়।[২৬৭]

ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি ইবনে রুশদের প্রায় সকল গ্রন্থই লাতিন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় ইউরোপীয় উদীয়মান বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃতি পান।[২৬৮]

তার স্বতন্ত্র মতামতের জন্য ইউরোপে রুশদবাদ জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদে পরিণত হয়। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের স্বার্থে লাতিন ইউরোপের সাক্ষাৎ পরিচয়ের বড় মাধ্যম ছিলেন ইবনে রুশদ। এ্যারিস্টটলের দর্শনের যে ব্যাখ্যা তিনি রচনা করেন তার মাধ্যমে ইউরোপের জ্ঞান জগত গ্রীক দর্শনের পরিচয় লাভ করে। এ্যারিস্টটলের মতাদর্শ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি তিনটি পুস্তক লেখেন। ক. এ্যারিস্টটলের মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত সার; খ. মাঝারি আকারে ব্যাখ্যা; গ. বিস্তারিত ব্যাখ্যা। তিনি কেবল এ্যারিস্টটলের মতাদর্শের ব্যাখ্যা পরিবেশন করেন নি, তিনি স্বয়ং মৌলিক সৃজনশীল লেখক ছিলেন। তাঁর পূর্বে এ্যারিস্টটলের মতাদর্শের ব্যাখ্যায় যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল তা তিনি খণ্ডন করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ্যারিস্টটলের মতাদর্শকে নব্য প্লেটোবাদ হতে মুক্ত করেন;[২৬৯] এবং মৌলিক ভাষ্য লেখেন। প্রকৃত এ্যারিস্টটলকে জানতে আগ্রহী ইউরোপের সকল বুদ্ধিজীবী রুশদবাদী হয়ে পড়েন। বস্তুত দ্বাদশ হতে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে রুশদবাদের একচ্ছত্র প্রভাব ছিল।[২৭০]

দ্বাদশ শতকের শেষে রুশদবাদ এতই জনপ্রিয় হয় যে, সনাতনপন্থী যাজকরা ভীত হয়ে ১২১০ সালে প্যারিস কাউন্সিলে ইবনে রুশদ লিখিত এ্যারিস্টটলের সকল ভাষ্য পঠন পাঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্যারিসের কর্ডিনাল ১২১৫ সালে এবং পোপ ১২৩১ ও ১২৪৫ সালে উক্ত নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করেন। পোপ চতুর্থ আরবান ১২৬৩ সালে তুলুস বিদ্যালয়ে এ্যারিস্টটলের পদার্থ ও অধিবিদ্যা পঠন পাঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১২৬৯ সালে প্যারিসের বিশপ রুশদের মূল মতবাদের তেরটি বিষয়ের উপর পঠন পাঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১২৭৭ সালে রুশদপন্থীদের উপর নিপীড়ন চালানো হয়। মজার ব্যাপার প্রাচ্যে ও প্রতিচ্যের স্কলাস্টিকরা তার যে সব ধ্যান ধারণার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন ইউরোপের প্রগতিবাদীরা সেগুলোকে স্বাগত জানান। ঐসব ধ্যানধারণা পরবর্তী রেনেসাঁস আন্দোলনের পথ সুগম করে।

সংক্ষেপে তার ধ্যান ধারণাগুলি নিম্নরূপ :১. ধর্ম পুস্তকের রূপক বা প্রতিকী ব্যাখ্যা; (Allegorical) ২) দু সত্য তত্ত্ব, ৩. বিশ্ব আত্মার চিরন্তনতা এবং ব্যক্তি আত্মার

মরণশীলতা তত্ত্ব; ৪. বস্তুর অনাদিত্য এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তত্ত্ব; ৫. নারী মুক্তি তত্ত্ব।[২৭১] রুশদবাদের দু সত্য তত্ত্ব ইউরোপের বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিরা লুফে নেয়; বস্তুত বস্তুর অনাদিত্যতা তত্ত্ব বিজ্ঞান চর্চার রাস্তা খুলে দেয়। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার জন্য রাষ্ট্র ও গীর্জা রুশদবাদীদের নির্মূল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। কারণ দ্যা উলফ রুশদবাদীদেরকে Doctor of Antri Scholastic বলে অভিহিত করেন।[২৭২]

ইবনে রুশদের প্রচুর প্রভাব পড়ে ফ্রান্সসিকান সম্প্রদায়ের উপর। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ফ্রান্সসিকান সম্প্রদায়ের বড় কেন্দ্র; এখানে রুশদের দর্শনের উপর খুবই গুরুত্ব দেয়া হত। ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের সকলেই রুশদবাদী ছিলেন না; তাদের অনেকেই রুশদের প্রগতিবাদের জন্য রুশদবাদী হয়েছিলেন তাও নয়; বরং তাদের অনেকে রুশদের অদ্বৈত পরমাত্মাবাদের জন্য তাঁকে সমর্থন করেন। ডোমিনকান সম্প্রদায়ের অনেকে রুশদবাদ বিরোধী হলেও তাদের অনেকে রুশদবাদের গুণগ্রাহী ছিলেন। ফ্রান্সিসকানদের মহান পণ্ডিত টমাস এ্যাকুইনা এবং রেমন্ড মার্টিনী রুশদবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। রেমন্ড লিলি (১২২৪-১৩১৫ খ্রি.) কেবল রুশদবাদ নয় সমগ্র আরব দর্শন ইউরোপ হতে নির্মূল করার সর্ব প্রকার প্রয়াস চালান।[২৭৩]

ইউরোপে আরবি জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল প্যারিস। এখানে প্রবাসী স্পেনীয় ইহুদীগণের একটি বড় অংশ আবাসন গ্রহণ করেন এবং তাদের সকলেই ছিলেন রুশদবাদী। তারা আরব জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিশেষভাবে রুশদের গ্রন্থাবলী লাতিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদে সক্রিয় ছিলেন। মজার ব্যাপার প্যারিস কেবল রুশদবাদীদের নয়, রুশদবাদ বিরোধীদেরও বড় আড্ডাখানা ছিল।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ছিল রুশদবাদের বড় দুর্গ; অথচ সোরবান বিশ্ববিদ্যালয় ছিল রুশদ বিরোধীদের প্রাণ কেন্দ্র। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধ্যক্ষ সীজার ব্রাবন্ট (মৃ. ১২৮৪ খ্রি.) ছিলেন রুশদবাদের দৃঢ় সমর্থক। তার মতাদর্শের জন্য তিনি কারাজীবনে দেহত্যাগ করেন। সনাতনীদের কেন্দ্র সোরবনের উপর পোপের ছিল কৃপাদৃষ্টি। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অসন্তুষ্ট হওয়ায় পোপ ১২২৮ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যবস্তু ছিল আরব দর্শন তথা রুশদবাদ প্রতিহত করা; আরব দর্শনের অধ্যাপকদেরকে ধর্মবিরোধী বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১২৬৯ সালে সোরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের চেষ্টায় একটি ধর্মপরিষদ আহবান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যারা নিম্নলিখিত বিষয় মান্য করে তাদেরকে রুশদবাদী নাস্তিক বলে ঘোষণা করা হবে; ১. সকল ব্যক্তির মধ্যেই এক ব্রহ্ম বর্তমান; ২. জগৎ অনাদী; ৩. কোন আদীপিতা আদম মানুষের প্রথম পূর্বপুরুষ নয়; ৪. আত্মা শরীরের সঙ্গে বিনষ্ট হয়; ৫. ব্যক্তির যে জ্ঞান তা আল্লাহর মধ্যে নেই; ৬. মানুষের কর্মে আল্লাহর হাত নেই; ৭. নশ্বর বস্তুকে নিত্য বস্তুতে পরিণত করতে আল্লাহ অক্ষম। এ সব সত্ত্বেও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব দর্শনের পঠন পাঠন বন্ধ হয় নি।[২৭৪]

আরব তথা রুশদবাদী দর্শন আধ্যয়নের জন্য সারা ইউরোপে ইতালীর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য খ্যাতিমান অধ্যাপক সমবেত হয়েছিলেন এবং ইবনে রুশদের উপর অসংখ্য ভাষ্য রচনা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ১৬৩১ সালে দর্শন আচার্য দ্য ক্রিমনার আমৃত্যু আরব দর্শন তথা রুশদবাদের চর্চা পূর্ণ উদ্যোমে চলে। এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে রুশদ গ্রন্থাবলীর নতুন লাতিনী অনুবাদ করা হয়। বিখ্যাত অনুবাদকদের অন্যতম ছিলেন বেরোনা।

পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশদবাদ প্রচারে ইহুদি পণ্ডিতদের অবদান স্মরণীয়। তাদের অসংখ্য অধ্যাপকদের একজন ছিলেন ইলিয়াস মাদিজু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রুশদ দর্শনের প্রভাবে বিচার স্বাতন্ত্র্যের প্রচার ইহুদি সমাজে এত বৃদ্ধি পায় যে, ধর্মাচার্যগণ আপন সমাজে ধর্মহানির আশঙ্কা করেন। তাঁরা দর্শন-বিরোধী মুসলমানদের সাথে আঁতাত গড়ে তোলেন। আবু মুসা আলমাসিনো ১৫৩৮ সালে গাজ্জালীর তাহফাতুল ফিলোসোফার হিব্রু ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন।[২৭৫] বিখ্যাত পণ্ডিত জাব্রিলার শিষ্য সীজার ক্রিমানো ছিলেন আরব দর্শন এবং রুশদবাদের যোগ্যতম অধ্যাপক। কিভাবে সরকার এবং গির্জা হতে তাঁর অধ্যাপনার কাজে বাধা আসে সে সম্পর্কে রুশদের এক পুস্তকের ভূমিকায় তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৬১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সরকারি হুকুমনামা প্রেরণ করা হয়; এতে ধর্মবিরোধী দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলো খণ্ডন করার নির্দেশ দেয়া হয়। এই হুকুমনামার উত্তরে এক পত্রে তিনি বলেন যে, তিনি এ্যারিস্টটলের দর্শনের অধ্যাপনার কাজের জন্য বেতন ভোগ করেন। এর বাইরে অন্য কোন দায়িত্ব পালন করতে নারাজ। প্রয়োজন হলে তিনি পদত্যাগ করতে রাজি ছিলেন। যা হোক পাদুয়াতে তাঁর মৃত্যুর পরও রুশদবাদী দর্শনের পঠন পাঠন কার্যক্রম চলতে থাকে। রুশদবাদীদেরকে স্বাতন্ত্র্যের পুত্র বলা হয়। রুশদবাদীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েও ইউরোপ হতে আরব দর্শন নির্বাসন করা সম্ভব হয় নি। পিদারক রেমান্ড লিলির আরব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তার আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তার আন্দোলনের এক মাত্র উদ্দেশ্যে ছিল লাতিন জগতে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পুনর্বাসন। সর্বত্রই তিনি প্রাচীন ইউরোপের গৌরবগাঁথা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তার শ্লোগান ছিল "হে ইতালীর বুদ্ধি ও প্রতিভা তুমি কি গভীর নিদ্রা হতে কখনো জাগবে না?[২৭৬] পেদারক স্বপ্ন দেখতেন কবে গ্রীক ভাষায় এ্যারিস্টটলের মৌলিক দর্শনের উপর পাদুয়াতে বক্তৃতা হবে। তাঁর মৃত্যুর ১২৩ বছর পর ১৪৯৭ সালে ৪ নভেম্বর পাদুয়া তথা ইতালীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এ দিনে অধ্যাপক ল্যানিয়াস গ্রীক ভাষায় এ্যারিস্টটলের দর্শনের উপর বক্তৃতা করেন। সনাতনপন্থীরা ভেবেছিল ঘড়ির কাটা পশ্চাতমুখী করতে সমর্থ হয়েছে; কিন্তু তা কি সম্ভব! এর পরও পাদুয়ায় রুশদবাদের পাঠ অব্যাহত থাকে।

সতের শতকের জেসুইটদের প্রবল আক্রমণের মুখেও আরব বিজ্ঞান দর্শন ইউরোপ হতে নির্বাসিত হয় নি।[২৭৭]

এক নতুন পরিস্থিতিতে মধ্যযুগের অগ্রসর দর্শন রুশদবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হয় একেবারে ভিন্ন এক কারণে। এর গৌরবময় পরাজয় ঘটে উদীয়মান নয়া বিজ্ঞানের কাছে। গ্যালিলিওর দুরবিন, হার্ভের রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এবং সর্বপরি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের নিকট রুশদবাদ আত্মসমর্পণ করে। ইতিহাসের আলোকে লক্ষ্য করা যায় যে, নয়া বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পরিমাণক্রমে রুশদবাদের ক্রম পশ্চাদ অপসারণ বা ক্রমপতন সংঘটিত হয়। রাসেল যথার্থ বলেন ঃ Our superiority since the Renaissance is due partly to science and scientifice technique.[২৭৮]

একাদশ শতক হতে লাতিন ইউরোপে যে ঘটনা প্রবাহের উদ্ভব হয় সতের শতকে এসে তা দ্রুত এক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। এই শতাব্দীতে ইউরোপে অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক বিপ্লব সূচিত হয়। পনের ও ষোল শতাব্দী ধরে সারা ইউরোপে যুগপৎ চলে রেনেসাঁস ও পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন; ভৌগোলিক আবিষ্কার উন্মোচন করে এক নব দিগন্ত; একই সাথে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হয়; নয়া আবিষ্কৃত আমেরিকা হতে স্বর্ণ-রোপ্য ইউরোপে উপচে পড়ে। কৃষি বিপ্লবের আঘাতে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় প্রতিদিন প্রকট হয়; নয়া বাণিজ্যতন্ত্রের বিকাশ এবং বিশ্ব বাণিজ্য বিপ্লবের সূচনা হয় সতের শতকের প্রারম্ভে। ইউরোপে ঐ নয়া বাণিজ্যতন্ত্র এবং বিশ্ববাণিজ্য বিপ্লবই মূলত আঠারো শতকে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব তথা প্রকৌশলী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত এবং অজেয় করে। আঠারো শতকের শিল্প বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে ধ্বসে পড়ে ইউরোপীয় বাণিজ্যতন্ত্রের একচেটিয়া অধিকারবাদ তথা সামন্ততান্ত্রিক অবশিষ্টাংশ; গড়ে ওঠে বিজ্ঞানভিত্তিক ইহলোকবাদী সমাজ ও সংস্কৃতি। বস্তুত ইউরোপের এরূপ অগ্রগামী সমাজ বিপ্লবের মধ্যে মধ্যযুগীয় অগ্রগামী রুশদবাদের সমাধিস্থ হওয়াই স্বাভাবিক। রুশদবাদই ইউরোপীয় অগ্রগামী এ্যারিস্টটলীয় বস্তুবাদের বিকাশের পথ প্রশস্ত করে।[২৭৯] ইতিপূর্বে আমরা ইউরোপে রুশদবাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি; উল্লেখ্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে রুশদবাদ ছিল বিস্মৃতির অতল তলে। রাসেল যথার্থই বলেন ঃ Averroes is more important in christian than in Mohamedan Philosophy. In the latter he was dead and in the former, begining.[২৮০]

সম্ভবত এর বাহ্য কারণ এতদাঞ্চলে তার পুস্তকের বিস্তার ঘটে নি; তদুপরি তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত গাজ্জালীর তাহফাতুল ফালাসিফা ছিল রুশদবাদ প্রতিহত করার বড় হাতিয়ার। এ অঞ্চলে গাজ্জালীর চিন্তাধারা সুদৃঢ় হয়। পুনশ্চ প্রশ্ন হতে পারে গাজ্জালীর চিন্তাধারা এবং রহস্যবাদী মরমিবাদী সুফিবাদ কেন মুসলিম বিশ্বে সুদৃঢ় ভিত্তি পেল? এর কি কোনো বৈষয়ক বা আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা আছে? একাদশ শতক হতে

এতদাঞ্চলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সময় প্রাচ্য-ইসলামী রাজ্যসমূহের বিশ্ব বাণিজ্য পথে কেবল বিশৃঙ্খলাই ছিল না বরং উত্তর ও দক্ষিণ বাণিজ্য পথের পতন ঘটে; সর্বত্র বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক সামরিকবাদের বিকাশ ঘটে। সুন্নি মুসলিম সমাজের উপর বাগদাদের খলিফা নামক ইসলামি যাজক এবং সামাজিক রক্ষণশীলতা চেপে বসে। মুক্ত চিন্তার কোন পরিবেশ অবশিষ্ট থাকে নি। সামন্ত শোষণ ত্রিব্র হওয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়। সুফিবাদকে গাজ্জালী দৃঢ়মূল করেন মাত্র। তাই এতদাঞ্চলের বাস্তব অবস্থা ছিল ইউরোপ হতে ভিন্নধর্মী। ইউরোপের বাস্তব অবস্থা ছিল উন্নয়নমুখী, অগ্রগামী; এ অঞ্চলের বাস্তব অবস্থা ছিল দ্রুত পতনশীল, পশ্চাদমুখী। এ প্রসঙ্গে হিট্টির মন্তব্য খুবই প্রণিদানযোগ্য। In fact in the branch of pure or physical Science was any appreciable advance made after the Abbasid days. The Muslim of todav if dependent on their own books; would have been less than their distant ancestors in the eleventh century.[২৮১]

তথ্যপুঞ্জি

১. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দর্শন দিগদর্শন
২. ঐ পৃ. ১৮
৩. ঐ পৃ ১৯
৪. ঐ পৃ. ৩২-৩৩
৫. ঐ পৃ. ৩৩
৬. Hitti, op. cit 306
৭. D. L. O'Leary, Arabic though and its plaace in History (London 1939) p 105
৮. Hitti, op. cit 307
৯. O' Leary, op. cit 105
১০. Ibid, p. 106
১১. Hitti, op. cit 308
১২. Ibid, p. 308
১৩. Ibid, p. 307
১৪. Ibid, p. 309-10
১৫. Ibid, p .311
১৬. Ibid, p .314
১৭. Ibid, p. 315
১৮. মুসা আনসারী ইসলামী বিশ্বের উদ্ভব ও বিকাশের সামাজিক ভিত্তি, হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ
১৯. মুসা আনসারী, ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা.

২০. Hitti, op cit 381
২১. Ibid, p 364
২২. Ibid, p 364
২৩. Ibid, p 365
২৪ Ibid, p 365
২৫. Ibid, p 363
২৬ Ibid, p 365
২৭ E G Browne, Arabian Mediecine (Combridge history 1921) p 44
২৮ Hitti op cit 366
২৯ Ibid, p 366
৩০ Ibid p 367
৩১ Ibid, p 367
৩২ Ibid p 367
৩৩ Ibid p 368
৩৪ Ibid, p 373
৩৫ Ibid, p 375
৩৬ bid, p 375
৩৭ Ibid, p 375
৩৮ Ibid, p 376
৩৯ Ibid, p 376
৪০ ইসলামী বিশ্বকোষ (লিডন) পৃ ৭২৩-২৭
৪১. Hitti op cit 377
৪২ Ibid, p 377
৪৩ Ibid, p 379
৪৪ Ibid p 379
৪৫ Ibid, p 379
৪৬ Ibid p 380
৪৭ Ibid, p 380
৪৮ Ibid p 381
৪৯. Ibid, p 384
৫০. Ibid, p 384
৫১. Ibid, p 385
৫২. Ibid, p 385
৫৩. Ibid, p 386
৫৪. Ibid, p 386
৫৫. Ibid, p 387
৫৬. Ibid, p 380

৫৭. Ibid, p. 380
৫৮. Ibid, p .381
৫৯. Ibid, p .381
৬০. Ibid, p. 381
৬১. Ibid, p. 381
৬২. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দর্শন দিকদর্শন ১ম খণ্ড
৬৩. M. M. Sharif, (ed) History of Muslim Philosophy, p. 434
৬৪. Shaban, op cit p. 152
৬৫. Hitti, op cit p. 156
৬৬. M. M. Sharif, op cit p. 435
৬৭. সাংকৃতায়ন, পূর্বোক্ত পৃ:. ৪৮
৬৮. M. M. Sharif, op cit p. 435
৬৯. Ibid, p. 435
৭০. সাংকৃতায়ন, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮
৭১. M. M. Sharif, op cit p 438
৭২. সাংকৃতায়ন, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮-৪৯
৭৩. M. M. Sharif, op cit p .444-5
৭৪. সাংকৃতায়ন, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৯
৭৫. ঐ পৃ. ৪৯
৭৬. ঐ পৃ. ৪৯
৭৭. M. M. Sharif, op cit p. 440
৭৮. Ibid p 448
৭৯. সাংকৃতায়ন, প্রাগুক্ত পৃ. ৫০
৮০. Hitti, op cit p .372
৮১. Ibid p .372
৮২. সাংকৃতায়ন পৃ. ৫০
৮৩. Hitti, op cit p .373
৮৪. সাংকৃতায়ন পৃ. ৫১
৮৫. Hitti, op cit p .373
৮৬. সাংকৃতায়ন, প্রাগুক্ত পৃ. ৫২
৮৭. ঐ পৃ. ৫২
৮৮. রাহুল পৃ. ৫২
৮৯. ঐ পৃ. ৫১
৯০. ঐ পৃ. ৫২
৯১. ঐ পৃ. ৫২
৯২. Hitti, op cit p .401

৯৩. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৯৪. O' Leary de locy, Arabic Thongh and its place in history (London 1939 p 137)
৯৫. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৯৬. ঐ পৃ. ৫৭
৯৭. ঐ পৃ. ৫৭
৯৮. O'Leary, op cit p 137
৯৯. Hitti, op cit p 370
১০০. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
১০১. ঐ পৃ:. ৫৭
১০২. O'Leary, op cit p 139
১০২ক. Ibid p 139
১০৩. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১০৪. O'Leary, op cit p 141-2
১০৫. Ibid p 143
১০৬. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১০৭. ঐ পৃ. ৬০
১০৮. ঐ পৃ. ৬০
১০৯. O'Leary, op cit p 144
১১০. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১১১. O'Leary, op cit p 144
১১২ রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১১৩. O'Leary, op cit p 146
১১৪. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
১১৫. ঐ পৃ. ৬৩
১১৬. ঐ পৃ. ৬৩
১১৭. ঐ পৃ. ৬৪
১১৮. ঐ পৃ. ৬৪
১১৯. ঐ পৃ. ৬৪
১২০. Hitti, op cit p 371
১২১. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
১২২. ঐ পৃ. ৬৬
১২৩. ঐ পৃ. ৬৬
১২৪. ঐ পৃ. ৬৬
১২৫. ঐ পৃ. ৬৭
১২৬. ঐ পৃ. ৬৮
১২৬.ক. Tarif Khalid, op. cit p. 172

১২৭. রাহুল, ঐ পৃ. ৬৮
১২৮. ঐ পৃ. ৬৯
১২৯. O'Leary, op cit p .169
১৩০. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
১৩১. O'Leary, op cit p. 171
১৩২. Ibid p .173
১৩৩. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
১৩৪. O'Leary, op cit p .173
১৩৫. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
১৩৬. ঐ পৃ. ৭১
১৩৭. ঐ পৃ. ৭২
১৩৮. O'Leary, op cit p .175
১৩৯. Ibid p .177
১৪০. Ibid p .176-77
১৪১. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
১৪২. ঐ পৃ. ৭৩
১৪৩. O'Leary, op cit p. 175
১৪৪. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
১৪৫. ঐ পৃ. ৭৩-৭৪
১৪৬. O'Leary, op cit p 179
১৪৭. Ibid p .179
১৪৮. Hitti, op cit p .433
১৪৯. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
১৫০. O'Leary, op cit p. 181
১৫১. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
১৫২. O'Leary, op cit p. 185-92
১৫৩. Lane Pole op cit p .181
১৫৪. O'Leary, op cit p. 188
১৫৫. Ibid p. 185
১৫৬. Hitti, op cit p. 433-4
১৫৭. Ibid p. 434
১৫৮. Ibid p .435
১৫৯. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১৬০. Hitti, op cit p .435
১৬১. Ibid p. 435
১৬২. Ibid p. 435-36

১৬৩. Ibid p 433
১৬৪. O'Leary, op cit pp 101-3
১৬৫ বাহুল প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১
১৬৬. Hitti, op cit p 436
১৬৭. O'Leary, op cit pp 196-7
১৬৮. Hitti, op cit pp 436-7
১৬৯ Ibid p 438
১৭০ Muhammad Habib, Introduction to Eliat and Dowsen
১৭১. O'Leary, op cit pp 111 12
১৭২. Ibid p 112
১৭৩. Hitti, op cit pp 431
১৭৪. O'Leary, op cit pp 211
১৭৫. Ibid p 216
১৭৬. Ibid p 213
১৭৭ Ibid p 213-14
১৭৮. Ibid p 214 15
১৭৯. Ibid p 215
১৮০. Ibid p 216
১৮১. Ibid p 217
১৮২. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬
১৮৩ ঐ পৃ: ৭৫-৭৬
১৮৪. মুসা আনসাবী, ইসলামী বিশ্বেব উদ্ভব ও বিকাশের সামাজিক ভিত্তি আবু মুহামেদ হবিবুল্লা স্মারক গ্রন্থ,
১৮৫ শিবলী নোমানী, আল গাজ্জালী, লক্ষ্ণৌ ১৯২৮ পৃ ১৯৪
১৮৬. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
১৮৭. ঐ পৃ. ৭৭
১৮৮. ঐ পৃ. ৭৭
১৮৯. শিবলী নোমানী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৫
১৯০. ঐ পৃ. ১৯৮
১৯১. বাহুল প্রাগুক্ত, পৃ ৮০
১৯২. G E Lewis, History ob Philosphy, p 50
১৯৩. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
১৯৪. ঐ পৃ. ৮৩
১৯৫. ঐ পৃ. ৮৩
১৯৬. ঐ পৃ. ৮৫
১৯৭. শিবলী নোমানী, প্রাগুক্ত পৃ. ১০১

১৯৮. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১৯৯. ঐ পৃ. ৮৮
২০০. ঐ পৃ. ৮৯
২০১. ঐ পৃ. ৮৯-৯০
২০২. ঐ পৃ. ৯৪
২০৩. ঐ পৃ. ৯৩
২০৪. ঐ পৃ. ৯৪
২০৫. ঐ পৃ. ৯৪-৯৫
২০৬. ঐ পৃ. ৯৫
২০৭. Hitti, op cit p 431
২০৮. Bertrand Russel, History of Philosophy, 419
২০৯. Hitti, op cit p 582
২১০. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
২১১. ঐ পৃ. ১০৯
২১২. ঐ পৃ.১১১
২১৩. ঐ পৃ. ১১৩
২১৪. ঐ পৃ. ১১৪
২১৫. ঐ পৃ. ১১৫
২১৬. ঐ পৃ. ১১৭
২১৭. ঐ পৃ.১১৮
২১৮. ঐ পৃ. ১১৮
২১৯. ঐ পৃ. ১১৮-১৯
২২০. ঐ পৃ. ১১৯-২০
২২১. ঐ পৃ. ১২১-২২
২২২. O'Leary, op cit p 266
২২৩. Ibid pp 267
২২৪. রাহুল প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৩
২২৫. O'Leary, op cit pp 257-8
২২৬. রাহুল, (জি. ই. লিউয়িস হতে উদ্ধৃত) প্রাগুক্ত পৃ. ১২৫
২২৭. ঐ পৃ. ১২৪-২৫
২২৮. ঐ পৃ. ১২৫-২৬
২২৯. ঐ পৃ. ১২৬-২৭
২৩০. M. N. Roy Historical Role of Islam (Delhi reprint 1990) p 10
২৩১. Stephanson and Leyon, Mediaeval History, (N Y 1062 p 305
২৩২. মুসা আনসারী, ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা।
২৩৩. Bertrand Russel, History of Western Philosophy

২৩৪. Ibid, p. 426
২৩৫. Ibid, p. 426
২৩৬. Ibid, p. 427
২৩৭. Ibid, p. 422-28
২৩৮. Slephanson Leyon, op cit. p. 275
২৩৯. Ibid, p. 295
২৪০. Stephanson and Leyon, op. cit p 304-305
২৪১. P. H. Hitti, History of the Arabs,
২৪২. Ibid, p 607
২৪৩. Ibid, p. 588
২৪৪. Ibid, p 588
২৪৫. Ibid, p. 588
২৪৬. Ibid, p 589
২৪৭. Ibid, p 589
২৪৮. Ibid, p 366
২৪৯. Ibid, p .366
২৫০. Ibid, p 366
২৫১. Ibid, p 68
২৫২. Ibid, p. 379
২৫৩. Stephanson op cit pp 306-310
২৫৪. Ibid, p .191-92
২৫৫. S. M. Sherif. op. cit. p .1372
২৫৬. Stephanson leyon, op. cit p. 308
২৫৭. B. Russel, op. cit p 116
২৫৮. S. M. Sharif (ed) op. cit p. 1370
২৫৯. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দর্শন দিগদর্শন, প্রথম খণ্ড
২৬০. S. M. Sherif. op. cit. p. 1376
২৬১. Ibid, p .1376
২৬২. Ibid, p. 1378
২৬৩. Ibid, p .1378
২৬৪. Ibid, p. 1377
২৬৫. B. Russel, op. cit p. 419
২৬৬. Ibid, p .419
২৬৭. Ibid, p .419
২৬৮. S. M. Sherif. op. cit. p .1379-87
২৬৯. Ibid, p .1380

২৭০. রাহুল, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪১-১৪৫
২৭১. ঐ পৃ. ১৪১-১৪৬
২৭২. ঐ পৃ. ১৪৬
২৭৩. ঐ পৃ. ১৪৯
২৭৪. B Russel, op cit p 395
২৭৫. Ibid, p 419
২৭৬. Ibid, p 419
২৭৭. Ibid, p 419
২৭৮. Hitti, op cit 381
২৭৯. Ibid, p 419
২৮০. Ibid, p 419
২৮১. Ibid, p 419